সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড এণ্ড বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ

(স্থাপিত—১৯৪০)

৪এ, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, পোঃ কালিঘাট, কলিকাতা।

বার্ষিক শতকরা ৬৲ সুদে Fixed Deposit লওয়া হইতেছে। Fixed Depositএর যাবতীয় টাকা জমীতে লগ্নী করা হইতেছে এবং Capitalএর টাকা হইতে জমিগুলির উন্নতি-সাধন করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। দশ হাজার বা ততোধিক টাকার Fixed Deposit এর জন্য জামানত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইহা অপেক্ষা নিরাপদে টাকা খাটান আর কিছুতেই সম্ভব নহে।

সোসাইটি নিজের এবং Fixed Depositএর টাকায় বহু মূল্যবান্ জমি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছেন।

বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

আমাদের তৈরী

ডাক্‌ব্যাক্ ওয়াটারপ্রুফ্
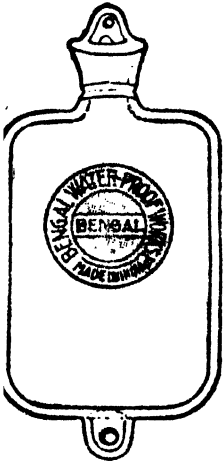
রবার ক্লথ,
হট্ ওয়াটার ব্যাগ,
আইস্ ব্যাগ,
হাওয়া বিছানা ও বালিশ,
এয়ার রিং ও কুশন,
ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি

নির্ভরযোগ্য, টেক্‌সই এবং দামেও কম

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাবেন।

সচিত্র ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

হেড অফিস্ ও কারখানা :—পানিহাটি (২৪ পরগণা)।
শোরুম ও বিক্রয়কেন্দ্র :—১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।
নাগপুর বিক্রয়কেন্দ্র :—অভয়ঙ্কর রোড, সীতাবল্‌দী, নাগপুর।

পরাবিদ্যা
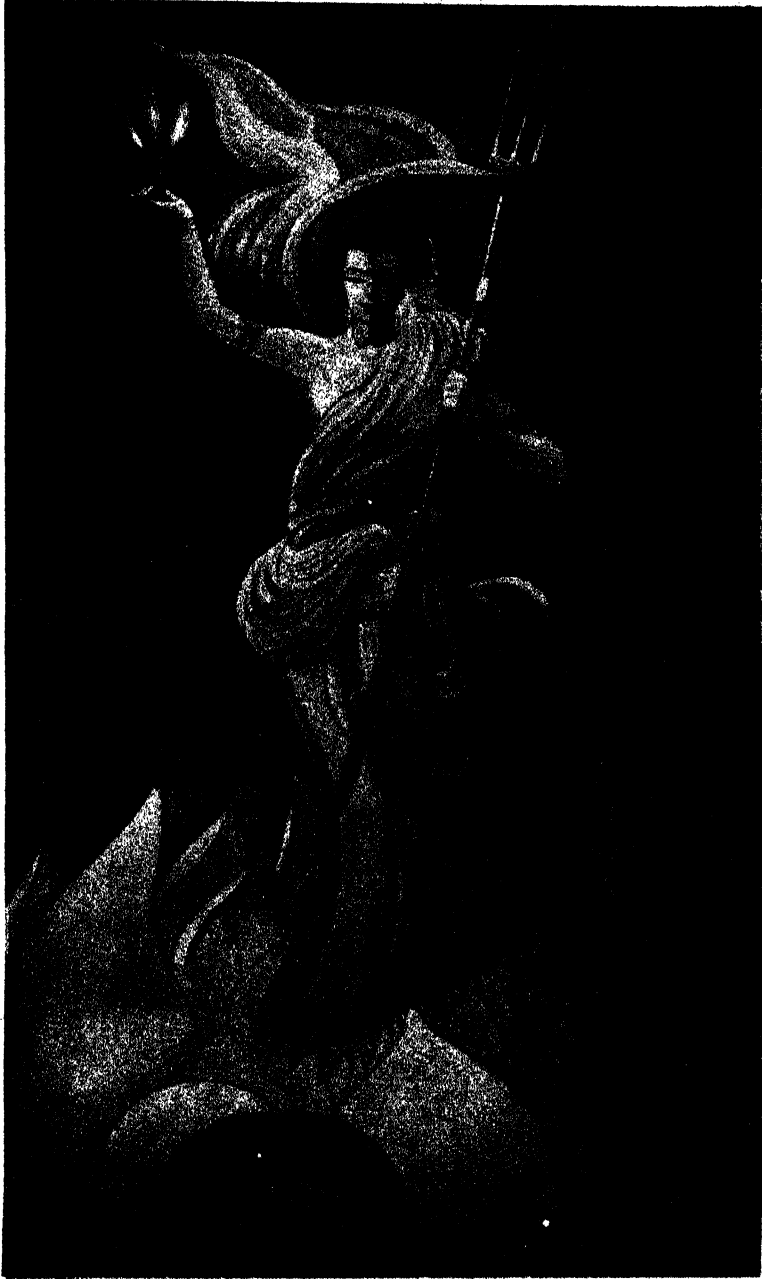
শিল্পী: শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যা
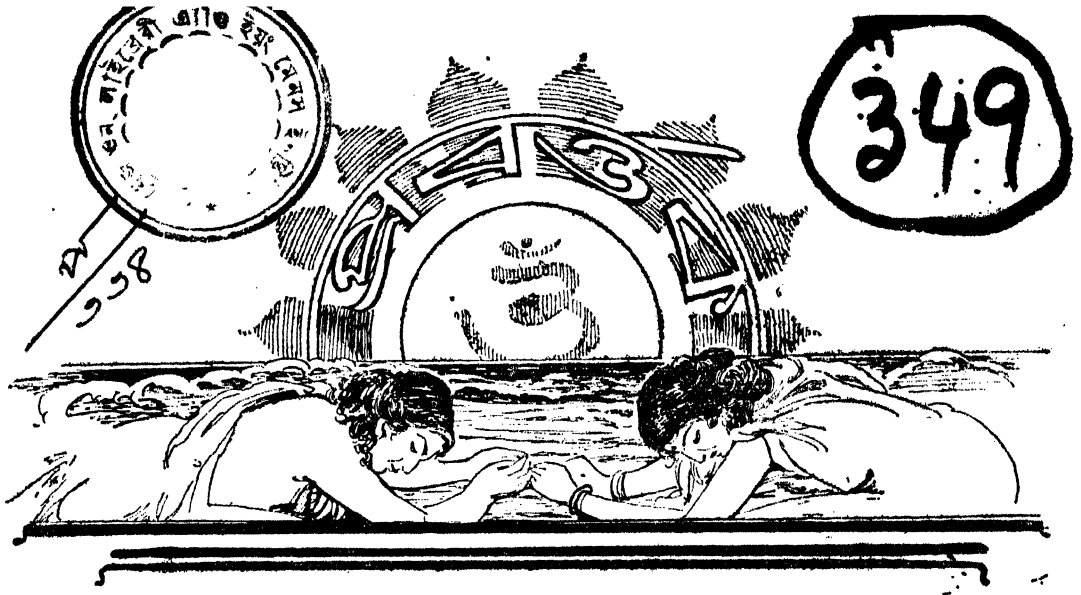
সপ্তবিংশ বর্ষ ১৩৪৯ সাল	বৈশাখ	প্রথম খণ্ড ১ম সংখ্যা

আশ্রয়ের সাধনা

আকাঙ্ক্ষা জাগে, কিন্তু ধারণ করবার অক্ষমতা বুঝে সরে' দাঁড়াতে চাই। কে চায় এমন ক'রে মরতে? কিন্তু শব না হলে, শ্যামা নাচে না। শ্যামার নাচন যদি দেখতে চাও, শব হও। সে কত বড় সাধনা? সকল বৃত্তির বিসর্জ্জন জড়ত্ব। কিন্তু শুভ্র চেতনার অনুভূতি জাগ্রত করে' রাখা চাই—জ্যান্তে মরার মতই অবস্থা। তবুও ভয় নাই—সাধন যদি তুমি করতে, এই প্রলয়-ঝড়ে ভেসেই যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আশ্রিত স্বয়ং ভগবান। তুমি যত চেষ্টা ও কামনা ছাড়বে, আশ্রয়-মহিমার উপলব্ধি ততই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে।

সাধনাটী অভিনব। লক্ষ্যও অতীতে এমন ছিল না—পথও নূতন। বীর যে, সে ছাড়া এপথের যাত্রী কে হবে? শ্রদ্ধা—বীর্য্য দান করে। পদে পদে শ্রদ্ধাহীন হও কি দুঃখে? মনে প্রাণে বাজে? শব হওনি, বুঝিয়ে দেয় বিবেক। সতর্ক হও, সচেতন হও—কৌশলে, ছন্দে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চল জোর করে'। এক্ষেত্রে নিজের অহঙ্কারে একটী তৃণও উঠান যায় না।

আমি দিতে চাই তোমাদের প্রত্যেককেই এমন এক অনুভূতি, ফুটিয়ে তুলতে চাই এমন এক আলো, দর্শন করাতে চাই এমন এক অপার্থিব রূপ—প্রকৃতি-অনুযায়ী এমন একটা সাড়া তুমি পাবেই, যা নিয়ে নির্ভয়ে তুমি এগোতে পার। চক্ষে দেখে' কে আর অপ্রত্যয় করবে অধ্যাত্মসাধনার গৌরব?

সহস্র কর্ম্মের মাঝেই ফুটে' উঠ্‌বে অপ্রত্যাশিত অনুভূতি—অভাবনীয় দর্শন। হে সাধক, অধ্যাত্মচেতনায় অবস্থান কর। ঘটনায় যদি চিত্ত বিচলিত হয়, এ মহাযুগের দান ব্যর্থ হবে।

[শ্রীম—]

নববর্ষে

আবার নববর্ষ। "প্রবর্ত্তক" এইবার সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিল। বিশ্বজীবনের এই খণ্ড প্রলয়-যুগে, শুধু "প্রবর্ত্তক" কেন, নিখিল মানব-জাতি ও তাহার সম্পর্কিত সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আয়ুঃ-রক্ষার ব্যাপারও দুর্ভাবনাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় "প্রবর্ত্তকে"র জীবন ও ভবিষ্যৎ বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তির হস্তেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া, আমরা নববর্ষের সম্মুখীন হইতেছি। যিনি অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টিকে লয় ও লয়কে সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া নিমেষে অসাধ্য সাধন করেন, সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী মহাদেবী তাঁহার অমোঘ ইচ্ছার যন্ত্র-স্বরূপ আমাদের চিরদিন চালনা করিয়াছেন, আজও করিবেন—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই আমাদের অমোঘ বীর্য্য ও অপ্রতিহত গতি দান করিবে।

এই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা—আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্ ও নিখিল দেশবাসীর আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। শিবস্বরূপ স্বয়ং শুভবুদ্ধি দিয়া এই দুর্দ্দিনে স্বদেশ ও স্বজাতিকে সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে রক্ষা ও অভিনব অভ্যুদয়ের পথে সুসংস্থাপিত করুন।

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যংভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ

গুরুশক্তি

গুরু—প্রকাশক। তিনি নয়ন-স্বরূপ, জ্যোতিঃ-স্বরূপ। প্রাচীন নন্দিকেশ্বর কাশিকায় উক্ত ও ভর্ত্তৃহরি-বিরচিত বাক্যপদীয় গ্রন্থে বিশদীকৃত স্ফোটবাদানুসারে, 'গ'-অক্ষরে চক্ষুঃ, 'র'-অক্ষরে বহ্নি এবং 'উ' শরীর বা বিগ্রহস্বরূপ বুঝায়। এই সূত্রে 'গুরু'-শব্দে প্রকাশক চক্ষুঃ ও প্রকাশময় আলোকেরই রূপকে জ্ঞান-ঘন জ্যোতির্ঘন অধ্যাত্মতত্ত্বকেই স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যায়। গুরুশক্তি সেই শক্তি, যাহা অজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া তাহার আঁধার জীবনপথ আলোকিত করিয়া তুলে। তাই

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

-এই শ্লোকার্থ গুরুতত্ত্বেরই যথার্থ মর্ম্ম বহন করে, ইহার মধ্যে অতিবাদ বা অতিশয়োক্তি একবিন্দু নাই। গুরু-শব্দের নিজস্ব অর্থ, তাহার প্রকৃত স্বরূপ-তত্ত্বই প্রাঞ্জলভাবে এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে—উহা খুলিয়া ধরিয়াছে অধ্যাত্ম-জগতের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় মহাসত্য।

গুরু বহু হইতে পারেন, কিন্তু গুরুতত্ত্ব এক, অভিন্ন। এক অখণ্ড জ্ঞানই নিত্য সনাতন গুরুবস্তু। যেখানেই বহুর মধ্যে একের প্রকাশ, যেখানেই অনিত্যের মধ্যে নিত্যের আকর্ষণ, সেইখানেই হেতুস্বরূপ গুরুশক্তি বর্ত্তমান। গুরুশক্তি সেই পরাপ্রকৃতিই, যাঁহাকে গীতায় "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" বলা হইয়াছে। জীবজগৎ যে অবিদ্যা বা বহু-বুদ্ধির আকর্ষণে, স্বার্থে ও স্বাতন্ত্র্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুগুলি আত্ম-বৈশিষ্ট্যে অতিবিশিষ্ট ও বিকর্ষণশক্তির প্রভাবে রেণু-রেণু হইয়া যে উড়িয়া যাইতেছে না, অহঙ্কারের উৎকট লীলা যে জীবন-শৃঙ্খলা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে না, তাহার কারণ মূলে এক, অখণ্ড, অভেদ, ভূমাস্বরূপ গুরুশক্তিই ঐ অপরা-শক্তির বিরুদ্ধে নিয়ত জগৎ-শৃঙ্খলা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, জীবকুলকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন অনন্ত প্রেমে ও শক্তিতে একেরই অভিমুখে, অবিদ্যাকে, অজ্ঞানকে বিমুখ করিয়া দিতেছেন প্রতি মুহূর্ত্তে জ্ঞান দিয়া, বিদ্যা দিয়া—যে জ্ঞান, যে বিদ্যা একের, নিত্যের, ভূমাস্বরূপের। সেই পরাশক্তি না থাকিলে,

অপরার স্বতন্ত্রলীলায় বিশ্ব-ভূমিকা বিশ্লিষ্ট, বিযুক্ত ও একেবারে শ্রীহীন, ছন্দোবিহীন হইয়া বিনষ্ট হইত।

গুরুশক্তি চতুর্ব্ব্যূহ। তিনি মহান্ বুদ্ধিস্বরূপ—জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই তাঁর চতুর্ব্বীর্য্য। তন্মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মই তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ। আর তাঁর তটস্থ লক্ষণ—বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। জ্ঞানের কথা পূর্ব্বেই কিছু ইঙ্গিত করিয়াছি—গুরু স্বয়ং জ্ঞানঘন, জ্ঞানমূর্ত্তি। যাঁহাকে "কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, তত্ত্বমস্যাদি-লক্ষ্যং, সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং" বলিয়া ভারতীয় সাধক মাত্রেই প্রত্যহ বন্দনা করিয়া থাকেন, তিনিই সদ্গুরু। সৎ-স্বরূপের গুরু-ভাবই মূলতঃ তাঁহার জ্ঞানভাব। ইহা সনাতন ও অখণ্ড জ্ঞান। ইহা পরমা চিৎ-শক্তিরই বিশেষ বিভূতি।

জ্ঞান—প্রকাশশক্তি। কিন্তু জীবের জীবন ক্রিয়াময়। এই ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণও গুরুই অন্তর্য্যামীরূপে করেন যে বিধানে, তাহাই তাঁর ধর্ম্ম-ভাব। ইহাই দ্বিতীয় ব্যূহ। জ্ঞান ও ধর্ম্ম—পরস্পর ভিন্ন নয়, পরিপূরক। জ্ঞানের আলোকেই ধর্ম্মের ক্রিয়া; আবার ধর্ম্মের আচরণেই জ্ঞানের যথার্থ বিকাশ, বস্তুতন্ত্র আত্মপরিচয়। জ্ঞান—দৃষ্টি; ধর্ম্ম—সৃষ্টি। দৃষ্টি ও সৃষ্টি উভয় লইয়াই পরিপূর্ণ অধ্যাত্মজীবন।

জ্ঞান—সত্য। ধর্ম্ম—ঋত। বৃহতে উভয়েরই প্রতিষ্ঠা। বৃহৎই ভূমার চৈতন্য। আত্মার জ্ঞানপ্রকাশের জন্য চাই অন্তরের বৈরাগ্য—একটা শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাব। কারণ জ্ঞানের আবরণ কামনা বা আসক্তি থাকিতে শুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রকাশ পায় না। গুরুভাব পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। গুরু উদাসীন—উৎ অর্থাৎ উর্দ্ধে, সমুচ্চ ভূমার চেতনায় স্থিরাসীন। তিনি পরম বৈরাগী। শিবভাবই গুরুভাবের যথার্থ নামান্তর। শ্রীগুরু যিনি, তিনি যোগীশ্বর, তিনি শিব-স্বরূপ।

এই বৈরাগ্যের পৃষ্ঠেই ঐশ্বর্য্যের ফুল্লশ্রী ফুটিয়া উঠে। তাই শিবের বুকে ঈশ্বরী-শক্তি। জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা শিবেরই গৃহিণী। কামনা ও অহঙ্কারের স্পর্শে ঐশ্বর্য্য ম্লান হইয়া যায়। জীবের অহঙ্কার সীমাবদ্ধ খণ্ড-চৈতন্য—উহা অনীশ্বর। ঐশ্বর্য্য ঈশ্বর-ভাব, ঈশ্বরীরই গুণ-বীর্য্য। পূর্ণ গুরুতত্ত্ব তাই যেমন বৈরাগ্যে প্রদীপ্ত, তেমনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যে তাঁর চিৎ-শক্তি বিকশিত, বিলসিত। গুরু উদাসীন বৈরাগী বলিয়াই অষ্টসিদ্ধি, ত্রি-ভুবনের ঐশ্বর্য্য তাঁর পদতলে বিলুণ্ঠিত, প্রণত।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জীবনে চতুর্ব্ব্যূহ গুরুশক্তি লীলারত। বিশ্বের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে সঙ্ঘ সেই সনাতন গুরুভাবকে কেন্দ্র করিয়াই অভিনব জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের জয়পতাকা উড্ডীণ করিয়া অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে। গুরু-তত্ত্ব নিত্য তত্ত্ব। সঙ্ঘের সাধনা—কোনও অনিত্য বস্তু লক্ষ্য করিয়া নয়, তাহা নিত্যেরই উপাসনা। গুরুই সমষ্টি-সাধক, কারণ তিনি যে সমষ্টি-চৈতন্য। আত্মসমর্পণ-যোগীর জীবনে এই গুরু-তত্ত্বের বিকাশ ও লীলা প্রত্যক্ষ সাধনানুভূতিরই বিষয়।

সেই ব্রহ্মানন্দ, পরম-সুখদ, গগন-সদৃশ সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত অথচ সান্ত-মূর্ত্তি শ্রীগুরু-চৈতন্যে আমাদের হৃদয়, মন, বুদ্ধি যোগযুক্ত হইলেই আমরা সমষ্টি-সাধনার নূতন আলোক, অব্যর্থ পথনির্দ্দেশ পাইব। নববর্ষে, জীবন-সাধনার এই নবীন সন্ধিক্ষণে, জাতীয় জীবনে ভাবাতীত, গুণাতীত সদ্গুরু-তত্ত্বেরই আবাহন সশ্রদ্ধ চিত্তে করি।

জীবনবাদ

জীবনের সত্য উপলব্ধি করার জন্যই যোগ বা সাধনা। শক্তির উপাসনায় এই সত্য উপলব্ধ হয়। যে শক্তি দেহযন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া স্থূল দেহবীর্য্যরূপে প্রতীত হয়, উহার মধ্যেই কুণ্ডলিত হইয়া আছে আরও সূক্ষ্ম-শক্তি, নিগূঢ় চৈতন্য—সেইগুলির ধীরে ধীরে বেষ্টনী খুলিয়া আত্মোন্মোচনই জীবনের স্বভাব-ধর্ম্ম। জীবনের এই স্বভাব-বিকাশ ঘনীভূত ও ক্ষিপ্রতর করাই যোগ-সাধনা।

জীবন স্বপ্ন নয়, সত্য। আমরা মায়াবাদী নহি। আমরা জীবনবাদী তান্ত্রিক বা শক্তি-সাধক। মানুষ সত্য, জাতি সত্য—এই স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির উপর দাঁড়াইয়াই আমরা সাধনার কল্যাণ-পথ বাছিয়া লইয়াছি। আমাদের

শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থ-নীতি, সমাজ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি—সবই এই মৌলিক সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

মানুষ সত্য। তাই পুরুষও সত্য, নারীও সত্য। নর-নারীর মিলনও সত্য। আবার নর-নারী-নির্ব্বিশেষে মানবের সহিত মানবের পরস্পর বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ ও মিলনও তেমনি সত্য, তেমনি স্বতঃসিদ্ধ।

যোগ এই স্বাভাবিক জীবন-সত্যগুলিকে অপার্থিব চেতনার স্পর্শে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া লয়। তখন সম্বন্ধ হয় নিত্য। নর ও নারী অথবা মানবে মানবে যে পরিচয়, সংস্পর্শ ও মিলন, তাহার সবখানিই হইয়া উঠে নির্ম্মল, আনন্দঘন, অমৃতময়।

স্বভাব-সম্বন্ধ প্রাকৃতিক রক্ত-মাংসের প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজনের সীমা আছে ; এইজন্য এই রক্ত-মাংসজনিত সম্বন্ধও সীমাময়, নানাপ্রকার স্বার্থনিষ্ঠ অভিপ্রায়ে কুণ্ঠিত ও কণ্টকিত হইয়া দেখা দেয়। যোগ এই সম্বন্ধের বন্ধনকে চেতনার নূতন ক্ষেত্রে তুলিয়া ধরে। সেখানে নর-নারী পায় নূতন করিয়া আত্মপরিচয়। সে প্রীতি বা প্রণয় দেহের অনুভূতি ছাড়াইয়া একটা অনন্ত শাশ্বত সুরে আপনাকে মিলাইয়া দেয়—সেখানেই মানব-প্রেম পূর্ণ ও সার্থক হয়।

প্রেম ও ঐক্যের অনুভূতি—উর্দ্ধের চেতনায়। এই চেতনা উচ্চ হইলেও, কল্পনা নয়, মিথ্যা নয়। মানবে মানবে প্রকৃত যোগ এই জ্ঞানঘন চৈতন্যে—দেহ-চেতনায় নহে। দেহ-চেতনা জড়, উহা পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী। তাই বলিয়া উহাও একেবারে মিথ্যা নহে। জড় দেহ নশ্বর ; মানবাত্মা নিত্য ও অপরিণামী। এই আত্মার জীবনই সব চেয়ে সত্য ও চিরস্থায়ী।

অধ্যাত্মজীবন, অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ—সাধনার সামগ্রী। দেহধারী জীব আমরা জড়দৃষ্টি লইয়া সাধারণতঃ বাস করি বলিয়া, সত্যের একাংশ মাত্রকেই সবখানি সত্য বলিয়া মনে করিয়া লই। এইজন্য নিত্য চৈতন্যে সহজ প্রত্যয় হয় না, নিত্য সম্বন্ধেও বিশ্বাস স্থাপন করি না। কিন্তু অন্তরের চাওয়া থাকে নিত্যেরই—চিরন্তন জীবন ও সম্বন্ধেরই। এই চাওয়ার সাক্ষ্যেই আমরা বুঝিয়া লইতে পারি—যাহা চাই তাহা যদি সত্য না হয়, নিত্য জীবন যদি সত্যই না থাকে, তবে এই চাওয়াই বা আদৌ ফুটিয়া উঠিল কোথা হইতে? প্রশ্নই যখন উত্তর হইয়া ধরা দেয়, তখন আর সংশয় রহে না—প্রশ্নেরও অবকাশ থাকে না। আমরা প্রাপ্তি-বস্তু লইয়াই জীবনে সাধনা করি। সাধনার আসল নিগূঢ় মর্ম্ম ইহাই। যাহা সাধ্য, তাহাই আদর্শরূপে দেখা যায় ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহা দূরে আছে। সাধ্য সন্নিহিত হইলেই প্রমাণিত হয়—ইহা সিদ্ধরূপে আপনাকে আবিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে বা তুলিতেছে।

রক্ত-মাংসের মানুষ রক্তের পরিচয়ে যে আত্মপরিচয় দেয়, তাহা তাহার সম্পূর্ণ সত্য যে নয়, ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। সাধক প্রথম সাধনার পথে ইহা উপলব্ধি করিয়াই গোত্রান্তরিত হয়। হিন্দু গৃহের নব-পরিণীতা নারী কেমন করিয়া পিতৃগৃহ-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ-গোত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহে নব গোত্র বরণ করে, তাহা কি আমরা দেখি নাই? সেই নূতন মানুষ, নূতন গোত্রই তাহার আপনার হইতে অতি আপনার হয় না কি? তেমনি সুশিষ্যও করে গুরুগোত্র-গ্রহণ—এখানে প্রাকৃত সম্বন্ধের উপর এক অভিনব সম্বন্ধ-স্থাপনই সংসিদ্ধ হয়। হিন্দুর পরিবারে, সংসারে—এ সকলের কোনটাই অজ্ঞাত, অসাধারণ তথ্য নয়, এইগুলি দেহজ স্বভাব-সম্বন্ধের উপর অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের অঙ্কুরণ বা পরিস্ফুরণেরই সহজ উদাহরণ। অধ্যাত্মযোগের সাধনায় এই নিত্য জীবন ও সম্বন্ধের অনুভব স্বতঃস্ফুরিত ও ক্রমপরিপুষ্ট হয়। এই যোগ গুরু-মুখে গ্রহণ করিতে হয়। শ্রদ্ধা ও সম্বন্ধের স্বীকৃতিই ইহার প্রথম উপকরণ। শুধু গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধই নহে, পিতাপুত্র, সখা-সখী, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য, সর্ব্ববিধ হৃদয়-রসেই এই সম্বন্ধের সাধন অনুশীলিত হইতে পারে। সর্ব্ব রসই নিত্য রসে পরিণত হয়, যখন তাহা পরশ-মণি স্পর্শ করে। এই পরশমণিই যোগ। স্বীকৃতি নিত্য হইলে, সম্বন্ধও নিত্য হয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম—আত্মার এই নিত্য সম্পদরাজি সেই নিত্য-সম্বন্ধের রসায়ণে বিশুদ্ধ হইয়া জীবন মধুময় করে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জীবনবাদ এই নিত্য সম্বন্ধ ও জীবনের দর্শন। ইহার মধ্যে স্বকপোলকল্পিত ধারণা বা কষ্টকল্পনা

এতটুকু নাই। আমরা নিত্য-জীবনে ও নিত্য-সম্বন্ধে বিশ্বাসী বলিয়াই লয় বা মোক্ষকে সাধনার লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই। আমাদের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এই নিত্য-দৃষ্টিই নির্ব্বিরোধ ঐক্য দান করিয়া, উভয়কেই মহিমময় করিয়াছে। জাতির সেবায় ও সংগঠনে এই নিত্য-বুদ্ধিই আমাদের জীবনের অসংখ্য কর্ম্মধারা খুলিয়া অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দিতেছে। আমাদের সাধ্য-বস্তু—ভারতের নিত্য-জাতির আবিষ্কার ও নবভাবে তাহার বস্তুতন্ত্র জীবনের পুনর্গঠন।

সঙ্ঘের এই নবীন জীবনদর্শন তাহার জীবনে যতই সফল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, ততই দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা জাতির জীবনে অভিনব প্রেরণাসঞ্চারের কারণ হইবে। সঙ্ঘের প্রত্যেক নারী-পুরুষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে এই জীবনবাদই প্রচারিত হইবে। এই প্রেম ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠ পুণ্য সংহতিশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের মহামেলা বসিবে। জাতীয় সংস্কৃতিমূলক শিক্ষায় ও সাধনায় আসমুদ্রহিমাচল অখণ্ড বঙ্গভূমি মুখরিত হইবে। এই বীরজাতি সমুদ্রে অর্ণব-পোত ভাসাইবে। সুবিস্তীর্ণা ধরণী তাহাদের করস্পর্শে শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিবে। বাংলার নগরে নগরে যন্ত্র-শালার কলরব দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিবে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অপৌরুষেয় বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়ের অনুশীলনে ও গবেষণায় প্রতি নারীপুরুষের ললাটে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে।

সাধনার মধ্যে বাস্তবতাকে গ্রহণ করার যে বিজ্ঞান-দৃষ্টি, তাহা যতই দুঃসাধ্য হউক, সেই ঋতময় পথেই সঙ্ঘ অভিযান করিয়াছে—সেই বস্তুতন্ত্র শক্তির উপর দাঁড়াইয়াই ভারতের অধ্যাত্মবীর্য্য জাতিজীবনে সফল হইবে।

রাষ্ট্র-বিচার

ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে আর এক দৃশ্যের যবনিকা-পাত হইল। ইহা বর্ত্তমান নাট্যলীলার শেষ অঙ্কপাত নয়, ইহা অনুভবেই বুঝা যায়—যদিও আপাততঃ রাষ্ট্র-দূতের আগমনঘটিত যে প্রস্তাব ও আলোচনা এবং তজ্জনিত যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুধু ভারত ব্যাপিয়া নয়, এক রকম জগৎ ব্যাপিয়াই ঢেউ তুলিয়াছিল, তাহার একটা ছেদ পড়িল। এ ঘটনায় ভারতের স্বাধীনতান্দোলনের পূর্ণচ্ছেদ না হইলেও, বৃটেন ও ভারত-ঘটিত সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রনেতৃদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ঘটনাশক্তির হাতেই গিয়া পড়িল। নিছক রাজনীতির বিচক্ষণতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহাতে কোন পক্ষেরই রাষ্ট্রবুদ্ধির সম্পূর্ণ প্রশংসা করা যায় না।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের রাজনৈতিক অভিযান ব্যর্থ হইল কেন, ইহা আজ আর অস্পষ্ট নয়। বিলাতী সমর-পরিষদের প্রস্তাব যে বর্ত্তমান প্রাপ্তির দিক্ হইতে কিছুই নয়, ইহা একটা অগ্রিম-তারিখ দেওয়া চেক মাত্র—এই অভিমত মহাত্মা গান্ধীজির, এই অভিমত সারা ভারতের, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতন্ত্র বিচার-ক্ষেত্রে, হিন্দু মহাসভা ও মুসলমান লীগ ভবিষ্যতের ব্যাপার লইয়াই সমগ্রভাবে অগ্রহণীয় বিবেচনায় বৃটনের প্রস্তাব বর্জ্জন করিলেও, নিখিল ভারত কংগ্রেস কিন্তু ঠিক সেই দিক্ দিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তাঁহারা দেশরক্ষার অধিকার ও বিশেষভাবে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—ইহা কংগ্রেসের শেষ ইস্তাহার ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিপ্‌স-আজাদ লিপি-বিনিময় হইতে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। একমাত্র ভারতের পক্ষ হইতে অতীত যুগের জাতীয় নেতা শ্রীঅরবিন্দই লেখনীমুখে বৃটনের প্রস্তাবের খসড়া বিনা দ্বিধায় গ্রহণীয় বলিয়া মত প্রকাশে সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। তাঁহার এই উদার ন্যায় আত্মপ্রকাশ যেমন আপামর সাধারণের বিস্ময়, তেমনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে আক্ষেপেরও কারণ হইয়াছে। ক্বচিৎ কেহ এই উপলক্ষে মিত্রপক্ষের সাহায্যকামী তাঁহার ন্যায় অধ্যাত্ম-যোগীর এইরূপ তাড়াতাড়ি স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে প্রকাশ্য সার্টিফিকেট দেওয়া খুবই অশোভনীয় বলিয়া উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমাদের মনে হয়, শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ উক্তি ও আচরণ সহসা দুর্ব্বোধ্য মনে

হইলেও, একটু ভাবিলেই তাহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যটুকু বুঝার প্রয়োজন তাঁহার দিক্ দিয়া কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতের রাষ্ট্রীয় বিচারের দিক্ দিয়া নিশ্চয়ই আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণ বৃটনের প্রস্তাব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনও দিক্ দিয়া শ্রেয়স্কর মনে করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতার অধিকার বুঝা-পড়ার পথে পাওয়ার পরিকল্পনা যদি কুত্রাপি থাকে, তাহা হইলে স্যার ষ্টাফোর্ডের প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেও, নূতন করিয়া ঘটনার দায়ে আবার উক্ত বুঝা-পড়া সম্ভব হইবে, এইরূপ আশা বুকে রাখিয়াই তাঁহারা সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ইহা ছাড়া তাঁহাদের আচরণের অন্য অর্থ করা যায় না। এই বুদ্ধির রাজনীতিক মূল্য বেশী নাই। খাঁটি রাজনৈতিক এক্ষেত্রে খসড়ার চুলচেরা হিসাব না করিয়া, সমগ্র রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়াই উহাকে কাজে লাগাইতে পারেন। যে অবস্থার দায়ে পড়িয়া বৃটিশ সমর-সভা বর্ত্তমান খসড়াটী প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই অবস্থার দায় কাল-চক্র হঠাৎ ঘুরিয়া আগামী কল্য আর নাও থাকিতে পারে—রাজনৈতিকের নীতি তাই সুযোগ হাতে আসিলে তাহা প্রত্যাখ্যান না করিয়া, সম্ভব হইলে তাহার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করা আরও পূর্ণতর সুযোগের প্রতীক্ষায়। ঘটনার উপর অধিকার স্থাপনের সূত্র যদি প্রস্তাবে থাকে, তবে সেই সূত্র ছিন্ন করিয়া ঘটনাশক্তির হাতে নিরুপায়ভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া—ইহা আদর্শবাদীর লক্ষণ হইতে পারে, বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রনীতিবিদের ধর্ম্ম নহে।

সমর-পরিষদের প্রস্তাবে এইরূপ একটা ব্যবহার্য্য সূত্র ছিল কি না, তাহাই বিচার্য্য। কংগ্রেস এই দিক্ দিয়াও গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। উক্ত খসড়ায়, এমন একটীও ব্যবহার্য্য সূত্র তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই, যাহার প্রয়োগে নিখিল ভারতবাসীর বিদ্যুৎ-প্রাণ জাগাইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান সঙ্কটে দেশব্যাপী সমরোদ্যম ও অন্যান্য উপযোগী প্রতিকার-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ভরসা করিতে পারিতেন। কংগ্রেসের এই প্রত্যাখ্যানের চেক বলিয়া

কেহই তাঁহাদিগকে তজ্জন্য দোষারোপ করিতে পারেন না। লর্ড প্রিভি সীলও স্বয়ং এজন্য কংগ্রেসকে দোষারোপ করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রস্তাবের এইরূপ গভীর ত্রুটি সত্ত্বেও উহাকে কার্য্যকরী করিয়া লওয়ার তবুও পথ ছিল। সে পথ কি কংগ্রেস-নেতৃগণ, কি স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স স্বয়ং—কেহই আর উদ্ঘাটন করিতে চাহেন নাই। বুদ্ধির টাগ-অফ-ওয়ারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াই যেন উভয় পক্ষই শেষে রণে ভঙ্গ দিয়াই সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। খসড়ার দোষ-ত্রুটি নহে, ঘটনা ও অবস্থার শক্তিই এখানে জয়ী হইল—মানুষের শুভ-বুদ্ধি তাহার কাছে পরাস্ত মানিল—এই ত্রুটি কোনও পক্ষই হয়ত লক্ষ্য করিলেন না। যোগী শ্রীঅরবিন্দের লেখনী এইখানেই পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করিয়াছে। এ বাণী সেদিনও রাষ্ট্রবিদ্‌গণের প্রণিধানের যোগ্য ছিল এবং আজও আছে।

এই শুভবুদ্ধি নিছক আদর্শবাদীর দৃষ্টি-ভঙ্গী নহে। ইহা বস্তুতান্ত্রিক রাজনৈতিকেরই শ্যেনদৃষ্টি। সমর-পরিষদের প্রস্তাব ভারতের এই বাস্তব প্রতিভাদৃষ্টির কষ্টি-পাথরেই যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে—আদর্শবাদীর হৃদয়ের কষ্টিপাথরে নয়। ভারতের জাতীয়াত্মা চাহিয়াছেন স্বাধীনতার স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি সুস্পষ্ট ও অনবদ্য আকারেই উক্ত বৃটিশ প্রস্তাবে ছিল—একথা প্রত্যেক রাজনৈতিক পক্ষ, এমন কি তাহার কঠোরতম বিরুদ্ধ সমালোচকও স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বীকৃতি ভবিষ্যতের চেক বলিয়া উপেক্ষা আদর্শবাদীরই শোভনীয়, বাস্তব রাষ্ট্রবাদীর নহে। ভূতের মুখে রাম-নামের ন্যায় এই স্বীকৃতির যে শুধুই অভিনবত্বই আছে, তাহা নহে—ইহার একটা বাস্তব গুরুত্বও আছে। যাঁহারা ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের পরিচয় স্মরণে রাখেন, তাঁহারাই বুঝিবেন ৺দাদাভাই নৌরজীর দিন হইতে এই স্বীকৃতির অগ্রগতি ও দ্বিধাহীন সুস্পষ্টতা, গুরুতা ও গভীরতা কতখানি। ভারতের বস্তুতান্ত্রিক রাষ্ট্রধুরন্ধর ইহার মধ্যে ভারতের জাতীয় তপস্যারই বিজয়-লক্ষণ খুঁজিয়া পাইতেন এবং প্রস্তাবটীর সত্য সার্থকতা এইখানেই তাহাও স্বীকার করিতেন। যোগী শ্রীঅরবিন্দেরও

অনির্ব্বাণ রাষ্ট্রীয় সত্তা এই স্বীকৃতিকে অভিনন্দন না করিয়া পারেন নাই। বৃটনের স্বীকৃতি ভারতের জাতীয় পক্ষের চির-লক্ষ্য আদর্শের জয় বলিয়াই উহা অভিনন্দনীয়। সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের অতীত ইতিহাস ও সেই ঐতিহাসিক চৈতন্য ইহার সমর্থন করিবে—আর ইতিহাসের সূত্র ছিঁড়িয়া রাজনৈতিক বিচারও অবশ্যই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

বৃটিশ প্রস্তাবে এই লক্ষ্যের স্বীকৃতিটুকুই অবশ্য যথেষ্ট মনে করা যায় না। জাতীয় জীবনে কার্য্যকরী ব্যবহার-সূত্র তাহার মধ্যে কিছু আছে কিনা, তাহাও দেখা প্রয়োজনীয়। এখানেও আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পক্ষের দৃষ্টি-ভঙ্গীর অখণ্ড প্রশংসা করিতে পারিলাম না। স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য—যুক্তি নহে, রক্ত। ভারতের লক্ষিত এবং বৃটিশ-গভর্ণমেন্টের স্বীকৃত স্বাধিকার লাভের জন্য যে রক্ত-মূল্যের প্রয়োজন, তাহা দেওয়ার সুযোগ কি এই সমর-সভার প্রস্তাবে ছিল না? আমরা বলিব—তাহা ছিল। প্রস্তাবের আর সকল অধিকারমূলক ত্রুটি এই রক্তের অবদানেই ভাসিয়া যাইত, নিশ্চিহ্ন মুছিয়া ফেলার সুযোগ ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-পিপাসা সত্য যেখানে, সেখানে এই সত্য প্রত্যয়ও নিশ্চয়ই আছে যে, বৃটিশের বিরুদ্ধেই হউক আর তাহার আশ্রয়ে ও অনুকূলেই হউক—এই রক্ত-মূল্যে স্বাধিকারার্জ্জনের যোগ্যতা আমাদের অর্জ্জন করিতেই হইবে। নিখিল ভারতের ক্ষাত্রশক্তির অস্ত্র-শিক্ষা ও অস্ত্র-সজ্জার (militarisation) সুযোগ এই প্রস্তাবের মধ্যে ছিল। আমরা ইচ্ছা করিলে, সে সুযোগ ব্যবহার করিতে পারিতাম। স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ বা স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জীর বীর পুত্র যে হাতিয়ার ধরার অধিকারটুকু চিনিয়া লইয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়াই আমাদের ধারণা, স্বাধীনতার যে ভিত্তিপাত হইতেছে, কূটনীতিজ্ঞগণের সহস্র যুক্তিজালে—অধিকার লইয়া বণিকের দরাদরিতে তাহা হইবার নহে। আমাদের রাষ্ট্র-নীতিক সাধনা এখনও অনেকখানি 'একাডেমিক' অর্থাৎ পণ্ডিতী ধরণের—এই কথার বেসাতিতে ভুলিবার মত অবস্থা ইংরাজ শাসকজাতির হইলে, আমরা সে শাসন-নীতির দৃঢ়তা ইতিমধ্যেই অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে মনে করিতাম। স্যার ষ্টাফোর্ডের ন্যায় ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রস্তাবের প্রত্যাহারে ইংরাজের রাজনৈতিক দৃঢ়তারই পরিচয় আমরা পাইলাম। প্রস্তাবটী সংরক্ষণশীল ডাই-হার্ডদের সঙ্কীর্ণবুদ্ধি-লাঞ্ছিত, ইহা আমরা স্বীকার করিলেও, মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্রনীতিও যে রাষ্ট্র তথা সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে গৌরবের নহে, ইহাও আমরা ভুলিতে পারি না। ইংরাজ এখনও দৃঢ় ও সবল হস্তেই সাম্রাজ্যদণ্ড ধারণ করার অন্ততঃ আকাঙ্ক্ষা রাখেন।

ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণ মুসলীম লীগ ব্যতীত সকলেই ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার কষ্টিপাথরেই প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ যাচাই করিয়া দেখার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী ও আশ্বস্ত হইয়াছি। ইহা রাষ্ট্রীয় বিচার নহে, হৃদয়ের বিচার। কিন্তু হৃদয়ের সুস্থতা ও স্বচ্ছতাও অখণ্ড জাতীয় জীবনেরই সহায়ক।

ভারতের অপরিপক্ক রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি অভিজ্ঞতায় পরিণতি-লাভের জন্যই ইংরাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আমরা ইহাই বুঝিব। প্রকৃতির করুণা নিষ্ঠুর ঘটনাশক্তিকে আরও কিছুখানি খেলাইয়া এই রক্তদানের সুযোগ ভারতবাসীকে দিবে, আমাদের ইহা অনুমান। সেদিনও ভারতের নেতৃগণ যদি আবার কূটনীতিক বিচারে বসেন, তর্ক করেন, দর-কষাকষি করেন, তাঁহারা করুন, কিন্তু ভারতের অন্তর্নিহিত ক্ষাত্রশক্তি দুর্জ্জয় বিক্রমে যেন এই সব কূটনীতির জাল ছিন্ন করিয়া সার্ব্বজনীন অস্ত্রগ্রহণের অধিকার স্বীয় রক্তদানের দায়িত্বেই ছিনাইয়া লয়, অন্য কোনও অধিকার-বিচারে নয়—আমরা এই প্রার্থনাই করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতার্জ্জনের আর কোনও পথই সুপথ নহে, শ্রেয়ঃও নহে। আজ কূটনীতিক আলোচনাভঙ্গে তাই আমরা মিত্রের ক্ষোভ ও ব্যথা, এবং প্রতিপক্ষের উল্লাস যাহাই ঘটুক, ইহাকেই চরম ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা ভবিষ্য ভারতের উদীয়মান বীর জাতিরই জাগরণ-প্রতীক্ষায় স্বক্ষেত্রে তপঃরত রহিলাম।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

নববর্ষে

রবীন্দ্রনাথ

সকল জাতির স্বভাবজাত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ মাত্র।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলোর ভিতরে বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যে ভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকার,—একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্ব্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারও থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের মত দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্ত্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনও নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলন লাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছে, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্ম্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষ্যাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্য্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্ম্মের বাসনা, জনসঙ্ঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপে যাহাকে "ফ্রীডম" বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্ব্বল, ভীরু, তাহা স্পর্দ্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর,—তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এই জন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে সর্ব্বদা রাত্রিদিন বর্ম্মে-চর্ম্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় "ফ্রীডম্‌" কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না—কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক-কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই "ফ্রীডম্‌" আমাদের সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিসলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র পরিয়াছেন, এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষি-কবিরা ত্রিষ্টুভছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মসৃণ-চিক্কণ পীতহরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্য্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের বহু সহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার করা ফুলে-পাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচির-প্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল, নব-সৌন্দর্য্য আমরা যদি অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই তবে দুই দণ্ড বাদেই তাহা কদর্য্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্প-পত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধন-রজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা-ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন, শ্রীহীন হইয়া পড়ে—বিদেশের শিক্ষা, রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হয়, কারণ তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তখন সেই অম্লানগৌরব মাল্যখানি আশীর্ব্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সরলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক্‌ তাহারই জয় হইবে,—আমরা—যাহারা ইংরাজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

"মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা।"

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাদের কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—

'ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন।"

[স্বদেশ পুস্তক হইতে]

উপলক্ষ্য

জগদীশ গুপ্ত

পুত্রের বিবাহে পণ লইয়া কৃতার্থ হইবে, এ আকাঙ্ক্ষা অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র করিতেছেন না। তাঁর পুত্র অশোক বিশেষ মেধাবী ছাত্র; তাহাকে জামাতা করিবার অভিলাষ বড়লোকে যদি করে, তাহা হইলেই মানায়; কিন্তু অন্নপূর্ণার কোন বড়লোকের অভিলাষ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা নাই, তিনি চান দরিদ্র পরিবারের একটি কন্যা—কন্যাটির খুব রূপের গৌরব না থাকিলেও চলিবে, কিন্তু বুদ্ধিমতী আর সহিষ্ণু প্রকৃতির হওয়া চাই। দরিদ্রের ঘরেই নারীর বুদ্ধিমত্তা আর সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিয়তই হইতে থাকে বলিয়া অন্নপূর্ণার ধারণা; এবং গরীবের মেয়ের হিসাবী হওয়াই সম্ভব। যাহাকে তিনি পুত্রবধূ করিতে চান, তার পিতামাতা যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁরা যথেষ্ট ভদ্র এবং সবলচিত্ত কি না তাহা দেখিতে হইবে--তাঁরা যদি জীবিত না থাকেন, তবে সে অবস্থা আরও ভালো, অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল, ইহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকেই মনে করিতেছে, অন্নপূর্ণার এ কেমন খেয়াল! ছেলের বিবাহে টাকা লওয়াই রেওয়াজ, এমন কি আভিজাত্যের লক্ষণ—টাকা সম্বন্ধে যত চাপ, আভিজাত্য তত উচ্চ আর দুরতিক্রম্য; কিন্তু অন্নপূর্ণা একটি পয়সাও লইবেন না। শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকিলে শ্বশুর বাড়ীতে জামাইয়ের সুখ থাকে না—কুটুম্বিতার প্রীতি জন্মেই না; ঐ অভাবটা লোকে সুখের ক্ষতিই মনে করে; কিন্তু অন্নপূর্ণা পছন্দ করিতেছেন, ছেলের শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকাটাই। তার উপর, ছেলের বয়স এখন মাত্র আঠারো কি উনিশ; কিন্তু অন্নপূর্ণা অনুসন্ধান করিতেছেন একটি ডাগর মেয়ে—তার বয়স পনের কি যোল হইলেও তাঁর আপত্তি নাই—কেবল আপত্তি নাই নয়, ঐ বয়সের মেয়েই তাঁর চাই

লোকে একটু অবাক্ই হইল

ঘটক, ঘটকী এবং আত্মীয়স্বজনকে ইচ্ছা এবং বিবরণ জানানো ছিল—তাদের একজন সংবাদ দিল যে, নিকটেই এক ষ্টেশন পরেই, দুর্লভপুরে ৺পরমেশ্বর রায়ের ঠিক তেমন একটি মেয়ে আছে যেমনটি তিনি চান—গোত্রে না বাধিলে মেয়েটিকে লওয়া যাইতে পারে। মেয়ের বাপ বাঁচিয়া নাই, মা আছে। চিরকাল তারা দুঃখী মানুষ। এই মেয়েটিই মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান; তারপর দুটি পুত্র। মেয়েটির বয়স যোল চলিতেছে; পুত্রদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে তের এবং দশ।

প্রাথমিক সংবাদ অনুকূল এবং গ্রহণীয়। অন্নপূর্ণা নিজেই গেলেন মেয়ে দেখিতে; দেখিয়া তার চেহারা তাঁর পছন্দ হইল—পরিবার অভাবী, সন্দেহ নাই; কিন্তু অভাবের ভিতরেই মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর একটি পরিপুষ্টি দেখা দিয়াছে···

মেয়ের মা শরৎ বলিলেন, বাপের চেহারা সুন্দর ছিল, স্বাস্থ্যও ছিল খুব ভাল।

—তিনি মারা গিয়েছিলেন কিসে?

সে-ও এক পরম দুঃখের কাহিনী—শরতের চোখ ছলছল্ করিতে লাগিল···

পরমেশ্বর লেখাপড়া জানিতেন অল্প; তবে বাংলা হিসাব রাখায় এবং জমিদারী সেরেস্তার বিবিধ কাজে ছিলেন পটু; চাকুরীর চেষ্টা করিতে করিতে চাকরী মিলিল রাজসাহীর এক জমিদারের সেরেস্তায়—বেতন খোরাকী বাদে বার টাকা। কিন্তু তিনি সেখানে একটি দিনও কাজ করিতে পারেন নাই; রাস্তায় বোধ হয় অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়াছিলেন—ষ্টেশন হইতে জমিদারের কাছারিতে সন্ধ্যায় পৌছিবার পরই ভোর বেলায় কলেরা হইয়া তিনি সেখানে, সেই নির্ব্বান্ধব বিদেশেই মারা যান—শুশ্রূষা কি চিকিৎসা হয় নাই···

কাঁদিতে কাঁদিতে বিধবা এই কাহিনী বিবৃত করিলেন —মেয়েটিও কাঁদিতে লাগিল—অন্নপূর্ণার চোখেও জল আসিল।

অন্নপূর্ণা দেখিলেন, মেয়েটির চোখে, মুখে, কথায় এমন একটি মৃদুতা আছে, যা বিষণ্নতার প্রকারান্তর নহে, নির্জ্জীবতার লক্ষণও নহে, নির্ব্বুদ্ধিতারও পরিণাম নহে,

বিনয়। অন্নপূর্ণার মনে হইল, এই প্রকৃতির মানুষই হয় প্রকৃত প্রেমাকাঙ্ক্ষী, যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহিতে পারে…

কিন্তু কাজের বেলায় সে ভারি দ্রুত, ভারি পরিচ্ছন্ন, একেবারে সম্পূর্ণ।

এদিককার অবস্থা অন্নপূর্ণা দেখিলেন, এদের একখানা মাত্র ঘর, তা'তেই শোয়; ঘরখানা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া আছে; বাতাস কিছু প্রবল হইলেই ঘর ভূমিসাৎ হইবে বলিয়া অন্নপূর্ণার মনে হইল। ভূমিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শরৎ বলিলেন, হীরালাল বলে' একটা লোক এখানে আছে—সে আমাদের দেখে শোনে। বাঁশ যোগাড় করে' দেবে বলেছে, জলও পড়ে চাল দিয়ে; মেরামত করে' দেবে বলেছে।

মেয়েটি তার মাকেই বলিল, উইয়ে চাল রাখে না, মা।

—একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না করেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন।

—বলুন, বলুন। বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণার কথা শুনিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া ভারি কুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন—কথা বলিবার জন্য তার অনুমতি চাওয়াই যেন তাঁহাকে অপ্রাপ্তব্য বলিয়া লজ্জাকর একটা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—ঘর মেরামতের খরচটা আমিই দিতে চাই। নেবেন?

—সম্পর্ক ঘটুক, তারপর নেব। বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

—ঘট্‌তে বাকি নেই। এ ত' ঘটকের কথা নয়, আমি নিজে বল্‌ছি। ভাল করে' মেরামত করান। এখন আমাকে নিঃসম্পর্কের লোক বলে' মনে করলে ভারি দুঃখিত হ'ব।

শরৎ খানিকক্ষণ মুখ নত করিয়া রহিলেন—তারপর দান লইতে স্বীকার করিলেন, বলিলেন,—নেব।

রান্নাঘরের সংস্কারের প্রস্তাবও অন্নপূর্ণা করিলেন; "অত খরচের" আপত্তি করিয়া শরৎ তাহাতেও রাজি হইলেন।

অন্নপূর্ণা তখন মেয়ের নাম জানিতে চাহিলেন: মেয়ের নামটি কি?

—কিরণ, কিরণময়ী। ডাক নাম গুণ্‌না।

—বড় ছেলের নাম?

—অবনী।

—ডাকুন তাকে; একটু আলাপ করি তার সঙ্গে। বলিয়া অন্নপূর্ণা হাসিলেন।

অবনীকে ডাকা হইল, অন্নপূর্ণা তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন, অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইস্কুলে সে যায় কিনা; ইস্কুল কত দূরে অবস্থিত, মাহিনা দেয়, না ফ্রী; কতগুলি বই পড়িতে হয়; কখনও পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি।

প্রথম সে দু'বার হইয়াছে; কিন্তু অন্য ইস্কুল হইতে একজন টিচারের সঙ্গে একটি ছেলে আসিয়াছে—তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না—দ্বিতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে…

বলিয়া অবনী অত্যন্ত ম্রিয়মাণ রহিল।

ছেলেটি বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই—অন্নপূর্ণা বলিলেন, মেয়ের সঙ্গে ছেলেটাকেও আমি নেব—আমার কাছে রাখ্‌ব।

জিজ্ঞাসু হইয়া শরৎ অন্নপূর্ণার দিকে তাকাইয়া রহিলেন; অন্নপূর্ণা বলিলেন, এখানে থাকলে আপনার ছেলের সে-রকম উন্নতি হবে না। আমার কাছে থাকবে; বড় ইস্কুলে পড়্‌বে। সে মানুষ হ'লে একদিন আপনার সুখের দিন আস্‌তে পারে।

এত বড়ো সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় শরতের চোখ সজল হইয়া উঠিল; বলিলেন, দিন এসেছে। আপনাকে পেয়ে বহুদিন পরে আজ আমি সুখের মুখ দেখ্‌ছি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, আর একটি কথা ভাই।

কি?

—দু' বছরের মধ্যে যদি ছেলে না হয়, তবে আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব।

শরৎ অকাতরে বলিলেন—নিশ্চয় দেবেন; প্রায় সকলেই তা' দেয়। কিন্তু আপনার ছেলের বয়স ত' বেশি নয়!

—অর্থাৎ দু'বছরের পরও অপেক্ষা করতে পারি?

—হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন না।

মেয়ে দেখিয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া আসিলেন; কিরণকে তাঁর খুব পছন্দ হইয়াছে। ভদ্র পরিবার সন্দেহ নাই; অত্যন্ত নম্র, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন কি বুদ্ধিহীন নয় কেউই। কিরণই ভাই দুটিকে লালন করে—ভাইদের যত চাওয়া দিদির কাছেই। কিরণের মুখের চেহারায় বেশ একটি লক্ষ্মীশ্রী আর বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি আছে—কিন্তু তা' শাণিত কি নগ্ন নয়, সহজ ব্রীড়ার আবরণে তা' মধুর। সৌন্দর্য্যগত ত্রুটি ঢেরই আছে, কিন্তু অন্নপূর্ণা নিখুঁত অপ্সরী চান না—তিনি যা' চান কিরণময়ীতে তা' আছে। শরীরের গঠন আরও সৌষ্ঠবযুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু এ-ও বেশ; রং কালো নয়—কণ্ঠস্বর ভারি মধুর—দাঁতগুলি চমৎকার সাজানো—হাসিলে বেশ দেখায়…

আলস্যে, অনিচ্ছায় তার হাত পা নিশ্চল হইতে জানে না, খাসা চলে।

অন্নপূর্ণা বলিয়াছেন যে, বিবাহের দরুণ "একটি পয়সাও" তাঁদের খরচ করিতে হইবে না—উপকরণ বলিতে যা' বুঝায়, তা' সমুদায় তিনিই পাঠাইয়া দিবেন—ছেলেটিকেও তিনিই মানুষ করিবেন—সে ছুটিতে মায়ের কাছে আসিবে, যে ক'দিন ইচ্ছা বাড়ীতে থাকিবে—

অবনী বলিয়াছিল, গরমের ছুটীতে আম কাঁঠাল খেয়ে যাব।

শুনিয়া ওঁদের সঙ্গে কিরণও হাসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিয়াছিলেন, মেয়ের 'কুষ্ঠি' আছে কি না—

"নাই" শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই, কারণ ছেলের কোষ্ঠীতেই সব লিপিবদ্ধ আছে—অদ্বিতীয় এক পণ্ডিত দৈবজ্ঞের গণনা তা'।

অন্নপূর্ণার হাতে টাকা আছে অনেক। তাঁর স্বামী জানকীজীবন হঠাৎ বড় চাকরী পাইয়া আগে করিয়াছিলেন ভবিষ্যতের চিন্তা, বহু টাকার জীবনবীমা; তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর সেই টাকা অন্নপূর্ণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু মৃত্যুর দুঃখ তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

শরৎকুমারীকে তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কাহিনী বলিয়াছেন—দুরন্ত সেই সান্নিপাতিকের কথা; এবং এ দুঃখও জানাইয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন লক্ষ্মী মেয়ে কিরণময়ী এ জীবনে তৃষ্ণা মিটাইয়া কাহাকেও বাবা বলিয়া ডাকিতে পারিল না…

এই কথায় সকলেরই মনে তখন অপার দুঃখ জন্মিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা ভাবেন মেয়েটির কথা: এককথায় সে "দিব্যি", "প্রাণভরা", আর সে এখনই যেন তাঁর চোখের তারা; ভাবিতে ভাবিতে একসময়ে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া অন্নপূর্ণা দেখেন, তাঁহারই একটা নিঃশ্বাস পড়িয়াছে।

সে যাহাই হউক, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল; অন্নপূর্ণার টাকায় শরৎকুমারী আয়োজন ও ব্যবস্থা করিলেন উৎকৃষ্ট, এবং বরযাত্রীরা পরিশ্রম করিল বহু…

আর, বউ দেখিয়া ওদিককার লোক এবং জামাই দেখিয়া এদিককার লোক প্রশংসা করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, ইহাকেই বলে শুভ বিবাহ; দরিদ্র বিধবার কন্যা অত্যন্ত আনন্দপ্রদভাবে উদ্ধার হইয়া গেল; তা' অর্থাৎ কন্যাদায়ে উদ্ধার যে করে, সে নারী হইলে মহীয়সী, পুরুষ হইলে সে মহাশয় ব্যক্তি…ইত্যাদি।

উনিশ বছরের ছেলের এমন স্বাস্থ্যবতী ষোল বছরের বউ, ইহার ভিতরকার বেপরোয়া ভাবটার দিকে যে কেউই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ না করিল এমন নয়, কিন্তু তা' চুপে চুপে; আবার ইহাও অনেকের মনে হইল যে, অমন হইয়া থাকে—কোন কোন স্ত্রীলোকের পৌত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অসময়েই অত্যন্ত দ্রুতই অস্থিরকর হইয়া ওঠে, বিশেষ করিয়া বিধবার; কাজে সাহায্যের জন্যও কেউ কেউ বউ চায় তাড়াতাড়িই। এ-ও হয়তো তা'-ই—

তবু সকলেই স্বীকার করিল যে, বেমানান্ হয় নাই; ছেলের বয়স অল্প হইলেও, শরীর বৃহৎ এবং বলিষ্ঠ—পুরুষশ্রী চমৎকার এখনই।

অল্প কথায়, দুর্লভহরের লোক বলিল, জামাই সৎ; আর কানাইগ্রামের লোক বলিল, বউ সুদর্শনা এবং সুলক্ষণা।

বুদ্ধিমতী বউ পাইয়া অন্নপূর্ণাও নিশ্চিন্ত হইলেন, খুশী হইলেন, বিস্মিতও হইলেন—এমনটি পাইবেন বলিয়া তিনি আশা করেন নাই। বধূ কিরণময়ী ভারি কাজের লোক, সেবায় তৎপর, আর বেশ হাসিখুশী। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আলাপের সময়ে সে এমন সপ্রতিভভাবে এমন সঙ্গত সব কথা বলে যে, অন্নপূর্ণা অবাক্ না হইয়া পারেন না—তাঁর মনে হয়, তিনি কোনকালেই তা' পারেন নাই, এখনও পারেন না।

বাহিরের শিক্ষা নয়, প্রকৃতিই তাহাকে এমন নিপুণা করিয়া তুলিয়াছে—এম্নি মেয়েই সম্পদে বিপদে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

একটি বিষয়ে অন্নপূর্ণার অহেতুক অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল—নিরবচ্ছিন্নভাবে বধূকে কাছে রাখার। মায়ের কাছে তাহাকে যাইতে দেন না। অবনী তাঁর কাছেই থাকে; ছোট ছেলেকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মাসে একবার কি দুইবার আসিয়া দিনকতক মেয়ের বাড়ীতে থাকিয়া যান—তখন অন্নপূর্ণার দিনগুলি কাটে ভাল।

ছেলেকে অন্নপূর্ণা কলেজ ছাড়াইয়া বাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়াছেন; বলিয়াছেন, চাকুরী করতে হবে না তোকে। ২৫।৩০ টাকার জন্যে তোকে হয়রান হ'তে হ'বে না। পুঁজি বাঁচিয়ে হিসেব করে' চল্‌লে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব তোর কোনদিনই হবে না।

মা বিধবা। মায়ের এই দুঃখই একান্ত আর দুস্তর। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ আর মায়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া অশোক তাঁর দুঃখ বাড়াইতে চাহে না। মায়ের কথায় কলেজ ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় সবজীবাগ্ প্রস্তুত করিয়া সেই উৎসাহেই বাড়ীতে সে বেশ আছে।

বধূ কিরণময়ীর বিষয় অন্নপূর্ণা আরও চিন্তা করেন এই সংশয় আর আনন্দের দোলায় দোল খাইতে খাইতে যে, বউ যদি বন্ধ্যা হয় অথবা যদি বন্ধ্যা না হয়; হইলে সে অনন্ত দুর্ভাগ্যের কি প্রতিকার সম্ভব, এবং না হইলে অর্থাৎ বধূ পুত্রবতী হইলে, সে আনন্দ কতটা···

অন্নপূর্ণা তা' নিরূপণ করিতে পারেন না; ভাবিতে ভাবিতে অন্নপূর্ণার মাঝে মাঝে কিছুই ভাল লাগে না—মাঝে মাঝে অত্যন্ত কান্না পায়, মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিয়াই অদৃষ্ট খুব কুটিল আর জটিল গতিতে চলে—অদৃষ্ট কখনও কখনও যেন যোগাযোগ এবং ষড়যন্ত্রমূলক···

মনের এই অবস্থায় তিনি বধূকে কাছে ডাকেন; কিন্তু তাহাকে কি বলিবেন, আর তাহাকে লইয়া কি করিবেন তা' ভাবিয়া পান না।

কিন্তু তিনি কেবল অদৃষ্টেরই উপর নির্ভর করিয়া নাই—কিরণময়ীকে তিনি যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া সতর্ক হইয়া আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছেন—শরীরের এমন কোন অযত্ন সে না করে, যা'তে সার্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া তার সন্তানধারণের কাল বিলম্বিত বা ব্যর্থ হইতে পারে—রোগের সৃষ্টি না হয়, জরায়ু ক্লিষ্ট বিকৃত না হয়— ? সে রজস্বলা হইলে তিনটি দিন তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করান—নড়িতে দেন না···

এটা কেবল তাঁর স্নেহের চঞ্চলতা নয়, অহেতুক একটা আতঙ্ক যেন। অশোক আর কিরণ উভয়েই কখনও অবাক্ হয়, কখনও হাসে।

বিবাহের দেড় বৎসর পরেই কিরণময়ীর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইল; এবং তখনই দেখা গেল অন্নপূর্ণার এমন অদ্ভুত অস্থিরতা, যাকে বলা যায় প্রায় ক্ষ্যাপামি। বধূকে কেন্দ্র করিয়া এবং গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া সুরু হইল তাঁর অষ্টপ্রহরব্যাপী অভাবনীয় ঘূর্ণন, বাচনিক এবং দৈহিক··

—বৌমা খুব সাবধানে আছ ত? বলিয়া বউয়ের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া অন্নপূর্ণা যেন অসাবধানতার লক্ষণই অনুসন্ধান করেন···

বলেন, খুব সাবধানে চলাফিরা করবে, পা টিপে' টিপে', মা, পা টিপে' টিপে'—সিঁড়িতে উঠ্‌বে নাম্‌বে এমন আস্তে আস্তে যে, খবরদার যেন পা না হড়্‌কায়। বুঝ্‌লে ত' ?

—হ্যাঁ।

—বোঝোনি'।

কিরণময়ী বলে, না, মা, বুঝেছি।

—মনে থাক্‌বে ত ?

—থাক্‌বে, মা।

অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বলেন, থাকে যেন।

কেবল নিজে প্রহরা দিয়া আর বধূকে সাবধানে থাকিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়া অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত নয়—কিরণময়ীর ভাই অবনীকে তিনি গুপ্তচর, সেবক এবং শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন—

তার উপর তিনি ডাকাইলেন কবিরাজকে; তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ বলিলেন, আছে বৈকি সব—গর্ভিনীর স্নায়ু প্রভৃতি সুস্থ থাক্‌বে, গর্ভস্থ সন্তান স্বাভাবিক সবল অবস্থায় থাক্‌বে, এমন ফলপ্রদ ঔষধ আমাদের আছে।

—তাই দেবেন ; কিন্তু উগ্র না হয়।

—না, মা, মৃদুবীর্য্য। বলিয়া কবিরাজ ঔষধ দিতে সম্মত হইলেন এবং পাঠাইয়া দিলেন। সেই মৃদুবীর্য্য অথচ যথেষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ কিরণময়ীকে প্রতি দিন সেবন করানো চলিতে লাগিল…

অশোক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি ?

কিরণময়ী বলে, মা আমাকে একেবারে পাটে বসিয়ে রেখেছেন যেন! সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র আস্‌ছেন…

—তা' নয় তো কি! তিনখানা সিংহাসন তার জন্যে পাতা আছে।

কোথায়, কোথায় ?

—মার বুকে, তোমার বুকে, আর আমার বুকে।

শুনিয়া কিরণময়ীর চোখ হঠাৎ সজল হইয়া ওঠে—

অশোক চুম্বন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে, অর্থাৎ হাসায়।

কেবল কবিরাজই নয়, এবং কেবল ঔষধই নয়, আহ্বান পাইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তিশালী এবং করেরখা-বিচারক পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যও আসিলেন; তাঁর কাছে অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন আর কিছু নয়, কেবল এই কথাটি যে, প্রথম সন্তান পুত্র না কন্যা ?

পরমব্রহ্ম আর কিছু দেখিলেন কিনা বলা যায় না; কিন্তু প্রথম সন্তান যে পুত্রই, ইহাই তিনি ঘোষণা করিলেন একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া—শুনিয়া অন্নপূর্ণা আশ্বস্ত হইলেন, এবং দেবালয়ে পূজা বসাইলে কোন প্রকার সুফল পাওয়া যাইতে পারে কিনা, তাহাও জানিতে চাহিলেন। কল্যাণার্থে দেবালয়ে পূজাপ্রেরণ বাঞ্ছনীয় কার্য্য নিশ্চয়ই; পরমব্রহ্ম বলিলেন, পাঠাও মা, তোমার যা' কামনা তা' দেবতাকে জানাও—দেবতা প্রসন্ন হ'লে সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পূজা প্রেরিত হইল—

প্রসাদ আসিলে অন্নপূর্ণা বলিলেন, মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দাও, বৌমা। মনে মনে একটুও অভক্তি কি অবিশ্বাস করো না।

কিরণময়ী অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল—মাথায় স্পর্শ করাইয়া তা' মুখে দিল—অভক্তি কি অবিশ্বাস একটুও করিল না।

অন্নপূর্ণা তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বিশ্বাসে আর তৃপ্তিতে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মুখের এই ঔজ্জ্বল্য সম্পূর্ণ বজায় রহিল—

এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সফল করিয়া আর হুলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি আর অনন্ত পরমায়ুঃলাভের আশীর্ব্বাদের মাঝে কিরণময়ীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল—অন্নপূর্ণা চমকিত হইয়া উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁর এই অভিলাষটি ভগবান্ পূর্ণ করিয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না—প্রসূতি-পরিচর্য্যায় কিছুমাত্র ত্রুটি কি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, ছেলের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর আর পরিপুষ্ট—সুস্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য একটুও নাই।

ছেলের নাম রাখা হইল শুভময়—শুভময় বাড়িতে লাগিল, এবং তারপরও কিরণময়ীর গর্ভে আর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল…

ইহাদের দ্বারাই বংশের ধারা বহমান থাকিবে; অন্নপূর্ণা প্রায় নিশ্চিন্ত হইলেন।

তেইশ বছর বয়সেই দুইটি সন্তানের জনক হইয়া অশোকের একটু ইতস্ততঃ ভাব আসিয়াছে—এটা যেন লজ্জাকর দুরবস্থার মত; কিন্তু তা' ধর্ত্তব্য নয়—ধর্ত্তব্য ইহাই যে, বৈধব্যের অপার বিরসতার মাঝেই তার জননী যেন কখন কখন হঠাৎ খুশী হইয়া উঠিতেছেন—আর, পূর্ব্বপুরুষগণকে এবং সংসারকে আনন্দপ্রদ দেয় বস্তু হিসাবে সন্তানোৎপাদন করিয়া সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে।

পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য আসেন, যান্; অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাঁর কি কথা হয় তা' জানা যায় না; কিন্তু দেখা যায়, মাঝে মাঝে তিনি কিছু টাকা লইয়া চাদরে বাঁধেন—আর, শনিবারে শনিবারে অত্যন্ত আয়োজন করিয়া শনির পূজা করেন; কিন্তু সে পূজায় উল্লাস উৎসব কিছুই থাকে না, থাকে কেবল সুগভীর নিষ্ঠা।

কিন্তু শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দিল অন্নপূর্ণার নিজের শরীরে আর মনে: কি কারণে তিনি নিঃশঙ্ক হইয়া উঠিতেছেন, আর সর্ব্বদাই অস্থিরচিত্ত তা' বুঝা যায় না, কিন্তু দেখা যায়, তাঁর শুষ্ক মুখ আরও শুকাইয়া উঠিতেছে—দিন দিন তাঁর শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতেছে—একটা শোকাচ্ছন্ন বৈরাগ্যবশতঃ তিনি যেন স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছেন···

অশোক আর কিরণের উদ্বেগ আর প্রশ্নের শেষ নাই: মা, তোমার শরীর এমন হ'য়ে যাচ্ছে কেন? কি হয়েছে তোমার বল।

অন্নপূর্ণা বলেন, কিছুই হয়নি রে। তোরা ভাবিস্ নে।

—নাতিরা এসে আয়ুঃ হরণ করছে দেখছি। বলিয়া অশোক হাসিতে চেষ্টা করে।

কিরণ বলে, মা বড্ড খাটেন ওদের নিয়ে।

—তা' হ'তে দিও না। সেই মেয়েটাকে আবার রাখ না কেন, বেশ যত্ন করতে পারে। বলিয়া অশোক তার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে···

কৈবর্ত্তদের একটি মেয়েকে 'ছেলে ধরার' জন্য রাখা হইয়াছিল; আন্না তার নাম। ছেলে রাখিতে রাখিতে আন্না ছোট ছেলেটাকে কোলে করিয়াই একদিন আঁচলে পা বাধিয়া আছাড় খাইল। আন্নার তেমন দোষ ছিল না—সে পরিয়া আসিয়াছিল তার মায়ের কাপড়—অত বড় কাপড় সাম্‌লাইতে পারে নাই; কিন্তু অন্নপূর্ণা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না; যে-মেয়ে অসাবধান, তাহার কাছে ছেলে দিয়া বিশ্বাস নাই বলিয়া তিনি আন্নাকে তাড়াইয়া দিলেন। ছেলের বুকে যদি আঘাত লাগিত, হাত পা ভাঙিতে পারিত, ইত্যাদি।

শিহরিয়া উঠিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন,—সে মেয়েকে এনে আর কাজ নেই।···সত্যি আমার শরীর খুব খারাপ দেখছিস্ তোরা?

—হ্যাঁ, মা; খুব খারাপ হয়েছে।

—তবে আমাকে ক'লকাতায় নিয়ে চল্—কিছুদিন থেকে আসি।

—চল।

বন্দোবস্ত হইয়া গেল; অন্নপূর্ণা সবাইকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; বলিয়া আসিলেন, হে মা দুর্গা, সবাইকে বজায় রেখে যেন ফিরে আস্‌তে পারি। বলিয়া দুর্নিবার একটা আবেগে একবার পুত্রকে একবার বধূকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর এই কান্না অহেতুক মনে হইয়া ওরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই অন্নপূর্ণা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; দেখিলেন, এখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক; বলিলেন, আগে অনুমান করতে পারি নাই যে, ক'লকাতা এমন প্রবল সাংঘাতিক স্থান; আমার বড় ভয়-ভয় কর্‌ছে।

বলিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন—

এবং দেশে ফিরিয়াই তাঁর মনে হইল, এখানে তাঁরা ভারি অসহায়—স্থান নিরাপদ্ নহে। অসুখে বিসুখে ভরসা মাত্র নিত্যনিধি কবিরাজ আর গুরুদাস দত্ত ডাক্তার—উভয়েরই ক্ষমতা অল্প—

বলিলেন, চল্, ক'লকাতাতেই থাকি গিয়ে; কিন্তু তোরা কেউ বেরুতে পাবি নে আমার অনুমতি না নিয়ে।

একটা চালাক্ চতুর চাকর রাখ্‌তে হবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই এক সঙ্গে বেরুব।

তাহাতেই সম্মত হইয়া অশোক সবাইকে লইয়া আবার কলিকাতায় আসিল—এবার সঙ্গে আসিলেন পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য···

সবাইকে বাসাবাড়ীতে আবদ্ধ রাখিয়া অন্নপূর্ণা পরমব্রহ্মকে সঙ্গে লইয়া নিত্য নিয়মিতভাবে যাইতে লাগিলেন দেবতার দুয়ারে—দেবতার দুয়ারে উপুড় হইয়া তিনি পড়িয়া থাকেন—তাঁর চোখের জলে দুয়ার ভাসিয়া যায়—আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা তাঁর শেষ হইতে চায় না···

পরমব্রহ্ম জানেন সব, কিন্তু এখন তিনি নিঃশব্দ—তিনি কেবল অন্নপূর্ণার সঙ্গী—বাড়ীতে থাকিতেই তাঁর যে কাজ তা' শেষ হইয়াছে; সাতদিন তিনি হোমানল নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই।

এ-সব ছাড়াও অন্নপূর্ণা আর-একটি বিষয় দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত্ত ধ্যান করিতেছেন, যার মত উগ্র হইয়া সংসারের আর কিছুই তাঁর সম্মুখে নাই—১৩২১ সালে যার জন্ম, ১৩৪৫ সালে তার বয়স কত? ঐ হিসাবটি অন্নপূর্ণা করেন, আর তাঁর বুকের শিরা ফাট্‌ফাট্ করিয়া স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসে, দুস্তর অন্ধকার চোখের সম্মুখে ব্যাপ্ত হইয়া তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়েন···

৪৫ সাল চলিতেছে—

অন্নপূর্ণা সবাইকে খুব সাবধানে, আর সর্ব্বাঙ্গে আর সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভূত একটা অতলস্পর্শতার মাঝে একমাত্র ভরসাস্থল মনে হইয়া পরমব্রহ্মকে নিকটে রাখিয়াছেন··· সাবধানে থাকিতে থাকিতে একদিন তিনি অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন—অশোককে অত্যন্ত পাণ্ডুর দেখাইতেছে···

অশোক বলিল, মাথাটা বড্ড ধরেছে, মা—ফেটে যাচ্ছে যেন। 'শোব' বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে যাইয়া সে উঠিতে পারিল না···

অন্নপূর্ণা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন—তখন অশোক ঘামিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঘাম গলদ্‌ধারে বহিতে লাগিল—অন্নপূর্ণা দেখিলেন, অশোক অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে···

পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য অন্নপূর্ণার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই চক্ষু মুদিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল—

আরও ডাক্তার আসিল, আরও বড়, তারও বড়; কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়া গেল—অশোক বাঁচিল না; জননীকে পুত্রহীন, কিরণময়ীকে বিধবা, আর পুত্র দু'টিকে পিতৃহীন করিয়া সে চলিয়া গেল···

তিনদিন নিঃশব্দ আর অনাহারে থাকিবার পর অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন—বিধবা পুত্রবধূকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন—তার রিক্ত মূর্ত্তির দিকে শুষ্ক চক্ষে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অন্নপূর্ণার যখন মনে হইতে লাগিল, তাঁর অপরাধের সীমা নাই, ক্ষমা নাই, তখন তিনি কথা কহিলেন। বধূর দু'টি হাত দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, মা, আমায় ক্ষমা কর্। এ আমি জান্‌তাম।

কিরণময়ী নিষ্পলক চক্ষে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

আকাশের বুকে চাঁদ

শ্রীকালীপদ দাস

পুরানো বছর শেষ হয়ে যায় আকাশের বুকে নূতন চাঁদ,
রাত্রি একাকী কাটিছে আমার চারিদিকে ঘেরা মায়ার ফাঁদ।
দিকে দিকে হেরি তব ছায়াখানি যে রূপ আমার নয়নে ভাসে,
তোমার প্রতিমা শোভা পায় তাই আমার নয়নে নামিয়া আসে।

পূজা ফুল দিয়ে যে আরতি রচি যাহার লাগিয়া কাটে এ নিশি,
মনে হয় ঐ আসিয়াছে আজি—আমার সাথেতে রয়েছে মিশি।
মোর সাথে আজ পূজা দেই তারে, আমার পূজায় তাহারে পূজি,
বিশ্বের মাঝে যে ছায়া বিরাজে আপনার মাঝে তাহারে খুঁজি।

নব বরষের নূতন দিনেতে তাইতো আজিকে প্রাণের 'পরে,
শুধুই কেবল ঝরে পড়ে আলো—আনন্দ হাসি শুধুই ঝরে।

কয়লা শিল্পের পরিস্থিতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দ কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দও অতিক্রান্ত। এই সময়ের মধ্যে জগতে যে কত বিপদ্, বিভ্রাট ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যেমন রাষ্ট্রজগতে, তেমনি শিল্প-বাণিজ্য জগতেও দারুণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কোন কোন শিল্পের উন্নতি, কোন কোন শিল্পের বিপত্তি; কোন কোন বাণিজ্যের প্রসার, আবার কোন কোন বাণিজ্যের হ্রাস ঘটিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে পাথুরিয়া কয়লাশিল্পের দুঃখ-দুর্গতির আলোচনা করিব। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ কয়লাশিল্পের পক্ষে আদৌ শুভকর হয় নাই। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দও যে শুভকর হইবে, তাহারও কোন নিদর্শন এখনও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। বর্ত্তমানে যে কয়লার মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে শিল্পের কোন সুবিধা ঘটে নাই। এই বৃদ্ধি মাল গাড়ীর অনটন হেতু এবং এই বর্দ্ধিত মূল্য শিল্পের আয়ত্ত-বহির্ভূত।

যুদ্ধপ্রয়োজনে পাথুরিয়া কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, এই প্রত্যাশা সকলেই করিয়াছিল। কয়লাশিল্পের কর্ত্তৃপক্ষও আশান্বিত হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে সরকারের প্রয়োজন মিটাইবার প্রতিশ্রুতি সরকারকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত বৎসর, কয়লাশিল্পের পক্ষে, লোক-মত-বিরুদ্ধ গতি-প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। উৎপাদন সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া ২৯ মিলিয়ন (নিযুত) টনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং রেলচালান (Despatches) ২৬½ মিলিয়ন টনে পরিগণিত হইয়াছিল। তথাপি কয়লার মূল্য অতি প্রত্যাশিত গতি-পথ অবলম্বন করে নাই। পক্ষান্তরে, আলোচ্য বর্ষের অগ্রগতির সহিত মূল্যের হার, ক্রম-নিম্নগতি লাভ করিয়া, লাভশূন্য উৎপাদন ব্যয়ের সীমান্তরেখায় পৌঁছিয়াছিল। এই অধোগতির কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা সমীচীন হইবে না। সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন, কয়লাবাহী মালগাড়ীর নিয়মিত যোগানের অভাব, দূরদেশান্তরে চালান দিবার নিমিত্ত মালগাড়ী ও জাহাজের অনাটন প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিকূল কারণে, কয়লার মূল্যের হার নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল। এই দুর্দ্দৈবের মূলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশদায়ক নিমিত্ত ছিল—খনিমালিকগণের মধ্যে সদ্ভাব ও একতামূলক মৈত্রী এবং বিক্রয়ব্যবস্থামূলক সংগঠনের অভাব।

বর্ত্তমানে প্রাপ্তব্য সংখ্যাসমষ্টি হইতে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্যবর্ষে প্রদেশসমূহে মোট উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ হইয়াছিল ২৬ মিলিয়ন টন—পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১·৫ মিলিয়ন টন অধিক কয়লা বহন করিয়াছিল। বৎসরের কিয়দংশকাল রপ্তানীর ধারা সন্তোষজনক ছিল। কোন কোন মধ্য এবং নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব-দেশ কয়লার নিমিত্ত ভারতের প্রতি দৃষ্টি যোজনা করিয়াছিল। সুদান, প্যালেষ্টাইন ও গ্রীস হইতে সরবরাহের নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু মালবাহী জাহাজের অনটনে এই চাহিদার সম্পূর্ণ সুযোগ লওয়া যায় নাই। আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে কেবল যুদ্ধসম্ভারোৎপাদনে ব্যাপৃত কতকগুলি শিল্প হইতে। অন্যান্য শিল্পের চাহিদা বরং কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

অত্যধিক উৎপাদন হেতু কয়লাশিল্পের ক্ষতির উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। ১৯৩৮ সালের সর্ব্বোচ্চ উত্তোলনের ফলে মূল্য-মানের হ্রাস ঘটিয়াছিল। এখনও চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অধিক। সুতরাং উৎপাদন-শাসন ব্যতীত, মূল্য-মানকে ক্ষতির উর্দ্ধে অর্থকরী অবস্থায় রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ চাহিদা, দেশের বিপুল আয়তন ও বিবিধ শিল্প সম্ভাবনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। প্রভূত শিল্পশক্তিসম্পন্ন বিরাট্ ভারতের বহু শিল্পের মূল্য ও স্থূল উপাদান, কয়লার প্রয়োজন বর্ত্তমান কাটতি অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং অত্যধিক উৎপাদনের অজুহাতে শিল্পের প্রতি কটাক্ষপাত সমীচীন নহে। ভারতে; মাথা-প্রতি কয়লার ব্যয়, অন্যান্য দেশের তুলনায়, সর্ব্বাপেক্ষা কম। যুক্তরাজ্যে, কয়লার মাথা-প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ, ৩·৯ টন; যুক্তরাষ্ট্রে

৩'৫ টন; জার্ম্মাণীতে ২'৪, ক্যানাডায় ২'৩, অষ্ট্রেলিয়ায় ১'৭, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১'২, সোভিয়েট রুশিয়ায় ০'৮, জাপানে ০'৬ এবং ভারতে ০'১ টন মাত্র। ভারতের ন্যায় বিরাট্ দেশের তুলনায়, ক্ষুদ্র জাপানের ব্যয় ছয় গুণ অধিক। ভারতের এই অত্যল্প কয়লার চাহিদা, দেশের শিল্প-সঙ্কীর্ণতা ও অপকর্ষের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। শিল্প-সমুন্নয়ন-সমৃদ্ধ ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ আদিম উপাদান কয়লার চাহিদা ও কাট্তি বর্ত্তমানাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হওয়াই অতি স্বাভাবিক। যুদ্ধারম্ভে সকলেই প্রত্যাশা করিয়াছিল যে, বহু শিল্পের দ্রুত উন্নতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সহিত, কয়লার চাহিদা ত্বরিত বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ততটা ঘটে নাই। আলোচ্য বর্ষের অধিকাংশ ভাগে যুদ্ধ-প্রারম্ভে বর্দ্ধিত মূল্যহার সমপর্য্যায়ে অবস্থিত ছিল। দৃশ্যতঃ যদিও ইহা সন্তোষজনক অনুমিত হইয়াছিল, তথাপি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভাণ্ডার-সম্ভারের (Stores) মূল্য, শ্রমিকদিগের মজুরি এবং করবৃদ্ধি হেতু উৎপাদনের ব্যয়-বৃদ্ধি নিমিত্ত যুদ্ধারম্ভে মূল্যের স্বল্পোন্নতি শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল। কয়লা-শিল্পে অতিরিক্ত লাভ দিবা-স্বপ্নের ন্যায় নিতান্ত অলীক। অতিরিক্ত লাভকরের দ্বিগুণ বৃদ্ধি কয়লাশিল্পের কোনই ক্ষতি করে নাই; ক্ষতি করিয়াছে আয়-কর, অতিরিক্ত আয়কর (Super-tax) এবং অতিরিক্ত বোঝাইকর (Surcharge)।

কয়লাশিল্পের দুর্গতিপ্রসঙ্গে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে মনে হয়, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ মাল-গাড়ীর অভাব। গত বৎসর এই অভাব তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হইয়াছিল। কয়লা ব্যবসায়ে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনিমালিকদিগের পক্ষে, মাল-গাড়ীর নিয়মিত যোগান জীবন-মরণ সমস্যা। দুঃখের বিষয়, কয়লাব্যবসায়ীদিগের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মালগাড়ী যোগান সমিতির তৎপরতা সন্তোষজনক হয় নাই। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কয়লাক্ষেত্রে মালগাড়ীর অনটন ঘটিয়াছিল, কিন্তু তদনুপাতে সমিতির অধিবেশন যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র ঘটে নাই। বর্ত্তমান বর্ষে, সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল ১৪ই জানুয়ারী এবং দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হইয়াছিল ২৮শে মার্চ্চ;—প্রায় আড়াই মাস পরে! এই অবকাশে, মালগাড়ীর যোগান যথোপযুক্ত ছিল না এবং এঞ্জিন সরবরাহও সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকিত। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধার্থ অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান-সমূহের বিশেষ যোগান ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে, মালগাড়ী যোগান সমিতির অধিবেশনে, চালানের-উপদেষ্টা-কর্ম্মচারী কোন একটি লক্ষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত মাসিক ৬৯০০ টনের পরিবর্ত্তে ৭৫০০ টন কয়লা প্রেরণোপযোগী মালগাড়ী সরবরাহের সুপারিশ করেন; কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, বস্তুতঃপক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠান প্রতিমাসে ৫৫০০ টনের অধিক কয়লা লইতেছে না। কয়লা ব্যবসায়ের মুস্কিল এত অধিক যে, ন্যায়ানুগত বিধিব্যবস্থার সামান্য ব্যতিক্রমেও, ইহার দুর্গতি ও দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। এবিষয়ে রেলকর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে বালিঠাসা প্রস্তাবে খনি-মালিকেরা, বিশেষতঃ ছোট ছোট খনির কর্ত্তৃপক্ষ, বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র নিরাপত্তার নিমিত্ত কয়লা-খনি-সজ্জীকরণ আইন (Coalmines Stowing Act) সমীচীন হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে গভীর মতভেদ বিদ্যমান। সজ্জীকরণমণ্ডলীর (Stowing Board) পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে অর্থবণ্টন দুরূহ ব্যাপার। সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা এই উভয়বিধি উদ্দেশ্যসাধনার্থ সজ্জীকরণ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে, বণ্টনের তৌলদণ্ড সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিত। বর্ত্তমানে, সংরক্ষণসম্পর্কশূন্য, কেবলমাত্র নিরাপত্তার নিমিত্ত, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ন্যায় ও বিচার-সঙ্গত বণ্টন একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই ব্যবস্থার ফলে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার উৎপাদক খনিগুলির অসুবিধা সমধিক। এই শ্রেণীর খনি-মালিকেরা ভারতবাসী। তাহাদের অর্থ-সামর্থ্য ও শক্তিসংস্থান কম। নিরাপত্তার নিমিত্তও তাহাদিগকে সরঞ্জাম প্রভৃতি যাবতীয় ব্যয় সাহায্য না করিলে তাহারা এই সাহায্যের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারিবে না। সাধারণতঃ যে মূল্যে এই সকল খনির কয়লা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাতে লোকসান

বাঁচাইয়া লাভের অঙ্ক এত কম যে, তাহারা কোন প্রকার অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ।

গত বৎসর মে মাসে, যখন সরকার এই বিধি সম্বন্ধে কয়লাশিল্প ও ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মতামত চাহিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় খনিজ সমবায় (Indian Mining Federation) ও ভারতীয় খনি-মালিক সমিতি (Indian Colliery owners Association) একত্র নিবেদন করিয়াছিলেন যে, নিরাপত্তার নিমিত্ত সজ্জীকরণ ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের স্বার্থগত সংরক্ষণ-সুবিধার মধ্যে ভেদ-ব্যবধান রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। এই নিমিত্ত সজ্জীকরণমণ্ডলীর সম্বন্ধে অতি দুষ্কর কর্ম্মের ভারার্পিত হইয়াছে। মণ্ডলীর অর্থসংস্থানও প্রচুর নহে, সুতরাং সংগৃহীত স্বল্পধনের অপচয় অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, বাধ্যতামূলক সজ্জার নিমিত্ত অন্তর্দ্দেশীয় শুল্ক (Excise duty) সমুৎপন্ন অর্থও যথেষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, আশু ঐ শুল্কের মাত্রাবৃদ্ধি একেবারেই অসম্ভব। বাণিজ্য-সচিব যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় সমিতি দুইটি এই বিষয়ে তাঁহার সহিত ঘরোয়া আলাপা-লোচনাও করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃথা! স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সজ্জীকরণবিধির প্রত্যাহার অথবা প্রভূত প্রশমন প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বিধির কুফল শীঘ্রই অনুভূত হইবে; স্বল্পসঞ্চিত অর্থের অপচয়ের বিনিময়ে মণ্ডলী যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন, তাহা অতি উচ্চ মূল্যে অর্জ্জিত হইবে এবং অধিকতর অর্থপ্রয়োজন হেতু করভার-প্রপীড়িত শিল্পের বোঝা বাড়িবে। ইতিমধ্যেই কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কাঁচা ও পোড়া কয়লার প্রতি নির্দ্ধারিত সজ্জীকরণ-কর (Stowing excise duty) আট আনায় না হউক, অন্ততঃ আইনানুমোদিত কাঁচা ও মৃদু পোড়া (Soft coke) কয়লার নিমিত্ত তিন আনায় ও খর পোড়া (Hard coke) কয়লার নিমিত্ত সাড়ে চারি আনায় পর্য্যবসিত হউক। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, অপকৃষ্ট খনি মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ীর সমূহ ক্ষতি হইবে। সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি পাইবে এবং মণ্ডলীর পক্ষে সাহায্যদান দুর্ঘট হইবে। আশা করি, শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী মন্দা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কেহই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন না। আইনানুযায়ী সজ্জীকরণমণ্ডলীর "অন্য প্রকার সাহায্য" ("Other assistance") দিবার কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু মণ্ডলী কি ভাবে এই "অন্য প্রকার সাহায্যের" ব্যাখ্যা করিবেন, তাহার ইঙ্গিত পাইবার নিমিত্ত সকলেই উদ্‌গ্রীব। ফলে, অপকৃষ্ট শ্রেণীর খনি মালিকদিগের আশঙ্কা যে, কোন প্রকার উপকারের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগকে নীরবে চাঁদা যোগাইতে হইবে।

অতিরিক্ত বোঝাই-মাশুল কয়লাশিল্পের আর একটি গুরুতর অভিযোগের বিষয়। গত নবেম্বর মাসে, এই মাশুলের হার শতকরা পাঁচ অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, বিগত বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে এই অতিরিক্ত কর পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে না, এমন কথা কেহই দুঃসাহস করিয়া বলিতে পারে না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ববিধ অনুকূল-প্রতিকূল বিষয় বিবেচনা করিয়া, রেলওয়ে বোর্ড টন প্রতি সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এক টাকা। নূতন বিধানানুসারে, এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ১৫ অংশ এবং নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শতকরা ২০ অংশ অতিরিক্ত বোঝাই মাশুল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অন্যান্য পণ্যের পক্ষে এই অতিরিক্ত মাশুলের হার শতকরা ১২½ অংশ। কয়লাশিল্প সকল-আদিম শিল্পের মূল, সুতরাং এই শিল্পকে খর্ব্ব করিয়া রেলপথের আয়বৃদ্ধি সমীচীন নীতি নহে। সমগ্র শিল্প এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সরকারের নিকট পেশ করিয়াছে; ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। মালগাড়ী সরবরাহ সমস্যা এই করবৃদ্ধির মূল নিদান; কিন্তু এই করবৃদ্ধি, কেবল মাত্র শিল্পকে নহে, শিল্পের মারফত গৃহী, শিল্পী, ব্যবসায়ী সকল ক্রেতাকেই পীড়া দেয়। রেলপথের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এই অতিরিক্ত অসঙ্গত করভার যথাসম্ভব ন্যূন করিয়া একটি স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট হারে পর্য্যবসিত করা অত্যাবশ্যক। মাল-গাড়ী সরবরাহ সমস্যা আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কয়লা-শিল্পের প্রধানতম অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধের বিষম পরিস্থিতি হেতু ইহার আশু অবসানের আশাও দুরাশা মাত্র।

কয়লাশিল্পের উন্নতির পথে আর একটি প্রধান অন্তরায় রেলকর্ত্তৃপক্ষের কয়লাক্রয়নীতি। যাঁহারা অতীত ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত তাঁহারা জানেন যে, শিল্পের অযথা অর্থ-গৃধ্নুতা রেলকর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করিয়াছিল, কয়লাক্ষেত্র আয়ত্ত করিয়া, সহজে ও সুলভে আত্ম-প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত আত্মবশতার আশ্রয় লইতে। পরবশতা দুঃখ। সুতরাং কয়লাশিল্প যখন রেলওয়ে-চাহিদা যোগাইবার নিমিত্ত অতিরিক্ত হারে কয়লা বিক্রয়ের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইল, তখনই রেলকর্ত্তৃপক্ষ ন্যায়সঙ্গত ভাবে, আত্ম-স্বার্থ-সংরক্ষণ হেতু, কয়লার খনি আয়ত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন বাস্তব পক্ষে, কয়লার বাজার দরের চাবীকাটি রেল-কর্ত্তৃপক্ষের হাতে। নিজেদের খনি থাকা সত্ত্বেও, রেল-কর্ত্তৃপক্ষ এখনও বাজার হইতে শতকরা তেত্রিশ অংশ কয়লা ক্রয় করিয়া থাকেন। আপনাদের খনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রেলকর্ত্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে বাজার দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহারা প্রয়োজনের পরিমাণ বিজ্ঞাপিত করিয়া বাজার হইতে দর চাহিয়া পাঠান এবং চাহিদা, যোগান ও শিল্পের এবং আপনাদের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া, যে দরে কয়লা ক্রয় করেন, তাহাই বাজার দরে পরিণত হয়। ইহাকেই বলে, উপযুক্ত প্রতিফল-দায়ী বিধি-বিধান। কয়লাশিল্প রেলওয়ে চাহিদার উপর এরূপ নির্ভরশীল, যে পূর্ব্বে দরনির্দ্ধারণের যে ক্ষমতা তাঁহাদের আয়ত্তে ছিল, অপব্যবহারের ফলে আজ তাহা ক্রেতার হস্তে হস্তান্তরিত। এখন কয়লা-শিল্প আলাপ-আলোচনা, আবেদন-নিবেদন ও তারস্বরে পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ জানাইয়াও কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। স্বার্থের উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, পরার্থের নিমিত্ত তাহার সঙ্কোচ বা প্রত্যাহার সম্ভব নহে। ফলে, প্রয়োজনের তাগিদে রেলকর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময়ে সাময়িক ক্ষতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি করেন এবং কুচা কয়লা (slack coal) বাজারে বিক্রয় করিয়া কয়লাশিল্পের ক্ষতির নিমিত্ত হইতে বাধ্য হয়েন। সাধারণ খনি-মালিক-দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য না হইলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে ফল তাহাই দাঁড়ায়। কিন্তু কয়লা শিল্প আবেদন-নিবেদন ব্যতীত চরম প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ। কারণ, সমগ্র উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের ক্রেতা ও ভোক্তা রেলকর্ত্তৃপক্ষ, সুতরাং রেলপথের সওদার উপর কয়লাশিল্পের জীবন নির্ভর করে। ক্রয়নীতির কূট-পরিচালনা দ্বারা রেলকর্ত্তৃপক্ষ যেমন শিল্পের কণ্ঠরোধ করিতে পারেন, উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক তেমনি তাহার পুষ্টিসাধনও করিতে পারেন। উত্তম খনি-মালিকদিগের পক্ষে যদিও প্রতিবাদ সম্ভব, অপকৃষ্ট খনি-মালিকদিগের পক্ষে তাহাও অসম্ভব। উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের জন্য, মাল চালান দিবার নিমিত্ত মালগাড়ী-সরবরাহের জন্য এবং কয়লাশিল্পের আরও বহু অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত খনিমালিকগণ রেল-কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী। সুতরাং রেলওয়ে বোর্ডের কর্ম্ম-পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ অথবা প্রতিকূল সমালোচনা শ্রেয়স্কর নহে, বরং বিষম বিপজ্জনক। বোর্ডের ক্ষমতা-হ্রাস ব্যতীত, কয়লাশিল্প ও ব্যবসায়ের মুক্তি সুদূর-পরাহত। এই প্রচেষ্টার মূলে চাই একতা; কিন্তু কয়লা-শিল্প ও ব্যবসায়পরিচালক সমিতিত্রয়ের মধ্যে মৈত্রী ও একাভিসন্ধির একান্ত অভাব। উত্তমাধম নির্ব্বিশেষে, শিল্প ও ব্যবসায়ের স্থায়ী কল্যাণ-কল্পে, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই বিঘ্ন-বিপত্তি নিবারণের একমাত্র উপায়।

ভারতীয় খনিজ সমিতির (Indian Mining Association) সভাপতি তাঁহার গত-পূর্ব্ব বাৎসরিক অভিভাষণে একটি বিক্রয়ব্যবস্থাবান সংগঠনের অতি সমীচীন প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কয়লাশিল্পের শুভানুধ্যায়ী সমিতিত্রয়ের বা নিযুক্ত কার্য্যকরী সমিতিগুলি এই বিষয়ে অবহিত হইলে, আশু সুফল লাভ ঘটিতে পারে। উত্তম কয়লার উৎপাদক, প্রথম শ্রেণীর খনিগুলি গত দুই বৎসর তাহাদের উৎপাদন অযথা বর্দ্ধিত করিয়া বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান অনিষ্টকর মূল্য-মন্দা অনর্থের নিমিত্তভাগী হইয়াছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে যে কিছু মূল্যমানের উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহার হেতু ছিল বৃহৎ শিল্প কর্ত্তৃক অধিকতর পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর কয়লা-ব্যবহার। উত্তম কয়লার মূল্য তখন

সাড়ে চারি হইতে সাড়ে পাঁচ টাকা টন প্রতি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু লোভে পাপ। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চ শ্রেণীর খনিমালিকগণ, তাঁহাদের উৎপাদন অযথা বৃদ্ধি করিয়া, স্বর্ণপ্রসূ রাজহংসের কণ্ঠরোধ করিয়াছিলেন। ফলে ১৯৩৭-৩৮ সালে, যে মূল্যে প্রথম শ্রেণীর (Grade I) কয়লা বিক্রীত হইয়াছিল, পরে সেই মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট (Selected Grade) কয়লা প্রাপ্য হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে, কোন প্রতিষ্ঠান গত বৎসর, ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা, ছয় লক্ষ টন অধিক উত্তম কয়লা উত্তোলন করিয়াছিলেন। একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই বাড়্তি উৎপাদনের ফলে, অবশ্যম্ভাবী মূল্যহ্রাসের নিমিত্ত, তাঁহারা আর্থিক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট কয়লার মূল্যহ্রাস সর্ব্বপ্রকার কয়লার মূল্যবৃদ্ধির পথে বিষম অন্তরায়। স্বল্প মূল্যে উত্তম কয়লা পাইলে, অধিক পরিমাণে অল্প মূল্যে নিকৃষ্ট কয়লা কিনিয়া, কোন শিল্পই অকারণ অধিক রেল মাশুল দিতে প্রস্তুত নহেন। অল্প পরিমাণ উত্তম কয়লায় বহু পরিমাণ নিকৃষ্ট কয়লার কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং স্বল্প মূল্যে অল্প পরিমাণ উত্তম কয়লা কেনাই শিল্পের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহার কুফল অত্যন্ত গুরুতর। কারণ, যেখানে নিকৃষ্ট কয়লায় বেশ কাজ চলে, সেখানেও উৎকৃষ্ট কয়লার ব্যবহার দ্বারা প্রথম শ্রেণীর কয়লার অমার্জ্জনীয় অপচয় ঘটে। ভারতে উৎকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ অসীম নহে। এই শ্রেণীর কয়লার অপব্যবহার নিবারণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে তাহার সংরক্ষণই আমাদের বৃহৎ শিল্প-ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অদূরদর্শিতার ফলে, এবং আশু লাভের লোভে আমরা বৃহৎ শিল্পের পাদমূলে কুঠারাঘাত করিতেছি। এই আত্মঘাতী নীতির পরিণাম শোচনীয় হইবে।

এই সকল কারণে কয়লাশিল্পের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আশু তদন্তের প্রয়োজন। কয়লা অত্যাবশ্যকীয় জাতীয় সম্পদ, প্রায় শিল্প মাত্রেরই মূল ও স্থূল উপাদান। ইহার অপচয় শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অচিরে, কয়লার উৎপাদন ও বিতরণ দেশের কল্যাণ-কল্পে নিয়ন্ত্রিত হওয়া অতীব প্রয়োজন। কয়লাশিল্পের ঘরে বাহিরে শত্রু। এই উভয়বিধ শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, লৌহশিল্পোপযোগী (Metal-lurgical) কয়লার আকর সঙ্কীর্ণ; অথচ এই কয়লাই বৃহৎ শিল্পের জীবন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বাধীনে বিহারের শাসনতন্ত্র একটি কয়লা-ব্যবস্থাপন সমিতি (Coal Re-organisation Committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সমিতির তদন্ত-সিদ্ধান্ত সম্প্রতি বিহার সরকারের হস্তগত হইয়াছে। প্রকাশ এই যে, সরকারের তত্ত্বাবধানে নাবালকের সম্পত্তিরক্ষার ন্যায়, রাষ্ট্রকর্ত্তৃক কয়লাশিল্পের শাসন ও নিয়ন্ত্রণই এই সমিতির প্রধান সুপারিশ। এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ বাঙ্গালা, বিহার ও মধ্য প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত কয়লাপরিষদ্ (Joint Coal Commission) গঠনের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় খনিবিদ্ সমবায়ও সম্প্রতি সরকারের নিকট একটি কয়লা তদন্ত সমিতির (Coal Enquiry Committee) প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সমবায় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদন্তের অঙ্গীভূত হইবে; (১) উৎপাদনের পরিকল্পিত-নিয়ন্ত্রণ, (২) অপচয়নিবারণ ও লৌহদ্রবকারী কয়লার সংরক্ষণ; (৩) বিক্রয়ব্যবস্থাপন; (৪) রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকার; (৫) সেলামী-নিরিখ নির্দ্ধারণ; (৬) কাঁচা ও পোড়া কয়লার উপর নির্দ্ধারিত সর্ব্বপ্রকার করের ঐক্যীকরণ; (৭) বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে গুণানুযায়ী বিবিধ কয়লার পরিকল্পিত বিতরণ; (৮) কয়লা শিল্পের উপর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলাফল; (৯) রেলওয়ের অধিকৃত ও অন্যান্য খনিগুলির পারস্পরিক অবস্থা-ব্যবস্থা এবং ঘাত-প্রতিঘাত; (১০) মালগাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা-সমস্যা; (১১) গবেষণামূলক ইন্ধন-সংস্কার প্রচেষ্টা; (১২) নিকৃষ্ট কয়লার যথোপযুক্ত উন্নততর সদ্ব্যবহার; (১৩) রেলপথের মাশুলনীতি এবং (১৪) কয়লার সর্ব্বনিম্ন মূল্য-নির্দ্ধারণ।

এই সকল সমস্যার আশু সমাধান ব্যতীত, কয়লাশিল্পের কল্যাণ অসম্ভব। সুখের বিষয় এবং সৌভাগ্যের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কয়লাক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, প্রগাঢ় সৌজন্য ও সহানুভূতির সহিত, খনি

অঞ্চলের সমস্যাগুলির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশান্তর্গত খনিগুলির শাসন ও নিয়ন্ত্রণ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অতিরিক্ত খনিজ মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশের বহুধাবিভিন্ন নীতি ও রীতির সমীকরণ ও ঐক্যীকরণ দ্বারা কয়লাশিল্পের দুঃখ-দুর্দ্দশার স্থায়ী প্রতিকার ও প্রতিবিধান দ্বারা চির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। শিল্পপ্রতিনিধি-সংগঠিত একটি পরামর্শদাতা সমিতি খনিজ মন্ত্রীকে প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশ দিতে পারে। এই প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(তৃতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥৩৩॥

কর্ত্তা (বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট জীব) [কস্মাৎ (কি হেতু)] শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের সাফল্যরক্ষা হয় এই হেতু)।

জীব যদি উপাধিভূত না হইত, তাহা হইলে শাস্ত্র-শাসনের সার্থকতা থাকিত না। শাস্ত্র বলিতে পারিয়াছে—ইহা কর; ইহা করিও না। যতক্ষণ জীব উপাধিভূত, ততক্ষণ শাস্ত্র। উপাধিভূত জীবের কর্ত্তৃত্বই শ্রুতি স্বীকার করিয়াছে, 'এতোহি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মাপুরুষঃ।'

বিহারোপদেশাৎ ॥৩৪॥

বিহার (স্বপ্ন-সঞ্চরণ) উপদেশাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ থাকা হেতু)। জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয়। শ্রুতি বলিতেছেন 'স ঈয়তেঽমৃতোযত্রকামম্ স্বে শরীরে যথাকামম্ পরিবর্ত্ততে।' অর্থাৎ সেই অমৃতময় আত্মা যদৃচ্ছা গমন করেন, যদৃচ্ছা কামনা করেন, আপনার শরীরে যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তিত হন। জীব-প্রকরণের আরও শ্রুতি-প্রমাণ আছে—

উপাদানাৎ ॥৩৫॥

জীবের উপাদান থাকা হেতু। উপাদান অর্থে ইন্দ্রিয়াদি। শ্রুতি বলিতেছেন—'তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়' ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে করিয়া শয়ন করেন।

জীবধর্ম্ম আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে পরবর্ত্তী সূত্রে—

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥৩৬॥

ক্রিয়ায়াং (লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়ায়) ব্যপদেশাৎ (জীবকর্ত্তৃত্বের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে) ন চেৎ (বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা জীবের নির্দ্দেশ যদি না দেওয়া হইত) নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ (নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইত)।

অর্থাৎ তিনি "বিজ্ঞানং" এইরূপ কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ হওয়া হেতু জীব উপাধিভূত আত্মাই—আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুকে কর্ত্তা পদের নির্দ্দেশ হইলে 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ করণ কারকে উল্লিখিত হইত। শ্রুতি বলিতেছেন—'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' ইত্যাদি অর্থাৎ বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে। এই কর্ত্তৃত্ব জীবের; বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোন বৃত্তির নহে। পূর্ব্ব সূত্রে 'বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়'—ইহাতে করণবিভক্তি যুক্ত হওয়ায়, উহাই বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—কর্ত্তা যদি আত্মাই হয়, তিনি বুদ্ধিযুক্ত হইলেও, বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র হন; তবে তাঁহার জন্য আবার শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা কেন? স্বয়ং আত্মা কখনও কি আত্মঘাতী হইতে পারেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥৩৭॥

উপলব্ধিবৎ (যেমন উপলব্ধি তেমনই করেন) অনিয়মঃ (এই উপলব্ধি অনিয়মিতরূপে হয়)।

আত্মা কর্ত্তা হইলেও, তিনি কর্ম্ম করেন উপাদানাদির

সাহায্যে। এই উপাদানগুলি সর্ব্বদাই বিকৃতি। আত্মা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু উপাদানাদির সাহায্যে তিনি আপনার পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব করিতে পারেন না। উপদানাদির অপেক্ষা থাকা হেতু এবং এই উপাদানাদির ভিতর দিয়াই তাঁহাকে বিষয় উপলব্ধি করিতে হয়, এই হেতু তাঁহার কর্ম্ম কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নহে। উপাদানাদির শোধন ও সাধন আছে। জীবের উপাদান যত স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ হয়, আত্মার প্রকাশও ততই নির্ম্মল ও নিখুঁত হয়। জীব সর্ব্বদাই অনন্ত বিভূচৈতন্য হইতে উপাধিভূত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কর্ম্ম আত্মোপলব্ধির সম্পূর্ণত্বসূচক হয় না। জীব সর্ব্বদাই বিভুচৈতন্যকে প্রকাশ করিতে চাহে। ইহাই জীবের স্বভাব। কিন্তু এই ভাব উপাদানাদি দোষে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না বলিয়া শাস্ত্র-শাসনের উপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রশ্ন হইল—এইরূপ উপাধিভূত জীবের স্বাধীনতা ইহাতে ক্ষুণ্ন হয় না কি? তদুত্তরে বলা যায়—আত্মা উপাধি হইতে পৃথক্। তিনি নিত্যমুক্ত, সৎ-স্বভাবসম্পন্ন। ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশকালে যে অনিয়মতা, তাহাই উপাধিভূত চৈতন্যের স্বভাবক্রিয়া। শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইলে, জীব অধিকতররূপে কর্ম্মকে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করিতে পারেন। গীতায় এই মতবাদকেই সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে :

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততেকামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখম ন পরাম্ গতিম্॥"

যে ক্ষেত্রে জীব আত্ম-প্রকাশ দিব্য করিতে অভিলাষী হন, সেই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই জীবের কর্ম্ম শাস্ত্রানুবর্ত্তী হয়। স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত কর্ম্ম ও উপাদানগুলির অসম্পূর্ণতা হেতু অধিকতর বিশৃঙ্খল ও কদর্য্য হয়। এই সকল কথায় উপাদানগুলির অপেক্ষা থাকায়, আত্মার স্বাধীনতা সপ্রমাণ হয় না। আচার্য্য শঙ্কর আত্মার স্বাধীনতা এই অবস্থায় যে অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা প্রমাণ করার জন্য পাচক, অগ্নি ও কাষ্ঠের উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ রন্ধনক্রিয়া পাচক, অগ্নি ও কাষ্ঠের সহায়তাসাপেক্ষ হইয়াও যেমন বাধা প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মার উপাদানের অপেক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না। জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে, কর্ম্মের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু কর্ম্ম উপাদানাদি গুণভেদে অনিয়মিত হয়, ইষ্টানিষ্টগুণযুক্ত হয়। শাস্ত্র জীবের জন্য নহে, উপাদানাদির শোধনের জন্য চিরদিন উপযোগী। এই হেতু জীব মুক্ত ও স্বাধীন। তাঁর কর্ম্মপ্রকাশের জন্য শাস্ত্রাদির বিধি-নিষেধ অপরিহার্য্য হইল।

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥৩৮॥

শক্তি (বুদ্ধির করণশক্তি) বিপর্য্যয়াৎ (বিপর্য্যস্ত হয়, এই হেতু)।

অর্থাৎ জীব অর্থে বুদ্ধি হইলে, তাহার কর্ত্তৃশক্তি থাকিবে। এইরূপ হইলে, বুদ্ধি অহং-জ্ঞানের গম্য হয়। কেননা, যে কোন প্রবৃত্তি সবই অহং-আশ্রয়ে প্রকাশ হয়। সব কর্ম্মই আমি ও আমার, এইভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি যদি এইরূপ অহমাস্পদ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবে, এমন কার্য্যক্ষম করণের প্রয়োজন। যেহেতু, কর্ত্তা কোন কার্য্যই করণ ভিন্ন সম্পাদন করে না, ইহা প্রত্যক্ষ। জীব যদি বুদ্ধি হয়, তবে ভেদ নামে, কার্য্যতঃ দুই তুল্য। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—আমার বুদ্ধি, আমি বুদ্ধি নহি। এই শ্রুতি-বচনে বুদ্ধির করণশক্তি প্রমাণিত হয়। বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে, শ্রুতিবাক্যের অর্থবৈপরীত্য হওয়া হেতু—বুদ্ধি কর্ত্তা নহে, জীবই কর্ত্তা।

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥৩৯॥

সমাধি (যোগশাস্ত্রোক্ত সংযম) অভাবাচ্চ (আত্মার কর্ত্তৃত্বাস্বীকারে তাহার অভাব হয়, এই হেতু)।

অর্থাৎ আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যা-শিতব্য প্রভৃতি ভাবে আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হয়। এইরূপ শ্রুতির উপদেশ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত সঙ্গত হয় না। শাস্ত্রের সমাধি-বিষয়ক উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়, যদি আত্মার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়। অতএব আত্মাকেই কর্ত্তা বলা উচিত, বুদ্ধিকে নয়।

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥৪০॥

যথা তক্ষা (যেমন সূত্রধর) চ উভয়থা (উভয় প্রকারেই দেখা যায়)।

কি উভয় প্রকার দেখা যায়? সূত্রধর যন্ত্রাদি লইয়া কখনও কর্ম্ম করে, কখনও করে না। এই সূত্রের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। বেদান্তে সমাধির কথা আছে। এই সমাধির জন্য আত্মাই অন্বেষণীয়, আত্মাই বিজ্ঞেয়; এইরূপ বলা হইয়াছে। আত্মাকে অন্বেষণ করার জন্য বুদ্ধ্যাদি করণের আশ্রয়ে আত্মার কর্তৃত্বই পূর্ব্ব সূত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি উপাধিযুক্ত আত্মারই কর্তৃত্বাদি গুণ আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি ইহাও বলিতেছেন—'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহ দ্রষ্টা নাই। জীব হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখার নিষেধও শ্রুতিতে আছে। শ্রুতি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—'যত্র হি দ্বৈতমিবভবতি তদিতরংপশ্যতি' অর্থাৎ যখন আত্মা দ্বৈতের ন্যায় হন, তখন তিনি ভিন্ন বস্তু দর্শন করেন। ইন্দ্রিয়াদিগুণসংযুক্ত আত্মার অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাহভূত্তৎ কেন কম্পশ্যেৎ ইতি' যখন এই সকলই আত্মা হন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে? উপাধিভূত আত্মার কর্ম্ম আছে, উপাধি হইতে বিমুক্ত পরমাত্মার কর্ম্ম নাই। উপরোক্ত সূত্রে সূত্রধরের দৃষ্টান্তে তাহাই বলা হইতেছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-দর্শনের জন্যই এইরূপ দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইয়াছে। সূত্রধর যন্ত্রাদি লইয়া যখন কর্ম্ম করে, তখন তাহার এক অবস্থা; আর যখন সে কর্ম্ম করে না, তখন তাহার অন্য অবস্থা। উপাধিভূত জীবাত্মার অবস্থা যন্ত্রাদি লইয়া সূত্রধরের কর্ম্ম করার অবস্থার সহিত তুলিত হইয়াছে। আর যখন সূত্রধর কর্ম্মবিরত থাকে, তখন তাহার সেই অবস্থার সহিত পরমাত্মার অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্র-ব্যাখ্যায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যন্ত্রাদি ব্যতীত সূত্রধরের কার্য্য যেমন সম্ভব নয়, তেমনই মন প্রভৃতি করণ ব্যতীত পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হন। আত্মা নিরবয়ব, উপাধিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্করের এই সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যায়, আমরা পরমাত্মাকে কর্ম্মহীন কেবল চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানি। ইহা হইতেই মধ্য যুগের ভারত জড় সমাধিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছে। যদি এমনই হইবে, তবে ব্যাসদেব কপিল-সূত্রের প্রতিবাদ করিবেন কেন? সাংখ্যসূত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাই প্রমাণিত হইয়াছে। কর্ম্ম থাকিলে যদি পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, জীবের তাহা দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বের প্রমাণস্বরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মসূত্রগুলি নাকচ করিতে হয়। জীব কি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র? জীবের যে স্বরূপগত শক্তি, তাহা কি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র? জীব যে উপাধি-সংযোগে বৈচিত্র্যময় হইয়াছেন, সেই ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের মূলে পরমাত্মার কি যুক্তি নাই? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মময় জগৎ শুধুই ভাব, তাহার মধ্যে বস্তুতন্ত্র সত্য কিছুই নাই বলিতে হইবে। জীব উপাধিবৈচিত্র্যে কর্ম্ম করেন, ইহাই তাঁহার জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা। যন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সূত্রধরের যে বিশ্রামসুখ, তাহা নৈষ্কর্ম্ম্যমূলক; ব্রহ্মসূত্রে এমন কথা বলা হয় নাই। চৈতন্য নিরুপাধিক হইলে, সুষুপ্তি অবস্থায় দ্বন্দ্বহীন আনন্দের ভোক্তৃত্ব পরমাত্মায় না থাকিবার হেতু নাই পরবর্ত্তী সূত্রে এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪১॥

(তু-শব্দ জীবের কর্ম্মস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে প্রতিপাদনার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা) পরাৎ (পরমেশ্বর হইতেই সমস্ত হয়) তচ্ছ্রুতেঃ (এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে)।

কার্য্য, করণ, সংঘাত ও অবিবেক প্রভৃতি দ্বারা জীবের যে কর্তৃত্বাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার মূলে ঈশ্বরের কারণতা আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—'এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম করিষ্যতি তং যমধো নিনীষতে' ইতি অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ লোক হইতে উচ্চ লোকে যিনি উন্নীত হন, ঈশ্বরই তাঁহাকে সাধু কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, আর যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান।

এ বড় অদ্ভুত কথা। লোকতঃ শুনা যায় যে 'যেমন করান তেমনই করি', পাপ-পুণ্যের ভাগীদার স্বয়ং ভগবান। কেহ সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণভূষিত, সর্ব্বজনমান্য; আর কেহ বিদ্বেষী, পরপীড়ক, হিংস্র, সর্ব্বজনঘৃণ্য; ইহাতে কি ঈশ্বরের বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়তা দোষ স্পর্শ করে না? সূত্রকার বলিতেছেন—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধা-
বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥৪২॥

(তু-শব্দ উপরোক্ত ঈশ্বরের প্রতি দোষনিবারণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত প্রযত্নের অপেক্ষা থাকা হেতু ঈশ্বরে দোষ স্পর্শ করে না) [কুতঃ? কেন এমন হয়?] বিহিত প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিধি ও নিষেধমূলক শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয় হেতু)।

পরমেশ্বর কর্ত্তা, প্রেরয়িতা। জীব উপাধিভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। শাস্ত্র কর্ম্মের বিধিনিষেধ নির্দ্দেশ করে। জীব তদ্দ্বারা স্ব-স্ব করণাদির সাহায্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত করার প্রযত্ন করে। উপাদানাদির গুণভেদে জীবের প্রযত্নের ইতরবিশেষে, কর্ম্মভেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম উপস্থিত হয়। ইহার ফলেই জীবের উচ্চ ও অধোগতি নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার অংশবিশেষকে এইরূপ লীলায় নিয়োজিত করিয়াও, আনন্দময়রূপে অবস্থান করেন। তাঁহাতে বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ স্পর্শ করে না, নির্ম্মল ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বেদবাক্যের সার্থকতাও রক্ষিত হয়।

জীব অংশ। ঈশ্বর ভূমা। অংশের প্রযত্ন একদিকে ঈশ্বরাধীন প্রেরণাস্বরূপ, অন্য দিকে উপাদানাদির অপেক্ষাও তাহার আছে। ইহাই সৃষ্টিবিজ্ঞান। জীবের একটা দিক্ ঊর্দ্ধমূল, অন্য দিক্ পল্লবিত, কুসুমিত, অধঃশাখ। এক দিকে অমৃত, অন্য দিকে গরল-সমুদ্র। শাস্ত্রবিধি-নিষেধের দ্বারা জীবের কর্ম্ম নিয়মিত করে সর্ব্বক্ষেত্রে এই নিয়ম স্বীকৃত নয়। ক্ষেত্র একই, কোথাও ধান্য, যব, কলাই, মুগ প্রভৃতি বিচিত্র শস্য ও ফলাদির ন্যায়, জীবের বৈচিত্র্য রূপের জগতে সংঘাত সৃষ্টি করে, সুখ-দুঃখের স্পন্দন তুলে—কিন্তু স্বরূপের ক্ষেত্রে চোলাই করিয়া যাহা উপনীত হয়, তাহা অমৃত, তাহা আনন্দ। জীবের ক্ষেত্রে যাহা হয়, পরম ব্রহ্মে তাহা অজ্ঞাত নহে; কিন্তু সেখানে সকল বৈষম্য সমীকৃত হইয়া একাকার হইতেছে—এই লীলারহস্য উপলব্ধিগম্য না করিয়া জীবের বৈষম্যে পরমাত্মায় বৈষম্যদোষদৃষ্টি হয়।

অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব-
মধীয়ত একে ॥৪৩॥

অংশ (জীব ব্রহ্মের অংশ) নানা ব্যপদেশাৎ (নানা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে) অন্যথা চ অপি (প্রকারান্তরে অভেদ ভাবও দেখান হইয়াছে) একে (কোন কোন কোন শ্রুতিতে) দাশকিতবাদিত্বম্ (দাশ ও কিতব প্রভৃতি রূপে ব্রহ্ম অবস্থান কল্পে) অধীয়তে (এইরূপ পাঠ হইয়া থাকে)।

অতঃপর জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নিরাকৃত হইতেছে। ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন। ব্রহ্মই ভোক্তা ও কর্ত্তা। ব্রহ্ম ও জীবের ভোগপ্রভেদ আছে। জীব অবয়বী। অবয়ব নশ্বর বা পরিবর্ত্তনশীল। জীব যাহা ভোগ করেন, তাহা করণাদির সহিত যুক্ত হইয়াই সম্পন্ন হয়; অতএব ভোগাদি বিশেষরূপে অনুভূত হওয়া অসঙ্গত কথা নহে। জীবের এই ভোগ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। তিনি করণাদি-নিরপেক্ষ হইয়া অসীমের মধ্যে বিশ্বের ভোগ গ্রহণ করেন, ভোগের বিশেষ ভাব সেখানে প্রকাশ পায় না। সামান্য বলিয়াই পরমেশ্বরকে আনন্দভুক্ আখ্যা দেওয়া হয়। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভোগপার্থক্য যেমন আছে, তেমনই অস্তিত্বের পার্থক্যও অসমীচীন নহে। তাহা কিরূপ, বক্ষ্যমাণ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। পরন্তু ঈশ্বর ও জীব উভয়ই অজ। শ্রুতিবাক্যে জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ উপদেশও যেমন আছে, আবার তদ্রূপ ভেদও প্রদর্শিত হইয়াছে। ভেদ-দর্শনের শ্রুতিবাক্য যথা—'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি' যিনি আত্মায় অবস্থিত ও অন্তঃস্থিত থাকিয়া আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহা ভেদ-নির্দ্দেশক। এই ভেদ প্রভু ও ভৃত্যসম্বন্ধের ন্যায়। ব্যাসদেব বলিতেছেন—তাহাই বা সবখানি সত্য কেমন করিয়া হইবে? অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মসূক্তে আছে "ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত" ইত্যাদি। দাশেরা ব্রহ্ম। দাসেরা ব্রহ্ম। কিতবেরা ব্রহ্ম। প্রথম দাশ কৈবর্ত্তকে বুঝায়, দ্বিতীয় দাসের অর্থ ভৃত্য। কিতব যাহারা 'জুয়াখেলে। শ্রুতির এই বাক্যে বুঝায়—ব্রহ্ম সর্ব্বভূতেই আছেন, তাঁহার অবস্থিতি জাতিনির্ব্বিশেষে অক্ষুণ্ণ। শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ' অর্থাৎ তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া যষ্ঠি

ধারণপূর্ব্বক গমন কর, তুমি জন্মগ্রহণ কর, তুমি সর্ব্বমুখ। এই সকল শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের সহিত জীবের অংশাংশী ভাবই সিদ্ধ হয়। যাহা অংশে, তাহা অংশীরই গুণকর্ম্ম বলিতে হইবে। এই জন্য জীবের কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম। এই জ্ঞানই মোক্ষ বলিলে জীবত্বের প্রতি হেয় জ্ঞান হয় না এবং শাস্ত্র-মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

অংশকে অংশীর জ্ঞানে নিয়মিত রাখার অন্তরায় অংশের উপাধিযুক্তত্ব। উপাধিযুক্ত জীব স্বরূপজ্ঞান রক্ষা করিলে, কর্ম্ম পূর্ণ ও অপূর্ণ উপাদানবৈচিত্র্য হেতু যাহাই হউক, তাহার জন্য দায়ী নহেন। শ্রুতি বলিতেছেন—অংশকে বা জীবকে পরম ধাম বা পরম গতি দিবার জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধু কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। এই সাধু কর্ম্মই 'শাস্ত্রনিবদ্ধ'। যে শ্রেণীর জীব শাস্ত্র-বিধি-সম্পন্ন হয়, সেই শ্রেণীর জীবেরই ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। যেখানে ইহার অন্যথা হয়, সেখানে জীবের অধোগতি। গীতায় এই জন্য সুরাসুর জীবের শ্রেণীভেদ আছে। উপাধিভূত জীবচৈতন্যে এই গতিভেদ বিষম বলিয়া মনে হইলেও, ঈশ্বরে তাহা হয় না। এই কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরেও বলা হইবে। এক্ষণে জীব যে ব্রহ্মের অংশ, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মচৈতন্য অভিন্ন, তাহা সপ্রমাণ করা হইতেছে।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥৪৪॥

মন্ত্রবর্ণাৎ (মন্ত্র বৈদিক শ্লোক) বর্ণাৎ (বর্ণনা-বিশেষের দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, এই হেতু) অর্থাৎ বৈদিক শ্লোকে জীবকে অংশই বলা হইয়াছে—'যথা তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' এতাবৎ সমুদয় প্রপঞ্চ বিরাটের মহিমা। পুরুষ তাহার জ্যেষ্ঠ। সমুদয় ভূত তাহার একপাদ তাহার ত্রিপাদ দ্যুলোক এবং অমৃত। পাদ অর্থে অংশ অতএব মন্ত্রবর্ণনায় জীবের অংশত্বই প্রতীত হইল।

(ক্রমশঃ)

সুন্দরের অশ্রু

এস, ওয়াজেদ আলি, বি.এ. (কেণ্টাব) বার-এট্-ল

স্ফটিক ঐ জলের ধারা,
কত ভাবে এঁকে বেঁকে,
পাষাণের বুক চিরে
বের হয় শেষে।

ভাবের স্বর্গীয় ফুল,
শক্ত কত আবরণ ছিঁড়ে,
মুখ খুলে শেষে,
দেখা দেয় এসে!

কুৎসিৎ সুন্দরকে
রাখতে চায় চেপে,
অন্ধকার চায় সদা
আলোকে ঢাকিতে;

শ্রেয়ের নির্য্যাতন
চলে তাই সদা,
কুৎসিৎকে তাই
দেখিগো হাসিতে!

এ ভাবেই সদা,
চলিবে জীবন,
সুন্দরের চোখ
অশ্রুতে ভাসিবে;

শুভ্র মুক্তার মত,
অশ্রুর ধারা তার,
মহামূল্য হার সম
গলায় শোভিবে!

চন্দ্রনাথ তীর্থ

শ্রীমতী সুধা চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৭ সাল। পূজোর ছুটীতে মাসখানেক শিলং বাস করে' বহু কালের অভিলাষ চন্দ্রনাথ তীর্থ-দর্শনের মানসে রওনা হলাম। শ্রীহট্ট-কুলাউড়া-লাকসাম হয়ে চাঁদপুর-চট্টগ্রাম লাইনের সীতাকুণ্ডু ষ্টেশনে এসে নামলাম। ভোরের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে।

ছোট্ট ষ্টেশন। লটবহর নিয়ে এখন কোথায় উঠি, তাই হ'ল ভাবনা। একমাত্র সঙ্গী স্বামীর (অধ্যাপক নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়) ইচ্ছা ডাকবাংলোয় আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু কুলির সুপারিশে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মশালায়ই গিয়ে উঠলাম।

আসাম রেলপথের একটি টানেল

ব্যাস কুণ্ডু: স্নানের ঘাট

ষ্টেশনের অনতিদূরেই ধর্ম্মশালা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোতালার একটি প্রশস্ত কক্ষ আমাদের জন্য ব্যবস্থা হ'ল। অবাধ আলো-বাতাস। খাট, টেবিল, চেয়ার কিছুর অভাব নাই। ঘরে ঢুকেই সারা রাত্রির ক্লান্তি যেন এক মুহূর্ত্তে অপনীত হ'ল। পশ্চাতে দিগন্তবিস্তৃত সমতল ভূমিতে শ্যামলিমার ঢেউ; আর সামনে থরে থরে সাজানো সবুজ পাহাড়। সহজভাবেই মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

ধর্ম্মশালার মালিক ও চন্দ্রনাথের সেবায়েত রায় সাহেব হরকিশোর অধিকারী মহাশয় আমাদের তীর্থযাত্রার সব ব্যবস্থা করে' দিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রায় দুই মাইল পথ হাঁটার পর ক্রমশঃ চড়াই সুরু হ'ল। পথিপার্শ্বের দোকান থেকে গঙ্গা জল, ফুল, বিল্বপত্র, পৈতা, সোণার বিল্বপত্র, রূপার ত্রিশূল, মিষ্টি প্রভৃতি পূজার উপকরণ কিনিয়া নিলাম। প্রথমেই পড়লো ব্যাসকুণ্ডু। প্রবাদ, এই কুণ্ডের তীরে মহামুনি ব্যাসদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে বেদব্যাসের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি বিরাজমান। পাণ্ডার মুখে শুনলাম, এখানে নাকি ভক্ত কবি জয়দেবও কিছুদিন এসে বাস করেছিলেন। কল্পনার পটে সমস্ত পুরাণখানি যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো।

এইখান থেকেই সত্যিকার খাড়াই যে সুরু হ'ল, তা' চলার ক্লান্তি থেকেই বেশ অনুভব করতে লাগলাম। একটু দূরেই সী তা কু ণ্ডু। মন্দিরে সীতা-দেবীর বিগ্রহ নিত্য পূজিত হচ্ছে। মন্দিরের সামনে কুণ্ডু এবং তারই পাশে সীতাদেবীর পদচিহ্ন পাথরে খোদিত। জন-শ্রুতি এই যে, বনবাসকালে তীর্থ-পরিক্রমায় শ্রীরামচন্দ্র এই অঞ্চলে আগমন করলে ভার্গব মুনি সীতাদেবীর স্নানের জন্য যোগবলে এই চতুর্হস্ত পরিমিত কুণ্ডের সৃষ্টি করেন। বহুকাল এই তীর্থ বিলুপ্ত ছিল। ত্রিপুরার মহারাণী রত্নমঞ্জরী দেবী ইহার পুনরুদ্ধার করেন। মন্দিরের পাশেই একটি পাহাড়ের ফাটল দিয়ে অনির্ব্বাণ আগুন জ্বলছে। বিমুগ্ধ নরনারীর ভীড়ের মধ্যে আমি সবিস্ময়ে সেই অগ্নি স্পর্শ করলাম।

আরও খানিকটা এগিয়ে ভবানী দেবীর মন্দির। পথি-মধ্যে পড়লো রামকুণ্ডু, লক্ষ্মণ কুণ্ডু ও হনুমানের মন্দির। ভবানীমন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পম্পা নদীর তীরে সতীর দক্ষিণ হস্ত বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে পড়ায় ইহা পুণ্য পীঠস্থান বলে' পরিগণিত। কলিকাতা-বেহালাস্থ সাহাপুরের জমিদার হীরালাল দাস বারিক মহাশয় ভগ্নপ্রায় ভবানী-মন্দিরের সংস্কার সাধন করে' ইহাকে ধ্বংসের হাত

হ'তে রক্ষা করেছেন। এই মন্দিরের সন্নিকটেই জ্বালাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী। এখানেও একটি পাহাড়ের ফাটল হতে অনর্গল অগ্নিশিখা বের হচ্ছে দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলাম।

মনোরম পরিবেশ। আশে পাশে সবুজঘন নিবিড় বনানী, বিচিত্র পাখীর কলতান, মৌমাছির গুঞ্জন, ঝিঁঝিঁর একটানা সানাই বাদনে মনে হ'ল, নিসর্গ-রাণী যেন তাঁর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে' ধরেছেন। অতীত হিন্দু-ভারতের স্মৃতিবিজড়িত অনাড়ম্বর নিরালা তীর্থ, যুগ-যুগের সহস্র নরনারীর অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য, কত দানবীরের অজস্র অকৃপণ দান, প্রকৃতির নিগূঢ় লীলা-রহস্য স্মরণে, মননে আর দর্শনে তন্ময় হয়ে পথ চলেছি। সঙ্গী স্বামী ভূতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক। তিনি মাটি-পাথর কুড়ুচ্ছেন, পরীক্ষা করছেন আর সংগ্রহ করছেন। চিন্তার তাঁরও অন্ত নাই। নীরবতা ভেঙ্গে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সৃষ্টির এই অপার মহিমা আমায় যেন কেমন উন্মনা করে' তুলছে। মনে হয়, এরা আমার বড় আপন—নিত্য যুগের চলার সঙ্গী। সত্যি আমি আনন্দে যেন দিশাহারা হ'য়ে পড়ছি।"

"দিশাহারা হবার আর কি আছে! এ সবেরই চমৎকার—চমৎকার ইতিহাস আছে। তুমি তা জান না তাই"—বলে' তিনি আমাকে বোঝাতে সুরু করলেন, "প্রায় দু' কোটি বছর আগের কথা। উত্তরে শিলচর-ডিগবয়, পশ্চিমে গারো-খাসিয়া পাহাড় আর দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এ অঞ্চল সবই সাগরগর্ভে লীন ছিল। সমুদ্রের তলে পলি-বালি-কাদা কত শত সহস্র বছর ধরে' যে জমেছে, তার ঠিক নেই। একদা প্রলয়ের ফলে জল গেল সরে', বালি-কাদা ফুলে' হ'ল পাহাড় আর কালে কালে তাই জমে হয়েছে পাথর। এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে, বলো?"

রহস্য ক'রেই বললাম, "আর তুমি বুঝি দূরবীণ হাতে গারো পাহাড়ের চূড়ায় বসে' যুগ যুগ ধরে' তাই দেখে নোট করছিলে?"

"তা' হবে কেন? সভ্য মানুষের বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার আলোই তাকে কোটি কোটি বছরের অতীত অন্ধকারের গর্ভে পথ দেখিয়ে দিয়েছে"—বলতে বলতে তিনি বালিপাথরের একটা টুক্‌রো ভেঙ্গে ছোট ঝিনুকের খোলা বের করে' বললেন, "এই দেখ ঝিনুকের চিহ্ন, এ সব সেই যুগে সমুদ্রের জলে ছিল।"

তর্ক না বাড়িয়ে বললাম, "আচ্ছা, তা' যেন ছিল। কিন্তু পাথরের ফাটলে চিরযুগ ধরে' এই যে আগুন জ্বল্‌ছে তা কি করে সম্ভব?"

"সোজা, অতি সোজা কথা।" তিনি তন্ময় হয়ে ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন, "মাটি ও পাহাড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মদেশ ও আসামে খনিজ তৈলের উৎপত্তি হয়। এখন বহু স্থানে অনেক মাটির নীচে তার সন্ধান মিল্‌ছে। এই ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়মের গ্যাসই ইহার প্রধানতম

সীতাকুণ্ড: ঘাটে উপবিষ্টা লেখিকা

হেতু। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বাড়বানল ও সুদূর পাঞ্জাবের জ্বালামুখী তীর্থেও এইরূপ তৈল-গ্যাস বহুকাল ধরে' জ্বল্‌ছে।"

আমি নীরবে হাস্‌ছি দেখে একটু যেন উত্তেজিত হয়েই তিনি বললেন, "তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না! আচ্ছা, চল, জ্যোতির্ম্ময়ীর আগুন পরীক্ষা করে' প্রমাণ করে' দিচ্ছি।"

বললাম, "থাক, কলেজে গিয়ে ও-সব প্রমাণ ক'রো, আমি তো আর তোমার ছাত্রী নই। আমার ভাবভঙ্গ করে তীর্থ-দর্শন ব্যর্থ ক'রো না।"

তর্কে-বিতর্কে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। সামনের পাহাড়ে দেবাদিদেব স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির। খাড়াই উঠতে হাঁপিয়ে উঠলাম। জনমানবহীন নির্জ্জন মন্দির-বারান্দায় পুরোহিত একা বসে'। স্বয়ম্ভূনাথের পূজা দিলাম। মন্দিরের হিম-স্নিগ্ধ আব্‌হাওয়ায় শ্রান্ত তনু আপনা হতেই জুড়িয়ে এল। পূজারী দেবাদিদেবের মহিমা কীর্ত্তন করলেন: "স্বয়ম্ভূনাথ আপনা হতেই এখানে আবির্ভাব হ'ন। একদা শৈবশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার মহারাজা ধন্য মাণিক্য বাহাদুর এই মহামহিম শিবমূর্ত্তির সন্ধান পেয়ে লিঙ্গকে স্বরাজ্যে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও লিঙ্গকে নড়াতে সক্ষম না হওয়ায়, অবশেষে এখানেই এই

ভবানী দেবীর মন্দির

স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির

মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রঙ্গপুর রাধা-বল্লভের জমিদার অন্নদা প্রসাদ সেন মন্দিরের সংস্কার, ভোগঘর ও বিশ্রামাগার তৈরী করে' দিয়ে অনেক সুবিধা করে দিয়েছেন।"

সদ্য কাটা বাঁশের লাঠী ভর দিয়ে চড়াই চড়তে লাগলাম। রীতিমত কষ্ট হতে লাগলো। তবুও চন্দ্রনাথ-দর্শনের আকুল আগ্রহ যেন বুকে বল সঞ্চার করতে লাগলো। পথে পড়লো গয়াক্ষেত্র ও শ্রীজগন্নাথের মন্দির। ময়দানে বা সহরের কোলাহলে এ-সব নগণ্য দর্শন হলেও, এই গভীর অরণ্যে ইহাই যেন কত মহিমামণ্ডিত! খানিকটা এগিয়ে আসল পথ ছেড়ে একটি পা-পথ ধরে' উনকোটি শিব দেখতে চললাম। কঙ্করময় পাহাড়ের পাষাণ গুহাগাত্র ঝরণার জলবিধৌত হ'য়ে উনকোটি শিব-লিঙ্গের আকারই ধরেছে। জায়গাটি যেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি নির্জ্জন। নির্জ্জনতা যেন অনুভব করা যায়। এই ঝরণার জল জমিয়ে পাইপে নীচে সরবরাহ করা হচ্ছে। আমরা অঞ্জলি ভরে' বরফের মত ঠাণ্ডা জল পান করে' তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

পুনরায় ফিরে' প্রধান রাস্তায় এসে পড়লাম। এখান হতে রাস্তা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দুই গা-বাহিয়া পর্ব্বতশীর্ষে মূল মন্দিরকে কেন্দ্র করে' মিলিত হয়েছে। একটি পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো রাস্তা উঁচু দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সোজা খাড়া উঠে গেছে। সাতশো সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা খুব আরামের নয় ভেবে' এই পথে ফিরে' আসার মনঃস্থ করলাম। বিপুল ব্যয়ে এই পথ-নির্ম্মাণ খড়দহ বিশ্বাস বংশের এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। পরে টাকির জমিদার সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী, কলি-কাতার ধনী ব্যবসায়ী সতীশচন্দ্র ঘোষ ও বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব্‌ বাহাদুর এই সিঁড়ি-পথকে স্থায়িত্ব প্রদান করেছেন। যে পথটি বিরূ-পাক্ষের মন্দির হয়ে চন্দ্রনাথ গেছে, আমরা সেই পথ ধরে' রওনা হলাম। এই দুর্গম পথকে রংপুর ডিমলার রাণী বৃন্দারাণী চৌধুরাণী বহু অর্থব্যয়ে সিঁড়ি, লোহার সেতু, রেলিং প্রভৃতির দ্বারা অনেকটা সুগম ক'রে দিয়েছেন। বিরূপাক্ষের মন্দির চত্বরে সারা শরীর এলিয়ে পড়লো। ভাবছি আর এগুতে পারবো কিনা, এমন সময়ে কাণে এল কারা যেন সমগ্র মন-প্রাণ ঢেলে কাতর মিনতি জানাচ্ছে, "জয় বাবা চন্দ্রনাথ, দেখা দাও।" একটু পরেই একদল যাত্রী এল। সঙ্গে জন দুই ন্যুব্জ বৃদ্ধা, কোন রকমে যেন বুকে হেঁটে চলেছে। তীর্থ-দর্শনের এই তপস্যায় নির্জ্জীব দেহ-মনে আমার যেন শক্তি ফিরে' এল। মনে হ'ল, এই সব তীর্থস্থানগুলি যদি এরূপ দুর্গম প্রাকৃতিক

পরিবেশের মধ্যে না প্রতিষ্ঠিত হ'ত, তবে এর কোন মাধুর্য্যই হয়তো থাকতো না।

বিরূপাক্ষ মন্দির হ'তে টিলার বাঁক ঘুরে' আবার সেই আগের রাস্তায় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগলাম। কোথাও সিঁড়ি ভেঙ্গে, কোথাও অতল খাড়াইয়ের উপরের সেতু পেরিয়ে আঁকা-বাঁকা সর্পিল পথ বেয়ে চলেছি। অনভ্যস্ত পদদ্বয় অবশ হয়ে আস্‌ছে, নেহাৎ অপারগ হ'লে মাঝে মাঝে পতিদেবতা তীর্থ-দর্শনের এই তপস্যায় সাহায্য করছেন। স্থানে স্থানে একপেয়ে রাস্তা, উপরে গগনস্পর্শী খাড়াই আর নীচে অতলস্পর্শী গভীর খাদ। নয়ন মেলে চেয়ে দেখতেও হৃদ্‌কম্প হয়। মনে হ'ল বুঝি—আর পারি না। কিন্তু দেবতার দয়া হ'ল। অবশেষে পথের শেষে আমরা ১৩০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতশীর্ষে চন্দ্রনাথের শ্রীমন্দিরে পৌঁছলাম।

পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এক নিমিষেই সব পথক্লেশ দূর হ'ল। সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ মৃদু পবন চামর ব্যজন করে' চলেছে। সারা চিত্ত-মন ভরে' গেল। সত্যিই অনুভব করলাম, যেন কিছু পেয়েছি। মুক্তির আনন্দে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নৃত্য জুড়ে' দিল।

উনকোটি শিবের মন্দির

বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির

সাম্‌নে সমতলের তরঙ্গায়িত সবুজের মেলা অনন্ত-বিস্তার সাগর বেলায় গিয়ে মিশেছে। পশ্চাতে নয়ন-মনোহর দিগন্তপ্রসারিত ঘন বনানীর অপরূপ দৃশ্য। উপরে অসীম স্বচ্ছ নীলাকাশ। এমনি মনোরম পরিবেশের মধ্যে চন্দ্রনাথের মন্দির তুচ্ছ হলেও, অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ। শরীর-মন সহজ ভাবেই ধ্যানমগ্ন হ'য়ে আসে। আত্মাকে মুখোমুখি অনুভব করা যায়। অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ মৌন বসে' রইলাম। তারপর নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে চন্দ্রনাথের পূজা করলাম। আত্ম-সমর্পণের এ তৃপ্তি ভুলবার নয়।

আশে-পাশে ঘুরে-ফিরে' দেখলাম। উনি কয়েকখানি ফটো নিলেন। আর বাইনকুলার-যোগে সুদূরের ঐ সাগরপারের শোভা দেখতে লাগলাম। দেখেও তৃপ্তি নেই। ছবির মত কুটীর-পল্লী আর তারই পাশে পাশে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। হেথা হোথা বৃক্ষরাজীর মাঝে মাঝে মন্দিরচূড়া। গিরিনিতম্বে দোদুল্যমান পথের রূপালি হার অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রে ঝলমল করছে। সত্যিই বাংলা মায়ের এত রূপ! বার বার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, বাংলার এই পূর্ব্ব প্রত্যন্ত তো খুব বেশী দূর নয়, কিন্তু ক'জন শিক্ষিত আধুনিক আসে!

সব চেয়ে এখানকার পুরোহিতের ব্যবহার লক্ষণীয়। এতটুকু উৎপীড়ন নাই, ছলনা নাই। পূজারী সাগ্রহে অনেক গল্প করলেন, চন্দ্রনাথের ইতিহাস মুখে মুখে বললেন। ত্রিপুরার মহারাজ-বংশের ইতিহাস এই সব তীর্থগুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই রাজবংশের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তিতে মন্দিরের আজও ব্যয়নির্ব্বাহ ও তত্ত্বাবধান চলছে। দেড়শো বছর পূর্ব্বে হাজার দশেক টাকার মুনাফার দেবোত্তর সম্পত্তির ভার মোহান্তের এবং দেব-সেবাদির ভার সেবায়তের উপর দেওয়া হয়েছে, বলে' পুরোহিত বললেন।
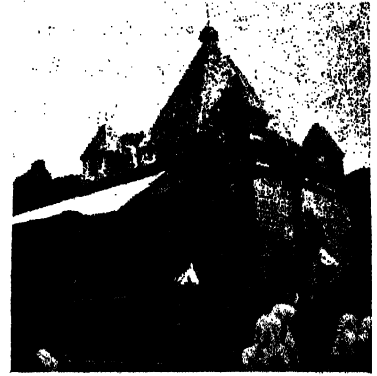
মন্দির প্রদক্ষিণ করে' নীচে নামলাম। নিকটেই 'বুদ্ধকূপ'। বুদ্ধদেবের একটি অঙ্গুলী নাকি এই পাহাড়ের চূড়ায় প্রোথিত আছে। পূজারী বললেন, প্রতি বছর চৈত্র মাসে বহু বৌদ্ধ এখানে আসেন এবং বুদ্ধকূপে দীপ-দান ও ধ্বজা উড়িয়ে যান। মৃত আত্মীয়-স্বজনের -

অস্থিও বুদ্ধেরা পবিত্র কূপে নিক্ষেপ করে' থাকেন। কূপকে উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে রওনা হবার মুখেই একটি স্মৃতি-

শ্রীচন্দ্রনাথদেবের মন্দির

স্তম্ভের উপর দৃষ্টি পড়ল। পাষাণের গায়ে খোদা রয়েছে—

মৃত্যু নহে বিচ্ছেদ, চিরমিলনের দ্বার।
প্রাণাধিক পুত্র নিমায়ের পুণ্য স্মৃতি।
জন্ম ১৩২৬, মোক্ষ ১৩৩০।
তোমারি মা, বাবা। হেমনগর।

সন্তানহারা মা-বাপের বেদনা যেন মূর্ত্তি নিয়ে সামনে দেখা দিল। মনের পটে ব্যথার অক্ষরে এক সুকরুণ বিয়োগান্ত কাহিনী সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভাব-বৈচিত্র্যের এক অভূতপূর্ব্ব আস্বাদ হিয়ার গোপন পুর রাঙিয়ে যখন নিত্যদিনের এই কোলাহলের জগতে আবার নেমে এলাম,
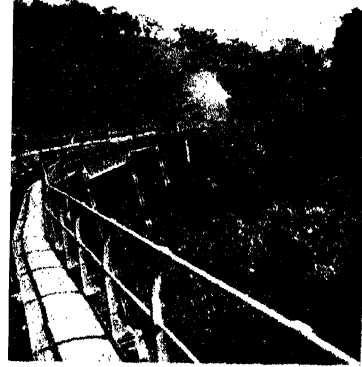
আসাম রেলপথে লোহার সেতুর উপর দিয়া ট্রেণ-গমনের দৃশ্য

তখন অস্তরবির রক্তরাগ বাইরের পশ্চিমাকাশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

নবীন মন্ত্রে পাষাণ দেবতা জাগ্রত হবে তোর,
বিশ্ব-দুয়ারে হান করাঘাত, কাল নিশি হবে ভোর।
মন্দিরদ্বারে কাঁসর-ঘণ্টা, পূজার অর্ঘ্য থালা,
কেন মিছে আর করুণ হৃদয়ে নয়ন-অশ্রু ঢালা।
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্ম-দেবতা মূর্ত্ত জ্যোতির্ম্ময়
চেয়ে দেখ সেথা কিবা সে সাধক, কিবা তার পরিচয়।
দুখের দেউলে অলস পূজারী তোর ধ্যানে নাহি প্রাণ;
পাষাণ ভিতরে কেমনে জাগাবি সর্ব্বশক্তিমান্?
নয়ন মুদিয়া বেদীর সমুখে জোড় করে বসি' হায়
অশ্রুধারায় দিনগুলি তোর তিমির-তলে বয়ে যায়।

চারি ধারে নিরলস পূজা আরতি-ছন্দঃ লোভে
চেয়ে দেখ ওরে কর্ম্মের মাঝে অপরূপ দেব শোভে।
ওরে ও বেভুল পূজারী, আমার শূন্য যে দেবালয়,
ওঙ্কার ধ্বনি কাহারে শুনালি, কারে দিস্ ফুলচয়?
ভুলে যে গেছিস্ পূজার সাধনা, আর সে শকতি নাই;
পূজা-মন্দিরে সে রূপ জাগাতে নূতন মন্ত্র চাই।
ওই শোন ওই বিশ্ব-দেউলে মঙ্গলময় বাণী
কর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিতে শুনায় মন্ত্রখানি।
দেবতা কহেন, কর্ম্ম-ধেয়ানে আমায় করিলে জয়—
জাগিব সেথায় মন্দির মাঝে আমি যে সর্ব্বময়।

চৌদ্দ
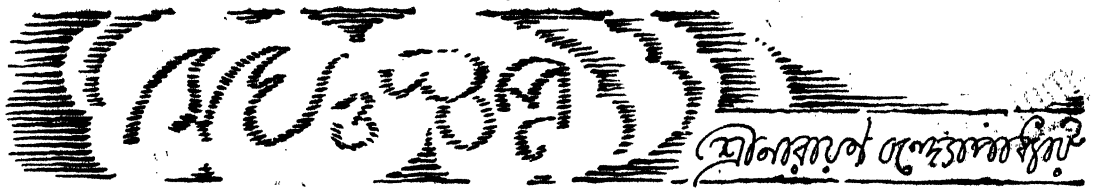
[অগ্রপরিচায়িকা :—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী গার্গীর জীবনে আধুনিক বাঙলার বিখ্যাত লেখক বিদ্যুৎ বসু একদা প্রবল আলোড়ন এনেছিল, কিন্তু বিচলিত করতে পারেনি। গার্গী বিচলিতা হ'ল সেদিন, যেদিন হঠাৎই বিদ্যুৎ কিছু না ব'লে নিরুদ্দেশ হ'ল। সন্দেহ নেই, বিদ্যুতের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় গার্গী মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের এই খামখেয়ালী জীবনের ঔদাসীন্য তাকে নিদারুণভাবে পীড়া দিত।

অন্য দিকে গার্গীর জীবনে 'কুমারী-কল্যাণ-সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাত্রী মঞ্জুদি'র প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। মঞ্জুদি' বিদ্যুতের এই আকর্ষণকে স্বীকার করতেন না, বরং বিদ্যুৎ যে একদিন গার্গীর জীবনে ক্ষতি করবেই, এ কথা বারে বারে জানিয়ে দিতেন। একদা কোমল মঞ্জুদি'র এই কঠিন রূপের ভিত্তিমূলে ছিল তাঁর অতীত জীবনের কয়েকটী মর্ম্মান্তিক ঘটনা।

অধ্যাপিকা মল্লিকা মল্লিক ছিলেন মঞ্জুদি'র অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী এবং সহকর্মিণী। নাট্যকার নলিনীকান্ত তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। সঙ্ঘকর্মিণীদের মধ্যে গার্গীর বান্ধবী আভার নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে গার্গী মঞ্জুদি'র প্রচুর স্নেহ এবং বিদ্যুতের গভীর ভালবাসা যুগপৎ এই দ্বৈধ আকর্ষণে বিপর্য্যস্ত।

গার্গীর শৈশব জীবনে তার পিতা এবং মাতার দৃঢ় আদর্শবাদ কঠিন ভিত্তি গড়েছিল। পিতা ছিলেন এস, ডি, ও। গার্গীকে তিনি তার 'গার্গী' নামের উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। দৃঢ় আদর্শবাদী সংস্কারমুক্ত স্বামীর এই কল্যাণময় উদ্দেশ্যে গার্গীর মা'র পূর্ণ সমর্থন ছিল। একদা আকস্মিক বজ্রপাতে গার্গীর পিতা নিহত হ'লেন—তারই কিছুদিন পরে গার্গীর মাও তাঁকে অনুসরণ করেন, যাবার সময়ে তিনি গার্গীকে বড় হ'বার আন্তরিক আশীর্বাদ ক'রে যান—গার্গীর জীবনে মা'র এই মৃত্যু প্রবল নাড়া দিয়েছিল। বর্তমানে গার্গী তার বৃদ্ধা দিদিমা এবং বৃদ্ধ দাদামশায়ের বিরাট্ সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। সম্প্রতি দাদামশাই মারা গিয়েছেন।

বিদ্যুতের অজ্ঞাতবাসের মধ্যে এক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে কলকাতার বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত হরনাথ সামন্ত'র পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে। উক্ত দুর্ঘটনা থেকে তাঁর একমাত্র কন্যা রেবাকে বিদ্যুৎই রক্ষা ক'রেছিল। রেবার একটী মাত্র ছোট ভাই আছে, সুজিত।

ইতিমধ্যে একদিন আকস্মিকভাবেই বিদ্যুৎ গার্গীর কাছে ফিরে আসে। শুধু গার্গী নয়, সঙ্ঘের অনেকেই এ ঘটনায় হতবাক্ হ'য়েছিলেন। একদা মঞ্জুদি' তাঁর নিজের বাড়ীতে গার্গীর কাছে যে সময়ে এই ভবঘুরে এবং খামখেয়ালী বিদ্যুতের ভালবাসাকে যথেষ্ট হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বিদ্যুৎ সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে নিজের নামের 'স্লিপ' পাঠালেন। মঞ্জুদি' তাকে সাদর আহ্বান জানিয়ে ডেকে পাঠালেন।]

বিদ্যুতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরের মধ্যে মুহূর্তে যেন গম্ভীর নৈঃশব্দ্য নেমে এল। মল্লিকা সোজা হ'য়ে বসলো। মঞ্জুদি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরময় একটা অদ্ভুত আব্‌হাওয়া। গার্গীর দৃষ্টি জান্‌লার বাইরে নিবদ্ধ।

"আসুন" মঞ্জুদি এগিয়ে গেলেন, বললেন "এই দিকে।"

"নমস্কার" বিদ্যুৎ দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো, "অনেকদিন পরে দেখা, ভাল আছেন তো ?"

"এই চল্‌ছে" মঞ্জুদি সামান্য একটু হাস্‌লেন, "আমাদের আর ভালো থাকা !—দিনগত পাপক্ষয় বল্‌তে পারেন।"

ঘরে ঢুকে বিদ্যুৎ যেন একটু অপ্রতিভই হ'ল, বল্‌লে, "আপনাদের আমি বোধহয় খুব অসুবিধে করলাম, কিছু মনে করবেন না, নিতান্ত দরকারে একবার আস্‌তে হ'ল এখানে। এই তো, গার্গী, এখানেই আছ—তোমার সংগে একটু দরকার ছিল আজ—"

গার্গী শুধু একবার বিদ্যুতের দিকে চাইলে, কথা বল্‌লে না।

মঞ্জুদি আরো সাম্‌নে এগিয়ে এলেন, মল্লিকার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আপনার সংগে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হ'চ্ছেন আমাদের সঙ্ঘসম্পাদিকা এবং খ্যাতনাম্নী অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা মল্লিকা মল্লিক—আর ইনি আধুনিক বাঙলার শ্রেষ্ঠ এবং সুবিখ্যাত কবি ও কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত—"

"আমি জানি—" মল্লিকা বল্‌লে। বিদ্যুৎ দুই হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলো।

"বসুন" মঞ্জুদি বল্‌লেন, "দীর্ঘ দিন পরে আপনার সংগে দেখা হ'ল—কোথায় ছিলেন এতদিন ?"

বিদ্যুৎ কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে নিলে, "আমার কথা আর বলবেন না—কোনো কিছুরই তো ঠিক নেই, সম্প্রতি সমস্ত ভারতবর্ষ-ভ্রমণের জন্যে বেরিয়েছিলাম—"

"ঘুরে এলেন নাকি ?" মঞ্জুদি বিদ্যুতের চোখের দিকে চাইলেন।

"এক রকম—তবে সব হয় নি—এবারের পরিক্রমায় সেই অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ ক'রে আস্‌বো।"

"উৎসাহ আছে আপনার" মঞ্জুদি নিরাভ একটু হাস্‌লেন, "বিখ্যাত কয়েকটা জায়গার নাম করুন না ?"

"এই ইলোরা, অজন্তা,—ওদিকে কণারকের সূর্য্যমন্দির, মাদুরার বিখ্যাত দেবায়তন—এই আর কি—কাশ্মীর পর্য্যন্ত ওঠার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় হ'ল না—স্বাস্থ্যও আমাকে বাধা দিলে—অবশেষে ফেরাই ঠিক করলাম।"

"তারপর এখন আছেন কোথায় ?" একটা নিতান্ত স্থুল এবং প্রায় অশোভন প্রশ্নে মঞ্জুদি ঝলমল ক'রে উঠলেন, "খুব দূরে নাকি ?"

"না, মোটেই নয়, খুবই কাছাকাছি বল্‌তে পারেন—এই তো রসারোডে—"

"তা' হ'লে মাঝে মাঝে তো প্রায়ই আস্‌তে পারবেন—আস্‌বেন কিন্তু"—মঞ্জুদি আবার হাস্‌লেন।

"দেখা যাবে," বিদ্যুৎ মাটীর দিকে চাইলো।

"ওহো আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম—বসুন বিদ্যুৎ বাবু—চা ক'রে আন্‌ছি" : মঞ্জুদি উঠে দাঁড়ালেন।

"থাক্, চা আমি এই কিছু আগে খেয়ে এসেছি।"

"আরও এক কাপ্ নিশ্চয়ই আপনার স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি করবে না—আর করলেও এখন এসেছেন, তখন সে ক্ষতি স্বীকার করতেই হ'বে আপনাকে।" মঞ্জুদি হেসে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আসুন—একান্তই যখন আন্‌ছেন, কিন্তু তার আগে আমার একটী প্রার্থনা আছে আপনার কাছে। কিছু উপসর্গ এর সংগে যোগ করবেন না কিন্তু—"

"উপসর্গ থাকলে আপনার কথাতেও হ'ত না, কিন্তু যেহেতু নেই—ঠিক সেই কারণেই আপনার এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো মনে হ'চ্ছে।"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো—ঘরের আর সকলের মুখেও হাসির সামান্য আভা ছড়িয়ে পড়লো।

মঞ্জুদি নীচে নেমে গেলেন।

এতক্ষণে মল্লিকা যেন কিছুটা হাঁপ ছাড়তে পারলো। মঞ্জুদির এই সব দীর্ঘ আর বিরক্তিকর প্রশ্নে ঘরের সমস্ত আব্‌হাওয়াটা কেমন যেন ভারী হ'য়ে উঠেছিলো, মঞ্জুদির বহির্গমনের সংগে সংগে মল্লিকা অনুভব করলো—ঘরের ভেতরে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য নেমে এসেছে।

"খুব ঘুরে ঘু'রে এলেন তা'হ'লে—" কোনরকমে—আরম্ভ না করলে নয়, ঠিক এইভাবে মল্লিকা বল্‌লে।

"কোথায় আর !" বিদ্যুৎ মল্লিকার দিকে চাইলে, "আরো তো ইচ্ছে ছিল অনেক—"

"কতদিন ছিলেন অজন্তায় ?" মল্লিকা প্রশ্ন করলো, —"শুনেছি অদ্ভুত চমৎকার অজন্তা—"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "দিন কুড়ি ছিলাম, সত্যিই অদ্ভুত জায়গা বল্‌তে পারেন,—তবে গভীর গিরিগহ্বর অতিক্রমের হাংগাম আছে অনেক, লাঠী আর টর্চ নিয়ে সাবধানে ধাপ্ ধাপ্ সিঁড়ি ভেঙে ভেতরে ন'মা, সেই অন্ধকারে গহ্বরের ভেতরে,—সে এক দারুণ ক্লান্তিকর ব্যাপার। কিন্তু দর্শনে মননে সমস্ত হাংগাম, সব পরিশ্রম যেন সার্থক হ'য়ে ভ'রে ওঠে, মনে হয়" : বিদ্যুৎ অলক্ষ্যে নিশ্চল মৌন আনমনা গার্গীর দিকে একবার চাইলে, তারপর মল্লিকার চোখের দিকে চেয়ে বলে' চললো : "অপূর্ব সুন্দর শান্তিময় ছিল অতীতের গর্ভে বিলীন-হওয়া সেই যুগ ! সে অনুভূতি আজ আপনাদের ঠিক বোঝাতে পারবো না। সেই মেঝের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি যেন ফিরে গেলাম সেই সাধনমুখর দিনগুলিতে" : বিদ্যুৎ যেন একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো : "ভাব্‌তে পারেন কি বিরাট্‌ভাবে অমিতাভের প্রেমধর্ম সমস্ত পৃথিবীতে আলো ফেলেছিলো ! —সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'ল—যেন আমি চ'লে গিয়েছি কোথায় কত দূর সেই অতীতে, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সব শিল্পীরা ; তারা রচনা করছে,

তারা মূর্ত্তি আঁকৃছে এই পর্বত কন্দরে, আর তা অনবদ্য হ'য়ে ফুটে উঠ্ছে। টর্চ্চের আলো ভাল ক'রে ফেলে মনে হল এই একটু আগে যেন এ-সব মূর্ত্তি আঁকা শেষ হ'য়েছে"—বিদ্যুৎ থাম্‌লো।

"সত্যিই সুন্দর!" মুগ্ধ মল্লিকা সবিস্ময়ে বললে।

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই এত সুন্দর! ভারতে জায়গায় জায়গায় এই সব বিস্ময়কর শিল্পকলা ছড়িয়ে আছে—আমাদের পূর্ব পুরুষের অক্ষয় অজেয় সেই সব কীর্ত্তি—কিন্তু বড় কথা কি জানেন?" বিদ্যুৎ মল্লিকার দিকে চেয়ে একটু কৌতুকের হাসি হাস্‌লো, "আমরা এসব ফেলে সকলের আগে মিশরের পিরামিড দেখ্‌তে যাই—দেখ্‌তে যাই নায়েগ্রা ফলস্‌। দেখ্‌তে যাই লুভ্যর মিউজিয়াম। সুইজারল্যাণ্ডের বরফমণ্ডিত চূড়ার দিকে চেয়ে মুগ্ধ হই। সুদূর আমেরিকা আর চীন—আর ইংলণ্ড থেকে যাঁরা আসেন সেই বোধিদ্রুম দেখার জন্যে, তাঁদের সংগে আমাদের রুচির তুলনা করতে লজ্জা হয়। কারণ বোধিদ্রুম আমরা আজো দেখিনি আর সেই কপিলাবস্তু, আর কুশীনগর? হায়! সে তো ঐতিহাসিক ঘটনা—সে তো ইতিহাস হ'য়ে রয়েছে—আমাদের ভাল লাগে অরোরা বোরি-এলিস্‌—"

বিদ্যুতের কথা শেষ না হতেই গার্গী জান্‌লার ধার থেকে উঠে দাঁড়ালো—হাতে কি একটা বই নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলো, টেবিলের ওপরে সেটা রেখে দিলে; মল্লিকার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আমি যাই—মাথাটা বড় ধরেছে—মঞ্জুদিকে বল্‌বেন, বস্‌তে পারলাম না—"

বিদ্যুতের কথা বন্ধ হল। মল্লিকা বল্‌লে, "সেকি—যাচ্ছ নাকি তুমি?—একটু ব'সনা—মঞ্জুদি আসুন তারপরে—"

"বস্‌বো" গার্গী প্রশ্ন করলো "কিন্তু দেরী হবে না খুব?"

"না—এইতো, এখুনি এলেন বলে।"

বিদ্যুৎ গার্গীর দিকে চাইলে, "তোমার সংগে আমার একটা কথা ছিল গার্গী—সেই জন্যেই তো আজ এলাম এখানে—"

নির্ভীক তীক্ষ্ণ [illegible] দৃষ্টিতে গার্গী বিদ্যুতের দিকে চাইলো, এক মুহূর্তের জন্যে সমস্ত ঘরের ভেতরে একটা গম্ভীর আবহাওয়া ঘনো হ'য়ে উঠলো, তারপরে অতি আস্তে—সংযতভাবে গার্গী বল্‌লে, "শুনে সুখী হ'লাম, কিন্তু এর জন্যে এতখানি কষ্ট তোমার না স্বীকার করলেও চল্‌তো বিদ্যুৎ—দেশ থেকে ডাকবিভাগ এখনো ওঠেনি—তুমি তাদের সাহায্য অনায়াসেই নিতে পারতে, তোমার কথা আজ আমি শুন্‌তে পারলাম না, এ জন্য আন্তরিক দুঃখিত। চল্লাম দিদি—" গার্গী দাঁড়ালো না, যেমন হঠাৎই সে বিদ্যুতের কথায় বাধা দিয়েছিলো, ঠিক সেই রকম হঠাৎই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল: "মঞ্জুদিকে ব'লো আমার কথা—" গার্গীর গলা বারাণ্ডা থেকে ভেসে এলো।

বোকার মত, সম্পূর্ণ নির্ব্বোধের মত বিদ্যুৎ সেই দরজার দিকে চেয়ে রইলো, তারপরে, কিছুক্ষণ পরে বল্‌লে, "কি হয়েছে জানেন কিছু আপনি?"

"কিছুই না—" মল্লিকা ম্লান আর নিষ্প্রভ গলায় বল্‌লো, "ওর মাঝে মাঝে ওই রকম হয়, বিশেষ ক'রে আজকাল এইটা বেশী লক্ষ্য করছি।"

কেমন একটা ছেদ পড়লো। তাদের সেই অজন্তার মূর্ত্তিখচিত দেয়ালে কে অনেকখানি কালি মাখিয়ে দিয়ে গেলো—বিদ্যুৎ মাথা নীচু করলো

মল্লিকা তবু চেষ্টা করলো, বল্‌লে, "তারপরে আরো অনেক জায়গা তো ঘুরলেন? অজন্তার পরেই কোথায় গিয়েছিলেন?"

"অজন্তার পরে?" বিদ্যুৎ অনেক কষ্টে যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, "অজন্তার পরে গেলাম ইলোরা কেভে, সেও বেশ সুন্দর—ঠিক না দেখলে ভাষায় বোঝানো যায় না। সুযোগ হ'লে যাবেন কিন্তু এসব জায়গায়—" বিদ্যুৎ অতি সহজেই ছেদ টান্‌লো, এর পরে আর জোর ক'রে কোনো কথাই বলা চলে না, বলানও চলে না।

মল্লিকা একটু অস্থির হ'য়ে উঠলো, কিন্তু মঞ্জুদিই বাঁচালেন—চায়ের ট্রে নিয়ে তিনি নিজেই ঘরে ঢুকলেন, বল্‌লেন, "বড্ড দেরী হ'য়ে গেলো, কিছু মনে করবেন না বিদ্যুৎবাবু, ষ্টোভটা নিয়ে বড় গোলমালে প'ড়েছিলাম—" মঞ্জুদি ট্রেটা টেবিলের ওপরে নামালেন, "এ কি?—গার্গী কোথায় গেল

"চলে গেছে—" মল্লিকা বল্‌লে।

"চলে গেছে? কেন? হঠাৎ গেল যে—?"

"কি জানি", মল্লিকা সেইভাবেই উত্তর দিলে, "বোধহয় কোনো দরকারী কাজ আছে।"

"আসুন—" মঞ্জুদি একটা কাপ বিদ্যুতের দিকে এগিয়ে দিলে, "আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বাংলার খ্যাতনামা এবং সার্থকনামা কবির সাথে ব'সে এক সংগে চা খেতে পার্‌ছি—কি বলো মল্লিকা?"

মল্লিকা ঈষৎ মাথা নাড়লো, বল্‌লে, "তা আর বল্‌তে—বিদ্যুৎবাবুকে কাছে পাওয়া রীতিমত অঘটন?"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "আপনারা বড় বেশী মুল্য দেন সব কিছুর—এতে খানিকটা অবিচার করা হয়—অন্ততঃ আমি সেই কথাই মনে করি!"

মল্লিকা হাস্‌লো; কথা বল্‌লে না।

মঞ্জুদি আর একটা কাপে চা ঢেলে মল্লিকার দিকে এগিয়ে দিলেন, তারপরে নিজের কাপে খানিকটা ঢাল্‌লেন, বললেন, "দেখুন তো আরো একটু চিনি দরকার কিনা—আমি আবার চিনি বড় কম খাই—" ব'লেই একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাস্‌লেন।

বিদ্যুৎ বাধা দিলো, বল্‌লে, "না—না, যথেষ্ট চিনি হয়েছে—সুন্দর হয়েছে; আর কিছু লাগ্‌বে না।"

"জানেন তো—" মঞ্জুদি তাঁর আগের কথার জের টেনে বল্‌লেন, "আমার কথা তাই বড় বেশী নীরস, এবার থেকে একটু বেশী চিনি খাওয়ার অভ্যেস করবো ভাব্‌ছি—"

মল্লিকা হেসে উঠ্‌লো। বিদ্যুৎও হাস্‌ল, বল্‌লে,—"আপনি বেশ কথা বলেন মঞ্জু দেবী—"

মঞ্জু দেবী!—কথাটা যেন গানের অদ্ভুত সুরের মত এসে মঞ্জুদির কাণে বাজলো। মঞ্জু দেবী! কবে কোন্ অতীতে কে যেন তাঁকে এই নাম ধ'রেই ডেকেছিলো একদিন। অতীত—অস্পষ্ট, ধূসর অতীত থেকে সেই স্মরণের হাওয়া এসে তাঁর চিত্তে ঢেউ তুল্‌লো। তারই প্রিয়তম একদা তাকে ডেকেছিলো বর্ষা রাত্রির এক ঘন অন্ধকারে। বিয়ের পরের সেই কয়েকটা স্বপ্নিল দিনের স্মৃতি মঞ্জুদির মনের কোণে বার বার নূতন ক'রে মাধুর্য্যের রেখা টেনে দিল।

"উঠি তা'হ'লে" বিদ্যুৎ বল্‌লে, "আরো কয়েক জায়গায় যেতে হ'বে।"

"এখনি যাবেন?" মঞ্জুদি বিদ্যুতের চোখের দিকে চাইলেন—"আরো একটু দিই না চা?"

"এই তো এলেন" মল্লিকা যোগ দিল, "আবার এর মধ্যেই যাবেন কোথায়—আমরা ছাড়লে তো আপনাকে—"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, "না, সত্যি, সময় থাক্‌লে আপনাদের এখানে অনেকক্ষণই থাক্‌তে পারতাম, আপনাদের সংগে গল্প করা এ তো আমার সৌভাগ্য—আর যখন এতদিন পরে আমাদের দেখা হল।"

মঞ্জুদি বিদ্যুতের কাপে আরো একটু চা ঢেলে দিলেন, বল্‌লেন, "যখন এসেছেনই, তখন আপনি আপনার সেই সৌভাগ্যকে অবহেলা করবেন না, আর আমরাও যখন আপনাকে রোজ পাচ্ছি না—"

বিদ্যুৎ নিষ্প্রভ একটু হাস্‌লো, চায়ের কাপটা মুখের কাছে তুলে ধরলো—তারপরে মল্লিকার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আপনি বেথুনে আছেন বুঝি?

"হ্যাঁ, ওই ধ'রে নিন্ না একটা" মল্লিকা সামান্য হেসে উত্তর দিলে।

"আপনাদের সংঘ কি রকম চল্‌ছে?"

"খুব ভাল" মঞ্জুদি বল্‌লেন, "ভারতের চারদিক থেকেই আমরা সাড়া পাচ্ছি, আর কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত জগতের চোখের সাম্‌নে সংঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবো, এ আশা রাখি—"

"সত্যিই আনন্দের বিষয়—" বিদ্যুৎ কাপটা টেবিলের ওপরে রেখে দিলে, "আপনাদের এই বিরাট্ এবং সাধু পরিকল্পনা সার্থক হোক, আপনাদের জন্যে আমার এই শুভ কামনা রইলো।"

মল্লিকা হাস্‌লো। মঞ্জুদিও হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "ধন্যবাদ—"

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "এবার আমাকে ছুটী দিন, সত্যিই দরকার। কিছু মনে করবেন না, সময় থাক্‌লে নিশ্চয়ই আমি বস্‌তাম—"

ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো। মঞ্জুদি উঠে দাঁড়ালেন:

"একান্তই যখন যাবেন, তখন আর ধ'রে রাখবো না, তবে সময় হ'লে আসবেন মাঝে মাঝে। নতুন কোনো বই-টই বেরুচ্ছে নাকি?"

এইবার মল্লিকা লক্ষ্য করলো, বিদ্যুতের সমস্ত মুখ যেন পাংশু হ'য়ে এলো। কয়েক মিনিট থেমে বল্লে, "বই? না—তো! বই তো আর বেরুচ্ছে না! লিখতে পারছি না মঞ্জুদেবী!" শেষের কথা কটা কান্নার সুরে যেন মঞ্জুদির কাণে ভেসে এলো। বিদ্যুৎ দাঁড়ালো না। হঠাৎই সে দুই হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলো, তারপরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, বল্লে, "আচ্ছা, চল্লাম এখন, কিছু মনে করবেন না আপনারা।"

একটা বিরাট্ ছায়ার মত দরজার ধার থেকে বিদ্যুৎ স'রে গেলো।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডক্‌টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ. পি-এইচ-ডি

বৈষ্ণব মত এবং পন্থা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাবলম্বী মতের বিপক্ষে যে সব অহিংসাবাদী মতসমূহ উত্থিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব মত তাহাদের অন্যতম। ওয়েবারের[১] মতে এই অহিংসাবাদী বৈষ্ণবমতাবলম্বীদের 'ভাগবতের দল' বলা হইত। ইহাঁরাই পরে 'পঞ্চরাত্রের দল' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট্‌দের বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইতে দেখি। জয়সোয়ালের[২] মতে ভারশিব ও ভাটাকাটা সম্রাট্‌দের কঠোর শৈব ধর্ম্মের প্রভাবের পর "পরম ভাগবত" গুপ্ত সম্রাট্‌দের বৈষ্ণবমত দেশে কঠোরতার বিপক্ষে এক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। এই সময়কার বৈষ্ণবধর্ম্ম ভোগ-সুখেচ্ছু হাস্যময় ধর্ম্ম, যাহার কৃষ্ণ ছিল কংসারি মধুকৈটভারি। গুপ্ত সম্রাট্‌দের এই বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী এবং ঘোর আক্রমণশীল (aggressive) জাতীয়তাবাদী ছিল। এই সময়ে শক ও অন্যান্য জাতির শাসন গুপ্তরাজগণ দেশ হইতে সমূহে উৎপাটিত করেন এবং মরৌলী প্রস্তরশাসনানুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) সিন্ধু নদের পঞ্চশাখার উৎপত্তিস্থল[৩] (বোধ হয় বাহ্লিক দেশ) জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে কালিদাস-বর্ণিত রঘুর হুন-পারসীকদের দেশ জয় করা এই মরৌলির সংবাদের প্রতিধ্বনি করে।

সংস্কৃত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে; যথা, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, প্রভৃতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধার প্রেমবিষয়ক কবিতা আমরা প্রথম পাই জয়দেবে। বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেব একজন কবি ও গায়ক ছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে বাংলার বৈষ্ণবদের ভিতরে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাঁহারা জয়দেবকে "গোস্বামী" বলিয়া অভিহিত করেন। এমন কি হালের কোন কোন বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহার জপমালা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তথাকথিত মালা দর্শকদের দেখান*। কিন্তু হালের আবিষ্কৃত "সেখ শুভোদয়া" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে যদি কিছু সত্য আছে বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আমরা উক্ত গ্রন্থে অন্য সংবাদ পাই। তথায় দৃষ্ট হয়, পদ্মাবতী লক্ষ্মণ সেনের সভায় নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব একজন গায়ক ছিলেন। "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" পদে পাওয়া যায় যে, ইনি নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব তার তাল রক্ষা করিতেন*।

(১) Weber—"History of Sanskrit Literature,"

(২) K. P. Jayaswal—History of India Circa 150 A. D. to 350 A. D. in J B. O. R. S. Vol. XIX. Pts.

* একটা সুতায় গাছের গুঁড়ির এক টুকরা, তৎপর একটা মালার দানা, তৎপর একটা গুঁড়ির টুকরা, এই প্রকারে একটা মালা গাঁথা, লোকদের জয়দেবের "জপমালা" বলিয়া দেখান হয়। লক্ষ্মণ সেনের

এই জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় দশ অবতার স্তোত্র লেখেন। তথায় কৃষ্ণকে কেশী-মুর প্রভৃতির নাশন বলা হয়। জয়দেবের কৃষ্ণ গুপ্তযুগের কৃষ্ণ থেকে পৃথক্ নহেন, তিনি যোদ্ধা কৃষ্ণ। তৎপর তাঁহার শেষ কল্কি অবতারের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন— "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সিকরবালম্"—। তারপরে সংস্কৃতে লিখিত তাঁহার বিখ্যাত গীতিকাব্যে যে কৃষ্ণ ও শ্রীমতীর প্রেম বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, তাহার খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত ভারতব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট lyric কাব্য। এই সময়ে বাংলায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত আরও অনেক কাব্য পাওয়া যায়। এই সময়ে বোধ হয় প্রেম-কাব্যের খুব ছড়াছড়ি বাংলায় হইয়াছিল। ভিক্টর হুগোর বিভাগানুযায়ী ইহা বাংলার ইতিহাসের একটি lyric যুগ বলা যাইতে পাবে। হিন্দী সাহিত্যিকেরা বলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম লেখক হইতেছেন জয়দেব। শিখদের "গুরুগ্রন্থ সাহেবে"[৫] জয়দেবের একটি হিন্দী কবিতা সন্নিবেশিত আছে। তাহার একটি নমুনা দেওয়া হইল:

রাগ মারু

"চন্দসত ভেদিয়া নাদসত পুরিয়া সুরসত খেড় সাদতুকীয়া
অবলবলু তাড়িয়া অবলুচলু আপিয়া অঘড়ু ঘড়িয়া তহা অপিউ পীয়া।
*   *   *   *
বদতি জয়দেব জয়দেব কৌ রঁামিয়া ব্রহ্মনির্বান লবলিন পাইয়া।"

জয়দেবের কবিতায় নির্বৃত্তির কথাও নাই, ভোগের কথাই আছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ যেমন যোদ্ধা, তেমনি প্রেমিক, তত্রাচ তিনি ধনুর্দ্ধর। জয়দেবে রাধা নাই, যেমন তৎ বহু পূর্ব্বের শ্রীমদ্ভাগবতেও রাধা নেই। এবং ইহার পরে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধা হ্লাদিনী শক্তি হিসাবে চিত্রিত হইয়াছেন। জয়দেবের শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী। কিন্তু তিনি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসিনী নহেন। জয়দেব হিন্দু বাংলার সুখসমৃদ্ধির সময়কার কবি ছিলেন। তিনি সেই "পঞ্চগৌড়েশ্বর" লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাসদ্ ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে প্রস্তরফলকসমূহ সগর্ব্বে সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইনি যৌবনে কলিঙ্গ দেশের যুবতীগণের সহিত জলক্রীড়া করিয়াছেন, গৌড় জয় করিয়াছেন, কাশীর রাজাকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন[৬]। তখনকার বাংলার সামাজিক অর্থনীতিক চিত্র জয়দেবের গীতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দীনেশবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রমোদোদ্যানে অভিসারিকাগণ মুখর নূপুর ত্যাগ করিয়া নীলাম্বরী ও মেঘডুম্বুর সাড়ী আঁধার রাত্রির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া 'বাঁধি তাম্বুল আঁচলে' যে লীলা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে ছিল সেই দৃশ্য"[৭]। অবশ্য জয়দেবের রচনার মধ্যে আমরা রাজনীতিক বা সামাজিক কোন সংবাদ পাই না, কিন্তু বিভিন্ন স্থান হইতে যে সংবাদ আমরা এই যুগে পাই, তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, lyric-এর স্রোতঃ তখন বাংলায় বহিতেছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই বাংলার হিন্দুর পক্ষে এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়।

জয়দেবের পর আসেন চণ্ডীদাস। তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন বাংলার আর এক নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। চণ্ডীদাসকে আমরা বাংলা ভাষায় প্রথম বৈষ্ণব কবি বলিতে পারি। চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলার হিন্দুরা বিজিত জাতি এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা কঠোরভাবে শাসিত। এই সময়ে আরব পর্য্যটক ইব্‌ন্ বতুতা (Ibn Batuta) বাংলাদেশ দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালীরা হুড় হুড় করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন—এমন কি রাজারাও সামান্য প্রলোভনে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে।" সেই সময়ে হিন্দুর ঘরের লোক ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার পর হইতেছে। আর এই সময়ে সেন রাজাদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন হিন্দু রাষ্ট্র হারাইয়া খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য এবং জাতিভেদের বিষয় লইয়া ব্যস্ত। চণ্ডীদাসের জীবনীতে তাহার ছাপ পাওয়া যায়। রজকিনী রামীর প্রেমের জন্য চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। তৎপরে আমরা ইহা পাই যে, চণ্ডীদাসের পিতা "বাসুলীদেবীর" পূজক ছিলেন। এই বাসুলীদেবী বৈদিকদেবীও নহেন, পৌরাণিক দেবীও নহেন। হয়ত

বৌদ্ধ যুগের শেষ সময়ের কোন লৌকিক গ্রাম্য দেবী, যাহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হজম করিয়াছেন। তারপর চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিষয়ক জনশ্রুতি যে, কোন নবাবের হুকুমানুযায়ী তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়—তাহা হালের আবিষ্কৃত রামীর গীতিকা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। এই গীতিকা চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিষয়ে জনশ্রুতিকেই অনেকটা সমর্থন করে; যথা—গৌড়ের বাদশার বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ইহাতে বাদশা চণ্ডীদাসকে হস্তিপৃষ্ঠে বাঁধিয়া জর্জ্জর প্রহারে মারিয়া ফেলেন—

—"রাজা গৌড়েশ্বর, দুষ্ট কলেবর, কেহ না বুঝালো তাকে ॥
* * * *
সুন্দ কলেবর হইল জর্জ্জর দারুণ সন্ধান ঘাতে।
* * * *
চণ্ডীদাস করি ধ্যান, বেগম ত্যজিল প্রাণ।
শুনি শ্রুত্বা ধ্বনি ধায়, পড়িল বেগম পায় ॥"

ইহাতে আমরা এই তথ্য পাই যে, হৃদয়ের আবেগ ধর্ম্ম বা সমাজের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলে না।

চণ্ডীদাসের লিখিত "কৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে আর একটি পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তকটি সুরুচিপূর্ণ নহে। এই সম্বন্ধে পরলোকগত দীনেশবাবু বলেন, "রাজসভায় যে ভাববিকার আরম্ভ হয়—সমাজের নিম্নস্তরে তাহা যখন আসিয়া পৌছায়—তখন তাহা অতি বিকট হয় ······সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কুচবিহার ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি, তাহার নাম কৃষ্ণ-ধামালী। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক শ্রেণীর নাম "আসল", ও অপর শ্রেণীর নাম "শুকুল (শুক্ল)······শুক্লা ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধু-ভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, কবিত্বমণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না গীত-গোবিন্দ ও কৃষ্ণধামালির পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল। দীনেশবাবু হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অমার্জ্জিত রুচি-সম্মত ভাষায় তাহা অনুসন্ধান করা যাক। চণ্ডীদাস তাঁহার "দশাবতার" নামক কবিতাতে বলিতেছেন—

"পূর্ণতা ত্যজিয়া কল্কি অবতার ধরেন মুরতি কায়া।
অশ্বের উপরে ধরে দুই করে সংহার অনুপ ছায়া ॥৮

এই স্থলে দেখি—যেখানে জয়দেব "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্······" বলিয়া গর্জ্জন করিয়াছেন, সেখানে চণ্ডীদাসের সুর কত নামিয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিজিত বাঙ্গালীর মনে ও চিন্তাতে বিজেতা শাসকবর্গের Censor বড় জোরেই ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজেতার এই Censor-Ship যে কত কঠোর ছিল, তাহা চণ্ডীদাসের এই লেখা ও শোচনীয় মৃত্যুতে প্রমাণিত হয়। তৎপরে আসে তাঁর বিখ্যাত পদাবলীর ভাষা, যথা,

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
* * * *
সাগর শুকাল মাণিক লুকালো অভাগীর করম দোষে।"

এই গান একজন প্রেমবিরহিণীর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, তেমনি একজন হতাশ-হৃদয় রাজনীতিক বৈপ্লবিকের মুখ হইতেও বাহির হইতে পারে।

ইহার পর চণ্ডীদাস রাধাকে রাঙাবসনপরিহিতা যোগিনী সাজাইয়াছেন—

"বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা"

বৃন্দাবনের শ্রীমতীকে যোগিনী সাজাইবার দৃষ্টান্ত এই প্রথম পাওয়া গেল। তৎপরে আর একটি অনুষ্ঠানের কথা পাই—তাহা "মাথুর"। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের সমস্ত পদাবলী পড়িলে রাধার কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন শুনিয়া ইহা কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পদাবলী পড়িলে ইহাও মনে হয় যে, একটা হতাশ বেদনা ও একটা হাহাকারের ধ্বনিও ইহার মধ্যে হইতে বাজিয়া উঠিতেছে। কবির অবিদিত মনের (uncons-cious mind) পশ্চাতে কি কি ইচ্ছা (urges) জাগ্রত ছিল, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? বাংলার হিন্দুর পরাধীনতার যুগের প্রথম কবির মুখ হইতে কেবল হতাশ[illegible] [illegible] জানা গেল। (ক্রমশঃ)

মেক্-আপ্

শ্রীজনরঞ্জন রায়

চা খাইয়া সিগারেটটা সিগারেট-কেসের উপর বার দুই ঠুকিয়া নিয়া লালমোহনবাবু সেটাকে মুখে পুরিয়া দিলেন এবং অগ্নিসংযোগের পর সধূম উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—"মেয়েমানুষের সবটাই মেক্-আপ্…মেকি…অন্দরে থাকে শুধু চাপে পড়ে'—তা আপনার ঝি-ই হোক আর গোঁসাই-গিন্নীই হোক…সব এক! আপনি না তাকে মহান্তর হারেম্ থেকে উদ্ধার করেছেন? উদারতার প্রশ্রয় পেয়ে গেছে…।"

হারু ডাক্তার আম্‌তা আমতা করিয়া বলিল—"হঁা, তাই যেন দেখছি!"

কলেজের গরমের বন্ধে শহর হইতে পলাতক প্রোফেসার নামে স্বপরিচিত ডিস্‌পেপ্‌টিক্ একক অকাল-বৃদ্ধ লালমোহনবাবু কোথাও বাড়ী না পাইয়া নবদ্বীপের এক বৈষ্ণব পাড়ায় হারু ডাক্তারের বাহিরের ঘরটায় পাঁচ টাকা ভাড়ায় আসিয়াছেন। তুলসীদাসী তাহাদের চা দিয়া গেল। এত অন্যমনস্ক যে পেয়ালার চা অনেকটা চলকাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার রুক্ষ কেশ, চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রিয়া বাহির হইতেছে। দাসী-চাকর এত অমনোযোগী হইবে কেন? লালমোহনবাবু সেই কথাটাই হারু ডাক্তারকে বলিতেছিলেন।

এমন সময়ে সেখানে আসিয়া পড়িল দোয়াত-হাতে কাণে-কলম একমুখ-দাড়ি নিত্য অধিকারী। দলিল লেখা তাহার ব্যবসা কিনা—তাহাতে এক রকম কালী-কলম লাগে। তাই অধিকারী কালী কলম ছাড়া চলে না। ডাক্তারের কাণের কাছে মুখ নিয়া গিয়া নিত্য বলিল—"বুঝলেন কি-না…মেয়েমানুষের মন, আর দেরী করা নয়…শীগ্‌গীর রেজেষ্টারী ক'রে নিন্…বুঝলেন কিনা…ষ্ট্যাম্প কাগজে শুধু সই ছাড়া বুঝলেন কি-না আর তো কিছুই করেনি!"

হারু ডাক্তার যেন বিব্রত হইয়া উঠিতেছিল। নিত্য অধিকারী চলিয়া গেল। লালমোহনবাবু খবরের কাগজে শেষে হাতটাও পুড়িত। ওঃ! বলিয়া সেটা ফেলিয়া দিয়া আবার কাগজে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন!

রাস্তা দিয়া সিবিল সার্জ্জনের সঙ্গে এম্-ডি ডাক্তার সারদাবাবু গাড়ী করিয়া ফিরিয়া গেলেন। শ্যামচাঁদ মহান্তকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আজ আর বুঝি মহান্ত বাঁচে না!

হারু ডাক্তার ভাবিল, মহান্তের চিকিৎসায় এত খরচ করিতেছে কে? যেন রাজা-রাজরার মত! মনে করিল, মহান্তকে শেষ একবার দেখিয়া আসিবে কিনা। আবার ভাবিল, লোকে ঠাট্টা করিবে না তো যে, চির শত্রুর মরণ দেখিতে আসিয়াছে? তখনই মনে তার পড়িল তুলসীর কথা—যাইবে কোন্ মুখে? এমনি কত সব অতীত কথা তাহার মাথার ভিতরে কিল্‌বিল্ করিয়া উঠিল:

শ্যামচাঁদের সঙ্গে সেই মাতৃ-আশ্রমে হারু ডাক্তারের প্রথম আলাপ। তাঁহারই অনুগ্রহে আশ্রমে সে ডাক্তারী পদ লাভ করে। আশ্রমের প্রধান সেবক শ্যামচাঁদ মহান্তের করুণায় ধর্ষিতা ও সমাজ-পরিত্যক্তা সুন্দরী যুবতী তুলসী মাতৃ-আশ্রমের ফ্রী ওয়ার্ডে আশ্রয় পাইল। এবং বহুদিন পর্য্যন্ত 'ওয়েট-নার্স' হিসাবে সে শ্যামচাঁদেরই কৃপায় আশ্রমে থাকিয়া গেল। তাহার পর তুলসীকে নিয়া শ্যামচাঁদ একদিন পলায়ন করিল। কিছু দিন পরে নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিয়া ভেক নিয়া উভয়ে কণ্ঠী বদল করিল।

মধুলোভী মশা-মাছির উৎপাত ও উপসর্গ হইতে বাঁচিতে গিয়া দীর্ঘ এগার বৎসর তুলসী শ্যামচাঁদের অন্দরে পর্দ্দানসীন হইয়া রহিল। শ্যামচাঁদের বৈষ্ণবপাড়ায় মোড়লিও জমিল মন্দ নয়। অর্থের জন্য কিন্তু তার সত্য-মিথ্যায় দ্বিধাশূন্যতা লোপ পাইল। অবশেষে একটা জাল উইলের সাক্ষী দিতে গিয়া জেলের হাত হইতে শ্যামচাঁদ প্রায় মরিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া গেল। মামলায় হারু ডাক্তার অপর পক্ষ গ্রহণ করিল। সেই হইতেই শ্যামচাঁদের পতন ও হারু ডাক্তারের উত্থান।

ভাঙ্গিয়া পড়িল, শেষে শয্যা নিল। চিকিৎসার খরচের অভাবে তাহার পর তুলসী যখন অন্দর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইল, তখন দিন কতকের মধ্যেই তুলসীকে হারু ডাক্তার কি করিয়া জালে ফেলিল। অর্থাৎ প্রথম দিন তুলসীর হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া ভরসা দিয়া ডাক্তার বলিল—দরকার হ'লেই যেন নিঃসঙ্কোচে এসে নিয়ে যায়। তারপর আর একদিন পঁচিশ টাকা দিয়া একটা কাগজে তুলসীকে সহি করিয়া দিতে বলিল—তুলসী দ্বিরুক্তি না করিয়া সহি করিল। আর পরের দিনই ভোরের বেলা হারু ডাক্তার দেখিল, তাহার আঁধার ঘর আলো করিয়া তাহারই খাট ধরিয়া তুলসী দাঁড়াইয়া আছে। সেও প্রায় চার মাসের কথা। এখন তুলসীই তাহার ঘরের মালিক, কিন্তু তবুও কেন তাহার মন উঠে না!

হঠাৎ সকলে চমকিয়া উঠিল ডাক্তারের ঘরের ভিতরে দুম্‌দাম্‌ করিয়া আলমারীর কাঁচ ভাঙার শব্দে। সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল, স্পিরিটের আগুনে তুলসী একটা কাগজ পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছে। হারু ডাক্তারকে দেখিয়া হাঃ-হাঃ-হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া তুলসী বলিল—আমার কাজ শেষ হল···শ্যাম মহান্ত মরে' গেল···তাকে বাঁচাতে তোমার মুঠো মুঠো টাকা খরচ করলাম, তুমি তা জানো না···তার বদলে তোমার নিকট সতীত্ব-সম্ভ্রম বেচে গেলাম! আর আমার বাড়ীখানা লিখে নিতে চেয়েছিলে না—আমার নামে মহান্তর দেওয়া বাড়ীখানা? তার থাকলো ঐ ছাই! ঐ বাড়ী বিক্রি করে' মহান্তের শ্রাদ্ধ করব—পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য বামুন-বোষ্টম খাওয়াব। ছাড়, ছাড়—পথ ছাড়—শ্মশানে যেতে হবে—

লালমোহনবাবু খুব রাগত স্বরে বলিলেন—মেক্ আপ্···মেয়েমানুষের সব কিছুই মেক্ আপ্!

এক দিন, এক রাত শ্মশানে পড়িয়া থাকার পর তুলসী উঠিয়া বসিল।

ধূলার পাহাড়

[O' Henry'র Witche's Loaves-এর অনুবাদ]

শ্রীসুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মিস্ মার্থা মিক্যামের একটা 'বেকারী' আছে সেই বড় রাস্তার কোণে। হয়তো আপনাদের মনে আছে, তার দোকানের সামনেই আছে তিনটে সিঁড়ি, আর দরজা ঠেললেই ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজে।

মার্থার বয়স এখন চল্লিশ। ব্যাঙ্কে আছে কিছু টাকা আর আছে দুটো নকল দাঁত এবং স্নেহশীল হৃদয়। মার্থার থেকেও যাদের ভাগ্য খারাপ তাদের বিয়ে হ'ল, কিন্তু মার্থার আর বিয়ে হ'ল না। ভাগ্য···

তার দোকানে সপ্তাহে দু'দিন কি তিন দিন ক'রে একটি খদ্দের আসে। তাকে দেখে মার্থার মন যেন কেমন করে। তার সাজ-পোষাকের মধ্যে যদিও দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট অনুভূত হয়, তবুও সে বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং ভদ্র।

সে প্রতিবারই দুটো বাসি পাঁউরুটি কিনতে আসে। একটা টাটকা পাঁউরুটির দামে দুটো পাঁউরুটি পাওয়া যায়। সে কোনও দিন বাসি পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছুই কিনতে আসে নি।

একদিন মার্থা সেই লোকটির আঙুলে লাল এবং পাহাড়ী রঙের দাগ লক্ষ্য করে। তার তখনই বিশ্বাস হয় যে, সেই লোকটি নিশ্চয়ই একজন শিল্পী, আর্টিষ্ট এবং বড় গরীব। নিশ্চয়ই সে কোনও অন্ধকার, পূতিগন্ধময় ঘরে থাকে, ছবি আঁকে আর বাসি রুটি খায়। হয়তো সে একদিন তার দোকানের ভাল খাবার খাওয়ার আশা রাখে।

মার্থা প্রায়ই খাবার টেবিলে একরাশ ভাল খাবারের সামনে ব'সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। তার ইচ্ছা হয়, সেই শিল্পীটি এসে তার পাশে ব'সে তার আহার্য্যের ভাগ লয়। মার্থা সত্যিই স্নেহশীলা।

মার্থা একদিন একটি বেশ ভাল ছবি তার বাড়ী থেকে এনে তার দোকানে রাখে, যাতে ছবিটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

দিন দু'য়েক পরে সেই ভদ্রলোকটি এসে বলেন—দুটো বাসি রুটি দিন্।

মার্থা পাঁউরুটি দুটোকে যতক্ষণে কাগজে জড়ায়, ততক্ষণে তিনি আবার বলেন—আপনার ছবিটা তো বেশ!

মার্থা চমকে ওঠে, বলে—ছবিটা কি আপনার খুব ভাল ব'লে মনে হয়?

তিনি মাথা নেড়ে বলেন—না, খুব ভাল নয়। এই দৃশ্যটা খুব ভাল ক'রে ফোটানো হয়নি। আচ্ছা যাই।—

তিনি রুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি শিল্পী। মার্থা ছবিটা আবার বাড়ীতে নিয়ে যায়।

মার্থা ভাবে, কি সুন্দর, করুণ তাঁর চোখ দু'টি! কি সুন্দর তাঁর ভ্রূ। অথচ তিনি থাকেন এক অন্ধকার ঘরে আর খান শুধু বাসি রুটি! কিন্তু প্রতিভাশালী লোকদের এই ভাবেই সাধনা ক'রতে হয়েছে।

আচ্ছা, যদি এই প্রতিভাশালী শিল্পীর পিছনে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু ব্যাঙ্কে টাকা, একটা বেকারী আর একটি খুব সুন্দর, স্নেহশীল হৃদয় থাকে, তবে—। কিন্তু মার্থা, এ শুধু স্বপ্ন!

এখন তিনি প্রায়ই মার্থার সঙ্গে কথা বলেন। মার্থার কথাগুলো বোধ হয় তাঁর বেশ ভাল লাগে। মার্থাও এখন ভাল ক'রে কথা ব'লতে শিখেছে।

মার্থা দেখে, তিনি যেন দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছেন। তার ইচ্ছা করে তাঁর সেই দুটো পাঁউরুটির সঙ্গে জোর ক'রে কিছু জ্যাম, কিছু জেলি, কিছু পাই দিয়ে দেয়। কিন্তু তার সাহসে কুলোয় না। সে জানে শিল্পীর গর্ব্ব, শিল্পীর অভিমান।

মার্থা আজকাল একটা নীল ছিটের সিল্কের জামা পরে। প্রসাধনও আজকাল কিছু কিছু করছে। তার একটু সুন্দর হওয়া যেন চাইই।

সেই খদ্দেরটি আর একদিন ঠিক আগের মতই আসেন। মার্থা বাসি রুটি দুটো আনতে যাবে, এমন সময়ে ফায়ার ব্রিগেডের শব্দ শুনে সকলে দরজার কাছে ছুটে যায়। সেই খদ্দেরটিও যান। মার্থা সেই সুযোগটি মুহূর্ত্তে ছাড়ে না। রুটি দুটোর ভিতরটা কেটে সে কিছু মাখন দেয় ঢেলে। তারপর আবার রুটি দুটোকে জুড়ে কাগজ দিয়ে বেঁধে রাখে।

খদ্দেরটি চলে গেলে মার্থা মনে মনে হাসে আজ আর তাঁকে শুধু বাসি রুটি খেতে হবে না। তিনি কি কিছু মনে করবেন? না, না, তাঁর মন অতটা নীচ নয়। সে সারাক্ষণ ধ'রে শুধু সেই কথা ভাবে। যখন তিনি পাঁউরুটির মধ্যে মাখন দেখবেন, তখন তাঁর কি আনন্দই হবে, মার্থা শুধু সেই কথাটাই মনে করবার চেষ্টা করে

তিনি রঙ-তুলি রেখে, ছুরি দিয়ে রুটি কেটেই দেখবেন—আঃ! মার্থার মুখ আরক্তিম হ'য়ে ওঠে। তিনি একবার খেতে ব'সে তার কথা মনে ক'রবেন কি? তিনি কি—

সামনের দরজার ঘণ্টা ভীষণ শব্দ ক'রে বেজে ওঠে। কে যেন ভয়ঙ্কর গোলমাল করে' আস্‌ছে।

মার্থা ছুটে যায়। দুটি লোক—একজন একটু অল্প বয়সের, তাঁকে সে একদিনও দেখেনি। আর একজন তার সেই খদ্দের, শিল্পী।

শিল্পীর মুখ ভয়ঙ্কর লাল, টুপি পিছন দিকে ঝুলে পড়েছে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো হ'য়ে উঠেছে। শিল্পী ঘুসি তুলে মার্থার দিকে ছুটে আসেন। হ্যাঁ, মার্থারই দিকে…!

চীৎকার ক'রে ওঠেন—বুড়ী, শয়তান, জোচ্চোর…

অপর জন তাঁকে টেনে নিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

—আমি যাব না, তিনি চীৎকার ক'রে ওঠেন, আমি একে শিক্ষা দিতে চাই।

শিল্পী ছুটে গিয়ে মার্থাকে বলেন—তুমি আমার সর্বনাশ করেছ। হ্যাঁ, সর্বনাশ…তাঁর নীল চোখ দুটো জ্বল্‌তে থাকে।

মার্থা অসহায়ভাবে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার তার নীল সিল্কের জামাটার দিকে তাকায়।

অন্য ভদ্রলোকটি ততক্ষণে সেই শিল্পী খদ্দেরকে ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে মার্থাকে বলেন, আপনাকে ঘটনাটা আমার বলা উচিত। আমরা দু'জনেই এক অফিসে

চাকরী করি। ও একজন ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। ও তিন মাস ধ'রে একটা বড় হলের প্ল্যান আঁকছে, ছবিটাতে অনেক টাকা পুরস্কার আছে। সে তার প্ল্যানে কাল সবে কালি দিয়েছে। আপনি হয়তো জানেন, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান প্রথমে পেন্সিলে আঁকে। ছবি আঁকা শেষ হ'লে, বাসি রুটি দিয়ে সেগুলি ঘ'সে মোছে। রবারের চেয়েও বাসি রুটি বেশী কার্য্যকরী কিনা! ও তাই আপনার 'বেকারী' থেকে প্রায় বাসি রুটি কেনে। আজ আপনি হয়তো জানেন—হ্যাঁ, রুটির মধ্যে কি ক'রে যেন মাখন ছিল। আর সমস্ত ড্রইং-এ মাখন প'ড়ে—তাই, আচ্ছা আসি।

মার্থা পিছনের ঘরে গিয়ে ধীরে ধীরে তার নীল ছিটের সিল্কের জামাটা খুলে ফেলে। আগেকার মোটা মেটে রংএর জামাটা আবার গা'য়ে দেয়। তারপর তার যাবতীয় প্রসাধনের সামগ্রী আস্তে আস্তে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।

নীল আকাশ বোধ হয় কালো হ'য়ে আসছে।

আলোচনা—

বাঙ্গালা ভাষায় অরাজকতা

কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিয়া আমার জনৈক আত্মীয়কে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময়ে ইহাদের মধ্যে একখানি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই পুস্তকখানির নাম "সাহিত্য-প্রবেশ ব্যাকরণ" এবং ইহার লেখকের নাম মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পুস্তক-খানির "বিজ্ঞাপন" পড়িয়া জানিলাম, "ইহার বয়স্ ৭০ বৎসর। এই ৭০ বৎসরের মধ্যে ইহা আশীবার ছাপাইতে হইয়াছে। তিন পুরুষ ধরিয়া লোকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছে।"

পুস্তকখানি খুলিতে খুলিতে "অশুদ্ধি-শোধন প্রকরণ" দৃষ্টিগোচর হইল। এখন যাহা আমার বিস্ময়কর বোধ হইল, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল :—

১। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ত্রৈবার্ষিক—অশুদ্ধ; ত্রিবার্ষিক—শুদ্ধ।" ত্রৈবার্ষিক—পদ হইতেই পারে না। ইহার পরিবর্ত্তে ত্রিবার্ষিক (যাহা তিন বৎসর ধরিয়া হইয়াছে; অতীতার্থে) ও ত্রৈবর্ষিক (যাহা তিন বৎসর ধরিয়া হইবে; ভবিষ্যদর্থে) এই দুইটী পদই হইবে। "বর্ষস্যাভবিষ্যতি" (পাণিনি)। তিনি দুইটী পদ না দিয়া একটী মাত্র পদ দিলেন কেন? দ্বৈবার্ষিক—পদের পক্ষেও এই নিয়ম।

২। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহারাজা—অশুদ্ধ; মহারাজ—শুদ্ধ।" বিদ্যারত্ন মহাশয় এখানেও সাংঘাতিক ভুল করিয়াছেন। মহারাজা—পদ শুদ্ধ। ইহার অর্থ—মহান্ রাজা যস্মিন্ বা যস্যাম্ (বহুব্রীহি)। যে দেশে বা নগরীতে বড় রাজা আছেন, সেই দেশ বা নগরীকে "মহারাজা দেশ বা নগরী" বলিতে পারি। মহারাজ—শব্দের অর্থ "বড় রাজা।"

৩। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "সত্ত্বাধিকারী—অশুদ্ধ; সত্তাধিকারী—শুদ্ধ।" এখানেও বিদ্যারত্ন মহাশয় অদ্ভুত ভুল করিয়া বসিয়াছেন। শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হইলে "স্বত্বাধিকারী" লেখাই সুসঙ্গত।

৪। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "সুবুদ্ধিমান্—অশুদ্ধ; বুদ্ধিমান্ বা সুবুদ্ধি—শুদ্ধ।" "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদ্ অর্থ-প্রতিপত্তিকরঃ।" ইহার অর্থ এই যে, বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা যদি অর্থের প্রতিপত্তি হয়, তাহা হইলে কর্ম্মধারয়-সমাস-নিষ্পন্ন পদের উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইতে পারে না। সত্যই ইহা ব্যাকরণের কথা। তবে "অতিশয়"-অর্থ বুঝাইলে, মত্বর্থীয় প্রত্যয়ের বিধান আছে। উদাহরণ—

(ক) "ন বিরেচ্যো নবজ্বরী।"

(খ) "বর্জ্জয়েদ্ দ্বিদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ম্।
নবজ্বরমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী॥" (আয়ুর্বেদ)

৫। বিদ্যারত্ন মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, "পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের।" তিনি "পাশ্চাত্য" এইরূপ বানান্ লিখিয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত বানান "পাশ্চাত্ত্য"। "দক্ষিণাপশ্চাৎ-পুরসস্ত্যক্" (পাণিনি)।

এই গ্রন্থে আরও অনেক সাংঘাতিক ভুল আছে। স্থানাভাবে সমস্তগুলি দেওয়া হইল না। এরূপ ভুল লিখিলে ছাত্রগণের ক্ষতি হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, Text Book Committeeর পণ্ডিতগণ বিগত সত্তর বছর ধরিয়া এইদিকে উদাসীন আছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর

যুদ্ধোত্তর শিক্ষায় নববিধান

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ., এইচ্. ডিপ্. এড্. (ডাবলিন)

চৈত্র-সংখ্যা প্রবর্ত্তকে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা বিষয়ে কেবলমাত্র শিক্ষার আদর্শ লইয়া বিচার করিয়াছি; ইহার কার্য্যকরী দিক্ লইয়া কিছুই বিচার করি নাই। এখানে দেখা যাউক—এই উচ্চ আদর্শকে বজায় রাখিতে হইলে, শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুকে কি ভাবে সংস্কারসাধন করা যাইতে পারে। শুধু আদর্শকেই বড় করিয়া ধরিলেই হইবে না, কার্য্যক্ষেত্রে সেই আদর্শকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না, তাহাও দেখা উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধরত দেশ ও জাতিগুলির নানা সমস্যা এদেশেও বড় হইয়া দেখা দিবে। প্রথম প্রতিক্রিয়া হইবে বেকার-সমস্যা। যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতে এদেশের লোক অধিক সংখ্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত না থাকিলেও, অনেকগুলি ছোট বড় কলকারখানা (যার প্রয়োজন একমাত্র যুদ্ধকালেই) যুদ্ধবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সেই সব কলকারখানার শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়িবে। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা অতি অল্পই; কারণ, সমগ্র কর্ম্মেচ্ছু বা কর্ম্মঠ ব্যক্তির তুলনায় এই সব কলাকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখা অতি অল্পই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শতকরা ৮৫ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্যের সহিত জড়িত। অত্যধিক লোক কৃষিকার্য্যে রত হওয়ায়, ভারতের আর্থিক সম্পত্তির উন্নতি হয় নাই। দেশে যতদিন না শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হয়, ততদিন আর্থিক উন্নতির কোন আশা নাই। কৃষিকার্য্যে কোনরূপে উদর-পূরণের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন-যাপনের উচ্চমান রক্ষিত হইতে পারে না।* কাজেই এদেশে কিছু কিছু Heavy Industries ও তাহার সহিত বহু সংখ্যক অন্যান্য কলকারখানার প্রচলন করিতে হইবে (ইহার সহিত কুটীরশিল্পও অবশ্য থাকিবে)।

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে, চাই দেশব্যাপী বৃত্তিশিক্ষার (Vocational education) ব্যবস্থা। এই বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা শুধু নামমাত্র হইলে চলিবে না—সত্যকারের বৃত্তিশিক্ষা হওয়া চাই। ইহার ফলে অনেকে যাহাদের কৃষির অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তাহারা নিজ নিজ আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিবে। শতকরা ৫০ জন কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার অধিক থাকিবার প্রয়োজন হয় না। অবশিষ্ট লোককে শিল্প ও সমাজের অন্যান্য কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এখন হয়ত অনেকে বলিবেন, দেশব্যাপী বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সকল লোককে মিস্ত্রী আর কারিকরে পরিণত করিলে শিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে, উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। সত্য বটে, আমাদের দেশের লোকের বৃত্তিমূলক শিক্ষা অপেক্ষা কৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রতি আস্থা ও আকর্ষণ অধিক (তাহার কারণ দেড়শত বৎসর ধরিয়া কৃষ্টিমূলক শিক্ষা সমাজে একটা গৌরব ও গর্ব্বের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং সাধারণ ছাত্রের স্বাস্থ্যও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত অনুকুল নহে); কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বর্ত্তমান যুগের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এক বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার বৃত্তিশিক্ষার অবস্থায় নাই। বর্ত্তমান কালের বৃত্তিমূলক শিক্ষার খাঁটি কৃষ্টিমূলক শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে কম বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিৎ অধ্যাপক ডিউই তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন।

(ক) তিনি বলেন, বর্ত্তমান যন্ত্র ও বিজ্ঞানের যুগে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার এত বেশী হইয়াছে যে, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় নিজ নিজ যন্ত্রপাতি লইয়া ওস্তাদ কারিকরের কাছে শিক্ষানবিশী করিলে বৃত্তি-বিষয়ক জ্ঞান বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা ছাড়াও পূর্ব্বেকার বৃত্তি-শিক্ষার বুদ্ধির স্থান অল্পই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান শিল্পের উন্নতির চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়ায়, Intellectual content and cultural possibility খুব

* মিঃ মাসানি গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক একটি কৃষক-পরিবারের (স্বামী, স্ত্রী ও তিনটি শিশু লইয়া) গড়পড়তা বার্ষিক আয় হইল ২০০৲। উহা হইতে বার্ষিক ৩০৲ রাজস্ব এবং ৫০৲ ঋণের সুদ পরিশোধ করিয়া থাকে মাত্র ১২০৲ অর্থাৎ মাসিক ১০৲। ইহাতেই তাহাকে নিজ পরিবারের ও গরুবাছুরের ভরণপোষণ করিতে হয়।

বেশী স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমানের বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা এক কারিকরের পক্ষে অন্য কারিকরকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়—কাজেই এই শিক্ষার ভার বিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ ব্যবহারিক (experimental) হইয়া উঠিতেছে; অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় আর শুধু দোহাই বা তর্কবিতর্কের উপর নির্ভর করে না; কাজেই এই বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানও মানুষের কৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানের উন্মেষের সাহায্য করিতেছে।

(গ) শিশু যেমন খেলার মধ্য দিয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়া লয়, বয়স্ক ব্যক্তিও তেমনি কাজের মধ্য দিয়াই সহজে আপনাপন শিক্ষার বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। শিক্ষার সহজ উপায় হইল, Learning by doing (ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই নিয়মটি গ্রহণ করা হইয়াছে)।

বৃত্তি-শিক্ষা সম্বন্ধে এত কথা বলা হইল, তাহার কারণ দেশের শিল্পপ্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে, ব্যাপকভাবে বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা যদি স্কুল-কলেজের মধ্য দিয়া না হইয়া শুধুই কারখানা ঘরের মধ্যে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহা ব্যর্থ হইবে; কেননা, এ পরাধীন দেশে শিক্ষার চেয়ে ডিগ্রীর মূল্য অধিক। বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা এমন ব্যাপকভাবে করিতে হইবে যে, অন্ততঃ শতকরা ৫০ জন লোক শিল্পের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ইংলণ্ডে দেখা যায়, শতকরা ১০।১২ জন এবং আমেরিকায় শতকরা ২৫ জন মাত্র কৃষিকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে, ইহার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার মতন পঞ্চ-বার্ষিকি পবিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। Planned Industrialisation চাই—তবে এই পরিকল্পনাটি কিভাবে হইবে, সে শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারিবেন।

(২) যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধনী ও নির্ধন সকলেই যাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে হইবে। তাহার পরের শিক্ষার ব্যবস্থায়, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা বিষয়ে প্রচুর সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহাতে বহু সংখ্যক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানেরাও শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীলোকদের অন্ধকারে রাখিলে, সমাজের আধখানা অঙ্গ যেমন পঙ্গু হইয়া থাকে, তেমনি মুষ্টিমেয় ধনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অগণিত দরিদ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা অবহেলা করিলে, সমাজ-দেহে দুষ্ট ব্রণের ন্যায় তাহারা আত্মপ্রকাশ করিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে, এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

(৩) শরীর ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য প্রাচীন গ্রীক্‌দের আদর্শ Gymnastic for the body and music for the soul, অর্থাৎ শরীরের পুষ্টির জন্য অঙ্গচালনা আর আত্মার পুষ্টির জন্য সুকুমার বিদ্যার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সেই সঙ্গে এ লক্ষ্যও রাখিতে হইবে যেন ষ্টেট্ এই ব্যায়ামপুষ্ট দেহের অপ-ব্যবহার না করে।

(৪) যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—Survival of the fittest জীব-জগতে সত্য হইলেও, সমাজ-জীবনে যে ইহা সত্য নয়, সেখানে ছোট-বড়, যোগ্য-অযোগ্য, সকলেরই স্থান আছে, সকলের মিলনে যে মহান্ ঐক্য গড়িয়া উঠে, তাহাকেই নব-শিক্ষা-বিধানে স্থান দিতে হইবে।

(৫) কৃষ্টির সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকাতেও ভারতবর্ষের ন্যায় নানা জাতির বাস। সেখানে মনীষীরা সর্ব্বজাতির কৃষ্টির একটা সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা বিদ্যায়তনের মধ্য দিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন।*

(৬) নিরীশ্বর শিক্ষাও বর্ত্তমান দুঃখের একটি কারণ। নূতন বিধানে শিক্ষায়তনে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা অতি সাবধানে করিতে হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা বলিতে কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না—ধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ ও মূল নীতিগুলি সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়, সেই আদর্শ ও নীতিগুলির কথাই বলিতেছি। ধর্ম্মের বাহ্য আচার বা অনুষ্ঠান

* Vide the Report of the commission on "Recent Social Trends in America"-Submitted to President Hoover.

আমাদের লক্ষ্যের বিষয় নহে। সাম্প্রদায়িকতা যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, পরধর্ম্মের প্রতি যাহাতে বিদ্বেষ প্রচার না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে, মানুষ যাহাতে এই পৃথিবীকেই চরম ও পরম সত্য বলিয়া মনে না করে—মৃত্যুর পরেও যে এক নূতন জগৎ আছে এবং সে জগতের জন্যও যে মানুষের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজনীয়, এ শিক্ষাও দিতে হইবে।

(৭) সাম্প্রদায়িক (Denominational) বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে; কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে উহা একেবারেই অচল। এই সব সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলি মিলনের মধুর সুর না গাহিয়া বিচ্ছেদের ভৈরব রাগিণীকে সপ্ত সুরে বাজাইয়া তুলে। কাজেই খৃষ্টান স্কুল, হিন্দু স্কুল, মুসলমান স্কুল প্রভৃতি ছাপমারা স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, Inspector of schools for Mahammedan Education, Inspector of schools for Schedule Castes প্রভৃতি পদগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে ইহাদের স্থান নাই। এ বিষয়ে অধ্যাপক অমরনাথ ঝা (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর) নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মিলনের কাশ্মীর অধিবেশনে সুন্দরভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন—

"But the sectarianism in modern institution spells disaster and may to a large extent be responsible for the separatist movements that are disturbing the harmony of national life. There are so many occasions for discord and misunderstanding later in life that at least while youths can still have ideals and generous impulses and noble desires, they should be spared the jarring sounds of the holy strife of disputatious men.'......It is to the educationist that the country must look for the eradication of the canker that threatens to destroy the solidarity of the Indian nation. The teacher must himself be free from the cramping influence of narrow communalism; he must think in terms of India and of humanity; he must in his action and words demonstrate the complete impartiality as between creed and creed, sect and sect; he must encourage a nationalistic and and humanitarian outlook."

অর্থাৎ আজকাল বিদ্যালয়গুলিতে (denominationed schools) যে ভেদনীতি প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। যে স্বাতন্ত্র্যবাদ জাতীয় জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী হইল এই সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলি। উত্তরকালে জীবনে বিভেদ ও বিবাদের এত সুযোগ মিলিবে যে, যুবকদের অন্ততঃ উচ্চ আদর্শ, উদার প্রেরণা ও মহান্ সঙ্কল্পের দ্বারা চালিত হইতে দেওয়া ও "তার্কিকদের ধর্ম্মযুদ্ধ" হইতে রক্ষা করা উচিত।......যে ভেদজ্ঞান কুৎসিৎ ক্ষতের ন্যায় ভারতের ঐক্যকে নিয়ত ক্ষুণ্ণ করিতেছে, তাহার ধ্বংসের জন্য সারা দেশ শিক্ষকদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। শিক্ষক নিজে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবেন ও ভারতবর্ষ এবং মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়াই সর্ব্বদা বিচার করিবেন; কথায় ও কার্য্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন এবং জাতির ও মনুষ্যত্বের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিতে উৎসাহ দান করিবেন।

(৮) বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বমানবতা যে সব দেশের সাহিত্যে ও ধর্ম্মে প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলির সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

(৯) বর্ত্তমানে ইউরোপের কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে জাতি-বিদ্বেষ, ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ও অনুদারতা প্রকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাহাকে একেবারে দূর করিতে হইবে। শিক্ষায়তনকে ধর্ম্ম ও জাতিবিদ্বেষের ক্ষেত্রে কিছুতেই পরিণত হইতে দেওয়া হইবে না।

(১০) ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে মারামারি কাটাকাটি নিত্য লাগিয়া আছে। এই কলহ অজ্ঞানতাপ্রসূত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই নব শিক্ষাবিধানে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হইবে—পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মমত আছে, সকলেরই মূলকথা ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম নাই—সমস্ত ধর্ম্মই সত্য।

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্—সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।"

সমস্ত ধর্ম্মেরই মূল ভগবান্। সেই ভগবান (যাঁহার বহু নামের মধ্যে একটি নাম হরি) সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঈশ্বরই সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল।

(১১) স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি সকলের কাম্য হইলেও, শিক্ষা-ব্যবস্থা হইবে অতি উদার ও আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন।

এই যে পৃথিবীতে এত ঘন ঘন প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিতেছে, মানুষের ধন, প্রাণ, সভ্যতা, সমাজ সমস্তই ধ্বংস পাইতে

বসিয়াছে, তাহার হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উপায় কি? মানুষের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল মনীষীই ব্যথিত ও চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনেই এই বিপদের মেঘ কাটিতে পারে। ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা কমিশনার মহাশয়ও কাশ্মীরের শিক্ষক-সম্মিলনে এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কয়েক ছত্র তুলিয়া দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

"যে ভয়ঙ্কর বিপদ্ এক পুরুষের মধ্যে দুইবার ঘটিল, সেই বিপদ্‌কে শুধুই পুনরায় ঘটিতে দেওয়া বা বন্ধ করা নয়, যে যেখানেই বাস করুক না কেন, সকলের জন্য এক সুন্দর নূতন পৃথিবী রচনা করিবার জন্য যদি আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হই—আর আমরা যে দৃঢ়সঙ্কল্প, সেকথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—তাহা হইলে এই কথাই বলিব যে, সুচিন্তিত ও ব্যাপক শিক্ষার উপরই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

"সর্ব্বগ্রাসী দেশগুলি যদি বিশ্বাসের অযোগ্য অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষার দ্বারাই নিজ নিজ দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্যকে বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করিতে পারে যে, তাহাদের কাছে তাহা শাস্ত্রবাক্যেরই মতন অমোঘ বলিয়াই মনে হয়;—যদিও আমাদের কাছে তাহা জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে ছাড়া আর কিছুই বলিয়া মনে হয় না; তাহা হইলে আমরাও কি সেই শিক্ষারই সাহায্যে পৃথিবীতে সত্য, সুন্দর ও স্বাধীনতায় প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি করিতে পারিব না?

"শিক্ষা-সংস্কারের সমগ্র পরিকল্পনাটির লক্ষ্য হইবে—প্রতি বালক-বালিকার, প্রতি নরনারীর সমগ্র বিশ্বের শান্তি-প্রচেষ্টা।"

উপসংহারে পুনরায় বলি, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই, কারণ যুদ্ধোন্মত্ততা একটা সংস্কারবিশেষ। এই সংস্কার (ডাঃ ফ্রয়েড ইহাকে Death Instinct বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) সময়ে সময়ে সমগ্র জাতিকে ভূতের মতন পাইয়া বসে; তবু আমাদের বিশ্বাস, এই Death Instinct বা Instinct of Aggression যাহাই হউক না কেন, উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা ইহাকে কথঞ্চিৎ অবদমিত রাখা যাইতে পারে এবং যদি ইহা সত্যই হয়, তাহা হইলে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে তাহা কম আশ্বাসের কথা নহে। এইজন্যই আমরা সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, এই বিশ্বময় অশান্তির মধ্য হইতে যে নূতন সমাজের সৃষ্টি হইবে, সেই সমাজের মুখ চাহিয়া, মানবজাতির কল্যাণার্থে তাঁহারা যেন পৃথিবীর সমস্ত তীক্ষ্ণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, স্থিতধী, একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধক ও শিক্ষা-বিদ্‌দের আহ্বান করিয়া নবীন সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজনানুসারে সমগ্র জগতের জন্য এক শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। নবীন সৃষ্টির জন্যই ধরিত্রীর এই প্রবল সৃজনবেদনা—বেদনার উপশমে সত্যই সুদূরদৃষ্টিসম্পন্ন নরনারীসমন্বিত এক মহান্ সমাজের সৃষ্টি হইবে। সেই সমাজকে, সেই নূতন অতিথিদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নূতন জগৎ বলিতে আমাদের মনে হয় না, পৃথিবীর ভৌগলিক সীমারেখারই শুধু পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার সহিত পরিবর্ত্তিত হইবে রাষ্ট্রনেতাদের কঠিন হৃদয়। দুর্ব্বল, পীড়িত, লাঞ্ছিত, পরাধীন জাতিরাও কিছু কিছু অধিকার ও সুখ-সুবিধা ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু আমাদের ঐ সমস্ত স্বপ্নই বৃথা হইবে, যদি সেই অনাগত নববিধানে পূর্ব্ব পূর্ব্বকার মতই শিক্ষা-পরিকল্পনাপ্রস্তুতিতে শিক্ষা-বিশারদ্‌দের আহ্বান না আসে। শিক্ষা-পরিকল্পনা শিক্ষাবিশারদদের হাতে না থাকিয়া রাষ্ট্রনেতাদের অঙ্গুলি-হেলনে চালিত হইতেছে বলিয়াই শিক্ষার এবং জগতের আজ এই দুর্দ্দশা। এইজন্যই মহামতি প্লেটো বলিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইবেন একজন জ্ঞানী দার্শনিক পণ্ডিত। আশা করি, রাষ্ট্রনেতারা পূর্ব্বের ন্যায় এবার আর ভুল করিবেন না—শিক্ষাবিশারদদের নবীন সমাজের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনরচনায় আহ্বান করিবেন।
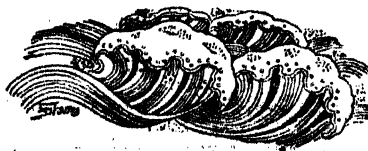
পঞ্চ দ্বীপ

(সুমাত্রা ও সেলিবিস্)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

পঞ্চ দীপ নয়—পঞ্চ দ্বীপ! মহাসিন্ধুবক্ষে এই পঞ্চ-দ্বীপ রূপ পঞ্চদীপ সাজাইয়া প্রকৃতি দেবী কোন্ বিরাট্ পুরুষের পূজা বা আরতি করিতেছেন কে জানে?

মালয় উপদ্বীপ হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিলে, প্রথমেই পদার্পণ করা যায় সুমাত্রায়। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মাঝখানে সঙ্কীর্ণ মালাক্কা প্রণালী। সুমাত্রার এবং দ্বীপাকার প্রায় মালয় উপদ্বীপের আকৃতি অনেকটা একপ্রকার। তবে সুমাত্রা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রশস্ত। সুমাত্রার পূর্ব্ব পার্শ্বেই যাভা বা যবদ্বীপ। উভয়ের মধ্যস্থলে অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সুন্দা প্রণালী। যাভার পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রায়ই উহাকে স্পর্শ করিয়া বালি দ্বীপ অবস্থিত। যাভা হইতে কিছু দূর উত্তরে আগাইয়া যাইলে, বোর্ণিয়ো নামক বৃহৎ দ্বীপ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বোর্ণিয়োর পূর্ব্ব পার্শ্বে সেলিবিস। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জলরাশি ম্যাকাসার প্রণালী আখ্যায় অভিহিত। এই পঞ্চ দ্বীপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ক্রমশঃ আমরা "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক-পাঠিকাকে প্রদান করিব। বারিধিবক্ষে বিরাজিত মায়াপুরীস্বরূপ এই দ্বীপাবলী মালয় জাতির বাস-স্থলী। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ আখ্যায় অভিহিত দ্বীপপুঞ্জে এই পঞ্চ দ্বীপ ছাড়া আরও অনেক দ্বীপ আছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া এই পঞ্চদ্বীপ যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, অন্যগুলি সেরূপ নহে।

প্রকৃতি দেবী কিরূপ অপরূপ রূপে এই দ্বীপাবলীকে সাজাইয়াছেন, তাহা না দেখিলে উপলব্ধি করা সহজ নয়। শুধু নানা রকম অদ্ভুত উদ্ভিদ্ নয়—বহু প্রকার বিচিত্র ।—বিচিত্রকায় পশু, পক্ষী ও পতঙ্গ এই পঞ্চ দ্বীপকে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীপূর্ণ রঙ্গমঞ্চ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশেই ওলন্দাজ জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই দীর্ঘকালের প্রাধান্য আজ জাপানের প্রতিকূল প্রবাহে পর্য্যুদস্ত হওয়ায়, বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সম্প্রতি এই দ্বীপাবলীর উপর পড়িয়াছে

সুমাত্রা

সুমাত্রা যবদ্বীপ হইতে তিন গুণ এবং নেদারল্যাণ্ডস্ হইতে তের গুণ বৃহত্তর। কিন্তু এরূপ বৃহত্ত্ব সত্ত্বেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ইহার গুরুত্ব যবদ্বীপ এমন কি সুক্ষুদ্র বালি অপেক্ষাও অল্প। দুর্গম জঙ্গল ও জলা[illegible] পরিপূর্ণ দ্বীপের অনেক অংশ এখনও আমাদের অজ্ঞাত। বারিসান্স নামক পর্ব্বতশ্রেণী এই দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান। বহু নদ-নদী এই দ্বীপে আছে বটে, কিন্তু তাহারা আকারে ক্ষুদ্র ও স্বভাবে রুদ্র বলিয়া মানুষের বিশেষ কোন কার্য্য ব[illegible] কল্যাণ সাধন করে না। এই দেশের প্রকাণ্ড হ্রদ ও জলা ব[illegible] বিলগুলিতে করাল কুম্ভীরকুল এবং একপ্রকার বিকটকা[য়] কর্কট বা কাঁকড়া বাস করে। এখানে এমন শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্ভেদ্য জঙ্গল আছে, যেখানে সভ্য মানব কখনও পদার্পণ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। এই সকল অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু তো আছেই, তাহা ছাড়া যে সকল বর্ব্বর জাতি বাস করে, তাহাদের প্রকৃতিও শ্বাপদের মতই হিংসাপ্রবণ। সুমাত্রার অনেকাংশ এখনও অপরিজ্ঞাত বলিয়া এই বিচিত্রকায় বৃক্ষ-লতা ও পশু-পক্ষীতে পূর্ণ বিশাল দ্বীপটী আমাদের নিকট রহস্যরাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক।

সুমাত্রার জল-বাতাস প্রায়ই যাভার মত, তবে যাভা অপেক্ষা এখানে কিঞ্চিৎ অধিক গরম। এই দ্বীপের অধিবাসীদিগকে আচিনীজ বলা হয়। আচিনীজদের প্রকৃতি যাভানীজ বা বালানীজদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় নহে। ইহাদের প্রকৃতি প্রচণ্ড ও প্রতিহিংসাপ্রবণ। ক্রুদ্ধ হইলে, ইহারা অত্যন্ত রুদ্রভাব ধারণ করে। আচিনীজরা সহজেই রা[গান্বিত] হয় এবং যাহার উপর রাগে, তাহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করে। তবে আচিনীজরা যাভানীজদের অপেক্ষা পরিশ্রমী। আচিনীজ শ্রমিক যাভানীজ শ্রমিক অপেক্ষা অধিক কাজ করিতে সমর্থ। ওলন্দাজরা যাভানীজদের উপর যত সহজে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে আচানীজদের উপর তাহা পারে নাই। আচিনীজরা যাভানীজ অপেক্ষাও নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান। ইহার কারণ আচিনীজদের দেহে আরব-রক্তাধিক্য রহিয়াছে। একদা দুঃসাহসী আরবরা মালয়দের মধ্যে ইসলাম ধর্ম

প্রচার করিয়াছিল; প্রায় সেই সময়েই পোতপরিচালন-পারদর্শী বহু আরব এই সুমাত্রা উপদ্বীপেও আসিয়াছিল। সেই সময়ে আরব-রক্তের সহিত মালয়-শোণিতের সংমিশ্রণে বর্ণসঙ্কর স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সম্ভূত হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের বিশ্বাস, আচিনীজরা সেই বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্তান। হজ্‌ করা বা ইস্‌লামের মহাতীর্থ মক্কায় গমন করিবার ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে প্রবল। অবশ্য যবদ্বীপবাসী মুসলমানরাও দলে দলে জাহাজযোগে হাজী হইয়া অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য মক্কাভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু আচানীজরা এ বিষয়ে যেন অধিক আগ্রহশীল। সুমাত্রায় দেখা যায়, মক্কাসমীপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তি বা হাজীকে তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গ অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

যাভানীজদের মত আচানীজরাও অর্থসঞ্চয় করিতে জানে না। জুয়া খেলিয়া বা মোরগের লড়াই প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া ইহারা বহু অর্থ ব্যর্থ ব্যয় করে। তার উপর আচিনীজ বা কতকগুলি একান্ত অনিষ্টকর কদভ্যাসের বশবর্ত্তী। এই সকল কদভ্যাসের অন্যতম—গঞ্জিকাসেবন। গাঁজা খাইয়া প্রায়ই পাগল হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা সেখানে নিতান্ত কম নহে। এইরূপ ব্যক্তি সময়ে সময়ে তরবারি হস্তে জনতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া যাহাকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই আঘাত বা আক্রমণ করে। এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের ফলে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ লোক সম্পর্কে 'রান্ এমক' বাক্য ব্যবহৃত হয়। 'এমক্'টি এই দেশের শব্দ, পরে ইংরেজীতে প্রবেশ করিয়াছে। কাহাকেও এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিলে, প্রতিবেশী পথচারীরা স্ব স্ব গৃহে লুক্কায়িত হয় বা দূরে পলায়ন করে। যাহারা বিশেষ সাহসী, তাহারা 'রান্-এমক্' লোকটির সম্মুখে গিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করে এবং সম্ভব হইলে তাহাকে ধরিয়া রুদ্ধ স্থানে আবদ্ধ করে।

সুমাত্রার রাজধানী বা প্রধান নগর পাদাং। আর একটি নগরের নাম মেদান। ইহা অপেক্ষাকৃত নূতন। এই নগরের চারিদিকে 'প্লান্টেশান্' বা কৃষি-ক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত। রাবারের চাষই এই দেশে অধিক। ক্ষেত্রে ওলন্দাজপরিচালকের অধীনে চৈনিক ও আচিনীজ উভয় জাতীয় শ্রমিকদিগকে কাজ করিতে দেখা যায়। ঋজু বা সোজাভাবে সারি সারি দণ্ডায়মান রাবার গাছগুলি দেখিতে সুন্দর। রাবারবৃক্ষের বনগুলি এরূপ নিবিড় যে, সৌরকর সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই বৃক্ষ হইতে দুগ্ধবৎ একপ্রকার রস বা নির্য্যাস নির্গত হয়। সেই নির্য্যাস জমিয়া রাবারে পরিণত হয়। গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের নীচে পাত্র ঝুলাইয়া রাখা হয়। নির্গত নির্য্যাস সেই পাত্রে পতিত হয়। পরে বড় বড় ক্যানে সেই আঠাবৎ পদার্থ ঢালিয়া লওয়া হয় এবং সেই ক্যানগুলি কলে ও কারখানায় পাঠান হয়। সুমাত্রা অপেক্ষাও অধিক রাবার মালয় উপদ্বীপে উৎপন্ন হয়।

সুমাত্রার উত্তরাংশই আরব-রক্তযুক্ত আচিনীজদের বাসস্থান আবিন। আবিনের দক্ষিণে অন্যান্য মালয় জাতি বাস করে। ইহাদের ভিতর বাটক, কোরিঞ্চি, জাম্বি প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। বাটকরা মুসলমান নহে। পরন্তু মুসলমান আচিনীজ ও যাভানীজ প্রভৃতি সম্প্রদায় ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ইহারা পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মার পূজা করে। বাটক-পুরোহিতেরা সর্প লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করে এবং নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্র অর্থাৎ যাদু বিদ্যা জানে। স্ত্রী-পুরোহিতও আছে। বাটকরা নরমাংস খাইত বলিয়া কথিত। অল্প কাল পূর্ব্বে কোন কোন বাটক মাংস-বিক্রেতাকে বাজারে মনুষ্যমাংস বিক্রয় করিতে দেখা গিয়াছিল, এইরূপ সংবাদ আমরা শুনিয়াছি। তবে এই অতি জঘন্য প্রথা অধুনা আর দেখা যায় না। প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টাতেই এই নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। যাহারা এই জঘন্য কার্য্য করিত, তাহাদের অধিকাংশই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়াও জানা যায়। বাটকরা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। ইহাদের গৃহগুলি দীর্ঘদেহ দারুদণ্ডাবলীর উপর দণ্ডায়মান। ছাদ উচ্চ। ছাদের গায়ে সাপের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করার প্রথা প্রচলিত। এই ক্ষোদিত সর্পমূর্ত্তিগুলি গৃহস্থকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, এইরূপ বিচিত্র বিশ্বাস বাটকদের মনে বদ্ধমূল। কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান গৃহে প্রবেশ করিবার পথ। বাড়ীগুলি বড়। কোন কোন বাড়ীতে আটটি পরিবার একত্র থাকে।

এইরূপ সার্ব্বজনীন গৃহ বোর্ণিয়ো, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপেও দেখা যায়। রন্ধন করিবার চুল্লী একটি মাত্র। প্রত্যেক পরিবার ইহা ব্যবহার করে। এই চুল্লী রাবণের চিতার মত সর্ব্বদা জ্বলে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য এক একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাটক নরনারী উভয়েই নীলে রঙীন বস্ত্র পরিধান করে। এমন কি ইহারা অঙ্গুলীগুলিও ইণ্ডিগো বা নীলে রঞ্জিত করিয়া থাকে। কুকুর এবং শূকর গ্রামের সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করে। আবর্জ্জনাসমূহ উদরস্থ করিয়া ইহারা ঝাড়ুদারের কার্য্য করিয়া থাকে। শূকর দেখিয়া বুঝা যায়, ইহারা মুসলমান নয়। যাভা এবং বলি অধিবাসীদের মত ইহারাও নৃত্যানুরাগী। পল্লীতে পল্লীতে প্রায়ই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। বাটক এবং সুমাত্রার অধিবাসী অন্যান্য সম্প্রদায়ও প্রধানতঃ কৃষকের কাজ করে। এখানে মহিষের দ্বারা হল ও মই চালিত হয়। মহিষগুলি বেশ সুশিক্ষিত। মই দিবার সময়ে দেখা যায় মহিষেরা উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ধানের নূতন গাছগুলিকে কখনও পদতলে পিষ্ট করে না।

এক প্রকার পাখী ধান্যের অশেষ অনিষ্ট করে। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য বাটক কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্বে কলা বা নারিকেলকুঞ্জের তলদেশে বাঁশের মঞ্চ নির্ম্মাণ করে। এই মঞ্চের উপর চড়িয়া বাটক-বালক-বালিকারা বিস্ময়কর নৈপুণ্যসহকারে ধান্য-ধ্বংসী পক্ষী-কুলকে বিতাড়িত করার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে। এই পাখীগুলিকে ইংরেজীতে 'প্যাডি বার্ড' অর্থাৎ 'ধান্য-পক্ষী' বলা হয়। ইহারা দেখিতে সুন্দর।

সেলিবিস্

সেলিবিস সুন্দা দ্বীপাবলীর অন্যতম। এই দ্বীপটির আকার অদ্ভুত। প্রখ্যাতনামা ম্যাকাসার প্রণালী ইহাকে বোর্ণিও হইতে পৃথক্ করিতেছে। সেলিবিসের আকৃতি অনেকটা ষ্টারফিস্ নামক সামুদ্রিক মৎস্যের মত। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসুলভ বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী এখানে যেন পূর্ণোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। নিবিড় অরণ্যে আবৃত তুঙ্গতনু গুরুগম্ভীর গিরিশ্রেণী এবং ভয়ঙ্কর গভীর গহ্বর বা খাত এই দ্বীপের দক্ষিণাংশে প্রায়ই দেখা যায়। এখানেও সুমাত্রার মত দুর্ভেদ্য জঙ্গল বর্ত্তমান। বনৈশ্বর্য্যে চিত্তচমৎকারী নানা প্রকার বিচিত্র পুষ্পরাজি ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বিরাজিত রহিয়া যেন কারুকার্য্যকমনীয় পর্দ্দারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সেলিবিসে এমন কতিপয় পশুপক্ষী আছে, যাহা ইষ্ট ইণ্ডিজের অন্যত্র দেখা যায় না। এই দ্বীপে ১ শত ৬০ রকম পক্ষী রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯০ প্রকার বিচিত্র বিহঙ্গম এখানকার সম্পূর্ণ নিজস্ব। শুধু পক্ষী নয়, সেলিবিসের নিজস্ব প্রজাপতি এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গও ইহার বৈশিষ্ট্য।

উপকূলাংশের অধিবাসীরা মুক্তাহরণের জন্য ডুবুরীর কার্য্য করে। এক প্রকার সামুদ্রিক কচ্ছপ ইহাদের প্রধান আহার্য্য। এই দ্বীপের মালয় জাতিভুক্ত সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে তিনটি প্রধান—ম্যাকেসার, মান্দার ও বুগি। ম্যাকেসারেরা দেখিতে সুন্দর এবং ইহাদের দেহ সুগঠিত ও শক্তিশালী। ইহারা দৌড়, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম ভালবাসে এবং শিকারীও বটে। ইহারা নামমাত্র মুসলমান। কার্য্যতঃ ইহারা উপদেবতাদের ও কতিপয় জীবজন্তুর উপাসক। ওলন্দাজ সরকার ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রবয়নব্যাপারে নিপুণা। এই বস্ত্র সারংরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কুটীরগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। যাভানীজ বা বালিনীজদের মত নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য নাই বলিয়া ইহাদের গৃহগুলি সময়ে সময়ে সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে। গৃহকে দৃঢ় করিবার উপায় ইহারা জানে না।

এই দ্বীপের দক্ষিণাংশে বুগিরা বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ বণিক্ ও নাবিকের কাজ করিয়া থাকে এবং শান্তিপ্রিয় বলিয়া বিদেশীয়দিগের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। বুগি এবং ম্যাকাসার উভয়ের আকৃতি দেখিয়া নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন, কিঞ্চিৎ নিগ্রোরক্ত ইহাদের দেহে রহিয়াছে।

সুমাত্রা বা স্বর্ণদ্বীপ

মিনান্‌কাবো রমণী : সুমাত্রা

সুমাত্রার আদিম অধিবাসীদিগের সার্ব্বজনীন গৃহ

বাটক তরুণী : সুমাত্রা

অমিতাভ (শ্রীবিজয়) : সুমাত্রা
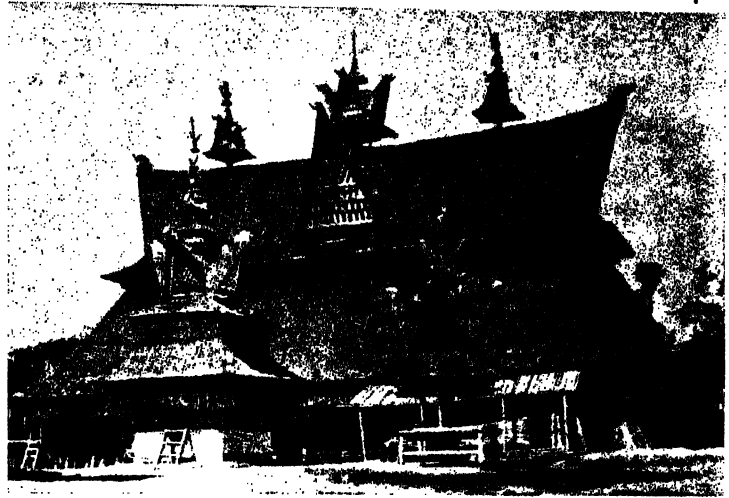
রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

বিগত এক মাসে ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই জাপানের করতলগত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণভাবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপান অধিকার করিয়াছে। বর্ম্মার যুদ্ধেও জাপান ক্রমসাফল্য লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বর্ম্মায় প্রোমের ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তৈলখনি অঞ্চলের মধ্যবিন্দু ইয়েনাংইয়াং-এ ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। মিত্রপক্ষের তীব্র প্রতিরোধের জন্য জাপানের ত্বরিতাক্রমণ-নীতি এখন বিলম্বিত হইতেছে। লিবিয়ার রণক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। শীতের প্রভাবে ইউরোপের রণক্ষেত্রে যে নিষ্ক্রিয়তা আশা করা গিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। রাশিয়া প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণীকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে এবং কিছুটা সাফল্য লাভও করিয়াছে।

মনোরম পরিবেশের মধ্যে একটী কাঠের কারখানা : আন্দামান

বসন্তকাল সমাগত। হিটলারের দুর্জ্জয় বাহিনী ঝঞ্ঝার মত বেগে কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে তাহা নিয়া মিত্র-পক্ষীয় রণপণ্ডিতগণের গবেষণার অন্ত নাই। হিটলারের অভিযান-নাটকে জাপান কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করিবে, তাহা নিয়াও যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, জাপান এবারে সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে; কেহ বলেন, সে ভারত আক্রমণ করিবে, আবার কাহারও ধারণা, সে অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, খুব সম্ভব জাপান ও জার্ম্মানীর সৈন্যবাহিনী পশ্চিম এশিয়ার কোনও এক স্থানে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের রণনীতি এবারে পরিচালিত হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জাপানের যে সব দ্রব্যসম্ভারের অভাব হইতে পারে, সে সব তাহাকে জার্ম্মাণীর নিকট হইতে লইতে হইবে। অপর পক্ষে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে অনেক প্রকার কাঁচা মাল জার্ম্মাণী প্রত্যাশা করে। সুতরাং এই উভয় সৈন্যবাহিনী যুক্ত হইতে না পারিলে তাহাদের পক্ষে বেশী দিন যুদ্ধ পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটিবে। শীঘ্র যুদ্ধ শেষ করার জন্য উহাই শত্রু পক্ষের ষ্ট্র্যাটেজি।

ঐ ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন অর্থনীতি পরিচালনার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু রণনীতি পরিচালনার পক্ষে ঐ ব্যবস্থার কতদূর উপযোগিতা আছে তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি। ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে সোভিয়েট রুশিয়া আর বৃটেন বা আমেরিকা হইতে কোনও প্রকার সামরিক সহায়তা পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ভারতমহাসাগরেও জাপানের নৌ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৃতীয়তঃ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ উভয়ই বিশেষভাবে বিপন্ন হইবে। চতুর্থতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশে ইংলণ্ড হইতে কোনও প্রকার সাহায্য আসিতে পারিবে না। সুতরাং শত্রু পক্ষের এই ষ্ট্র্যাটেজি যাহাতে ব্যাহত হয় সেই দিকে মিত্র পক্ষ বিশেষ সজাগ আছে এবং এইরূপ সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করিতে মিত্র পক্ষ বিশেষভাবে তোড়জোড় করিতেছেন।

জাপান আন্দামান দখল করিয়াছে। উহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কথা। তারপরে যদি জাপান সিংহল ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ দখল করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতমহাসাগরের উপর জাপানের অবাধ নৌ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। শত্রু পক্ষের এই ষ্ট্র্যাটেজির নিকট তাহাদের ব্রহ্মদেশ দখল করাও

অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মদেশ দখল করার ব্যাপারে জাপানের অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে। উহাতে সে চীন দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহায়তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এবং ব্রহ্মদেশের তৈল খনি আয়ত্তে আনিতে চাহে। চীন দেশে

বর্মার জঙ্গল-যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে ঃ ছবিতে ভারতীয় সৈন্যদের গভীর অরণ্যে চলাচল করিতে দেখা যাইতেছে

এ যাবৎ জাপান যে প্রকার রণনীতি পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য মিত্র পক্ষের বড় বড় মহারথীগণও বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে, জাপানের দুর্জ্জয় বাহিনী চীনবাসীদের নিকট পরাজিত হইয়াছে; সুতরাং জাপানের শক্তি-সামর্থ্য কিছু নয়। কিন্তু আমরা বহুদিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি যে, জাপান চীনবাসীকে তাহার বন্ধুত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করার জন্যই এইরূপ নীতি পরিচালনা করিয়াছে। ঠিক এইভাবে আমাদের দেশেও বিষ্ণু গুপ্ত চাণক্য এক সময়ে মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ রাক্ষসকে মিত্ররূপে পাইতে বাধ্য করিবার জন্যই নীতি পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন। উহা একটি উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক কৌশল। মিত্রপক্ষীয় রণপণ্ডিতগণ উহাকে জাপানের দৌর্ব্বল্য অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মহামতি চিয়াং কাইসেক এতদিন জাপানের কূটনীতি ব্যর্থ করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই বর্ত্তমানে জাপান ব্রহ্ম হইতে চীনকে বিচ্ছিন্ন করিবার পথ ধরিয়াছে। যদি উহাতে তাহারা সফলকাম হয়, তবে চিয়াং কাইশেকের পক্ষেও চীন দেশের নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিবে। ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংবাদে দেখিতেছি যে, জাপানী সৈন্যদল টঙ্গু অধিকার করিয়া আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়াছে। উহারা চীনা সৈন্যগণকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে—জাপানের সৈন্য পরিচালনা অবলোকন করিয়া এ কথা বেশ বোঝা যায়। আকিয়াবের পথেও তাহারা অনেক অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছিল। কিন্তু তার পরই আকিয়াবের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধি দুইটা খবর আসিয়াছে। তাহাতে আকিয়াবের অবস্থা ঠিক বোঝা যায় না। বঙ্গোপসাগরে আকিয়াবের পরবর্ত্তি বন্দরই হইতেছে চট্টগ্রাম। ব্রহ্মদেশ হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার তিনটী পথ আছে। প্রথম চট্টগ্রামের পথ, দ্বিতীয় মণিপুরের পথ ও তৃতীয় উত্তর আসামে ডিব্রুগড়ের পথ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথে আসিতে হইলে শত্রুপক্ষকে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম দখল করিতে হইবে। কিন্তু চট্টগ্রামের পথে জাপানীদের আসিবার পক্ষে তত বেশী অসুবিধা দেখা যাইতেছে না। বিশেষতঃ ঐ পথে আসিতে হইলে তাহারা নৌবহের সুবিধাও পাইবে।

ভারতের বড়লাট মিঃ ওয়াভেল

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত-আক্রমণ এ সময়ে গৌণ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইবে, প্রথম ভারতমহাসাগরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনীর সঙ্গে মিলন। আমাদের এই অনুমান সত্যে পরিণত হইলে জার্ম্মাণীকে বন্ধু অথবা শত্রু যে ভাবেই হউক তুরস্কের ভিতর দিয়া অথবা তুরস্ককে পাশ কাটাইয়া আসিতে হইবে। যে ভাবেই হউক জার্ম্মাণী বুলগেরিয়ার সৈন্য সহায়তায়

তুরস্ক অতিক্রম করিবে। তাহাতে সে একদিকে ককেশাসে রুশিয়াকে আক্রমণ করিতে পারিবে ও অন্য দিকে সুয়েজ খাল দখল করিবার চেষ্টা করিবে। সুয়েজ খাল দখলের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্পেন শত্রু পক্ষে যোগ দিয়া জিব্রাল্টার আক্রমণ করে, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরস্থ মিত্র পক্ষের নৌবহর অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাতে ভারত মহাসাগরে জাপ-জার্ম্মাণ নৌ-যোগাযোগের সুবিধা হইবে। ইহাই শত্রুপক্ষের প্রধান ষ্ট্রাটেজি। উহাতে সফলকাম হইলে, ককেশাস্, ইরাক ও ইরানের তৈল খনির উপর জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহাতে তাহারা রুশিয়াকে মিত্র পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া ঐ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তবে আমাদের ভরসা এই যে, মিত্র পক্ষীয় রণপণ্ডিতগণ পূর্ব্বাহ্নেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শত্রু পক্ষের ঐ কৌশল বিনষ্ট করিয়া দিবেন। তাছাড়া জাপ-জার্ম্মাণ মিলনের পক্ষে দূরত্বের বাস্তব কঠিনতাও চিন্তনীয়।

রুশ-জার্ম্মাণ ফ্রন্ট

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আয়র্লণ্ড, ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষ এই তিনটী দেশের ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত। ঐ সব দেশের অধিবাসীগণের নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতা আছে এবং উহারা জাতিতে বৃটন নয়। এই তিনটী দেশ বিষয়ে বৃটন এ যাবৎ যে নীতি পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে তাহাতে ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, এই তিনটী দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি আজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পাইতেছেন না। বৃটিশের রক্ষণশীলদলের পরিচালিত নীতিই এজন্য দায়ী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মালয়ের সমগ্র ভূভাগ আজ যে দ্রুতগতিতে জাপানী বাহিনীর পদানত হইল তাহার অন্যতম প্রধান হেতুও জনসাধারণের ঔদাসীন্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানের পক্ষে সিংহল ও ম্যাডাগাস্কার আক্রমণ করা স্বাভাবিক। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, জাপানী বিমান সিংহলের কলম্বো ও ট্রিকোনমিলিতে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ঐ প্রকার বোমা বর্ষণ ভবিষ্যৎ আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ হইতে পারে, অথবা বন্দর ও ঘাঁটি ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলি নষ্ট করাও হইতে পারে। জার্ম্মানী ও জাপানী বাহিনী পশ্চিম এশিয়ার কোনও এক স্থানে মিলিত হইবার পরিকল্পনা শত্রুপক্ষের থাকিলেও, জার্ম্মানী রুশিয়াকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যই বর্ত্তমানে প্রথম প্রাণপণ করিবে। যদি রুশিয়া এবারকার জার্ম্মাণ অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে, তবেই শত্রুপক্ষ সত্বর যুদ্ধে হারিয়া যাইবে। সুতরাং রুশিয়ার প্রান্তরেই এবারেও পৃথিবীর ভাগ্য পরীক্ষা হইবে।

মানিনী

শ্রীপ্রতিভা দেবী

গোকুল চাষীর মেয়ে মানিনী।

গোকুলের বউ কচি মেয়ের ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের ঘটা দেখিয়া সাধ করিয়া নাম রাখিয়াছিল,—মানিনী। গোকুল সম্পত্তিপন্ন চাষী নয়, তবু বউ বায়না ধরিল, মেয়েকে মল গড়াইয়া দাও; গোকুল অনুনয় বিনয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বকুনি দিয়াও নিস্তার পাইল না। শেষে হরি পোদ্দারের কাছে গিয়া ধার করিয়া মেয়ের মল গড়াইয়া দিল। মেয়ে মল পায়ে দিয়া টলিয়া টলিয়া হাঁটে, বউ টিপি-টিপি হাসে আর বলে,—দেখ, মানু আমার মল পায়ে দিয়ে কেমন চলেছে! বলি, তুমি যে বড় গড়িয়ে দেবেনা বলেছিলে, এই পায়ে মল না দিলে কেমন হ'ত বল দেখি।

গোকুল স্বীকার করে—সত্যই না দিলে বড় অন্যায় হইত, বউয়ের বুদ্ধি আছে। দেনার টাকাটা কিন্তু কিছুতেই প্রাণে শান্তি দেয় না, বুদ্ধিরও তারিফ্ করে না। গোকুল সকালে মাঠে যাইবার সময়ে দাওয়ায় গামছা পাতিয়া বলে—এতেই চারটি চালভাজা দে ত বউ—শীগ্গির, বড় বেলা হ'য়ে গেল, আজ আর ভিজে ভাত খেয়ে যাওয়া হবে না, এতক্ষণ মাখমদের আধখানা জমি চষা হ'য়ে গেল। বউ তাড়াতাড়ি গামছায় চালভাজা ঢালিয়া দেয়, মানিনী কাছেই ছিল, সামনের জলের ঘটিটি দিল কাৎ করিয়া। চালভাজা ভিজিয়া গেল, বিষম রাগে গোকুল মেয়ের পিঠে এক চড় বসাইয়া দিয়া ভিজা চালভাজা গামছায় বাঁধিয়া লাঙ্গল কাঁধে তোলে। মানিনী ততক্ষণ তাহার যাত্রাপথ ক্রন্দন-মুখর করিয়া তুলিয়াছে। মেয়েকে কোলে তুলিয়া বউ পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করে, গালে গাল ঠেকাইয়া কত সোহাগের কথা বলে। ঘরে লোক নাই, আর বসিয়া থাকিলে চলে না, মেয়েকে কাছে করিয়া সে সমস্ত কাজ সারা করে; ভাত রাঁধিয়া, ভাতের থালা হাতে করিয়া আর মেয়েকে কোলে নিয়া সে মাঠে যায়। হাত হইতে ভাতের থালা নামাইয়া গোকুল বলে—আবার কেন এ্যাত কষ্ট করে' এলি বউ? আজ একটু সকাল করেই যেতাম। মানুর মুখটা রোদ্দুরে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; মেয়েকে কোলে নিয়া গোকুল হাওয়া দেয়, আদর করে। কৃত্রিম রোষে বউ কোল হইতে মেয়েকে ছিনাইয়া লইয়া বলে,—যাও, আর আদর কাড়াতে হবে না, কচি মেয়েটাকে তখন কি ক'রে চড় মেরে এসেছিলে মনে নেই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর থামে না বাছার! অনুতপ্ত গোকুল আবার সাধিয়া মেয়েকে কোলে লয়, বলে—তখন তাড়াতাড়িতে বড় রাগ হ'য়ে গেল কিনা! তা নাম রাখা তোর সার্থক হ'য়েছে বউ; কিন্তু আমার মনে হয়, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ নাম তুই রেখেছিস্। ছেলেবেলায় বউয়ের নাম ছিল ভামিনী; এখন সে শুধু গোকুলের বউ আর মানিনীর মা।

সেই মেয়েকে কোলে নিয়া, আদর করিয়া, তাহার কচি মুখে হাসি কান্নার খেলা দেখিয়া সাধ না মিটিতেই যখন গোকুলের বউ মারা গেল, মানিনীর বয়স তখন মাত্র তিন বৎসর। কিছুই নয়। সামান্য জর হইল প্রথমে, সর্দ্দি জর। গোকুল ডাক্তার ডাকে নাই, গরীব চাষার ঘরে ওইটুকুতে ডাক্তার-বদ্যি দেখানো চলে না। বউ ভাত খায়, কাজ করে। ক্রমে গা-টা একদিন যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। কাশির শব্দ খন্‌খনে। বউ বলে—বুকে ব্যথা। গোকুল সেদিন মাঠে গেল না, বউকে ভাত দিল না। বিছানায় শুইয়া থাকিতে বলিয়া সাবু রাঁধিয়া খাওয়াইল—বউকে আশ্বাস দিল, আজকের দিনটা উপোস দিলে, কাল জর-টর সব ছেড়ে যাবে। বউ যন্ত্রণায় ছটফট করে আর মাঝে মাঝে মানুর দিকে চোখ মেলিয়া তাকায়। রাত্রে কিন্তু তাহার দৃষ্টির স্থিরতা থাকিল না, বারে বারে এদিক ওদিক তাকায়, বিছানা ধরিয়া টানে আর বিড়্‌বিড় করিয়া কি যেন সব বলে। গোকুল ভোরে উঠিয়া নিতাই মোড়লের বাড়ী গেল। নিতাই সবিশেষ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল,—বড় ভাবনার কথা হ'ল রে গোকুল, হীরু ওঝাকে ডাক দে, দেব্‌তার দৃষ্টি লেগেছে।

যথাক্রমে ওঝা আসিল, রীতিমত ঝাড়ফুঁকও হইল। গোকুল ব্যগ্রভাবে বলিল—সারাতে যদি পার ওঝার-পো,

একখান নতুন গামছা আর ধান বেচে নগদ পাঁচ সিকা তোমায় দেব আমি।

ওঝা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল: গোড়াতে যে গেরাহি করবে না বাপু, ভাল ক'রে যখন চেপে বসেছে, তবে না আমায় ডেকেছ; দিষ্টি ত দেয়নি একেবারে কাঁধে ভর করেছে; দেখছ না ভাব ভঙ্গী? এ সব সিদ্ধ গুরুর কাছে বহুত পয়সা খরচ ক'রে শিখতে হয়েছে;—এখন দেখ, তোমার কপাল!

গোকুলের কপাল বোধহয় মন্দই ছিল, কারণ অমন প্রথিতযশা হীরু ওঝার জলপড়া ও সরিষা পড়ায় কিছুই ফল হইল না। কেবল মরিবার আগে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া বউ বলিল—আমি ম'লে বিয়ে করবে জানি, কিন্তু আমার মানু যেন কষ্ট না পায়। আমার মাসীর মেয়ে কদম—

বউয়ের মুখের কথা মুখেই রহিল, শেষ করা আর হইল না।

রোরুদ্যমানা মানিনীকে কোলে লইয়া গোকুল মাঠে মাঠে ঘোরে। ঘরে আর কিছুতেই মন বসে না। আজ দুদিন বউ তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। ঘরের প্রতিটি জিনিষে তাহার হাতের মঙ্গলশ্রী এখনও লাগিয়া আছে। জলের কলসীটি সুষ্ঠুভাবে বসানো, ঘরের আঙ্গিনা গোময় লিপ্ত—পরিচ্ছন্ন, তাহার সাধের রাঙ্গা কস্তাপেড়ে শাড়ীখানি বাঁশের আলনায় দোলানো; সবই তেমনি আছে; নাই শুধু সে নিজে। ক্রমে দু'মাস গত হইল। মানিনীকে লইয়া সে অস্থির হইয়াছে; কেবলই সে মা, মা করিয়া কাঁদে; এদিকে ধান কাটিবার সময় হইয়া আসিল। মেয়ে লইয়া থাকিলেও আর চলে না, গোকুল বড় মুস্কিলেই পড়িল। দূর সম্পর্কের এক পিসীকে গোকুল আনিয়াছিল রাঁধিয়া দিবার জন্য, সেও ত যাই যাই করিতেছে, সংসার ফেলিয়া সেই বা আর কতকাল থাকিবে ভাইপোর ঘরে! পিসী বলে—গোকুল, বিয়ে-থা একটা কর বাবা! সে ত ভাগ্যিমানী, সিঁদুর নোয়া নিয়ে চলে' গেছে, কিন্তু তোর ত বাবার ঘর বজায় রাখা চাই, কচি মেয়েটাকেই বা রাখে কে। তোকে থিতু করে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাই বাবা, আমায় ছুটি দে।

গোকুলের ভাবনার উপর ভাবনা বাড়িল। বউ বলিয়া গিয়াছে, "মানু যেন কষ্ট না পায়"। বউ তার মাসীর মেয়ে কদমের কথাও উল্লেখ করিয়াছিল, কথাটাকে সে শেষ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকেই বিবাহের কথা যে বলিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়; দেখিয়াই না হয় আসুক একবার। বিবাহে তার আর কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। কিন্তু বউয়ের কথা রাখিতে সে মাসীর মেয়ে কদমকে বিবাহ করিবে। বোনের মেয়ের সঙ্গে কিছু কদম খারাপ ব্যবহার করিবে না, আর এই জন্যই যে বউ তাহাকে বিবাহ করিতে বলিয়া গিয়াছে, এ কথাও ঠিক। মানুই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা; আর যে আসিবে সে শুধু মানুকে সুখে রাখিবার জন্য।

অবশেষে একদিন গোকুল চুঁপুইপোঁতা গাঁয়ে বউয়ের মাসীর বাড়ী গিয়া বিবাহের কথা পাড়িল। মাসী বিশেষ কিছু আপত্তি করিল না; আড়ালে একটু চোখের জল ফেলিয়া ভাবিল, কদমের বাপ ত আজ নাই, থাকিলে সে যা হয় করিত। চাষা-ভূষার ঘরে মেয়েও কিছু অত বড় হইত না তা হইলে। ভরা বারো বছরের মেয়ে কোন আর দুটো পাঁচটা নয়—একটা মেয়ে তার কচি, বড় হইলে পরের ঘরে যাইবে। লাল রঙের চেলী সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া কদমকে মাসী লইয়া আসিল। শ্যামল বর্ণ। কদম কুসুমের মতই নিখুঁত নিটোল শরীর। পূর্ণ দৃষ্টিতে গোকুল তাকাইল, পরক্ষণেই মহা ব্যস্তভাবে বলিল—না, না, দেখাতে হবে না আর, সেও ত,—কথাটাকে গোকুল অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিল।

বিবাহান্তে বউ ঘরে আনিয়াই মেয়ে কোলে লইয়া গোকুল বাহিরে চলিয়া গেল। শত অনুরোধেও শুভ অনুষ্ঠান কিছুমাত্র করিল না। পিসী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিল—সে কি আর যাবার জিনিষ গো! ঘর জোড়া বউ, তার শোকটা গোকুল আর কিছুতে ভুলতে পারছে না, কার ঘর কে করে! কদম মনে মনে ভীষণ ভ্রুকুটি করিল। বিধবা মায়ের একটি মাত্র মেয়ে সে, তাই মেয়ের অতি লালনের ফলে কদমের স্বভাব হইয়াছিল হিংসুক, বিবাক্ত। মাসখানেকের মধ্যেই কদম পাকা গৃহিণীর মত সংসারের ভার গ্রহণ করিল। ভোরে গোকুলের মাঠে যাইবার সময়

হয়, কদম তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠানে গোবর ছড়া দিয়া মুখ হাত ধুইয়া গোকুলের জন্য ভিজা ভাত বাড়িতে যায়; পরের আর সব কাজ হয়ত পিসীই করে। দুপুরে পিসী রান্না করে, কদম কাছে বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া থাকে। মানিনীকে স্নান করাইয়া নিজে হাতে খাওয়াইয়া দেয়। দুপুরে বলে—ও পিসী; ভাত কটা বেড়ে নিয়ে মাঠে যাও গো, কত বেলা হ'ল। ঐ একরত্তি মেয়ে তায় আবার সেদিন বিবাহ হইল, তাহার এতখানি বেহায়াপনা পিসীর ভাল লাগে না, বিরক্ত হয়; আবার সুখী না হইয়াও পারে না একটু। না, বউটা যত্ন-আত্তি করতে পারবে বাপু। একটু বেহায়া? তা হোক, ওর কি লজ্জা করে' থাকলে চলবে, বলে কথাতেই আছে—"যে নারী সতীনে পড়ে, বিধি তারে ভিন্ন গড়ে।" আবার মেয়েটার ওপরেও মায়া-মমতা আছে। যাই হোক বাপু, গোকুলের আমার বউ হ'য়েছে ভালই। যাহাই হউক, অবশেষে নিশ্চিন্ত মনে পিসী একদিন নিজের সংসারে ফিরিয়া গেল। আসিবার সময়ে কিছু বুঝাইয়া আসিবার দরকার হইল না, কারণ কদম আগেই সব বুঝিয়া লইয়াছে; ঘর-সংসারের কাজ পিসীর হাতে দিয়াও গোকুলের কাজ সে নিজেই করিয়াছে; এ পিসী লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে। পরলোকগতা বধূর কথা মনে করিয়া তাহার নারীচিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠে, কদমের উপর অজ্ঞাতভাবে বিরক্তিও আসে একটু।

পিসীকে ভুলাইবার জন্য যেটুকু অভিনয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। প্রথম দিন হইতেই মানিনীর উপর তাহার ঈর্ষা ও বিরক্তি জন্মিয়াছিল, এখন বাধাহীনভাবে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। গোকুল সকালে মাঠে যাইবার সময়ে নিজ হাতে মানিনীকে খাওয়াইয়া যায়, কদমকে বলে—ওকে সময় মত খাওয়াতে ভুলিস্ নে। কদম মাথা নাড়িয়া বলে—সে আমাকে আর বল্‌তে হবে না। বেলা হইলে তিন বছরের মেয়ের সাম্‌নে কদম তেলের বাটী আগাইয়া দেয়,শেষে মাথায় খানিকটা জল ঢালিয়া দিয়া ঘরে আসে, গা মাথা মানিনী সাধ্য অনুসারে নিজেই মোছে। মাঠ হইতে আসিতে গোকুলের বেলা হইবে, তাই কদম নিজে খাইয়া লয়, মানিনীকেও দেয় একটা থালায় বাড়িয়া। মেয়ে বড় হইতেছে না? তাহাকে তেল মাখাও, গা মোছাও, খাওয়াইয়া দাও; ওঃ এত আর দায় তাহার পড়ে নাই.! তা' যদি বিষের পেটের বিষ না হইত! কি আমার আপন রে! বলে "আন্ সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।" তারই পেটের মেয়ে তো।

অবসর সময়ে গোকুল মানিনীকে কোলে নিয়া আদর করে, খেলা দেয়, কদমকে ডাকিয়া বলে—মানুকে ভাল করে' খাইয়েছিস ত নতুন বউ? কদম গম্ভীর মুখে জবাব দেয়—না, উপোস করিয়ে রেখেছি। গোকুল কৌতুকভরে হাসিয়া বলে—আরে না, না, তুইও কিনা ছেলেমানুষ! কদম মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়।

এমনি করিয়া দুই বৎসর চলিয়া গেল। চতুর্দ্দশী কদমের দেহে দেহে যৌবনের জোয়ার লাগিয়াছে। বসন্তের বৃক্ষশাখে কুসুম-কলি অর্দ্ধ বিকশিত সেই আধ-ফোটা ফুলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গোকুলের নয়ন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। মধু-লোভে মধুপের মন আকুল হয়। মানিনীর সে মল ছোট হইয়া গিয়াছে এবং সে দেনাও ইতিমধ্যে শোধ হইয়াছে। গোকুল মনে করিয়াছিল—আবার ভাঙিয়া বড় করিয়া গড়াইয়া দিবে, ওর মা যে বড় সাধ করিয়া ঐ মল গড়াইয়াছিল! এমনি সময়ে কদম একদিন বলিল—মানির পায়ের মলও ছোট হ'য়ে গিয়েছে, ঐ ভেঙ্গে আর যা লাগে দিয়ে আমার হাতের চুড়ি গড়িয়ে দাও, কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে আমি আর থাকতে পারিনে বাপু। মা সেই কানের ফুল দিয়ে দিয়েছে, তুমি ত' কিছুই দাও নি। একটু অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়। গোকুল বলে—কোত্থেকে দেব বল? ক্ষমতা থাকলে তোকে দিতে কি আমার অসাধ? —তাইত কিছু বলি নি এ্যাদ্দিন। কিন্তু তাও বলি, আমি বলে' তাই, অন্য কেউ হ'লে রসাতল হ'ত। ঐ ধেড়ে মেয়ের পায়ে মল দিলে এখন মানায়ই নাকি? কদমের কথা শুনিয়া গোকুলের মন বদলায়, ভাবে—সত্যিই উহার পায়ে মল এখন সত্যই মানায় না। কদমের গোল হাতে রূপার চুড়ি কেমন মানাইবে, তাহাই কল্পনা করিয়া গোকুলের মন পুলকিত হইয়া ওঠে।

মানিনী তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিতে পারে যে,

তাহার বাবা তাহাকে আর আগের মত ভালবাসে না। আগে যে সময়টুকু তাহাকে আদর করিত, কোলে নিত, এখন সেই সময়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করে। কাছে গিয়া আবদার করিলে অকারণেই তাড়া খায়। সাঁঝের বেলা ঘুমাইয়া পড়িলে কেহ তাহাকে ডাকিয়া খাওয়ায় না। অনেক ঠেকিয়া মানিনী তাহার মান পরিত্যাগ করিয়াছে।

মানিনী সাত বৎসরে পড়িতেই কদম তাহার বিবাহের জন্য গোকুলকে অস্থির করিয়া তুলিল। যেন মেয়ের প্রতি অসীম স্নেহে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। দিদি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে কি এই সময়ে মেয়ের বিবাহ না দিয়া থাকিতে পারিত? মানি পেট ভাঁড়াইয়া আসিয়াছে, না হইলে মেয়ে প্রকৃত তাহারই, সেই ছোটটি হইতে এত বড় করিল কে?

মাখমদের বাড়ী আসিয়াছে তাহাদেরই এক আত্মীয়, নাম বুঝি ছিদাম। কদম গোকুলকে সুযোগ বুঝিয়া পরামর্শ দেয়, ছেলেপিলে গোটাকতক আছে, তা' তুমি কিছু অমত ক'রো না এতে। তারপর গলার স্বর মৃদু করিয়া বলে—যে না রূপের মেয়ে তোমার, লোকটার আছে দু'পয়সা, মোটা টাকা দেবে বলেছে। মনে মনে টাকার সংখ্যা গণনা করিয়া গোকুল খুসী হইয়া উঠিল ও কদমের অশেষ বুদ্ধির গুণেই যে সংসার টিকিয়া আছে, এ কথাও বলিল। ইহার পর একদিন সাত বছরের মেয়েকে চল্লিশ বছরের ছোঁড়ার হাতে তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে গোকুল আশীর্ব্বাদ করিল—"জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা।"

স্বামীর ঘরে গিয়া মানিনী ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করে, আর অবসর কালে স্বামীর দশ বছরের মেজ মেয়ে খেঁদির সঙ্গে খেলা করে। সৎমা বলিয়া মানিনীর উপর খেঁদির খুব বিদ্বেষ, খেলা করিতে করিতে সে প্রহারের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে না। রাত্রে ছেলে-মেয়েদের সাথে সে ঘুমায়, কোন কোন দিন ছিদাম ঘুমন্ত মানিনীকে ঠেলিয়া তোলে, গম্ভীর মুখে বলে—পায়ে একটু তেল ডলে' দে।

কদম বলিত মিথ্যা নয় যে, "মানি গুরুলোকের কথায় মোটে কর্ণপাত করে না"; তাহা না হইলে ছয় মাস পূর্ণ হইতে না হইতে গোকুলের আশীর্ব্বাদ বৃথা করিয়া সে বিধবা হইল! অশৌচান্তে স্বামীর ঘরে আর তাহার ঠাঁই হইল না, ফিরিয়া বাপের ঘরে আসিল। উঠানে পা দিতেই কদমের উচ্চ চীৎকারে পাড়া মুখরিত হইয়া উঠিল—ওগো কি সর্ব্বনাশী মেয়ে গো, কি রাক্ষুসী, অমন জোয়ান মরদ ছেলের হাতে দিলাম, তাকে ছ'মাসের মধ্যে খেয়ে ফেলল গো। মানিনী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল মুখ নীচু করিয়া। কিছুক্ষণ পরে শিশুর ক্রন্দনে মুখ তুলিয়া বিস্মিত হইয়া দেখে, দাওয়ায় শুইয়া আছে একটি নধর কচি শিশু। তাহার ভাই হইয়াছে, তাহাকে এ কথা ত' কেহ বলে নাই, সে ছুটিয়া খোকাকে কোলে তুলিতে গেল। চকিতে কদমের চীৎকার বন্ধ হইল, বলিল—থাক, থাক—ওকে আর না-ই ছুঁলে, প্রথমে মা খেয়েছ, ছ'মাস না পেরুতে অমন সোয়ামী খেলে, এটার ওপর আর দয়া ক'রে দিষ্টি দিও না।

মানিনী সংসারের সমস্ত কাজ করে। কদম থাকে তাহার ছেলে লইয়া, কোন ছলেই মানিকে নিতে দেয় না। দিন কাটিতেছিল, অবশেষে একদিন কদমের ছেলে সন্দি-জ্বরে মরিল। কদম মানির উপর একেবারে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিল, রাক্ষুসী, শতেক খোয়ারী, আবাগীর নজরে আমার সোনার চাঁদ চলে গেল।

অনুষ্ঠানের যেটুকু বাকি ছিল, এইবার তাহা পূর্ণ হইল। মানি প্রতিদিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। নিতান্ত কুকুর-শেয়ালের মতই পচা-পান্ত যখন যা পায়, খায়। গোকুল দেখিয়াও কিছু দেখে না। উপর্য্যুপরি কয়েকটা ব্যাপারে তাহারও ধারণা হইয়াছিল যে, মেয়েটা অলুক্ষুণে। মানির এ সমস্ত গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। বয়সের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার হইয়াছে। পাড়ার মেয়েদের কাছেও সে ওই কথাই শুনিতে পায়—সে নাকি অলুক্ষণে। কি জানি কি এক সঙ্কোচে সে কাহারও সহিত মিশিতে পারে না।

মাখমের ছেলে নটবর আসে তাহার সঙ্গে খেলা করিতে, সে শুধু তাহাকে কিছু বলে না। সংসারে পরিশ্রম করিয়া আর ঘরে-পরে বহুবিধ বিশেষণ শুনিতে শুনিতে তাহার কৈশোর উত্তীর্ণ হইল। কদমের আর একটি ছেলে হইয়াছে। গতরখাগী মানির হাতে ত আর সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, কাজেই দুরন্ত ছেলেকে

একটু না ধরিলে চলে কই? ও ডাইনী যখন ঘরে আছে, তখন ভাল-মন্দ একটা কিছু হইবেই। দাসুকে কোলে করিয়া মানি ভাবে, কেন এমন হইল! তাহার বয়সী মেয়েদের এইত সেদিন বিবাহ হইল, কেহ স্বামীর ঘরে গিয়াছে, কেহ বা এখনও এখানে আছে কেমন হাসিয়া খেলিয়া। সেই ছোট বেলায় তাহার বিবাহ হইয়াছিল—মনে পড়ে যেন স্বপ্নের মত, মনে পড়ে ছিদামের সেই গম্ভীর মুখ, বাবা কাজ নাই তাহার সে ঘরে! কিন্তু সেও যদি ওই ক্ষেন্তিদের মত অকারণেই হাসিয়া ওঠে, চঞ্চল পায়ে যদি একটু ছুটিয়া যায়, কেন তবে চারিদিকে তিরস্কারের সাড়া পড়িয়া যায়! নটবরের সঙ্গে একটু গল্প করিলে বাবা ত' বকিয়া রাখে না কিছু আর! নটবর ত' কিছু জানে না, তাই রোজই আসে সাঁঝের বেলা; তাহাকে এই তিরস্কারের কথা বলিতে কি জানি কেন বড় মানির লজ্জা করে! যৌবন মানির দুর্ভাগ্যের কিন্তু বারণ মানে নাই—তার সর্ব্বাঙ্গ উপচিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মানি আজকাল বড় এলোমেলো কথা ভাবে। কখন যে দাসু দাওয়া হইতে পড়িয়া গিয়াছে, মানি জানিতে পারে নাই। দাসুর চীৎকারে কদম ছুটিয়া আসিল একগাছা ঝাঁটা হাতে করিয়া: বলি ও হতচ্ছাড়ী মন ছিল কোথায়, ছেলেটাকেও আটকাতে পার না? সজোরে ঝাঁটা তাহার পিঠে পড়িল। নিত্যকার পাওনা ত এই সবই, কত আর কাঁদিবে মানি, তাহার চোখে আর জল নাই। এ সমস্ত সে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু একদিন সাঁঝের বেলা মানি বসিয়াছিল বাতাবী গাছটার গোড়াতে। অজস্র ফুল ফুটিয়াছে গাছে, তাহার তীব্র গন্ধে সারা বাড়ী যেন মাতাল হইয়াছে। কি জানি কি তিথি ছিল সেদিন। এক টুক্‌রা ফালি চাঁদ গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিয়া ম্লান হাসিতেছিল। আজ এই নিস্তব্ধ গন্ধমদির সন্ধ্যায় নিজেকে যেন মানির বড় অসহায়, বড় একলা মনে হইতেছিল। এ জগতে তাহাকে ভালবাসিবার কেহ নাই, প্রাণের আপন কেহ নাই, কাহাকেও ভালবাসিতে নাই তাহার। কি যেন কি এক তীব্র ব্যথায় সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল মানিনীর গাল বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে নটবর আসিয়া ডাক দিল—ও খুড়ী, বাড়ী আছ?

খুড়ী বাড়ী নাই। কেহ সাড়া দিল না। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া নটবর বলিল—এই মানি, একলা বসে কি করছিস্ রে এঁ্যা? ওমা সাড়া দেয় না যে, হ'ল কি তোর?

চোখের জল মানি ফেরৎ দিয়াছে, কিন্তু চোখে যে এখনো জলের কণা লাগিয়া আছে, মুছিবার অবসর হইল না। মুখ নীচু করিয়াই মানি বলিল—এমনি-ই ন্যাটুদা।

কেমন যেন সন্দেহ হইল, কি যেন ভাবিয়া হঠাৎ মানির কাছে গিয়া গাছের তলায় বসিল নটবর। এক ঝাম্‌টায় মুখ তুলিয়া মানি বলিল—চলে যাও বলছি নাটুদা, উঠে যাও এখান থেকে।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে এবার মুখখানা দেখা গেল, চোখে থৈ-থৈ জল উপচাইয়া পড়িতেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া রহিল নটবর। এমন করিয়া মানিকে কাঁদিতে সে কখনো দেখে নাই। কত দিনই ত গোকুলর কাছে বকুনি খাইয়া, কদমের চড়-চাপড় খাইয়া চোখ মুছিয়া মানি উঠানে গোবর দিয়াছে, দেয়ালে ঘুঁটে দিয়াছে, আবার হাসিয়া কথা কহিয়াছে সবার সাথে। কিন্তু এমন চাঁদনী সাঁঝে নিরালা গাছের তলে ব্যথার মূর্ত্তি মানিনীর এমন অপরূপ রূপশ্রী···

ভাবাবেশে নটবর মানিনীর আরও কাছে ঘেঁসিয়া দুই হাত নিজের কোলে তুলিয়া লইল, এক হাতে মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—মানি কেন কাঁদছিস্ ভাই বল্, বল্ তোর পায়ে পড়ি। যা বল্‌বি তুই, তাই-ই আমি কর্‌ব।

কিন্তু কি বলিবে মানিনী, এবার তাহার কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দু' একটা শুকনা পাতার যেন মড়্ মড়্ শব্দ। নটবর ফিরিয়া চাহিল, কদম আসিতেছে আল্‌গা পায়ে। ত্বরিতে নটবর দাঁড়াইয়া বলিল—এই যে খুড়ী, কোথায় গিয়েছিলে, এসে তোমায় ডেকে পাই না, শেষে দেখি মানি এইখানে বসে কাঁদতে লেগেছে।

ছিলাম না তা ভালই হয়েছে। আর দুঃখে কষ্টে তুমি না দেখলে চলবে কেন বাবা! কদম মুখ বিকৃত

করিয়া হাসিল। তা' এবার আমি আসি খুড়ী। হাঁ, কাল আবার এমনি সময়ে এসো, আমি বাড়ী থাকবো না। নটবর পলাইয়া বাঁচিল। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কদম বলিল—আমার সোহাগ কাঁদন! আহা-হা কি নামই মায়ে রেখে গিয়েছেন গো—মানিনী সুন্দরী! শ্যাম নটবর এসে রাধে মানিনীর মান ভঞ্জন করছেন! ওলো কালামুখী লো, এ ভিটেয় আর পা দিয়ে দাঁড়াস্ নে, দড়ি কলসী নিয়ে ওই "পীরপুকুরে" ডুবে মর্। মানি ডুকরাইয়া উঠিল—আমি ত কিছুই করিনি মা, কেন আমাকে মিথ্যে দুষ্‌ছ।

—আহা গো, তা' বটে আমি ত জানিনি মা, ওসব তোমাদের কিছুই নয়, মুখ্যু মেয়ে মানুষ, মনে করিছি ওই মস্ত অপরাধ, মরে' যাই!

আর কথা না বাড়াইয়া মানিনী ঘরে গিয়া দুয়ার ভেজাইয়া শুইয়া একমনে মরণ কামনা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোকুল খাইতে বসিয়া বলিল, মানিকে দেখছিনে, এরই মধ্যে শুল নাকি?—মায়ের আমার মানসটা ভাল নেই গো—বিদ্রূপ করিয়া কদম "ভদ্দলোকের" কথা বলিতে যায়। গোকুল অত না বুঝিয়া বলিল—তা' হ'তেই পারে। অদ্ভুত কণ্ঠে কদম শুধু বলিল—হুঁ।

কদম তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিল, পান মুখে দেওয়ার কথা মনে পড়িল না। অনেক রাত পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি যেন গোপন কথা হইল। সকালে গোকুল মাঠে যাইবার সময়ে পাথরের মত শুকনা কঠিন মুখে বলিয়া গেল—এই মানি, তোর কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে রাখবি। তোর শ্বশুর-ঘরে তোকে রেখে আস্‌ব কাল। কদমও কি কাজে কি জানি সকালেই পাড়ায় বাহির হইল। সব কাজ সারিয়া মানি নাহিতে গেল পুকুর ঘাটে। সেখানেও ভীড় জমিয়াছে অনেক। খুড়ী, জ্যেঠীর দল কি কথা বলিতে বলিতে ভালমানুষের মত গম্ভীর মুখে চুপ করিল; মেয়েদের ধম্‌কাইল, যা লো সব উঠে যা জল থেকে, অত ঝাঁপাই-ঝোপ মেয়ে-মানুষের ভাল নয়। মানি দেখিল, বিন্দি, পাঁচি আড়চোখে চাহিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া গেল।

—কি লো মানিনী, কাল নাকি সারা রাত উপোস দিয়েছিলি ঘরে হুড়্‌কো দিয়ে? কি হয়েছিল লো? শুকনো মুখে মানি বলিল—কিছুই ত হয়নি ছোট খুড়ী। —ও, আমরা বলি,—ওলো চ' সেজ-বউ পা চালিয়ে। মানি খুড়ীর চাপা গলার আওয়াজ শুনিল—শাক দিয়ে মাছ ঢাকেন, ভিজে বেড়াল! নটবরের মা গাল পাড়িতে পাড়িতে চলিল—ওমা কি গন্তানি মেয়ে মা, কোথায় যাব মা, কি আস্পর্দ্ধা; অমন মেয়ে জলের তলায় শোয় না কেন? আমার দুধের নাটু, সোনার নাটু!

কদম দাসুকে কোলে নিয়া বসিয়া আছে। স্নান সারিয়া মানি বাড়ী ফিরিল, ডাকিল, মা—। ঝঙ্কার দিয়া কদম বলিল—কালপেঁচির আর মা ব'লে ডেকে আদর কাড়াতে হবে না। কাঁদিয়া মানিনী বলিল—সত্যি করে' বল, আমি ম'লেই কি তুমি খুসী হও। নিজে চোখে যখন দেখেছ, তখন সত্যি ক'রে জান, কি মন্দ কাজ আমি করেছি। আমার মরণই কি তুমি চাও?

কদম ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, হাঁলো হাঁ, তুই এক্ষুনি মর্, আমার একটুও দুঃখ হবে না। সতীন-কাঁটার জ্বালা, বড় জ্বালা! যদি জানিই যে তুই মন্দ কাজ করিসনি, তবু সুযোগ পেয়েছি ছাড়্‌ব কেন, পাড়ায় পাড়ায়, জনে জনে তোর কথা বলে' বেড়াব, শ্বশুর-ঘর থেকে তোকে নিতে এলে শুনিয়ে দেব, কেন তাড়ালাম। তুই মর্, আমি বাঁচি।

মানি আর কথা বলিল না, কিছু খাইল না। কেহ খাইতেও বলিল না। এক সময়ে ও-বাড়ীর খেঁদাকে মানি চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল—আমাকে একটা কলসী এনে দিবি খেঁদু, কুমোর বাড়ী থেকে? এই পয়সা নে, আমি ভেঙ্গে ফেলেছি জলের কলসীটা, সাঁঝে গাছপালা ডুবে গেলে, চুপি চুপি ঘরের পেছনে রেখে যাবি। দেখতে পেলে বকবে কিনা! মুড়্‌কি কিনে খাবি, এই পয়সা নে।

নিঝুম, নিশুতি কৃষক পল্লী। ক্লান্ত চাঁদ আঁধারের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। শূন্য কলসী-কাঁখে মানিনী চলিল সেই মর্ম্মরিত বেণুবনের ধারের 'পীরপুকুরে'... কালো ঘন আঁধারে গেল মিশিয়ে...।
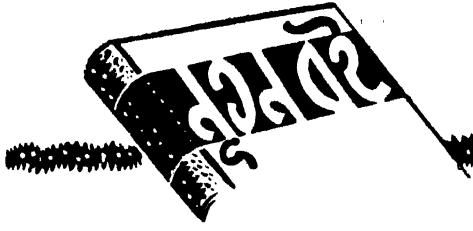
জ্ঞান-প্রদীপ—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মা প্রণীত। মূল্য ।/০।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া জাতির সুপ্ত জীবনীশক্তির উদ্বোধন করিবার আকাঙ্ক্ষা লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলার ধর্ম্মপ্রাণ অসংখ্য নরনারী পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া লেখকের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

সম্বন্ধ-নির্ণয়—(চতুর্থ পরিশিষ্ট, প্রথম খণ্ড) ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। ৯৩/৪, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমরা 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'এর অন্যান্য খণ্ডগুলির আলোচনা করিয়াছি। বাংলার সমাজ-জীবনের জটিলতা ও বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া যে জীবনধারা বর্ত্তমানে বহিয়া চলিতেছে তাহার দিক নির্ণয় করিতে পুস্তকটি যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এই ধরণের পুস্তকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবার পক্ষে জনসাধারণের যে সহযোগিতা প্রয়োজন, তাহা প্রকাশক বিশেষ লাভ করেন নাই। তথাপি আলোচ্য গ্রন্থের ন্যায় একটি জটিল বিষয়ে প্রকাশক এককভাবে যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সহিত পথ অনুসন্ধান করিয়া চলিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বর্ত্তমানে জাতির শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির অভাব, বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধনির্ণয় এদিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলার বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের যাহারা অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহারা পুস্তকটি হইতে যথেষ্ট তথ্য পাইবেন।

পত্র ও পুষ্প—শ্রীউমাদাস গুপ্ত, এম্, এ, প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্, এ, ৬নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

কবিতাগুলিতে এমন কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না যাহা উল্লেখযোগ্য; না ভাবের দিক দিয়া—না ভাষার। ছন্দও ত্রুটিপূর্ণ।

সাহিত্য-কথা (প্রথম ভাগ)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—দীপালী গ্রন্থাবলী, ১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলিঃ। মূল্য ১০।

প্রবীণ সাহিত্যিক সুকবি শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। চিন্তাশীলতা ও সাহিত্য রসের দিক দিয়া এগুলি হইয়াছে উপভোগ্য। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপমার যে প্রয়োগ কৌশল তাঁহার ভাষায় রসসৃষ্টি করে তাহা তাঁহার নিজস্ব ষ্টাইল। আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকারের বিভিন্ন রচনায় এই উপভোগ্য রচনা কৌশলের পরিচয় পাইয়াছি। ফলে প্রবন্ধগুলি সরল, শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগে জাতির চিন্তাশীলতায় ছেদ পড়িয়াছে, গল্প কবিতায় এক্সপেরিমেণ্ট সুরু হইয়াছে সত্য, কিন্তু এগুলি সাহিত্যে অদ্ভুত বিকৃতির সৃষ্টি করিতেছে। আধুনিক যুগের ও সাহিত্যের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটা বলিষ্ঠ ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহারই মধ্যে 'সাহিত্যে স্বৈরাচার' 'বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তি' 'রেস্তর্*াঁ সাহিত্য রচনা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বোমা ও ব্যারিকেড—শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ১৪০, দাম পাঁচ সিকা।

আলোচ্য পুস্তকে লেখক স্পেনীয় গৃহ-যুদ্ধের পট ভূমিকায় একটি কাহিনী গ্রথিত করিয়াছেন। বাঙালীর ছেলে সুব্রত স্পেনীয় যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দাঁড়াইয়া সমাজ-তন্ত্রবাদের সহিত হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা করিতেছেন—ইহাই হইল মূল তথ্য। সাধারণ বাঙালী পাঠকের নিকট পুস্তকটি আদৃত হইবে বলিয়া মনে করি, কারণ রোমাঞ্চ ও রোমান্স এই উভয়েরই রসিক পাঠক সমাজে যথেষ্ট আছেন। লেখকের ভাষা ভাল, বক্তৃতা স্থানে মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে। গঠন পরিপাটী ভাল।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা সার—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৬) শ্রীগৌড়ীয় মঠ; কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

৪৫৬ শ্রীগৌরাঙ্গের 'শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা' সার প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আলোচ্য বর্ষে বৈষ্ণবগণের ব্রত ও উপবাস-বাসর, পারণের দিন ও সময়, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি-পূজার-বাসর প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার ইহাতে অনুসরণ করা হইয়াছে।

অন্তরাল—শ্রীহৃষিকেশ বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকাকাতুয়া বসু, জ্যোতিষ গবেষণা ভবন; ১৭০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

এই কবিতা পুস্তকটি পাঠ করিয়া আমরা প্রশংসার বিশেষ কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া সত্যই দুঃখিত। আধুনিক যুগে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রচুর ফসল ফলিতেছে সত্য কিন্তু প্রাণরস পুষ্ট করিবার পক্ষে তাহাদের প্রয়োজন কতখানি তাহাই আজ চিন্তনীয় বিষয়। কবিতাগুলির মধ্যে 'দারিদ্র' ও 'ভিক্ষা' এই দু'টি মন্দ লাগিল না।

বর্ষ ফল : ১৩৪৯

অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিষসিদ্ধান্তাচার্য্য

ঈশ্বর আপন মহিমায় পরস্পরের সম্বন্ধক্রমে যন্ত্রের ন্যায় এরূপ কৌশলে জগতের রচনা করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ হইলেও, সর্বগুণ ও ক্রিয়ার আধার বলা যায়। ঈশ্বরের ব্যাপকতাদি গুণযুক্তহেতু জগতের যেরূপ যথাবৎ ধারণ ও প্রলয় হয়, তদ্রূপ সর্ব-কর্ত্তৃত্বাদি গুণপ্রযুক্ততার জন্য তিনি সকল প্রকাশকের প্রকাশকও বটেন। প্রকাশ ও অন্ধকারের পরমাণুপূর্ণ সূর্য্যাদি পদার্থকে অন্তরীক্ষের মধ্যভাগে প্রকাশ করিয়া তিনিই সর্বদা নিয়মিত করিতেছেন এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও পৃথিবী প্রভৃতি ধৃত হইয়া স্ব-স্ব-স্থানে (নিজ কক্ষে) নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে।

অতএব সূর্য্যের দ্বারা পৃথিবী এবং তত্রস্থ জীব ও পদার্থ সকলের গুণ-কর্ম-স্বভাব যথাবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্য বেদে উক্ত সূর্য্যাধিষ্ঠিত (সম্বৎসর) চক্রকে সবিতা যন্ত্র বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে সবিতা যন্ত্রের কার্য্যানুসারে ১৩৪৯ সালের বর্ষ ফলোপযোগী যোগের বিষয় মোটামুটি লিখিত হইতেছে।

এই বৎসর রাশিচক্রে গ্রহ-সংস্থানহেতু বিশেষ অশুভ যোগ চারিটী : (১) বৎসরের প্রথমে শনি ও বৃহস্পতি এক রাশিতে যুক্ত থাকা। (২) বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, পৌষ ও মাঘ মাসে বুধ গ্রহের উদয় হওয়া। (৩) কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে পাঁচটী রবিবার হওয়া। (কার্ত্তিক অমাবস্যা তিথিতে বিষ্কুম্ভ যোগ পাইলে সম্পূর্ণ সংহারক যোগ হইত।) (৪) সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এই তিন গ্রহ আষাঢ় মাসারম্ভে যুক্ত থাকা।

উক্ত চারি প্রকার গ্রহাদির যোগাযোগ হেতু বিশ্বে নানা প্রকার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অশান্তি দেখা দিবে। ইহা ছাড়াও ভৌম ও আন্তরীক্ষ উৎপাতের যোগ দেখা যায় এইরূপ :—

ঝড় ও বৃষ্টি : বৈশাখ তাং ২-৫, ১২-১৯, ২১-২৫, ২৮-২ জ্যৈষ্ঠ, ৮-১৬, ২০-২২, ২৮-১ আষাঢ়, ৪-৭, ১০-১৪, ১৮-২০ : এই সময়ে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইবে তাহা দেশ-বিশেষে অবশ্যই কম-বেশী হইবে।

ভূমিকম্পের সঠিক তারিখ ও ক্ষণ গণনার দ্বারা বলা বিশেষ শ্রমসাধ্য। এখানে মোটামুটি কালের হিসাব দিলাম।

(ক) বৈশাখ—তাং ১৩-৩১ মধ্যে। (খ) শ্রাবণ—তাং ২-২৫ মধ্যে। এই সময়ে দুইটী উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প এবং অগ্নিভয় বা বাষ্পীয় যানের দুর্ঘটনাদি, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের লক্ষণও দেখা যায়। (গ) কার্ত্তিক—তাং ১৭—অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে। এই সময়েও দুইবার উল্লেখযোগ্য কম্পন হইবে। (ঘ) মাঘ—তাং ৪-২০ মধ্যে। (ঙ) চৈত্র—তাং ১২-২৪ মধ্যে। এই সময়ে প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হইবে এবং অন্যান্য দুর্ঘটনার লক্ষণও দৃষ্ট হইবে।

এই সকল ভূমিকম্প কেবল ভারতবর্ষের জন্য নহে, উহা বহির্দ্দেশে হরিবর্ষাদিতেও সংঘটিত হইবে।

রাশি ফল : এ বৎসরে মেষ, মিথুন, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির পক্ষে প্রায় সর্ব্বপ্রকারে অশুভ; কন্যা, বৃশ্চিক-মীন রাশির মধ্যম ফল এবং বৃষ, কর্কট, সিংহ ও ধনু রাশির শুভ ফল হইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি

সমষ্টিবদ্ধ মানবগোষ্ঠির বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বহু জটিলতায় পূর্ণ। ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই শক্ত, নিরাপদও নয়। তবুও গ্রহ-সংস্থান জনিত দেশ ও জাতি সমূহের উপর যে শুভ-অশুভ ফল সংগঠিত হয় তাহা নির্ভুল গণনায় মোটামুটি সত্য হইতে দৃষ্ট হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখ সংখ্যা প্রবর্ত্তকে আমি ১৩৪৮-এর বর্ষ ফল বলিতে গিয়া এক স্থানে বলিয়াছিলাম যে, ফাল্গুন (১৩৪৮) হইতে ১৩৪৯-এর কিয়দংশ কালের মধ্যে সুদূর প্রাচ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিবে এবং বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা ভারতবর্ষে চাঞ্চল্য ও বিক্ষুব্ধ সংঘটিত হইবে, এমন কি শত্রুর হানা দিবার সম্ভাবনাও বর্ত্তমান। এই সম্ভাবনা এই বৎসরেও তিরোহিত নাই। বর্ত্তমান বর্ষে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে যে ব্যাপক মহাযুদ্ধ ঘটিবে, সেই যুদ্ধ ভারতের প্রজাগণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে এবং কর্ম্ম পথ কুজ্ঝটিকার ন্যায় প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিবে। এই জন্য

প্রজারা অস্থির হইয়া উঠিবে এবং অন্যায় বা অত্যাচারের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইবে। আশ্বিন মাসের ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে এবং প্রকৃতির ধ্বংসলীলা পূর্ণ মাত্রায় চলিবে। বহু ঋত্বিক, যোদ্ধা ও নরনারী এই নরমেধযজ্ঞের আহুতিস্থানীয় হইবে। পরন্তু যুদ্ধের পরিণাম এই বৎসরেই অনেকাংশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

আয়ারল্যাণ্ড, এসিয়ামাইনর, অষ্ট্রেলিয়া, সাইপ্রাস দ্বীপ, রুশিয়ার কতকাংশ, ইংলণ্ডের পশ্চিম দেশ, লোয়ার ঈজিপ্ট, আফ্রিকা, তুরস্ক, ফ্রান্স, আলজিরা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আশঙ্কা ঘটিবে। বিশেষতঃ কুরুবর্ষের (আমেরিকার) পক্ষে এ বৎসর অত্যন্ত অশুভ। হরিবর্ষ (ইউরোপ) ও কুরুবর্ষ (আমেরিকা) এবং ভারতবর্ষ সর্বত্রই ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবে এবং অনাহারক্লিষ্ট জনগণের জাগরণ ঘটিবে।

জার্ম্মাণী বিক্ষুব্ধ-চিত্ত হইয়া রণতাণ্ডবে উদগ্র ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে। অক্ষশক্তির সংহত গতিবেগ বিরাট্ মিত্র শক্তিকে বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলিবে। চূড়ান্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মিত্রশক্তি স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্য অক্ষশক্তির গতিরোধে যে অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিবেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মণীয় হইয়া রহিবে। এ বৎসর অক্ষশক্তিসমূহের বিশেষ করিয়া জাপানের ভৌগলিক পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়। চীনের মোটামুটি বর্ষফল শুভ। সমরবিরতির এবং চীনের আভ্যন্তরীণ শান্তি ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা। ভারত ও চীনের মিত্রতা অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইবে। ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইবে এবং চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অরাজকতা বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের বহির্বাণিজ্য ও বহির্গমনের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। মুসলমানাপেক্ষা হিন্দুর প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে এবং কোন হিন্দু দেশনেতার প্রতিষ্ঠাসূচক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বৎসরের মাঝামাঝি হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় শুভযোগ সূচিত হয়।

ফিলিপাইন

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

বর্ত্তমানে ফিলিপাইনস্ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। আমেরিকার সহিত তাহার আধুনিক রাষ্ট্রনীতিক সম্পর্কের বহু পূর্ব্বে সুদূর অতীত ব্যাপিয়া এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাণ-প্রবাহ বহু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বিচিত্র ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিক সত্ত্বার পশ্চাতে এই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পটভূমিকাটি রহিয়াছে—তাহা না বুঝিলে ফিলিপাইনের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক কিছু ধারণা করা সম্ভব হইবে না।

গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতা ভিন্ন যখন ইউরোপে অন্য কোন সভ্য জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, তৎকালে ফিলিপাইনস্ প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধে লিপ্ত ছিল, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ফার্ডিনাণ্ড মেগেলান নামক জনৈক স্পেনবাসী প্রথম ফিলিপাইনস্ আবিষ্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতি প্রাচীন কালে ফিলিপাইনস্ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। স্পেনীয়গণ ফিলিপিনোদিগকে 'ইণ্ডিয়স' বলিয়া অভিহিত করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইসলাম ধর্ম্ম মালয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইনসে প্রবেশ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলাম সভ্যতাকে স্থানচ্যুত করিয়া স্পেনীয় সভ্যতা তাহার জয় পতাকা উড্ডীন করে। স্পেনীয় অভিযানের ফলে ফিলিপাইনের আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভূত ক্ষতি হয়। ইহাদের অত্যাচারে ফিলিপাইনের প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত পরিচয় লোপ পাইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে নিগ্রোস দ্বীপের এক গুহায় এই সাহিত্যের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তদ্দারা ফিলিপাইনো সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, বোঝা যায়। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিলিপাইনের ইতিহাসে এক

বিপ্লবের যুগ—এই যুগে বৈদেশিক অত্যাচার ও স্বাধীনতা স্পৃহা পারস্পরিক সংঘর্ষে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে ফিলিপাইনসে তিনটি জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিগ্রাইটো, ইন্দোনেশিয়ান এবং মোঙ্গলয়েড। নিগ্রাইটোগণ ছিল আদিম অধিবাসী, মোঙ্গলয়েডগণ দক্ষিণ চীন হইতে আসিয়াছিল জানা যায়। ইণ্ডোনেশিয়ানগণের সহিত দক্ষিণ ভারতের রক্ত সম্বন্ধ ছিল। ভারতের রক্তে যে ইণ্ডোনেশিয়ান জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারাই ফিলিপাইনসে সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত করে। ইহা হইল ফিলিপাইনসের প্রাক্ ঐতিহাসিক পরিচয়। ঐতিহাসিক যুগে পঞ্চম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের পহ্লবগণ বৃহত্তর দ্বীপময় ভারতে উপনিবেশ গঠনে যত্নবান হন। ইহার ফলে নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে হিন্দু সভ্যতার বাণী দ্রুত প্রসার লাভ করে। পণ্ডিতগণ এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রক্ত মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ক্রমশঃ ফিলিপাইনস পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালার সহিত ফিলিপিনো বর্ণমালার চমৎকার সাদৃশ্য যে বর্ত্তমান এ সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিলিপাইনসে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ী ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে, যে হিন্দু-পূর্ব্ব আর্য্য সভ্যতা জাভায় এবং উত্তরকালে যে দ্রাবিড়ী হিন্দু সভ্যতা ইণ্ডোচীন ও সুমাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহাই কালক্রমে ফিলিপাইনসের সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ইহা বিশেষ কৌতুহলজনক যে, এখনও লুজান ও মিণ্ডানাও-এর পাহাড়ী লোকদের পূজাপার্ব্বণে বৈদিক দেবতাগণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ইদানীং কয়েকটি দ্বীপে পিতল, তাম্র এবং স্বর্ণের শিবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েকটি ভারতীয় অলঙ্কার ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

সম্রাট্ আকবরের শাসনকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবকে স্তিমিত করিয়া ইস্লাম সভ্যতার অভিযান মালয় দ্বীপপুঞ্জে বিশেষ ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠে। ইহার ফলস্বরূপ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে মিণ্ডানিও ও সুলুতে ইসলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিপাইনের সভ্যতার অভিব্যক্তিতে ইহা একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণ, ইহার অল্পদিন পরেই পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীযদের অভিযান সুরু হয়। গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে মার্কিণের সহিত ফিলিপিনোদের ভাগ্যসূত্র বিজড়িত হয়। মার্কিণ আমলেও ফিলিপাইনসের স্বাধীনতা স্পৃহা বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানী আক্রমণের ফলে এই সুপ্রাচীন দ্বীপের ভাগ্য বিপর্য্যয় প্রত্যেক স্বাধীনতাকামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

পল্লী-প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণপদ মিত্র এম. এ.

বাঙালীর জাতীয় জীবনে আজ এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছে যা তার শান্তিপ্রিয় আত্মকেন্দ্রিক জীবনকে ক্ষুব্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি; সেই বিপ্লবের অশান্ত ঢেউ এসে তার সামাজিক জীবনের জীর্ণ তটভূমিকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করেছে। তাই আজ আর তাকে শুধু রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করলেই চলবে না; কি ক'রে জীবনের প্রাথমিক সমস্যাগুলোর সমাধান মিলবে তারও তাগিদ এসে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকেও ভীত চকিত ক'রে তুলেছে। কি খেয়ে আমরা বাঁচব বা আমাদের প্রতিদিনের "তেল-নুন-লক্ড়ির" সংস্থান কোথায়—এ জাতীয় প্রশ্নকে বাদ দিলেও এই স্থূল দেহটির নিরাপত্তা বিধান কেমন ক'রে সম্ভব, সরল নিরঙ্কুশ জীবনযাত্রায় কোন একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় স্থলই বা কোথায়—বাঙালীর তার কিছুই সন্ধান মিলছে না আজ।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রোত বয়ে বাঙালী তার মনকে ও দেহকে এমন একটি স্থানে উপস্থাপিত করেছে, যেখান থেকে পেছন ফিরে আজ বাঙালী অসহায়ের মত আপনার অস্তিত্বকে খুঁজে

ম'রছে। বাঙালীর জীবনে এমন একটি দিন এসেছিল যেদিন থেকে সে তার সংস্কারাবদ্ধ পল্লী জীবনকে জ্ঞানালোকবিহীন গ্রাম্য জীবনের পরিবেশকে এড়িয়ে চলবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল; সেদিন আমরা কেবল মনে করেছি—আমাদের দৃষ্টিকে জ্ঞানানুসন্ধিৎসু করে' গড়ে' তুলতে হ'লে গ্রামজীবনের অজ্ঞতা থেকে নিজেকে মুক্ত করাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সহরের প্রলুব্ধ কুহকে একদিকে যেমন আমরা নির্ব্বিচারে গ্রাম্য সব কিছুকেই ঘৃণা করতে শিখেছি, অন্য দিকে তেমনি একে একে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সরলতা, স্নেহপ্রবণতা, চারিত্রিক মাধুর্য্য সব কিছুকেই বিসর্জ্জন দিয়েছি। এর বদলে যা আমরা পেয়েছি সেই সহুরে লৌকিকতা, বাইরের চাকচিক্য আর বিলাস-ব্যসন—এই নিয়ে শুধু যে আমরা খুসীই হয়েছি তা' নয়, নিজেদের মনে করেছি ধন্য। আজ বিশ্ব-শৃঙ্খলা দূরে থাকুক, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও তার প্রয়োজনীয়তা যে কত অল্প তা' মর্মে মর্মে অনুভব করছি। একদিন সহরকে পেয়ে গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে', পল্লী মায়ের অযাচিত শ্যামস্নিগ্ধ স্নেহকে উপেক্ষা করে' যে-বাঙালী গৌরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, আজ তাকেই আবার অসহায় শিশুর মত নাগরিক জীবনের সমস্ত সভ্যতা, বৃহত্তর সমাজের সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে অনাদৃত, অসংস্কৃত, পরিত্যক্ত গ্রাম্য জীবনের এক পাশে একটু আশ্রয় পাবার জন্যে লোলুপ হ'য়ে ছুটে যেতে হচ্ছে। সেখানে গিয়ে পূর্ব্বপুরুষের প্রাণপ্রিয় সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ভগ্নাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে আজ গর্ব্বিত ও বিভ্রান্ত নাগরিকের চোখে জল দেখা দিয়েছে; স্বেচ্ছাকৃত পাপের অনিবার্য পরিণামকে আজ একান্ত অনিচ্ছায়ই তাকেই বরণ ক'রে নিতে হচ্ছে।

কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি ধর্ম—এর প্রত্যেকটিরই ওপর ভারতের বিশেষ করে' বাঙলার গ্রাম্য জীবন যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা' আমাদের অবিদিত নেই। মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রতি নজর দিলে আমরা দেখতে পাব, যে সকল ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল, তাতে এই বাঙলার পল্লী জীবনের আলেখ্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। যে সমস্ত দেব-দেবীর স্তব-স্তুতিতে মঙ্গল-কাব্যের বিরাট সৌধ গঠিত হয়েছিল, তার সকল দেব-দেবীই জন্মলাভ করেছিল এই বাঙলার পল্লী কুটীরের শিশুসুলভ সরল, ভয়ব্যাকুল পল্লীবাসীর চিন্তাধারা থেকে। পুরাণের উল্লেখ ক'রে এই দেব-দেবীদের আমরা যতই পৌরাণিক ক'রে তুলতে চাই না কেন—আখ্যায়িকায় এঁদের একেবারেই গ্রাম্য করে'ই আঁকা হ'য়েছে। এঁদের মর্ম্মে মর্ম্মে যে সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনের চিন্তাধারাই বয়ে চলেছে কেউই তা' অস্বীকার করতে পারবেন না। কবিকঙ্কণের চণ্ডিকা, কৃষ্ণরামের দক্ষিণারায়, শীতলামঙ্গলের শীতলাদেবী, মনসামঙ্গলের মনসাদেবী—এঁরা প্রত্যেকেই যে গ্রাম্য উপাদানে গড়া এবং এই সকল কাব্যের মধ্যে গ্রাম্য জীবনই যে শুধু প্রাধান্য লাভ করছে, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এমনি করে'ই বাঙালীর যে গ্রাম্য জীবন তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম জীবনে প্রেরণা দিয়ে এসেছে, এম্‌নি করে'ই পল্লী-মায়ের নিভৃত নিকেতনে তার ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপণ করেছিল, তাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে'ই ক্ষান্ত হইনি, মনোহর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যর্থ অস্ত্রে তাকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

নাগরিক জীবনের প্রভাব বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনে এমন একটা দুর্ব্বলতা এনে দিয়েছে, তাকে পাকে পাকে এমন ক'রে জড়িয়ে ধরেছে যে, আজ আর সে গ্রাম্য জীবনের সরলতার ওপর একান্ত নির্ভরশীল হ'তে পারছে না। পাড়াগাঁ সম্বন্ধে আজ আমাদের মনে এম্‌নি একটা কদর্য্য ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে, সেখানকার কথা ভাবতে গেলেই আমাদের মনের সামনে এসে দাঁড়ায় ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-জর্জ্জরিত জীর্ণশীর্ণ দীনতা ও হীনতায় পরিপূর্ণ কতকগুলো অর্দ্ধ-উলঙ্গ নরনারীর ছবি। এর চাইতে মার্জিত পরিবেশ আমরা কিছুতেই ধারণা করে' নিতে পারি না। আমরা কোন মতেই তাদের আর আমাদেরই মত রক্ত-মাংসে গড়া সুখ-দুঃখ-সমন্বিত মানুষ বলে' স্বীকার করি না। এতদিন আমরা তাদের ভাই বলে' স্বীকার করতে, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্যে নিজেদের স্বার্থ থেকে একটুখানি ভাগ দিতে, দু'বেলা

দু' মুঠো তাদের ভাগ্যে মিলছে কিনা, সে কথা ভাবতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। পল্লীর সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল, আছে বা থাকৃতে পারে, সে কথা মানতে কুণ্ঠিত হয়েছি। শুধু তাই নয়, মনে মনে তাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তিও কামনা করেছি হয়ত। কিন্তু আজ আমরা সহরের স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে পল্লী মর্ত্ত্যের মৃত্তিকাকে আশ্রয় করেছি। আজ বাঙালীর জীবনে এমন দিন এসেছে যে, পরস্পরের ঘৃণা আর নেই; সহর থেকে পালাবার জন্যে, নিজের নিরাপত্তার জন্যে যে মুহূর্ত্তেই আমাদের উপায় উদ্ভাবন করবার তাগিদ এসেছে, সেই মুহূর্ত্তেই নাগরিকগণকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পার হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হ'য়েছে ছায়াশীতল পল্লী মায়ের বুকে। আজ সেই অর্দ্ধনগ্নদের পাশে দাঁড়িয়ে নাগরিকদের তাদের চেয়েও কি কম অসহায় ব'লে মনে হয়? বসবাস করবার অট্টালিকা তাদের নাও থাকতে পারে, কিন্তু আপনার পরিশ্রম দিয়ে মাঠের খড়ে সে যে গৃহ নির্ম্মাণ করেছে, তা' ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের জ্যোতিঃ বিকীরণ না করলেও, শান্তিতে বসবাস করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তার জন্যে রাজভোগের ব্যবস্থা নেই সত্যি, কিন্তু শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির দয়ার দান দু'বেলা দু'মুঠো অন্নই তার চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ষোড়শোপচারকে হার মানায়। কিন্তু আজ যাদের তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হ'য়েছে, অট্টালিকার মালিক হ'য়েও তারা গৃহহীন; কোটিপতি হ'য়েও আজ তারা নিঃস্ব; ভোজপুরী দারোয়ান থাকতেও আজ তারা অসহায়। এর চেয়ে অদৃষ্টের পরিহাস ও চরম দুর্দ্দশা আর কি থাকতে পারে?

এম্‌নি করে'ই নাগরিক জীবনের আপাতমধুর প্রলোভনে ভুলে' বাঙালী একদিন বিস্মৃত হ'য়েছিল—তাকে আবার পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, অনুন্নত পল্লী সমাজের দ্বারে গিয়ে নিতান্ত অপরিচিত কাঙালের মত নতজানু হয়ে দাঁড়াতে হবে; এম্‌নি করেই জাতীয় জীবনে ঘরে-বাইরে বাঙালী আপনাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছে; নিজের মাথা গুঁজবার এতটুকু ঠাঁই পর্য্যন্ত নেই কোথাও। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে জাতীয় বিরোধিতার সূত্রপাত দেখা দিয়েছে, তার সংঘাতও পল্লী জীবনের স্নিগ্ধমধুর আবেষ্টনীকে, গ্রামের সহজ আব্‌হাওয়াকে এমনভাবে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে যে, আজ আর সেখানেও কোন শান্তি নেই। সংস্কার, সঙ্কোচ, উচ্চনীচ ভেদাভেদ অহমিকা সভ্য বাঙালীর মনকে এমন করে' সঙ্কীর্ণ করে' ফেলেছে যে, আজ কি নগরে, কি গ্রামে কোথাও শক্তিহীন বাঙালীর আর আদর্শ নিয়ে বাঁচবার উপায় নেই।

পল্লী-উন্নয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে সহরে বসে' একদিন আমরা সভা করেছি, বক্তৃতা করেছি, দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে বাহাদুরীও নিয়েছি প্রচুর, কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে সেই সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইনি। আজ গ্রামের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখে আর্ত্ত পল্লীবাসীর সেবাকে জীবনের একটা ব্রতরূপে গ্রহণ না ক'রলে পরিণতি যে এর চেয়ে কত ভয়াবহ হ'তে পারে, সে বিষয়ে বোধ করি আর কারও বুঝতে বাকী নেই। জাতির মেরুদণ্ডকে যদি সতেজ ও সুদৃঢ় করে' রাখতে হয়, যদি কোন উচ্চতর আদর্শের জন্যেই জাতিকে গড়ে' তুলতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-অন্তরায়কে তুচ্ছ করে' গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কুটীর শিল্প, কৃষি প্রভৃতির দিকে আজ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এম্‌নি করে'ই গ্রামবাসীরা যেদিন সমস্ত বিভেদ-বিরোধ ভুলে' মিলনের ও কল্যাণের দীপবর্ত্তিকা হাতে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেশের জন্যে ভাবতে শিখবে, সহরবাসীদের যেদিন আপনাদের ভাই বলে' গ্রহণ করবে—সেই দিনকেই আমরা দেশের সুদিন বলব। বাঙালী সেদিন কি রাজনীতি, কি সমাজ, কি ধর্ম্ম সব বিষয়ের সুমহান্ আদর্শকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে শিখবে ও সেদিন এই আদর্শ লাভের জন্যে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সুখ-স্বার্থ নির্ব্বিচারে বিসর্জ্জন দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'বে।

ভ্রম সংশোধনঃ—বর্ত্তমান সংখ্যার ৩০ পৃষ্ঠার 'পূজারী' কবিতায় ২য় স্তম্ভের প্রথম পংক্তির 'চারি ধারে নিরলস…' স্থলে 'চারি ধারে আজ নিরলস…' হইবে।

সাময়িকী

বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার প্রস্তাবাবলী :

বৃটিশ সমর-মন্ত্রী-সভার পক্ষ হইতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ ভারতের ভাবী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় পূরণ সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেনে ও ভারতে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যতদূর সম্ভব সত্বর ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বনের মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎসমুদয় সুস্পষ্ট ভাষায় ও পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে—এরূপ এক নূতন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (New Indian Union) গঠন করা, যাহা সম্রাটের প্রতি সাধারণ আনুগত্য দ্বারা ইউনাইটেড কিংডম (বৃটেণ) ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সর্ব্ব বিষয়ে উহাদের সমান মর্য্যাদা-সম্পন্ন ডোমিনিয়নে পরিণত হইবে। উহা আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে কোন দিক দিয়াই কাহারও অধীন হইবে না।

সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা প্রচার করিতেছেন :

(ক) যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরেই ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া ভারতে একটী নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। কি ভাবে ইহা গঠিত হইবে, তাহা পরে বিবৃত করা হইতেছে।

(খ) শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির অংশ গ্রহণের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(গ) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এইরূপভাবে রচিত শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত সর্ত্তে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে ও কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন :—

(১) বৃটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, তাহাকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে দেওয়া হইবে। পরবর্ত্তী কালে ঐ প্রদেশ যদি নবগঠিত যুক্তরাজ্যে যোগদানে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে। যে সব প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে রাজী হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাদের জন্য 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের' অনুরূপ পূর্ণ মর্য্যাদাসম্পন্ন অন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন; উহাও এই স্থলে উল্লিখিত ভাবেই প্রণীত হইবে।

(২) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও শাসনতন্ত্র রচনাকারী উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনা দ্বারা একটি সন্ধিপত্র (Treaty) স্বাক্ষরিত হইবে। এই সন্ধিতে বৃটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের নিকট সম্পূর্ণ দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান থাকিবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্ম্মবিষয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এই সন্ধিতে তাহা রক্ষার বিধান থাকিবে। কিন্তু এই সন্ধি বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক নির্দ্ধারণের ক্ষমতার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করিবে না।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্

কোনও দেশীয় রাজ্য এই শাসনতন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক, নূতন অবস্থায় প্রয়োজন বুঝিয়া ইহাদের সন্ধিসর্ত্তগুলির পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আবশ্যকীয় আলোচনা চালাইতে হইবে।

(ঘ) প্রধান প্রধান ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্বে নিজেদের মধ্যে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থায় সম্মত না হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে :—

যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদসমূহের সকল সদস্য একটি নির্ব্বাচকমণ্ডলীরূপে (as a single Electoral College) সংখ্যানুপাতে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে (Constitution-making Body) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর আনুমানিক একদশমাংশ সদস্য লইয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে।

বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যার যে অনুপাত অনুসারে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি এই শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে থাকিবেন, সেই অনুপাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে দেশীয় রাজ্যসমূহকেও আহ্বান করা হইবে এবং বৃটিশ ভারতের সদস্যগণের যে অধিকার থাকিবে, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও সেই অধিকার থাকিবে।

(খ) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে সঙ্কটকাল যাইতেছে, যতদিন তাহা দূরীভূত না হয় এবং যতদিন নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব না হয়, ততদিন নিশ্চিতই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষার দায়িত্ব বহন করিবেন এবং জগদ্ব্যাপী মহাসংগ্রাম-প্রচেষ্টার অংশস্বরূপ তাহা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সামরিক, নৈতিক ও উপকরণগত যে সকল সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, উহা পুরাপুরি সংগঠন করিবার দায়িত্ব থাকিবে ভারত গভর্ণমেণ্টের এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট তদর্থে ভারতবাসীদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের, বৃটিশ কমনওয়েলথের ও সম্মিলিত রাজ্যসমূহের পরামর্শদান ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দলসমূহের নেতৃবর্গের ত্বরিত ও সক্রিয় যোগদান কামনা করেন ও তজ্জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য যাহা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য্য, এইভাবে তাঁহারা সেই কার্য্য কার্য্যকরী সম্পাদনে এবং গঠনমূলকভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন।"

স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের দৌত্য :

ভারতের শাসন-সংস্কারের যে প্রস্তাব বৃটিশ সমর মন্ত্রি-পরিষদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই আলাপ আলোচনার ব্যাপারে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের নিজস্ব দায়িত্ব কিছু ছিল না, বৃটিশ হাইকমাণ্ডের দৌত্য গ্রহণ করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহাকে সমস্ত সমস্যাটি আলোচনা করিতে হইয়াছে। বৃটিশ সমর মন্ত্রি-সভার বিশিষ্ট সভ্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর সহিত সমাজ-তন্ত্রবাদী স্যার ষ্ট্যাফোর্ডকে মিলাইতে গেলে ভুল করা হইবে। ভারতবর্ষ সে ভুল করে নাই। ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচলায়তনে এখনও ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারার বিষক্রিয়া চলিতেছে। এবং পরোলোকগত মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন একজন অগ্নিভুক (fire-brand) সমাজতান্ত্রিক।

প্রস্তাবের প্রথমাংশে ভবিষ্যৎ এবং শেষাংশে বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুবিহীন বলিয়া বৃটিশ সমরমন্ত্রি-পরিষদের এই প্রস্তাবাবলীকে ভারত গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন যুক্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব বর্জ্জিত হইয়াছে। সাপ্রু ও জয়াকরের নেতৃত্বে ভারতের উদারনৈতিক দল ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান দেশরক্ষা ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অনমনীয় মনোভাব ও খণ্ডিত ভারতের যে পরিকল্পনা ইহাতে করা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভাবী শাসনতন্ত্র রচনায় কোন প্রদেশের পৃথক থাকিবার যে স্বাধীনতা

কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলেও ইহার অনিষ্টকর দিকগুলি লইয়া ইঁহারা গভীর আলোচনা করিয়াছেন। এই যুক্তিগুলির সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নাই, সংবাদপত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার তরফ হইতে অখণ্ড ভারত সৃষ্টির প্রতিবন্ধকরূপে এই প্রস্তাবকে দেখা হইয়াছে। হিন্দু মহাসভা বলিয়াছেন—The right to step out of the Indian federation will stimulate communal and sectional animosities. মহাসভার

এই আশঙ্কার পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। ইহা বিবেচনা করিলে বিভিন্ন ইউনিয়ন সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সমস্যাটীর এই দিক দিয়া বেশী আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, এমন কি মহাসভার পাকিস্থান বিরোধী প্রস্তাবে ইহার বিশদ কোন আলোচনা করা হয় নাই, মাত্র একটু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে সারা ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ব্রিটিশেরই প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারই ফল। অথচ বৃটিশের উচ্চতর শাসন কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের এই দূষিত মানসিকতার (Psychology) পূরামাত্রায় সুযোগ লইতে চাহিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার বীভৎস আত্মপ্রকাশ কোন জাতির জীবনে সাময়িকভাবে সত্য হইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতের এই সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সাময়িক ভাবে যত বড় সত্যই হউক, কোন জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কল্যাণ ইহাতে আত্মসমর্পণ করিলেই যে আসিয়া যাইবে এইরূপ চিন্তা করার মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি আছে। সংখ্যা লঘিষ্টের দোহাই দিয়া একটা খণ্ডিত সত্য ও সাময়িক ব্যাপারকে বড় করিয়া দেখার জেদ আজ কর্ত্তৃপক্ষের দেখা যাইতেছে। যুক্তি হিসাবে ইহাকে বড় করিয়া দেখিলে ভারতের বৃহত্তর সম্ভাবনাকে নষ্ট করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের শাসকবর্গ আসন্ন সঙ্কট মুহূর্ত্তেও অকুণ্ঠিতভাবে এই পথেই চলিতেছেন। জাতির বৃহত্তর জীবন, তার ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যাহা শুধু অতীত বা বর্ত্তমানকে লইয়া নয়, যাহা আগামী ভবিষ্যতেও ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার সহিত এই ধরণের সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী চিন্তাধারা খাপ খায় না। প্রায় ১৫০ বৎসর বৃটিশ শাসনের ফলে বর্ত্তমানে এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির এক চরম প্রকাশ রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় যদি সমস্ত জাতিকে গণভোটের সাহায্যে (Adult Suffrage) তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও জনমতের মধ্য দিয়া ভারতের সত্যকারের মনোভাব ও চাওয়া হয়তো প্রকাশিত হইবে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। Constitution-making body যাহা প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই প্রাদেশিক নির্ব্বাচন সম্পূর্ণরূপে adult suffrage দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যাক্। গণতন্ত্রের (Democracy) দিক দিয়া ইহা খাঁটি, যুক্তির দিক দিয়াও ইহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। তথাপি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় গণতন্ত্রের এই বৃহত্তর নীতি ব্যর্থ হইয়া যাইতে বাধ্য। কারণ বর্ত্তমানে জনগণের মানসিক স্বচ্ছতা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের গ্লানিতে মলিন হইয়া উঠিয়াছে; এ অবস্থায় গণতন্ত্রের যত

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

বড় প্রয়োগই হউক না কেন, জনসাধারণ তাহার পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়া কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িকতাকেই কল্যাণের পথ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সাম্প্রদায়িকতার হবিপুষ্ট মানুষের মন গণতন্ত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি খাঁটি হইয়া উঠিতে পারে না। অকল্যাণকেই সে কল্যাণের পথ বলিয়া মনে করিবে। অথচ কৌতুকের বিষয় এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী জগতের সম্মুখে নিজেদের এই বলিয়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইবে যে, আমরা তোমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধিকারের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তোমরা গ্রহণ করিলে না। আমরা সাম্প্রদায়িকতাশূন্য

শাসনতন্ত্র রচনা করিবার ভার তোমাদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা সাম্প্রদায়িকতাকেই বড় করিয়া লইয়াছ। এমন কি তোমরা সর্ব্বদল মিলিয়া একটা সংযুক্ত দাবীও পেশ করিতে পারিলে না।

অথচ ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার যে অন্ধ গলিপথ আজ আমাদের সম্মুখে প্রসারিত তার জন্য সত্যই দোষী কে? হিন্দু মহাসভা ইহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র হইতে কোন প্রদেশের পৃথক থাকিবার যে স্বাধীনতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহার অনিষ্টকারী ইঙ্গিত এখানে খুঁজিলেই মিলিবে।

মুসলিম লীগের পাকিস্থানী চীৎকার এখানেও উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। লীগ-ডিক্টেটররূপে মিঃ জিন্না সমর-পরিষদের প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও পুরাতন সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া সমস্ত সমস্যার প্রতি লীগের মনোভাব হইয়াছে অগভীর ও রাষ্ট্রবুদ্ধিবিবর্জ্জিত।

কংগ্রেস যুদ্ধবিরতির পর শাসনতান্ত্রিক যে কাঠামোটা গড়িয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; বরং আজাদ-ষ্টাফোর্ড পত্রাবলীর একস্থানে ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কংগ্রেসের কতকটা অনুকূল মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী আলাপ-আলোচনা 'ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট' ও 'ডিফেন্সে'র বালুচরে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিতজী ও মৌলানা আজাদ বিশেষ আন্তরিকতার সহিত আগাগোড়া আলোচনা চালাইয়া এমন কি সর্ব্বনিম্ন (minimum and irreducible) বস্তুতন্ত্র দাবীতে স্বীকৃত হইয়াও, শেষ পর্য্যন্ত সফলকাম হইতে পারেন নাই। সত্যকারের কোন দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিতে কর্তৃপক্ষের দৃঢ় অনিচ্ছা পক্ষাধিককাল আপোষের আপাতঃ মনোরম মুখোষ পরিয়া যে নিজেকে জাহির করিতেছিল, সে ছদ্মবেশের নগ্নরূপ আলোচনান্তে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। লর্ড প্রিভি সীল যদি প্রারম্ভেই স্পষ্ট হইতে পারিতেন তবে আলোচনা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইত। আলোচনা যে 'ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট' ও 'ডিফেন্স' সম্বন্ধীয় ধারণার ভুলের উপর এতদূর গড়াইয়াছে তাহা স্যার ষ্টাফোর্ডের শেষ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বৃটেনের বর্ত্তমান ডাই-হার্ড সমর-মন্ত্রী মণ্ডলীর প্রগতিশীল পারিপার্শ্বিকতার জ্ঞান-বিবর্জ্জিত স্বার্থান্ধ মনের ইচ্ছাকৃত ভ্রম। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের উদ্ধত উক্তি ও দম্ভের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছেন:
"Airily enough, Sir Stafford says, the Congress wanted all or nothing, they could not have all, so they got nothing. I alter the words and say, the British Government wanted to give nothing at present, they could not delude the people into the belief that nothing is something. So the British Government got nothing out of these negotiations" শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির এই উক্তির মধ্যে প্রস্তাবের মর্ম্ম সুস্পষ্ট। মহাত্মাজী প্রথম দর্শনেই এই প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝিতে পারিয়া আলোচনা চালানই আবশ্যক মনে করেন নাই।

বস্তুতঃ চীন, রাশিয়া, মার্কিণের প্রভাব ক্রিয়াশীল না হইলে বর্ত্তমানে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের এই দৌত্যের প্রয়োজন গোঁড়া রক্ষণশীল চার্চ্চহিল মন্ত্রিসভা আদৌ অনুভব করিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শাসন-কর্তৃপক্ষ জীর্ণ পুরাণো কাঠামো চূণ ফিরাইয়া ভারত তথা সমগ্র মিত্র শক্তিপুঞ্জের মনস্তুষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে, ভারতের রাষ্ট্রচেতনা আজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। গোখেল-নৌরোজি-অরবিন্দ-বিপিন পাল - সুরেন ব্যানার্জ্জির স্বরাজ-স্বপ্নের মধ্যে যে বৃটিশ-স্বাতন্ত্র্য দুঃসহ ছিল, আজ কালচক্রে দীর্ঘ ত্যাগ তপস্যার পথ বাহিয়া তাহা স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতার বাস্তব রূপ লইতে চলিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না, করিলে ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনকেই অস্বীকার করা হয়। ইহা ভিন্ন ভারতের জাতীয়তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মর্য্যাদার কোন অর্থ থাকে না।

মোটের উপর আসন্ন সঙ্কটমুহূর্ত্তে ভারতের বর্ত্তমান দেশ-রক্ষা-ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিবার এই সুযোগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে হেলায় হারাইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্রমহল ভারতীয় কংগ্রেসের এই দাবীকে অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। আমেরিকার পত্রিকাগুলি কিছু কিছু হঠকারিতা করিলেও

কংগ্রেসের মূল যুক্তির বিরোধী কোন কিছু প্রকাশ পায় নাই। সুখের বিষয়, এই আলোচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্বের জাগ্রত দৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই মনে হয়, স্যার ষ্টাফোর্ডের এই দৌত্য আপাততঃ নিষ্ফল হইলেও ভবিষ্যতে ইহা আরও বৃহত্তর সম্ভাবনা লইয়া দেখা দিবে এবং ফলপ্রসূ হইবে।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের পরিচয়ঃ

বৃটিশ সমর পরিষদের প্রস্তাব লইয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ভারতে আসিয়াছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম ভারতের ঘনায়মান রাষ্ট্রনীতিক সমস্যার সমাধানের পথ তিনি খুঁজিয়া পাইবেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। রাষ্ট্রনীতিক হিসাবে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের কৃতিত্ব বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে, আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি কথা এখানে আলোচনা করিতেছি।

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ফ্রান্সের রেড ক্রস প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। পরবর্ত্তী বৎসর কুইনস্ ফেরী (Queen's Ferry) নামক স্থানে তিনি সম্রাটের রাসায়নিক কর্ম্মশালার সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদ গ্রহণ করেন। আইনের ক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয়বত্তা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাকে সাফল্যের শীর্ষে টানিয়া আনিয়াছিল। তিনি একজন গভীর আদর্শবাদীরূপে বৃটেনের রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান করেন। রাষ্ট্রনীতিক জীবনে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎকালে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শান্ত, বিনয়ী ও সাধকোচিত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া থাকেন। ভারতের সাদাসিধা জীবনযাত্রায় তিনি যেন স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারেন। তিনি নিরামিষাশী; মাদক দ্রব্য ও বিলাসিতাও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। ২৪শে এপ্রিল তাঁহার ৫৩ জন্ম বার্ষিকী পূর্ণ হইবে।

পরলোকে সঙ্ঘ-সাধক কৃষ্ণচন্দ্রঃ

স্থির একাগ্র নেত্রে বিলম্বিতা মাতৃমূর্ত্তির পানে প্রেমপ্লুত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিশিষ্ট সাধক কৃষ্ণচন্দ্র পাল ২২শে চৈত্র, রবিবার গভীর নিশিথে ইষ্টধামে প্রয়াণ করেন। সহতীর্থমণ্ডলী, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নারী ও পুরুষ, সঙ্ঘ ও জাতির অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য সে রাখিয়া গেল তার পুণ্য জীবনেরই অমর উৎসর্গ-বীর্য্য, প্রেম ও তপস্যার স্মৃতি।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে চন্দননগরে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম। পিতা ৺অবিনাশ চন্দ্র পালের সে অষ্টম সন্তান। আই-এস-সি পড়িতে পড়িতেই সঙ্ঘগুরুর নিকট আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র একদিন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দেয়। তার মুখের সেই ভাষা "unconditional surrender" আজও সহতীর্থগণের স্মরণে আছে। তাহার প্রতি চিন্তা, অনুভূতি, প্রতিনিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত ছিল

৺কৃষ্ণচন্দ্র পাল

সঙ্ঘেরই জন্য। এমন দরদী, একনিষ্ঠ, প্রেমিক প্রাণ মর্ত্ত্যে খুব অল্পই আসে!

সঙ্ঘব্রতে দীক্ষিত হইয়াও ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থসাধনাই হইল তার উৎসর্গের প্রথম সোপান। তার পরই, কালব্যাধি প্রথমে প্লুরিসিরূপে দেখা দেয় এবং তাহাই তাহাকে অনেকখানি অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। কিন্তু তাহার সেবানিষ্ঠ সাধকপ্রাণ ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, শুধু সেবার ক্ষেত্রটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্ঘকর্ম্মেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের অকুণ্ঠ একান্ত সেবা ও বিজয়ী ইচ্ছাশক্তি প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি-ভবনের অভ্যুদয়ের মূলে কতখানি কার্য্য করিয়াছে, তাহা সঙ্ঘ ও সঙ্ঘের বাহিরেও সুপরিচিত। এই বিশ্বাসী ভক্ত ও প্রেমিকের তিল তিল আত্মদান ১৪ বৎসরের অধিক কাল দেহের ধারাবাহিক রোগাক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সঙ্ঘকে

দিয়াছে তুলনাহীন সেবা ও উৎসর্গ, বিশ্বাস ও মহাপ্রেমেরই দৃষ্টান্ত। সঙ্ঘগুরুর নির্দ্দেশ মত সঙ্ঘে নিরামিষ ভোজন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হয়।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব :

শ্রীমান অজিত মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়িতে পড়িতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের কিছু পরেই বিলাতে যান। বি-এ পাশ করিবার পরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক তাঁর 'বাংলার লোক শিল্প' (Folk Art of Bengal) সম্বন্ধে যে সুবৃহৎ বইখানি প্রকাশিত হয়, তাহা সুধীসমাজের
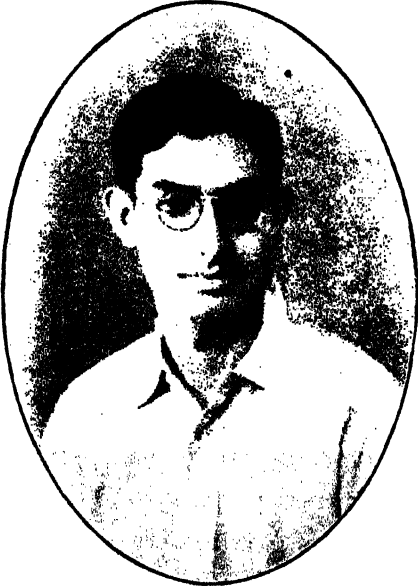
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিগত ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'শিল্পের ইতিহাসে' সাফল্যের সহিত এম-এ পাশ করেন। তাঁহার বিশেষ বিষয় ছিল 'আদিম জনশিল্প' এবং থিসিস্ (Thesis) লিখেন বাংলার 'জনশিল্পে'র উপর। লণ্ডনের বিখ্যাত 'Ethnographical Museum' ও 'Hornman Museum'এর অধ্যক্ষ ডক্টর ম্যাল্‌কম্-এর অধীনে Moscologyতে অজিতবাবু বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত Royal Anthropological Institute-এর তিনি Fellow নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। আমাদের দেশে অজিত বাবুই বোধহয় প্রথম আদিম ও জনশিল্প সম্বন্ধে এইরূপ গবেষণামূলক উচ্চ শিক্ষা পাইলেন। লোকশিল্পের পুনর্জ্জাগরণকল্পে অজিত বাবুর আকৈশোরের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা সফলকাম হইয়াছে দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দিত হইয়াছি। বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া অজিতবাবু বাংলা ও বাঙালীর মুখোজ্জল করুন, ইহাই প্রার্থনা।

পরলোকে ভাগবত ভূষণ :

গত ৮ই চৈত্র, রাত্রি ১২ ঘটিকায় চন্দননগরের চাঁপাতলানিবাসী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় ৬৪ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করেন। ভাগবত ভূষণ মহাশয় একজন সুপণ্ডিত, সদাশয় ও সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। শুধু শাস্ত্রজ্ঞান নয়, তিনি প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগের অধিকারী ছিলেন ও অনাড়ম্বরে স্বধর্ম্ম পালন করিতেন। এই সঙ্গে তাঁর উদারভাব ও খাঁটি সাধুচরিত্রই তাকে সকল সৎকর্ম্মের অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল ও এই সূত্রেই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সহিত তাঁর যে পরিচয় হয়, ইহা গভীর প্রীতির বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল। সঙ্ঘের সকল অনুষ্ঠানে শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন। আমরা বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল :

গত ১লা এপ্রিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (Secondary Education Bill) উত্থাপিত হইয়াছে। নূতন বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে প্রায় অনুরূপ কারণ দেখাইয়া বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীমণ্ডলী ১৯৪০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিল লইয়া তৎকালে সমগ্র প্রদেশে এক প্রবল প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। ইহা ছিল একটি গভীর চক্রান্তজাত রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিধান। গত মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টসহ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই বিলের আলোচনা কিছু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসরও হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ ইহার পরই এই সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমণ্ডলীর

পতন হয় এবং তাহার স্থলে মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিমণ্ডলী পুরাতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিল অর্থাৎ ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি রচনা করিয়াছেন। ইহাই প্রস্তাবিত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৫৭ ধারায় সমাপ্ত এই বিলটির বিস্তৃত বিচার-বিবেচনা এ স্থলে সম্ভব নয়, তথাপি ইহা বলা চলে, প্রস্তাবিত শিক্ষা-আইনের মধ্য দিয়া আমরা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের একটি বিবেচনাশীল মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি। বিলটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রশংসার বিষয় কিছু থাকিলেও, ইহার দোষত্রুটিগুলির প্রতিও আমাদের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বর্ত্তমান বিলে বর্ণিত বোর্ডের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সম্পর্কেও পুরাতন অভিযোগের জের রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিলে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার যে নীতি কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলেই এই ত্রুটিগুলি রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া বিলটি অধিকতর সুসংস্কৃত হইয়া উঠিবে।

পি, এফ্, ক্লাব:

প্রবর্ত্তক ফার্নিসার্স লিমিটেডের শো রুমে সম্প্রতি পি, এফ, ক্লাবের বাসন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে সখের যাদুকর শ্রীযুত পশুপতিনাথ দাস মনোহারী যাদু দেখাইয়া উপস্থিত দর্শকগণকে আমোদিত করেন। ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ জলযোগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নিমন্ত্রিতগণকে বিশেষ আপ্যায়িত করেন।

প্রবর্ত্তক ফার্নিসার্স লিমিটেডের মালিক, কর্ম্মচারীবৃন্দ এমন কি আজ্ঞাবাহক পর্য্যন্ত এই ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পারস্পারিক হৃদয় বিনিময়ের মধ্য দিয়া এক প্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পি, এফ, ক্লাবের এই সৌহার্দ্দপূর্ণ আদর্শ সত্যই অনুকরণীয়।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব:

৫ই বৈশাখ হইতে ১৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বিংশবার্ষিক প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী চন্দননগর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলার স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী ও দেশরক্ষক সচিব মাননীয় শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু এম-এ বি-এল মহোদয় উদ্বোধন সভার পৌরোহিত্য এবং প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। বিচিত্র অনুষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাদির ব্যবস্থা প্রতিদিন অপরাহ্নে আছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়কে চার্ট মডেল প্রভৃতির মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলা হইবে। প্রদর্শনী এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য।

সহর ত্যাগ বাঞ্ছনীয় কি না?

গত ১৫ই মার্চ্চের হরিজন পত্রিকায় 'স্থান ত্যাগ বাঞ্ছনীয় কিনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন—আক্রমণের সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই সহরে বাস করিতে বাধ্য নহে। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে

পি, এফ, ক্লাবের সভ্যবৃন্দ

যে, যাহারা অকেজো তাহারা সকল প্রকারেই ভারস্বরূপ হইবে। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সাফল্যপূর্ণ উপায় হইতেছে শত্রুকে দূরে রাখিবার জন্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া মনোনিবেশ। যাহারা রক্ষা ব্যবস্থায় নিযুক্ত তাহাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নহে। সামরিক কৌশলের দিক হইতে ইহা বলা যায়।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় :

যাঁহারা পূজনীয় সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের গত ৭ই জানুয়ারী বিজন-বাস-বরণের পর, তাঁহার সংবাদ সম্বন্ধে স্বাভাবিক চিন্তা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশপূর্ব্বক সঙ্ঘকেন্দ্রে পত্র দিয়াছেন ও দিতেছেন, সেই সকল বিশিষ্ট অনুরাগী ভক্ত পুরুষ ও মহিলা, গৃহস্থ সাধক ও সাধিকা সকলের কাছে তাঁহার নিম্নলিখিত নির্দ্দেশটুকু সান্ত্বনার কারণ হইবে :—

"যুদ্ধসঙ্কট যতই হউক, মানুষের মন ততোধিক আতঙ্ক-গ্রস্ত। যোগীর উদ্বেগের কারণ নাই। অবস্থা মত ভগবান ব্যবস্থা করিবেন। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় আমরা যেন বিচলিত না হই। দুর্দ্দিনেও যে আগাইয়া চলে, জয় সেইখানেই অনিবার্য্য।"

অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ কামনায় পূজনীয় সঙ্ঘগুরু গভীরভাবে আত্মস্থ আছেন। অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির খেলা সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়াই তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

"যাঁহারা সঙ্ঘের অমৃতময় উপাসনাবিধান বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিবে, আমার ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা দিয়া তাহাদের সকলের ভিতর আমি অধ্যাত্মক্ষেত্র হইতে শক্তিসঞ্চার করিব।"

সঙ্ঘগুরু শারীরিক মোটামুটী সুস্থ আছেন। তাঁহার ঠিকানা সঙ্ঘকেন্দ্র ব্যতীত অন্য সাধারণের নিকট অজ্ঞাত
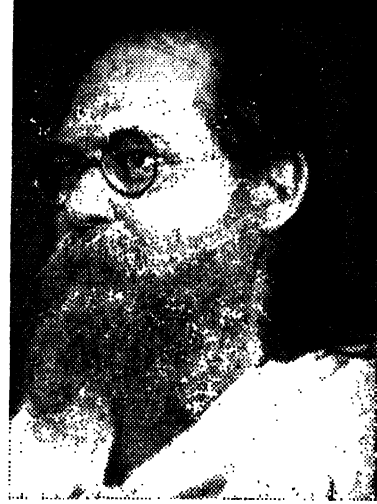
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়

থাকিবে। তবে পত্রাদি চন্দননগর মূল কেন্দ্রের সম্পাদক-মারফৎ তাঁহার নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।

প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী :

এ বৎসরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কিঞ্চিদধিক ৪৩ হাজার পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার বেশী। ইহাদের জন্য ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এ বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ১৪,৩২৬ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছেন, গত বৎসরের সংখ্যা ছিল ১৩,৯৬৯।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
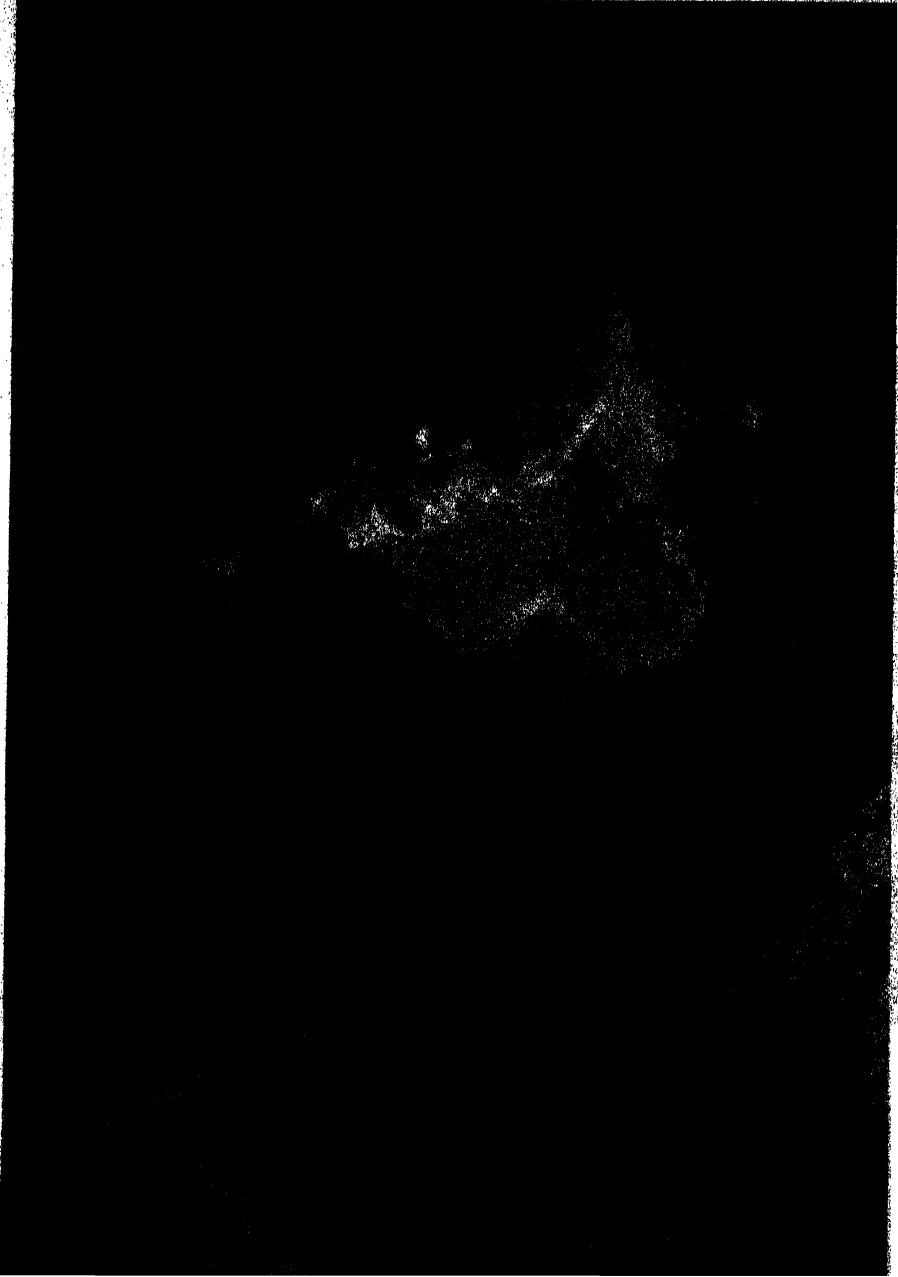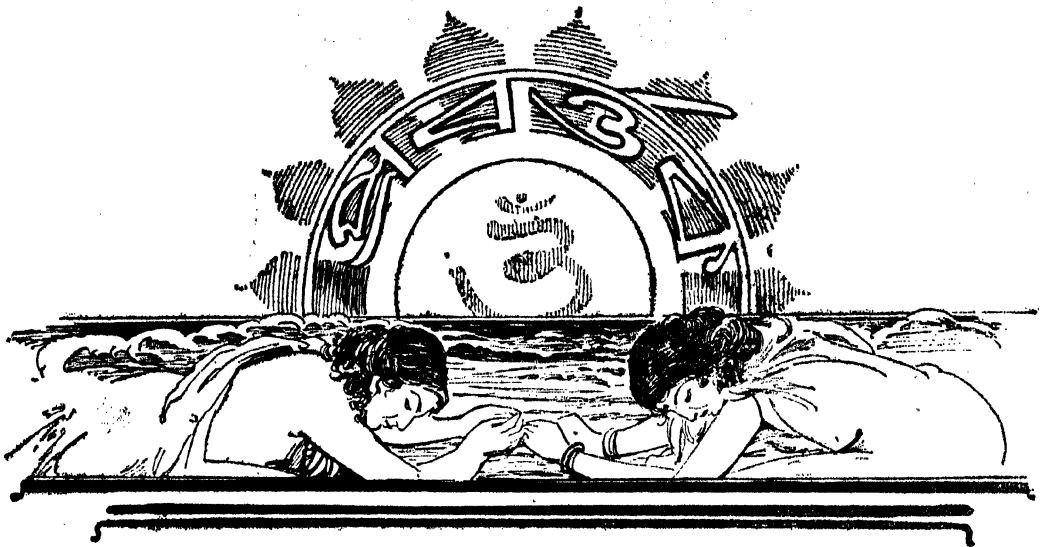
সপ্তবিংশ বর্ষ ১৩৪৯ সাল	জ্যৈষ্ঠ	প্রথম খণ্ড ২য় সংখ্যা

তদেকং শরণম্

"তদেকং শরণম্"। সেই একে সতত আশ্রয় করে' থাকা—অন্য আশ্রয় ত্যাগ করা—তবেই তো সাধনার আরম্ভ।

অন্তরে যদি অন্য আশ্রয়-জ্ঞান আসে, সাধনার ক্ষুণ্ণতা অনিবার্য্য। অধ্যাত্মযোগ ভিন্ন ভিতরের ভাব-রক্ষা সম্ভব নয়, এই হেতু নিরন্তর সতর্ক থাক। বাহিরের মত অন্তরেও যেন তুমি আশ্রয়শূন্য হতে পার। যে অন্তরে বাহিরে মুক্ত, তার দিকে চেয়ে নিঃসংশয়েই বলা যায়—"অহং ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।"

পৃথিবীর মানুষ শুধু ভাবে ও কথায় ধর্ম্মকে গ্রহণ করে, সত্তার ধর্ম্মের সন্ধান রাখে না। এই জগতে তাই যথার্থ বিশ্বাসী সর্ব্বত্র সংশয়-ভাজন। তার ছিদ্রান্বেষণে প্রকৃতি উদ্যত। কিন্তু তোমাদের ভয় নাই। নিরন্তর শরণ যেখানে, সেখানে অন্য কিছু অন্তরায় সম্ভব নহে। হে খাঁটী আত্মসমর্পণযোগী, বিরোধ আর যতই থাক, এই সাধনচক্রে তোমাদের যে ঐক্য, তা' কখনও ব্যর্থ হবে না। মিশ্রণ হেয় কর। অনন্যশরণ হয়ে যোগসিদ্ধ হও। যোগীর ব্যূহই ভবিষ্য ভারতের শক্তি-কেন্দ্র।

[শ্রীম—]

জ্ঞান

আমরা চিন্তা করি, আমরা জানি। চিন্তার বিষয় থাকে। চিন্তা যখন জানা হইয়া দেখা দেয়, তখন সেই চিন্তার বিষয়ই হয় জ্ঞেয়। চিন্তার ভাষা শব্দ। জ্ঞানেরও বাহন কিয়দংশে তাই। কিয়দংশ বলিলাম; কেন না চিন্তাতীত জ্ঞানও আছে, অর্থাৎ সকল চিন্তার ন্যায় সকল জ্ঞানই শব্দময় নয়। প্রকৃতপক্ষে শব্দময় ও শব্দাতীত উভয়বিধ বোধ লইয়াই আমাদের জ্ঞানজগৎ গড়িয়া উঠে।

জ্ঞানের বিষয় জীবন। জীবনই জ্ঞেয়। যাহা কিছু ভাবি, বুঝি, বলি, ধরি, পাই, সকলই জীবনের অন্তর্গত, সকলই জ্ঞেয়। জ্ঞান ফুটিয়া উঠিতেছে এই সকলেরই মধ্য দিয়া—এই সবের ভিতরেই খেলিতেছে যে বোধশক্তি, যে চিৎশক্তি, তাহাই জ্ঞান। জীবন জ্ঞানেরই লীলা। কিন্তু সব সময়ে এই জ্ঞানের প্রকাশ জীবনক্ষেত্রে পরিস্ফুট থাকে না—অনেক সময়েই উহা থাকে নিগূঢ়ে প্রচ্ছন্ন। এই তমসাচ্ছন্ন বোধ লইয়াই আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জীবন। ঘটনার নির্মম আঘাতে বা বিশিষ্ট সাধনায় গূঢ় জ্ঞানশক্তি যখন অন্তরে জাগে, তখন আমরা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ভাব ছাড়াইয়া উপনীত হই এক অপার্থিব ঊর্দ্ধতন চৈতন্যে। এইখানেই জ্ঞানের উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ —ইহাই তাহার নিজস্ব অধিষ্ঠান ও ক্রীড়াভূমি।

কাঁচা যে জ্ঞান, তাহা লইয়াই আমাদের সংসার, সমাজ। ইহা মূলতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়। ঝুনা সংসারীর জ্ঞানকেও আমরা কাঁচা বলিতে ইতস্ততঃ করিব না। সে জ্ঞানের কত ফাঁক, তাহা একটু ভাবিলেই ধরা পড়ে, ইহা অধিক করিয়া বুঝাইতে হয় না। পাকা বিষয়ীরাও যে জীবনে পদে পদে ঠেকে ও ঠকে, ইহা তো অনেক স্থলেই দেখা যায়। তবু সেই কাঁচা জ্ঞানকেই পাকা মনে করিয়া, দুনিয়ার কাজ সারিয়া চলিতে হয়, ইহা আমাদের সহজাত স্বভাব-ধর্ম

কাঁচা জ্ঞান পাকা হয়—সাধনায়। জীবনে কোন ঘটনামূলক প্রবল আঘাত এই সাধনারই প্রকারান্তরে সহায়ক হয়। এমন কি ঘটনামাত্রকেই চতুর অধ্যাত্মযোগী তাঁহার সাধনার উপকরণরূপে ব্যবহার করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। প্রতি ঘটনাই জ্ঞানের উন্মেষ করে, জ্ঞান-প্রকাশের কারণ বা উপলক্ষ হয়। বৈদিক ঋষি জীবন-ঘটনার এই ব্যবহার-বিধি উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। প্রকৃতির নিয়মাধীন যে ঘটনা, তাহাকে বুঝিতে, ধরিতে হইলে, প্রকৃতির নিয়ম-রহস্য জানিতে হয় এই প্রকৃতিবিজ্ঞান বৈদিক ঋষি ও সাধকদের নিকট কি সুগভীর ও সুস্পষ্ট ছিল, তাহা বেদের যে কোনও মন্ত্রের সাধন ও অনুধ্যান করিলেই জানা যাইতে পারে। বেদোক্ত যজ্ঞও ক্রিয়ামূলক ঘটনারই সাধন। ইহা কর্ম্মসিদ্ধির হেতুভূত হইয়া, কৃতী সাধকের জীবনে জ্ঞানের বিকাশ সংঘটিত করিয়া তুলিত। আজও নিষ্ঠাশীল সাধক-সাধিকা গুরু-নির্দ্দিষ্ট আচার ও ক্রিয়ার অনুশীলন করিয়া যে প্রকরণ-সিদ্ধ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়, তাহা নিছক তর্কে, আলোচনায় সম্ভব নহে। প্রকৃত জ্ঞান চিরদিনই কর্ম্মমূলক অর্থাৎ ঘটনাসিদ্ধ। দার্শনিক ভঙ্গী অনুসরণ করিয়া বলিলে, ইহাই বলা যাইতে পারে যে, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান ক্রিয়ামূলক ঘটনার সহায়তায় অব্যক্ত অপ্রকাশ-অবস্থা হইতে নিরন্তর ব্যক্ত ও প্রকাশিত অবস্থায় আসিয়া পড়ে। এইরূপ জ্ঞান-প্রকাশ-নীতিই ভারতীয় শিক্ষা ও দীক্ষার মূল পদ্ধতি-সূত্র। "প্রতিবোধবিদিতং" বলিয়া উপনিষদের ঋষি যে ঘটনায় ঘটনায় বোধের অর্থাৎ জ্ঞানেরই বেদন বা জাগরণের নিগূঢ় সঙ্কেত দিয়া গিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিলেই আমরা এই ভারতীয় জ্ঞান-তত্ত্বও কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

পাকা জ্ঞান প্রাপ্তিমূলক। প্রাপ্তিই উপলব্ধি। যাহা পাই না, তাহা ঠিক ঠিক জানি, ইহা বলিতে পারি না।

জানার ঘনীভূত সত্যই পাওয়া। পাইলে, জানিবার আর খুব বেশী বাকী থাকে না। সে জানা তখন পাওয়ারই স্বতঃ-স্ফূরণ—চৈতন্যের আবরণমোচনে স্বরূপের আত্মপ্রকাশ।

ইষ্টকে জানিতে হইলে, তাঁকে পাইতে হইবে—প্রেম দিয়া, হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া। প্রেমের আকর্ষণ যেমন দূরকে নিকট করে, তেমনি জ্ঞেয়কে জ্ঞাত করে। আমরা যখন ভালবাসি, তখনই প্রিয়কে জানিবার, তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিবার বুঝিবার সুযোগ-সৃষ্টি করিয়া লই। ইহাই পাকা জ্ঞানের প্রকৃষ্ট বিধান। প্রিয়ের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়াই আমরা তাঁহার সহিত প্রাপ্তি-সম্বন্ধ সুদৃঢ় ও নিকটতর করিয়া তুলি। তাই আনুগত্যই প্রেমের ও পরিণামে জ্ঞানেরও বিশিষ্ট প্রকরণ।

পূর্ণযোগ

শরীরী আত্মার জীবনবিকাশই বস্তুতন্ত্র সত্য ব্যাপার। শুধু অশরীরী আত্মার জগতে কোনই কাজ নাই; আবার আত্মহীন শরীর শুধু জড়পিণ্ড অর্থাৎ যন্ত্র মাত্র। মানুষ একটা পূর্ণ গোটা বস্তু—একাধারে আত্মা ও দেহ। এই দুই লইয়াই পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন।

গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনার চেয়ে ভক্তিযোগে দেহধারী অবতারী পুরুষোত্তমের পূজার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এই পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনেরই আদর্শ ভারত তথা বিশ্বমানবজাতিকে দিয়া গিয়াছেন। পূর্ণ মানুষ তিনিই, যিনি শুধু অধ্যাত্মজীবন নহে, শুধু পার্থিব জীবন নহে, এই দ্বিবিধ জীবনাঙ্গ যুগপৎ বরণ করিয়া, উভয়কেই সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলেন।

পূর্ণতাই লক্ষ্য। তাহার সাধন—পূর্ণযোগ। এই যোগ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও বস্তুতন্ত্র। আধ্যাত্মিক ভিত্তি—বস্তুতন্ত্র বিকাশ। সূত্র হইতেছে এই—যাহা ভিতরে, তাহাই বাহিরে প্রকাশ পায়।

আমাদের তিন-চতুর্থাংশ জীবন জড়, যান্ত্রিক, বস্তুতন্ত্র। আমাদের অধ্যাত্মচেতনা অধিকাংশ সুপ্ত, অস্পষ্ট। এই যে জড়ীভূত বাস্তব জীবন, ইহা ভিতরের একটা সত্য-সূত্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিলেও, সে সূত্রের সন্ধান যেন এখানে পাওয়া যায় না অর্থাৎ চেতনায় স্পষ্ট হইয়া উহা ধরা দেয় না। বস্তুশক্তিকেই আমরা দেখি; দেখি না তার অন্তরালবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন চৈতন্য, যাহাই তাহার আত্ম-চৈতন্য। এইরূপে বস্তুতন্ত্র জীবন ও সংসার আত্মচৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে ও চলিতেছে। চৈতন্যের অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে যতটা সম্ভব ইহার বাহিরে গিয়াই দাঁড়াইতে হয়। জীবনের সাধন ও অধ্যাত্মসাধন হইয়া পড়ে বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন।

অথচ প্রকৃত সত্য হইতেছে—আত্মাই জড়ত্বের ভিত্তি ও উপাদান। আত্মার চৈতন্যই একাংশে ঘনীভূত হইয়া এই বস্তুঘন জগদ্রূপে বিকশিত, প্রকট হইয়াছে। আত্ম-চৈতন্য বাদ দিয়া জড় জগতের কোনও রহস্যই গভীর ও যথার্থ ব্যাখ্যা পায় না। জড় বিজ্ঞানের সত্যগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোকহারা হইয়াই আজ শিরোহীন কবন্ধের মত বিশ্বমানবের জীবনে কল্যাণের সহিত উৎপাত ও বিভীষিকাও সঞ্চার করিয়াছে—মানুষকেও করিয়া তুলিয়াছে পিশাচের ন্যায় নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, দৈত্য-দানবের ন্যায় বিকট ও বিভীষণ। আবার আত্মার সত্য খুঁজিতে গিয়া বস্তুতন্ত্র জীবনের সত্যে বিমুখ বা আস্থাহীন হওয়াও সত্যধর্ম্মীর লক্ষণ নহে। ভারতের মধ্যযুগে এই প্রয়াস কিছু প্রবল হইয়াছিল। তাহাতে বস্তুহীন আত্মার স্বপ্ন কল্পনারই মরীচিকা রচনা করিয়াছিল। ইহাই তথাকথিত শাঙ্কর মায়াবাদের মূল। প্রকৃতপক্ষে উহা বৈদিক পূর্ণ সত্যের খণ্ডিত অপব্যাখ্যা মাত্র। এবং আমরা যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, উহা আসল শঙ্করাচার্য্যেরও বিরচিত ব্যাখ্যা নহে, উহা শঙ্করাচার্য্য-নামধারী দ্বিতীয় কোনও ক্ষুরধার বুদ্ধিশালী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের উদ্ভাবিত ব্যাখ্যা, বেদ-সাহিত্যের অপভাষ্য। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে, পরাধীনতার অভিমুখী জাতির ক্ষীয়মাণ জীবন-প্রতিভা সহজেই প্রথম শঙ্করকে ডুবাইয়া, এই দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিপ্রতিষ্ঠ মতবাদকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল।

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ণযোগী নবীন জাতিকে অধ্যাত্ম ও অধিভূত, উভয়বিধ জীবন-সত্যকেই সংযুক্ত-ভাবে স্বীকার করিয়া, পরিপূর্ণ জীবননীতিই আশ্রয় ও অনুশীলন করিতে বলিতেছি। আত্মায় বস্তুর সত্য, বস্তুতে আত্মচৈতন্যেরই রূপ—এই পূর্ণ দৃষ্টি লইয়া আমরা চলিব। পূর্ণযোগ—পূর্ণতত্ত্বেরই অনুশীলন। তাই পূর্ণযোগী আত্মা ও শরীর, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, উভয় লইয়াই সাধনপথে চলিবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায়, তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম, দুই হাতে দুইখানি তরবারি ঘুরাইয়াই জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইবেন।

জ্ঞান—আত্মার সাধন। কর্ম্ম—দেহের। পূর্ণযোগে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়-সূত্রই বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে। জ্ঞানসিদ্ধ আত্মাই সিদ্ধ দেহ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া সিদ্ধ কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেন। জ্ঞানের সাধন অন্তরে। কর্ম্মের সাধন বাহিরে। পূর্ণ মানুষ বাহির ভিতর দুই সমান করিয়াই সাধন করিবেন; তার অর্থ এই যে, তাঁহার দেহ হইবে আত্মার সম্পূর্ণ অনুগামী, জ্ঞানের অনুকূল পথেই সে চলিবে, ফিরিবে, দেহের জ্ঞান, দেহের বোধ এমন কিছু হইবে না, যাহা আত্মজ্ঞানের বিরোধী বা প্রতিকূল, দেহের চাওয়া আত্মার চাওয়ার মধ্যেই আপনাকে মিলাইয়া ধরিবে, সেই সুরেই আপনার সবখানি সে বাঁধিয়া লইবে, ছন্দিত করিয়া তুলিবে; আবার তাঁর আত্মার চাওয়াও দেহের কোনও চাওয়াকেই একেবারে সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে না, পরন্তু তার মধ্যে যেটুকু শাশ্বত অমৃত, তাহাই সদ্যঃ ভূগর্ভোত্থিত ধাতু-দ্রব্যের মত মালিন্যমুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া লইবে।

এই দিক্ দিয়া পূর্ণযোগের সাধন হইবে দ্বিবিধ—প্রথম, আত্মার অতীন্দ্রিয় প্রেরণা দেহে আবাহন ও গ্রহণ; দ্বিতীয়, সেই প্রেরণার অভিষেকে দেহেন্দ্রিয়জ আসক্তির পরিশোধন ও রূপান্তর।

আমরা এই সকল কথা পরে সুযোগমত আরও সবিস্তারে আলোচনা করিব।

স্বাধীনতার যুদ্ধ

বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়—এই এক-পক্ষীয় ভারতবাসীর মত। অন্য পক্ষের মতে, সোভিয়েট রুষের যুদ্ধে যোগদানের পরে এই যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ অর্থাৎ আমাদেরও যুদ্ধ বলিয়া পরিগণ্য হইতে আর কোনই বাধা নাই। প্রথম শ্রেণীর মতের প্রধান কেন্দ্র মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুপ্রেরণা-চালিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস। দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদ বামপক্ষীয় চরম রাষ্ট্রপন্থিগণ—বিশেভাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট রুষের সুহৃদ্-সংহতিগুলি পোষণ ও প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় এই মতের প্রথম প্রচারক। সম্প্রতি ঢাকা জেল হইতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠনের রাজবন্দীগণ, স্বামী সহজানন্দ এবং পঞ্জাবের সদ্যঃকারামুক্ত রাষ্ট্রবন্দীগণও এই মতেরই সমর্থনে বাণী ও ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মহাত্মা গান্ধীজির ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের মতবাদ কার্য্যতঃ অভিন্ন হইলেও, তাহার মধ্যে একটু ভেদ বা বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। মহাত্মা গান্ধী শুধু বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধ নহে, তিনি যুদ্ধ মাত্রের সহিত সংযুক্ত হইতে অন্তরে অন্তরে চাহেন না—ইহা প্রধানতঃ আদর্শের দিক্ দিয়াই। যুদ্ধ হিংসাত্মক কার্য্য, ইহা রক্তপিপাসার অভিব্যক্তি—কাজেই অহিংসার উপাসক আদর্শবাদী ও নীতিবাদী গান্ধীজী এই হিংসামূলক যুদ্ধনীতির সমর্থন তাঁহার আদর্শ ও নীতির দিক্ দিয়াই করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস পুনা ও বোম্বাই, ওয়ার্দ্ধা বা দিল্লীতে যে সময়ে সময়ে অহিংসার আদর্শ নয়, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ঐ আদর্শের প্রয়োগ লইয়া সিদ্ধান্তের অদল-বদল করিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী মহাত্মা গান্ধী নিজে নহেন, পরন্তু অন্যান্য কংগ্রেসনেতৃগণই—ইহারা কখনও বিশুদ্ধ আদর্শবাদ, কখনও মিশ্র রাষ্ট্রবুদ্ধির প্রেরণায় আদর্শকে অনুরঞ্জিত বা অবনমিত করিয়াও বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন বা যোগদানের সর্ত্ত জ্ঞাপন করিয়া, মহাত্মাজীর হইতে তাঁহাদের মতবাদকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন এবং এখনও তুলিতেছেন।

এই কংগ্রেস-রাষ্ট্রনেতৃগণের মতে, বর্ত্তমান যুদ্ধ তখনই

আমাদের যুদ্ধ হইবে, যখন বৃটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিবে ও তৎসঙ্গে দেশরক্ষার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আমাদের করগত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসীর সম্মতি না লইয়া ভারতের যুদ্ধে যোগদান করার যে সরকারী ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়াই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসমন্ত্রিগণ শাসনভার প্রত্যর্পণ করিয়া শাসনতন্ত্রের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং "এই যুদ্ধ যে আমাদের নয়", এই কথাটুকু প্রচার করার স্বাধীনতা উপলক্ষ করিয়া ভারতব্যাপী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ নীতির অনুকরণ করিয়া অনেকেই—মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত প্রায় সকল কংগ্রেসনেতাই—কারাবরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে যুদ্ধের ঘনায়মান পরিস্থিতি ও ব্যাপক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় এই সকল রাষ্ট্রনেতাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পরিশেষে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে রাষ্ট্রদূতরূপে এ দেশে প্রেরণ করিয়া, এই যুদ্ধে কংগ্রেসের সক্রিয় সহানুভূতি ও পক্ষগ্রহণের জন্যই বিশেষ চেষ্টা চলে। বৃটিশ সমরপরিষদের প্রস্তাব কংগ্রেসনেতৃগণ যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত বিচার ও বিবেচনা করিয়াও, পরিণামে তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার পর বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা রাজা গোপালাচারিয়া কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত হইতে পুনশ্চ আরও একটু আপনাকে বিশিষ্ট করিয়া, মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত জহরলাল ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ন্যায় সতীর্থগণকেও অপ্রস্তুত ও রুষ্ট এবং সাধারণ দেশবাসীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, সে প্রস্তাবের মর্ম্ম সর্ব্বজনবিদিত। কংগ্রেসের নেতৃপরিষৎ হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া স্বাধীনভাবে প্রচার ও আন্দোলন সহায়ে অতঃপর এই প্রস্তাবটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং শেষে হয়ত অন্ততঃ মাদ্রাজে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট (National Government) না হউক, জনপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট (Popular Government) প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন, ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই আচারিয়া-পন্থিগণ উক্ত "পপুলার গভর্ণমেণ্ট" স্থাপন করিয়া দেশরক্ষার সক্রিয় সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এই আশা লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কংগ্রেস-দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহারই পূর্ব্বভূমিকাস্বরূপ তাঁহারা মুসলিম লীগের সহিত একটা আপোষ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে একটা "পপুলার ফ্রণ্ট"-সংগঠনেই উদ্যত হইয়াছেন।

কংগ্রেস ব্যতীত হিন্দু মহাসভার নেতৃগণ এই যুদ্ধে যোগদান ও ভারতবাসীর সামরিক অস্ত্রসজ্জার ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়াও, স্যার ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে উহার কোনও কার্য্যকরী অধিকার বা সুযোগ আছে, তাহা মনে করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্যই তাঁহারাও উক্ত প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সক্রিয় সহায়তা ও সহযোগিতা হইতে ক্ষান্ত আছেন। পক্ষান্তরে, মুসলিম লীগ তাঁহাদিগকে কিছু সারবান্ অধিকার দিয়া তুষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহারা এই যুদ্ধে সহায়তা করিবেন, নতুবা চুপ করিয়া থাকিবেন—এইরূপ রাজনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করিয়া অন্য পক্ষীয়গণের চালের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পণ্ডিত জহরলাল ও কংগ্রেসরাষ্ট্রপতি প্রমুখ ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতৃগণ তাঁহাদের ন্যূনতম দাবী ইংরাজ পূরণ না করিলে যে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে যোগ দিতে পারেন না, এই কথা বড় ব্যথা ও মনঃক্ষোভের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন ও সম্প্রতি এলাহাবাদ হইতে তাঁহারা দেশকে যে "লীড্‌" দিয়াছেন অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একদিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি মনোভাব ও অন্য দিকে জাপ-শত্রুর আক্রমণ-বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা, এই উভয়েরই প্রসঙ্গ আছে। কংগ্রেস বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার সক্রিয় বাধা দিবেন না; পক্ষান্তরে জাপান যদি এদেশ আক্রমণ করে, তবে কংগ্রেস সক্রিয়ভাবেই সর্ব্বপ্রকারে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। এই কংগ্রেসী ঘোষণায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার ন্যায় কয়েক জন সন্তুষ্ট হইতে না পারিলেও, ইহা স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে তবু মন্দের ভাল বলিয়া গ্রহণ করিবেন ও কিঞ্চিৎ আশ্বাস অনুভব করিবেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ক্রিপ্‌স্‌-দৌত্য ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও যে

উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই বলিয়া লর্ড প্রিভি সীল স্বয়ং ও সমগ্র এংলো-আমেরিকান মুখপত্র ও মুখপাত্রগণ প্রচার করিতেছেন, ইহার মূলে আছে এই ভাবেরই একটু আশ্বস্তিই। অবশ্য ভারতের ভবিষ্যৎ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে বৃটনের কোন কু-অভিপ্রায় নাই, এ বিষয়েও ঢাক পিটিয়া জগদ্ব্যাপী মিত্রপক্ষীয় ও নিরপেক্ষ জাতিগণকে জানাইয়া দেওয়ারও যে ইহাতে সুযোগ ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্যও যে ইংরাজের এই উল্লাস, তাহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে দেশবাসীর আসল স্বস্তি ও আশ্বাসের কারণ কিছু আছে কিনা, ইহা আমরা প্রশ্ন করিতে পারি। 'ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার', এই লোকপ্রবচন উদ্ধৃত করিয়া যাঁহারা বলিবেন—কংগ্রেস কি ভাবে একদিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, অন্য দিকে দুর্দ্ধর্ষ জাপশক্র, এই উভয়ের বিরুদ্ধে যুগপৎ দ্বিমুখী আত্মরক্ষার ও স্বাধীনতার্জ্জনের সংগ্রাম চালাইবেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না, তাঁহাদের তর্ক উড়াইয়া নিঃশেষ করার মত খুব বেশী শাণিত যুক্তি কংগ্রেস-পক্ষে পাওয়া যাইবে না। কংগ্রেসের সপক্ষে এইটুকুই যথার্থ বলিবার আছে যে, ইহা ছাড়া আমাদের আর উপায়ই বা কি আছে, যাহা সম্মানের সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে ও বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে? বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব—এ ছাড়া আর কোনও সম্মানজনক রাস্তা যে রাখে নাই। ইহা খুব সত্য কথা, সন্দেহ নাই। যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিনা দ্বিধায় ও সর্ত্তে পরাধীন সিরিয়াকে যুদ্ধকালেই স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন, তাঁহারা যে ভারতের ক্ষেত্রে ভিন্ন মনোভাব এখনও পোষণ করিতেছেন, তাহার কারণ তাঁহাদের চিত্তে অনুরূপ অবস্থার তাগিদ এখন পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য হইয়া দেখা দেয় নাই। কাজেই তাঁহারা এইখানেই আসিয়া আপাততঃ নিরস্ত থাকিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের পূজারীগণ এখন সত্য সত্যই কি করিতে পারেন?

আমরা বলিব—ভারতের স্বাধীনতা-সাধনার ক্রম-সূত্রেই এই সমস্যার আলো নিহিত আছে, সেই আলোর সন্ধানই নেতারা করুন। আর আদর্শের দায়ে নেতারা যদি তাহা আজ নাও করিতে পারেন, অন্ততঃ দেশবাসী, দেশের নবীন ও তরুণ জাতি তাহা করিবেন। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম এখনও অসম্পূর্ণ। স্বাধীনতার যুদ্ধই আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ। অন্য যুদ্ধ আমাদের পরোক্ষ সুযোগ বা বাধা মাত্র। আজ বিশ্বযুদ্ধের ঘোরতর সঙ্কটে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত গতিনির্দ্দেশ করিবে কে? এই সঙ্কটকেই সুযোগে পরিণত করার মত সে দীপ্ত রাষ্ট্রপ্রতিভা, সে সংগঠনী রণকৌশল কাহার আছে? যে বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটকে সুযোগে পরিণত করিয়া আবিসিনীয়া ইংরাজেরই সহায়তায় ও সহযোগিতায় পুনরায় স্বাধিকার ফিরিয়া পায়, সম্রাট হেল-সেলেসির সেই রাষ্ট্রনীতি, সেই বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রকৌশলের মর্ম্ম ভারতবাসী, ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণ কি অবধারণ করিতে অপারগ?

ইংরাজ আদর্শবাদী জাতি নহে; আদর্শগত সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশা তাহার নিকট করিতে গিয়াই আমাদের নেতৃগণ নিরাশ হইতেছেন—বিফলকাম হইয়া ফিরিতেছেন। ইংরাজ আমাদের ন্যায্য অধিকার দিতে স্বীকার করিলেন না বলিয়া নেতৃগণ আজ অভিমানের ব্যথায় কাতর, সংক্ষুব্ধ ও তিক্ত চিত্তে গান্ধীজীর যে অহিংস অসহযোগরূপ ঘরোয়া দাম্পত্যনীতির ক্রোড়ে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা-বার্ত্তা সুরু করিয়াছেন—সে নীতি আজ অচল। বিশ্বযুদ্ধের দিক্ দিয়াও ইহা অচল, আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের দিক্ দিয়াও অচল। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের যুদ্ধ এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই—সে যুদ্ধ রক্তদানের যুদ্ধ, নিষ্ক্রিয় সংগ্রাম নয়, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ।—সনাতন রণ-কৌশল ও রণ-শিক্ষাই তাহার জন্য অপরিহার্য্য। ইহার যে পরম সুযোগ, তাহা এই বিশ্ব-যুদ্ধের উপলক্ষেই আসিয়াছে এবং স্বয়ং ইংরাজকে আজ এই যুদ্ধে আমাদের শত্রুরূপে নয়, মিত্ররূপে আমরা ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারি—স্বপক্ষে টানিয়া আনিতে পারি। বৃটিশ সমর-সভার নিকট আজ আমরা আর কোনও অধিকারের দাবী উপস্থাপন করিব না—চাহিব না আর কোনও সর্ত্তের পূরণ—স্যার আর্চ্চিবল্ড ওয়েভেলের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বাধীনে আমাদের যুদ্ধ করিবার সার্ব্বজনীন অধিকারটুকুই আমরা

গ্রহণ করিব। আমরা স্বাধীনতা পাইলে, স্বাধিকার পাইলে, তবে যুদ্ধ করিব অথবা যুদ্ধ করিবার মত উৎসাহ ও শক্তিলাভ করিব—ইহা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী বসাইবার মতই হাস্যকর যুক্তি, অবাস্তব দাবী বলিয়াই আমাদের মনে হয়। স্বাধীনতা পাইয়া, অধিকার পাইয়া যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধের দিন ইহা আমাদের নহে; স্বাধীনতা পাইবার, স্বাধিকার-গ্রহণে অধিকারী হওয়ার জন্যই আজ আমাদের এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নহে, ইহা খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু এই যুদ্ধকেই আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমরা এই মুহূর্ত্তে পরিণত করিয়া লইতে পারি—ইহাই আমাদের বক্তব্য। তাহার জন্য প্রয়োজন—নেতিমূলক অসহযোগ নহে, পরন্তু সংগঠনী রাষ্ট্র-প্রতিভার আলোকে ও প্রেরণায় ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজ সেনাপতিরই ছত্রতলে ভারতের পরিপূর্ণ অস্ত্রসজ্জা ও সক্রিয় সমর-সহযোগ। আজ অভিনব স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই পথ আমাদের সম্মুখে। নবীন ভারতকে এই অব্যর্থ মুক্তি-মার্গেরই আবিষ্কার ও অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সঙ্কীর্ত্তনের দেশ ও কাল

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

বাঙ্গালার নানা জনপদে প্রায়শঃ অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ বাসরে সঙ্কল্প সহকারে অহোরাত্র, চব্বিশ প্রহর, পঞ্চরাত্রাদি আরব্ধ হইয়া থাকে। উহা প্রধানতঃ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। নাম-গুণ-লীলভেদে কৃষ্ণকীর্ত্তন ত্রিবিধ। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতই সঙ্কীর্ত্তন কোথায়, কবে, কাহার দ্বারা উদ্ভাবিত অথবা প্রথম প্রচারিত হয়, বলা দুঃসাধ্য। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্ব হইতে উহা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত ছিল এবং তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। আসামের মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে সঙ্কীর্ত্তন উপাসনার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গণ্য হইত। পশ্চিম ভারতের পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবা (শ্রীকৃষ্ণ?) বিগ্রহের ভক্ত বারকরী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকেরা বিশ্বাস করিতেন, নাম-কীর্ত্তন করিলেই মোক্ষলাভ হয়। শঙ্করদেব ও জ্ঞানদেব যথাক্রমে উল্লিখিত সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বোপদেব স্বামিকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পুষ্পিকাতে মুকুন্দ-সঙ্কীর্ত্তনের সুদুর্লভত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

> গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসঙ্কীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
> সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধাদ্ লভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ॥

দক্ষিণে নাম-সঙ্কীর্ত্তন আচার্য্য-রামানুজ-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের অভিগমন-উপাদানাদি পঞ্চাঙ্গ উপাসনার অন্যতম স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত।

স্বাধ্যায়ো নাম অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকো মন্ত্রজপো বৈষ্ণব-সূক্তস্তোত্রপাঠো নামসঙ্কীর্ত্তনং তত্ত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ।

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন

দ্রবিড় দেশে আঝ্বার (সাধারণতঃ আলওয়ার নামে পরিচিত) সাধকগণের অভ্যুদয় খ্রীষ্টীয় ১ম শতকেরও বহু পূর্ব্বে। তাঁহারা যন্ত্রসহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'বুদ্ধের প্রতি ভক্তি করিলে, তাঁহার পুঁথিপত্রের পূজা করিলে, তাঁহার ডাগোবার (পালী ডাগব—ধাতুগর্ভ; বুদ্ধদেবের ভূ-প্রোথিত কেশদন্তাদি স্মারক বস্তুর উপর নির্ম্মিত স্তম্ভ-স্তূপ প্রভৃতি) সম্মুখে কীর্ত্তন করিলে মানুষ সদ্গতি লাভ করে।'

নিম্নে পুরাণাদি হইতে অল্প কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

> গীতরাগস্বরৈশ্চ মূর্চ্ছনাতানসুস্বরৈঃ।
> গায়ন্তি কেশবং লোকা বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ॥

পদ্মঃ ভূমিঃ ৭৪ তম অঃ

অর্থাৎ বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ লোকেরা স্বর-তান-মূর্চ্ছনাযুক্ত স্বপদরচিত কেশবমাহাত্ম্য স্বস্বরে গান করিত।

প্রজাস্তু মুদিতাস্তত্রকৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
স্কন্দঃ, বিষ্ণু, ভাগবতমাহাত্ম্য ২।৭

তৎকালে তাঁহার (বজ্রের) প্রজাগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইল।

বীণাবেণুমৃদঙ্গৈঃ কীর্ত্তনকাব্যাদিরসসঙ্গীতৈঃ।
উৎসব আরব্ধবো হরিরতলোকান সমানায়্॥
ঐ ঐ ২।২৬

তিনি (উদ্ধব) বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ বাদন এবং কীর্ত্তন ও কাব্যাদি সরস সঙ্গীত দ্বারা তত্রত্য হরিগত-মানস ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধনাদদূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে।
প্রবৃত্তঃ কুসুমাম্ভোধৌ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনোৎসবঃ॥
বৃষভানুসুতাকান্তবিহারে কীর্ত্তনাশ্রিয়া।
সাক্ষাদিব সমাবৃত্তে সর্ব্বেঽনন্যদৃশোঽভবন্॥
ঐ ঐ ২।৩০-৩১

তিনি (পরীক্ষিৎ) গোবর্দ্ধন গিরির অদূরে বৃন্দারণ্যের কুসুমবহুল সখীস্থলে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-কীর্ত্তনোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বৃষভানুসুতার পতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিহার-ভূমি কীর্ত্তনসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল এবং সকলেই যেন অনন্যনয়ন হইয়া সেই উৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন।

শশ্বদেব নাম গায়ন্তি গুণং মন্ত্রং জপন্তি চ।
কুর্ব্বন্তি শ্রবণং গাথা বদন্তি তেঽতি বৈষ্ণবাঃ॥
ব্রবৈঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মঃ ১।৪৮

যাঁহারা নিরন্তর হরির নাম ও গুণ গান করেন ও তন্মন্ত্র জপ করেন এবং হরির পদাবলী শ্রবণ করেন, তাঁহারা অতিশয় বৈষ্ণব।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচারদসঙ্গ॥
ভাগঃ ১১।২।৩৮

চক্রপাণির সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্মবিবরণ লোক-মধ্যে গীত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল জন্ম-কর্ম্মঘটিত নাম শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা নির্লজ্জভাবে গান করিয়া নিস্পৃহ হৃদয়ে বিচরণ করিবে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
ঐ ১১।৫।৩২

বিবেকী ব্যক্তিরা তখন কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কীর্ত্তনবহুল অর্চ্চনা দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

স সংকীর্ত্তমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।
নারদভক্তিসূত্র, ৮০

তিনি (ভগবান্) সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া শীঘ্রই আবির্ভূত হন এবং ভক্তগণকে অনুভাবিত করেন।

'পুণ্যেষু কৃষ্ণকীর্ত্তনং'। নারদ পঞ্চরাত্র, ১।১।৭৮
পুণ্যের মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতং বীণাধ্বনিসমন্বিতং।
কুরুবৎসাধুনাত্রৈব শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সুরাঃ॥
গোপীনাং বস্ত্রহরণং পরং রাসমহোৎসবং।
তাভিঃ সার্দ্ধং জলক্রীড়াং হরেরুৎকীর্ত্তনং কুরু॥
ঐ ১।৩০।৬৬-৬৭

হে বৎস, এখন বীণাধ্বনির সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসময় সঙ্গীত কর, দেবতাসকল ও মুনিগণ শ্রবণ করুন। গোপীদিগের বস্ত্রহরণ, রাসোৎসব ও তাহাদের সহিত জলক্রীড়া ইত্যাদি হরির উৎকীর্ত্তন কর।

অথ গন্ধর্ব্বরাজস্তু ভগবানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতঞ্চ জগৌ তত্র কৃষ্ণরাসমহোৎসবং॥
ঐ ১।১১।১

অনন্তর ভগবান গন্ধর্ব্বরাজ বিধাতার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে শ্রীকৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান আরম্ভ করিলেন।

ধ্যায়ন কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥
বিষ্ণুঃ, ৬।২।১৭ ; গর্গ অশ্বমেধ, ৬১ তম

সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পূজা করিয়া যে ফললাভ হয়, মানব কলিকালে কেবল কেশব-কীর্ত্তন করিয়া সেই ফল পাইয়া থাকে।

অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
ঐ ৬।২।৩৯

অত্যন্তদুষ্ট কলির এই একটি মহদ্‌গুণ যে, এইকালে মানবগণ কেবল কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হরিবাসরে মনোহর গীতবাদ্যের ব্যবস্থা আছে।
স্তোত্রৈর্গানাবিধৈর্দিব্যৈর্গীতবাদ্যৈর্মনোহরৈঃ॥
ব্রহ্ম, ২২৮

সঙ্কীর্ত্তন পারায়ণেরও একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

প্রসাদতুলসীমালা শ্রোতৃভ্যশ্চাথ দীয়তাং।
মৃদঙ্গতালললিতঃ কীর্ত্তনং কীর্ত্ত্যতাং ততঃ॥
পদ্ম, উত্তর, ভাগবত মাহাত্ম্য ৬ অঃ *

---

* [প্রমাণাদির অধিকাংশ বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে গৃহীত।]

স্বপ্ন আর সত্য

শ্রীহাসিরাশি দেবী

অনাদি ভাবছিল: আর নয়, এইবার ইস্তফা দেওয়া যাক এ যাত্রায়! তবে—যাত্রা ব'লতে অভিনয় নয়, সংসার-যাত্রা! আজ এটা নাই, কাল ওটা ফুরিয়েছে, পরশু সেটা আনতেই হবে; তার ওপর আবার ছেলের জ্বর, মেয়ের সর্দ্দি,—এবং তাদের মায়ের ফরমাস্! মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকায় যে অনাদি কেমন ক'রে চারিদিকের খরচ কুলায়, এ চিন্তাটা কেউ কখনও করে না, ক'রতে চায়ও না, আশ্চর্য্য শুধু এইটুকু!

অনাদি আরও ভাবে, সকলে না হোক রাণী বুঝি মনে করে ওর পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গালেই নগদ টাকা, কর্‌করে ঝক্‌ঝ'কে টাকাগুলো বার হয়ে আসবে আর কি! আজব এই দুনিয়া,—এবং তার চেয়েও আজব এই স্ত্রীচরিত্র; এরা বোঝে না কোনও অভাব, শুধু অভিযোগ ক'রেই ক্ষান্ত! আবার বোঝাতে গেলেও বিপদ্ অনিবার্য্য! অর্থাৎ চোখের জল এবং দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ঝাপ্‌টা চ'লবে অন্ততঃ দেড়দিন ধ'রে!…মহাবিপদ্…!

অনাদি আবার ভাবে—মা বেটী তো ম'রে বাঁচ্‌ল; কিন্তু ম'রবার আগে ঘাড়ে তার যে ভার চাপিয়ে দিয়ে গেল, এ ভার বওয়া যে মরার বাড়া, এটা মা বুঝল না!

হায়রে অদৃষ্ট!…

একতলা একটা ছোট বাড়ীর মধ্যে ছোট্ট একটা ঘর, আর তার সংলগ্ন এতটুকু বারান্দা!…এই ঘর আর বারান্দা ভাড়া নিয়েই কোনও রকমে ওদের বসবাস চলে! কল-জল সব আর তিন ঘর ভাড়াটেদের সঙ্গে সমান অংশে ব্যবহার ক'রতে হয়, তাই নিত্যকার দাঙ্গা ও সতর্ক পাহারা দিয়ে প্রতিদিন যেমন দখল ক'রতে হ'ত, তেমনি আজও রাণু তার ত্রুটি করেনি; অর্থাৎ কলহ শেষে সদ্য মানসিক কাপড়ে যখন একহাতে জলভরা বালতী ও অন্য হাতে চালের-ধুচুনী নিয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন বারান্দার জলের ওপোরে ছোট ছেলেটাকে মহাআরামে শুয়ে থাকতে দেখে রাণু চেঁচিয়ে উঠল: "বলি, চোখের মাথা খেয়েছ? কোন্ চুলোয় গেলে?"

অনাদি তখন সমস্ত মুখময় সাবান মেখে সবেমাত্র শেভ্ ক'রতে ব'সেছে।…সাড়ে নয়টায় অফিস।…খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে সাড়ে আটটার ম'ধ্যে; তারপর পদব্রজে যেতে হবে সেই ডালহৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত!…দীর্ঘপথ…। খাওয়া দাওয়া সেরেও বড় কম সময় হাতের পাঁচে ফেলতে হয় না! অনাদিকে সেই জ'ন্যেই তৈরী হ'তে হয় অনেক আগে থাকতে।…আজও হচ্ছিল…।

এমনি সময়ে রাণুর সাদর সম্ভাষণ কাণে আসতেই চ'মকে উঠল:—"কি ব'লছ কি?"…

"বলছি আমার মাথা!"

হাতের বালতি আর চালের ধুচুনীটা নামিয়ে রেখে রাণু ছেলেটার হাত ধ'রে টেনে তুললে, তারপর তার পিঠে পরপর গোটাকতক কিলচড় বসিয়ে তীক্ষ্ণ থেকে আরও তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে ব'লে উঠল: "মর্, মর্! যেমন অদেষ্ট নিয়ে জগতে এসেছিস, তেমনি তো ফল ভোগ ক'রবি!"

ছেলে মায়ের চেয়েও তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো: "ভ্যাঁ"—!

অনাদি সেভ্ করা স্থগিত রেখে বা'র হ'য়ে এল। বিরক্তির সঙ্গেই বলল, বলি "হল কি?…"

"হবে আর কি, আমার মাথা! একটা একটা ক'রে ম'লেও বাঁচি, হাড়ে আমারও বাতাস লাগে, ওরাও জুড়ায়। এমন ক'রে জ্যান্তে মরা হ'য়ে থাকতে হয় না।"

বারান্দার এককোণে তোলা উনুনে ভাত চড়ানো,… এতক্ষণে ভাতের জল শুখিয়ে উঠেছিল কয়লার আঁচে। রাণু বালতীর খানিকটা জল তাতে ঢেলে দিয়ে ঘরে চ'লে গেল ভিজে কাপড় ছাড়তে।…

অনাদি নির্ব্বাক্ দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে তাকিয়ে।…

•

দিন এমনি ক'রেই কাটে;

তাই অনাদি ভাবে—এ দিনকাটার কোনও জায়গায়

কি কমা নেই, সেমিকোলেন কি পূর্ণচ্ছেদও নাই এর মধ্যে?—প্রাণ যেন তার হাঁপিয়ে ওঠে।…সেদিন—! মাইনে পাওয়ার দিন;…মাইনের টাকা কয়টা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেসে উঠলো রাণুর অর্ডার মত সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস, মেয়ের ফরমাস, ছেলের অনুরোধ!…কত কি নিতে হবে!

থামতে থামতে যেতে হবে ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটী থেকে যমুনালয় পর্য্যন্ত!…উঃ, অনেক পথ!…অনাদি একটু তাড়াতাড়িই ছাতিটা তুলে নিয়ে চ'ললো বার হ'য়ে…! ডালহৌসী থেকে কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত…

রোজকার চলার পথ!

তবু আজ যেন পা দুটো কেমন ধ'রে আসে…! মনে হয় ট্রামে কি বাসে গেলেও চ'লত আজ! ভারি তো কয়টা পয়সা! এমন পয়সা এদিকে ওদিকে কত যায়, কপালে থাকলে আসেও; তারজন্যে ভাবনা কি?—চ'লতে চ'লতে চোখে পড়ে দেওয়ালের গায়ে রঙিণ ছবি… "অচ্ছুত্ কন্যা!" মনের মধ্যে ভেসে ওঠে অশোককুমার আর দেবিকারাণীর প্রতিমূর্ত্তি! কাণের কাছে গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে—বল্ কি চিড়িয়ার গান! যে গান আজ পথে পথে ভিখারীরাও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গেয়ে বেড়ায়, সেই গান!—

নাঃ—অনেকদিন কিছু দেখা শোনা হয়নি! এবার নয় একখানা টিকিট কিনে ঢুকে পড়া যাক্ সিনেমাহাউসের ভিতরে। আর একবার এ মাইনের পয়সাকড়ি হাতে নিয়ে বাসায় ঢুকলে এর সিকিও বার হবে না, তার বায়োস্কোপ!

অনাদি একবার একটু দাঁড়ালো রূপকথার সামনে, তারপরে একখানা টিকিট কেটে ঢুকে প'ড়ল ভেতরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্দ্দার গায়ে ভেসে উঠল দেবকী আর অশোককুমারের ছবি…কাণে আসতে লাগলো ওদের কথা, হাসি, চোখের জল!

মনটা ডুবে যায় ধীরে ধীরে…অনাদি ভুলে যায় নিজের অবস্থা।…

ছবি ধীরে ধীরে মুছে যায় পর্দ্দার ওপোর থেকে;… সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জল হ'য়ে উঠতেই সম্মুখের আসনের দিকে তাকিয়ে অনাদি চ'মকে উঠল। সামনের সিটে ব'সে কে ও মেয়েটি? যাকে দেখে সে সচকিত হ'য়ে উঠেছিল, সে তখন হয়তো ভিড় পরিষ্কার হবার আশায় অপেক্ষা করছিল দরোজার দিকে তাকিয়ে…। অনাদির মনে হ'লো ওর ঐ মুখ, চোখ, এমন কি ঐ ঋজু ভঙ্গীটা পর্য্যন্ত যেন তার চেনা!

বিগত জীবনের কোন এক অধ্যায়ে যেন ওর সঙ্গে তার পরিচয় হ'য়েছিল। কিন্তু সে অনেক দিন! অনেক-দিনের স্মৃতি আজ তার মন থেকে প্রায় বিলুপ্ত; ওকেও হয়তো তার সঙ্গেই সে মুছে ফেলেছিল মন থেকে, কিন্তু আজ হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই এই ভাবে দেখা হ'তে মনে প'ড়ে গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিত রূপে।…

মনে প'ড়লেও অনাদি তাকে ফিরে চিনিবার সুযোগ দিতে চাইল' না, উঠে দাঁড়াল বাইরে যাবার জন্য—কিন্তু মেয়েটি তা দিলে না; হাত দুখানা একত্র ক'রে কপালে ছোঁয়ালে: "নমস্কার, আমায় চিনতে পারেন? আমি শিপ্রা—।"

প্রতিনমস্কার ক'রে শুষ্ক হাসি হাসলে অনাদি— "চিনেছি; কিন্তু আলাপ ক'রতে সাহস হ'চ্ছিল না।"

"কেন? মানুষ যদি মানুষের সঙ্গে চেনা থাকলেও আলাপ পরিচয় ক'রতে সাহস না করে—বা সামান্য দু' চার দিনের তর্তফাতে ভুলে যায় সব, তা হ'লে তার লোকারণ্য ছেড়ে বনবাস করাই উচিত ছিল।"

শিপ্রা হাসতে লাগল। অনেকদিন আগের সেই সুন্দর, সেই সরল হাসি!

অনাদি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল শিপ্রা,— সেই শিপ্রা! আট দশ বছর আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি র'য়েছে। সেই স্বচ্ছন্দ সাবলীল কথা বলার ভঙ্গী, সেই অকৃত্রিম হাসি! সুন্দর! অতি সুন্দর!…

অনাদি একটু হাসি ছাড়া কোনও উত্তর দিতে পারলে না—শিপ্রার কথার।

শিপ্রা বুঝলে সে হাসি অপ্রস্তুতের।

কাঁধের কাপড়টা একটু গুছিয়ে নিয়ে সে ব'ললে: "চলুন,—যাওয়া যাক।"

ভীড় ঠেলে পাশাপাশি পথ ক'রে তারা এসে উঠল

শ্যামবাজার ট্রামে। সমস্ত পথ আর কোনও কথা হ'ল না; নামবার সময়-সময় অনাদি যেন পরিচয়টা এড়াবার জন্যই ভাসাভাসা কথায় আনন্দ জানালে আবার: "অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, বড় আনন্দ পেলাম কিন্তু—"

প্রত্যুত্তরে একটু হেসে শিপ্রা ব'ললে: "এতদিন এখানে ছিলাম না কিনা, তাই, নইলে ঠিক খুঁজে বার ক'রতাম; যাক্ আপনার ঠিকানাটা?"

কম্পিত হাতে অনাদি তার বাড়ীর নম্বরটা লিখে দিতেই কাগজখানা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে ফেলে শিপ্রা উঠে দাঁড়াল; ব'ললে—"আচ্ছা, একদিন কিন্তু নিশ্চয় যাবো আপনার বাসায়,—আজ আসি, নমস্কার।"

প্রত্যুত্তরে নমস্কার জানিয়ে অনাদি দেখলে শিপ্রা ট্রাম থামিয়ে নেমে যাচ্ছে ত্বরিত-পদে।...

বাসায় ফিরতেই শুনল রাণীর অনন্ত অভিযোগ:—"বেশ মানুষ যা হোক; যাবে, যাবে! ব'লে গেলেই হয়, মিটে যায় ল্যাঠা! আমায় আর এমন ক'রে ভাব্‌তে হয় না!"

অনাদি উত্তর দিল না এ কথার—জুতো ছেড়ে ঘরে ঢুক্‌ল।

ছুটো ছেলের জ্বর, মেয়েটার পেটের অসুখ···। রাণু আর পারে না অফিসের ভাত রাঁধতে; ব'ললে—"তুমি কিছুদিনের মত ছুটী নাও অফিস থেকে।"

অনাদি চ'মকে উঠল—"ছুটী নেব! আমি? বল কি রাণু?"

রাণীর চোখে ভ্রুকুটী দেখা গেল—"ছুটী নেবে না? অসুখ বিসুখেও ছুটী নেবার দরকার নেই?"

অনাদি কেমন থতমতো খেয়ে গেল: "না, তা ব'লছিনে; ব'লছি অফিসের বড় সাহেব ছুটী দিলে তো নেব!"

"দিলে, মানে! ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখও বুঝবে না অফিসের বড় সায়েব! কেন, তার ছেলে-মেয়ে নেই?"

অনাদির হাসি এল—ব'ললে: "আছে বৈকি; কিন্তু সে হ'চ্ছে ওপোরঅলা, আমি হচ্ছি তার চাকর, কামাই ক'রলে মাইনে কাটবে না?"

"হ্যাঁ—মাইনে কাট্‌বে, কাট্‌লেই হ'লো ওমনি!"

অবহেলাসূচক একটা মুখভঙ্গি ক'রে রাণী থেমে গেল, কিন্তু রান্নার কোনও যোগাড়ই করলে না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রান্নার জন্য অপেক্ষা ক'রে অনাদি নিজেই উনুনে আগুন দিয়ে দিলে ভাতে ভাত চড়িয়ে—এবং যথা সময়ে সেই আধসিদ্ধ ভাতই কোন রকমে উদরস্থ ক'রে অফিসে বার হবার উদ্যোগ ক'রতে লাগলো।

ছেলেমেয়ে নিয়ে রাণী শুয়ে ছিল বিছনায়; অনাদিকে সাজগোছ ক'রে বা'র হ'য়ে যেতে দেখে মাথাটা একটু উঁচু ক'রে তুললো: "বলি কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?"

"অফিসে, ছুটী আন্‌তে—।"

ভয়ে ভয়ে অনাদি এই উত্তর দিলেও রাণী ব'ললে একটু অবহেলার ভঙ্গীতে: "সে তো একখানা চিঠি লিখে পাঠালেই হ'ত!"

"অফিসের কাজ এ সব, চিঠি দিলে চলে না রাণু—।"

"অফিসে তো তুমিই একা কাজ কর না—আমার বাবাও আফিসের চাকুরে ছিলেন, তাই ব'লে কি তিনি ছুটী পাননি কখনও?—"

অনাদি এবার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাণীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর বিনা বাক্য-ব্যয়ে যখন ছাতিটা তুলে নিয়ে বাড়ীর বা'র হ'য়ে গেল, তখন অদৃশ্য ভগবান এবং তদীয় সৃষ্ট রাণীর ললাটলিপি সম্বন্ধে রাণীর অজস্র বাক্যবাণ বর্ষিত হচ্ছিল।

পাঁচটার পরে অনাদি আবার যখন বাসায় ফিরল, তখন তার হাতে একখানা ছুটীর মঞ্জুরপত্র।

রাণী সেখানার লেখা কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললে।...

ছেলে মেয়ে তো একা তারই নয়,—মানুষ করার দায়িত্ব অনাদিরও আছে,—সুতরাং—

"অনাদিবাবু এই নম্বরে থাকেন? অনাদিবাবু......"

ছুটী নেওয়ার পর, পর পর কয়টা দিন বেশ নিষ্ক্রিয় ভাবেই কেটে চলেছিল অনাদির—তাই সে হাতে ধরা খবরের কাগজখানা সবেমাত্র এক পাশে সরিয়ে রেখে—বৈকালের

বেশে সযত্ন-সজ্জিতা রাণীর দিকে তাকিয়ে মনে ভাবছিল, রাণী যেন আগের চেয়ে আর একটু বেশী ফর্শা হ'য়েছে, চুল বাঁধবার ধরণটাও আয়ত্ত ক'রেছে অনেকটা আধুনিকাদের মত। আর ঐ নীলচে রংয়ের শাড়ীখানা!··· ওখানা প'রলেও তাকে বেশ মানায়!

হাতে-ধরা চায়ের কাপটা শূন্য অবস্থায় নামিয়ে রেখে সবেমাত্র অনাদি তার সৌন্দর্য্যের উপমা দেবার জ'ন্যে কথা খুঁজ্‌ছে, এমন সময়ে বাইরে থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে চ'মকে উঠল। তারপর বিচলিত চিত্তে—বাইরের দরজা খুলে যাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল—বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে রাণী দেখলে সে একটি সুসজ্জিতা তরুণী।···কৃশ তনুলতা তার সিল্কের শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, একহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্য হাতে ছাতা।···মুখে সপ্রতিভ হাসি।···

অনাদির দিকে রাণী দৃষ্টিপাত ক'রল অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে, কিন্তু অনাদি তার কোনও উত্তর দিল না, নির্ব্বাক্‌-ভাবে তাকে নিয়ে গিয়ে বসাল ঘরের মধ্যে, সাদর সম্ভাষণে।

তারপর প'ড়লো পরিচয়ের পালা—"ইনি আমার স্ত্রী,—আর ইনি আমার সহপাঠিনী—"

"অর্থাৎ পূর্ব্ব পরিচিতা বলাও চলে,·· কি বলুন!···" অনর্থক হেসে উঠে শিপ্রা যেন অনাদিকে আরও খানিকটা অপ্রস্তুত ক'রে ফেললে।—তারপরে ওর ব্যাগ খুলে একটি মিনে করা সুদৃশ ব্রোচ্‌ বা'র ক'রে রাণীর কাঁধের কাপড়টা গুছিয়ে দিলে আটকে; ব'ললে—"মনে রাখবার জন্যেই শুধু এই স্মৃতিটুকু রেখে যাচ্ছি ভাই,—আর কিছু নয়—।"

রাণী তার একথার কি জবাব দিলে কে জানে, কিন্তু অনাদির মনে হ'ল এটা যেন শিপ্রার পক্ষে বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। বড় বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে এই পূর্ব্ব-পরিচয়ের উচ্ছ্বাস······যার ফলাফল সে জানে না।···

ধীরে ধীরে চা-জলযোগের পালা সাঙ্গ ক'রে শিপ্রা যখন বিদায় নিলে, তখন রাত্রি প্রায়সাড়ে আটটা হবে।

শিপ্রা চ'লে গেলে, তার দেওয়া ব্রোচ্‌টা খুলে রাখতে রাখতে রাণী অনাদিকে প্রশ্ন ক'রলে—"মেয়েটি তোমার কে হয়?—"

"কে হবে আবার! অনেকদিন আগে এক সঙ্গে প'ড়েছিলাম কিনা,—তাই!"

অনাদি আর কোনও কথা না ব'লে খবরের কাগজটা টেনে নিলে।

এরপরেই একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল শিপ্রার জন্মদিনে যোগ দেবার জন্য অনাদির নিমন্ত্রণ···অনাদিকে যেতেই হবে।···শিপ্রার নিজের হাতে লেখা অনুরোধ-পত্র!···পত্রখানা পকেটে ফেলে অনাদি চুপ ক'রে ব'সে রইল কিছুক্ষণ! রাণী এসে ব'ললে—"শুনছ!···"

"কি?"

"খোকা প'ড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে বড্ড রক্ত প'ড়ছে।"

"তার আমি কি ক'রব?"

"ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনা একবার!"

"পারিনে;—একটু চিনি টিপে দাওগে, এখনি সেরে যাবে।" বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী ক'রে সে উঠে প'ড়ল।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো রাণী।···

পুরানো কাগজ-পত্রের বাক্স পরিস্কার ক'রতে ক'রতে রাণী অবাক্‌ হ'য়ে গেল।···কবিতার খাতা!···অনাদি আবার কবিতা লিখত!···খাতার পাতা উল্টে উল্টে রাণী প'ড়ে যেতে লাগল···কত উচ্ছ্বাস! কত আবেগ!—কিন্তু এ কাকে লক্ষ্য ক'রে?···

মনে মনে অনুমানের ওপোর নির্ভর ক'রে সে একটা ঠিক ক'রে ফেললে—বটে! এত···! আচ্ছা, আসুক আজ বাড়ী।···তারপর···

অনাদি অফিস থেকে বাসায় ফিরলে—রাণী অবলীলা-ক্রমে কবিতার খাতাখানা ছুড়ে ফেললে ঠিক অনাদির পায়ের কাছে;—"কি এখানা, শুনি!—

"কবিতার খাতা দেখছি যে, কার?"

বিকৃত মুখে রাণী ব'লে উঠল—"তোমার গো, তোমার! এতদিন লুকিয়ে এযেছ, আর নয়—··।"

অনাদি হেসে উঠলো—"বটে! ধ'রে ফেলেছ দেখছি!··· ধন্যবাদ তোমায়।···

তীক্ষ্ণ স্বরে রাণী চেঁচিয়ে উঠল—"নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকে মানুষের, কিন্তু তোমার তাও নেই,—তুমি কি তাই আমি ভাবি··!"

উঠে গিয়ে সে শিপ্রার সেদিনের দেওয়া ব্রোচ্‌টা এনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে অনাদির সমানে—"এই নাও তার মনে রাখার চিহ্ন ; এ আমি চাই নে, চাই নে।"

হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠতেই অনাদি তাড়া দিল—"কি হ'ল তোমার, শুনি, মড়াকান্না বাধিয়ে তুলেছ যে ?"

রাণী কোনও উত্তর দিল না, অনাদিও কথা ব'ললে না কিছু ; যেমন ভাবে অফিস থেকে বাসায় এসেছিল তেমনি পোষাক-পরিচ্ছদেই বাসা ছেড়ে বা'র হ'য়ে গেল আবার।

ইচ্ছে থাকলেও, রাণী তাকে আর ফিরে আসতে অনুরোধ ক'রলে না।

অনেক রাত্রে, যখন বাইরে থেকেই খাওয়া দাওয়া সেরে অনাদি বাসায় ফিরল, তখন বাসার অন্য ভাড়াটেরা সব নিদ্রিত, ছেলেমেয়েরাও ঘুমিয়ে প'ড়েছে—একা রাণী আলো জ্বেলে ব'সে কি যেন জিনিসপত্র গোছ্‌গাছ্‌ ক'রে বাঁধা-ছাঁদা ক'রছিল ; অনাদিকে দেখে ব'ললে—"কাল একটু সকাল অফিস্‌ থেকে ফিরবে ?"

রাণীর কণ্ঠে অনুনয়ের স্বর।

অনাদি কিন্তু পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রল : "কেন ?"

"কাল-একবার দেশে যাব ভাবছি।"

"কত দিনের জন্যে ?"

"যত দিনের জন্যে পারি।" রাণীর কণ্ঠে আবার অশ্রু উদ্বেল হ'য়ে উঠল।

কিন্তু সে অশ্রুতে অনাদির মন গ'লল না ; আগের মতই গম্ভীর স্বরে সে জবাব দিলে, "বেশ্‌!" ছোট্ট জবাবটুকু ;—

কিন্তু এর পরে আর রাণীর মুখে কোনও কথাই যোগাল না।

সকালে উঠে রাণী আবার আগের মত রান্না-বান্না ক'রল, খেতেও দিল অনাদিকে।

অনাদি কিন্তু নির্ব্বাকে খেয়ে উঠে গেল অফিসে ; যেন তার রাণীর কার্য্যকলাপ কিম্বা মাতুলালয় যাওয়া-আসা সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধিৎসাই নাই। কিছুই সে আর জানতে চায় না।

বিকেল বেলা, প্রায় সাড়ে পাঁচটা।···রাণী চুপ ক'রে ব'সেছিল বারান্দায়।···নিকটেই ব'সে সুসজ্জিত ছেলে-মেয়েগুলি খেলা ক'রছে, যাত্রার আয়োজনও সম্পূর্ণ, অর্থাৎ জিনিষপত্রগুলি বাঁধা।···কিন্তু রাণীর সমস্ত মুখে চোখে ফুটে উঠেছে ক্রন্দনের চিহ্ন, এতক্ষণ চেপে রাখলেও, এবার যেন সে আর নিজেকে সংযত ক'রতে পারছে না—এখনি হয়তো চোখের জল তার বাঁধ ভেঙ্গে নামবে হু—হু করে'···।

অফিস থেকে ফিরল অনাদি! হাতে তার একখানা কাগজ, মুখে প্রসন্ন হাসি। ডাকল—রাণী!···

ধরা গলায় রাণী উত্তর দিল "কি ব'লছ ?"

অনাদি ওর কণ্ঠস্বরকে গ্রাহ্য ক'রলে না ; সহাস্যে ব'ললে, "যাবার সব ঠিক ক'রে নিয়েছ তো ? আমার জিনিসগুলো ?"

ইঙ্গিতে রাণী দেখিয়ে দিল—অনাদির জামা কাপড়, তোয়ালে গেঞ্জি, যেখানকার যা, সব সেইখানেই আছে—কিছুই সে সঙ্গে নেয়নি।

অনাদি নিজেই সেগুলো টেনে এনে বেঁধে ফেললে। বললে, "আমিও যাব যে রাণী···"

বিদ্রূপের স্বরে রাণী ব'ললে—"তুমি যাবে মানে ? তোমার চাকরী···"

—"ছুটী নিয়েছি"

"—কত দিনের ?"

"যতদিন হয়,—যতদিন খুশী···হয়তো আর চাকরী না ক'রতেও পারি।"···

রাণী এবার আর উঠল না, জিনিসপত্রেও হাত দিল না ; শুধু হু'চোখ মেলে তাকিয়ে রইল অনাদির দিকে—যেন আর তার জিজ্ঞাসা করার মত কোনও কথা নেই,—ঠাট্টা করার কথাও খুঁজে পাচ্ছে না আর।···

অতীত ভারতের এক গৌরবময় অধ্যায়

শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ

ভারতের বাহিরে উত্তর দিকে—চীন, তিব্বত, তাতার রাজ্য, একথা ভূগোল পাঠকের নিকট অজানা নাই। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন তাতার ও চীন রাজ্যের সীমা কোন পর্য্যন্ত ছিল ঠিক বলা যায় না। চীন অতি পুরাণ দেশ হইলেও, তাহার পশ্চিম সীমা তাতার (পূর্ব) সীমানা অতিক্রম করে নাই। সে কালের চীন ও তাতার সীমার মাঝে—যে তাতারী ও চীনেরা বাস করিত, তাহারা হয়ত মিশিয়া বাস করিত। ভাষাটা সম্ভব ছিল মিশেল-ভাষা। চীনা ও তাতারী ভাষার মাথামাথী এক রকম কথিত-ভাষার দেশ। সচরাচর দেখা যায়—দুই বিভিন্ন জনপদের অন্তবাসীরা দোভাষী হইয়া থাকে। যেখানের কথা বলিতে যাইতেছি, সেখানকার অধিবাসীরা চীনা ও তাতারী মিশ্র-ভাষী ছিল। তখন সে দেশের লোকেরা লিখিতে পড়িতে শেখেনি।

সে জনপদটি তখন ছিল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা জনাকীর্ণ। যথাকালে সেই জনপদ মরুভূমে পরিবর্তিত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে সেটি মরুদেশপ্রায়। এখন ভূগোলে সেই প্রদেশকে চীনে-তাতার বলে। বাঙলা দেশের উত্তর-সীমা হইতে সে দেশটি প্রায় ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তখনকার লোকেরা যত দূরই হউক হাঁটিয়া দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করিত। কখন কখন ঘোড়ায় চাপিয়া যাইত। সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পুরাকালে সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দশ-বিশ হাজার বৎসর আগে, পূর্বদেশী যাযাবর ধরণের কৃষ্ণকায় বলবান্ লোকেরা, আদি পাষাণ-যুগে পূর্বদেশ (ভারত) হইতে দলে দলে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব-দক্ষিণ অংশে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সংযোগ অবস্থায় যথায় পারস্য উপসাগরে পড়িয়াছে; সেই মোহনার নিকটে পারস্য উপসাগরের (তখনকার নাম অজ্ঞাত) একটি ছোট দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকে সেই দ্বীপটিকে কালহড়েদের বাসস্থান বলিয়া 'হড়মোশিয়া' বলিত। তাহারা নেতা বিশেষের আদেশে দিনের বেলায় হয়ত ভেলায় চাপিয়া পাথুরে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া পূর্বতীরের ভূভাগে আসিয়া কুঁড়েঘর তৈরি করিত। ফলমূল এবং শীকার করিয়া পশুমাংস পুড়াইয়া খাইত। কত হাজার বছর ধরিয়া এই কালহড়েদের গল্প সে দেশে, লোকমুখে চলিয়া আসিয়াছিল। পরে গ্রীকেরা বা ঐ দেশের লোকেরা কত রকমের হড়মোশিয়ার গল্প বলিত। তাহাদের নেতার নাম—ওয়ানেশ বা মীনেশ ছিল। তিনি খুব বুদ্ধিমান্ ও চতুর শিল্পী ছিলেন। গল্পে বলা হইত যে, তিনি ছিলেন মৎস্য-অবতার, অর্দ্ধ মৎস্য-মানব। হড়মোশিয়ারা রাত্রে সাগর-জলে থাকিত, সকাল হইলে সদলবলে ভূখণ্ডে আসিত।[১] যেখানে তাহারা নেতার আদেশে কুঁড়ে ঘর গড়িয়া তুলিত, সেখানে একটা নদীও ছিল, তারা সে নদীকে বলিত—করদম।[২] সেই করদম নদীর তীরে তাহারা বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। পরে সেই পল্লীশোভিত জনস্থল করদম বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। কাল জাতিরা তথায় বাস করায়, সে স্থানের নাম হয় কালদিয়া (কর্দম)। নদীমাতৃক লোকালয়কে সে সময়ে কালদিয়া বলা হইত। অনেক পরে উহা চালদিয়া নামে কথিত হয়। বোধহয় সে দেশের লোকে 'ক'কে 'চ' উচ্চারণ করিত। কালদিয়াকে চালদিয়া বলিত। ভারতীয় পুরাণে সে দেশের নাম শাল্মলী দ্বীপ বলা হয়েছে (শলমু মানে মূত্তি, মূর্ত্তির দেশ) মীনেশ, মীনু এই রকমের নাম ভারতীয় ধরণের। মীনোয়ান নামটি আধা ভারতীয়, আধা সে দেশের। চীনেদের গল্পের তিনি ওয়ানেশ।

এই রকমের গল্প একদিন চালদিয়ার ইরেচ বন্দরের মাঝিমাল্লারা মুখে মুখে দেশ-বিদেশে প্রচার করেছিল। সেই পুরাকালে ভারতের বণিকেরা হামেসা বাণিজ্য-তরী ভাসিয়ে ইরেচে যাইত, তারা বাণিজ্য করিত বাবিলনের হাটে বাজারে কাঠ আর নানান রকমের মসলাপাতি—এলাচ, লবংগ, দারুচিনি, গোল মরিচ এই সব গরম-মশলা। তা' ছাড়াও ভারত হইতে যাইত (মালবার থেকে) টিক্কা বা টেক্কা কাঠ, আমরা যাকে বলি সেগুন কাঠ, আর যাইত আবলুশ কাঠ। চন্দন ও আবলুশ কাঠের চিরুণী উরের

১। জল-মধ্যের দ্বীপে থাকিত বলিয়া কি জল থেকে আসা যাওয়ার কথা গল্পে আছে।

২। করদম (কর্দম) নামটি কিন্তু বাঙলায়।

(বাবিলনের) মহিলারা খুব পছন্দ করিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যখন উর নগরের ধ্বংসস্তূপাদি খনন করেন, তখন ভূগর্ভ থেকে সেগুন, আবলুশ কাঠের টুক্‌রা বাহির হয়, আর পাওয়া গিয়াছিল আবলুশ কাঠের ও হাতীর দাঁতের ভারতীয় ধরণের চিরুণী।

গোলমরিচ সে দেশের রাঁধুনীরা বড় আদর করিত। সে কালের অনেক পরে, গ্রীকেরা যখন ভারতের গোল মরিচ দিয়ে মাংস রাঁধিতে শিখিল, তখন ভারতীয় মরিচের চাহিদা তথায় খুব বাড়িয়া যায়। বড় বড় পাদরিগণকে গোলমরিচ উপহার দেওয়া হইত। পেরিপ্লাস নামক বই পড়িলে, এসব কথা জানিতে পারা যায়।

মোট কথা, কালহড়েরা (মানুষেরা) সকলের আগে পারস্য উপসাগরের তীরে উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। তখন খুব সম্ভব প্রাচীন-পাষাণ যুগ চলিতেছিল। ভারতে যখন পাষাণ-যুগ ছিল, তখন য়ুরোপে পাষাণ-পূর্ব নর-পশু-যুগ প্রবর্তিত ছিল। ভারতের যখন ক্যালকো-লিথিক যুগ প্রবর্তিত হয়, সম্ভব তখন য়ুরোপে আদ্য পাষাণ-যুগ প্রবর্তন হইতেছিল। গোড়া থেকে ভারতবাসীরা য়ুরোপ অধিকার করিয়া এবং সে দেশের পশু-মানবদিগকে সভ্য-ভব্য হইতে শেখায়। এ কথা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না, বলেন এ সব গল্পকথা, সত্য ব্যাপার নয়। আমরা বলি, এ সব কথার মধ্যে মূলে সত্য আছে—জনশ্রুতি ছাড়া সে কালের লিখিত বিবরণ নাই। যাহাই হউক, একাধিক প্রমাণের দ্বারা বলিতে পারি, কাল ভারতীয় হড়গণ সেদেশে গিয়া, প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিল। বাবিলনের জনৈক বণিকের ঘরে মাটির টালিতে খোদাই করা, বাণমুখ চিত্রলিপিতে লেখা অনেকগুলি ভারতীয় বণিকের নাম পাওয়া গিয়াছে। আগেই হউক, পরেই হউক, ভারতবাসীরা প্রায়ই ইরেচের বন্দরে গিয়া ব্যবসা করিত। মাঝি-মাল্লারা ভারতের কথা ইরেচে এবং সে দেশের নানান গল্প এ দেশে আসিয়া বলিত। দেশ-দেশান্তরের ভাব-ধারা এইরূপে সে-যুগে প্রচারিত হইত।

এই রকমের জনশ্রুতির গল্প বহু পরে পুস্তকবিশেষে লেখা হয়। সে রকম দলিল সব দেশেই আছে। আবেস্তা, বাইবেল, পুরাণ ইত্যাদি ঐ রকমের প্রাচীন ঐতিহাসিক মালমশলার খনি, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

আফ্রিকার নীল নদীর নাম প্রায় অনেকেরই জানা আছে। এই নদীর উৎপত্তি-স্থানটি ভৌগোলিকগণের জানা ছিল না। যিনি নীল নদীর উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতদের সভায় তাঁহার অনুসন্ধানের পরিচায়ক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভারতীয় পুরাণ (শাস্ত্র) বিশেষে তিনি নীল নদীর মূলের সন্ধান পান। চন্দ্রীস্থান (চন্দ্র পর্বত) নামক পর্বত হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্রীস্থানটি প্রাচীনকালে সভ্যজনপদের কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল। সেই পাহাড়ের সন্ধান লইতে লইতে এবং উক্ত পুঁথির বর্ণনায় জল-স্থলের অনুসন্ধানে চন্দ্রীস্থানের সন্ধান তিনি পান। এখন সে পাহাড়গুলি উদ্ভিদ ও জীবশূন্য মরুতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার উক্তিতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় শাস্ত্রবর্ণিত চন্দ্রীস্থান গল্পের দেশ নয়, ভৌগোলিক সত্য ব্যাপার।

ভারতীয় পুরাণে পাই—ভারতীয় অতি প্রাচীন রাজারা তথায় রাজত্ব করিতেন। এই কথাপুরুষীয় উপাখ্যানেই পাই, রাজা পুরুরবার মাতামহী ছিলেন বাবিলনের রাণী। পুরুরবা বাল্যকালে দিদিমার নিকট থাকিতেন। যখন তিনি যুবক হন, তখন তিনি বাবিলন হইতে বৎসরে একবার (পুরাণে আছে প্রতি মাসে পূর্ণিমায়) পূর্ব-পুরুষীয় রাজধানী চন্দ্রীস্থানের চন্দ্রদেবের মন্দিরে গিয়া পূজাদি কর্ম করিতেন। বোধহয় এইজন্য তিনি চন্দ্র-উপাসক বংশের আদি পুরুষ (?)। সম্ভব তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। যথাকালে ভারতের পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলে, মাতামহী তাঁহার জন্য উর্বশী নামক নৃত্যকীকে তাঁহার বিবাহের জন্য বাবিলন হইতে ভারতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে যে, এই উর্বশীর পিতৃভূমি ছিল হিমালয়ের পূর্বাস্তস্থিত কলাপ গ্রাম (আসাম পার্বতীয় অঞ্চলে)। বোধহয় নৃত্যকীরা (বিদ্যাধরীরা) কলাপ গ্রাম হইতে সেকালের বড় বড় রাজসভায় গিয়া নৃত্যগীতাদি করিতেন।

এই উপলক্ষ্যে উর্বশী বাবিলনে গিয়া থাকিবেন।

প্রথমে পুরুরবা তাঁহাকে মাতামহের রাজসভায় দেখিয়া, দিদিমাকে উর্ব্বশীকে স্ত্রীরূপে পাইবার কথা বলিয়া থাকিবেন। সেইজন্য দিদিমা উর্ব্বশীকে নাতির জন্য ভারতে পাঠাইয়া থাকিবেন। য়ুরোপের সর্বাদি সভ্যতার কেন্দ্র বাবিলন এবং ভারতের উত্তরাপথে পুরুরবার রাজ্য ছিল। ভারতীয় সভ্যতা পুরুরবার সময় হইতে বাবিলনে (কালদিয়া বা চালদিয়া দেশে প্রবর্তিত হয়)। সে কালে য়ুরোপের সহিত ভারতীয় রাজাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইত। তখন জাতিভেদ হয় নাই বা ধর্মগত বিভাগও ছিল না। উভয় দেশের পুরাতত্ত্বে ভারতীয় রাজাদের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই রকমের জনশ্রুতি হিরোডোটাশের সময়ে প্রচলিত ছিল। তিনি জনশ্রুতি মূলে অবগত হইয়া, বাবিলনে ৮০ জন ভারতীয় রাজাদের নাম শুনিয়া তাঁহার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া থাকিবেন। তাঁহার সময়ে কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছিল। বর্তমানে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুরাতত্ত্ব-বিদেরা যে সকল নিদর্শন ভূখননে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হয়ত কোন কোনটি ভারতীয় রাজাদের সময়ের থাকা অসম্ভব নয়। হিরোডোটাসের বর্ণিত ভারতীয় রাজাদের কথা বর্তমান ঐতিহাসিকেরা 'মিথ' বলিয়া চাপিয়া গিয়াছেন। উহাতে ভারতীয় তথাকথিত রাজাদের কথার আলোচনা নাই। কাজেই ভারতীয় সভ্যতার কথা আর এখন উঠে না, একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

চন্দ্রীস্থানের ভারতীয় রাজাদের সময়েই সম্ভব চন্দ্রীস্থান মরুভূমে পরিণত হইতেছিল, তাঁহারা তথা হইতে সুজলা সুফলা চালদিয়া দেশে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবেন। চালদিয়ার ইরেচ বন্দরের সন্নিকটে রাজধানী গড়িয়া উঠিয়াছিল—বাবিলন (বাবিরুশ ?) সেই কালের প্রথম নগর। উর ইহারও কিছু পরের—উরের রাজা নিয়াননি পদ্ম সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজা ছিলেন। উরের যে প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে, তাহার গাত্রে যে সকল চিত্রমালা বিদ্যমান, তাহাতে বলিদানের জন্য বৃষের শোভাযাত্রা দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনকালে উক্ত উরের প্রধান মন্দিরে ভারতীয় কোন দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল (সম্ভবতঃ শিব—ইশান-ইশানী ?) এবং সেবাপূজার্থী একাধিক ভারতীয় পুরোহিতেরা তথায় ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মী পুরোহিতগণ ভারতীয় পুরোহিতদিগকে কতক হত্যা করেন, কতককে খ্রীষ্টান করেন এবং যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিতাড়িত করেন (ভারতীয় পুরোহিতদের দীর্ঘ কেশ ছিল)। খোটানের দেওয়ালে—দীর্ঘকেশী বৈদিকগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পদতলে চিত্রিত রহিয়াছেন দেখা যায়। এই দীর্ঘকেশী যাজ্ঞিকগণ উর হইতে বিতাড়িত হইয়া হয়ত ভারতে পুনরাগমন করিয়া থাকিবেন। খুঁজিলে, এ ঘটনার কিছু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। আসিরিয়া দেশ হইতে সমগ্র দেবালয়ের পুরোহিত-দিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এ খবরও পাওয়া যায়। তাঁহারাও এক রকম যাজ্ঞিক ছিলেন। ধার্ম্মিক মোজেস যে নব-যজ্ঞ প্রবর্তন করেন, সেই যজ্ঞ ব্যাপারটি প্রায় প্রাচীন ভারতীয় পুরোহিতদের মতই ছিল।

চালদীয়া দেশের রাজধানী বাবিলনে পুরাকালে এক প্রকার ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল। সে লেখমালা কতকটা সৈন্ধবী রাঢ়ী লেখমালার মতই। কোন কোন লিপি প্রাচীন বংগী তুল্য। যখন ভগবান বুদ্ধদেব বাল্যকালে জনৈক বিশ্বামিত্র নামক লিপিগুরুর নিকট ৬৪ প্রকার লিপি শিক্ষা করেন (বৌদ্ধললিতবিস্তর গ্রন্থ দেখুন), তখন তিনি অংগ, বংগাদি লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা যে সকল প্রাচীন বংগ (রাঢ় লিপি) লিপিমালার আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছি, তাহার একাধিক লিপি অনুরূপ লিপি এবং নাগ (খরোষ্ঠী পূর্ব ?) লিপির সহিত য়ুরোপের সর্বপ্রাচীন লেখমালা লিখিত লিপির সহিত সমসাদৃশ্যযুক্ত। য়ুরোপে প্রাচীন লিপি খোদিত একাধিক যে লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঈজিপ্টেও যে প্রাচীন লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় প্রাচীন লিপি চিত্রের বিচার করিলে উহা (তুলনায়) প্রায় একই চিত্ররূপ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ললিতবিস্তর বর্ণিত বংগী লিপির তুল্য লিপিবিশেষ য়ুরোপেও পাওয়া গিয়াছে। ৬৪ প্রকার লিপির সন্ধান না

পাইলেও অংগ, বংগ, (রাঢ় ?) লিপিও একাধিক ছিল। আমরা একমাত্র রাঢ় বংগ লিপির একাধিক রূপের সন্ধান পাইয়াছি। একাধিক রাঢ়ী লিপি (বংগ ?) ছিল। দেড় শত বা দুই শত বৎসর পূর্বে লিখিত বাংলা পুথিতে, এক প্রকার প্রাচীন রাঢ়ী বাংলা লিপির কতিপয় লিপি পাইয়াছি, সেগুলি বংভী নয়। একাধিক লেখমালা পাইয়াছি যাহার লিপি সৈন্ধবী, খরোষ্ঠী (নাগ) ও বিশেষ রাঢ় বংগ লিপি। শুশুনীয়াপাহাড় লেখমালার লিপিও প্রাচীন রাঢ়ী লিপিবিশেষ।

প্রাচীন য়ুরোপীয় লেখমালায় তথাকথিত লিপির তুল্য চিত্রও দেখা যায়। য়ুরোপে যে পুরাকালে ভারতীয় লিপির প্রচলন ছিল, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। এই লিপি-ঘটিত ব্যাপার সহ, ভারতীয় সমাধিস্তূপ এড়ুক (ডলমেন)-গুলির সম্বন্ধ আছে। কেন এইরূপ সম্বন্ধ পাই, ইহার কারণ সন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, অতি পুরাকাল হইতে ভারতীয় প্রভাব য়ুরোপে বিদ্যমান ছিল। বাবিলন, চালদিয়া, চন্দ্রীস্থান প্রভৃতি জনপদে ভারতীয় রাজারা একদা রাজ্যশাসন করিতেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

পূর্বতাতার প্রান্তে, বাংলা দেশের রাজা বিশেষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। লেখমালা ও ভাষার দিক্ দিয়া একাধিক প্রমাণ দিয়া বারান্তরে প্রাচীন বাংলার এই গৌরব-কীর্তির কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কাশীরাম-দাসের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ

কাশীরাম দাস অতি সহৃদয় ও সহানুভূতি-সম্পন্ন সুকবি ছিলেন। "মহাভারতের" ঘটনা-বিশেষের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য দেখিলে, তিনি কখনও বা হর্ষ, কখনও বা বিষাদ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজকবি টেনিসন্ যাহাকে Poetic justice বলিয়া গিয়াছেন, সেই Poetic justice-এর উদাহরণ কাশীরাম-দাসের "মহাভারতে" যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া যদি কাশীরাম তাহার দোষ দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভণিতি-যোগে তাহার নিন্দা করিতেন, এবং গুণ দেখিলেও, তিনি তাহার প্রশংসা করিতেন। কবি ঠিক কথা বলিতে ছাড়িবেন কেন? কাশীরামের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।*

মাদ্রীর কথা না শুনিয়া পাণ্ডু তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। এই হেতু, কাশীরাম ব্রহ্মশাপের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ-প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিতেছেন :—

"পাণ্ডু না শুনিল সতী মাদ্রীর বচন।
কাশী কহে, ব্রহ্মশাপ বড়ই ভীষণ ॥" (আদি ৬৮) †

অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিতে যাইতেছেন। সমবেত দর্শক-বৃন্দ তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিতেছেন। কাশীরাম আর থাকিতে না পারিয়া ভণিতা দিয়া কহিতেছেন :—

"লয় মনে, হেন জনে বিদ্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে, হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥" (আদি ।৯৬)

---

* "চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয় ॥"

এই কবিতা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কাশীরাম দাস ১৫২৬ শকাব্দে, ১০১১ বঙ্গাব্দে বা ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। "আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। রচিয়া গেলেন কাশীদাস স্বর্গপুর ॥" এই কবিতা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কাশীরাম দাস আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কিয়দ্দূর রচনা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। "দ্বিজপদরজ লয়্যা কাশীর নন্দন। জনকের আজ্ঞামত করিল রচন।" "জয়দ্রথ বধ কথা অমৃত সমান। নন্দরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্?" এই দুইটী কবিতা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাস পিতার অনুমতি পাইয়া শেষ চতুর্দ্দশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। উদ্যোগ পর্ব্ব হইতে মুষল পর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ভণিতিযুক্ত কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নন্দরামের রচিত। নন্দরাম নিজ নামের পরিবর্ত্তে পিতা কাশীরামের নামের ভণিতি দিয়াছেন। স্থানে স্থানে নন্দরাম নিজ নামেরও ভণিতি দিয়া গিয়াছেন। দেখা যায়, নন্দরাম কাশীরামের প্রতিভার সহিত হৃদয়েরও যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

† মৎ-সম্পাদিত "কাশীরাম দাস মহাভারত," আদি পর্ব্ব, ৬৮ অধ্যায়।

যখন শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাবিধ কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন কাশীরাম তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে কহিলেন :—

"বিশ্বরূপ দেখালেন যেই বনমালী।
কাশী কহে, শিশুপাল! তাঁরে দাও গালি॥" (সভা।২৮)

দুঃশাসন, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভায় লইয়া গেল। কোমল-হৃদয় কাশীরাম তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বুঝিয়া লইলেন, কুরুকুল শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তিনি প্রাণের আবেগে কহিলেন :—

"দুঃশাসন আনে ধরি' দ্রৌপদীর চুল।
কাশী কহে, কুরুকুল হইল নির্ম্মূল॥" (সভা।৪০)

যখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী কাম্যক-বনে বাস করিতেছিলেন, তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদের সর্ব্বনাশ-সাধনের নিমিত্ত দশ সহস্র শিষ্যসহ দুর্ব্বাসাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে অন্ন নাই, অথচ এতগুলি অতিথির সেবা করিতে হইবে, এই ভাবিয়া দ্রৌপদী দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবদ্-ভক্ত কাশীরাম কহিলেন :—

"দ্রৌপদীর দুর্ভাবনা, দুর্ব্বাসার দেখা।
কাশী কহে, কি অভাব কৃষ্ণ যাঁর সখা॥" (বন।৮৭)

পঞ্চ স্বামীকে একটী কন্যা প্রদান করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া দ্রুপদ-রাজ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তখন কাশীরাম তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিলেন :—

"দ্রৌপদী-বিবাহে হৈল দ্রুপদ অধীর।
কাশী কহে, শিব-বর পূর্ব্বে আছে স্থির॥" (বন।১১২)

ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠিরকে দুরূহ প্রশ্ন করিলেও, তিনি তাহার সদুত্তর দিলেন দেখিয়া কাশীরাম কহিতেছেন :—

"কাশী কহে, ধর্ম্ম প্রশ্ন করে বহুতর।
যেমন বাপের ব্যাটা, তেমনি উত্তর॥" (বন।১২০)

যখন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বিদুরের বাটীতে গিয়া তাঁহার ভিক্ষালব্ধ অন্ন-গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন ভগবদ্-ভক্ত কাশীরাম কহিলেন :—

"মহানন্দে বিদুরান্ন খাইলেন হরি।
কাশী কহে, তুষ্ট তিনি ভক্তের উপরি॥" (উদ্যোগ।২১)

যখন সন্ধি-স্থাপনের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কাশীরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন :—

"যে কৃষ্ণ করেন ভব-বন্ধন-মোচন।
কাশী কহে, তাঁর বন্ধে যায় দুর্য্যোধন॥" (উদ্যোগ।২৫)

যখন বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব অর্জ্জুনের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন, তখন কাশীরাম হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইয়া কহিলেন :—

"পার্থে কোলে করি ভীষ্ম মানুষ করিল।
কাশী কহে, ভীষ্ম-বধে বিষাদ রহিল॥" (ভীষ্ম।১৯)

যখন ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া দেহত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিলেও, দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করিল না, তখন কাশীরাম ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কহিলেন :—

"দুর্য্যোধন না শুনিল ভীষ্ম-উপদেশ।
কাশী কহে, কুরুকুল এতদিনে শেষ॥" (ভীষ্ম।২০)

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি কুঞ্জরঃ", জ্ঞাতসারেও এই মিথ্যা কথা কহিয়া শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ-বর দ্রোণাচার্য্যের জীবন-নাশ করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এই কথা স্মরণ করিয়া কাশীরাম মনের দুঃখে কহিতেছেন :—

"জেনে শুনে ধর্ম্মরাজ করিলা অধর্ম্ম-কাজ
গুরুবধ-ব্রহ্মহত্যা-কারী।
যিনি ধর্ম্ম-অবতার এ কাজ কি সাজে তাঁর
কাশীর বিষাদ রৈল ভারী॥" (দ্রোণ।৩৯)

কুন্তী যখন যুধিষ্ঠিরকে তর্পণ-ক্রিয়া করিতে বলেন, তখন কাশীরাম হৃদয়ের আবেগে কহিলেন :—

"কুন্তী বলে, কর্ণে ধর্ম্ম কর জলদান।
কাশী কহে, ইহা শুনি ফাটে মোর প্রাণ॥" (স্ত্রী।১১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগে কাশীরাম বিস্মিত হইয়া কহিতেছেন—

"সৃজন করেন যিনি বিনাশ করেন তিনি
তাঁর লীলা বুঝা বড় ভার।
মরণ নাহিক যাঁর জরা-হস্তে মৃত্যু তাঁর
কাশী কহে, সৌভাগ্য জরার॥" (মুষল।৭)

ওয়ার-বেবি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

দৌড় — দৌড় — দৌড়। ব্ল্যাক্-আউট্ — কাক-জ্যোৎস্না। সেপাই দেখিতে পায় নাই তো? যদি পাইত···? দৌড়—

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্!

আমার দিকে? গেলাম! গাছে পিঠ দিয়া লুকাইলাম। বুকে যেন পাথর ভাঙিতেছে—প্রাণটা গলার কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে!

না তো?—

কোকিল ডাকিতেছে···বিরহে! সে মিঠে আওয়াজ নাই···বসন্ত যে নাই···! যেখানে বসন্ত, সেখানে যায় না কেন? যে যাহাকে চায়, তাহার কাছে সে যায় না কেন?

হাঁ, আমার বেবি—ওয়ার-বেবি! কুন্দ কোলে নিয়া নাচাইতেছে নিশ্চয়ই। হইয়াছে ঠিক যেন মেলিন্স ফুডের ছেলে! কুন্দ'র ছেলে হইবে জানিয়া কুমারেশ বাবুর স্ত্রী আমাদের শুইবার ঘরে একটি ছবি টাঙাইয়া দিয়া গেলেন। ড্রেস্-করা সুন্দর একটি খোকার ছবি। বলিলেন—এমনি একটি খোকা হবে তোর। হইলও কি ঠিক তাই! খোকাকে ওয়ার-বেবি বলিলে কুন্দ রাগে! তাহার মানে সে জানে। গম্ভীর হইয়া বলে—আর বোলো না···যুদ্ধের সময়ে হলেই তার নাম ওয়ার-বেবি হয় না-কি? তবুও আমি তাহাকে রাগাইবার জন্য খোকাকে ডাকিতাম ওয়ার-বেবি বলিয়া। তাই কুন্দ একটা বুদ্ধি খাটাইয়াছে। সে খোকার নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছে—পুলক। যদিও খোকার অন্নপ্রাশন হয় নাই। কারণটা বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। পাছে ওয়ার-বেবি নামটা চল্ হইয়া পড়ে সেই ভয়ে!··· আমার কুন্দ!

দড়্বড়্—দড়্বড়্!

দৌড়—দৌড়—দৌড়। গলির মধ্যে—আবার গলির মধ্যে। কৈ শব্দ···? নাঃ—।

ঐ তো আমার বাসা? সিঁড়িতে পা উঠিতেছে না। বসিয়া পড়িলাম—হাঁপ জিরাইয়া নিতে।

বেবিকে চুমো···কুন্দকে চুমো···। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়।

আমি ফ্যাক্টরীর হপ্তা মজুর। ছোট বড় সবাই তাই। পেটের দায়ে দেহমন বিক্রি। এখন দু'বেলা খাইতে পাই তো—ম্যাট্রিক পাস করার পর চার বৎসর তা' পাই নাই। তাহার পর আমাদের সেক্শানের বাবু কুমারেশ অধিকারীর চোখে পড়ি। তিনি তাঁহার মৃত-শ্যালীর মেয়ে কুন্দর সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। তাহার পর আসিল যুদ্ধের মাতন। কাজ বাড়িল—মাহিনা বাড়িল—বাঁধন বাড়িল—সঙ্গীনধারী সওয়ার বাহিরে ভিতরে ঘুরিতেছে। সাহেব কমিল—ছুটি কমিল—জাত-বিচার কমিল—কারখানাতেই প্রায় সবাইকে খাইতে শুইতে হয়। সেই লোহা-তামা-সীসা—ব্রোঞ্জ-পিতল-নিকেল···ঢালাই-পেটাই-ঘষামাজা, দিবারাত্রি ঘর্-ঘর্ ঘর্ঘর···দমাদম্। তাহার মধ্যেই ঢং-ঢং—খাইবার শুইবার ঘণ্টা। কলের পশুর দল···এক দল আসে—এক দল যায়! কাজ—কাজ—কাজ!

কি করিয়া আমি এই রাত্রে বাহির হইয়া পড়িলাম জানি না···তবে ইহার জন্য কি শাস্তি নিতে হইবে, তাহা বেশ জানি!

উঠিয়া পড়িলাম। ঘরের ভিতরে যাইতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকিল। যেন কত দিন আসি নাই। পাঁচ হপ্তা—না ছয় হপ্তা?···নাঃ আরও বেশি। কুমারেশবাবু যে আসিতেই দেন না—বলেন পাঁচ জনের মত ফ্যাক্টরীতেই থাকো······বেশি রোজগার হইবে। রোজগারটাই সব কিছু বুঝি···!

দেখিলাম ঘরের দরজা ভেজানো! ঘর খুলিয়াই বুঝি কুন্দ শুইয়াছে? ঘরে ঢুকিলাম···আলো নাই। বিলাতী কারণবারির তীব্র গন্ধ! খাটে ও কে?—এ্যাঁঃ···একটা পুরুষ—একটা স্ত্রীলোক!

যেন ইলেকট্রিক শক্ লাগিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। যত রাগ গিয়া পড়িল কুমারেশবাবুর উপর।

আর দাঁড়াইলাম না···সিঁড়ি কয়টা লাফাইয়া পড়িলাম—আবার দৌড়িতে লাগিলাম। দুইটা চামচিকা ঝটাপটি খাইয়া মাথায় আসিয়া পড়িল। মঙ্গলবার—বৈশাখের কৃষ্ণাপঞ্চমী। এখনও চাঁদ ওঠে নাই।

দৌড়িতেছি···। সামনে কাহার ছায়া চলিয়াছে—? গা ভুলি দিয়া উঠিল। কোথায় যেন ঘড়ির শব্দ হইল—টং···। রাত্রি সাড়ে বারোটা—না একটা? ছায়া দৌড়িতেছে। পিছনে দেখিতে সাহস হইতেছে না!

এইবার বাঁশতলা দিয়া রাস্তা। রাস্তার উপর একটা বাঁশ। লাফাইব? যদি খাড়া হইয়া ওঠে! দাঁড়াইলাম। কড়্-কড়্-কড় শব্দ। চোখ বুঁজিয়া লাফাইলাম! বাঁশতলা দিয়া দৌড়িলাম। কাহার সঙ্গে যেন ধাকা খাইলাম। চিৎকার করিয়া উঠিলাম।

ওঃ—। মোড় ফিরিয়া ফাঁকা রাস্তা। চাঁদ উঠিয়াছে। ছায়াটা নাই তো? চাঁদের আলোয় আর আসিল না বুঝি! না—বাঁশ গাছে উঠিয়া পড়িল?···ভয় কমিল। ভাবিলাম কাহার ছায়া দেখিয়াছি—আমার নয় তো?··· পিছনে ছিল আবছা' জ্যোৎস্না!

আস্তে আস্তে চলিয়াছি—আর দৌড়িবার সামর্থ্যও নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোথায় লুকাইয়া ছিল—এক সঙ্গে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু কি দেখিয়া আসিলাম আমার ঘরে—আমার বিছানায়···? আবার কাণে তালা লাগিল··· মাথা ঘুরিয়া গেল···পা টলিতে লাগিল···!

ঐ একটু দূরেই তো কুমারেশবাবুর নিজের বাড়ী। বেশ ছোট একটি বাড়ী। সামনে সুন্দর ছোট বাগানটি। অতি ফিটফাট্, একমাথা-টাক্, প্রৌঢ় ভদ্রলোক। এই লোহার কারখানার পুরাতন কর্ম্মচারী। স্ত্রী আছেন··· কোন সন্তান নাই। মৃত শ্যালীর মেয়ে কুন্দকে মানুষ করিয়াছেন। কুন্দ—সেই কুন্দ আজ···!

মারিলাম সজোরে বাগানের গেটে ধাক্কা। যাহারা ভিতরে বসিয়া ছিল, কলরব করিয়া উঠিল।

কে—কে? কুমারেশবাবু টর্চটা টিপিয়া আগাইয়া আসিলেন।

একটা প্রতিহিংসা আমায় পাইয়া বসিল। বড় কর্ম্মচারী উনি—গরমের রাতে বাগানে বসিয়া মৌজ করিতেছেন···আর আমি সামান্য মজুর—প্রাণের জ্বালায় ছুটিয়া ছুটিয়া মরিতেছি!

মরিয়া হইয়া উঠিলাম। আবার গেটে লাথি মারিতে গেলাম। শরীর এত অবসন্ন যে পা উঠিল না···চোখে সর্ষে ফুল দেখিতেছি। গেটের গরাদ ধরিয়া সামলাইয়া নিলাম—নতুবা পড়িয়া যাইতাম।

গেটের চাবী খুলিয়া কুমারেশবাবু বলিলেন—মনোরথ? তাঁহার স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ওগো মনো এসেছে। বেবিকে ডাকিলেন — পুলক — পুলক আয়, আয় বাবা এসেছেন। অনুযোগ করিয়া আমায় বলিলেন—তা' পালিয়ে এলে কেন বাপু?···পালিয়ে আসা ভারি বিপদ্—যদি বন্দুক ছুঁড়ত? আমি যখন এলাম বললে না তো—এক সঙ্গেই আসতাম। এমন দুঃসাহস করতে আছে···?

কুমারেশবাবুর স্ত্রী আসিয়া বলিলেন — এস বাবা ভেতরে এস···। খাওয়া দাওয়া হয় নি বোধহয়। তোমার সেই বাসাটার খোঁজ নিয়ে আসছ নিশ্চয়। সেটা কবে ছেড়ে দিয়েছি··কবে রে কুঁদো? উনি বললেন, তুমি দু'এক মাস কারখানাতেই থাকবে। শুনেই কুঁদোকে এ বাড়ীতে নিয়ে এলাম···সে ও-বাড়ীতে একা থাকতে পারবে কেন? আর পুলো যে কি দুষ্টু হয়েছে বাপু! আয়, আয়—বাবার কাছে এস তো দাদু।

বেবিকে তাহার দিদির কোলে দিয়া হাসনাহানার ঝোপের পাশে কুন্দ সরিয়া গেল। মুখে কি দুষ্টু হাসি—।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(তৃতীয় পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৪৫॥

স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে গীতা বলিতেছেন—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি অর্থাৎ আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবভাবে অবস্থান করিতেছে।

জীবকে ঈশ্বরাংশ বলিলে, অংশের দুঃখ অংশীকে যেমন সমভাবে পীড়িত করে, সেইরূপ জীবের সুখ-দুঃখাদি ঈশ্বরকেও তো পীড়িত করিবে? এইরূপ হইলে, শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ মোক্ষবাদ তো নিরর্থক হইয়া যায়। অর্থাৎ জীব আর কি হেতু ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রার্থী হইবে? এইরূপ ব্যাখ্যার উপসংহার আমাদের ভাষ্যকারদের। ব্যাসদেব এতদর্থে সূত্র রচনা করেন নাই। ব্রহ্ম যাবৎ উপাধিবিশিষ্ট জীব থাকিবেন, তাবৎ উপাধিযুক্ততা হেতু জীবের ব্রহ্ম হইতে ভোগপার্থক্য অনিবার্য্য থাকিবে। এই দুঃখনিবৃত্তি জীবের কাম্য নহে। ব্রহ্মভাববঞ্চিত জীবের অজ্ঞতাই ইহার জন্য দায়ী। জীব 'অহমস্মি' জ্ঞান লাভ করিলে সুখ-দুঃখের প্রকার-ভেদ হইবে না, অনুভূতি-ভেদ হইবে। জীবের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ যে চৈতন্য তাহা যে প্রকারের, আর ব্রহ্মযুক্তির চৈতন্য লইয়া উপাধিযুক্ত হইয়া যে জীবচৈতন্য তাহা অন্য প্রকারের হইবেই। অঙ্কশাস্ত্রে অমীমাংসিত কূট প্রশ্ন যেমন শুধুই অঙ্কশাস্ত্রবিদের বুদ্ধি-মার্জ্জনের জন্যই ব্যবহৃত হয়, শাস্ত্রবর্ণিত মোক্ষ জীব-চৈতন্যের মার্জ্জন ও শোধনের জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু জীবও নিত্য, ব্রহ্মও নিত্য। জীবের মোক্ষ অংশাশী জ্ঞান রক্ষা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সমস্ত ব্রহ্মসূত্রে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। জীবের দুঃখভোগের প্রকার ব্রহ্ম-তুল্য হয় না, তাহাই প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥৪৬॥

পরঃ (পরমেশ্বরঃ) ন এবং (এইরূপ হন না) প্রকাশাদিবৎ (প্রকাশাদি দৃষ্টান্তের ন্যায় ইহা প্রমাণিত হয়)।

অর্থাৎ জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের ভোগ তুল্য নহে সৃষ্টি-প্রকাশাদি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে জীবের দেহাদিতে আত্মভাব থাকা হেতু কর্ম্মজনিত যে সংঘাত নশ্বর বিষয়বস্তুতে উপস্থিত হয়, তাহার স্পন্দনভেদে কখন দুঃখীর, কখন সুখীর মত জীব দ্বন্দ্ব ভোগ করে; কিন্তু জীব ব্রহ্মচৈতন্যযুক্ত হইলে, কর্ম্মজনিত যে স্পন্দনানুভূতি তাহা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে হওয়ায়, তাহা যে দেহের বা মনের, এইরূপ অনুভব করিয়া সে ভোগাদির দ্বন্দ্ব-লীলা লক্ষ্য করে। শরীরে আঘাত লাগিলে, শরীর যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়। আত্মা যে দেহাতিরিক্ত চৈতন্য, এই জ্ঞান না থাকায়, দেহের সঙ্গে তাহার সবখানি অভিভূত হইয়া পড়ে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ হয় না। তিনি বলেন—আমার দেহটার বড় যন্ত্রণা হইতেছে, আমার মনটা কেমন করিতেছে। ব্রহ্মচৈতন্যযুক্ত জীবের আর ব্রহ্মচৈতন্যহীন জীবের ভোগ-ভেদ যখন এতখানি, তখন জীবের সংসার-দুঃখ ঈশ্বরে যে কতখানি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে, তাহা অনুমেয়। বেদব্যাস সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্রকিরণ বিপুল আকাশব্যাপী, তাহা বাতায়নের ছিদ্রপথে কি সঙ্কীর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারেন। এইরূপ জীবের অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি-ছিদ্রে ব্রহ্মকর্ম্ম যে আকৃতি পরিগ্রহ করে, উহা তদাকারে ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। জলে সূর্য্য-বিম্ব রেখায় রেখায় খণ্ডিত হয়, সূর্য্য কিন্তু অখণ্ডই থাকে। জীবের উপাধিনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা পরমেশ্বরকে স্পর্শ করে না। জীবের মোক্ষবাদ উপাধি হইতে মুক্তি নহে, দুঃখের অজুহাতে এই মুক্তিপ্রাপ্তির কর্ত্তৃত্ব জীবের নাই। জীব ঈশ্বরাংশ। ঈশ্বরেচ্ছাই অংশের ইচ্ছা। এই ভূমার ইচ্ছা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অবধৃত হওয়ার নামই মোক্ষ; এ কথা ব্রহ্মসূত্রে আরও স্পষ্টীকৃত হইবে

স্মরন্তি চ ॥৪৭॥

স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে আছে। অর্থাৎ জীবের দুঃখ

পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না, এ কথা স্মৃতি ও শ্রুতি উভয় ক্ষেত্রেই লিখিত আছে। 'তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণ। তিনি পদ্মপত্রের ন্যায় জলের দ্বারা লিপ্ত হন না প্রভৃতি। শ্রুতিও বলেন—'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" সেই দুইয়ের একটি সুস্বাদ জ্ঞানে কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্যটী ভোগ না করিয়া প্রকাশিত থাকে।

শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ, এই দুই লক্ষণই আত্মার পক্ষে কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা হইতে আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে, জীবের সুখ-দুঃখ পরমাত্মাকে স্পর্শ না করার হেতু আছে। কিন্তু ভেদ ও অভেদ, এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ মত-প্রবর্ত্তন শ্রুতির লক্ষ্য হইতে পারে না। উপাধিভূত ব্রহ্মকেই অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উহা ভিন্ন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মূলতঃ এই জীব অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দেহাদিতে আশ্রিত জীবের সুখ-দুঃখাদি যে প্রকারে অনুভূত হইবে, উপাধিবিযুক্ত আত্মায় তদ্রূপ হইবে না। দেহাদিতে আশ্রিত জীবের জন্যই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। মুক্তাত্মার জন্য শাস্ত্র নহে। এই সকল কথা পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে পরিষ্কার করিয়া বলা হইবে।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৮

দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু) অনুজ্ঞাপরিহারৌ (বিধিনিষেধ) জ্যোতিরাদিবৎ (আলোক প্রভৃতির দৃষ্টান্তের ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে)।

জীবসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ-বাক্যই শ্রুতিতে আছে। জীব ও ব্রহ্ম এক হইলে, ব্রহ্মের যে অংশ দেহসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই জীব-সম্বন্ধের জন্য শাস্ত্রোক্তির প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—দেহ-সম্বদ্ধ জীবও তো ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বিধিনিষেধের অধীন করা কি কাল্পনিকতা নহে? জ্যোতিঃ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। অগ্নি তো সর্ব্বত্রই এক পদার্থ। শ্মশানাগ্নি ও হোমাগ্নি কি তুল্য বোধে গৃহীত হয়? মর্ত্ত্য তো মৃত্তিকায়। হীরক ও মৃতদেহ তুল্যভাবে কি গৃহীত হয়? অতএব শাস্ত্রবাক্য—চুরি করিও না, এই নিষেধ ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবে, এই বিধি দেহীর পক্ষে অসঙ্গত হয় না।

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥৪৯॥

অব্যতিকরঃ (সাঙ্কর্য্য হয় না? কেন হয় না?) অসন্ততেঃ (সকল শরীরের সম্বন্ধের অভাব হেতু)।

অর্থাৎ এক জীবের কর্ম্ম অন্য জীবের কর্ম্মে অব্যবস্থা সৃষ্টি করে না।

আত্মা এক বলিয়া এক জীব যাহা করে, অন্য জীবে তাহা অর্শায় না। তাহার কারণ, আত্মা এক হইলেও, বুদ্ধি এক নহে। জীব দেহমুক্ত হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির আশ্রয়ে যে যে পরিমাণে শাস্ত্রবিধি রক্ষা করে অথবা শাস্ত্র-বিধি অগ্রাহ্য করে, বিদেহ আত্মা তদনুযায়ী সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধির আশ্রয়ে ফলভোগ করিয়া থাকে। আত্মা এক হইলেও, বুদ্ধিভেদবশতঃ স্থূলদেহত্যাগের পরও এইরূপ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য পরলোকেও রক্ষা করিয়া থাকে। নিরুপাধিক আত্মার এবম্বিধ কর্ম্ম নাই। ব্রহ্মের একাংশ জীবভূত। সেই অংশে অংশীর পরম অবস্থা অবশ্যই ভাব্য হয়। অংশ লয় করার আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রকথিত বিধি-নিষেধের আধীন্য জীব স্বীকার করে। ইহাতে জীবের অধ্যাত্মোন্নতি নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু জীব কর্ম্মে অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যে অদ্বয় ব্রহ্মে লয় পায় কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা নাই। জীবের প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি অনাশ্রিত-বুদ্ধি হইয়া যখন সম্ভব নয়, তখন জীবত্ব কল্পান্তকালস্থায়ী। কিন্তু জীবের মৌলিক সত্তা অখণ্ডত্বের অনুভূতিকামী, ইহাই তাহার আসল স্বভাব। এই কামনাই উন্নত জীবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই পর্য্যন্তই আমরা কল্পনা করিতে পারি। পর পর সূত্রগুলি আমাদের এই কথাই প্রতিপাদন করিবে।

আভাস এব চ ॥৫০॥

আভাস (প্রতিবিম্ব) এব চ (জীব পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব)।

আকাশের সূর্য্য খণ্ডিত হইয়া জলে ভাসে না। অখণ্ড সূর্য্যের প্রতিবিম্বই জল-মধ্যে লক্ষিত হয়। ব্যাসদেব জীবকে ব্রহ্মের এইরূপ অংশ বলিয়া অর্থাৎ আভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপ হইলে, এক জলাশয়ে

সূর্য্যাভাস যে ভাবে উদ্ভাসিত হন বা স্পন্দিত হন, অন্য জলাশয়ে তদ্রূপ হন না। জীব এক হইলেও, বুদ্ধি-পার্থক্যে কর্ম্মভেদপ্রদর্শনের এই দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে।

যাঁহারা মোক্ষবাদী, তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে, ব্যাসদেবের এই সূত্রের পর জীবের মোক্ষবাঞ্ছা কি সঙ্গত হইতে পারে? প্রতিবিম্ব বস্তু নহে—বস্তুর আভাস। এই আভাস অবিদ্যাকৃত বলা হয়। এই অবিদ্যা দূর হইলে, জীব মুক্ত হয়। জীব যদি পরমাত্মার আভাস হয়, অবিদ্যা হয়, তাহা হইলে তাহা দূর করার কর্ত্তা তো জীব নহে। জীবের মোক্ষবিচারও যেমন নিরর্থক, তাহার বিধিনিষেধের অনুগমনও তদ্রূপ হেতুহীন। এই জন্যই বোধ হয় সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—জীব বা আভাসের এই কথাই সার কথা—"যা করান কালী এই সে জানে।" জীবের কর্ম্মবাদ অস্বতন্ত্র নহে, উক্ত সূত্রে তাহা প্রমাণিত হয়। জীব শুধু আভাস হইলে, তাহার কর্ম্ম থাকে না। সবই তো ব্রহ্মকর্ম্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেখানে যেভাবে উদ্ভাসিত হইবেন, সেইখানে তাহাই হইবে। ইহার জন্য পূর্ব্বে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে তাহাই প্রযুজ্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহাকে উন্নীত করিতে চাহেন, তাহাকে সাধু কর্ম্মে নিয়োজিত করেন—যাহাকে আবার রাখিতে চাহেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

ফলে দাঁড়াইতেছে, তিনি যেখানে যে ভাবে প্রকাশ হইতে চাহেন, তাহাই অনিবার্য্য। বেদের বিধি-নিষেধ-পালনের ইচ্ছা যেখানে, সেখানে জীব তাঁহার অনুগামী হয়। বিধি-নিষেধের অনুবর্ত্তী যেখানে হইতে না চাহেন, সেখানে তাহার অন্যথা হয়। আমরা গন্ধযুক্ত জল ঘ্রাণ করিয়া, বলিয়া থাকি—জলের গন্ধ; আসলে উহা যেমন মৃত্তিকারই গন্ধ; তদ্রূপ জীব হইয়া আমরা বলি—আমার কর্ম্ম, আমার দেশ, আমার ধর্ম্ম, আমার জাতি। আমি বেদ পড়ি, আমি বেদ অস্বীকার করি; ব্রহ্মই তাহার জন্য দায়ী। ইহার জন্য ব্রহ্মের বিষম দোষ বা নৈর্ঘৃণ্যতা আরোপ যদি করি, তাহা আমার দ্বারা কৃত হয় মাত্র; তাহাও ব্রহ্মকর্ম্ম। যে জীব সতত স্মরণ করে—ব্রহ্মই স্রষ্টা, ব্রহ্মই কর্ত্তা, সে জীবের যে প্রকরণ, ব্রহ্মই তাহার জন্য দায়ী। আর যে জীব আমি করি, আমি ভোগ করি, আমার তুল্য কেহ নাই, এইরূপ মনে করে, তাহার জন্যও সেই ব্রহ্মই দায়ী; অন্য কেহ নহে। লৌকিক ভাষায় 'সাপ হইয়া কামড়ান, রোজা হইয়া ঝাড়ান' কথাই আসিয়া পড়ে। বুদ্ধিমানেরা বিষয়টাকে এত সহজ করিয়া লইতে চাহেন না। ব্রহ্মসূত্রকার কিন্তু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই কথাই বলিতেছেন। সাংখ্যবাদীরা বলেন—ঐরূপ এক-বিজ্ঞান বালকের কথা; আত্মা বহু ও বিভু, কিন্তু নির্গুণ ও নিরতিশয়। আত্মার প্রকাশ প্রকৃতি হইতে। এই প্রকৃতির দ্বারাই আত্মার ভোগ ও মোক্ষ ঘটে। বৈশেষিকেরা বলেন—আত্মা বিভু ও বহু বটে, তবে উহার চৈতন্য নাই; ঘটাদির ন্যায় অচেতন; উহার আশ্রয় মন ও জড়সমষ্টি। কিন্তু এই সবই পরমাণু তুল্য। এই আত্মা, মন ও অচেতন সমষ্টির সমবায়ে ভোগোৎপত্তি, আর ইহার উৎপত্তির অভাব মোক্ষ। সাংখ্যের আত্মা চৈতন্যরূপী। প্রকৃতি—ভোগ ও মোক্ষের প্রবর্ত্তয়িতা। এই অবস্থায় সর্ব্বত্রই শোক-দুঃখের সমানতাই হওয়া উচিত। সাংখ্য তদুত্তরে বলেন—প্রকৃতির মুখ্য প্রবৃত্তি পুরুষের মোক্ষের জন্যই হয়। কিন্তু সাংখ্যবাদ এইখানেই দেউলিয়া হইয়াছেন। সাংখ্যের প্রধান জড়। জড়ের প্রবৃত্তি অযুক্তিকর বাক্য। মোক্ষবাদ ছাড়িয়া দিলেও, বহু চৈতন্যময় আত্মা নির্গুণ ও নিরতিশয় একরূপ; প্রধানও সকলের পক্ষে সমান। তবে আবার সুখ-দুঃখাদির ইতরবিশেষ হয় কেন? কণাদের মতও অসার। মনের সহিত আত্মার সংযুক্তিতে যে কর্ম্মসৃষ্টি হয়, হেতু-বিষয়ের অবিশেষ থাকা বশতঃ ফলবিশেষও সাধারণ হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। ব্যাসদেব এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য পরবর্ত্তী সূত্র রচনা করিতেছেন।

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥৫১॥

অদৃষ্ট অনিয়মাৎ।

অর্থাৎ অদৃষ্ট নিয়মের বোধক হেতু না থাকায়, সাংখ্য-বৈশেষিক মতের দোষ তদবস্থ থাকে।

অর্থাৎ অদৃষ্টের কোন নিয়ামক নাই। সাংখ্য বলেন—আত্মা প্রধানকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট সৃষ্টি করে। এইজন্য প্রধান সকল আত্মার সাধারণ সম্পত্তি হইয়াও

কর্মভেদ সৃষ্টি করে। তদুত্তরে বলা যায়, সর্বব্যাপী প্রধানের ক্ষেত্রে কোন আত্মা কিরূপ কর্ম সৃষ্টি করিতেছে, নিয়ামক কেহ না থাকায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে কে? কণাদের মতেও, আত্মার সহিত মনের সংযোগ সর্বত্রই তুল্য। এ ক্ষেত্রেও আত্মা বিশেষের অদৃষ্ট নির্দ্ধারণ করা যায় না। এইরূপ স্থলে যদি কেহ বলেন—সাংখ্যের আত্মা যখন বহু এবং তাহা চৈতন্যময়, কণাদেরও আত্মা ও মন সংযুক্ত হইয়া যে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়, তাহাতে প্রত্যেকটাই যদি এক এক অভিসন্ধি লইয়া কর্ম করিতে থাকে, তাহা হইলে তো এক আত্মার কর্মের জন্য অন্য আত্মাকে ফল ভোগ করিতে হয় না। তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্॥৫২॥

অভিসন্ধি প্রভৃতিও সাধারণ। আত্ম-মনঃসংযোগের দ্বারা সর্বাত্মসন্নিধানেই ক্রিয়মাণ হয়। অর্থাৎ এক মনের সহিত এক আত্মার যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আত্মার সহিত এই যোগ সিদ্ধ হয়। অভিসন্ধি প্রত্যেক আত্মাতেই একরূপ হইবে, অতএব অভিসন্ধির দ্বারা জীবের সুখ-দুঃখাদির পার্থক্য আসিতে পারে না।

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ॥৫৩॥

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ (শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশ স্বীকার করিলে, একটা ব্যবস্থা হয়, এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) [কেন?] অন্তর্ভাবাৎ (কেননা তিনি সর্ব্ব শরীরের অন্তর্ভূত)।

অর্থাৎ আত্মা বিভু-চৈতন্য, তিনি সর্বব্যাপী অথচ সুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্য কি হেতু ঘটিয়া থাকে? তদুত্তরে ব্যাসদেব ৪৯ সূত্র হইতে ৫৩ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রের পর সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমে বলিয়াছেন, সকল দেহে এক আত্মা হইলেও, কোন দেহী স্বর্গকামী, কেহ বা নিরয়গামী, এইরূপ ভেদের কারণ "অসন্ততী" অর্থাৎ আত্মা এক অখণ্ড কিন্তু দেহ ভিন্ন ভিন্ন। দেহগত বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া দেহী লীলায়িত। দেহের মত বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং দেহাদির আশ্রয়ে এক দেহীর কর্মফল অন্য দেহীর তুল্য হয় না।

একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহগত হইলেও, এরূপ কর্ম-বৈচিত্র্য নাও তো হইতে পারে? জীবকেই যখন কর্তা ও ভোক্তা বলা হইয়াছে, সেই জীবের সহিত আত্মার যখন কোনই ভেদ নাই, তখন দেহভেদে একই কর্তা কর্ম-ভেদের কি কারণ হইতে পারে? তাহার জন্যই ব্যাসদেব বলিয়াছেন — জলাশয়স্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। এক জলাশয়ের প্রতিবিম্বের কম্পন অন্য জলাশয়ে দৃষ্ট হয় না। ঠিক এইরূপ আত্মা এক অবিকৃত হইয়াও, শরীরাদির আশ্রয়ে বিচিত্র আকৃতি ধারণ করে।

মূলের এই আভাস শব্দের অর্থ—জীব ঈশ্বরের অংশ অথবা প্রতিবিম্ব, ইহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। আমরা এই সকল জটিল বিচারের অন্তর্বর্তী হইব না। আত্মা এক অথচ তাহার কর্ম-বৈচিত্র্য কি হেতু হইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্ত সহকারে দেখাইবার জন্য ব্যাসদেব "আভাস এবচ" সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই সূত্র দৃষ্টান্তস্থলেই রচিত হইয়াছে। পরন্তু জীবকে আভাস বলা হয় নাই।

ইহার পর সাঙ্খ্য ও বৈশেষিকের আত্মবাদের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছেন—আত্মাকে শুধুই বিভু বলায় জীবের কর্মবৈচিত্র্যের হেতুস্বরূপ কোন নিয়ামকের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদান্ত-মতে, ঈশ্বর বিভু। জীব দেহ-পরিচ্ছিন্ন অণুচৈতন্য। জীবের বিভুত্ব স্বরূপ-স্বভাব। কিন্তু উপাধিযুক্ত হইয়া অণুত্ববশতঃ জীবের কর্ম নিয়মিত হইয়া থাকে। বিভু আত্মা শরীরপরিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিসন্ধিযুক্ত হন, ইহা যুক্তি নয়। আত্মার একত্ব সর্বদা স্বীকৃত হইলে, তাহার কর্ম আত্মার কর্তৃত্বহেতু বৈষম্যযুক্ত হইবে কেন? যদি এমন বলা যায় যে, শরীরপার্থক্যে আত্মার সীমাবদ্ধতা নির্দ্ধারিত হয়, সেই শরীরস্থ উপাদানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায়, আত্মা অখণ্ড হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন কর্মসৃষ্টি সম্ভব হয়। কাজেই এক আত্মায় যাহা হয়, অন্য আত্মায় তাহা সংঘটিত হয় না। পরন্তু আত্মা অখণ্ড এবং উক্ত কারণেই এক জীবের সহিত অন্য জীবের কর্মবৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। ব্যাসদেব উপসংহার-সূত্রে বলিতেছেন—এরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। আত্মার সবখানি শরীরের অন্তর্ভূত। আর এই আত্মা যখন সর্বব্যাপী এবং তিনি যখন প্রতি শরীরেই আছেন, তখন একাত্মা

অন্য আত্মা হইতে পৃথক্। একের কর্ম্ম অন্য হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপ বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের বৈচিত্র্য কিরূপে হইবে? সিদ্ধান্ত হইতেছে—আত্মা এক অখণ্ড, কিন্তু তিনি শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া জীবের সর্ব্বগতত্ববাদ ছিন্ন হইয়াছে। 'অহং' এই অনুভবকর্ত্তার পরিমিত পরিমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই জন্যই অহং-নাশের জন্য নানা শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। এবং এই জন্যই জীব অসংখ্য শরীরে অসংখ্য প্রকার কর্ম্মে অসংখ্য ফল আহরণ করিয়া জগৎ রক্ষা করিতেছে। জীব স্বভাবতঃ বিভু, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অণু। বর্ত্তমান পাদের ৪৩ সূত্রে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। "অংশনানা ব্যপদেশাৎ"—শ্রুতিতে এক অখণ্ড চৈতন্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগী হয়, এ কথার প্রচুর উপদেশ আছে। অতএব জীব বিভু হইলেও, জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন এবং কর্ম্ম-তন্ত্রে উন্নতি-অবনতির কারণ হইয়া থাকে, এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

আফ্রিকা-ভ্রমণের ভূমিকা

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আফ্রিকার কথা মনে করতেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে ধূ-ধূ মরুভূমি, বালি-কঙ্করময় রুক্ষ প্রান্তর, সিংহ-বাঘ ভল্লুক আর কালো কালো কাফ্রি নরনারীর কুৎসিৎ চেহারা। একদিন আমার স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যেও তাই-ই ছিল। কিন্তু এক নাগাড় প্রায় দেড় বছর সাইকেল, ট্রেন, বাস ও ষ্টীমারে বেড়িয়েও সমগ্র আফ্রিকা শেষ করতে পারিনি। কত অদেখা এখনও রয়ে গেছে। ভুল আমার গেছে ভেঙ্গে। বিস্মিত হয়েছি আফ্রিকার বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দেখে। স্বর্ণপ্রসবিনী আফ্রিকা কোন্ সুদূর অতীত হতে যুগে যুগে বিদেশী অতিথিকে আকর্ষণ করছে। আজও তার শেষ হয়নি। তুলা, গম, টিন, সোনা, শুক্‌নো মাছ এমন কত বিচিত্র দ্রব্য বিদেশে নিত্য চালান যাচ্ছে। প্রভূত অর্থাগম হচ্ছে, কিন্তু সে অর্থ বিদেশীর স্ফীত পকেট স্ফীততর করছে। ওখানকার বন্দরের কুলিরা যা আয় করে এদেশের অনেক কেরানীও তা পায় না। দীর্ঘকাল আফ্রিকার অভ্যন্তরে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে ঘুরে আমি ওদেশের আদি ও সত্যকার মানুষ যারা তাদের অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। সুদূর নিগ্রো পল্লীর দীন কুটিরে এক ঘরে তাদের সঙ্গে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি। উলঙ্গ নগ্ন নিগ্রো নারী-পুরুষের যে সহজ সংস্কার, সংযম ও স্নেহ দেখেছি তা পোষাকে সভ্য মানুষের মধ্যেও বিরল। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম অভিজ্ঞতার বিষয় বলছি।

কেনিয়ার নিকুরু সহরের কাছাকাছি এক নিগ্রো কুটিরে একবার অপরাহ্ণে গিয়ে উঠলাম। কুটিরের সামনে কয়েকটা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছিল।

একটি হিন্দুমন্দিরের সম্মুখে লেখকের সহিত আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ

আমাকে দেখে অবাক হয়ে তারা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বড় কাউকে না দেখে আমি ইতস্ততঃ করছি, এমন সময়ে গৃহস্বামী সস্ত্রীক বাজার করে ফিরলো। আমি আশ্রয়ের কথা বলতেই সাগ্রহে রাজী

হয়ে গেল। দেখলাম, পশ্চিমে সভ্যতার হাওয়া এদের গায়েও লেগেছে। পুরুষটির কোট-প্যাণ্ট পরা আর মেয়েটির গাউন-পরা। কিন্তু আশ্চর্য্য, বাড়ীতে ঢুকেই একরকম টানা-হিঁচড়া করে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পোষাকগুলো খুলে যেন বিরক্ত হয়েই এখানে-ওখানে ছুঁড়ে ফেললো। এই-ই তাদের স্বভাব। পোষাকটা তাদের ধাতুসহ নয়,—

গুজরাটি নৌকা:
স্মরণাতীত কাল হইতে এইরূপ নৌকার সাহায্যে ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে বাণিজ্য-যোগাযোগ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে

আরোপিত যে এটা বেশ বোঝা যায়। শেষ পর্য্যন্ত উদম উলঙ্গ হয়ে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস খেতে লাগলো। ছেলেমেয়েগুলো বাপ-মাকে ঘিরে ধরলো। নগ্নের এ হাটে মনে হোল আমিও উলঙ্গ হয়ে বসে যাই। কিন্তু সভ্য মার্জ্জিত রুচি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো।

১৯৩৭ সালের ১৯শে নবেম্বর আমি আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে পৌঁছি এবং ১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ্চ কেপটাউন হতে আফ্রিকা ত্যাগ করি। আফ্রিকায় নানা দেশের লোক সমাগম হয়েছে। এরা সাধারণতঃ সহরে, বন্দরে এবং ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে। এ সব স্থানে পরকীয় আচার-ব্যবহার ও সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। তা ছাড়া একটা মিশ্র জাতি গড়ে উঠেছে যারা না আরবী, না সাহেব, না ভারতীয়। দু'একটা স্থান ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা আজ শ্বেত জাতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এদের ভোগের উৎকট লালসা আফ্রিকা-বাসিদের শিক্ষা-দীক্ষাবঞ্চিত করে বিমূঢ় অজ্ঞান রাখার ব্যবস্থা উদাসীন পর্য্যটকেরও চোখ এড়ায় না। রং-এর কৌলিন্য এত বেশী যে, সেখানে অশ্বেতকায় মানুষ বলেই গণ্য হয় না। এ অপমান আমাকে আফ্রিকা-ভ্রমণে সব চেয়ে ব্যথা দিয়েছে। কিন্তু তবুও জানি, এরা ঘটনাচক্রে আফ্রিকায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এবং প্রতিক্রিয়ায় কালের ফুৎকারে আবার তেমনি উবেও যাবে। আফ্রিকার সত্য পরিচয় এই শ্বেত বা মিশনারী সভ্যতা নয়, পরন্তু আফ্রিকার প্রাণ অমিশ্র আদিম অধিবাসী যাদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টাই আমি অন্তর দিয়ে করেছি।

আফ্রিকার দুর্গম স্থানে সাইকেলে যেতে যেতে সন্ধ্যে হলেই আমি সাধারণতঃ নিগ্রো কুটিরেই আশ্রয় নিতাম। আর তা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। কিন্তু কোন দিন কোনও কুটির হতে আমি নিরাশ হয়ে ফিরিনি। অধিকাংশ সময়ে আমি পথ-প্রদর্শক হিসাবে নিগ্রো তরুণদের সঙ্গী করে নিয়ে চলেছি। টাকার দরকার হলে বড় বড় সহরে ও বন্দরে গিয়ে ভারতীয়দের সাহায্য নিয়েছি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেয়েছিও। পথ-চলার মত নিগ্রো ভাষা একরকম শিখে ফেলেছিলাম। মাদ্রাজ প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে এদের ভাষার যেন মিল আছে। একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করলে এদের ভাষা যেন ভারতীয়দের কাছে খুব অপরিচিত নয়। মাদ্রাজী নামের সঙ্গেও এদের নামের অনেকটা মিল আছে। রেবেকা নামটি নিগ্রো মেয়েদের মধ্যে খুব প্রচলিত। মুরাপ্পা নামক একটি তরুণ নিগ্রোর সঙ্গে

আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। ভারী সরল ও আপনহারা অমায়িক ছিল মুরাপ্পা, আজও তার কথা মনে হয়।

আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্য ভ্রমণ-সময়ে কয়েক রকম নিগ্রো লক্ষ্য করলাম। অধিকাংশই শিম্পাঞ্জীর একটু উচ্চতর সংস্করণ। মাথার চুলগুলো ভেড়ার লোমের মত কুকড়ানো। আবার কতকগুলো নিগ্রো চোখে পড়লো যাদের চোখ-মুখ-নাক প্রায় আমাদেরই মত। চুলগুলো সাধারণ নিগ্রোর মত তেমন কুকড়ানো নয়। এদের একটু অসাধারণত্ব আছে। মাদ্রাজের পার্ব্বত্য জাতের মত অনেকটা দেখতে। এরা সাধারণ নিগ্রোর মত সরল নয়, গম্ভীর এবং চিন্তাশীল বলে মনে হয়। অসম্মানজনক কোন কথা এরা সহ্য করতে পারে না। কথা একটু বেতালা হলে এরা জবাব দেয় না। অবশ্য নিগ্রোমাত্রেই যখন কোন কিছু অপছন্দ করে তখন তার প্রতি পিছু ফিরে থাকে। পিছু ফিরাটাই তাদের বিরূপতার চিহ্ন। কোন কোন নিগ্রোর শরীর এত রোমশ যে বনমানুষ বলেই ভুল হয়। সত্য মিথ্যা জানি না, মুরাপ্পা আমার কাছে গল্প করেছে যে, জঙ্গলের ধার থেকে কখন কখন বনমানুষ নিগ্রো মেয়ে চুরি করে নিয়ে যায়। মেয়েটিকে খুব সোহাগ যত্ন করে। এইরূপ সহবাসের ফলে অনেক সময়ে সন্তানও জন্মে থাকে। সহবাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেয়েটি বনমানুষকে চড়-চাপড় মারলেও সে উত্যক্ত হয়ে অনিষ্ট করে না, বরং মাথা নিচু করে পাশ ফিরে থাকে এবং নানা ভঙ্গী করে ভালবাসা দেখায়। কিন্তু মেয়ে বনমানুষ ঠিক এর উল্টোটা করে থাকে। অর্থাৎ মেয়ে বনমানুষ যখন পুরুষ নিগ্রোকে ধরে নিয়ে যায় তখন যথেচ্ছা সহবাস করার পর পুরুষ মানুষটিকে মেরে গভীর জঙ্গলে খুব উঁচু গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। কিছুদিন পরে গায়ের মাংস পচে-গলে শুধু কঙ্কাল গাছের ডালে ঝুলতে থাকে। জঙ্গল দিয়ে চলার সময়ে এ দৃশ্য দেখার আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার চোখে পড়েনি।

নিগ্রোরা সাধারণভাবে খুব হিংস্র প্রকৃতির নয়। বিশেষ উত্যক্ত না হলে প্রাণহানি করে না। আমি দিনের পর দিন কত জায়গায় কেবলমাত্র নিগ্রোদের মধ্যেই রাত্রিবাস করে পথ চলেছি, কিন্তু কখনও এরা আমার অনিষ্ট করেনি বা একা পেয়ে সঙ্গের জিনিষপত্রও লুটপাট করেনি। চীনে রেলছাড়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে এত নির্ব্বিঘ্নে চলার কল্পনাও করা যায় না। মঙ্গোলিয়ান রক্তে উগ্রতা বেশী। নিগ্রো রক্তে এবং সভ্যতায় ভারতীয় নম্র প্রভাব যে প্রচুর, এটা আমার অভিজ্ঞতা। এদের মন এবং মস্তিষ্ক আজও অনুন্নত। শারীর বৃত্তির প্রেরণা-বশে এদের চলাফেরা, কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত। বিবাহের

মধ্য আফ্রিকায় এখনও জেব্রার দ্বারা শকট চালিত হইয়া থাকে

পূর্ব্বে নারী-পুরুষের মধ্যে অসংযমী হওয়া এদের মধ্যে ভয়ানক দোষনীয়। সভ্য মানুষের মত মনটা এদের তত ক্রিয়াশীল নয় বলেই বোধহয় রক্ত-মাংসের ক্ষুধায় সময়-অসময়ে এরা এত কাতর হয়ে পড়ে না। আমার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করছি।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত জাম্বোবী ধ্বংস স্তূপ দেখতে যাবার পথে সন্ধ্যায় এক নিগ্রো কুটিরে আশ্রয় নিলাম। সাধারণতঃ বাড়ী বলতে এদের একখানা মাত্র পর্ণ কুটিরই বুঝায়। আমাদের দেশের গোলা বা মড়াইয়ের মত গোল ঘর—খড়ে ছাঁওয়া, মাটিলেপা বাঁশের বেড়া। এরা গোবর ব্যবহার করে না, মাটিগুলায় ঘর-লেপা কাজ

করে। শিক্ষিত ধনী নিগ্রোদের অবশ্য চার চালা ঘরও দেখা যায়। একই ঘরে সব কাজ চলে। আহারাদি শেষ করে কুটিরের এক পাশে আমার নিজস্ব বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই রাতভোর। ভোরে উঠেই চোখে পড়লো নগ্ন তরুণ-তরুণী আমার দু'গজ দূরে পাশাপাশি সুখনিদ্রায় মগ্ন। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে সাইকেলটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলাম এবং পাম্প ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম। আর কেবলই এই নিগ্রো-জীবনের কথা

সামুদ্রিক ঝিনুক ও কাঠের মালায় নিগ্রো নারীদের প্রসাধন-সজ্জা

মনে হতে লাগলো। লজ্জা সঙ্কোচের আব্‌ডাল এরা দিতে শেখেনি বলেই বোধহয় স্বভাবপ্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে এরা অপকর্ম্মও তেমন করতে পারে না। আচ্ছা খানিকটা বেলা হলে এরা ঘুম্ থেকে উঠলো। আমি কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, তারা অবিবাহিত; তবে তাদের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। শীঘ্রই বিয়েও হবে। আমি প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করলাম যে, বিবাহের পূর্ব্বে তাদের সন্তান হতে পারে কি না। আমার কথা শুনে জিভ্ কেটে উত্তর দিলে, কক্ষোনো না। আমি তো অবাক্। তাদের কথায় আমার বিশ্বাস হ'ল। শুধু মনে হ'ল, এ সংযম সভ্য সমাজের মার্জ্জিত তরুণ-তরুণীর পক্ষে বুঝি অসম্ভব। বিহঙ্গমের মত মুক্ত জীবন এদের। প্রবৃত্তির দিক দিয়ে মানসিক অপরিপুষ্টতা ও নগ্নতা এদের অনেকখানি সহজ করে তুলেছে। এমন কি বিবাহিতা নিগ্রো নারীও নগ্ন অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে ঘোরাফিরা করে থাকে। কোন পুরুষ অসদভিপ্রায়ে তাদের প্রতি কু-নজর দিলে, সে হাঁটুগেড়ে বসে জানিয়ে দেয় যে সে বিবাহিত। দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গ করতে বিবাহিত নারীর সহজ সংস্কারে বাধে। অবশ্য প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা যে অনাচার করে না, এমন নয়। কিন্তু তা সহর-বাজারের সন্নিকটেই বেশী। বিদেশীর দ্বারা এদের মধ্যে গণোরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এক-রকম লতাগাছের দ্বারা এদের গণোরিয়া রোগ অব্যর্থভাবে সারাতে আমি দেখেছি।

এদের জীবনের প্রয়োজন খুব কম। এত কম যে তা মিটাতে স্নায়ু ও পেশীকে দিন রাত উত্তেজিত করতে হয় না। তাদের প্রধান খাদ্য সর্ব্বত্রই প্রায় এক রকম। মূলোর মত দেড় কি দুই ফুট লম্বা এক রকম মূল জাতীয় জিনিষ শুকিয়ে হামানদিস্তাতে (উদুখল) গুঁড়ো করে রাখে। তার সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে কুঁচানো মাংস প্রায় সম পরিমাণে মিশিয়ে একটি মাটির পাত্রে অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করে আর অবিরাম একটা কাঠির সাহায্যে ঘোঁটে। জল শুকিয়ে মণ্ডার মত হলে নাবিয়ে হাঁড়ির মুখ ঢেকে রাখে। সঙ্গে আনুসঙ্গিক আর কিছু প্রায়ই থাকে না। কোথাও কোথাও নুনমাত্র ব্যবহার করতে দেখেছি, তাও সর্ব্বত্র নয়। সাধারণতঃ এরা গোমাংসই বেশী ব্যবহার করে। পাঁটা বা ছাগীর মাংসের চেয়ে আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানের গোমাংসই বেশী সুস্বাদু এবং নরম। ছাগ-মাংস প্রায়ই কেমন একটা বিশ্রী গন্ধযুক্ত এবং ছিব্‌ড়া হয়ে থাকে। গরুর রক্ত, মাংস এবং দুধ সবই এদের প্রিয় খাদ্য। বহু স্থানে দেখেছি, এরা দুধ দুইতে জানে না—বাঁটে মুখ লাগিয়ে চুষে খায়। মাটির যে কলসী ও হাঁড়ী নিগ্রোরা ব্যবহার করে তাও প্রায়ই আমাদের দেশের মতই। তবে সাদাসিদে—অলঙ্কারবাহুল্য কলসীতে নাই।

নিগ্রোরা সঙ্গীতপ্রিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একতারা বাজিয়ে চলেছে। তারের ব্যবহার খুব কম, মৃত পশুর শুকনো নাড়ীর একতারা। আদিম ধরণের টোকা দিয়ে একঘেয়ে বাজনা। পুষ্পলতার চেয়ে ঝিনুক-কড়ির মোটা অলঙ্কারের এরা সজ্জা করতে ভালবাসে। উল্কির ব্যাপক ব্যবহার এদের মধ্যে প্রচলিত। প্রসাধনে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অনেক স্থানে দেখেছি, মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ছোটকাল থেকে নীচের পাটির সম্মুখের

শিকারীবেশে নিগ্রো পুরুষ

চারটে দাঁত উপ্‌ড়ে ফেলে। এটা নাকি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। অপ্রাকৃত শক্তিতে এরা বিশ্বাস করে, কিন্তু পূজা-অর্চনা করতে এদের কখনও দেখিনি।

আফ্রিকায় যেমন মরুভূমি আছে তেমনি সুজলা সুফলা সবুজ পাহাড়-জঙ্গলও আছে। সর্প, সিংহ এবং হাইনা বেশী চোখে পড়ে। সিংহ খুব বেশী হিংস্র বলে আমার মনে হয় না। কেনায়ার নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্য দিয়া একাকী পথ চলতে চলতে অদূরে সিংহীর সাক্ষাৎ একাধিকবার পেয়েছি কিন্তু আমার কোন অনিষ্ট করেনি। একবার একটা পাহাড়ে রাস্তা দিয়া আমি ও মুরাপ্পা চলেছি। পথিমধ্যে এক জায়গায় বসে মাছ খেয়ে টিনটা (Tin fish) ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তিন মিনিটও হয়নি, গন্ধে গন্ধে প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা ধরে এল এবং সরু লক্‌লকে জিভ দিয়ে টিনটা বোধহয় চাটতে লাগল। বিষধর সাপ—ভীষণ দর্শন! মারিবার জন্য মুরাপ্পা হিংস্র হয়ে উঠলো। নিষেধ করলাম এবং সরে পড়লাম।

আফ্রিকার কোন কোন স্থান এত খারাপ যে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে জ্বর উঠে যায়। চার পাঁচবার আমি 'ইয়েলো ফিভারে' (yellow fever) ভুগেছি। আমাদের দেশের কুট্‌কীর মত একরকম অদৃশ্য পোকা আছে, ভীষণ সাংঘাতিক এর কামড়। সঙ্গে সঙ্গেই সারা শরীর চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠে এবং জ্বর আসে। এইজন্য আমি সর্ব্বদা প্রচুর কুইনিন, এসপ্যারিন ও ফ্রুট সল্ট সঙ্গে রাখতাম। আবার মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানেরও অভাব

এই পাহাড়ের উপরের মন্দির প্রায় হিন্দু-মন্দিরের সদৃশ্য : আফ্রিকা

নাই। ভিক্টোরিয়া হ্রদকে কেন্দ্র করে কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিয়াকা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ অপেক্ষা কোন অংশে কম ঐশ্বর্য্যশালী নয়। সমুদ্রের মত বিশাল হ্রদ, অসংখ্য নদী-নালা। সবুজ পাহাড় এই সব দেশকে মনোহারী করে তুলেছে। আমার মনে হয়, এক মাত্র দক্ষিণ রোডেশিয়ার দ্রষ্টব্যসমূহ বিচারপূর্ব্বক দেখতে অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটকের ছয় মাসের কম লাগবে না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অন্যতম অত্যাশ্চর্য্য ভিক্টোরিয়া

ফল্‌স্‌, মেটাপো হিল্‌স্‌, ইনিয়াংগা পর্ব্বত প্রভৃতি দর্শকের অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও নয়ন সার্থক করে। এই প্রবন্ধে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আফ্রিকায় বহু গিরিগুহা, বহু একদা বিরাট্ নগরীর ধ্বংসস্তূপ একটা বিশাল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বুকে ধরে আজও বর্ত্তমান। ইউরোপ যখন অজ্ঞান আঁধারে ডুবে ছিল তখন কত বড় সভ্যতা যে আফ্রিকায় আলো বিতরণ করেছিল, তা এই সব ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায়। নিবিষ্ট হয়ে এই সব ধ্বংস স্তূপের পাশে বসে আমি ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছি। মনে গর্ব্ব অনুভব করেছি যে, কত বড় প্রভাবশালী ছিল সেই স্বাধীন প্রাচীন ভারত! সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও পেয়েছি যে, ভারত কি ছিল আর কি হয়েছে! আধুনিক ইউরোপ বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বিস্মৃতপ্রায় এইসব দ্রষ্টব্যকে জগতের সামনে ধরেছে। ধরেছে সত্য, কিন্তু বিকৃত করে ধরেছে। পরাধীন নেটিভ ভারতবাসী আর কালো কাফ্রী নিগ্রো যে একদিন সত্যই বড় ছিল, সভ্য ছিল, এ কথা তাদের প্রাণ বুঝলেও মুখ ফুটে বলতে বাধে। আমি পণ্ডিত, নৃতত্ত্ববিদ্ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নই, একজন নগণ্য মূর্খ ভূপর্য্যটক মাত্র—মনের আনন্দে পথ-চলা আর দেখাই আমার কাজ। কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত, দেশের স্বাধীনতা-কামী তরুণ যাঁরা বিলাতী শ্লোগান আর পশ্চিমের ইজম্ এবং মতবাদ নিয়ে ঘরের কোণে বসে মাথা ঘামায়, তাদের কর্ত্তব্য এই সব দেখা আর গবেষণা করে অতীত ভারতের গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করা। তবেই না বর্ত্তমান তারই উপর নিজেকে গড়বে এবং আশা ও উৎসাহ পাবে।

এবার আমি আফ্রিকা-ভ্রমণের এই ভূমিকাটুকুই শুধু করে রাখলাম। বারান্তরে আমার "আফ্রিকা-ভ্রমণ" প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখা ও বিচারের মধ্য দিয়া যতটুকু অনুভব করেছি তারই ইঙ্গিত দিব।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মোৎসব

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

২৫শে বৈশাখ আজ সমগ্র জাতি সশ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়া থাকে। এই তারিখে দেশের নানাস্থানে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। পারিবারিক তিথি-স্মরণের গণ্ডী ছাড়াইয়া কেমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম উহা উৎসবে পরিণত হইল, এই নিবন্ধে তাহাই বলিব। সে ছিল রবীন্দ্রের ৫০শতম জন্মতিথি। এই ৫০শতম জন্ম-তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রথম প্রকাশ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই আমি তাহাকে প্রথম জন্মোৎসব বলিয়া অভিহিত করিতেছি

বীরভূমের বালিকঙ্করময় দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের বুকে শালবীথিবেষ্টিত মহর্ষির প্রিয় সাধনভূমি শান্তি-নিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা তখন ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। শান্তিনিকেতনের অনাড়ম্বর শান্তশ্রী সেদিন যেন তপোরত ছিল। পাকা ভীত, মাটির দেওয়াল আর খড়ে-ছাওয়া হেথা-হোথা খানকয়েক আবাসগৃহ ছিল শান্তিনিকেতনের ঐশ্বর্য্য। ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, বাসগৃহ সবই এই সব কুটিরেই অবস্থিত ছিল।

সেই সময়ে প্রথম দর্শনেই বিদ্যালয়ের সেবা করিবার আমার সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ নিজ হইতেই করিয়া দিলেন। সে-যুগের আনন্দ-স্মৃতি আজও তেমনিই অম্লান হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আজ বিশ্বভারতীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া আচার্য্য-ছাত্রেরা হৃদয়-বিনিময়ের মধ্য দিয়া যে সম্বন্ধের জগৎ সে-সময়ে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাই হইতেছে আজিকার বিশ্ব-ভারতীর বিশাল ইমারতের বনিয়াদ! একসঙ্গে হাসি-খেলা-নৃত্য-গীত, নাওয়া-খাওয়া, বনভোজন, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া আনন্দের অফুরন্ত মেলা বসিয়াছে। তমনি বৈশাখের একটি দিনে ছাত্র-অধ্যাপকেরা মিলিয়া স্থির করিল যে, গুরুদেবের জন্মোৎসব করিতে হইবে। সেই বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সঙ্কল্পই হইল প্রকাশ্যোৎসবের সূচনা। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর

উৎসবের কার্য্যসূচীও স্থির হইল। কিন্তু প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইল জলের অপ্রচুরতা। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই বিদ্যালয়ের কূয়াগুলির জল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিত। এমন কি বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটিও নির্ভর করিত কূয়ার জলের উপরই। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের উর্দ্ধে কখনও বিদ্যালয় সেইজন্য খোলা থাকিত না। কিন্তু উৎসব উদ্‌যাপন করিতে হইলে ২৫শে বৈশাখ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ও খোলা রাখিতেই হইবে। তাহা ছাড়া বাহির হইতেও অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইবে। এত লোকের স্নান ও পানীয় জল সরবরাহই যে কি করিয়া সম্ভব হইবে, তাহাই হইল প্রধান সমস্যা। বীরভূম বিশেষ শান্তিনিকেতনের আবেষ্টনী বাংলা দেশের মধ্যে হইলেও ইহার আব্‌হাওয়া অনেকটা পশ্চিমেরই মত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে চারিদিক্‌ ঝাঁ-ঝাঁ খাঁ-খাঁ করিত। আগুনের হল্কা ও গরম বাতাস অসহ্য মনে হইত। সেই সময় হইতে বর্ত্তমানে শান্তি-নিকেতনের প্রাকৃতিক আব্‌হাওয়া কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অবশেষে সকলে মিলিয়া বুদ্ধি স্থির করা গেল যে, স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজার জল সঙ্কোচ করিতে হইবে। বাঙালী জলের অপচয় অধিক করিয়া থাকে, জল ব্যবহারে আমাদের হিসেবী হইতে হইবে। অবশ্য যদি দৈবকৃপায় বৃষ্টি হইয়া যায় তো আর জলের জমা-খরচ লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকিয়াও ইন্দ্রদেবতার কৃপাবারি আর বর্ষিত হইল না। ফলে ২৫শে বৈশাখের কাছাকাছি জলের পরিমাণ জনপ্রতি ছয় মঘে আসিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে সকলে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথকে ধরিল যে, উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহারা একটা অভিনয় করিতে চাহে। তিনিও সায় দিলেন। ঠিক হইল, তাঁহার রচিত "রাজা" নাটকের অভিনয় হইবে। কে কোন্‌ ভূমিকায় অভিনয় করিবেন, তাহাও স্থির হইয়া গেল। সে সময়ে অভিনয়ে ছাত্রেরাই সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের পার্ট করিত। এখনকারমত রঙ্গ-মঞ্চে তখন ভদ্রঘরের মেয়েদের নামিবার রীতি তেমন ছিল না। অবশ্য ঠাকুর পরিবারে পারিবারিক অভিনয়ে মেয়েরা সবে যোগ দিতে সুরু করিয়াছেন। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম, "মায়ার খেলা" অভিনয়ে তাঁহার মা নামিয়াছিলেন।

প্রতি সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের দোতালার খোলা বারেন্দায় চলিতে লাগিল আমাদের তালিম। রবীন্দ্রনাথ

যখন নাগরিক দলের গ্রাম্য কথাবার্ত্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গী দেখাইতেন তখন আমাদের মধ্যে উঠিত একটা হাসির হিল্লোল। সবিস্ময়ে ভাবিতাম, রবীন্দ্রনাথের বিরাট্‌ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এই সব হালকা হাস্য রস কি করিয়া

সম্ভবপর হয়! প্রত্যেক অভিনেতার স্বাভাবিক ভাবভঙ্গী, এবং বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেওয়ার সময়ে দেখিতাম, কী অসাধারণ ধৈর্য্য তাঁহার। মহড়া দেওয়ার কাজে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। দীনেন্দ্রনাথের ছিল তাল-মান, রসবোধের এক অসাধারণ শক্তি। তাঁহার গুরুগম্ভীর সুললিত কণ্ঠের ঝঙ্কার সকলকেই মুগ্ধ করিত। রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথ, দাদা-নাতীতে জমাট ভাবটা ছিল বিশেষ উপভোগের বিষয়।

এই সব লইয়া সেই সময়ের প্রতিটি সন্ধ্যা আমাদের পরম লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিনের অসহ্য গরম, জলকষ্ট প্রভৃতি সব দুঃখ নির্ব্বিকারে উপেক্ষা করিয়া আমরা এই সন্ধ্যার আনন্দ-আসরের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতাম।

এই সময়েই গভীর নিশীথে একলাটি আপন মনে শালবিথীকায় পায়চারী করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথকে পঞ্চমে কণ্ঠ তুলিয়া গান করিয়া ঘুরিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। একটি রাত্রির কথা বিশেষভাবে মনে জাগে। সে রাত্রিটা ছিল একেবারে নিঝুম ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরা। হাওয়াতে ছিল শালফুলের সৌরভ। রবীন্দ্রনাথ গাইতেছিলেন, "জাগ ওরে জাগ হৃদয় নীরব রাতে..."

সমস্ত স্তব্ধ বিশ্বপ্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব পটভূমিকায় রবীন্দ্রের মধুবর্ষী কণ্ঠ সেদিন আমার হৃদয়ে যে স্পন্দন তুলিয়াছিল, তাহা আজও থামে নাই।

ক্রমে বহু আকাঙ্খিত উৎসব আশ্রমদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরাকালে আশ্রম উৎসবের যে বর্ণনা মনের মধ্যে একটা ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার আভাষ পাইলাম রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মোৎসবে। ধুপ-ধুনা-চন্দন-গন্ধে বাতাস সুরোভিত। আম্রকুঞ্জ, আলপনা, পূর্ণকুম্ভ, পল্লব পুষ্পে সুশোভিত উৎসব-প্রাঙ্গনে চন্দন-চর্চ্চিত উপবিষ্ট সৌমমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ। হৃদয় নিঙাড়িয়া ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া সকলে সমবেত। দীর্ঘ জীবন ও কল্যাণ কামনা করিয়া সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র বন্দনা উঠিল। উদগান মুখরিত শান্তিনিকেতন সেদিন স্মরণ করাইয়া দিল— প্রাচীন ভারতের তপোবন আর ঋষির কথা। একটা নিবিড় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রাতঃকালীন উৎসব সমাপ্ত হইল।

সন্ধ্যায় 'রাজা' অভিনয় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। আশ্রমবাসী ছাড়াও আশপাশের বহু লোক দর্শক হিসাবে এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুর দাদার ভূমিকায় অভিনয় করিলেন। প্রধান স্ত্রী চরিত্র অভিনয়ে সাফল্যের সহিত আংশ গ্রহণ করিলেন পরলোক-গত উদীয়মান সাহিত্যিক অজিত চক্রবর্ত্তী ও সুধীরঞ্জন দাস (বর্ত্তমানে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার)। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে বাউলের দলে আমাকেও অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

যে সব অতিথি অভ্যাগত বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ছাত্র, অধ্যাপকদের পরিচর্য্যায়, উৎসব অনুষ্ঠানে এবং অভিনয়ে একটা নূতন ভাব ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা এবং তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির স্বাদে আকৃষ্ট হই নাই, কারণ তখন তাঁহার সাহিত্যের স্বাদ তেমন কিছু উপলব্ধি করিয়া উঠিতেও পারি নাই। তবে অনুভব করিয়াছিলাম তাঁহার অতিমানবীক এক আকর্ষণ শক্তি যাহা আজও আমায় আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

শেষ কবি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ফুটে উঠে ফের ঝ'রে যাবে ফুল, আলো নিভে যাবে জলে,
চিরস্মরণের মর্য্যাদা তারে কে দিবে কৌতুহলে?
তুমি ছিলে যবে, মনে করেছিনু চিরদিন যাব পেয়ে!
আজ শুধু ভাবি, কতখানি গেল আকাশের দিকে চেয়ে।

আশী বছরের জীবন বিয়োগে মনে হয়, প্রিয়তম
ভালো ক'রে পাওয়া হলনা, এ যেন অকাল মৃত্যু সম!
সব চেয়ে বড় কথা এ, বন্ধু শেষ কবি মানুষের
সমাপ্তি হ'ল, এর পরে চিররাত্রি যে দুঃখের।

পনেরো

মোটরের ভীড়ে পথ-চলা কঠিন—বিদ্যুৎ ফুট-পাথের ওপরে উঠ্‌লো—অজস্র পিঁপ্‌ড়ের সারের মতো গাড়ীগুলো লাইন-বন্দীভাবে এগিয়ে চ'লেছে। ট্রাফিক্‌ পুলিশটা যা হোক হাত তুলেছে এবার—বিদ্যুৎ 'ক্রস্‌' করবার জন্যে পীচের রাস্তায় নাম্‌লো।

পিছন থেকে মনে হোল কে যেন ডাক্‌ছে। তাকেই ডাক্‌ছে নাকি? —বিদ্যুৎ মুখ ঘোরালো। একটা লোক, চাপরাসী, ছুট্‌তে ছুট্‌তে এগিয়ে এলো—বল্‌লে "বাবু, আপনাকে ডাক্‌ছেন ওঁরা—"

চাপরাসীর আঙুলের অনুসরণ ক'রে বিদ্যুৎ পিছনের দিকে চাইলো—একটা বড়ো প্রাইভেট্‌ কার ফুট্‌পাথের পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর তার ভেতর থেকে হরনাথ বাবু মুখ বাড়িয়ে আছেন—বিদ্যুৎকে হাত ছানি দিয়ে ডাক্‌লেন তিনি এবার।

প্রথমে কী যে করা উচিত, বিদ্যুৎ ঠিক বুঝ্‌তে পারলো না, তারপরে যন্ত্রচালিতের মত সে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলো, কাছে এসে দুই হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলো।

হরনাথবাবু ততক্ষণে মোটরের দরজা খুলে দিয়েছেন, বল্‌লেন, "এসো, ভেতরে এসো, তোমার সংগে অনেক কথা আছে বিদ্যুৎ!"

বিদ্যুৎ কথা বল্‌তে পারলো না—যেমন এসেছিলো—ঠিক্‌ সেই ভাবেই গাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো, ওপাশে রেবা ব'সে আছে। বল্‌লো, "আসুন—আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হ'বে এখন—"

"এখুনি?" বিদ্যুৎ এতক্ষণে এই একটা প্রশ্ন করতে পারলো।

"হ্যাঁ, এক্‌খুনি! —মথুরাম—চালাও!"

গাড়ী ছেড়ে দিলো।

দু'পাশে স্রোতের মত গাছ আর বাড়ীগুলো পার হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো—মোটরের শুধু একটু শোঁ শোঁ শব্দ, বিদ্যুৎ চোখ বুজ্‌লো।

প্রথমে হরনাথ বাবুই কথা কইলেন, বল্‌লেন, "তোমাকে আবার এইভাবে পাবো, তা ভাবিনি—রেবাই প্রথমে দেখেছিলো—আমার পোড়া চোখ একেবারেই গিয়েছে, ওই আমাকে বল্‌লে"—হরনাথবাবু একটু চুপ করলেন।

"আচ্ছা লোক আপনি"—এবার রেবা আরম্ভ করলো, "কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একদিন সকালে দেখি একেবারে উধাউ—কি ব্যাপার? একটা খবরওতো মানুষ মানুষকে দিয়ে যায়! আমরা তো ভেবে অস্থির! জানেন? আমাদের ইউরোপে যাওয়ার প্রোগ্রাম স—ব আপনার জন্যে নষ্ট হ'য়েছে?"

"আঃ—থাম্‌ না" হরনাথবাবু সামান্য একটু বাধা দিলেন, "মানুষের কখন যে কী কাজ পড়ে তা বলা যায়? —হয়তো তখন বলবার সুবিধেই হ'য়ে ওঠেনি।—"

"না—না" বিদ্যুৎ বাধা দিলো, "মানে একটা দরকারেই এসেছিলাম—আপনাদের বলার ইচ্ছেও ছিলো—কিন্তু, —কিন্তু একটু সংকোচ বোধ করছিলাম—সেইজন্যেই—"

"থাক্‌গে—ও যেতে দাও, তুমি ও যেমন!" হরনাথ বাবু একটা হাই তুল্‌লেন, "তারপরে, এখন কোলকাতাতেই আছো তো?"

বিদ্যুৎ মাথা নীচু ক'রে ছিলো, বল্‌লে, "হ্যাঁ—থাক্‌তেও হ'বে কিছুদিন!"

"ও", হরনাথবাবু একটা সিগার বের করলেন। "তোমার মা তো প্রথম দিন কয়েক খুব কান্নাকাটী করলেন, বল্‌লেন, 'রেবাটাই হয়তো তোমায় কিছু বলেছে, তুমি আমাদের ওপরে রাগ ক'রে চ'লে গেছো, ও দুষ্টুটা সব পারে—ওকে নিয়ে যে কি করি!' তোমার মা তো"—হরনাথবাবু কথা শেষ না ক'রেই 'সিগার'টা জ্বালালেন।

রেবা বাধা দিলে, বল্‌লে, "হ্যাঁ, মার তো যতো সব ওই রকম ভাব্‌না—নিজেই নিজের জন্যে কষ্ট পান, বল্‌লাম, 'আমি কিছু বলিনি মা,—কোনো কথা বলিনি,

তিনি তাঁর নিজের দরকারে চলে গেছেন—তার আমি কি জানি বাপু ?'—কিন্তু আমার কথা কে শোনে !"

হাওয়ায় উড়ে-আসা চুলগুলিকে মুখের ওপর থেকে রেবা সরিয়ে দিলে, হুহু ক'রে মোটর এগিয়ে চ'লেছে—বিদ্যুৎ আবার মাথা নীচু করলো।

"এবার কিন্তু" রেবা বিদ্যুতের দিকে চেয়ে আবার আরম্ভ করলো, "এবার কিন্তু আর আপনি পালাতে পারছেন না—কি এমন অপরাধ করলাম আমরা আপনার কাছে ?"

বিদ্যুৎ হাসলো, বললে, "না, না, কী যে বলছেন ! অপরাধ আবার কি! আমার—জানেন তো, ও আমার একটা খেয়াল"—বিদ্যুৎ বিপর্য্যস্ত হ'য়ে কোন রকমে কথা কটা উচ্চারণ করলো।

এইবার মোটর একটু বাঁক নিলো, তারপরেই হঠাৎ গতি এলো মন্থর হ'য়ে—আর বিদ্যুৎ চেয়ে দেখলো, একটা বিরাট্ গেটের মধ্যে দিয়ে তাদের গাড়ী ভেতরে ঢুকছে।

"আসুন—" রেবা একেবারে মোটর থেকে প্রায় লাফিয়ে নীচে নেমে এলো, হরনাথবাবু আস্তে আস্তে নামলেন, বিদ্যুতের একটা হাত ধ'রে রীতিমত টানতে টানতে রেবা এগিয়ে গেলো—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চীৎকার ক'রে উঠলো, "ওমা, দেখে যাও—দেখে যাও কাকে ধ'রে এনেছি ! —ওমা— !"

মহামায়া ঘরের ভেতরেই ছিলেন—সকাল থেকে শরীরটা তাঁর ভাল নেই, আজ কয়েকদিন এই রকমই যাচ্ছে, কয়েকদিন থেকেই বাতে তাঁকে অত্যন্ত নিদারুণ ভাবে পংগু ক'রে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে থেকেই অতি কষ্টে তিনি বললেন, "কাকে এনেছিস্ রে ? এখানে নিয়ে আয়, আমি উঠতে পারছি না !"

সেই ভাবেই বিদ্যুতের হাত ধ'রে রেবা এসে একেবারে ঘরের ভেতরে ঢুকলো, "এই দেখো, কাকে এনেছি—"

মহামায়া দেয়ালের দিকে চেয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, দুজন দাসী তাঁর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি একেবারে তাড়াতাড়ি কোন রকমে উঠে ব'সলেন, বললেন, "কে ? বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ এসেছো ! মহামায়া খুসীতে একেবারে উছলে পড়লেন, "তুমি এসেছো তাহ'লে—"

বিদ্যুৎ এগিয়ে গেলো—মাথা নীচু ক'রে তাঁর দুই পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলো।

"এসো এসো—থাক্, থাক্—বেঁচে থাকো, তোমার জন্যে যে আমি কতোদিন ভেবেছি বাবা, বসো ওরে ও সুধা"—মহামায়া একজন দাসীকে ডাকলেন, "ওই মোড়াটা এনে দেনা—দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ?"

"থাক্ না—আমি এই বেশ আছি", বিদ্যুৎ কোনো রকমে কথাটা উচ্চারণ করলো।

"না—না, আচ্ছা থাক্—তুমি আমার এখানে এসে ব'সো, এসো—"

রেবা মাথার বিনুনিটা দুহাতে ততক্ষণে খুলে ফেলেছে—জানলার ধারে গিয়ে গুন্ গুন্ ক'রে কি একটা গান গাইতে আরম্ভ করলো। বিদ্যুৎ খাটের একপাশে বসলো।

"হ্যাঁ, তারপরে কতোদিন যে ভেবেছি বাবা তোমার কথা, হঠাৎ তুমি চ'লে গেলে না ব'লে ক'য়ে, আমি তো ভেবে মরি—নিশ্চয়ই ওই হতভাগা মেয়ে তোমায় কিছু বলেছে—ওর কি আর কোনোকালে বুদ্ধিশুদ্ধি হ'বে ? ও এইভাবেই আমায় চিরটা কাল জ্বালাবে, জানিনা কতো পাপ যে করেছিলাম আর জন্মে"—গতজীবনের পুঞ্জীভূত পাপের প্রতিক্রিয়ায় মহামায়ার চোখে জল এলো—কোনোরকমে তিনি নিজেকে সামলালেন, বললেন, "তুমি রাগ করোনি তো বাবা ?"

এইবারে, বিদ্যুৎ কিছু বলতে পারবে আশা হোল, বললো, "না—না, আপনারা একেবারে অন্যরকম ভেবে নিয়েছেন। রাগ আমি কেন করতে যাবো—আপনারা আমায় তো চেনেন, আমি ঐরকমই, কখন যে কী খেয়াল হয়—বরং রাগ করাতো আপনাদেরই উচিত ছিল আমার ওপরে—"

"কি যে বলো—"মহামায়া এবারে সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন", আমরা কেন রাগ করবো ?—যাক্, এখন এখানেই আছ তো ?

"হ্যাঁ—" বিদ্যুৎ মাথা নীচু ক'রে উত্তর দিল।

"কোথায় ?" মহামায়া জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই তো রসারোডে—"

"ওখানেই তোমার মা, বাবা আছেন?"

"না, কেউ নেই—" একটু থেমে বিদ্যুৎ বল্‌লো, "মেসেই তো থাকি—"

"ও, তাহ'লে তো তুমি প্রায়ই আস্‌তে পারবে, এই তো কাছেই—হাঁ্যা, আজ কিন্তু আর তুমি ছুটী পাচ্ছো না এখান থেকে—"

"নিশ্চয়ই—" রেবা জান্‌লার ধার থেকে এগিয়ে এলো—"সেই রাত দশটা পর্য্যন্ত থাকতে হ'বে কিন্তু, বিকেলে আমরা 'মেট্রো'য় যাচ্ছি—'লাকি-নাইট' হচ্ছে, দেখেছেন কি ফিল্মটা?"

বিদ্যুৎ মাথা নাড়লো, বল্‌লে, "না দেখিনি, কিন্তু আজ থাক্ না—আরেক দিন না হয় আস্‌বো।"

"মোটেই নয়—আপনাকে এখন আমরা সহজে ছাড়ছি কিনা—!" রেবা দুষ্টুমিভরা হাসিতে ঝলমল্ ক'রে উঠ্‌লো—আঁচলটা উড়িয়ে একেবারে বিদ্যুতের গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "ওঃ ভারী তো বাড়ীর ওপরে টান—থাকেন তো মেসে—কে আছে শুনি সেখানে আপনার?"

ইংগীতটা গভীর। বিদ্যুৎ মাথা নীচু করলো, মহামায়া সামান্য একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "যা, যা তোর আর ফাজ্‌লেমি করতে হ'বে না—যা চান করে আয়—"

"হাঁ্যা—তাতো যাবোই—" আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে রেবা বল্‌লো, "তুমি ধ'রে রেখো মা—আবার না সুট্ ক'রে কোথাও পালিয়ে যান্—যে লোক—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই—সত্যি মা"। রেবা বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

"আচ্ছা—তুই যা তো আগে—" মহামায়া সামান্য একটু হাস্‌লেন।

বিদ্যুৎও হাস্‌লো।

সুজিত এসে ঘরে ঢুক্‌লো। হাফ্‌প্যান্ট্-পরা বছর দশেক বয়েস। চোখে চশমা। হাতে একটা বেশ মোটা আর ভারী খাতা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। বিদ্যুৎকে দেখে বিস্ময়ে যেন হঠাৎ দু' পা পিছিয়ে গেল, চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "আরে, আপনি?"

বিদ্যুৎ আবার হাস্‌লো, বল্‌লে, "হাঁ্যা, এসো—তার পরে তোমার কি খবর সুজিত, হাতে ওটা কি?"

"এটা?" সুজিত যেন একটু গর্বিত দৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে চাইলো, বল্‌লে, "এটা আমার ষ্ট্যাম্পের খাতা, জানেন আমি কতো ষ্ট্যাম্প জোগাড় ক'রেছি এর মধ্যে?"

বিদ্যুৎ বল্‌লো, "কই না তো?"

"ওই দ্যাখো" মহামায়া বিদ্যুতের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লেন, "এইবার ওর ওই খাতা নিয়ে এসেছে তো—দ্যাখো তোমায় এইবার কি রকম জ্বালাতন করে।"

"এই দেখুন" মহামায়ার কোন কথাই সুজিতের কানে যায়নি, "এই দেখুন পাঁচ হাজার পনেরোটা ষ্ট্যাম্প আছে আমার এই এক নম্বর খাতায়, আর দু' নম্বর খাতায় কতোগুলো আছে জানেন, এই পাকা দু হাজার" বলে ডান হাতের দুটো আঙুল সোজা ক'রে বিদ্যুতের চোখের সাম্‌নে মেলে ধরলো।

বিদ্যুৎ বল্‌লো, "ওঃ খুব ষ্ট্যাম্প জমিয়েছো তো সুজিত।" "কোথায় আর জমাতে পারলুম," সুজিত একটু আস্তে বল্‌লে, "দিদিটার জ্বালায় কি কিছু রাখ্‌বার উপায় আছে? জানেন পরশু দিন আমার নেদার ল্যাণ্ডের পাঁচ সেণ্টের একটা টিকিট দিদি চুরি ক'রে নিয়েছে। কি পাজী হ'য়েছে দিদিটা জানো মা" সুজিত মহামায়ার দিকে একবার চাইলো।

মহামায়া সুজিতের কথা বলার ভংগী দেখে মুখ টিপে হাস্‌ছিলেন, বল্‌লেন, "দূর, ও কেন নিতে যাবে তোর ষ্ট্যাম্প?"

"তুমি জানো না মা" সুজিত আবার খাতাটা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো। তারপরে বিদ্যুতের কাছে এসে বল্‌লো, "এই দেখুন, এই ষ্ট্যাম্পগুলো আমি নতুন জোগাড় ক'রেছি। এই দেখুন, এটা হ'চ্ছে প্যালেষ্টাইনের। এই গম্বুজটা কেমন চমৎকার দেখুন, আর এটা হ'চ্ছে ইজিপ্টের, এটা জেকোশ্লোভাকিয়া, এটা ইরাণের, এটা উগাণ্ডার কেনিয়া টাংগানিকার—কি চমৎকার নৌকোর ছবিটা বলুন তো?" সুজিত একমুহূর্ত ষ্ট্যাম্পটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপরে আবার পাতা ওলটাতে লাগ্‌লো, "এই দেখুন, কেডা, ডেনমার্ক, সিলোন, ইটালী, ফ্রান্স,

কী রকম মেয়েটী নাচছে দেখুন—আর এই অষ্ট্রেলিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, কেমন ঢাক বাজাচ্ছে লোকটা—মালয়, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স—জাপান, কী চমৎকার পাহাড়টার ছবি! আর হাফ্‌ক্রাউনের ষ্ট্যাম্প—আর এই দেখুন নেপালের—ওঃ কী রকম পাহাড় দেখ্‌ছেন আর এইটা হ'চ্ছে" সুজিত এলোমেলো পাতা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো। "এইটা হ'চ্ছে ক্যানাডার, ওঃ আর সব থেকে চমৎকার দেখুন, এই এক ডলারের ষ্ট্যাম্পটা" সুজিত বিদ্যুতের দিকে চেয়েই ধপ্ ক'রে খাতাটা বন্ধ ক'রে দিলে—তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা দুপুর বেলা আপনাকে দু নম্বর খাতাটা দেখাবো—এখন আমার একটা কাজ আছে" বলেই খাতাটা নিয়ে এক লাফ্ দিলে চৌকাঠ পর্য্যন্ত।

তারপর পিছনের দিকে চেয়ে সোজা বারান্দার দিকে দিল ছুট্।

"আচ্ছা পাগল ছেলেটা" মহামায়া বল্‌লেন, "ওই ষ্ট্যাম্প ষ্ট্যাম্প করেই ওর মাথা খারাপ হবে।"

বিদ্যুৎ আবার হাসলো।

বাইরে সিঁড়ির ওপরে হরনাথ বাবুর চটির শব্দ পাওয়া গেল—মহামায়া মাথার কাপড়টা ঠিক ক'রে গুছিয়ে নিলেন। আস্তে আস্তে হরনাথ বাবু ঘরে ঢুকলেন, "এই যে এখানে আছো—ব'সো, ব'সো বাবা, উঠ্‌তে হ'বে না"—মহামায়ার দিকে চেয়ে বললেন, "আমার কি আর সেই চোখ আছে! খুকীই প্রথমে দেখেছে, আমাকে বল্‌লে, 'বাবা দেখোতো ঐ বিদ্যুৎ বাবু যাচ্ছেন না?' তাড়াতাড়ি চাইলুম রাস্তার দিকে, কিন্তু কোথায় কি?—সেই বিরাট্ ভীড়ের মধ্যে কোন একটী লোককে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা আর আমার নেই—তবু বল্‌লাম একবার চাপরাশীটাকে পাঠিয়ে দেখ্‌না—যাক্—" হরনাথ বাবু এতক্ষণে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লেন, "বিদ্যুৎকে যে আবার পাওয়া গেলো! —হ্যাঁ ভালো কথা—আমাদের যে চা-টা রেডী, চলো—কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্—"

মহামায়া ততক্ষণে খাট থেকে নেমে প'ড়েছেন, বল্‌লেন, "এসো বাবা,—কতদিন পরে যে তোমার সংগে দেখা হোল—আমরা তো তোমাকে আবার দেখ্‌তে পাবো, এ আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, চলো—" মহামায়া সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

নীচে বারান্দার ওপরে একটা বড়ো টেবিলে চায়ের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে—হরনাথ বাবু একধারে এসে বস্‌লেন, বিদ্যুৎ একটা চেয়ার টেনে নিলো—মহামায়া সকলের কাপে চা ঢেলে দিতে লাগ্‌লেন।

এতদিন বিদ্যুৎ কোথায় কোথায় ছিলো, এবং কেনই যে ওরকম হঠাৎ তাঁদের কাছ থেকে চ'লে এলো এই সব আলোচনাই দীর্ঘতরো হ'য়ে চল্‌লো—বিদ্যুৎ এখন কি-ই বা করবে!—আরো নানা রকম প্রশ্নে তাঁদের সেই আলোচনা-সভা রীতিমতো মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো!

"আমি ভীষণ দেরী ক'রে ফেল্‌লুম বিদ্যুৎ বাবু—" একরাশ এলোচুল পিঠের ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে রেবা ঘরে ঢুক্‌লো। সবে স্নান ক'রে এসেছে, তার সমস্ত শরীর থেকে পরম একটী স্নিগ্ধতা—একটা অপরূপ সৌন্দর্য্য যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে—কপালের পাশে এখনো বিন্দু বিন্দু জল লেগে র'য়েছে—এলানো চুলের থেকে ভেসে-আসা একটা সুন্দর মোহময় গন্ধে বারান্দার বাতাসটা যেন মুহূর্তে ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো!

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো, "আসুন—না, না, দেরী আর কি, এই তো সবে আমরা ব'সেছি—"

"তাই নাকি?" রেবা আরেকটা চেয়ার টেনে নিলে।"

"বসুন না" একটা ডিস্ টেব্‌ল থেকে নিয়ে বিদ্যুতের দিকে এগিয়ে দিলে, "দেখুন তো এই কেক্‌টা কি রকম?"

বিদ্যুৎ তুলে নিলো কেক্‌টা, একটা টুক্‌রো কামড়ে দিয়ে বল্‌লে, "সুন্দর—আপনি ক'রেছেন বুঝি?"

"ভাল হ'য়েছে নাকি?" রেবা বিদ্যুতের চোখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লো—"তাহ'লে দেখুন এই স্যাণ্ড-উইচ্‌টাও আমি ক'রেছি—এখনো তো শিখিনি সব"—রেবা আরেকটা প্লেট এগিয়ে দিলো বিদ্যুতের দিকে।

মহামায়া হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "বেশী কিছু শেখেনি, এই দুই একটা আর কি! তাও কি নিজে শিখ্‌তে চায়, আমিই একরকম জোর ক'রে—"

"বাঃ—আমি বুঝি শিখ্‌তে চাই না?" রেবা মহামায়ার দিকে চাইলো, "তুমি ভারী দুষ্ট্ মা—"

হরনাথ বাবুও হেসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, "সত্যিই তো, তোর মা যত দোষ তোর ঘাড়েই চাপান, জানো বিদ্যুৎ, মেয়েটা আমার কিন্তু ভারী লক্ষ্মী—" হরনাথ বাবু হেসে বিদ্যুতের দিকে চাইলেন।

"যাও,—" রেবা টেবিলের ওপরে মাথা নীচু করলো, "এরকম করলে আমি কিন্তু তোমাদের সংগে খাবো না ব'লে দিচ্ছি।"

"আহা! তোকে বলিনি—তোকে বলিনি!" হরনাথ বাবু নিজের উদ্গত-প্রায় হাসিকে কোনোরকমে চেপে রাখলেন, "ওই পাশের বাড়ীর রেখাকে বলছি রে পাগ্‌লী।"

আর সংগে সংগে একটা হাসির ঢেউ টেবিলের প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

চায়ের পরে রেবা বিদ্যুৎকে নিয়ে নিজের লাইব্রেরীর মধ্যে ঢুক্‌লো, বল্‌লে, "দেখবেন আসুন আমার লাইব্রেরীটা কী রকম!"

দরজার ওপরে নীল রংয়ের একটা ভারী পর্দা দু'হাতে সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুক্‌লো। বল্‌লে, "আসুন—।" বিদ্যুৎ ঘরে ঢুক্‌লো। চারিদিকেই বড় বড় আলমারীতে দেয়ালগুলো অদৃশ্য—ওপরে প্রায় সিলিং পর্য্যন্ত আলমারীর মাথাগুলো উঠে গিয়েছে, আর প্রত্যেকটী আলমারীতে বই ঠাসা। একটাতে ইতিহাস, একটাতে দর্শন—একটাতে উপন্যাস—বিদ্যুৎ আলমারীর ধারে ধারে ঘুরতে লাগলো। খুব বড়ো ঘর। মাঝখানে পড়বার জন্যে একটা ওভ্যাল শেপের বিরাট টেবিল—তার চার পাশে গোল ক'রে সাজানো গোটা দশেক চেয়ার—দরজার ঠিক বিপরীত দিকে একটা লম্বা সোফা—রেবা সোফার ওপরে গিয়ে বস্‌লো।

আলমারীগুলির মাথার ওপরে বড় বড় অনেকগুলি ছবি বাঁধানো। দরজার সাম্‌নেই রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রতিকৃতি—পাশেই বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, শরৎচন্দ্র, ওদিকে চার্লস্ ডিকেন্‌স্, সেইক্‌স্‌পিয়ার—শেলী!—সুন্দর, অতি সুন্দরভাবে ছবিগুলি সাজানো। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর জর্জ বার্ণার্ড শ' র'য়েছেন—আর একদিকে সুভাসচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, জহরলাল—দেশী এবং বিদেশী অতি মানবদের ছায়ায় সমস্ত ঘরটায় যেন অদ্ভুত একটী নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে—অভূতপূর্ব একটী গাম্ভীর্য্য—রেবা সোফায় এলিয়ে পড়লো, বল্‌লে, "আসুন না এখানে, কিছুদিন হ'ল এই ম্যাগাজিনটা আমি সাবস্‌ক্রাইব্ করছি,—দেখেছেন এটা?"

বিদ্যুৎ এগিয়ে এলো, টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিলো, দেখ্‌লো 'এশিয়া', বল্‌লে, "ও, এটা আপনি নেন্ নাকি?"

"ভাল নয়?"

"খুব ভাল, আমার এটা রেগুলার পড়ার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল—কিন্তু এক ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরী ছাড়াতো আর কোথাও এটাকে দেখ্‌তে পাইনি—কোনো ষ্টলেও না,—রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এতে ট্রান্-স্লেটেড্ হ'য়ে বেরুচ্ছে দেখ্‌ছি— "

রেবা হাস্‌লো, বল্‌লে, "হ্যাঁ, পেপারটা আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে—হুইলার ষ্টলে প্রথমে দেখেছিলাম—তারপরে একেবারে ডিরেক্ট—এই তো মাস তিনেক নিচ্ছি।"

বিদ্যুৎ রেবার পাশে ব'সে পড়লো, "আপনার লাইব্রেরী সত্যিই লোভনীয়—ভারী ভালো লাগ্‌লো আমার—।"

রেবা হাস্‌লো, বল্‌লে, "বাবার জন্যেই এত সব—বাবা নিজে পড়াশুনো করতে ভীষণ ভালবাসেন,—এই তো সেদিন আমার জন্যে একসেট্ 'বুক্ অব্ নলেজ' আনিয়ে দিলেন—দেখেছেন, নতুন এডিসানটা কি রকম হ'য়েছে বুক অব্ নলেজের?" রেবা বিদ্যুতের একটা হাত ধ'রে ঘরের একধারে নিয়ে গেলো, একটা বড়ো কাঠের কেশের মধ্যে বইগুলি র'য়েছে—এখনো খুলে আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়নি। রেবা কেশটা খুলে ফেললে। ভেতর থেকে সোনালী অক্ষরে নাম লেখা বইগুলি ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠলো—একটা টেনে নিয়ে বিদ্যুতের হাতে রেবা তুলে দিলে, "দেখুন, সত্যি, কি সুন্দর ক'রেছে বইগুলি—" বিদ্যুৎ বইটা নিয়ে খুল্‌লো, বাঃ—সত্যিই চমৎকার!—বিদ্যুৎ একের পর এক পাতা উলটে চল্‌লো—আর রেবা বিদ্যুতের মুখের দিকে চেয়ে রইলো! সমস্ত ঘর নির্জন—একটা ছুঁচ পড়লেও বোধ

হয় সে শব্দ শোনা যাবে—রেবা চেয়ে রইলো—চোখ সে নামাতে পারলো না—কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি এসে রেবার সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করলো, রেবা চেয়ে রইলো—মনে হোল বিদ্যুতের চোখের পাতাগুলি কি সুন্দর—কি সুন্দর ওর টানা ভ্রূ! প্রশস্ত কপাল আর বিস্তৃত বক্ষ—কি মোহময় ওর চোখের দৃষ্টি!

ষোলো

লোহার, কালো আর ভারী বড়ো দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। একটু ঠেলা দিতেই খানিকটা ফাঁক হোল, চারদিক নিস্তব্ধ। গেট দিয়ে ঢুকবার সময়েই বিদ্যুৎ এই অস্বাভাবিক নীরবতাকে লক্ষ্য করলো। একটা চাকর শুধু বাগানে কী করছিল, বিদ্যুৎকে দেখে এগিয়ে এলো।

"দিদিমণি আছেন?"

"হ্যাঁ, ওপরে যান"

বিদ্যুৎ এগিয়ে গেলো—কোথাও কোনো শব্দ নেই—কেবল অনেক দূরে কী একটা পাখীর অবিরাম ডাক শোনা যাচ্ছে—কুক্-কুক্, কুক্-কুক্! বিদ্যুৎ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

এমন গম্ভীর আর নিদারুণ নৈঃশব্দের মধ্যে বিদ্যুৎ যেন জীবনে এই প্রথম এলো, একটু যেন ভয়ও হোল—কেমন একটা সুদূরচারী ভয় এসে তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করছে মনে হোল।

সামনে দীর্ঘ বারান্দা! দেয়ালের ওপরে মানুষপ্রমাণ একটা দীর্ঘ ঘড়ি—পেণ্ডুলামটার সোনার মত রং ঝক্‌ঝক্ ক'রে জ্বলছে—বিদ্যুৎ এগিয়ে গেল। দীর্ঘ কালোরঙের কাঠের দরজাটা বন্ধ, বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়ালো কাছে, তারপর আস্তে একটু ধাক্কা দিলে—আস্তে, অতি ধীরে দরজাটা খুলে গেলো—আর ঘরের ভেতরে,—রৌদ্রের আলোকে উদ্ভাসিত ঘরের ভেতরে বিদ্যুৎ চেয়ে রইলো—সোফার ওপরে গার্গী শুয়ে আছে—মুখ তার জানলার দিকে—মাথাটা সে দু'হাতে চেপে আছে, আর মাথার ওপর থেকে মেঘের মতো নেমে এসেছে ঘনো আর কালো চুলের রাশি, থাকে থাকে পিঠের ওপরে এলিয়ে আছে, দরজা খোলার সামান্য শব্দটা তার কানে যায়নি বোধহয়।

আর একটা কঠিন মুহূর্ত! বিদ্যুৎ চৌকাঠের ওপরে পাথরের মত এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। কি করা—কি করা যায় এখন, কী ভাবলো সে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে পিছিয়ে এলো—ঠিক সেই ভাবেই দিল দরজাটা বন্ধ ক'রে। দরকার নেই,—দরকার নেই! আর একদিন না হয় দেখা করবে সে, পিছন থেকে ডাক্‌লে হয়তো চমকে উঠতো—মনের সূক্ষ্মতম তারে লাগতে পারতো কঠিন আঘাত, ভালোই হ'য়েছে দেখা না হ'য়ে, ভালোই হ'য়েছে বিদ্যুতের পক্ষে—হয়তো কথার মধ্যেই আবার দুঃখ পেতো গার্গী, ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়েছেন। কেন যে এলো এখানে ও, না এলেই তো হোত, না এলেই তো পারতো বিদ্যুৎ!

বারান্দার রেলিংটা সে চেপে ধরলো। নীচে বাগানে সেই লোকটা নিজের মনে কাজ ক'রে চ'লছে, বিকেলের ম্লান আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত আকাশে, কয়েকটা মেঘ ভেসে চ'লেছে—আর সেই দূরচারী অচেনা পাখীটা একই ভাবে ডাকছে: কুক্-কুক্—কুক্-কুক্!

"বিদ্যুৎ—"

বিদ্যুৎ ফিরে দাঁড়ালো। দরজার সেই ঈষৎ ফাঁকটুকুর আড়ালে গার্গী—চুল তার এলোমেলো, সামান্য অ-গোছানো, চোখে তার শান্ত-আভা, "চলে যাচ্ছিলে?"

বিদ্যুৎ একটু হাসতে চেষ্টা করলো, "ভাবলাম, এসময়ে হয়তো দেখা করলে বিরক্ত হ'বে, তাই—"

"তাই চ'লে যাচ্ছিলে?" গার্গী বিদ্যুতের মুখের দিকে চাইলো, "শোনো, ভেতরে এসো—।"

অভিভূতের মতো বিদ্যুৎ ঘরের ভেতরে এগিয়ে গেল।

"ওখানে বোসো—" গার্গী সোফাটা দেখিয়ে দিলো। তারপর দরজা বন্ধ ক'রে এগিয়ে এলো, "জান্‌তে পারি এসময়ে কেনই বা এলে হঠাৎ?"

"এম্‌নিই—" বিদ্যুৎ কোনোরকমে কথা কইলে, "ভাবলাম কিছু হ'য়েছে—তুমি সেদিন, আমার কোনো কথায় বোধ হয় আঘাত পেয়েছিলে, তাই ওভাবে চ'লে গেলে—ভাবলাম তোমার সঙ্গে আমার এবিষয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার—"

গার্গী হাসলো,—ম্লান, নিস্প্রভ! বল্‌লে, "সেদিন তোমার সঙ্গে আমার কোন কথাই তো হয়নি, এ-কথা তুমি ভুল্‌লে কি করে?"

বিদ্যুৎ মাথা তুললো, বল্‌লো, "ও সেদিন হয়নি বুঝি, কিন্তু এর আগে কোনদিন হয় তো হ'য়েছিলো—আমার মনে নেই—তোমাকে আমার সেই জীবনের রূঢ় মুহূর্তে হয়তো কিছু ব'লেছি, তুমি আমাকে——" বিদ্যুৎই থাম্‌লো একটু, "আজকাল কি রকম ভুল হ'য়ে যাচ্ছে সব—কাকে কি যে বলি কিছুই মনে থাকে না—এই কথাই জানাবার জন্যে এসেছিলাম—" বিদ্যুৎ চুপ করলো।

"কিছুই তুমি বলোনি আমায়" গার্গী সেইভাবেই বল্‌লো, "তুমি মিছিমিছিই একথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিয়েছো, কোনোদিনই কিছুই শুনিনি আমি তোমার কাছে।"

পশ্চিমের জান্‌লাটা খোলা—অস্তসূর্য্যের একটী দীর্ঘ রৌদ্র রেখা এসে ঘরের মেঝের ওপরে প'ড়েছে—বাতাস আস্‌ছে—বিদ্যুতের মনে হ'ল বাতাসটা ভারী সুন্দর—গার্গীর কপালের ওপরের চুলগুলি ঈষৎ উড়ছে—চৈত্র-গন্ধী বাতাস, বড় মোহময়—বড় বেশী তীব্র!

"তাই হ'বে হয়তো!" বিদ্যুৎ অতি আস্তে কথা কইলো, "তোমায় হয়তো কিছুই বলিনি কোনোদিন, হয়তো নীরবেই সে আঘাত ক'রেছি—আজ আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি গার্গী।"

"পেরেছো?" গার্গী আমার বিদ্যুতের চোখের দিকে চাইলো।

"বোধহয়, কিন্তু সময় নেই—সংশোধন করবার সেই সুদুর্লভ মুহূর্তকেও আমি হারিয়েছি—"

গার্গী চুপ ক'রে রইলো—বাইরের সেই পাখীটা অবিশ্রান্ত ডেকে চ'লেছে—বিদ্যুৎ জান্‌লার দিকে চাইলো।

"তা আমি জানি—জীবনে কখন কোন মুহূর্ত হঠাৎই এসে হঠাৎই চ'লে যায়—তার কোনো ঠিকানা বিধাতা পুরুষ রাখেন না, আমরাও তাদের সহজে হারাই—এ নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ কি বিদ্যুৎ?

"না লাভ নেই—তা ঠিক,—তবু কেন যে দুঃখ করি সেইটাই আমার মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য লাগে, জীবনের সমস্ত পথ ভ'রেই তো ভাঙা আর গড়া; আর টুথ আংখেমেনের কবর—আর মহেনজো-দাঁড়ো—হাজার হাজার বছর ধ'রেই চ'লেছে তার আবিষ্কার—গার্গী, আমি সেই জীবনকে চিনি, তাই আমার ভয় করে!"

গার্গী নিস্প্রভ একটু হাস্‌লো, বল্‌লে, "সে কথা আমিও স্বীকার করি—আবিষ্কারই চ'লেছে খালি—তার থেকে যে-রহস্য ঘনীভূত হ'ল, তার সমাধান কেউ করলো না, এটাই আমার কাছে ভারী অভিনব লাগে।"

অস্তগামী সূর্য্যের একটী সোনার রেখা জান্‌লার ফাঁক দিয়ে এসে বিদ্যুতের মুখে পড়ল, সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, গার্গী সোফার ওপরে এসে বস্‌লো। বল্‌লে, "একটু স'রে ব'সো, মুখে তোমার রোদ্দুর পড়ছে বিদ্যুৎ!"

"থাক্—এখনিই স'রে যাবে", বিদ্যুৎ কপালের দুটো পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরলো, "কতক্ষণই বা এই রোদ্দুর থাক্‌বে এ ঘরে?"

"মাথা ধ'রেছে নাকি?" গার্গী বিদ্যুতের আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো, "ওডিকোলন দেবো একটু?"

"থাক্ না—" বিদ্যুৎ সাম্‌নের দেয়ালের দিকে চাইলো। সুন্দর একটী ছবি—দেবীপ্রসাদের আঁকা, তুষারশুভ্র গিরিশিখর থেকে হিমানীর স্রোত নেমে আস্‌ছে, চারিদিকে দিগন্ত ছোঁয়া কুয়াশার কুহেলিকা—এখানে ওখানে হাল্‌কা কতগুলি সঞ্চরমান মেঘ—পদতলে উচ্ছলচ্ছন্দা নির্ঝরিণীর বেগবতী গতিপ্রবাহ—নীচে ছোট ছোট ক'রে লেখা 'আকাশ গংগা'। বিদ্যুৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

বড় 'গ্লাশকেশ' খুলে গার্গী ওডিকোলনের শিশিটা বের ক'রে নিয়ে এলো, "আমি জানি সব তাতেই তোমার 'থাক্ না', সব কিছুতেই তোমার আপত্তি—কিন্তু, কেন? এটুকুও কি আমি দিতে পারি না তোমায়?"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "এটা তুচ্ছ!—তুমি যা দিতে পার তার পরিমাণ হয় না—তা-ই তুমি দিয়েছো, কিন্তু যাকে দিলে সে অপদার্থ—সে যে তোমার সামান্য সম্মানও রাখ্‌তে পারলো না, গার্গী, তুমি কি বোঝো না?"

গার্গী কথা বল্‌লে না—শুধু শিশিটা নিয়ে এগিয়ে

এলো, তারপর বিদ্যুতের কপালের চারপাশে সে ভাল ক'রে লাগিয়ে দিলে, বল্‌লে, "একটু শোও, ছেড়ে যাবে মাথাটা!"

'থাক্‌না"—এই তো বেশ আছি—"বিদ্যুৎ খোলা জান্‌লা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চাইলো।

গার্গী কি বল্‌তে এসেছিলো, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করলো।

চারদিক আগের মতোই নিস্তব্ধ—সেই পাখীটা এখনো ডাকছে এখনো সে শব্দ ভেসে আস্‌ছে!

"আমার একটা উপকার করবে বিদ্যুৎ?" গার্গী সোফার ওপরে এসে বস্‌লো, "বেশী কিছু নয়, সামান্যই!"

বিদ্যুৎ গার্গীর মুখের দিকে চাইলো, তারপরে হাস্‌লো, বল্‌লে, "বলো সাধ্য থাক্‌লে নিশ্চয়ই ক'রবো—"

আমার এখন একটু বেরুতে হ'বে—বরানগরে যাবো, মাসীমার কাছে। নিয়ে যাবে?"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "এতো বেশী উপকার আমি কারো কোনোদিন করিনি জীবনে—আচ্ছা, আজ না হয় করলাম!"

"হাসির কথা নয়", গার্গী আরো কাছে এগিয়ে এলো "তোমার সময় আছে তো?"

"সময়?" বিদ্যুৎ আবার সেই 'আকাশ গংগার' দিকে চাইলো—হিমানীর স্তূপ ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে গিরি-শিখর থেকে, নীচে ধূসর কুয়াশা-লিপ্ত কুহেলিকা দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্নের জাল বোনা যেন—বল্‌লে "সময়?—অনেক—অনেক সময় আছে গার্গী!"

গার্গী উঠে দাঁড়ালো, "মাথাটা ছেড়েছে এখন?"

"হ্যাঁ, ছেড়েছে" বিদ্যুৎ গার্গীর চোখের দিকে চেয়ে হাস্‌লো—"যাও তুমি 'রেডী' হ'য়ে এসো, আমি রইলাম এখানে।"

গার্গী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

গংগার ধার দিয়ে সরুপথ—সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—মাঝে মাঝে হু, হু ক'রে আস্‌ছে বাতাস—ঝড়ের মত—গার্গীর আঁচল কেবলি পড়ছে উড়ে উড়ে, মুখের ওপরে চূর্ণ অলক বিস্রস্ত হ'য়ে প'ড়ছে বারে বারে—দুই হাতে গার্গী তাদের সামলে আন্‌তে পারছে না। একটু আগেই সূর্য্য ডুবেছে, সমস্ত পশ্চিম আকাশে তার সেই আভা—ঈষৎ সঞ্চরমান মেঘগুলিও আরক্ত হ'য়ে উঠেছে, গংগার জলেও তারি ছায়া!

একটা জায়গায় অনেকখানি ঘাস—কে যেন ঘাসের ভেল্‌ভেট্ বিছিয়ে দিয়ে গেছে সেখানে। অনেকটা নির্জন—দূরে দূরে কয়েকটা নৌকো নোঙর ফেলেছে—ঘাটের কাছেও একটা। ভেতরে টিম্ টিম্ ক'রে জ্বল্‌ছে লণ্ঠন—মাঝিরা নমাজ পড়ছে!

হাঁটতে হাঁটতে গার্গী গংগার দিকে চাইলো, কি বাতাস—যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের দুজনকে, গার্গী বিদ্যুতের একটা হাত ধরলো, বল্‌লে, "বেশ জায়গাটা, না?"

"সুন্দর—" বিদ্যুৎ বল্‌লো।

"বস্‌বে একটু?"

"দেরী হ'য়ে যাবে না তোমার?"

"না, দেরী আর কি—ভারী ভাল লাগ্‌ছে আমার এ জায়গাটা—উঃ কী বাতাস!" গার্গী দুই হাতে মুখের ওপরে এসে-পড়া চুলগুলিকে আবার ঠিক ক'রে নিলো।

"বেশ তো!—কিন্তু তুমি যাবে না বরানগরে?"

"নাই বা গেলাম!—চলোনা বসি গিয়ে একটু—" গার্গী অবনত দৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে চাইলো।

"তা হ'লে তো ভালই—" বিদ্যুতের মুখ নির্ম্মল হাসিতে ভ'রে উঠ্‌লো। বললে "খুব বেশী দরকার নেইতো সেখানে?"

"না, আরেক দিন না হয় যাবো!"

বিদ্যুৎ এসে ঘাসের ওপরে বস্‌লো, বল্‌লে, "বসো গার্গী—তোমাকে আজ আমি এতো কাছে পেলাম!—বড়ো ভালো লাগ্‌ছে আজ এই সন্ধ্যা—এই গংগা, এই আকাশ!"

গার্গী হাস্‌লো।

"শুধু ঘাসের ওপরেই বস্‌লে?"

"তাতে কী হ'য়েছে?" বিদ্যুৎ বল্‌লো, "এই তো ভাল, কী সুন্দর লাগ্‌ছে আজকের এই সাঁজের ক্ষণটি—বসোনা গার্গী একটু!"

গার্গী বস্‌লো। ওপারে—গংগার ওপারে আস্তে আস্তে

অন্ধকার নাম্‌ছে—শান্ত ঘনীভূত একটী সন্ধ্যা—আকাশে দু একটা তারা। অনেকগুলো মেঘ ভেসে চ'লেছে; আর তারি মাঝখানে ছোট এক টুক্‌রো কাস্তের মত চাঁদ। নীচে অনন্ত পৃথিবী—আর সন্ধ্যা নাম্‌ছে। কয়েকটা নৌকা। টিম্ টিম্ ক'রে ভেতরে আলো জল্‌ছে তাদের!

গার্গী ভাল ক'রে আঁচল মেলে বস্‌লো। আবার খানিকটা ঝড়ের মত বাতাস। গার্গীর আঁচল উড়ে বিদ্যুতের গায়ে এসে পড়লো।

"উঃ কী বাতাস বিদ্যুৎ?"

"হ্যাঁ," বিদ্যুৎ হাস্‌লো, "বড় বেশী,—কিন্তু ভারী ভাল লাগ্‌ছে—!"

"আমারো—" গার্গী বিদ্যুতের কাছে আরো ঘনো হ'য়ে এলো, "সারারাত আমার এখানে ব'সে থাক্‌তে ইচ্ছে করছে—সারারাত যদি থাক্‌তে পারতাম!"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "সত্যি তাই ইচ্ছে ক'রে—আমার একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে।"

"তোমার লেখা?" গার্গী আবার যেন সেই পুরানো দিনে ফিরে গেছে, যখন তার সংগে বিদ্যুতের প্রথম আলাপ হ'য়েছিলো: "তোমার লেখা?"

"না, আমার নয়, শোনো—" একটু থাম্‌লো বিদ্যুৎ, তারপরে বল্‌লে, "না—থাক্, তোমার হয়তো ভাল লাগ্‌বে না!"

"ভাল লাগ্‌বে না?" পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে গার্গী বিদ্যুতের মুখের দিকে চাইলো, "না, ভাল লাগ্‌বে, তুমি বলো!"

"বল্‌বো?" বিদ্যুৎ একটু ইতস্ততঃ করলো: "কিন্তু যদি তোমার না ভাল লাগে?"

"বল্‌ছি তো লাগ্‌বে!" গার্গী অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো: "বলো না?"

"শোনো তবে", বিদ্যুৎ আবার জলের দিকে চাইলো, গংগার ওপরে রাত্রীর অন্ধকার ঘনো হ'য়ে নাম্‌ছে—চার দিকে সুন্দর একটী নিটোল স্তব্ধতা, বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে বল্‌লো:

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সে দিন চৈত্র মাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ,
মঞ্জুরিত শাখায় শাখায়,
মৌমাছিদের পাখায় পাখায়
ক্ষণে ক্ষণে বসন্ত দিন ফেলেছে নিঃশ্বাস,
মাঝখানে তার তোমার চোখে—"

"বিদ্যুৎ—" গার্গী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো, "থামো"। তারপরে সে বিদ্যুতের বুকের ভেতরে নিজেকে ছেড়ে দিলো: "আমি পারলাম না—" কান্নায় গার্গীর সমস্ত দেহ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, "আমি পারলাম না,— আমাকে তুমি নাও—আমাকে তুমি খুন করো — আমাকে তুমি হত্যা করো বিদ্যুৎ—"

বিদ্যুৎও অভিভূত হ'য়ে পড়লো। গার্গীর সমস্ত ঘনো কালো চুল তার পিঠের ওপরে বিস্রস্ত হ'য়ে এলিয়ে প'ড়েছে, একটা অদ্ভুত মোহময় সৌরভ আস্‌ছে তার সেই চুল থেকে। সাম্‌নে সেই অন্ধকার গঙ্গা,—ওপরে কতোগুলো তারা জল্‌ছে—আবার হু হু ক'রে এক ঝলক বাতাস এলো—সমস্ত জলপ্রবাহ সেই বাতাসে যেন শির শির ক'রে উঠ্‌লো—বিদ্যুৎ চোখ বুজ্‌লো কেউ নেই—সাম্‌নে সেই তুষার-শুভ্র হিমগিরি। গগন-স্পর্শী শিখর থেকে ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে রহস্যময় কুহেলিকা। নীচে অনন্তবিস্তৃত পৃথিবী আর তারি মাঝখানে যেন সে আর গার্গী—আর তাদেরি ঘিরে কতোগুলি হালকা মেঘ—তারি মধ্যে তারা পথ হারালো যেন! বিদ্যুৎ সেই কালো কেশের ঘনো অরণ্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে।

একবার ইচ্ছে হোল, সে প্রার্থনা করে—প্রার্থনা করে: "হে ঈশ্বর, এই মুহূর্তকে তুমি শেষ করো না—সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে যাক্ ক্ষতি নেই, আকাশ আর জল আর গংগা মুছে যাক্ তার চোখের সাম্‌নে থেকে—তাতেও ক্ষতি নেই। শুধু—শুধু একে বাঁচিয়ে রাখো—এই অপূর্ব সোণার মুহূর্তটীকে!

বিদ্যুৎ গার্গীকে নিজের বুকের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবে টেনে নিলো।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ. পি-এইচ-ডি

২

এই সময়ে আর একজন বড় কবি ছিলেন—বিদ্যাপতি। তিনি ছিলেন একজন মিথিলাবাসী, কিন্তু বাঙ্গালীরা তাঁকে আপনার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে হিন্দী সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে হিন্দীভাষার কবি বলিয়া বড়াই করিতেছেন[১১]। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, Alexander-এর আমল হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলা বাংলার সঙ্গেই এক রাজনীতিক ভাগ্যের যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। গুপ্ত যুগে মিথিলা ও বঙ্গ এক "গৌড়-চক্রের" অধীন ছিল[১২]। প্রাচীন কালে মিথিলা, মগধ ও বাংলার মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? সেন রাজাদের আমলে মিথিলা বাংলার একটি প্রদেশ ছিল এবং আজও কৃষ্টির দিক্ দিয়া উভয় প্রদেশের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তৎপর মিথিলা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি এক স্থল হইতেই। উভয় ভাষাই মাগধী-প্রাকৃত প্রসূত। অন্য পক্ষে আজকাল যাহাকে হিন্দীভাষা বলা হয়, তাহা দিল্লীর "খড়িবোলীর" উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই "খড়িবোলীতেই" ফার্সী শব্দ প্রবিষ্ট করাইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে এই "খড়িবোলীতেই" বহু বিদেশী শব্দ বাদ দিয়া এবং সংস্কৃত-বহুল শব্দ প্রবেশ করাইয়া বর্ত্তমানের হিন্দী সাহিত্য গঠিত হইতেছে। এই জন্যই ইহা একটি রাজনীতিক দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। এই উভয় ভাষাকেই ইংরাজেরা "হিন্দুস্থানী" ভাষা বলেন। এই "খড়িবোলী" প্রসূত হিন্দুস্থানী ভাষার সহিত বিদ্যাপতির ভাষার সম্পর্ক অতি কম। ঐতিহাসিক এবং কৃষ্টিগত সম্বন্ধের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী বলিলে অপরাধ হয় না। যাহাই হউক, বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতির স্থান যখন আছে, তখন তাঁহাকে এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু পণ্ডিতদের মত যে, বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহার কবিতাকে বাংলার ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে আমরা হাহাকাররূপ ক্রন্দনের রোল পাই না। তাঁহার নায়িকা বা শ্রীমতী বরঞ্চ ইংরাজীতে যাহাকে aggressive type of woman বলে, তিনি তাহাই। প্রথমেই তিনি আরম্ভ করিতেছেন—

"গেলি কামিনী গজহুগামিনী[১২] বিহসি পালটি চায়" তৎপরে তার রূপ বর্ণনার স্থলে কবি বল্ছেন, "তুহারী ভয়ে সব দূরে পলায়ল" ইত্যাদি। এই সব পদাবলী দ্বারা নায়িকাকে আর এক ধরণে দেখিতে পাই। অবশ্য বিদ্যাপতিতেও এরূপ পাওয়া যায়—"করব মোয়ে তঁহা যোগিনী বেশ (পদ ১৪৬)। আবার ইহাও পাওয়া যায়[১৪] "দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া" (পদ ৪৭)। কিন্তু বিদ্যাপতিতে "মাথুরের পালা" নেই। বাংলার বৈষ্ণবগণ মাথুরে যে ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছেন বিদ্যাপতিতে তাহার অভাব। তিনি ইহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন—"হরি কি মথুরাপুর গেল......কৈনু ধাবই মাথুর মুখে॥... .. বিদ্যাপতি কহ নীত, অব রোদন নহে সমুচিত।" এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতির রাধার ক্রন্দনরোল তত তীব্র নয়, যত চণ্ডীদাসে! কিন্তু একটি পদে তিনি ভীষণ হা হুতাশ প্রকাশ করিয়াছেন।—"এখন তখন করি দিবস গোঞইনু, দিবস দিবস করি মাস।" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা একটি হতাশ প্রেমিকের মনোবেদনা প্রকাশ পায়। এই পদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া জ্ঞানদাসও[১৫] বলিয়াছেন—"আজকালি করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতি ভার,

*　　　　*　　　　*

দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল।"

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশের পরাধীনতার কথা ভাবিয়া দুঃখ করিয়া কমলা-কান্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"দিন গুনিতে গুনিতে মাস হয়......শতাব্দীও ঘুরিয়া ফিরিয়া সাতবার এল,

---

(১১) শুক্ল—"হিন্দী সাহিত্যিকা ইতিহাস।"

(১২) "আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প"।

(১৩) "বিদ্যাপতি"—৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত।

(১৪) "বিদ্যাপতি পদাবলী"—বসুমতী সংস্করণ।

(১৫) "বৈষ্ণব মহাজনপদাবলী"—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬ (বসুমতী সাহিত্যমন্দির)।

কিন্তু মা আমার কই ?" ইত্যাদি। এই পদাবলীতে যেমন হতাশ প্রেমিকের আক্ষেপ পাওয়া যায়, তেমনি দেশ-প্রেমিকেরও আক্ষেপের অর্থ করা যাইতে পারে। আর বিদ্যাপতিতে আমরা ইহা পাই যে, ইনি পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপের পরিষদ ছিলেন এবং এই রাজাকে তিনি "দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই রাজা শেষে দিল্লীর বাদশাহের নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী অবস্থায় তথায় নীত হন।* এই সময় হইতে নাকি তাঁহার গীত বন্ধ হইয়াছিল। বিদ্যাপতি হয় সামন্ত বা এক অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজার পারিষদ ছিলেন এবং এই রাজার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অনুমান হয় যে, পরাধীনতার ছাপ হইতে তিনিও বিমুক্ত ছিলেন না। তাঁহার রাধা প্রথমেই যে আনন্দ ও ভোগের প্রতীকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, যাঁহার, দীনেশবাবুর কথায়—"শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প[১৬]—তিনি শেষে বিরহের কালে যোগিনী সাজিতে চাহিয়াছিলেন। এইখানে আমরা দুইটি ভাবের সংমিশ্রণ দেখিতে পাইতেছি। বিরহিণী রাধাতে ভাবের আধিক্য বেশী। কিন্তু বিদ্যাপতির এই রাধা এত বেশী ক্রন্দন করেন নাই, যেমন চণ্ডীদাসের রাধা করিয়াছেন। ইহা কি উভয় প্রদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থাজনিত মনস্তত্ত্ব-প্রসূত ? বিদ্যাপতিতে রাজা শিবসিংহের সংবাদ ব্যতীত আর কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বাংলায় চণ্ডীদাসের পরে বড় বৈষ্ণব কবি হইতেছেন জ্ঞানদাস। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলায় আবির্ভূত হন[১৭]। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে চৈতন্য নিত্যানন্দের প্রেম আনয়ন করিয়াছেন, যথা, "জ্ঞানদাস কহে গৌর কৃপাময়, হেরিতে কোন জীব দেহ ধরে।" আবার—

"চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়,
জ্ঞানদাস নিশি নিশি নিতাই গুণ গায়।"

জ্ঞানদাস যখন তাঁহার পদাবলী লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত নব বৈষ্ণবধর্ম্ম বাংলায় পূর্ণ জোয়ারের মুখে চলিতেছে।

এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। যথা,—

"পূরবে গোবর্দ্ধন, ধবল অনুজ যার
জগজনে কহে বলরাম
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে, আইল কীর্ত্তন রঙ্গে
ধরি পহুঁ নিত্যানন্দ নাম।"

এই সম্প্রদায়ের কৃষ্ণ দশ অবতারের কৃষ্ণ নয়। ইঁহাদের কৃষ্ণ—

"কোটি ইন্দু জিনি বদন মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।"

জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপালের অনেকে রঙিন পাগড়ী বা বিনোদ পাগড়ী মস্তকে ধারণ করেন। শ্রীরাধিকার কপালে সিন্দুর বিরাজ করিতেছে, যথা, "সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি অনুপম"। জ্ঞানদাসের রাধা অভিসারে গমন করিতেছেন—"নীল বসনে তনু ঝাঁপল গোরী, চলিল নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভরি।"

তৎপর শ্রীকৃষ্ণের প্রবাস যাত্রাকালে শ্রীরাধা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সই পিয়া নাহি আইল
* * * *
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যথায় নিঠুর হরি॥"

পরে মাথুরের বিচ্ছেদে শ্রীরাধার ক্রন্দনের রোল যখন চরমে উঠিয়াছে তখন তিনি বলিতেছেন :

"মাধব কৈছন বচন তোমার আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার॥
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল॥"

জ্ঞানদাসে আমরা শ্রীকৃষ্ণের নাগর বেশ ও তাঁহার প্রেম লীলার বর্ণনা পাই। আর পাই রাধার বিরহে যোগিনীর বেশ গ্রহণ করার কথা, এবং মাথুরে বিদ্যাপতির কথারই প্রতিধ্বনি পাই। বিরহিনী রাধা দিন গণিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের আশা-পথ চাহিয়া। চণ্ডীদাসের সময় হইতে যে

* আবার কেহ বা বলেন, ইনি নেপালে পলাইয়া যান। এই বিষয়ে Dr. I. Prosad 'The Mediaeval History of India" দ্রষ্টব্য। (১৬) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ২২২।
(১৭) "বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী"—ভূমিকা পৃঃ ৬।

প্রেম ও বিরহের স্রোত বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, জ্ঞানদাসে আমরা তাহাই পাই।

ইহার পর আসেন গোবিন্দদাস। ইনি বলরাম দাসের একজন বন্ধু এবং চৈতন্যের পারিষৎদের শিষ্যবর্গের একজন। ইনি প্রার্থনাতে বলিতেছেন :

"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই"

দীনেশবাবু বলেন যে, গোবিন্দ দাসের আদর্শ ছিলেন বিদ্যাপতি[১৮]। ইনি বন্দনাতে গাহিতেছেন : "জয় শচীনন্দন ত্রিভুবনবন্দন।" ইহার শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, "চিকনকালা, গলায় মালা, বাজয় নূপুর পায়।" ইহার রাধা বিরহের কালে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া॥"

গোবিন্দদাসের শেষের পদাবলীগুলি গৌরলীলা বিষয়ক। চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাঁহার তিরোভাবের পরই শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে বসান হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুকরণেই গৌরাঙ্গ ভক্তি পদাবলী লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন :

"নাচে গোরা প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বলে হরি
খেনে বৃন্দাবন কররে শ্রবণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরি।"

গোবিন্দদাসে আমরা কোন সামাজিক সংবাদ পাই না।

এইবার আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের খাস সাহিত্য মধ্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নবদ্বীপের এই ব্রাহ্মণ যুবক দ্বারা যে ভাবতরঙ্গ উত্থিত করা হয়, তাহা বাংলায় এক ঘোর বিপ্লব সাধন করে এবং বাংলার বাহিরেও সে ধাক্কা গিয়া পৌছায়। এইজন্য তাঁহার জন্ম-সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে কিছু অবগত হওয়া প্রয়োজনীয়। বাংলায় তখন পূর্ণভাবে মুসলমান শাসন চলিতেছে। এই যুগে একদিকে যেমন বাঙ্গালী নানা কারণবশতঃ বহু সংখ্যক মুসলমান হইয়াছে, তেমনি বাঙ্গালীও গৌড়ের সিংহাসন দখল করিয়া স্বাধীনতার পতাকাও উড্ডীন করিয়াছে। চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। আবার এই সময়েই দনুজমর্দ্দন দেব ও তৎপুত্র, মহেন্দ্রের নামে টাকা বাংলায় প্রচলিত হয়। ইহা তাঁহাদের স্বাধীনতা ঘোষণার চিহ্ন বলিয়া ইতিহাসে স্বীকৃত হয়। ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তুর্কীর পদানত, তখন একমাত্র বাংলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে[১৯]। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের চিত্রপটে এই ঘটনা ক্ষুদ্র নহে[২০]। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, যদু মুসলমান হইয়া বাংলায় নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহার ফলে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদেশে চলিয়া যান। তৎপর গৌড়ের সিংহাসন লইয়া একদিকে যেমন কাটাকাটি আরম্ভ হয়, তেমনি অন্যদিকে জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে' পাওয়া যায় যে, চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে গৌড়ের সম্রাট্ নবদ্বীপ উৎসন্ন দিবার হুকুম দেন,

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥ (২১)

জয়ানন্দ বলেন যে, লোকে বাদশাহার কাণে গিয়া লাগায় যে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার রাজত্ব কাড়িয়া লইতে চাহেন। ইহাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে নবদ্বীপে হিন্দু রাজা হইবে এবং ইহারা সব "ধনুর্দ্ধয় প্রজা"।* অতএব তিনি যেন সাবধান হন। ইহারই ফলে রাজাজ্ঞায় নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ ধ্বংসের আদেশ হয়। কিন্তু কোন মুসলমান লিখিত ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই; অথচ আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণ রাজা হইবার প্রবাদ দুইখানি বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যদিকে ইহাও আমরা দেখি যে, ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে এই সব অনেক খবরই নাই। এইরূপ ঘটনা সে যুগে প্রায়ই

(১৮) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ২৮৮।

(১৯) রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাংলার ইতিহাস।"

(২০) জয়চন্দ্র নারাং—"ইতিহাস প্রবেশ" (হিন্দী)।

(২১) জয়ানন্দ—"চৈতন্যমঙ্গল"—নদীয়া কাণ্ড পৃঃ ১১।

* চৈতন্য ভাগবতে এই ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যথা, কেহ বোলে, বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে। সেই এই বুঝি, এই কথন না নড়ে।" আ ১২।২৬৭। জয়ানন্দ ও চৈতন্য ভাগবতের কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নে হিন্দুরা বুক বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন।

ঘটিত। সুতরাং এই সব ইতিহাসে—যাহাতে কেবল "রাজা জন্মাল, ফুলিল ও মরিল" এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—তাহাতে স্থান না পাওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। অন্য পক্ষে বর্ত্তমানকালের হিন্দু লেখকেরা জয়ানন্দের এই সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকহ প্রমাদ হব পাছে॥"

উদ্ধৃত কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও, একটি অতীত ষড়যন্ত্রের দূর প্রতিধ্বনি, তাহাতে সন্দেহ নাই[২২]।

রজনী চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই ঘটনাটি হোসেন সা'র পূর্ব্বে হাবসী বাদশাহদের সময়ে সংঘটিত হয়[২৩]। এই সংবাদটি অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। হিন্দু রাজত্ব হস্তচ্যুত দেখিয়া আবার জনকতক হিন্দু মনীষী যে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, তাই বা কি প্রকারে বলা যায়? বিশেষতঃ এই এই সময়কার একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন অদ্বৈত আচার্য্য, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ রাজা গণেশের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশে বর্ণিত আছে—

"সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি।
* * * *
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা"(২৪)।

এই রাজনীতিক ও সামাজিক চিত্রপট পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশীয় এবং শ্রীহট্ট হইতে আগমন করেন। এক্ষণে তর্ক উঠিয়াছে যে, চৈতন্যের মাতা শচীদেবী কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যা, অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য—এই দুই শ্রেণী আছে। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণের মুখে লেখক শুনিয়াছেন যে, তথাকার "সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণশ্রেণী" চৈতন্যকে নিজেদের জাতির লোক বলিয়া দাবী করেন। অন্য পক্ষে জয়ানন্দ বলিতেছেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছেন :—

"শ্রীহট্ট দেশে পালাইয়া গেল।
রাজা ভ্রমরের ডরে" (২৫)

কিন্তু আর কোন বৈষ্ণব পুস্তকে এই কথার উল্লেখ নাই। এইখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ নিজেদের পশ্চিমাগত বলেন; দাক্ষিণাত্যেরা উড়িষ্যাগত বলেন এবং "সাম্প্রদায়িকেরা" নিজেদের মিথিলাগত বলেন। চৈতন্যদেব যদি পাশ্চাত্য বা সাম্প্রদায়িক শ্রেণী-সম্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহার বংশ উড়িষ্যা হইতে কেমন করিয়া আসিতে পারে? আর যদি শেষোক্ত কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে এত বিধি-নিষেধের কড়াকাড়ি ছিল না।

তৎপরে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবদ্বীপের মনীষীরা বাংলাকে তুর্কী মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কোন মনীষী হিন্দুর এই অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। পক্ষান্তরে নিজেদের বিদেশীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ কঠোর কুর্ম্মাবস্থায় আনয়ন করিয়াছিলেন[২৬]। এই কামরূপের হিন্দু-রাজত্ব মুসলমানেরা জয় করিয়াছিলেন—

"বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ॥"*

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, কামরূপ তখন বাংলার অন্তর্গত ছিল। এই প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

(২২) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭১
(২৩) "গৌড়ের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।
(২৪) ঈশান নাগর কৃত "অদ্বৈত প্রকাশ।"

(২৫) "চৈতন্য মঙ্গল" পৃঃ ৯৬।
(২৬) পদ্মপুরাণে দাড়িওয়ালা অশ্বারোহী তুরস্কের সহিত সর্ব্ব প্রকারের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন এবং ইহাতে দুঃখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঘোর কলি যুগে অনেকে ইহাদের সংস্রবে আসে।

* প্রেমবিলাস—পৃঃ ১৮৯। বোধহয় হোসেন সাহ কর্ত্তৃক উত্তর বঙ্গের কামতাপুর রাজত্ব জয়ের কথা এই স্থলে ইঙ্গিত বা সূচিত হইয়েছে।

ব্যবস্থা

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

এক পশলা বৃষ্টির পর চার পাশ থম্‌থমে হ'য়ে রয়েছে। কাছের জামরুল গাছটার কালো ডালে সবুজ চওড়া পাতা একটুও নড়ছে না। দূরের দু' একটা দেখা-যাওয়া নারকেল গাছের পাতাগুলো স্থির হ'য়ে ঝুঁকে রয়েছে, কেবল কালকের আটকানো ঘুড়িখানা জলে ভিজে, রং উঠে, ফেঁসে গিয়েছে। কলকাতার ঘুঁজি-গলির ভিতর বাড়ী। সুহৃৎ ডাক্তারী পড়ে; গলির মোড়েই দোতলার ঘর-খানিতে সে থাকে। তার পড়া, শোয়া, বসা, সব এই ঘরে। জানলা দিয়ে সামনের একতলা বাড়ীর উঠান, ঘরের ভিতর, সব স্পষ্ট দেখা যায়। চট-ঘেরা রান্না-ঘর, দরমা-দিয়ে-ভাগ-করা রোয়াকের কোণে এক ঘর লোক, আর ওপাশে অমনি একখানি ঘর, একটু ফালিপানা রান্নাঘর, বিশ্বম্ভরবাবুর। এই দুই পরিবার, ভালয়-মন্দে আনন্দে-কলহে মিশিয়ে আজ কয়েক বছর ধরে পাশাপাশি বাস করছে। গলীর গরীব গৃহস্থের আবরুর আভিজাত্য নেই। সবই খোলা মেলা; সুহৃৎ সবই দেখতে পায়।

কলকাতা সহরে পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সাথেও পরিচয় বড় একটা হয় না। বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে তার জানাশোনা হ'য়েছিল নিতান্ত সুহৃদের চোখের চামড়া পুরু হয়নি বলে'। বাবুরা সব আফিসে বেরিয়ে যাবার পর বিশ্বম্ভরবাবু বেলা এগারটা নাগাত এক হাতে বাজারের থলে, আর এক হাতে মাছের খালুই নিয়ে, কাদামাখা চটি পায়ে, ঘামে-ভেজা ফতুয়া গায়ে গলির মুখে ঢোকেন, আর সুহৃৎও পরিপাটি বেশে, কোট গায়ে, মালকোঁচা মেরে ধুতি-পরে, নোট বুক হাতে কলেজে বেরোয়। সরু গলি, নিত্যই মাথা ঠোকাঠুকি। তাই অল্প একটু মাথা নাড়া, স্মিত হাসির মাঝে তাদের পরিচয় ঘনীভূত হ'য়েছিল। কারণও আর একটু হ'য়েছিল; বিশ্বম্ভরবাবুর বছর ছয় সাতের ছেলেটি প্রায়ই উদরাময়ে ভোগে। সুহৃৎ ডাক্তারী পড়ে জেনে ভদ্রলোক একদিন এনে হাজির চিকিৎসা করাতে। শীর্ণ হাত পা, পাংশুটে মুখ, ঝাঁকড়া চুল, স্ফীতোদর ছেলেটি।

—খোকা, তোমার নাম কি? সুহৃৎ প্রশ্ন করলো।

—পিণ্টু।

—ও পিণ্টু, বেশ নাম তো। তুমি কেবল প্যাণ্ট পর বুঝি?

ছেলেটির নিকার-বোকার পরা, কয়েকটি বোতাম ভাঙা। ভিতর থেকে সরু কালো কার-বাঁধা বড় একটা তামার মাদুলী উঁকি মারছে। মাদুলীটি নাড়া-চাড়া করতে করতে সুহৃৎ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো:

—এটা কি?

—মাদুলী।

—কিসের?

—অসুখের।

—তোমার চুল এত বড় কেন?

—আমার ঠাকুরদের চুল।

—কোথাকার?

—জানি না, সে অনেক দূর।

—আচ্ছা, তুমি কি খেতে ভালবাস?...লজেঞ্চস্?

—হুঁ।

—চিনাবাদাম?

—হুঁ।

—মাছ-ভাজা?

—হুঁ-উ।

—আর, মাংস?

ছেলেটি হেসে বললে, খু-উ-ব ভালবাসি।

সুহৃৎ পরীক্ষা করে বলেছিল, সাবু, ভাত, চিনি, মিছরী বেশি খেতে দেবেন না। আদা কুঁচোন, ছোলা ভিজান, হাতে-গড়া রুটি, মাঝে মাঝে দু' এক টুকরো মাংস খেতে দেবেন। ওষুধ একটা লিখে দিচ্ছি, তা' হ'লেও পথ্যের দ্বারাই উপকার হবে। বিশ্বম্ভরবাবু ব্যবস্থাপত্রখানি হাতে করে' ছেলেকে নিয়ে গেলেন। গিন্নীকে পথ্যের বিবরণ শোনানো হ'ল।

সুহৃদের কাণে গেল: পিণ্টুর মা চড়া গলায় বলছেন, "এমন কথাও ত কখনও শুনিনি বাবা! যার পোরের ভাত সাবু সইছে না, সেখানে রুটি-মাংস! যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড! আর চিকিচ্ছে করাতে হবে না! বলি, ডাক্তার ওকে পেটে ধরেছে, না আমি? আমি ওর ধাত বুঝিনে?

সুহৃদের সঙ্গে পিণ্টুর খুব ভাব হ'য়েছে। প্রায়ই আসে ছেলেটি যখন-তখন ঘুট্ ঘুট্ করে'। ঘরের জান্‌লা খোলা র'য়েছে দেখলেই হ'ল। হয়ত সুহৃৎ শুধোলে, "পিণ্টু আজ কি খেয়েছো সকালে ? পিণ্টু বলে, "দুধ, সাবু আর মিছরী।"

—আর দুপুরে ?

—এই ভাত, নেবু আর শিঙিমাছের ঝোল।...আমার কিন্তু একটুও খেতে ভাল লাগে না।

—ওষুধ খাও নি ?

—ওষুধ অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে। বাবা বলেছে মাসকাবার হ'লে নিয়ে আসবে।

—আচ্ছা, চোখ বোঁজ। উঁহুঁ হোল না, চাইলে হ'বে না। এ-ই, দেখো না।...হাঁ করো। আরও বড় করে। ...কি বল দিখিনি ?

—কাটলেট, না ?

পিণ্টুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে, যেন কেউ কেড়ে নেবে এক্ষুণি।

কিছুদিন কাটল। পিণ্টুর সেই ফ্যাকাশে মুখ, ঘামচি ভরা খসখসে গা, সেই স্ফীতোদর, সরু সরু নলা-নলা হাত-পা। কব্জির, কনুইয়ের কব্জা যেন ঢিলা হ'য়ে গেছে, নড় নড় করছে। বিশ্বম্ভরবাবুকে সুহৃৎ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, "খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখছেন ত ? তেমন ত কই সারছে না ?" বিশ্বম্ভরবাবু হ্যাঁ না ব'লে সরে পড়েন।

বেলা প্রায় বারটা। সুহৃৎ খেয়ে দেয়ে কলেজে বেরুবে, পিণ্টুর চীৎকারে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে। উঠানে রোয়াকের ছায়া সরু হ'য়ে গেছে, রোয়াকের গায়ে রোদে-শুকনো খুলশি-ওঠা শেওলা। বাজারের থলে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে, গোটা দুই আলু আর লেবু গড়িয়ে ঝাঁঝরির মুখে পড়েছে। মাছের তেল আর কুঁচো চিংড়িতে মাছি বসছে। আঁসটে গন্ধ। ও-ঘরের বর্ষীয়সী বিধবা নিবু নিবু উনানে ঘুঁটের আঁচে কি যেন ভাজছেন, খন্তির খন্‌খন্ আর ভাজার ছ্যাঁক ছোঁকে এক বিচিত্র শব্দের সমাবেশ হ'য়েছে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, সব তেতে আগুন হয়েছে। শীর্ণ পিণ্টুর মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে; হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদছে। ওদিকে দুধ চলকে পড়েছে ধাক্কা লেগে এনামেলের বাটি থেকে, এপাশে ছটকে-পড়া মিছরীর ঢেলা। সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টি বদ্ধ করে, হাত-পা মেঝেয় ঘ'যে ছটফট করে কাঁদছে পিণ্টু। মা এসে সশব্দে চড়িয়ে দিলেন: "মরণও হয় না তোমার। কেবল ভুগছ আর জ্বালাচ্ছ।"

পাশের ঘরের বর্ষীয়সীটি তাড়াতাড়ি কড়া নামিয়ে, ঘটি কাত করে হাত ধুয়ে দৌড়ে এলেন: "আহা মা, কি যে বল! ঠিক দুপুর বেলা! এই ত এক রত্তি শিবরাত্তির সলতে!" বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "পেটরোগা ছেলে, ভুগে ভুগে বায়নাদার হ'য়েছে। তা' বলে কি চোরের শাসন করতে হয় গা! দুধ সাবু কি আর রোজ ভালই লাগে ছাই। ছেলেটা মাছের তরকারী ভালবাসে, তাও ত একটু দিলে হয়।... আহা, বাছা রে, পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ ব'সে গেছে!..." পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নিয়ে গেলেন ঘরে। পিণ্টুর কান্না থেমে এসেছে; নাকের পাশে গালের ওপর চোখের জলে ভেসে গেছে। মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছে, সারা দেহটা তখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে বাঁধা ছিটের হাফপ্যাণ্ট-পরা পিণ্টু! সুহৃৎ জানালাটা ধড়াস করে বন্ধ করে খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তারপর সন্ধ্যা উৎরে গেছে।

"সুহৃৎবাবু, সুহৃৎবাবু," বিশ্বম্ভরবাবুর গলা পাওয়া গেল।

"এই যে," সুহৃৎ জানালায় দাঁড়াল।

"একবার আসবেন দয়া করে?......থার্মোমিটারটা আনবেন।" ষ্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার নিয়ে সুহৃৎ নেবে গেল। পথে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "পিণ্টুর বিকেল থেকে খুব জ্বর। ভুল বকছে। কেবল আপনার নাম করছে।"

"আমায়,...আমাকে দাও।.. রুটি,...মাংস খাব।... না, না, সাবু, না।......না—আ, খা—বো না—আ!"

সুহৃৎ ঘরে ঢুকল। পিণ্টুর মা ছেলের শিয়রে বসে বাতাস করছিলেন, মাথার কাপড় টেনে দিলেন।

"পিণ্টু, ও পিণ্টু।"

সব চুপচাপ। প্রবল জ্বর। পিণ্টু মাথা চালছে। জলপটি দিতে ব'লে, বাড়ী এসে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিলে সুহৃৎ।

খেয়ে উঠে এসে চেয়ার টেনে পড়তে বসল।

সামনে খোলা বই; সুহৃদের চোখ ঝাপসা হ'য়ে এল। ছেলেটা কি আর বাঁচবে! অত মার কি ঐ রোগা কচি ছেলে সইতে পারে! ষ্টার্চ ওর পেটে সইবে না; বললাম, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দিন,—তা' নয় কেবল সাবু আর মিছরী!…কেবল ওষুধ গেলালে আর কি হবে! সুহৃদের বুকটা মোচড় দিলে। টপ্ টপ্ করে জল পড়ল সার্জারীর খোলা পাতায়।

ওদিকে নারীকণ্ঠের উচ্চ কান্নার কলরোল উঠল। বুঝি সব শেষ!

রবিহারা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গভীর বিষাদ-মগ্ন আজি এই হৃদয় আমার
কেঁপে ওঠে, কেঁদে ওঠে তোমারে স্মরিয়া বারংবার—
হে কবি, হে রবি, ওহে দেশরবি, জ্ঞানজ্যোতির্ম্ময়,
হে বিরাট্, হে অতল; হে গভীর, হে রহস্যময়!
হে বিশাল বনস্পতি, বিস্তারিয়া সহস্র শিকড়
ধরেছ দেশের মাটী সর্ব্ব অঙ্গে—সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম 'পর।
শূন্যে মেলিয়াছে শাখা-প্রশাখা সুদূর অগণন
নিবিড় বিশাল শ্যাম মহাবট দাঁড়ায় যেমন—
ডালে ডালে লক্ষ পাখী, ছায়াতলে আর্ত্তজন যায়;
শীতল আশ্রয় দিয়ে জুড়ালে, জীয়ালে মমতায়।
সে ছায়া আজিকে সরে, সে আশ্রয় আজি ধূলিলীন,
ক্ষুদ্র পক্ষী সম মোরা কাঁদি আজ আশ্রয়বিহীন।
হঠাৎ প্রবল ঝড়ে ভেঙে দেছে আমাদের নীড়;
কলরবে হাহাকারে অন্ধকারে শূন্যে করি' ভীড়।
তব রসে, তব ছায়ে, তব স্নেহে জাগ্রত যে দল
আকাশের তাপ, ঝঞ্ঝা আজি তারে করিবে বিহ্বল।
আজি তারা নাথহীন, নেতৃহীন, দীপ্তিহীন, ম্লান;
রাজ্যেশ্বরহীন আজ প্রজাকুল বিক্ষুব্ধ পরাণ।
হে রবীন্দ্র, হে কবীন্দ্র, হে জ্ঞানেন্দ্র, প্রতিভা-নিলয়,
হে ভারত-সত্য-ছবি, হে প্রাচ্যের প্রমূর্ত্ত বিজয়।
তব চিত্ত হেরিয়াছে বিধাতার সৌম্য শান্ত রূপ;
তব কাব্য আঁকিয়াছে প্রকৃতির কান্তি অপরূপ।
তব কণ্ঠে শুনিয়াছি বাঙ্গালীর মধুভরা গান;
তব কান্তি ঘোষিয়াছে আর্য্য-ভাতি অতুল মহান্।
স্নেহ, প্রেম, মৈত্রী, দয়া, প্রীতি আর আনন্দ-আহ্লাদ,
দুঃখ ও পেষণ-বোধ, অবিচার, অবজ্ঞা, বিষাদ
চিত্তে তব পেল ঠাঁই, কাব্যে তব তাদের প্রকাশ;
কভু তুমি হাস্যমুখ, কভু শান্ত, কভু বজ্রভাষ।
প্রকৃতির চিত্তজয়ী, মানবের চিত্ত-অধিকারী,
বিধাতা-নির্ভর করি, অবিরাম মাধুর্য্যসঞ্চারী।
হে সুন্দর, হে উদার, মানবের পরম বান্ধব,
পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আজি পূজে তোমা, হে পূর্ণ-মানব।
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—কোনো শূন্য, কোনো ত্রুটি নাই;
আর কি এমন পাব?—কেঁদে মোরা ধাতারে শুধাই।

২৫শে বৈশাখ*

শ্রীলীলাবতী নাথ

২৫শে বৈশাখ। ৮২ বৎসর পূর্ব্বে এই ২৫শে বৈশাখ একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই দিনটি জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। নব বসন্তের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে, অযুত প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি পাইয়া প্রতি বৎসর এ দিনটি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। মর্ত্ত্যের সিংহাসনে অমর কবির পূজা। সমস্ত বৎসরের সঞ্চয়কে নিঃশেষ করিয়া প্রকৃতি যে কুসুম-কিশলয়পুঞ্জ ফুটাইয়া তোলে, ঘন সবুজের বন্যায় রুক্ষ পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহা সার্থক হয় কবির মুগ্ধ, স্নিগ্ধ, প্রশংসাসমুজ্জল দৃষ্টির স্পর্শে—সার্থক হয় মানুষের এই মহোৎসব কবিকে মাল্যচন্দন দিয়া, কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রণাম জানাইয়া আর কবির আদর আশীর্ব্বাদ পাইয়া। আজিও আসিয়াছে সেই ২৫শে বৈশাখ। আজিও দেখিতেছি প্রান্তরে প্রান্তরে সেই সবুজের প্লাবন, সেই বনে বনে নব পল্লবের পুঞ্জ কুসুমের উন্মীলন—সেই মাতাল দখিন হওয়ার চঞ্চল সঞ্চরণ, কিন্তু কবি কই? কবি চলিয়া গিয়াছেন—ধরার প্রাঙ্গন শূন্য; তবু প্রকৃতির ফুল ফোটানর, সৌরভ ছুটানর ছন্দে তাল ভঙ্গ হইল না? উহাকে দেখিলে মনে হইতেছে—এ দুঃসংবাদের খবর কেহ তাহাকে দেয় নাই—পূর্ব্ব অভ্যাস-মত দেবদাসী আসিয়াছে কবি বরণ করিতে। কবিকে দেখিতে পাইতেছি না, অর্ঘ্য-থালা, পূজার নৈবেদ্য যাঁহার চরণতলে রাখিয়া আজ প্রণাম করিতে আসিয়াছি, তিনি নাই। তবু মনে হয় আকুল হৃদয়ের এ পূজার আয়োজন ব্যর্থ হইবে না—কবি যেখানেই থাকুন, আজ অলক্ষ্যে আমাদের মধ্যে আসিয়া এ পূজা তিনি গ্রহণ করিবেন।

কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ, জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মধ্যে আপনার প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতেছে, পৃথিবীর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যাঁহার মধ্যে স্বচ্ছ দর্পণে ছবির মত প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে, অগণ্য নরনারীর অসংখ্য প্রাণের বিচিত্র ভাবরাশি যাঁহার ভিতরে সমুদ্রোত্থিত বাষ্পের ন্যায় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া আবার শ্রাবণধারার মত অপূর্ব্ব ভাষার বর্ষণে বিশ্ব প্লাবিত করিতেছে—যিনি প্রাণশক্তির মত অন্তরের অন্তঃস্থলে অলক্ষ্যে থাকিয়া জাতির চলন্ত অভিযানে শক্তি যোগাইতেছেন—আমাদের এতটুকু অভিজ্ঞতা আর বিচারশক্তি লইয়া এই অল্প সময়ে তাঁহার প্রতিভার প্রসারণ নির্দ্ধারিত করা সম্ভব কি? বিরাট্ বিশ্বের হৃৎস্পন্দন তিনি আপন হৃদয়ে অনুভব করিতেন—

"বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্॥
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন॥"

গোপনচারী স্তব্ধ অতীতও তাঁহার প্রাণে তাহার সঞ্চয় রাখিয়া যায়, তাহার নিঃশব্দ পদধ্বনিও তিনি শুনিতে পান—

"তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্ম্মের মাঝখানে
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে গেছ মোর প্রাণে।"

অতি সুদূরের গ্রহ-তারার সঙ্গে তিনি পরিচিত, বন-প্রান্তরের অব্যক্ত ভাষা তিনি বুঝিতে পারেন—

"নিশার আকাশ যেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।"

কবির প্রতিভা এমনিই ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যোমব্যাপী সহস্রাংশু সূর্য্যের কিরণমালার মত। জীবনের পথে চলিতে নৈরাশ্যের ভাবে ক্লান্ত হইয়া যখন বিশ্রাম খুঁজি, তখন কাণে আসে তাঁহার বজ্র-গম্ভীর স্বর—

"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,
সে ত নহে সুখ,
ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম,......"

অমৃতের অধিকার যদি চাই, তবে সত্যই অসীম ধৈর্য্য লইয়া অক্লান্ত কর্ম্মী হইতে হইবে, বিসর্জ্জন দিতে হইবে জীবনের সুখ, বিশ্রাম, শান্তি আর আরামকে। মানুষের প্রতি তাঁহার পরম বাণী—

* চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মবাসরে পঠিত।

"সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূর জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি,
* * *
তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবন কণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে-দুঃখে ধৈর্য্য ধরি', বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতি দিন নিরলস থাকি'
সুখী করি' সর্ব্বজনে।"

তিনি কবি, তিনি দার্শনিক, তিনি সাধক, তিনি প্রেমিক—যে দিকেই তাকাই, তাঁহার শেষ দেখিতে পাই না। তাঁহার এই বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কবির আর একটি নূতন জীবন এবং তাঁহার একটি নিজস্ব জগৎ। এই নূতন জগতে বিচরণশীল কবির এই নূতন জীবনটি বড় সুন্দর। এর কথা ভাবিতেও মন ভরিয়া ওঠে ভালবাসায়। এখানে কবি জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মহান্ ইত্যাদি দুরূহ বিশেষণযুক্ত নন; এখানে তিনি অত্যন্ত আদরের আত্মভোলা, সরল, পবিত্র, চঞ্চল একটি দেবশিশু। পার্থিব কোন মলিনতা, কোন কলুষতা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। সে সরল দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিশ্রী দৃশ্য আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ শিশু কবে যেন অলকার পথ ভুলিয়া, অন্য মনে মর্ত্ত্যের বকুল বাগানে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নূতন চোখে জগতের সমস্ত কিছু অত্যন্ত লোভনীয় এবং অত্যন্ত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। ভোরের আলোকে প্রথম যেদিন তিনি দেখিলেন—"কনককিরণে গাঁথা নীলাম্বর-পরা এই পৃথিবীকে"—এই নির্ম্মল সূর্য্যোকরোজ্জ্বল ধরণীকে, উচ্ছল আনন্দে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল—সে বিস্ময়, সে পুলক বুঝি ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়—তিনি শুধু মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর—
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখীর গান?"

বলিয়াছেন—"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'?" দেবশিশুর এই প্রথম চক্ষুরুন্মীলন। পৃথিবীর এত আলো, এত সৌন্দর্য্য; এমন সুন্দর পাখীর গানে তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। কি করিয়া সমস্ত কিছু চলিতেছে, তাহার সমস্তই তাঁহার নিকট বড় আশ্চর্য্যের। কবির এ জগতে আর কেহ নাই; মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত অপরিচিত লোকদিগের কাহাকেও এখানে আমরা দেখিতে পাই না। এ উদাসীন বালক একা চলিয়াছে নির্জ্জন, কুসুমাকীর্ণ, আলোছায়ার বনপথ দিয়া। তাহার হাতে আছে মায়ের দেওয়া একটি খেলার বাঁশী।

"যেদিন জগতে চলে' আসি
কেন মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশী
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে' গেনু একান্ত সুদূরে।"

আপন খেয়ালে হাতের বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে উন্মনা বালক বনপথে চলিয়াছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঝড়-রৌদ্র-বাতাস কিছুই এখানে নাই। কি সুন্দর এ পৃথিবী, কি সুন্দর এই চলার ছন্দঃ! পথের দুই ধারে অজস্র ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ জগতে বর্ষা, শীত বা সাংসারিক কার্য্য অন্য কিছু নাই, অনন্তযৌবনা পৃথিবীতে কেবল একটি অখণ্ড বসন্ত চিরবিরাজমান রহিয়াছে।

এই উন্মনা বালককে এমনি করিয়া ভুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে আর একটি চঞ্চলা মেয়ে—তাহার লীলাসঙ্গিনী। সুন্দর জগতে এ সুন্দরী ছন্দোময়ী রহস্যময়ী বালিকার আবির্ভাব আর একটি অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। জগতের সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবি ইঁহার স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন—

"চৈত্র হাওয়ার উতলা কুঞ্জ মাঝে
চারু চরণের ছায়া মুক্তির কাজে।"
"সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।"

কবি ইঁহাকে বলিয়াছেন—

"নদী কুলে কুলে কল্লোল তুলে'
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে,
বন-পথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগন কোণায় কোণায়
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোণায় সোণায়।

নির্জ্জন বনে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে—
কখন হাসিতে, কখন বাঁশীতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।"

এমনি বনপথে নদীর কুলে উপরে রঙ্গিন মেঘের খেলা, নীচে কেতকীকুসুমের পুঞ্জ, এখানেই এই বালকের খেলার জায়গা ছিল, আর সে খেলার সাথী ছিল এই সুন্দরী, চঞ্চলা, দুষ্টু মেয়েটি। এখানে বসে' তিনি তাঁহার বাঁশী বাজাইয়াছেন। সারাক্ষণ শুধু বাঁশীই বাজাইয়াছেন—

"আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থি করে' করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।"

বিচিত্রের সুরগুলি তাঁহার বাঁশীতে তিনি ভরিয়াছেন। সে সুরগুলি কি?

"ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্ম্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠায় কম্পিত মূর্চ্ছায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ উলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনী অন্তরালে তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে—"

এমনি করিয়া প্রকৃতির আনন্দ-ব্যথার, সুখ-দুঃখের সমস্ত অনুভূতির প্রতিটি কম্পন তাঁহার বাঁশীর সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মানুষের অনুভূতি তাঁর মধ্যে সুর পাইয়াছে—

"নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।"

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট্ গতির স্পন্দনও তার মধ্যে আছে,—

"চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলকল রোলে
উঠিতেছে রণরণি', ছায়া-রৌদ্রে সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্র তালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অন্তরের আনন্দ বেদনা।"

এখানে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া তিনি ধরণীকে আরও বিচিত্র বিরাট্‌রূপে দেখিতে পাইলেন:

"বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে-দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সঙ্গীত-মাখা
সুন্দর ধরাতল।"

তিনি বলিলেন—"আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের।" এমনি করিয়া এমনি সুরে 'আমার পৃথিবী' বলিতে বোধ হয় কেবল বালকেরাই পারে। এর মধ্যে যেন কত বড় অধিকার, কত বড় দাবী আছে। তাঁহার এই সুন্দর পৃথিবী যেন তাঁহাকে মুহূর্ত্তে আপন বলিয়া চিনিয়া লইল:

"মনে হয় যেন এ ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু জলে স্থলে,
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।"

এই কিশোর বালক স্রষ্টাকে পর্য্যন্ত নিতান্ত আপনার বলিয়া দাবী করিয়াছেন। ভগবান অনেক বড় আমাদের তুলনায়—আমরা অনেক ক্ষুদ্র, এ সব বিজ্ঞ লোকের কথা। এই দেবশিশুটি কখনও নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবেন নাই। 'দেবতার উপযুক্ত পুত্র আমি' এই ধারণা তাঁহার ছিল। নিজেকে চিনিয়া আনন্দে তিনি বলিয়াছেন—"দেহে, মনে, প্রাণে আমি একি অপরূপ!" তিনি জানিতেন—আমরা অমৃতের প্রিয় পুত্র—আমরা তাঁরই: ভগবানের সব—

"আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনী উঠল লাল হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো পূবে ও পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর—
সুন্দর হ'ল সে।"

সৃষ্টি হইয়াছে আমার জন্য, পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তুলিয়াছি আমি, ভগবানকে সুন্দর করিয়াছি আমি আমার বন্দনা দিয়া, নতুবা স্রষ্টা নিজেকেও চিনিতে পারিতেন না। আমাকে ভগবানের নিতান্ত দরকার। এত বড় আব্দারের সুরে এমন কথা বলিয়াছেন এই বালকটি। আমাকে ভগবানের চাই-ই, কারণ আমি না থাকিলে শূন্য হবে জগৎ—শুধু

"শক্তির কম্পন চলবে আকাশে বাতাসে—
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে
বাজবে না সুর।"

সত্যই ত যন্ত্র যেমন যন্ত্রী না হলে অর্থহীন, যন্ত্রীও তেমনি যন্ত্র ছাড়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার সুর থামিয়া যাইবে, আনন্দ থাকিবে না।

"সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে'
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।

তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তরে অসংখ্য অগণ্য লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোথাও
'তুমি সুন্দর'
"আমি ভালবাসি।"

বিধাতার কত দুঃখ হইবে তখন! প্রলয়-সন্ধ্যায় যুগযুগান্তর ধরিয়া একা তিনি জপ করিবেন—"কথা কও, কথা কও।"

"বল তুমি 'সুন্দর'
বল 'আমি ভালবাসি'।"

সুতরাং আমি ভগবানের সর্ব্বস্বধন, আমি ছাড়া তাঁহার জগৎ অন্ধকার, এতখানি দাবী লইয়া ভগবানের আদরের দুলাল হইতে বুঝি কেবল শিশুরাই পারে—বড়দের পাণ্ডিত্য যাহাদের ভিতরে প্রবেশ করে নাই।

এই চিরশিশুটি বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহার সেই মায়ের দেওয়া বা কুড়াইয়া পাওয়া বাঁশীটি মানবের চরণ-তলে রাখিয়া, ছোট হাতের একটি প্রণাম জানাইয়া চলিয়া গিয়াছেন:

"হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নম্র বাঁশী, এই মোর রহিল প্রণাম।"

তাই বলিতেছিলাম—সকল পাণ্ডিত্যের আলোচনা দূরে রাখিয়া এই দেবশিশুটির দিকে তাকাইতে বড় ভাল লাগে।

কবি চলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ অবিনশ্বর কবির নশ্বর দেহটি নষ্ট হইয়াছে। কবির স্পর্শ কবির আশীর্ব্বাদ আমরা আজিও পাইতেছি এবং চিরদিন পাইব। কবি অমর হইয়া রহিলেন আমাদের অন্তরে। অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢালিয়া বলিব—

'দুর্লভ দান তুমি বিধাতার ধরাতলে
জাগো চিরকাল ওঁকার-হার-পরা গলে।"

অক্ষম ক্রন্দন

শ্রীদিগেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

সারা বিশ্বের যত বরেণ্য তোমার বিয়োগে কবি
এঁকেছে কতই বিষাদ-মাখানো নয়নের জলছবি।
তাঁ'দের সবার মাঝেতে হে কবি, আমি যে ক্ষুদ্রতম,
কি বলিতে পারি?—নিবেদিয়া যাই পরাণ-বেদনা মম।
মুখে আসে নাকো কথার কাকলি, বুকে পাই নাকো বল,
তাই কবি, শুধু বহিয়া এনেছি নয়ন ভরিয়া জল।
বিশ্ব-সভায় যে আসনে তুমি বসেছিলে এতদিন
যুগ-যুগ ধরি' সে আসন তব রহিবে গো অমলিন।

"...এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরেতে" কবি,
তুমি দেখেছিলে বহুর মাঝেতে একটি মিলন-ছবি।
"...হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে..." নিজেরে আহুতি দিয়া
সকলের মাঝে "...জাগায়ে তুলিলে একটি বিরাট্ হিয়া।..."
তুমি যে শোনালে "...মূঢ়-ম্লান-মূকে দিতে হবে আজ ভাষা"
তুমি বলিয়াছ "শুষ্ক-বুকেতে ধ্বনিয়া তুলিবে আশা..."

মৃত্যুরে তুমি চিরদিনই কবি, দেখেছিলে শ্যাম সম;
প্রাণের অধিক তাহারেই তুমি করেছিলে প্রিয়তম।
নানান-ছন্দে, নানান ভাষায় বরণ করেছ তারে—,
তবুও সে লাজে ম্লান হয়ে গিয়ে ফিরে গেছে বারে বারে।
কিন্তু আজিকে শ্রাবণগগনে কি যে করে কাণাকাণি
কাণ পেতে শুনি সে যে গো তোমার বিদায়-বেলার বাণী।
দেশবাসীদের কহিতেছ ডাকি "...হয়েছে আমার শেষ—
আমার জীবনে জীবন লভিয়া জাগ রে সকল দেশ।..."

জানিনা এ দেশ তোমার বিহনে কেমনে জাগিবে কবি?—
আমি শুধু জানি ঘনায় আঁধার অস্ত যাইলে রবি।

গান ও স্বরলিপি

এমন বাদল রাতি
কোথা তুমি (ওগো) প্রিয়া,
তোমারি বিরহে মোর
কাঁদিছে হিয়া।

নাচে নটরাজ থৈ তাথৈ,
বিজুরী ঘনঘটা হানিছে ওই,
ডম্বরু তালে মেঘ
গাহে পিয়া পিয়া।

কথা—শ্রীসুনীলকুমার দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক (সুরসাগর)

আস্থায়ী

০ ১ + ৩ ৩
II {রা গা রা মা | গা রা সা ন্া I ধ্ন্া -া সা -া | (-রা -গা -মা -পা) I -া -া -া সা I
০ এ ম ন | বা ০ দ ল রা ০ ০ তি ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কো

০ ১ + ৩ ৩
ন্সা -রসা ণ্ধ্া পা | -া ন্া ন্া ন্া I সা -সা -রা -রা | (গা -গা -মা -পা)} | -া -া -া -া |
থা ০ ০ ০ তু ০ মি | ০ ও গো প্রি য়া ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

০ ১ + ৩
{মা রা মা মা | পা পা পা -া I ধা ধা ধা ণা | ণধা -পা -া -া |
তো মা রি বি | র হে মো র্ কাঁ দি ছে হি | য়া ০ ০ ০ ০ |

০ ১ + ৩
মা রা মা মা | পা পা ধনা -র্সর্া I র্সা না ধা ণা | ণধা পা -া -া} II
তো মা রি বি | র হে মো০ ০ র্ কাঁ দি ছে হি | য়া ০ ০ ০ ০

অন্তরা

০ ১ + ৩
II {-া মা পা পা | না -পা না -র্সা I -র্সা র্সা র্সা না | র্সা -া -া -া |
০ না চে ন | ট ০ রা ০ জ্ থ ই তা | থৈ ০ ০ ০ |

০ ১ + ৩
র্সা র্সা ধা ধা | ধনা -র্সর্া র্রা র্রা I -া র্সনর্সা ধা ণা | ণধা পা -া -া} |
বি জু রী ঘ | ন ০ ০ ০ ঘ টা ০ হা ০ ০ নি ছে | ও ০ ই ০ ০ |

০ ১ + ৩
{মা -রা মা পা | পা পা পা -পা I রা ধা ধা ণা | ধা -া পা -া |
ড ম্ ব রু | তা লে মে ঘ্ গা হে পি য়া | পি ০ য়া ০ |

০ ১ + ৩
মা -রা মা পা | পা পা ধনা -র্সর্া I সা না ধা ণা | ধা -া পা -া} II II
ড ম ব রু | তা লে মে ০ ০ ঘ্ গা হে পি য়া | পি ০ য়া ০

পঞ্চ দ্বীপ

(বালি)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ আখ্যায় অভিহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় পঞ্চ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বৈশাখ সংখ্যায় সুমাত্রা ও সেলিবিসের কথা আমরা বলিয়াছি। এবার বালি দ্বীপের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিব।

যবদ্বীপের পূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপগুলি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বালিবাসীরা যাভানীজদের জ্ঞাতি। অর্থাৎ উভয়ে একই জাতি। তবে পার্থক্যের মধ্যে বালীবাসী নরনারী যবদ্বীপবাসী অপেক্ষা দীর্ঘকায় এবং অধিক বলবান্। বালিনীজরা যাভানীজ অপেক্ষা প্রাচীনতর সম্প্রদায় বলিয়া মনে হয়। বালিনীজদের মধ্যে একদল নরনারী এখনও হিন্দু রীতিনীতি পালন করিতেছে। যাভানীজদের আর এক দল মুসলমান। যাহারা হিন্দু তাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল। বিশেষতঃ, বালিনীজ নারীরা অর্চ্চনা ও উপাসনার জন্য মন্দিরে যাওয়াকে অবশ্যকরণীয় বলিয়া মনে করে। পুষ্প, ধূপ এবং সুগন্ধি মসলার নৈবেদ্য তাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে নিত্যই উৎসর্গ করে। তাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত হয়। বহু সুন্দর হিন্দু দেব-মন্দির বালির বক্ষে আজিও বিরাজিত। রামায়ণী কথা এই দ্বীপে ভক্তিভরে আজিও আলোচিত হয়। রামলীলা সম্পর্কীয় নাটকের অভিনয় হিন্দু প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে।

দীর্ঘ-দেহ সৌম্য-মূর্ত্তি বালিনীজ মহিলারা যখন বর্ণ-বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক দীপ্তিশালী পোষাক পরিয়া পুষ্পপাত্র মস্তকে লইয়া মৃদুমন্দ পদে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন তাহা দেখিলে হিন্দু দর্শকের অন্তরে হর্ষধারা সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন স্বতঃই মনে হইয়া থাকে—ভারতে না হউক আমরা মহাভারতে অবস্থান করিতেছি। পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক ভক্তিমতী, ইহা সর্ব্বত্রই সত্য। পুরুষেরাও মন্দিরে যায় বটে, কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিবার জন্য তাহারা পুষ্পাদি বহন করে না। তৎপরিবর্ত্তে তাহারা মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মোরগের লড়াইএ যোগ দিবার জন্য স্বর্ণপিঞ্জরে রক্ষিত শিক্ষাদক্ষ মোরগগুলিকে লইয়া যায়। মালয় জাতি মোরগ যুদ্ধ দেখিতে যত ভালবাসে, তত আর কোন ব্যাপারকেই নয়। স্পেন প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে বৃষযুদ্ধ বা বুল-ফাইট এইরূপ জনপ্রিয়।

বালি দ্বীপের গ্রামগুলি ঠিক যাভার গ্রামসমূহের মত নহে। বালির প্রত্যেক গ্রাম কর্দ্দমে প্রস্তুত অনুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই পরিবেষ্টনীর ভিতরে বালির বালক-বালিকা সারা দিন আনন্দে খেলা করে। গ্রামের দক্ষিণে পাহাড়ের পাশে ধানের ক্ষেতগুলি চাতালের আকারে স্তরে স্তরে সজ্জিত। যাভার শস্যক্ষেত্র অপেক্ষা বালির শস্যক্ষেত্রগুলি অধিকতর নেত্রতর্পণ। সুদৃশ্য শৈলমালার অঙ্কে অঙ্কিত ছবির মত অবস্থিত। বালিবাসীর দ্বারা সম্পাদিত নৃত্যগুলিও এত মনোহর যে, উহারা সিংহলের নয়নাভিরাম কান্দী নৃত্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বালিনীজ তরুণীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা রকম নৃত্য শুধু সুন্দর নয়, বিস্ময়কর। নৃত্যের পরিচ্ছদগুলি এরূপ মনোমদ যে, নৃত্যকারিণীদিগকে পৌরাণিক যুগের অপ্সরা বলিয়া কল্পনা জাগা অসম্ভব নয়। এই সকল নৃত্য হিন্দু পৌরাণিক ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া জন্মলাভ করিয়াছে। অঙ্গভঙ্গী বা মুদ্রাগুলি দেখিলে বুঝা যায়—ভারতীয় নৃত্যকলার আদর্শে ইহারা রচিত।

বালির পাশেই লম্বক নামক দ্বীপ। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ বটে, কিন্তু অত্যন্ত গভীর। এই গভীরতার জন্যই বোধহয় উভয়ের উদ্ভিদ্‌দল ও প্রাণিপুঞ্জ পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বালির তরুলতা ও পশুপক্ষী প্রভৃতি এশিয়াসুলভ; কিন্তু লম্বকের গাছপালা এবং জীব-জন্তু অষ্ট্রেলিয়াসুলভ, এই সত্য অনেককে বিস্মিত করিবে। লম্বকবাসী মাসুপিলাস ও কাকাতুয়ার ন্যায় প্রাণী বালিতে আদৌ নাই। দেখিলে মনে হয়, মধ্যবর্ত্তী স্বল্পপরিসর কিন্তু সুগভীর প্রণালীটী যেন দুইটি দেশকে বিভক্ত করিয়াছে।

বল্কানের পথে

ভূপর্য্যটক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রান্ত মন, ক্লান্ত দেহ, পা আর চলে না। তদুপরি পার্ব্বত্য সর্পিল পথ। অতি সাবধানে পথ চলতে হয়। একবার পদস্খলন হলেই হয়ত বা জীবনের শেষ। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে পড়ছে। তবুও দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অজানা দেশের এক অচেনা পথে সাইকেলে চলেছি। যাব যুগশ্লাভিয়া দেশের রাজধানী বেলগ্রেডে। আসছি ইতালীর ভেনেজিয়া (ভেনিস) থেকে। সন্ধ্যায়ই সীমান্ত অতিক্রম করেছি। সীমান্ত পুলিশ আমার আসবাবপত্র তল্লাস করারও প্রয়োজন বোধ করলে না। শুধু ছাড়পত্র দেখে ও সাথে কোন প্রকার তামাক নেই জেনেই আমায় মুক্তি দিল। সে ছিল ১৩৩৯ সাল, বর্ত্তমান মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে।

মধ্য রাত্রিতে জাগ্রেব আসিয়া পৌছলাম। নিশার আবছা আঁধারে দূর থেকে যাকে স্বপ্ন-পুরীর মত দেখেছিলাম, তার বাস্তব অবস্থা দেখে মোহ আমার ভেঙ্গে গেল। না আছে এখানে সুন্দর ঘর-বাড়ী, না আছে ভাল রাস্তাঘাট বা পার্ক। অথচ জাগ্রেব এদেশের দ্বিতীয় বড় সহর ও ক্রোশিয়া প্রদেশের রাজধানী। সমৃদ্ধ সহর বলে ইহারও বেশ খ্যাতি আছে। অথচ 'সমৃদ্ধ' বলতে যা কিছু বুঝায় তার কোন লক্ষণই ইহাতে নেই, অন্ততঃ আমার চোখে পড়ল না।

নিঝুম পুরীতে এই নিশার ঘোরে আর কোথায় আশ্রয় খুঁজব? সোজা রেল-ষ্টেশনে চললাম। ষ্টেশনের বিশ্রাম-ঘরে থাকবার সুবিধা পেয়ে এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরুল। যেন মস্ত বড় একটা চিন্তার বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। ক্ষণকালের মধ্যেই ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে নিদ্রাদেবীর স্নেহাঞ্চলে ঢলে পড়লাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গল, সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক তখন উদ্ভাসিত, শিশিরসিক্ত সবুজ পাতাগুলি সূর্য্য-কিরণের সোনালি রংয়ে চিক্‌মিক্‌, ঝিক্-ঝিক্ করছে; জড়জগতে আবার জীবনের স্পন্দন অনুভূত হ'ল, সর্ব্বত্রই কর্ম্মচাঞ্চল্য।

পূর্ব্ব রাত্রে আমার ক্ষুধার তীব্র জ্বালা উপশম করবার সুবিধা হয়নি, তাই ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়েই প্রবেশ করলাম ষ্টেশনের রেষ্টুরেন্টে। বসতেই এল একজন পরিচারক। আমার দুর্ভাগ্য, সে ফরাসী প্রভৃতি দু' তিনটি ভাষাই বলতে পারল, কিন্তু পারল না কেবল ইংরেজী। পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশেই শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই নিজের মাতৃভাষা ব্যতীতও ফরাসী, ডাচ্ প্রভৃতি দু'তিনটি ভাষা বেশ জানে। এমন কি হোটেলের গাইড ও কুলি প্রভৃতিরাও ফরাসী এবং কিছু কিছু অন্য ভাষাও বলতে পারে, তবে ইংরেজী বিশেষ কেউ জানে না; আর যারা জানে, তাদের খুঁজে বা'র করাই মুস্কিল।

পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্রই, এমন কি পৃথিবীর অন্যত্রও ইংরাজীর চেয়ে ফরাসী ভাষা আজও অনেক বেশী সমাদৃত, যদিও ফরাসীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ইংরেজদের চেয়ে কোনদিনই বেশী ছিল না। আজ ইয়োরোপের বিরাট্ পরিবর্ত্তনের মুখে শুধু এটাই আশঙ্কা হয় যে, ফরাসীদের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতি ও ভাষার ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব যা এতদিন প্রত্যেক পাশ্চাত্যবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে, যার দান অতুলনীয়, হয়ত বা আর তেমনি ভাবে সেই স্থান অধিকার করে থাকতে পারবে না।

ইংরাজী ইংরেজদের মাতৃভাষা হলেও তা' প্রচারে তাদের চেয়ে অনেক বেশী আন্তরিক চেষ্টা করছে আমেরিকানরা। তাই দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত বিরাট্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ, যেমন—তেহেরাণের এলবুর্জ্জ কলেজ, বেরুটের ইউনিভার্সিটি, ইস্তামবুল, সোফিয়া ও বেলগ্রেডের কলেজ প্রভৃতি। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানই ঐ সব দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দেশের নেতৃবৃন্দের অনেকেই ঐ সব আমেরিকান প্রতিষ্ঠান-সমূহের ছাত্র।

যাক্, আকারে-ইঙ্গিতে কোনরকমে খাদ্য তালিকার কিছু কিছু রেস্তরাঁর পরিচারককে বুঝিয়ে যেন-তেন প্রকারেণ অমি প্রাতঃরাস্ শেষ করে ওয়েটিং রুমে এসে পুনরায় হাজির হলাম। এবার ঘরে এসেই দেখলাম, কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও জনকয়েক যুবতী মেয়ে আমার

লাগেজের পাশ ঘেঁসে আস্তানা নিয়েছে। দু'এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু সঙ্কোচ বোধ করলাম, কিন্তু পরক্ষণেই সহজভাবে আমি আমার আসন গ্রহণ করলাম।

অনেকক্ষণ পরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একজন আমায় প্রশ্ন করলেন—আপনি কি ভারতবাসী? মুখ তুলে চেয়েই দেখি একটি তন্বী তরুণী। মুখে চোখে তার বুদ্ধির দীপ্তি, চাহনিতে তার প্রকাশ পেল গভীর ঔৎসুক্য। প্রশ্ন করলেন ইনি ইংরেজীতে। তাই এতক্ষণে ইংরেজী জানা একজনকে পেয়ে আমার আর আনন্দের সীমা রইল না।

আমি ভারতবাসী জেনে ইনি আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝি ফরাসী কিংবা আমাদের ভাষা জানেন না? আমার উত্তর শুনে তিনি দুঃখিত হলেন, শেষে বললেন, আমার মা ঐ যে বসে, আপনাকে চুপ্‌চাপ্‌ বসে থাকতে দেখে ও আমাদের দেশীয় ভাষার অজ্ঞতাহেতু আপনার কষ্ট হচ্ছে মনে করে মা আমাকে আপনার সাথে আলাপ করতে পাঠালেন। তদুত্তরে তাকে ও তার মাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশ্ন করলাম—তাদের দেশ কোথায় ও কোথায় যাচ্ছেন? হেসে তরুণীটি উত্তর দিলে, তাদের দেশ বেলগ্রেডে, প্যারীর প্রদর্শনী থেকে ফিরতি পথে এখানে একদিনের জন্য নেমেছিলেন। সদালাপিণী এই মেয়েটির মারফৎ এই পরিবারটির সঙ্গে বেশ কাটল।

ঘণ্টাখানেক পরেই বেলগ্রেডগামী ট্রেণ এল। ট্রেণের গায়ে লিখা বিওগ্রেড। প্রথমটা খট্‌কা লাগল। জিজ্ঞেস করে জান্‌লাম, বেলগ্রেডেরই গাড়ী। ইংরেজদের দেয়া নাম দেশীয় নাম থেকে যে পার্থক্য এই একটি সহরের বেলায়ই হয়েছে, তা' নয়, বহু সহরের বেলাই হয়েছে, যেমন রোম, ইতালীয়রা ইহাকে বলে রোমা, নেপ্‌লস্‌—নেপোলি, জেনোয়া—জেনোভা, আমাদের কলিকাতা, কলকাতা—কেলকাটা, কেলকোট্টা ইত্যাদি।

সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এবার এরা গাড়ীতে উঠল। আমি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে বিদায় দিলাম। পার্ব্বত্য সপিল পথে ধীরে ধীরে ট্রেণখানা গেল মিলিয়ে। আশ্চর্য্য, কেন বা হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষণিকের পরিচয় অপরিচিত বিদেশে সহজেই নিবিড় হয়ে উঠে। বার বার অমর্থক তরুণীর সহজ ব্যবহার আর হাসিমাখা মুখখানি মনের মাঝে উঁকি দিতে লাগল। চিত্তের এ অহেতুক অবসাদকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

এই সময়ে ও-দেশে ডাঃ মেচাকের নাম লোকের মুখে মুখে প্রচারিত। ডাঃ মেচাক দেশের নতুন মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সভ্য। সে-সময়ে ক্রোশিয়া প্রদেশের ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা। তাঁরই আন্তরিক চেষ্টার ফলে এই প্রদেশ আজ কয়েক বৎসর হয় প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা লাভ করেছিল, কিন্তু তা' হলেও এই ক্রোটরা দেশের অন্যান্য জাতি-ভাইদের সাথে কোনদিনই তেমনি আন্তরিকতার সাথে মিশতে পারেনি। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই এদের একটা রাজনৈতিক ক্ষোভ বর্ত্তমান ছিল, আর তারই সুযোগ নিয়ে আজ জার্ম্মানী এই ক্রোটদের এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে—উদ্দেশ্য চিরতরে দেশের জাতীয়তাবোধকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করা। এজন্যই জার্ম্মানী যুদ্ধের সময়ে এই প্রদেশের উপর তেমন কোন এরোপ্লেন-আক্রমণ করেনি। জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য আজ সফল হয়েছে।

সার্ব্ব, শ্লাভ ও এই ক্রোটরা মিলেই যুগশ্লাভিয়া দেশের জাতি-দেহকে সৃষ্টি করেছিল। এদের চাল-চলন, পোষাক - পরিচ্ছদ, আচার - ব্যবহার—কোন কিছুরই ইতালী, জার্ম্মানী, ফরাসীদের সাথে কোন সাদৃশ্য নেই। তাই এই দেশকে দেখলে মনে হয় আমাদের প্রাচ্যেরই কোন দেশ বলে'। খাঁটি ইয়োরোপ বলতে আমি সাধারণতঃ বুঝি ইতালী, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্ম্মানী প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র যেখানকার লোকের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, মানসিকতা প্রায় একই রকম। এদের একঘেয়ে পরিবেশের মধ্যে পর্য্যটকের মন হয় ক্লিষ্ট। কিন্তু ইয়োরোপের এই বল্কান অঞ্চল ঐ একঘেয়ে পরিবেশের সৃষ্টি করে না। এখানে প্রতি পদক্ষেপে পর্য্যটক পায় বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের আনন্দ।

দিন কয়েক বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে জাগ্রেব থেকে বেলগ্রেডের দিকে রওনা হলাম। পথটি বেশ প্রশস্ত হলেও, সাইকেলে চলার পক্ষে মোটেই আরামদায়ক নয়। পথিপার্শ্বের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্যে

পথচারী তার সকল কষ্ট ক্ষণেকের মধ্যেই ভুলে যায়। জানা-অজানা শত সহস্র বৃক্ষশোভিত ছোট বড় পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছবির মত পল্লী। হেথা হোথা শস্যশ্যামল প্রান্তর।

সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশ রাঙিয়ে উঠেছে। সঞ্চরমান হাল্কা মেঘে বিচিত্র রঙের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। আশেপাশে পাহাড়ে, প্রান্তরে, বৃক্ষ শীর্ষে শুভ্র নির্ম্মল আলোর মেলা। এমনি মনোরম পরিবেশেষের মধ্য দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পথ চলেছি দেশের রাজধানীর দিকে। কোথাও বসে প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সময়ও যেন আমার নেই। শুধু চলা আর চলা।

চলার পথে যখন মাঝে মাঝে বিশ্রাম উপভোগ করতে বসতাম, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল এসে ঘিরে ধরত। আকার ইঙ্গিতে তারা কত কথাই না বল্‌তে চেষ্টা করত। মেয়েদের বিচিত্র পোষাক, আজানুলম্বিত ঘন কেশ আর বেদানার মত গায়ের রং, নারী-পুরুষের আতিথেয়তা বলকানের পথ চলাকে নির্ব্বিঘ্ন ও আরামপ্রদ করে তুলেছিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, ঘন অন্ধকার। বেলগ্রেডের রাস্তায় কোন কোলাহল নেই, লোকজনও নেই। সকলই যেন মৃত। এমনি সময়ে আমি বেলগ্রেডে এসে পৌছলাম। স্থানীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ আমি। তাই রাস্তার নাম-পড়া ও হোটেল খুঁজে বা'র করাই মুস্কিল হল। ভীষণ বিব্রত হয়ে এক চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি, এমনি সময়ে একজন আমেরিকান বৃদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয়। ইহাকে আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদই মনে করলাম। অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরুল। সমস্ত দিনের পথশ্রান্তিতে শরীর অবসন্ন, পা আর চলে না। এমনি অবস্থায়ই ভদ্রলোকের সাহায্যে একটি হোটেলে এসে আশ্রয় লাভ করলাম।

আহ্বান*

শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত, ব্যাকরণতীর্থা

সম্পদ্ ও বিপদ্ উভয়ই মানব জীবনে আগমন করে ভগবানের সঙ্কেতরূপে। সম্পদ্ মানুষের তখনই সার্থক হয়, যখন উহা ঈশ্বরেচ্ছা-পূরণের সহায়স্বরূপ হয়। বিপদ্ জীবনকে ক্ষিপ্রগতি দান করিয়া থাকে। ইহা ব্যষ্টির জীবনের পক্ষে যেমন, সমাজ ও জাতির জীবনেও তদ্রূপ— যে জাতি বিপদে দৃঢ়চিত্তে নিজের কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হয়, সে জাতির ধরাপৃষ্ঠ হইতে লয় পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। বিপদ্ যত বড়ই হউক, বাধা যত প্রবলই হউক, উহাকে অতিক্রম করিবার জন্য গতিবেগ ততই প্রবলতর করিতে হইবে; ইহাই প্রাণের স্ফূর্ত্তি এবং বাঁচার লক্ষণ। এই গতির লক্ষণস্বরূপই বর্ত্তমান সঙ্কটের মাঝেও সঙ্ঘের পুণ্য তীর্থ জনসমাগমে উৎসব-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

উৎসবের একটী অঙ্গস্বরূপ, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মহিলাদিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের হাওয়ায় যদিও পৃথক্‌রূপে অনেকক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না, তথাপি জাতির বৈশিষ্ট্যের দরুণই ইহার প্রয়োজন আবার অস্বীকার করাও চলে না।

নানাপ্রকার জাতীয় সমস্যার মধ্যে নারীজাতির উন্নতি বা প্রকাশভঙ্গীর সমস্যাও আজ বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৎসরের এই একটী দিনের আলোচনায় বা বক্তৃতাতে তাহার সুমীমাংসা বা নির্দ্দেশ দেওয়া খুবই সুকঠিন। অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে সবেরই অবশ্য সুফল পাওয়া যায়।

জাতির অর্দ্ধাংশ হইতেছে নারীশক্তি, উহাকে উপেক্ষা করিয়া জাতির পক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়ান বা বাঁচা অসম্ভব। বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর প্রতি সুসভ্য জাতির নারীশক্তি আজ বিশ্ব-মানবের শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছে। সর্ব্বজাতির

* ২০শ বর্ষীয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে মহিলা সভায় পঠিত।

প্রাণশক্তি যে নারীশক্তি তাহা আজ সুস্পষ্ট এবং কোন স্বাধীন জাতির নারীশক্তি আজ পশ্চাতে পড়িয়া নাই। বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বমঞ্চে সকলেরই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকার আছে। নারীও কেন ঈশ্বর-প্রদত্ত সেই দান হইতে বঞ্চিত হইবে?

আজিকার এই বিশ্বসঙ্কটযুগে নারীর দান যে কত বড় তা' কল্পনা করাও বুঝি বাংলার সাধারণ নারী সমাজের অসাধ্য। কেন এমন হয়? কিসের জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিতেও তাঁহারা আজ অন্ধতুল্য? কে সে অন্ধত্ব ঘুচাইয়া আলোর জগতে তাহাদের হস্ত ধারণ করিয়া টানিয়া আনিবে? কে তাহাদের বুঝাইয়া দিবে, হে নারি! তোমরা নিজেদের হেয় মনে করিয়া দূরে সরিয়া থাকিও না। নারীর দান লইয়াই পৃথিবীর জাতি বীরজাতি বলিয়া গৌরবমণ্ডিত হয়। তোমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ,—দেশের জন্য, জাতির জন্য তোমার দানেরও প্রয়োজন আছে। জাতিকে জাতিরূপে বাঁচিতে হইলে, চাই নারীর চির সনাতন আত্মদান, উহা নূতন ভঙ্গীতে নবরূপে আজ দিবার দিন আসিয়াছে। সমাজে, প্রতি গৃহে বীর জননী, দেব জননী, পতিব্রতা নারীর প্রয়োজন। বাংলার নারী জাতিকেও আজ সকল অশিক্ষা ও কুশিক্ষার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে নারীর সুশিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চাই। এমন শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ নারীকে উজ্জ্বল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। তার সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষারই আজ প্রয়োজন। সকল শিক্ষার মূলভিত্তি হইবে নারীর নারীত্ব, তাহার বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়া, সেবায়, প্রেমে, প্রতিভার অবদানে স্বদেশ ও জাতির কল্যাণশ্রী ফুটাইয়া তোলা।

"ত্বং হি প্রাণা শরীরে, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—এই জাগরণ ও গঠন মন্ত্র লইয়া পুরোভাগে দাঁড়াইতে হইবে বর্ত্তমানের সুশিক্ষিতা, নিঃস্বার্থ পরায়ণা, আত্মনির্ভরশীলা, তেজোদ্দীপ্তা একদল নারীকে, যাদের জীবন হইবে দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত শুভ্র পবিত্র কুসুমের ন্যায় অনাঘ্রাত নির্ম্মল। ত্যাগের প্রদীপ্ত অনল শিখা অন্তরে জ্বালাইয়া, সকল ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার বিসর্জ্জন দিয়া, জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া তাদের আত্মজীবন-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তুলিতে হইবে—বাংলার নারী সমাজকে। এই মন্ত্রের ফুৎকারে দিগ্‌দিগন্তে নারীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া, বাংলার নারীর শিক্ষা-দীক্ষার ভার তাহারা গ্রহণ করিবে।

বাংলার প্রতি জিলায়, প্রতিটী গ্রামে তাহাদের ঐ গড়ার মন্ত্র ঝঙ্কার তুলিবে। ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়িবার জন্য, ভারতীয় ভাবে সুশিক্ষিতা করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য এই নারীদল কি আজ অগ্রসর হইবে না? বাংলায় কি এমন উৎসর্গীকৃতা আপনহারা নারীর অভাব হইবে?

বাংলার কত পুরুষ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, সন্ন্যাসী বেশে জীবনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে নরের মাঝে নারায়ণের জাগরণের নিমিত্ত; আর নারী, সে পারিবে না নারী জাতির মধ্যে ভাগবতী মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটাইতে? কোথায় আছ সে নারী, বিশ্বের কল্যাণময়ী স্নেহময়ী মূর্ত্তি লইয়া, পূত পবিত্র জীবন-যাপনে উৎসুকা নারী, অগ্রসর হও তোমাদের কর্ম্মভার তোমরাই স্বহস্তে গ্রহণ কর।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ নারীর উন্নতির অবাধ ক্ষেত্র রচনায় আজ উদ্বুদ্ধ—তোমরা নিজদিগকে জাতির পরম কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া ধন্যা হও। এই আহ্বানে বাংলার তথা-কথিত শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা সকল শ্রেণীর নারীর অন্তরই কি সাড়া দিবে না?

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ
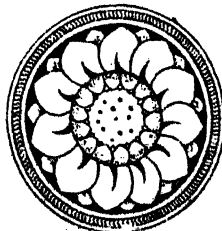
শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

ভারত ঃ ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রী নাইট ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের আগমনে ভারতের রাজনৈতিক আসর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের এক শ্রেণীর অদূরদর্শী লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, জাপান আসিয়া আমাদিগকে স্বরাজের উচ্চতম ধাপে তুলিয়া দিবে। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই অর্ব্বাচীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। সম্প্রতি এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে জনগণের মন হইতে ঐ ধারণার নিরসন হইবে। কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, জাপান বা অন্য আক্রমণকারী কেহ যে আমাদিগকে স্বরাজ দিবে, উহা নিছক ভ্রান্ত ধারণা। অপর দিকে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবও কিছুতেই যাইতেছে না। এ জন্যই কংগ্রেস যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করিলেও, বাধা দিবে না এবং আক্রমণকারীর বিপক্ষেও অহিংসভাবে অসহযোগ করিবে। আক্রমণকারী শক্রর নিকট আমরা কিছুতেই নতি স্বীকার করিব না, ইহাই বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে ভারতীয় নেতৃত্বের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ।

কিন্তু কংগ্রেসের এই নির্দ্দেশের প্রতিকূলে ভারতের কয়েকজন শক্তিশালী নেতা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ প্রতিবাদী মতগুলিকে তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণী হইতেছেন শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ভারতের মনীষি যাঁহারা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কোনও অংশ গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মত এই যে, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব গ্রহণ করা কংগ্রেসের উচিত। ভারতের জনগণকে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করা এক জিনিষ এবং ভারতের জনসাধারণকে দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে অন্য জিনিষ। তাহা ছাড়া ক্রিপ্‌স মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পাকিস্থানের বিষবটিকা খাইয়া হজম করিতে হইবে—এ কথাটার উপরও তাঁহারা তেমন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেছেন শ্রীরাজগোপালাচারিয়া পরিচালিত একদল কংগ্রেস সেবক। তাঁহারা নীলকণ্ঠের মত পাকিস্থানের বিষ বটিকা পরিপাক করিতে সমর্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রথমে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় এবং তাহাকে সাহায্য করিয়া শক্রর আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে। তাহার পরেই পৃথিবীতে এমন এক নূতন প্রাণধারা সঞ্চারিত হইবে—যাহার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কশাঘাত ও পাকিস্থানের বিষ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না। শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট রাজনীতিক। কিন্তু তিনিও এই সহজ সত্যটা বুঝিতে পারিলেন না যে, পাকিস্থানের নীতি একবার স্বীকৃত হইলে ভবিষ্যতের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় এক গলিত পূতিগন্ধময় ক্ষতের সৃষ্টি হইবে। তৃতীয় শ্রেণী হইতেছেন আমাদের সাম্যবাদী কম্রেডগণ। তাঁহারা শক্রর বিপক্ষে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষপাতী এবং ঐ উদ্দেশ্যে বিনাসর্ত্তেই বৃটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন যে, ফ্যাসিষ্ট নামক অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসের কবল হইতে রুশিয়া তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের নেতাগণ যদি ভারতীয় জনগণকে প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ না করিতে পারেন—তবে এতদিন তাঁহারা কি করিয়াছেন? আমাদের এই সব বন্ধুগণকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, কংগ্রেস নায়কগণ যে কোন কাজেরই উপযুক্ত নহেন, এ কথা তাঁহারা হাজার হাজার মজদুর সভায় ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এই অকর্ম্মণ্য প্রবীণ কংগ্রেস নায়কগণের উপর আবার নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করা তাঁহাদের উচিত নহে। সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্টগণই তো জনসাধারণের নেতা—এ কথাটা তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন। এখন রুশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতের জনগণকে গরিলা-যুদ্ধের আসরে নামাইবার দায়ীত্বটা তাঁহারাই গ্রহণ করুন না কেন?

উপরে যে তিন শ্রেণীর মতবাদের উল্লেখ করা হইল তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা সাধারণ ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। ভারতের জনগণকে মৃত্যুনিশ্চিত তরঙ্গভঙ্গে ঝম্পপ্রদানের

জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে উগ্র দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতে হইবে। ফ্যাসিজ্‌মের কবল হইতে রুশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতের জনগণকে শোণিত-তরঙ্গিনীতে অবগাহন করাইবার পরিকল্পনা একটা হাস্যোদ্দীপক প্রহসন মাত্র। উহার জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মনীষিগণের মতানুসারেও জনসাধারণকে গেরিলা যুদ্ধে উদ্বোধিত করিবার মত তেমন কোনও ইন্ধন বা প্রেরণার সন্ধান মিলে না। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতায় তাহারা দেশ ভুলিয়া গিয়াছে। এখন যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে—এই তোমাদের দেশ। এ দেশের কর্ত্তৃত্ব ভার তোমাদের হাতেই ন্যস্ত হইল। শত্রু তোমার স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রণসম্ভার প্রচুর পরিমাণে দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যাহা আছে তাহার দ্বারাই গেরিলা যুদ্ধ প্রণালীতে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে। কেবল তখনই জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রেরণা আসিতে পারে। অন্যথায় সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিলে একদল বেতনভুক সৈন্য সৃষ্টি হইবে—যাহারা কলের মত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কায়েমী করিবার জন্য এমন কি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকেও দলন করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

এই যুক্তি অনুসারে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অচলাবস্থা ও বিপদের প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয় এবং কখনও প্রস্তুত হইবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ শত্রু ভারতের দ্বারে সমাগত। এরূপ সঙ্কট সহস্র বৎসরেও একবার আসে না। এই যুগসন্ধিতে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে দেশবাসীকে যে নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহাই একমাত্র পন্থা; নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। উপরে যে শ্রেণীর মতবাদীর বিষয় উল্লিখিত হইল তাঁহাদিগকে আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ জনগণ আক্রমণকারীর বিপক্ষে দেশরক্ষার্থ মরণপণ করিয়া স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত তাঁহারা ইতিহাস হইতে দেখাইতে পারেন কি? তাহা ছাড়া আক্রমণকারী শত্রুই হউক আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীই হউক, নিরস্ত্র অধিবাসীগণের পক্ষে অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা ব্যতীত আর কি প্রকারে সংগ্রাম পরিচালন আশা করা যাইতে পারে?

এ ক্ষেত্রে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ব্যতীত গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব কিনা? কিন্তু আমরা স্বীকার করিতেছি যে, রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় অথবা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ব্যতিরেকেও গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা সম্ভবপর। ইতিহাসে উভয় প্রকার দৃষ্টান্তই আছে। কিন্তু তদনুযায়ী মনোভাব কোথায়? ঐ প্রকারের মনোবৃত্তি সঞ্চারিত করিবার পক্ষে পরাধীনতার আবেষ্টনী উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। উহাই আমাদের বলিবার কথা। কংগ্রেসের দাবী যদি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতেন, তবেই শত্রু-প্রতিরোধ মন্ত্রে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সুযোগ আসিত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অদূরদর্শিতায় ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়েই সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল।

প্রাচ্য রণাঙ্গনঃ প্রাচ্য রণ-রঙ্গমঞ্চে এখনও প্রথম অঙ্কের অভিনয় চলিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য যে যুদ্ধ তাহা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। নিউগিনির মোরস্‌বি বন্দর দখল করিবার জন্য জাপান এখন তৎপর। ব্রহ্ম দেশের পতনও আসন্ন। ব্রহ্মের পতনের সঙ্গে প্রথম অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত হইবে। বৃটিশ সৈন্যেরা দুর্গম অরণ্যপথ ধরিয়া যে সাফল্যের সহিত পশ্চাৎ অপসারণ করিতে পারিয়াছে, ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। ব্রহ্মের বৃটিশ সেনাপতির রণনৈপুণ্যের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

জাপানী সৈন্যদল মে মাসের মধ্যেই ব্রহ্মযুদ্ধ শেষ করিয়া চীনের একটা হেস্তনেস্ত করিতে প্রাণপণ-চেষ্টা করিতেছে। কারণ বর্ষা কাল সমাগতপ্রায়। আসাম ও ব্রহ্মে ভীষণ বর্ষার মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব। সুতরাং বর্ষা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জাপানী অভিযানের বিশেষ আশঙ্কা নাই। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পতনের পর জাপানের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য মুক্তি পাইয়াছে। প্রশ্ন এই, জাপান এখন কি করিবে? এমন মনে করা যাইতে পারে যে, জাপান জার্ম্মানীর সঙ্গে সঙ্গেই সাইবেরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে। উহারও পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

আমরা গত মাসে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, জাপান ও

জার্ম্মানী পশ্চিম এশিয়ার কোনও স্থানে সম্মিলিত হইবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছে। আমাদের ঐ অনুমানের মূলে যে সত্য নিহিত ছিল, তাহা বৃটিশ বাহিনীর পূর্ব্বাহ্নেই মাদাগাস্কার দ্বীপ দখল করিয়া লওয়ায় বুঝা যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী প্রভাব দমাইয়া দিবার পক্ষে বৃটনের এই নীতি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রাচ্যের সহিত মিত্র শক্তির যোগাযোগ রক্ষার পথও অনেকটা নির্ব্বিঘ্ন হইল। ফ্রান্সে মঃ লাভালের আধিপত্য এখন প্রতিষ্ঠিত। ম্যাডাগাস্কারেও বৃটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ভিসি সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছিল। অবশ্য এই ঘটনায় ভিসি গবর্ণমেণ্ট মিত্র শক্তির বিপক্ষে প্রত্যক্ষ শত্রুতায় অবতীর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া জার্ম্মানী ফ্রান্সে লাভাল-গভর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তা বাড়াইবার জন্যও চেষ্টা করিবে। নাৎসীর হাতের পুতুল ম লাভালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই সম্ভাবনা মিত্রশক্তি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন এবং সময়োপযোগী নিরাপত্তামূলক করণীয় যাহা, তাহাই করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

পশ্চিম রণাঙ্গন ঃ রুশ রণাঙ্গন, নিকট প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্য রণাঙ্গণে ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ডোনেৎস্ অববাহিকায় জার্ম্মানী যে বিপুল বাহিনী লইয়া আক্রমণের ভূমিকা দেখাইয়াছে তাহাতে ভাবী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ অনেকটা প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। আশার কথা, এবার মিত্রশক্তি সব দিক দিয়াই যে প্রস্তুত তাহার নমুনাও মিত্র শক্তির শক্তিশালী বিমান-বহরের আক্রমণাত্মক নীতি হইতে বুঝা যায়। আগামী কয় মাসে পৃথিবীব্যাপী যে ভীষণ মহা সংগ্রাম সংঘটিত হইবে, তাহাতে যুদ্ধের ফলাফল সুনিশ্চিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

মাদাগাস্কার

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

প্রশান্ত মহাসাগরের ঝটিকা আক্রমণের ফলে যখন ভারতের দুর্গদ্বার সিঙ্গাপুরের পতন হয়, তখন হইতেই ভারত মহাসাগরে এই আক্রমণের রুদ্ররূপ প্রকাশিত হইবে, অনেক আশঙ্কা করেন। আন্দামানের পতন এই আশঙ্কাকে দৃঢ় করে। সিংহলের আক্রমণ ও দক্ষিণ-ভারতের উপকূলবর্ত্তী বিশাখাপত্তম ও কোকনদ আক্রমণে জাপানের ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারে আর একটি পাদক্ষেপ। এই সময় হইতেই মাদাগাস্কার অধিকার লইয়া বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে একটি প্রতি-যোগিতার আভাষ যেন পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। আফ্রিকার পশ্চিমকূলবর্ত্তী ডাকার এক্সিস শক্তির হস্তগত হওয়ায় আটলাণ্টিক ও আফ্রিকার উপকূল দিয়া মিত্র শক্তির বাণিজ্য ও চলাচলের পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। মাদাগাস্কার শত্রুর কবলিত হইলে এই অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইত। সম্প্রতি মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক মাদাগাস্কার অধিকৃত হওয়ার ফলে জাপানের তিনটি মহাসমুদ্রে অভিযানের স্বপ্ন বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমরা এখানে মাদাগাস্কারের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামরিক অবস্থানের কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার উপকূলভাগ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এই দ্বীপটি আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপগুলির মধ্যে চতুর্থ। কেবলমাত্র গ্রীনল্যাণ্ড, নিউগিনী এবং বোর্ণিও মাদাগাস্কার হইতে আয়তনে বৃহত্তর। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া, ভারত ও লোহিত সাগরের যোগা-যোগের পথে এই দ্বীপটির অবস্থান সামরিক দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করিয়া ভারত মহাসাগরে বেপরোয়া আক্রমণরত শত্রুর পক্ষে মাদাগাস্কারের বন্দরে লুকাইয়া থাকিবার প্রচুর সুবিধা। এই কারণে নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের সময় ফরাসী জলদস্যুবাহিনী যাহাতে মাদাগাস্কারের অভ্যন্তর ভাগে আশ্রয় লইতে না পারে, সেইজন্য এই দ্বীপের প্রধান পোতাশ্রয় 'টামাটাভ' (Tamatave) বৃটিশকে দখল করিতে হইয়াছিল।

মাদাগাস্কারের আয়তন আড়াই লক্ষ স্কোয়ার মাইল, পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দর্শনীয় দ্বীপ হইলেও ইহা সাধারণতঃ

ভূপর্য্যটকের আগ্রহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ১৮৯৫ সাল হইতে এই দ্বীপের আধুনিক ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে ইহা ফরাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত উপনিবেশ বলিয়া ঘোষিত হয়। ফরাসীরা ডিয়েগো স্যুয়ারেজ (Diego Saurez) নামক পোতাশ্রয়ের যে উন্নতি সাধন করে তাহার ফলে ইহা এখন পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ পোতাশ্রয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ফরাসীরা এখানে টর্পেডো বোট ও ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ রাখিবার যে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাতে ইহা যে কোন আবহাওয়াতেই নিরাপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই দ্বীপের 'নিভারদে' নামক পোতাশ্রয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—এখানে যে 'ড্রাই ডক' আছে তাহা ৮০০০ টনের জাহাজ পর্য্যন্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারে। মাদাগাস্কারে নয়টি বন্দর এবং শতাধিক বিমান অবতরণের ঘাঁটি আছে। এখানকার রাস্তার মোট দীর্ঘতা ১৬ হাজার মাইল এবং রেলওয়ের দীর্ঘতা ৫ শতাধিক মাইল হইবে। গ্রাফাইট, চামড়া, অভ্র ও ক্যাষ্টর সিডের জন্য এই স্থানটি প্রসিদ্ধ। বৃটেনের এই দ্রব্যগুলির অভাব নাই। গ্রাফাইট আসে সিংহল হইতে এবং ভারতবর্ষ হইতে আসে অভ্র। কাজেই মাদাগাস্কারের দ্রব্যসম্ভার সম্ভবতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কাজে লাগিবে। বৃটিশ কর্ত্তৃক মাদাগাস্কার-অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে ২৭০০০ হাজার ফরাসীর বাস ছিল। মাদাগাস্কারের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল তিপান্ন বৎসরের বয়োবৃদ্ধ মঃ আবর্মা আনা সম্প্রতি দ্যগল পন্থীদের গ্রেপ্তারে খানিকটা উৎসাহ দেখাইয়াছেন। প্রকাশ এখানকার নৌবাহিনী বৃটিশ বিরোধী কিন্তু সৈন্যবাহিনী জার্ম্মাণবিদ্বেষী।

ফরাসী-পূর্ব্ব মাদাগাস্কারের ইতিহাসও বিচিত্র। দেশীয় অধিপতি কর্ত্তৃক ইহা বরাবর শাসিত হইত। নেপোলীয়নীয় যুদ্ধে বৃটেন সমস্ত ফরাসী উপনিবেশ অধিকার করিলে পর প্যারিসের সন্ধি (Treaty of Paris) সর্ত্তানুযায়ী এই দ্বীপ বৃটেনের অধিকারে আসে। বৃটেন এই দ্বীপের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই, এবং দেশীয় প্রজাবর্গ যাহাতে নিজেরাই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারে, ইহাই ছিল বৃটেনের উদ্দেশ্য।

এই সময় মাদাগাস্কারের শাসনব্যাপারে দেশীয় রাজগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাদেরই মধ্যে সম্রাট প্রথম রাদামা নানাদিক দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা তাহাকে পিটার দি গ্রেট-এর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। সমস্ত অধিবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণে তাঁহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। মাদাগাস্কারের কোন দেশীয় লিপি ছিল না, ইহারই আমলে ইংরাজ মিসনরীগণের সহায়তায় এই দ্বীপের কথিত ভাষা একটা সুপ্রতিষ্ঠ লিপির সম্মান লাভ করে। সম্রাট প্রথম রাদামার মৃত্যুর পর রাজ্ঞী শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার আমলে শাসন-সংস্কারের সব-কিছু ওলোট-পালোট হইয়া যায়। তাঁহার পুত্র মাত্র দুই বৎসর রাজত্বের পর নিহত হন—ইহারই আমলে ফরাসীগণ যথেষ্ট সুবিধা আদায় করিয়াছিল। ইহার রাণী প্রকৃত সুশাসিকা ছিলেন। ইনি বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে অনুসরণ করিয়া রাণী 'রানোভাদো দি থার্ড' শাসনভার গ্রহণ করেন তিনিও সুশাসিকারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি মাদাগাস্কারকে সার্ব্বভৌম ও সভ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে শক্তিবর্গকে অনুরোধ করেন, বৃটেন স্বীকৃত হইলেও ফ্রান্স এ ব্যাপারে যথেষ্ট বাধা দেয়। ইহার পরই ফ্রান্সের সহিত এই দ্বীপের রাজনীতিক সম্পর্ক তিক্ত হইয়া ওঠে। পর পর দুইটি যুদ্ধের পরই দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। শুধু ফরাসীদের উপর নয়, সমস্ত খৃষ্টান জাতির বিরুদ্ধে ইহারা উত্তেজিত হইয়া ওঠে। ইহার পরেই ফরাসীগণ সমস্ত দ্বীপটি দখল করে এবং রাজ্ঞীকে রিইউনিয়ন নামক দ্বীপে অন্তরীণ রাখে। এখানেই বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মাদাগাস্কারের এই অনতিদীর্ঘ ইতিহাসে একটি অল্প পরিচিত ও ইউরোপীয়-অর্থে অনুন্নত জাতির যে স্বাধীনতা প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করে। কিন্তু ইহা আজ অতীতের কথা, বর্ত্তমানে বৃটিশ কর্ত্তৃক এই দ্বীপটির অধিকারের ফলে সামরিক দিক দিয়া প্রতিপক্ষের উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব

শ্রীসুবোধ দত্ত

[চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের বিংশ বর্ষে যে উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী ৫ই বৈশাখ হইতে ১৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, প্রবর্ত্তক কলেজের ছাত্র কর্ত্তৃক লিখিত তাহারই ইহা সংক্ষিপ্ত আলেখ্য। প্রঃ সঃ]

উৎসব-প্রভাত। ভোরের আকাশে আলো-আঁধারের স্বপ্ন-মাধুরী তখনও যেন নেশার মত জড়াইয়া আছে। বাহিরের জগৎ তখনও স্তব্ধ, নিথর। শুধু পাখীর কণ্ঠে আলোর বন্দনা কেমন যেন জাগরণের গানে সুরের মোহ জমাইয়া তুলে।

আজ অক্ষয়তৃতীয়া। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জীবনোৎসব। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরে উৎসবের আবাহন উপাসনারই উদ্গান-মন্ত্রে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, আচার্য্য, সঙ্ঘের নারীপুরুষ সকল সঙ্ঘবাসীই আজ এখানে উপস্থিত। উপাসক ও উপাসিকার প্রীতিঘন সম্মিলনী, নারীকণ্ঠে ভজন-গীতি, বৈদিক স্তুতি তৎপরে যথারীতি সম্মিলিত কণ্ঠে সুগম্ভীর রোলে উপাসনায় ঋক্‌ধ্বনি—সব সমাপ্ত হইলে, সঙ্ঘ-সম্পাদক ধ্যানমগ্ন সঙ্ঘ-গুরুর দূরাগত আশীর্ব্বাণী পাঠ করিলেন। দীর্ঘ উনিশ বর্ষ পরে এই প্রথম উৎসবের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘগুরু উৎসবক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত নাই; কিন্তু তাঁর অশরীরিণী প্রেরণা যেন ভাবঘন মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীমন্দিরে ভরিয়া রহিয়াছে। বাহিরে শূন্যতা, কিন্তু ভিতরে পূর্ণ—এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতির রহস্যঘনিমা!

সঙ্ঘগুরুর বাণীর মধ্যে অন্যান্য কথার পর এই প্রেরণার কয়েক ছত্র এখনও কানে বাজিতেছে—সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ যাহাদের হস্তে তাহাদেরই জন্য যেন ইহা অদূর ও সুদূরের দিক্‌নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে:

"পাঁচ বৎসর পরে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের রজত জয়ন্তী পর্ব্ব আসিবে। এই বিশ বৎসরব্যাপী অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবে তোমরা এমন এক শত সভ্য করিয়া লইবে, যাঁহারা আগামী রজত জয়ন্তী উৎসবে একাত্ম হইয়া এই সংগঠনপন্থী সাধনা ও জাতীয় সংস্কৃতিপ্রচার সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই সঙ্ঘের ও চন্দননগরবাসীর তথা নিখিল দেশবাসীর এই গৌরবময় কীর্ত্তির একটী অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস লিখিত থাকিবে।"

তারপর সঙ্ঘের চারণগণ প্রবর্ত্তক কলেজের শিক্ষার্থী ও বিদ্যাপীঠের ছাত্রমণ্ডলী সমভিব্যাহারে গৈরিক পতাকা হস্তে নগরকীর্ত্তনে বাহির হয়। স্তব্ধ পল্লীবক্ষে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা নিদ্রোত্থিত জনতাকে আকর্ষণ করিয়া এক অপূর্ব্ব জাগরণের সাড়ায় উৎসবের আগমনবার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা করে:

বেদধ্বনি তোল, তোল সামগান।
শতকণ্ঠে তোল শিবের বিষাণ।
মোহমুগ্ধ জাতি লভিয়া চেতন
শির তুলি' আজ জাগো রে॥

নাহি আজ ভয়, নাহিক সংশয়,
অমৃতের পুত্র, তোরা মৃত্যুঞ্জয়।
জ্ঞান, বীর্য্য, গতি, সকলি অক্ষয়
নব জন্ম আজি মাগো রে॥

হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ নারায়ণ
প্রতি জীবে শিব হও সচেতন।
ঘরে ঘরে ঘুরি, ব্রহ্মনাম গাহি—
কত প্রেম-অনুরাগ রে॥

বল জয়, জয়, ভারতের জয়
মন্ত্র, গুরু, তীর্থ-দেবতার জয়।
পুণ্য দেবভূমি, নমি তারে নমি,
ভাসি যে অমৃতসাগরে॥

ইতিমধ্যে শ্রীমন্দিরের একাদশ শীর্ষে একাদশটী গৈরিক পতাকা উড্ডীয়মান করা হয়। উৎসবক্ষেত্রেও বিবিধ চারু-শিল্পযুক্ত প্রদর্শনী দেখিতে দেখিতে এক মায়াপুরীর রূপে ঝলমল করিয়া উঠিল।

এবার মূর্ত্তি-বিভাগের এক প্রান্তে নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পী কর্ত্তৃক ভারতের কবিশিল্পীদৃষ্ট পরম ভাবময় নটরাজমূর্ত্তি নূতন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান বিশ্বজীবনপটে নটরাজেরই ভীমভৈরব অথচ ছন্দোমধুর অপূর্ব্ব লালানৃত্যই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। অপর কক্ষে ভারতেতিহাসের কৃষ্ণত্রয়কে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই তিন কৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগেরই ন্যায় যুগমানবের আর এক সন্ধিযুগে ভারতের ঐতিহাসিক মঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিন জনের একই লক্ষ্য, একই মিশন। যুগের মন্ত্রদাতা বাসুদেব কৃষ্ণ। সেই মন্ত্র-সাধনের অব্যর্থ যন্ত্রস্বরূপ মহাকর্ম্মী ধনুর্দ্ধর পার্থকৃষ্ণ, যিনি কুরুক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এ যেন রামদাসের মন্ত্রদীক্ষিত ছত্রপতি শিবাজী বা ঠাকুর রামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বীরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ—মন্ত্রদ্রষ্টা ও আদর্শ কর্ম্মীর যুগপৎ মিলন না হইলে কোন যুগে কোন মহাব্রত সিদ্ধ হয় না। এই কৃষ্ণত্রয়ের তৃতীয় হইলেন মহাজ্ঞানী ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি ছিলেন সেই যুগের প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মবাণী ব্যাসদেবের ন্যায় একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী প্রচারকশ্রেষ্ঠের মধ্য দিয়া ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী রেখাপাত করিতে পারিয়াছে। ভারতের জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অখণ্ড প্রবাহরক্ষা ও তাহাই জাতীয় জীবনে ব্যাপক ও সংহতভাবে চিরদিন সঞ্চারিত করার সুব্যবস্থা করিয়া

বেদব্যাস যে প্রচারব্রতের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এমন অপূর্ব্ব স্থায়ী প্রপোগেণ্ডা-বিভাগসংগঠনে কোনও আধুনিক ভারত-নেতার কথা ছাড়িয়াই দিই, স্বাধীন বীরজাতিদের মধ্যেও কেহ এতখানি স্থায়ী সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

মডেলের সাহায্যে আর এক কক্ষে ভারতশক্তির মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। এই মূর্ত্তি বাংলার চিত্রগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পরিকল্পনা। ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতামালার মধ্য দিয়া ইহার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরে পূজনীয় সঙ্ঘগুরুর পরিকল্পিত পঞ্চ-শক্তিকে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া শিল্পীর কল্পনাকে একটী পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। সেই পঞ্চশক্তি যথাক্রমে সাবিত্রী, সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী ও শ্রীরাধা। জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজ, এই পঞ্চনীতি সর্ব্বাঙ্গ জীবনের প্রতীকস্বরূপ, পূর্ণাঙ্গ জাতি-জীবন-সংগঠনের জন্য সংগঠনপন্থীর চক্ষে পঞ্চশক্তিযুক্তা দেশমাতৃকা-মূর্ত্তির আবির্ভাব ও আবিষ্কার বাঞ্ছনীয়।

অন্যদিকে লিপিবিভাগে ভারতসংস্কৃতির মর্ম্ম ও পরিচয় চিত্রে ও চার্টের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। এই লিপিগুলি দেশসাধক ও কর্ম্মীর দেশমন্ত্রধ্যানে সহায়তা করিবে। তাঁহারা যদি প্রণিধানপূর্ব্বক গভীর মনোযোগ দিয়া এই চিত্র ও লেখাগুলি পাঠ করেন, সঙ্ঘ-গুরুর বহুদিনের চিন্তা ও সাধনলব্ধ ভারত-জাতীয়তার মর্ম্ম অনেকখানি সুস্পষ্টাকারে প্রতীয়মান হইবে। জাতীয় সংস্কৃতিই যে জাতির প্রাণস্বরূপ, জাতিকে রক্ষা করে, ইহা সুনিশ্চিত। ভারতের সংস্কৃতি অপৌরুষেয় সত্য, ঋত ও বৃহৎ—যাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম নিত্যতত্ত্ব। হিন্দু ভারতের প্রকৃত জাগরণের মন্ত্র, হিন্দুর প্রকৃত সংজ্ঞা ও পরিচয়, তাহার শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়, এই প্রস্থানত্রয়ের বিশদ তত্ত্ব বিশ্লেষণ, তাহার মন্ত্র, গুরু ও প্রতিমার আত্মপ্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি ও বিবরণ ক্রমিকভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে এই সকল পটে। প্রদর্শনীর এই কৃষ্টিমূলক দৃশ্যগুলির সহিত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জীবনেতিহাসের সামান্য রেখাচিত্রও অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতে এই সংগঠন-সাধনার অগ্রণীরূপে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাংলার যে নূতন পদক্ষেপ করিয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত জানিবার কৌতূহল যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই রেখাচিত্রগুলির মধ্য দিয়া সঙ্ঘের ক্রমবর্দ্ধন উন্নতির কথা জানিতে পারিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন।
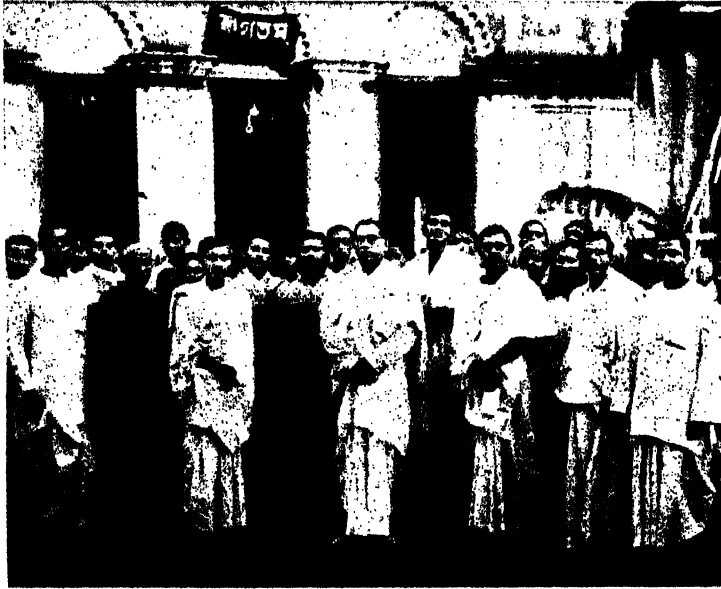
উৎসব-প্রাঙ্গণে উদ্বোধন-সভার পুরোহিত মাননীয় শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু (বাম হইতে তৃতীয়)

উদ্বোধন-সভার পুরোহিত মাননীয় মন্ত্রিবর শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এম-এল-এ মহাশয় এই সকল চার্ট, লিপিচিত্র ও মডেল দেখিয়া বিমুগ্ধ হন এবং বলেন—"কোন জাতিকে বাঁচিতে হইলে, প্রথমেই সেই জাতিকে উহার কৃষ্টি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মসম্পদ্-রক্ষাকল্পে বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল—বর্ত্তমান কোলাহল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, আবহমানকাল ধরিয়া কর্ম্মপ্রবাহের পিছনে যে বাণী সামগানের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ডুবাইয়া দিব। প্রবর্ত্তকের ভাব-ধারার সাথে নিজেকে যুক্ত করিয়া দিব। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধ ও দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব হেতু আমাকে এই সুযোগগ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। অল্প সময়ের জন্য প্রবর্ত্তকের এই তীর্থক্ষেত্রে আনতশিরে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। এই যে মন্দির ও প্রদর্শনী কক্ষ ইহার ভিতর শিক্ষার উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার এখানে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।"

তারপর দ্বিতীয় দিনে (৬ই বৈশাখ) গোন্দলপাড়ার ও চন্দননগরস্থিত দুই দল এ, আর, পি, বিমানাক্রমণপ্রতিরোধ মহড়া বিষয়ে কতকগুলি কৌশল প্রদর্শন করেন এবং কি উপায়ে বোমায় আহত ব্যক্তি-দিগকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ও নিকটস্থ হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়, তাহাও দেখান। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহা সাধারণের বড়ই উপকারে আসিবে এবং সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ করিবে।

তৃতীয় দিন (৭ই বৈশাখ) প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ভারতের কয়লা সম্পদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক মহাশয় বর্ত্তমানে কয়লার আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রকার কয়লার ব্যবহার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আইন প্রণয়ন দ্বারা বিধিবদ্ধ না হইলে, অদূর ভবিষ্যতে কয়লার অভাবজনিত ভারতের ধাতবসম্পদের বিনষ্টি ঘটিবে এবং ভারতবাসী এক আশঙ্কাজনক অবস্থার সম্মুখীন হইবে। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের ও রাজশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ দিবসে (৮ই বৈশাখ) সঙ্ঘের অনুরাগী সুহৃদ্ হাস্যরসিক অমরেশ গঙ্গোপাধ্যায় হাস্যকৌতুক দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করেন।

পঞ্চম দিবসে (৯ই বৈশাখ) চুঁচুড়ার কৃষিবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিজয়লাল চক্রবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং ইহার ফলে কৃষকদের দুঃস্থ অবস্থার প্রতিকারের কথা বলেন।

ষষ্ঠ দিবসে (১০ই বৈশাখ) শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে "প্রবর্ত্তক সাহিত্যসম্মেলন" হয়। এই সম্মেলন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রথমে সকলেই দুই মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অতঃপর এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়—"বিশ্বকবি, ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত্তবিগ্রহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানে এই প্রবর্ত্তক সাহিত্য-সম্মেলন হৃদয়ে গভীর পরম আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছে ও তাঁহার ঊর্দ্ধলোকচারী আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জাতির অভ্যুদয়ের সাধনায় তাঁহার অমর আশীষ প্রার্থনা করিতেছে।" শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কিছু বলেন ও তাঁহার সদ্য প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ' পুস্তক হইতে গ্রন্থকারের ভ্রাতা শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ রবীন্দ্র-স্মৃতি-কথা পাঠ করেন। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণদাস রায় স্বরচিত কবিতা এবং শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত মণিলাল ভট্টাচার্য্য, ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সপ্তম দিবসে (১১ই বৈশাখ) চন্দননগরের বিশিষ্ট গায়কদের এক সঙ্গীতজলসা হয়। গায়কদের মধুর সঙ্গীতালাপ উপস্থিত সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে। কুমারী বিভা, আভা ও ইভা চক্রবর্ত্তীর গান ও বিভিন্ন তারযন্ত্রে হস্তচালনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অষ্টম (১২ই বৈশাখ) ও নবম দিবসে (১৩ই বৈশাখ) হাটখোলা তরুণ সঙ্ঘদল ও ব্যায়ামবীর শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনাধীনে কাবারীপাড়া রাসবিহারী-ক্যাম্প বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন ও মাংসপেশীর সঞ্চালন প্রদর্শন করেন। জাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রথমে জাতীয় ক্ষাত্রবীর্য্যের উন্মেষ একান্ত আবশ্যকীয়। এই দুই দিনেই বহু লোকসমাগম হয়।

দশম দিবসে (১৪ই বৈশাখ) মহিলাসম্মেলনে শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবী সভানেত্রী হন। দেশ ও জাতির কল্যাণে স্ত্রীজাতির অবদান ঢালিবার আকুল আহ্বান সঙ্ঘের নারী-মন্দির-সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্তের কণ্ঠে ফুটিয়া উঠে। সভানেত্রী স্বয়ং যুগনারীর কর্ম্ম ও সাধনার উপযুক্ত দিক্‌নির্দ্দেশ করেন।

একাদশ দিবসে (১৫ই বৈশাখ) হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত মণীন্দ্রনারায়ণ রায় বিভিন্ন দেশের মতবাদের আলোচনা দ্বারা ভারতের আদর্শ ও জীবনবাদী জাতীয়তার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

দ্বাদশ দিবসে (১৬ই বৈশাখ) অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভড়ের পৌরোহিত্যে চন্দননগর সংহতিসম্মেলন হয়। ইহাতে প্রত্যেক সংহতি বা সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্ম্মসূচী অনুযায়ী পরস্পর সহযোগিতা রক্ষা করিয়া কিভাবে দেশের ও জাতির সেবা করা যায়, সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়।

সমাপ্তিদিবসে (১৭ই বৈশাখ) চন্দননগরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় সমাপ্তি-উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। তিনি প্রথমে প্রবর্ত্তকের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও দেশসেবক ৺কৃষ্ণচন্দ্র পালের স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভারম্ভ হইলে, উৎসবের অন্যতম সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী উৎসব ও প্রদর্শনীর বিবরণী পাঠ করেন। সভাশেষে শ্রদ্ধেয় চারুবাবু সঙ্ঘের উৎসব ও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য সেবার কথা উল্লেখ করিয়া সঙ্ঘকর্ম্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভা শেষ হইলে, প্রতি দিনের ন্যায় প্রবর্ত্তক নারীমন্দির কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরে দশাবতার স্তোত্র গীত হয়। তারপর নিত্যনৈমিত্তিক সমবেত উপাসনা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে সঙ্ঘ-সম্মেলনে, শ্রীগুরুর আবির্ভাবের অনুভূতি ও বাণীঘোষণায় উৎসবের পরিসমাপ্তি—প্রত্যেক সঙ্ঘবাসী ও দেশবাসীরও প্রাণে শুধু একটা স্নিগ্ধমধুর তৃপ্তি ও আনন্দের প্রলেপ রাখিয়া গেল।

আবার উৎসব আসিবে। হে উৎসব-দেবতা, তোমার সেই মঙ্গল-মধুর আগমনেরই প্রতীক্ষায় আবার আমরা তপস্যায় ও ধ্যানে দিন গণিব। তোমার আশীষধারা সঙ্ঘ ও জাতিকে চির অভিষিক্ত করিয়া রাখুক, এইটুকুই আজিকার প্রার্থনা।

সাময়িকী

রাজাজীর প্রস্তাবের পরিণতি :

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুত রাজগোপালাচারী মুসলিম লীগের ভারত-বিভাগের দাবী সমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা শোচনীয়-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ ভোট ও বিপক্ষে ১২০ ভোট প্রদত্ত হওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে। অপর পক্ষে শ্রীযুত জগৎনারায়ণলালের ভারত-বিভাগের বিরোধী পাল্টা প্রস্তাবটি ৯২—১৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে এই উভয় প্রস্তাব লইয়া তিন ঘণ্টা যাবৎ তুমুল বিতর্ক হয়। শ্রীযুত কে শান্তনম্ শ্রীযুত রাজগোপালাচারীকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা নুরুদ্দিন বেহারী ও মিঃ ইউসুফ মেহেরালি।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক রাজাজীর পদত্যাগ পত্রও গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত রাজগোপালাচারীর পদত্যাগের পর মাদ্রাজের রাজনীতি কোন্ পথ আশ্রয় করে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাদ্রাজ নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) রাজনীতির প্রতি ঝোঁক দীর্ঘদিনের, কিন্তু তাহা হইলেও কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিতে হইলে বর্ত্তমানে মাদ্রাজ কংগ্রেসীদের এই ঝোঁক ছাড়িতে হইবে। রাজাজীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজের কংগ্রেসী সকল সভ্যগণই যে স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইবে, মনে হয় না। রাজাজী এই প্রস্তাবের আনুকুল্যে লোকমত-গঠনের জন্য যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দলের কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াও আশ্চর্য্য নয়। গান্ধীজীর প্রভাব কংগ্রেস ও মাদ্রাজের মধ্যে এই অপ্রীতিকর অবস্থাটা অনেকটা মসৃণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিলে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

পরলোকে স্যার হেনরী গিডনী :

স্যার হেনরী গিডনীর মৃত্যুতে ভারতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে যোগদান করিয়া তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকিলেও, এই নেতার শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তিনি নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে শরৎচন্দ্র রায় :

খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি অপসারিত হইলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি গবেষণা-নিরত ছিলেন এবং যাহাদের অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইত, পরলোকগত রায় মহাশয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষায়ও এ সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। তিনি বিহারবাসী বাঙ্গালীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাংলার স্তিমিত-প্রায় প্রতিভার ক্ষেত্রে রায় মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব আজ যথেষ্ট অনুভূত হইবে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

৺শরৎচন্দ্র রায়

আসামের নূতন লাট :

গত ৪ঠা মে মাননীয় স্যার এ্যাণ্ড্রু ক্লো আসাম লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে স্যার রবার্ট রীডের শাসন পরিচালনায় আসামে মন্ত্রিসভা লইয়া যে অবাঞ্ছনীয় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এই উপলক্ষে নিরাকৃত হইলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে।

স্যার এ্যাণ্ড্রু ক্লো কেবল সিভিলিয়ান নহেন, তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। বিশেষ করিয়া তাঁহার মত পার্লামেণ্টারী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাসক এদেশে অধিক নাই। বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাকে ভারত সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সহিতও তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে ভারতের এই উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্ব অত্যধিক বাড়িয়াছে। আমরা আশা করি, আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসকরূপে স্যার এ্যাণ্ড্রু ক্লো যে গুরুতর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইবেন তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। আমরা তাহার এই নূতন কার্য্যভার গ্রহণ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

সঙ্ঘ-সাধকের স্মৃতি-রক্ষা :

বিগত বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সঙ্ঘের একনিষ্ঠ সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মহাপ্রয়াণোপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে চন্দননগর প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবনের নূতন ছাত্রাবাসে এক প্রস্তরফলক স্থাপিত হয়। ইহার উন্মোচনকার্য্য সম্পন্ন করেন চন্দননগরের বিশিষ্ট নাগরিক ও কঁসেই জেনেরেল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়। তিনি বলেন যে, বাঙালী জাতির জীবনে সঙ্ঘের উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষিত কৃষ্ণচন্দ্রের মত সত্য রক্ষার দৃষ্টান্ত সুদুর্ল্লভ।

ভারতীয় ডাক বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট :

সম্প্রতি ভারতীয় ডাক বিভাগের ১৯৪০-৪১-এর যে বার্ষিক কার্য্য বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে এই বিভাগের বিরাট্ কর্ম্ম-প্রসারের কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইবে। এই বৎসর ডাক বিভাগ কর্ত্তৃক ১,২১৫০ লক্ষ দ্রব্য (Postal articles) গৃহীত হইয়াছে। কর্ম্মচারী সংখ্যা ১২১,০০০ ও পোষ্ট অফিসের সংখ্যা ২৫,৩৩৮ দেখা যায়। এই বৎসর আর্থিক আদান-প্রদানের কার্য্য হইয়াছিল প্রায় ২৯৮ কোটি টাকার। ৩৯০ লক্ষের উপর রেজিষ্টার্ড এবং ২৬ লক্ষ ইন্সিওর (Registered and insured articles) এ বৎসর প্রেরিত হইয়াছিল। ৪৩০ লক্ষ মণি অর্ডার পোষ্ট অফিস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল এবং ইহার মোট টাকা ছিল ৮০·৪ কোটি। আলোচ্য বর্ষে টেলিগ্রামের সংখ্যা ছিল ১৯০ লক্ষ; সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থের ব্যালেন্স ছিল ৫৯ কোটি টাকা। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগের ১,২৪,৮০,৩২৫ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত ইহাই ডাক বিভাগের সর্ব্বোচ্চ আয়।

কর্পোরেশনের নূতন মেয়র :

গত ২৯শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের এ বৎসরের প্রথম সভায় শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর মেয়রপদে

মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর

বিদায়ী-মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
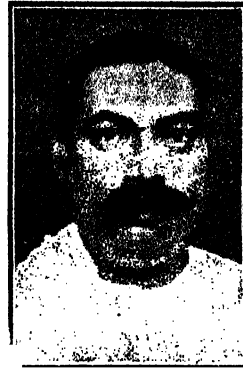
নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ হাজি আদম ওসমান ডেপুটি মেয়রের সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ উপলক্ষে আমরা উভয়কেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। শ্রীযুত নস্কর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিশেষ অনুরাগী সুহৃদ এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁর যোগাযোগ বর্ত্তমান। শ্রীযুত নস্করের কংগ্রেসের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য কর্পোরেশন ও পরিষদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল কর্পোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা আশা করি, তাহা এই মহানগরীর সৌকর্য্য ও সুখ-সুবিধার জন্য নিয়োজিত হইবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন :

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ও কৃষি মন্ত্রী মিঃ কে, হবিবুল্লা এক যুক্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে বাংলার কৃষকগণের প্রতি এই মর্ম্মে এক আবেদন জানাইয়াছেন যে, ভারতের বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার পথ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল। এ দেশে প্রতিবৎসর গড়পড়তা যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় তাহা মোট চাহিদার অনুপাতে অনেক কম। যুদ্ধের জন্য ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানীও একেবারে বন্ধ। সুতরাং এখন হইতে কৃষকগণ যদি ধানের চাষ বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে বাঙলাদেশে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। এই জন্য ধান ও অপরাপর খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের কৃষককুলকে সবিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছে। বীজের অভাব হইলে স্থানীয় কৃষি-কর্ম্মচারী, কৃষি-ডিমনষ্ট্রেটার, সার্কেল অফিসার, জুট রেগুলেশন বিভাগের অফিসার অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা কৃষকগণকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন।

এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের উদ্যোগে 'ফুড প্রোডাক্‌সন্ কমিটি' নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচার ও উৎসাহকল্পে কলিকাতায় কয়েকটি সভাও হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এইসব সভাতে যোগদান করিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ও উপদেশ দান করেন।

অবৈতনিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা :

গত ১৬ই বৈশাখ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ঘৃত-প্রস্তুতি-কেন্দ্র, ফরিদপুর জেলার গঙ্গানগর গ্রামে সঙ্ঘের একটী অবৈতনিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সমাজনেতা শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৌলিক উদ্বোধন-সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভায় সর্ব্বশ্রেণীর শতাধিক বিশিষ্ট পল্লীবাসী সমবেত হইয়াছিলেন। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সভায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জাতিগঠননীতি ও শিক্ষার আদর্শের কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সঙ্ঘ শুধু কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান নহে, ইহা একটী ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও নীতিকে ভিত্তি করিয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ পল্লীতে পল্লীতে যে গঠনমূলক কাজ করিতেছে, ইহার দ্বারা সমাজে নূতন প্রাণসঞ্চার হইবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীতে বেশ উৎসাহের সাড়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছে।
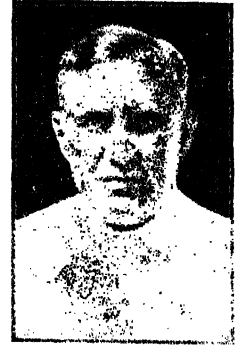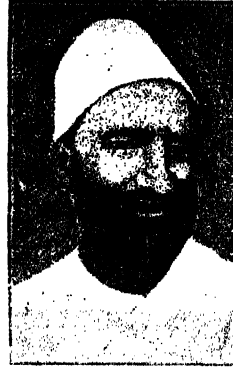
খাঁ সাহেব আব্দুল গোফুর খান ও ডাক্তার খান সাহেব : সীমান্ত প্রদেশের এই নেতৃদ্বয়ের সম্প্রতি কংগ্রেস হইতে অবসর-গ্রহণ বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে মার্কিণ মিশন :

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে একদল শিল্প-বিশেষজ্ঞ এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন। এই মিশনের সভাপতি মিঃ হেনরী গ্রেডী বলিয়াছেন যে, ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যই তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন। সামরিক সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারীর সুবিধার জন্য এ দেশে কি বিধি-ব্যবস্থা দরকার এবং কি কি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন, বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারা তাহা স্থির করিবেন। সম্প্রতি এই মিশন কলিকাতায় আসিয়া স্থানীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে 'রোজার মিশন' এদেশে আসিয়াছিল তাহাদের কার্য্যধারা ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়ক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিয়া এদেশের অনেকে বর্ত্তমান মার্কিণ মিশন সম্বন্ধে নানারূপ সংশয়ের ভাব পোষণ করিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে, যুদ্ধের সুযোগে আমেরিকান পুঁজিপতিদের (capitalist) পরিচালনায় এ দেশে কয়েকটি লাভজনক

শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং তদ্দ্বারা ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমেরিকান মিশনের সভাপতি মিঃ হেনরী গ্রেডী এই সন্দেহের নিরসন করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর কোন দিক দিয়া কোন প্রভাব বিস্তার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে ভারতকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। মার্কিণ মিশনের এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতের পক্ষে যথেষ্ট ভরসার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রবর্ত্তক কলেজ:

গত ১লা সেপ্টেম্বর চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে প্রবর্ত্তক কলেজ অব কাল্‌চারের দ্বিতীয় বার্ষিক সেশন আরম্ভ হয়। উপনিষৎ, গীতা, যোগ প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শনাদির অধ্যাপনার সহিত সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ছাত্রদের চিন্তা ও কর্ম্মজীবন গঠনের যে ব্যবস্থা এখানে আছে, তাহা পূর্ণভাবে পালন করিয়া ছাত্রগণ আগামী জুন মাসে বার্ষিক পরীক্ষান্তে সমাবর্ত্তনোৎসবের সম্মুখীন হইবে। অতঃপর, জুলাই মাস হইতে কলেজের তৃতীয় সেশন আরম্ভ হইবে। ইহা আশা করা যায়, নূতন বর্ষের জন্য কলেজের নিয়মাবলী ও অনুষ্ঠানপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সকল শিক্ষার্থী প্রবর্ত্তক কলেজে যোগদান করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার পরিচয় লাভের সহিত স্বাবলম্বী ও সংহতিনিষ্ঠ কর্ম্ম, শিক্ষা ও দেশসেবার সুযোগ লাভ করিতে চায়, তাহারা ১৫ই জুনের মধ্যে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের নিকট (চন্দননগর) আবেদন করিলে, তৃতীয় সেশনের প্রস্পেক্টাস যথাসময়ে তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে। এ বৎসরে ১৫টি মাত্র নূতন ছাত্র গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কলেজের প্রথম সেশনের উত্তীর্ণ ছাত্রকেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে সবেতন কর্ম্মশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। আমরা আশা করি, দেশবাসীর স্নেহদৃষ্টি এই জাতিগঠন প্রচেষ্টার প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

শিল্পীর যুদ্ধে যোগদান:

সুপরিচিত চিত্রশিল্পী শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মল্লিক ইণ্ডিয়ান কোর অফ এঞ্জিনীয়ারীংএর অধীনে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাংলার চিত্র-শিল্পে শ্রীমান নরেন্দ্র নাথের প্রতিভা একটি সম্ভাবনার পরিচয় দিয়াছিল। আমরা আশা করি, তাহার শক্তি ও কর্ম্মশীলতা এই নূতন পথেও তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দিবে। প্রবর্ত্তক পাঠক-পাঠিকার নিকট শিল্পী নরেন মল্লিকের নাম সুপরিচিত।
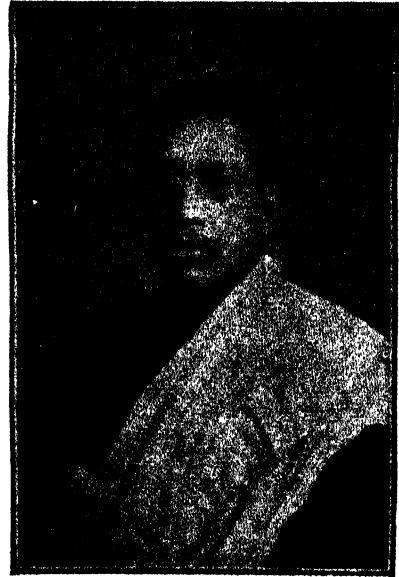
৺বিপিনচন্দ্র পাল: সম্প্রতি স্বর্গতঃ বিপিনচন্দ্র পালের দশম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের তীক্ষ্ণ সজাগতা ও বাগ্মীতা তাঁকে বাঙালীর স্মৃতিপটে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বিপিনচন্দ্রের স্থায়ী স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়।

উপাসনা-বার্ষিকী:

ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায় নিয়মিত উপাসনা। প্রবর্ত্তক - সঙ্ঘ ব্যাপক উপাসনা - প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা করিতেছে। সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ গৃহীসভ্য চন্দননগর-বাসী শ্রীযুত অরুণচন্দ্র সোম নিষ্ঠার সহিত বিগত ত্রয়োদশ বর্ষ সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘজননীর আসন প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিয়মিত উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। গত ৬ই মে বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীযুত সোম মহাশয়ের বাটিতে যে ত্রয়োদশ উপাসনা-বার্ষিকী উৎসব হয় তাহাতে স্থানীয় সঙ্ঘের সকল সভ্য-

সভ্যা উপস্থিত হন এবং পবিত্র অধ্যাত্ম আবহাওয়ায় সৃষ্টি হয়। সঙ্ঘগুরু এই উপলক্ষ্যে গার্হস্থ্য জীবনে দিব্যপ্রেম ও আনন্দলাভের নির্দ্দেশসূচক এক শুভবাণী প্রেরণ করেন।

ঢাকার সাম্প্রদায়িক মামলা প্রত্যাহৃত :

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত যে সমস্ত মামলা দায়রার বিচারাধীন ছিল, দায়রা জজ মিঃ জে, দে তৎসমুদয় প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ঢাকার পল্লী অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত মামলাসমূহ আপোষে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এস টি জনের এজলাসে পেশ করা হয়। তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট একশত মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের এই প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক্ ও অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের এই যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল, আমরা আশা করি, তাহা বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক কার্য্যপ্রণালীতে পর্য্যবসিত হইবে না। ইহার সূত্র ধরিয়া বাংলায় একটা বৃহত্তর শান্তি ও ঐক্যের যুগ প্রতিষ্ঠা হইবে।

রাজবলহাটে স্মৃতিসভা :

গত ২০শে বৈশাখ হুগলী জেলার রাজবলহাট পল্লীতে পরলোকগত মনীষী পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক ও প্রত্নবিৎ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা পরলোকগত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন। আমরা এই উপলক্ষে স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করিতেছি।

সঙ্ঘসভ্যের যুদ্ধে যোগদান :

গত ১৬ই বৈশাখ চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চিকিৎসক ডাঃ হারাণচন্দ্র রায়, এল, এম, এক মিত্রপক্ষীয় চিকিৎসা-বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে বিদায়কালীন অভিনন্দন দিবার জন্য প্রাতরুপাসনার পর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ শ্রীমন্দিরে এক সঙ্ঘাধিবেশন হয়। তাহাতে সঙ্ঘের নারী-পুরুষ সকল সভ্যই উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবাব্রতের সাফল্য কামনা করিয়া ডাঃ রায়কে চন্দন-টীকা ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। সঙ্ঘগুরু সঙ্ঘসন্তানের এই বিজয়াভিযানে তার ও পত্র-দ্বারা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া জয়কামনা করেন। কলিকাতার সঙ্ঘভ্রাতৃগণ হাওড়া ষ্টেশনে ডাঃ রায়কে সালিঙ্গন বিদায় অভিনন্দন দিয়া পাঞ্জাব মেলে উঠাইয়া দেন।

পরলোকে শশিভূষণ তরফদার :

নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শশিভূষণ তরফদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ছাত্রসাধারণের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বিশেষভাবে জ্ঞানব্রতী ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরলসভাবে ইহার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তরফদার মহাশয়ের পরলোকগমনে নবদ্বীপের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কর্ম্মীর তিরোধান হইল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পয়লা আষাঢ়ে আজ হয়তো কোথাও কোনো সঙ্গীহীন ঘরে
চতুর্দ্দশী কবিতাটি পড়িছ আমার বসি' অর্দ্ধস্ফুট স্বরে।

শিল্পী : শ্রীহাসিরাশি দেবী

—'চতুর্দ্দশী' : ক্ষেত্রমোহন
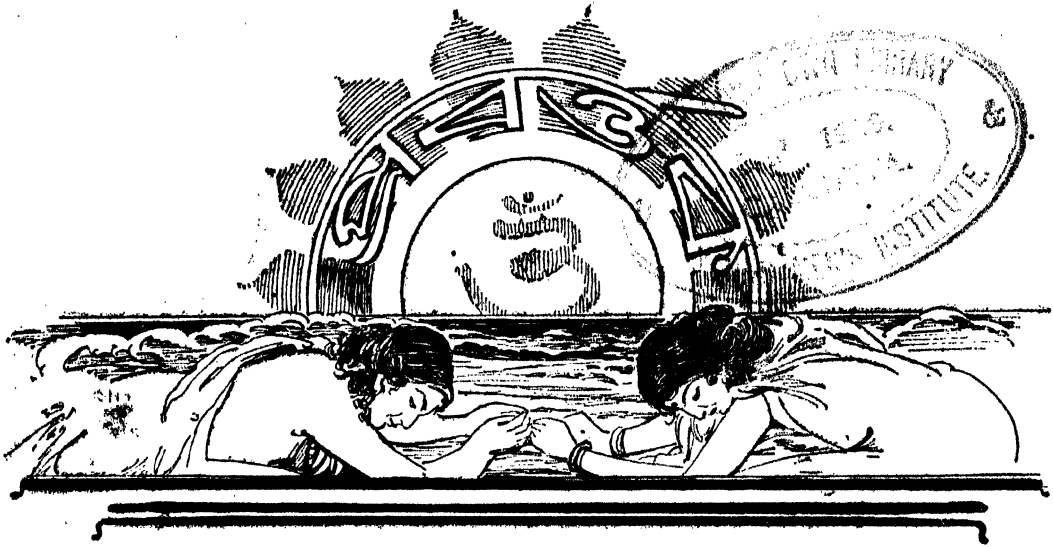
সপ্তবিংশ বর্ষ ১৩৪৯ সাল	আষাঢ়	প্রথম খণ্ড ৩য় সংখ্যা

তৎ-কামঃ

"তৎ-কামঃ"—ইহা সত্য হইলে, ভগবান স্বয়ং তোমায় তুলিয়া লইবেন। এই তৎ-কাম হওয়ার জন্য অধ্যাত্মযোগ আশ্রয় কর। তাঁহার সহিত যুক্তির কামনাই স্থির রাখ, অন্য কামনাকে আশ্রয় দিও না।

তাঁহারই কামনা মাত্র—এই ভাবে চিত্ত স্থির রাখার জন্য করার অন্য কিছু নাই, শুধু অনন্যশরণ হইয়া থাকা। চিত্তকে ইষ্টে স্থির রাখার দায়ও তোমার নহে, ইষ্টেরই—নচেৎ তাঁর যোগ-ক্ষেম বহন করার প্রতিশ্রুতির উপর যে তোমার কলম চালান হয়। যুগের বিধান আত্মসমর্পণ, ইহা সহজ সাধন বলিয়া উপেক্ষার নয়। আজ ভগবান চাহিয়াছেন যোগ পূর্ণ করিতে। তাড়া কেন্দ্রে আসিয়াছে, তাহারই হিল্লোল তোমার বুকে আনন্দ ও শক্তির ঝারা বহাইয়া দিবে। তোমার আর সব যৌগিক ক্রিয়া স্তব্ধ হউক, ভাগবৎ লীলা ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে রূপবন্ত হইয়া তোমাকে সার্থক করুক।

সাধনা ভগবানের স্বীকৃতি। তুমি যে ভগবানের, এই স্বীকৃতিটুকুই জীবনে জ্বলন্ত হইলে, আর সব তিনিই করাইয়া লইবেন। সাধনার ভার তাঁহার—তোমার কাজ শুধু শরণ আর স্মরণ, আর কিছু নহে।

[শ্রীম—]

কর্ম্মের মূল্য

শ্রমের মূল্য আছে। শ্রমশক্তি কর্ম্ম করে। যতখানি শ্রম যতখানি কর্ম্ম উৎপাদন করে, সেই কর্ম্মের পরিমাণ দিয়া শ্রমের আনুপাতিক মূল্য নিরূপিত হইবে। শ্রমের মূল্য অর্থ। এই অর্থ শুধু মুদ্রা-মূল্য বলিলে ঠিক হইবে না। 'অর্থ' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ—প্রয়োজন; আর ইহাই অর্থ-শব্দের যথার্থ অর্থও বটে। যে কর্ম্ম জীবনের যতখানি প্রয়োজন পূর্ণ করে, সে কর্ম্মের প্রকৃত মূল্যও তাহাই, ইহা কে অস্বীকার করিবে? প্রত্যেক কর্ম্মের মুদ্রাগত আর্থিক মূল্য ঠিক ইহাই হইবে কিনা, তাহা হয়ত বিবেচনাসাপেক্ষ; আর তাহাও শুধু এই কারণেই যে, মুদ্রার মূল্য-পরিমাণ কৃত্রিম, ইহা স্বভাব-কর্ম্মের ঠিক অপেক্ষা রাখে না। শ্রমের শক্তি স্বাভাবিক কর্ম্মবৃত্তিরই অনুসরণ করে। স্বভাবজাত প্রয়োজনবোধ দ্বারাই তাই ইহার যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইতে পারে।

শ্রম করি দেহ দিয়া, ইন্দ্রিয় দিয়া, মন দিয়া। যে উদ্দেশ্যে শ্রম, তাহাই তার প্রয়োজন। শ্রমমূলক কর্ম্ম প্রয়োজন পূরণ করিলেই, তাহার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়। মুদ্রা বিনিময়ের সুবিধা দেয়, কিন্তু আসল প্রয়োজন পূর্ণ করিতে সরাসরি সাহায্য করে না। তাই আমার শ্রমের অনুপাতে আমি যদি মুদ্রা-মূল্য নাও পাই, ক্ষতি নাই—সেই শ্রমজাত কর্ম্ম দ্বারা যদি আমার মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করিয়া লইতে পারি। এই প্রয়োজন-পূরণই আমার শ্রমের যথার্থ লক্ষ্য হওয়া উচিত—মুদ্রার প্রতিদান নহে। কিন্তু বিশ্বজীবনের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই ঋজু ও সরল সত্যদৃষ্টির অনুকূল তো নহেই, বরং একেবারে প্রতিকূল। আমরা এক্ষণে স্বভাব-দৃষ্টি ও স্বভাব-বৃত্তি উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া যুগের কৃত্রিম দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মস্রোতকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি—চলিতে বাধ্য হইয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সঙ্ঘের অভিনব জীবন-সাধনায় আমরা অনেকখানি স্বাভাবিক সত্যকেই পুনরাবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারি। সঙ্ঘে প্রত্যেক মানুষেরই শ্রম অবশ্য বিধেয়। কিন্তু এই শ্রমের আর্থিক প্রতিমূল্য সংহতির ভিতরে প্রয়োজনের অনুপাতেই আমরা নিরূপণ করিয়া লইতে পারি। এখানে একটা মুদ্রার মাপকাঠি হিসাবের খাতিরে যদি গণনাও করি, সে গণনা শুধু বুদ্ধির সন্তোষের জন্য। মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের পূরণই শ্রমের লক্ষ্য হইবে। কে কতখানি প্রয়োজন পূর্ণ করিতেছে সঙ্ঘের সৃষ্টি, পুষ্টি ও অগ্রগতির জন্য, ইহাই যদি আমরা দৃষ্টি রাখি, সেইটুকুই আসল আর সেইটুকুই যথেষ্ট। এই প্রয়োজনের পরিমাপেই ব্যক্তির উৎসর্গ ও অবদানের যাচাই হইবে—অর্জ্জিত মুদ্রাসংখ্যা দ্বারা নহে।

আমরা উপরে যে কথা বলিলাম, তাহা একটা আদর্শ সমাজের আর্থিক ছন্দঃ। কিন্তু এইরূপ সমাজের প্রতীক বা ভ্রূণমূর্ত্তিরূপে একটা সঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ জীবনে ইহা কথঞ্চিৎ ব্যবহারযোগ্য হওয়া বিচিত্র নয়, অসাধ্যও নয়। সঙ্ঘের সমগ্র প্রয়োজন অখণ্ড দর্শনে নিরূপণ করিয়া, সঙ্ঘসেবী প্রত্যেক পুরুষ ও নারী তাহারই এক একটা অংশ বিভক্ত করিয়া স্বকীয় শ্রমযোগে পূরণ করিতে উদ্যত হইবে। ইহাই হইবে মণ্ডলীর শ্রম-বণ্টনের নিয়ম। প্রত্যেকের যাহা সাধ্য, সে তাহা করিবে। সেই সাধ্যেরই পরিমাণ—কর্ম্মের পরিমাণ, শ্রমের পরিমাণ। উৎসর্গ যদি খাঁটি হয় আর প্রাণ-যন্ত্র যদি হয় বিশোধিত, এই সাধ্যের প্রয়োগশক্তি উৎসর্গের ক্রমবর্দ্ধিত বীর্য্যেরই অবধারিত অনুগামী হইবে।

সঙ্ঘের বীর্য্য উৎসর্গ। কর্ম্ম উৎসর্গেরই প্রতিমূর্ত্তি। তাই প্রত্যেক কর্ম্ম সাধনারই রসায়ণে অহরহ সঞ্জীবিত হইবে। সাধনা দিবে কর্ম্মকে রস, সাধনারই রূপ দিতে গিয়া কর্ম্ম রূপস্থ হইবে। সমষ্টির প্রয়োজন—এই সাধনাই পূরণ করিবে। তবে প্রত্যেকের প্রকৃতিবৈচিত্র্য শুধু উৎসর্গের ছন্দঃ ও রূপকে বিশিষ্ট, বিচিত্র করিবে। সঙ্ঘ-মন্ত্রের সাধক তার প্রতি কর্ম্মে নিজের শ্রমকে সার্থক দেখিবে একদিকে উৎসর্গের সাধনে, অন্য দিকে সমষ্টির

প্রয়োজনপূরণে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সঙ্ঘজীবন নিয়ন্ত্রিত হইলে, এই মুদ্রানিয়ন্ত্রিত যুগেও, অন্ততঃ ক্ষুদ্র সংহতি-পরিধির মধ্যে একটা সহজ, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক সত্যপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আমরা অচিরেই পরিলক্ষ্য করিব। সমষ্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে যদি কাঞ্চনের আকর্ষণকে শোধন করিয়া আমরা উৎসর্গ-মূলক অর্থনীতিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, সেই বিশুদ্ধ অর্থশক্তির বিনিময়-যন্ত্ররূপে কাঞ্চনকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়া জাতির বৃহত্তর আর্থিক প্রতিষ্ঠা সম্ভব করার যোগ্য চিন্তাসূত্রও অতঃপর খুঁজিয়া পাইব।

প্রয়োজনের ভগবান

স্বার্থ কাম; পরার্থ বা পরমার্থ প্রেম। স্বার্থ অর্থে নিজের প্রয়োজন। আবার পরার্থে নিজের প্রয়োজন বলি দিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে পরমার্থেই গিয়া সে উৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়। সাধনার ক্ষেত্রেই এই অর্থবিচারের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আছে। জীবনের ক্ষেত্রেও তবেই উহা একদিন আলোকপাত করিতে পারিবে।

সাধনা অন্তরেরই প্রয়োজনে। এই প্রয়োজনই ত স্বার্থ। সাধনা তাই গোড়ায় স্বার্থমূলক, এ কথা অস্বীকার কে করিতে পারে? কিন্তু সাধনার উদ্দেশ্য স্বার্থের পূরণ নয়, প্রয়োজনের শোধন। কথাটা বুঝিতে হইবে।

সাধনা বলিতে অধ্যাত্মসাধনাই, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমাদের আলোচনা। এই অধ্যাত্মসাধনা—ভগবানকে লইয়া, অন্তরেই ধ্যেয়, জ্ঞেয় কোনও পরম পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া। আমাদের জীবনে ভগবানের প্রয়োজন আছে, নহিলে ভগবানকে মানুষ চাহে কেন? এই প্রয়োজন—আত্মার প্রয়োজন অর্থাৎ জীব যাহাকে নিজের আমি-স্বরূপ বলিয়া জানে, তাহারই। যে সাধক বা সাধিকা তাহার সকল প্রয়োজনের মূলে ভগবানকেই স্থাপন করিতে পারেন, সে সাধক বা সাধিকা খুবই ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী—কারণ ভগবান তাঁহার কাছে শুধু সখের, খেলার, ভাব ও কল্পনার বস্তু নহেন, পরন্তু তিনি তাঁহার জীবনের অতি প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য, বস্তুতন্ত্র সত্য। অনেক তপস্যা বা সুকৃতির ফলে সাধন-জীবনে ভগবান এমন বস্তুতন্ত্র প্রয়োজনের সত্য হইয়া ধরা দেন। ইহা অধ্যাত্ম-সত্যানুভূতির এক উজ্জ্বল দিগ্দর্শন।

ভক্ত শ্রদ্ধার প্রয়োজনে, ভক্তির আকর্ষণেই ভগবানকে ডাকেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সেই ডাকে স্থির থাকিতে না পারিয়া নামিয়া আসেন বা শক্তিসঞ্চারণায় ভক্তের আকিঞ্চন পূর্ণ করেন। এই আকর্ষণ বিশ্বাসীর হৃদয়ের টান, তাই ইহা অমোঘ, অকাট্য। যিনি আকর্ষণ করেন, আর যিনি তাহা পূরণ করেন—ভক্ত ও ভগবান, জীব ও ঈশ্বর এইরূপেই পরস্পরের কাছে জাগ্রত হইয়া উঠেন; তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় গভীর, সরস ও ঘনিষ্ঠ। শিশু যেমন আত্মপরিপুষ্টিরই প্রয়োজনে মাতৃ-স্তন নিপীড়ণ করিয়া দোহন করে ক্ষীর-সুধা, তেমনি অধ্যাত্মজগতে শিশু আত্মা ভগবানকে দোহন করিয়া আহরণ করে জীবনের রসায়ণ। ভগবানকে ভক্তের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে হয়—ভক্তিরই পুষ্টির জন্য।

কিন্তু এই ভক্তিযোগে যে রস, যে অমৃত, তাহার একটা সীমা আছে। এই তৃপ্তি যোগের তৃপ্তি হইলেও, সে যোগ বিশেষ কালে ও অবস্থায় পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন, খণ্ড যোগ সাধন করিতে করিতেই সাধক বা সাধিকা অধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রসর হন। প্রয়োজনের পূর্ণতায় তৃপ্তির পূর্ণতা আসে না; কেননা আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় বিকর্ষণের অর্থাৎ বিরহের যুগও যে স্বাভাবিক, ইহা বলাই বাহুল্য। তখন বিশেষজ্ঞ সাধক-সাধিকা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে আস্বাদের পূর্ণতাসাধনে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। সর্ব্ব প্রয়োজনের মূলে ভগবানকে রাখিয়াও যখন ভক্তের আর তৃপ্তি নাই, তখনই খণ্ড রসের তর্পণে অখণ্ড রসের অনুসন্ধান ঊর্দ্ধমুখী চেতনায় নূতন আকর্ষণরূপে অনুভূত হয়। এই আকর্ষণের পূর্ণতাই প্রেম।

ভক্তির পরিণতি তাই প্রেমে। প্রয়োজনের ভগবান ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া, সাধকের জীবন-প্রবাহ বিপরীত মুখে আকর্ষণ করেন। তখন এক নূতন চক্ষু খুলিয়া গিয়া, ভক্ত প্রত্যক্ষ করে আর এক সঙ্কেত, আর এক জীবন-গতি—তার হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়

ভগবানেরই প্রয়োজনপূরণের জন্য। এই প্রয়োজন সত্যই ভাগবত—তাই অখণ্ড, অসীম। খণ্ড রস সেইখানেই পূর্ণ, অখণ্ড হইয়া উঠে। প্রয়োজনের ভগবান যদি ভক্তির সর্ব্বস্ব ধন হন, তবে ভগবানের প্রয়োজন পূর্ণ করার আকুল প্রেরণাই প্রেমের স্বচ্ছ নিরিখ, অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণত আকর্ষণ। এখানে স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই চেতনার রূপান্তরিত প্রবাহে অবগাহন করিয়া পরিশেষে পরমার্থে উত্তীর্ণ হয়। উৎসর্গের সাধনা এইরূপেই ভক্তি হইতে প্রেমে মুক্তি পায় ও সম্পূর্ণ সার্থক হয়। জীবনের ক্ষেত্রে এই ভক্তি ও প্রেমের প্রকাশমূর্ত্তি যে ঠিক এক প্রকারের হইবে না, ইহা আমরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সে কথার আলোচনার আজ সময় নহে।

ধারণা

ধারণা মানসিক জীবনের একটী প্রধান অংশ। সংহতি-জীবনে বা সামাজিক জীবনে ইহার প্রভাব অল্প নহে। সত্য ধারণায় পরস্পর শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়, তেমনি অসত্য ধারণায় পরস্পর মন তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিতেও পারে। সংহতিবদ্ধ ঘনিষ্ঠ জীবনে তাই একে অন্যের সম্বন্ধে কোনও দৃঢ়মূল ধারণা-গ্রহণে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হয়; নহিলে বিকৃত বা অবিশুদ্ধ ধারণা কাহারও সম্বন্ধে সহসা করিয়া ফেলিলে, তাহার জটিল ফলাফল কোথায় পৌঁছিতে পারে, তাহার ঠিকানা নাই। একটী অমূলক বা বিমিশ্র ধারণা মনের রঙে রাঙিতে রাঙিতে যে পুঞ্জীভূত সংস্কার-শক্তি সংগ্রহ করে, তাহা পরস্পর মনের প্রীতি ভাঙ্গিয়া বা টলাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্ঘ-সাধনা যেখানে প্রেম ও ঐক্য লক্ষ্যে রাখিয়াই সঞ্চালিত, সেখানে বিশেষ ধীরভাবেই পারস্পরিক ধারণা শোধন ও পরীক্ষা করিয়া মনে স্থান দিতে হয়।

ধারণা মনের স্বভাব-ধর্ম্ম; তাই ঘটনা বা অবস্থাচক্রে পড়িয়া একটা না একটা ধারণা মনে স্বভাবতঃ জন্মিবেই, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যে ধারণা কোনও ঘন-সম্পর্কিত সহকর্ম্মী, তাহার চরিত্র, আচরণ বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে, সেইখানেই বিশেষ সতর্কতা ও পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। বন্ধু বা আত্মীয়ের কর্ম্ম ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহার অভিপ্রায় মন্দ না হইতেও পারে—এইটুকু উদার দৃষ্টি লইয়া বিচারে না বসিলে, সে বিচারে ভুল হইবারই বেশী সম্ভাবনা। সেইরূপ অতি প্রিয় মানুষের আচরণও অবস্থা-বিশেষে কত যে সংশয়াত্মক হইতে পারে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এইরূপ ক্ষেত্রে একটা ঘটনাস্পর্শেই বুদ্ধিকে ছোঁ মারিয়া কোনও ধারণাবিশেষ করিতে না দেওয়াই সমীচিন। অন্ততঃ সে ধারণা যে অকাট্য না হইতে পারে, এইটুকু ভাবা উচিত। আমি যদি কাহারও সম্বন্ধে কোনও কারণে গুরুতর ধারণা করি, সে ধারণার সত্যাসত্যবিচারের জন্য সেই ব্যক্তিরই বাক্য বা আচরণ মাত্র দায়ী না করিয়া, আপনার দিক্ দিয়াই সর্ব্বাগ্রে ধারণাটী পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এইরূপ আত্মপরীক্ষাতেও সম্পূর্ণ আস্থাবান্ না হইয়া, উহা বিপরীত দিক্ হইতেই সত্য বলিয়া ধরিয়া চলাও মন্দ নীতি নহে—কারণ তাহাতে ঘটনার কষ্টি-পাথরে ধারণার সত্যমিথ্যা যাচাই হওয়ার অচিরেই সুযোগ মিলিতে পারে। নিজের ধারণাই স্থির এবং অকাট্য সত্য, এইরূপ অভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয়ই অধিকাংশ ধারণা-বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ। বলা বাহুল্য, এইরূপ মনোজাত আত্মপ্রত্যয়ে বস্তুতঃ আত্মমহিমা নাই।

ধারণার প্রমাণ চাই। সে প্রমাণ—প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ। পরোক্ষ প্রমাণ অনুমানই বিশেষ বিপজ্জনক। অনুমানের শোধন-যন্ত্র মানুষের খুব স্পষ্ট নহে। তর্কশাস্ত্র অনুমানবুদ্ধির সাধন বটে, কিন্তু উহা যেন বাহ্য সাধন; ঠিক মানসিক ধারণাগঠনের ক্ষেত্রে ঐ সাধন-শোধনের বিধি-নিষেধ আমরা প্রায়ই এড়াইয়া চলি। আমাদের জীবনধারণ ও দৈনন্দিন চিন্তাধারণা কোনটীই তর্কশাস্ত্রের অনুগত করিয়া বিশোধিত ও প্রমাণসিদ্ধ করা আমাদের ধাতুগত নহে। যাহা মনে লাগে, তাহাই চিন্তার উপকরণে পরিণত হয়—মনের এই সঙ্কল্পবিকল্পগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিশ্লেষণ করিয়া, যাচাই করিয়া দেখিলে হয়ত নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, প্রথম সিদ্ধান্তের ভূমি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট নীতি হইতেছে

এই জন্য—কোনও মনঃকল্পিত ধারণার উপরেই অতিরিক্ত ঝোঁক না দিয়া, উহার মূলীভূত ঘটনাশক্তিকেই আত্মসত্য প্রতিপাদন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া। মনের উপর জ্ঞানের আলো পড়িবারও তবেই সুযোগ ঘটিবে। বুদ্ধির এই ধৃতি ও জ্ঞানাপেক্ষা খুব দুঃসাধ্য অনুশীলন নহে। সমষ্টিজীবন সুছন্দিত, সত্যে ও শান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এইটুকু ধাতুপ্রসাদ—প্রশান্ত ধৈর্য্যশীল চরিত্র আমাদের চাই। ধারণায় প্রসন্ন ধাতু বিপর্য্যস্ত হইলেই বুঝিতে হইবে—কোথাও গোল ঘটিতেছে; তখনই সজাগ ও সচেতন হওয়া প্রয়োজনীয়।

সাধকের জীবনে প্রসন্ন ধাতুর উপর ভিত্তি দৃঢ় করিয়াই বুদ্ধির শোধন-সাধন অবশ্যকর্ত্তব্য। চিত্তে কাম-ক্রোধাদি রিপুর প্রভাব শুধু স্নায়ুবৈকল্য নয়, বুদ্ধিবিপ্লবেরও কারণ হয়, ইহা সকলেই জানেন। যোগী অন্তঃকরণ-যন্ত্রগুলি—বিশেষতঃ হৃদয় ও বুদ্ধিযন্ত্র বিশেষভাবেই পৃথক্ করিয়া স্বীয় অন্তর্জ্জীবন শাসন করেন। বুদ্ধির ধর্ম্ম—জ্ঞান; হৃদয় রসানুভূতির জন্য। হৃদয় উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করিলে, বুদ্ধির ধর্ম্ম ঘোলাইয়া যায়, সে রঞ্জিত দর্পণে আর স্বচ্ছ শুদ্ধ সত্যপ্রকাশ সম্ভব হয় না। সে আক্রমণ—ক্রোধেও হইতে পারে, কোনও আদর্শ-বিশেষে অসাধারণ নিষ্ঠা ও আবেগবশতঃও ঘটিতে পারে—চিত্তবৃত্তির ভাল-মন্দ নানা প্রকার উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসই এইরূপ ধৃতিচ্যুতির হেতু হইতে পারে। সাবধানতা—অন্তঃকরণের ধর্ম্মসঙ্কর না ঘটিতে দেওয়া। হৃদয়, বুদ্ধি—যাহার যাহা বিশিষ্ট ধর্ম্ম, তাহার অনুসরণ না করিয়া, পরধর্ম্মে প্রভাবিত হওয়াই বৃত্তিসাঙ্কর্য্য।

যোগী শুদ্ধ বুদ্ধিযোগে ধারণা করিবেন, ধ্যান বা চিন্তা করিবেন। ইহা বিশেষ সাধন। বিশুদ্ধ সত্য ধারণা ও ধ্যানই সমাধি অর্থাৎ ঐক্যের কারণ। সঙ্ঘ-সাধনায় ঐক্যই লক্ষ্য। তাহার জন্য প্রত্যয় ও চিন্তা, ধারণা ও ধ্যানশক্তির শোধন-সাধনের দিকেই আমরা প্রত্যেক সঙ্ঘ-সাধক, সঙ্ঘসাধিকার অবহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সঙ্ঘে সমষ্টিসাধনার যে নীতি, যে প্রকরণ, তাহাই ব্যাপক দৃষ্টি ও প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র-সংহতিগঠনেরও সুনীতি ও শুভছন্দঃ পাইতে পারিব।

বিভক্ত ভারত *

ভারতের রাষ্ট্রীয় অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা জাগিয়াছে। একদিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা আমাদের বাঙালী-জাতির নিকট গুরুতর বাস্তব সমস্যারূপেই আবির্ভূত হইয়াছিল। সে সমস্যার প্রতিকারমূলক চিন্তা ও চেষ্টাই স্বদেশী বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় ইহা এক করুণোজ্জ্বল ইতিহাসের অধ্যায় হইয়া আছে। লর্ড কর্জ্জনের "settled fact" আমরা "unsettled" করিয়াছি; কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ-সমস্যার রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, উহার মূলীভূত আশঙ্কার হেতুগুলির একান্ত নিরসন হয় নাই—দেশের পরবর্ত্তী রাষ্ট্র-বিভাগ বাঙালীজাতির সন্তোষের কারণ হয় নাই, বরং আরও ঘোরতর অভিশাপ যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, তাঁহারই উপাদেয় পটভূমিকা রচনা করিয়া দিয়াছে। তাই বহু চিন্তাশীল বাঙালী মনীষীর মুখে অনুচ্চ স্বরে ইহার জন্য অনুশোচনার উক্তিও আমরা শুনিয়াছি।

আজ অখণ্ড হিন্দুস্থানের চিন্তাজগতে "পাক" ও "না-পাক" সমস্যা এক ঘোরতর অভিশাপের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। মুসলিম লীগের রাষ্ট্রনেতা মিঃ জিন্না ভারতের রাষ্ট্রাকাশে সহসা বক্রী গ্রহের ন্যায় জাতীয়তার সাধনার দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া এই সমস্যার উদ্ভাবন করেন—পাকিস্তান তাঁহারই প্রতিভার বহু-চিন্তিত ও বহু-শঙ্কিত দান। তাঁহার এই স্বকপোলকল্পিত স্বর্ণমৃগ রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার শুধু উদ্বেগের কারণ নহে, উভয়ের চিত্তভেদও বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স যে বৃটিশ সমরপরিষদের দৌত্য-বাণী লইয়া সেদিন আসিলেন, তাহার মধ্যে এক পাকিস্তান নয়, একাধিক "স্থানের" সম্ভাবনা কিল্‌বিল্ করিতে দেখিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়ক মাত্রেই উদ্বেজিত চিত্তে উহার প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্যার ক্রিপ্সের প্রস্তাব যে সব কারণের জন্য এ দেশে স্বীকার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, তার সাক্ষাৎ হেতু যদি নাও বলা যায়, এই বহু-বিভক্ত ভারত হওয়ার শঙ্কা ও সম্ভাবনা যে

সমরসভার প্রস্তাবের প্রতি বিরূপতার অন্যতম বিশেষ কারণ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই অবস্থায়, এক শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া ছাড়া আর কোনও প্রতিষ্ঠাশালী রাষ্ট্রনেতা এই 'পাক'—'না-পাক' প্রশ্নের মীমাংসায় মুসলিম লীগের সমর্থন না করিলেও, নিখিল ভারতের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় চিন্তা যে মিঃ জিন্নার এই একটী চালে কতখানি ঘূর্ণিত, চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কে না বুঝিতেছেন? শেষে ইহা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সমাধানের অতীত বুঝিয়াই মহাত্মা গান্ধীজির ন্যায় চির বৃটিশ-বন্ধু রাষ্ট্রনেতাও ইংরাজকে 'তফাৎ যাও" ব্যবস্থাপত্র দিয়া, তাহার পর 'পাক—না-পাক' সমস্যা লইয়া কি করা সম্ভব দেখা যাইবে—এইরূপ চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাও আমরা পরিলক্ষ্য করিতেছি।

হিন্দুস্থান দ্বি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে কি বহুরাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে—ইহা নির্ভর করে কিসের উপর? আজ নিখিল ভারতের যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, ইহা বৃটিশ সম্রাটেরই ছত্রতলে, অর্থাৎ ইহা পরাধীনতারই সমান অবস্থা, একই দাসত্বের কলঙ্কটীকা আমাদের সমভাগ্য-সূত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়াছে। আমরা আজ নিশ্চয় এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যসূত্র বজায় রাখিয়াই পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, এইরূপ মনে করিয়াই পাকিস্তানী বিভাগ-নীতির প্রতিবাদ করিতেছি। ভাবিবার কথা, যে ঐক্যভূমি ইংরাজেরই দেওয়া অর্থাৎ ইংরাজের প্রয়োজনে সংগঠিত, তাহাই স্বাধীন ভারতের প্রয়োজনে সেই ভাবেই কাজে লাগিবে কিনা? আমাদের জাতীয় জীবনের ঐক্য-প্রেরণা আরও কোনও নিরপেক্ষ ও স্বপ্রতিষ্ঠ মূল হইতেই আসিয়াছে কিনা?

ইংরাজের সাম্রাজ্যদণ্ড পরাধীন ভারতকে একটা একতার কাঠাম দিয়াছে। ইহা নিছক রাষ্ট্রীয় কাঠাম—তাহার উপর যে সংস্কৃতির অভিষেক, তাহাও একান্ত সেই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই অর্থাৎ মনীষী মেকলে লিখিত "ব্রাউন ইংলিশম্যান" গড়িবার জন্য। ইংরাজের আনীত শিক্ষা ও সভ্যতা বর্ত্তমান যুগ-ভারতের চিত্ত এই আলোকেই গঠন করিয়াছে, যাহাতে আমরা ইংরাজের বিশ্বস্ত ও অনুরূপ চিত্ত-স্বারূপ্যই লাভ করি। সে উদ্দেশ্য যে বহুলাংশে সফল হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—যদিও ক্রিয়ার সহিত প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে অথবা কায়া-সহিত-ছায়া ন্যায়েই বরং আমরা বলিব—এই শিক্ষা-সমুদ্রের মন্থনে ইংরাজের দিক্ দিয়াও হলাহল উঠিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ আজ এই হলাহল হজম করা যায় কিনা, তাহাই উগ্র চিত্তে ভাবিতে গিয়া নানা আলাপ-প্রলাপ সময়ে সময়ে উচ্চারণ করিয়াও ফেলিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত কি হয়, তাহা অবশ্য ভবিতব্যেরই নির্ণেয় বিষয়, আমরা তাহা লইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে চাহি না।

ভারতের উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠাম আমাদের খুব অভিনন্দনের বস্তু হওয়ার কোনও একান্ত কারণ দেখি না। যদি স্বাধীন ভারতকে একতানিষ্ঠ করার চেষ্টায় সফলকাম না হইয়াই বিশ্বপ্রকৃতি পরিশেষে এই চরম অস্ত্র পরাধীনতার মুদ্গরাঘাতে ঢালিয়া পিটিয়া ঐক্যগঠনে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহার সে চেষ্টা তিনি যে দিক্ দিয়া সফল করিতে পারেন তাহা করুন, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে? কিন্তু ভারতের ঐ প্রকার উপরিচর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেয়ে আরও এক গুরুতর, গভীরতর ও নিগূঢ়তর ঐক্যশক্তির পরিচয় কি কোনও বর্ত্তমান ভারত-নেতাই অন্তরে খুঁজিয়া পান নাই? আদি মনুর ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া বৈবস্বত মনু, সূর্য্য-চন্দ্র বংশের শাসনাধীন স্বাধীন ভারত, এমন কি গুপ্ত, পাল বংশীয় সম্রাট্গণের শাসিত ভারত কি সাম্রাজ্যশক্তির দিক্ দিয়াও বারে বারে রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে নাই? সে রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের মূলে ছিল কিন্তু এক রাষ্ট্রাতীত মহাবীর্য্য। এই মহাবীর্য্যই ভারত-সংস্কৃতির ধর্ম্মবীর্য্য। "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—অখণ্ড ভারত গড়িবার প্রকৃত রহস্য এই ধর্ম্মসংস্থাপনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ভারতে-তিহাসের ইহাই যে চিরন্তনী বাণী। সেই সংস্কৃতি-শক্তি, সেই ধর্ম্মবীর্য্য উপেক্ষা করিয়া, উহা আশ্রয় না করিয়া, কি অখণ্ড হিন্দুস্থান গঠন বা রক্ষা করার প্রেরণা কোনদিন সফল হইবে—না হইতে পারে? ভারতের রাষ্ট্র-নেতৃগণ আজ এই কথা স্বীকার করা দূরে থাক, ইহা বুঝিবার চেষ্টাটুকুও করিবেন কিনা সন্দেহ। তাই আমরা দ্বিরাষ্ট্র বা বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারত হওয়ার আশঙ্কায় উৎপীড়িত

ও বিভীষিকাগ্রস্ত ভারতনেতৃগণের কথায় ও আচরণে প্রতিবাদের সুর শুনিয়াও একটু মাত্র আশান্বিত হইতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে এবং যে মুস্‌লিম রাষ্ট্রনেতা পাকিস্তানের ধুয়া তুলিয়াছেন তাঁহার মধ্যে প্রভেদ রাষ্ট্রমতে যত দূরপ্রসারীই হউক, অন্তর্ভেদ বিশেষ আছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। সকলেই সমানভাবে সেই মৌলিক সত্যে, সেই জাতীয়তার মহাশক্তির প্রতি উদাসীন, যাহা না বুঝিলে, না পাইলে, ভারত-মুক্তির চাবীকাটি কোনও দিনই মিলিবে না।

আমরা তরুণ ভারতকে তাই 'পাক'-'না-পাক' সমস্যায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে বারণ করিব। ইহা একান্ত অবান্তর সমস্যা। ইহা অসম্ভব ঘটনা। এমন কি ইহা ঘটিতেই পারে না, যদি ভারতের জাতীয় প্রতিভার মর্ম্ম-বীর্য্য, তাহার জাতীয় ইতিহাসের মূলসূত্র আমরা অব্যাহত রাখিতে পারি। বরং জাতীয় কৃষ্টি ও সাধন-রক্ষায় উদাসীন বা বিমুখ হইয়া নবীন ভারত অন্যভাবে যত আকুল ও উন্মাদ চেষ্টাই করিবে, ততই জাতিশক্তি অচল হইয়া আমাদের পরাধীনতার পরমায়ুই দীর্ঘতর করিবে—কারণ সেই পরাধীনতার মূলেই আছে ভারতের সনাতন ধর্ম্মে ও সাধনায় ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় উদাসীনতা, জাতির আত্মপ্রতিভারই ঘনায়মান সঙ্কোচ ও অবগুণ্ঠন। ভারতকে বাঁচিতে হইলে, তাহার জাতীয় ঐক্য ও সংগঠন-সংস্থিতি সুরক্ষা করিতে হইলে, এইদিকেই নবীন জাতি যেন স্থির দৃষ্টি ও তপঃশক্তি নিয়োগ করে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গান ও স্বরলিপি

আমন্ত্রণলিপি (জ্ঞানদাস বথৈলী)

প্রভাতে যখন আসিলে হে দূত
সোণালি পোষাক তব
ফুল-সুরভিত তব নিশ্বাস
চিত্ত জাগালে মম!
দুপুরের রোদে উদাস করিয়া
কি ব্যথা পাঠালে দূরে
সন্ধ্যায় মেলি' রাঙা চেলীখানি
গাহিলে পূরবী সুরে!

তারপর এল তিমির রাত্রি
মরণ আঁধার সম—
জ্যোতির আখরে কি লেখনখানি
মেলিলে নয়নে মম!
কেন এত নিতি সজ্জা হে দূত,
তুমিই ভুলালে মন;
দূত কহে 'সখা, মহা উৎসব
একা তব নিমন্ত্রণ।
তারি লিপিখানি দিকে দিকে এই
মেলিয়াছি অনুক্ষণ।'

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

	০				১				২				৩			
II	ঋা	মা	মা	|	মা	গমা	-পা	I	পা	পা	পা	|	পা	পা	-মা	|
	প্র	ভা	তে	|	য	থ০	ন্		আ	সি	লে	|	হে	দূ	ত্	
	পা	দা	দা	|	দা	দা	-র্সা	I	না	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	|
	সো	ণা	লি	|	পো	ষা	ক্		ত	ব	০	|	০	০	০	
	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	পা	I	পা	পা	পা	|	-া	পা	-জ্ঞা	|
	ফু	ল	সু	|	র	ভি	ত		ত	ব	নি	|	০	শ্বা	স্	
	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	|	ঋা	ঋা	সা	I	ন্া	সা	-া	|	-া	-া	-া	II
	চি	০	ত্ত	|	জা	গা	লে		ম	ম	০	|	০	০	০	

০ ১ ২´ ৩ [জ্ঞর্া

II {দা দা দা | -া দা না I না না -র্সা | র্সা র্সা ঋর্া |

দু পু রে | বৃ রো দে উ দা স্ | ক রি য়া |

জ্ঞর্া জ্ঞর্া জ্ঞর্া] [-া -া]

ঋর্া ঋর্া ঋর্া | ঋর্া ঋর্া র্সা I না র্সা -া | -া (-দা -া)} |

কী ব্য থা | পা ঠা লে দূ রে ০ | ০ ০ ০ |

পা -া পা | -া পা পা I ক্ষা পদা দা | দা দা দা |

স ন্ ধ্যা | য় মে লি রা ঙা ০ চে | লী খা নি |

ঋা ঋা ঋা | ঋা ঋা সা I ন্া সা -া | -া -া -া II

গা হি লে | পূ র বী সু রে ০ | ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩

II ঋা -মা মা | -া মা পা I পা পা পা | পা -া ণা |

তা র্ প | র্ এ ল তি মি র | রা ০ ত্রি |

ণা ণা -দা | দা পা -া I মা পা -া | -া -া -া |

ম র ণ্ | আঁ ধা র্ স ম ০ | ০ ০ ০ |

মা পা -জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I মা মা মা | -া মা মা |

জ্যো তি র্ | আ থ রে কাঁ লে খ | ন্ খা নি |

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা ঋা I ঋা সা -া | -া -া -া II

মে লি লে | ন য় নে ম ম ০ | ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ [জ্ঞর্া

II দা দা দা | দা দা না I না -র্সা র্সা | র্সা র্সা -ঋর্া |

কে ন এ | ত নি ভি স ০ জ্জা | হে দূ ত্ |

জ্ঞর্া জ্ঞর্া ঋর্া] [-া -া]

ঋর্া ঋর্া ঋর্া | ঋর্া র্সা না I র্সা -া -া | -া (দা -া)} |

তু মি ই | ভু লা লে ম ০ ০ | ০ ন্ ০ |

{র্সা -মর্া মর্া | মর্া মর্া মর্া I র্সজ্ঞর্া জ্ঞর্া জ্ঞর্া | -া জ্ঞর্া -া |

দূ ত্ ক | হে স থা ম ০ হা উ | ৎ স ব্ |

দা দা ণা | র্সা ঋর্া ণা I র্সা -া -া | -া -া -া} |

এ কা ন্ত | ব নি মন্ ত্র ০ ০ | ০ ণ ০ |

র্সা ঋর্া ঋর্া | ঋর্া ণা ণা I ণা ণা দা | -দা পা -া |

তা রি লি | পি খা নি দি কে দি | কে এ ই |

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা I সা -া -া | -া -া -া II II

মে লি য়া | ছি অ রু ক্ষ ০ ০ | ০ ণ ০

কাল কি হবে?

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

হালদারদের পেটা ঘড়ীতে ঢং-ঢং ক'রে পাঁচটা বাজল। তার ঘুম ভেঙে গেল। নাটমন্দির থেকে ঘুম-চোখে সে সোজা চলে গেল টালীর নালার ধারে।

গত দিবসের সমস্ত গ্লানি আদি-গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে নতুন দিনের প্রভাতে নতুন উদ্যম নিয়ে নতুন কিছু একটা করবার প্রচেষ্টায় সে এগিয়ে চল্‌ল। কালীঘাটের বাজারের সুমুখে এসে সে একবার তার ট্যাঁকে হাত দিল। চারটী পয়সা। পয়সাগুলি আর একবার ভাল ক'রে গুনে নিয়ে, সেগুলি যথাস্থানে রেখে দিয়ে সে আবার পথ চলতে আরম্ভ করল।

আজকের মত সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু কাল কি হবে? মাত্র চারটী পয়সা সম্বল করে কলকাতার মত সহরে একজন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে আর কতদিন বেঁচে থাকা সম্ভবপর? অথচ ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে, এক মাস পূর্ব্বে সে কল্পনাও করতে পারেনি। সে বর্ত্তমানকালের সাধারণ কলেজ ষ্টুডেণ্টদের মত ছিল কল্পনাবিলাসী, কিন্তু অকস্মাৎ এমন উৎকট দারিদ্র্যের সম্মুখীন হবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না! মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সংসারে কত বড় পরিবর্ত্তনই না হ'তে পারে! পিতার মৃত্যু; খুল্লতাতের বিষয়-ব্যাপারে অত্যধিক দাবী; ফলে মোকদ্দমা এবং আদালত ও উকীলবাবুদের নানাবিধ 'ফীস্' আদায়ের তাড়নায় দুর্ব্বলের সর্ব্বনাশ। কিন্তু যাক সে সকল পুরাণ কাহিনী; এখন কাল কি হবে?

বেলা আটটার সময়ে কটেজ লাইব্রেরীর ফ্রী রিডিং রুম থেকে সে বিরস মুখে বেরিয়ে এল। সহরের সমস্ত দৈনিকগুলি সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে; চাকরী তো দূরের কথা সামান্য একটা টিউশানীর প্রয়োজনও এত বড় সহরে কারুর নেই!

খবরের কাগজের ওপর তার আর কোন আশা-ভরসা নেই। গম্ভীর-মুখে রাস্তা চলতে চলতে সে গ্যাসপোষ্ট আর বাড়ীর দেওয়াল প্রভৃতি স্থানগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। হাজরা পার্কের মোড়ে এসে সে হঠাৎ থেমে গেল। ওই তো একখণ্ড কাগজ! —সদ্য আঠা দিয়ে মেরে দিয়ে গিয়েছে। ঈশ্বর বুঝি এত দিনে মুখ তুলে চাইলেন! সে পড়ল: "দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য একজন অভিজ্ঞ টিউটর প্রয়োজন।" তাড়াতাড়ি কাগজখানি ছিঁড়ে নিয়ে সে দ্রুতপদে রাস্তা পার হ'ল।

সে দ্রুতপদে দুরু-দুরু-বক্ষে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় এসে উপস্থিত হ'ল। বাইরের ঘরে একটী অল্প বয়স্ক যুবক বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল; তাকেই সবিনয়ে নমস্কার ক'রে সে জিজ্ঞাসা করল: "আপনাদের কি একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার...?"

যুবকটী বিস্মিত হ'য়ে কিয়ৎকাল তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ফিক্ ক'রে একটু হেসে নিয়ে বলল: "এরই মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন? বোধহয় কুড়ি মিনিটও এখনও হয়নি—নোটিস এঁটে দিয়ে এসেছি হাজরা পার্কের মোড়ে। যাক্‌গে—হ্যাঁ—মামাবুর একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। আপনি কি..."

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার কোয়ালিফিকেশন..." সে পকেট থেকে তার 'ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেট্'খানি সযত্নে বার করে যুবকটীর হাতে দিল। সার্টিফিকেট পড়ে বলল: ওঃ—আপনি গ্রাজুয়েট! কিন্তু আমাদের তো গ্রাজুয়েট দরকার নেই।"

—"কেন"?

তার নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে যুবকটীর মনে বোধহয় একটু দয়ার সঞ্চার হ'ল। বলল: "আমরা অল্প মাইনের লোক খুঁজছি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়ে—হেঁ-হেঁ আপনার সুবিধা হবে কেন?"

"অল্প মাইনে?—বেশতো—কত পর্য্যন্ত আপনারা দিতে পারেন জানতে পারলে..."

"তবে একটু বসুন, আমি মামাবাবুকে ডেকে দি।"

যুবকটী বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান করল। তার মনের মধ্যে তখন আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা

নিয়ে সে স্থির করল যত অল্প বেতনই এরা প্রস্তাব করুক না কেন—দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেলেই সে সন্তুষ্ট।

মামাবাবু ঘরে ঢুকলেন। সে ভেবেছিল মামাবাবুটী নিশ্চয়ই একজন প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তি হবেন; কিন্তু এখন দেখল তিনি যুবক, বয়স বোধহয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসরের বেশী হবে না। তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন শ্লীপিং গাউন পরে'। বোধহয় তাঁকে সদ্য ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে কঠোর দৃষ্টিতে তার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে মামাবাবু গাউনের পকেট থেকে প্রকাণ্ড বড় একটী জার্ম্মাণ-সিলভারের সিগারেট কেস্ বা'র করলেন। তা' থেকে একটী সিগারেট ধরিয়ে নিলেন, পরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "তারপর—কি চাও তুমি?"

সে ভীষণভাবে চমকে উঠল। মামাবাবুর কণ্ঠস্বরটী যেমন মোটা ও কর্কশ, তাঁর ব্যবহারটীও তেমনি অদ্ভুত এবং অভদ্র। নিজের মলিন কাপড়-জামার প্রতি একবার করুণভাবে দৃষ্টিপাত করে সে তাঁর "তুমি" বলবার তাৎপর্য্যও তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করল। ঢোঁক গিলে সে উত্তর দিল: "ছেলে পড়াবার জন্যে···আপনি···"

"ওহো, তুমি একজন candidate? I see—তা' দেখ, আগে যে লোকটা এদের পড়াত, সে আমার কাছ থেকে মাসে দশ টাকা ক'রে আদায় করত। দশ টাকা আমি দেব না। তুমি কত কমে পার?"

সে ব্যাকুল হ'য়ে বলল: "দেখুন আমি···আমি একজন গ্রাজুয়েট্···আপনি দয়া করে যদি···" সে আর বলতে পারল না। কি যেন একটা তার গলার কাছে ঠেলে ঠেলে উঠে তার কণ্ঠস্বরকে বাধা দিচ্ছিল।

অবজ্ঞার স্বরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মামাবাবু বললেন: "শোন—মাসে আট টাকা ক'রে তুমি পাবে। রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক পড়াবে—আর বিকেলে ঘণ্টাখানেক গান শেখাবে—বুঝলে?"

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না। আমতা-আমতা ক'রে বহু কষ্টে বলল: "গান?—শেখাতে হবে?—আমি তো···"

বিরক্তির চরম সীমায় উপস্থিত হ'য়ে দাঁত মুখ বিকৃত করে মামাবাবু বললেন: "জান না—এই তো? তা' গান জান না তো এখানে এসেছ কেন? দিলে আমার সকাল বেলার ঘুমটা মাটী করে'···" এই ব'লে আর কোন দিকে না চেয়ে দ্রুতপদে তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান করলেন।

লজ্জায় কি কিসে ঠিক জানা গেল না, তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছিল। সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এল। মামাবাবুর ভাগ্নেটী তারই জন্য বোধহয় রাস্তায় অপেক্ষা করছিল; তাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল: "দেখুন কিছু মনে করবেন না। মামাবাবুর ব্যবহারের জন্যে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। বিলেত থেকে ফেরবার পর থেকেই উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। কিছু মনে করবেন না; তাঁর জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

যুবকটী তার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করবার চেষ্টা করছিল কিনা, জানা গেল না বটে, কিন্তু সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল: "উনি বিলেত-ফেরৎ?"

"হ্যাঁ ব্যারিষ্টার—গত বছর ফিরেছেন।"

সে যেন নিশ্চন্ত হ'য়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল: ওঃ তাই!" মামাবাবুটীকে সে প্রথমে একজন সিনেমা এক্টর বলে ধরে নিয়েছিল; এখন তাঁকে সদ্য বিলেত-ফেরৎ জেনে সে বিস্মিত হ'লেও নিশ্চিন্ত হ'ল। এই তো স্বাভাবিক! সে হেসে ভাগ্নেটীকে বলল: "না—আমি কিছু মনে করেনি। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না; কিন্তু একটা কাজ করবেন—এবার বিজ্ঞাপন দেবার সময়ে গানের কথাটাও লিখে দেবেন। তাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হবে।"

সে যুবকটীকে একটী নমস্কার ক'রে দক্ষিণ দিকে চলতে সুরু করল। কি করবে সে? দুশ্চিন্তায় হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে পথ চলছিল সে—হঠাৎ বাধা পেল। পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধের ওপর একটা চড় মারল। সে ফিরে দেখল—এ সেই রজত রায়; তার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। ঢিলা পায়জামা-পরা পা দু'টী এংলো-ইণ্ডিয়ানদের মত ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, তার নাকের গোড়ায় দেড় পয়সা মূল্যের সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মৃদু হেসে সে জিজ্ঞাসা করল: "কিরে হঠাৎ সোস্যালিষ্ট হয়ে পড়লি নাকি?"

সে বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল: "অর্থাৎ"

"অর্থাৎ—যে রকম পোষাক পরে রাস্তায় বেরিয়েছ বাবা, তাতে তো তাই মনে হয়। যাক্—তোর সঙ্গে দেখা হ'ল্ ভালই হ'ল—চল্।"

"কোথায়?"

Y. M. C. Aতে—বিলিয়ার্ড খেলব।"

"দুঃখিত—আমার একটু কাজ আছে।"

"ওঃ—Sorry—যাক্ গণ্ডা ছয়েক পয়সা ধার দে দেখি;—আমার পার্স'টা আবার বাড়ীতে ভুলে ফেলে এলাম—"

কথাটা রজত বেশ সহজ ভাবেই বলল। সে কিন্তু হেসে ফেলল। বলল: "পয়সা কি হবে?"

"দু-তিন গেম বিলিয়ার্ড খেলব। মিস্ দাস আজ আসছেন শুনলাম। বড় দেরী হ'য়ে গেল।" এই বলে সে বাঙ্গলা দেশের কোন এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেতার অনুকরণে হাসল। সেও হাসল। বলল: "পয়সাটা কাল দিলে হয় না?"

এগিয়ে চলল সে। মনে পড়ে তার মাত্র দু'মাস পূর্ব্বেকার কথা, যখন সে নিছক বন্ধুত্বের আড়ম্বর বজায় রাখতে গিয়ে একসঙ্গে দশ পনের টাকাও খরচ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি। আর এখন? সেই স্মৃতি এখন তার দিবারাত্রির লজ্জা। তাই তো সে সেই সব তথাকথিত বন্ধুত্বের জের টেনে—তাদের কাছে নিজের দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করতে এত কুণ্ঠিত হয়। নিজের দুর্দ্দশার বিনিময়ে তাদের হাসির খোরাক জোগাবার মত হৃদয়ের প্রাচুর্য্য তার নেই। কিন্তু কি করবে সে?

হঠাৎ তার মনে পড়ে বিমলেন্দু সেনের কথা। তার অসংখ্য বন্ধুদের মধ্যে শুধু সে-ই ছিল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। একদিন এই দাবীতেই বিমু তার কাছে কর্জ্জ চাইতে কুণ্ঠা বোধ করেনি এবং সেও সে দাবী পূর্ণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি। সেদিন সেটা ঠিক টাকা ধার দেওয়া ছিল না—সেটা ছিল বন্ধুত্বের নিদর্শন। একটা সঙ্কোচ—একটা লজ্জার আবেশ তবু তার গতিশক্তিকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। এ ভিক্ষা নয়—এ তার দাবী। তবু কেন তার এ সঙ্কোচ—এ লজ্জা? এ মনোবৃত্তি সে পেল কোথা থেকে?

বিমলেন্দু সেন বর্ত্তমান যুগের একজন নাম-করা তরুণ সাহিত্যিক। থাকে বালিগঞ্জে—লেখে বস্তি-সাহিত্য। সেদিন সকালে যখন সে তার অগণিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বাছা-বাছা কয়েক জনকে নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায় তার বৈঠকখানা গুলজার করে' তুলছিল, সেই সময়ে আপাদ-মস্তক দারিদ্র্যের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে ধীর পদে সে সেই সৌখিন সম্প্রাদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করল। বিমলেন্দুর অত্যধিক সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে দৃষ্টি-শক্তির প্রখরতা বোধহয় পূর্ব্বের মত আর ছিল না, তাই অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত তাকে একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমে সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিল। পরে কিন্তু চিনতে পারল। শুষ্ককণ্ঠে ভদ্রতার হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল: "আরে তুমি?—এতদিন পরে?" এই বলে অন্দরের উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিল: "ওরে আর এক কাপ চা দিয়ে যা।" সে একটু হেসে বাধা দিয়ে বলল: "থাক্—থাক্ আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। খালি পেটে আমি চা খাই না।"

"ওঃ—ওরে তবে থাক। তারপর কি মনে ক'রে বল।"

"তোমার সঙ্গে ভাই কিছু কথা আছে। একটু privately বলতে চাই।"

"কিছু দরকার নেই। এরা সকলেই আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু—তুমি স্বচ্ছন্দে বল।"

"তা' হোক—তুমি একটু বাইরে এস।"

দুইজনে বাইরে এল। বেলা সাড়ে এগারটা অবধি তার 'খালি পেট' কেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না করে ব্যস্ত হ'য়ে বিমলেন্দু বলল: "কি বলবে বল—আমার ভাই একটু তাড়াতাড়ি আছে।"

সে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "হ্যাঁ বলছি। দেখ—মাস দু'য়েক পূর্ব্বে বিশেষ কোন দরকারে তুমি আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলে, সেটা কি এখন দেবার সুবিধে হবে? আমি একটু জড়িয়ে পড়েছি।"

বিমলেন্দু গম্ভীর ভাব ধারণ করল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তিত স্বরে বলল: "টাকা? মাস দু'য়েক পূর্ব্বে তোমার

কাছ থেকে নিয়েছিলাম বলছ? কিন্তু আমার তো কই··· আচ্ছা Next monthএ তুমি একবার এস। আমি আমার ডাইরীটা দেখে রাখবখ'ন।"

বিমলেন্দুর কথায় যথেষ্ট পরিমাণ বিরক্তির ঝাঁঝ্ পাওয়া গেল। সে বিস্মিত হ'ল। সে এতটা আশা করেনি। বলল: "Next monthএ আমার তো আসবার সুবিধা হবে না ভাই।"

বিমলেন্দু দৃঢ় স্বরে বলল: "Then can't help"—

সে ঈষৎ ব্যাকুল হ'য়ে বলল: "আমার যে বড্ড দরকার পড়েছে। তুমি যা পার আমাকে এই সময়ে দিয়ে help কর।"

"Sorry এই মাত্র সিগারেটের বিলের দরুণ তিরিশ টাকা দিয়ে দিলাম। আমার কাছে আর কিছু নেই— আচ্ছা, Good by।"

বিমলেন্দু চলে গেল। সে স্তম্ভিত হ'য়ে কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। কে যেন তার মুখে এক পোঁচ কালী মাখিয়ে দিয়ে গেল। এই সেই বিমলেন্দু! এখন মাসে তিরিশ টাকার সিগারেট খায়!

সে আবার রাস্তা পার হ'ল।

সে ভাবছিল—চাকুরীর সন্ধানে আজ কোথায় কোথায় যাবে।

কিন্তু আফিস্ পাড়ায় সে গুটী কতক ছোট ছোট বাঙ্গালী আফিস্ ছাড়া অন্য কোথাও ঢোকবার অনুমতি পেল না।

উপস্থিত চাকরীর আশা ত্যাগ করে সে এগিয়ে চলল ম্যাঙ্গো লেনের দিকে। সেখানে একটী ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে তাদের দেশের রমেনদা চাকরী করেন। হয়তো তিনি একটা কিছু সন্ধান দিতে পারেন। যে লোক আজ পঁয়তাল্লিস বৎসর যাবৎ এ পাড়ার বিভিন্ন কোম্পানীতে কেরাণীর কাজ ক'রে আসছেন, তাঁর আর কিছু না থাক একটা অভিজ্ঞতা আছে তো!

সাক্ষাতে রমেনদাও তাকে নিরাশ করলেন না, বললেন: "তা' তুই ভাবছিস্ কেন? ইনস্যুরেন্সের দালালী কর না—দু' দিনে লাল হ'য়ে যাবি।"

বিষাদের হাসি হেসে সে জবাব দিল: "আর দাদা —রোদে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই যে কালচে মেরে যাচ্ছি। ব্যাগ-বগলে ইনস্যুরেন্সের দালাল দেখলে আজকাল ভদ্রলোকেরা যে ভয় পায়। ও কাজ তো আমি পূর্ব্বে অনেকবার করবার চেষ্টা করেছি দাদা!"

রমেনদা আশা দিয়ে হেসে বললেন: "তা তুই যত সব বাজে কোম্পানীর হয়ে ঘুরে মরবি আর লোকে তাড়া করবে না? আমাদের কোম্পানীর হ'য়ে কাজ কর্, দেখিস্—দু' দিনে লাল হ'য়ে যাবি।"

"কোন পার্টি সন্ধানে আছে নাকি?"

বিরক্ত হ'য়ে দাদা বললেন: "আরে তাই যদি থাকবে, তবে তোকে বলতে যাব কেন? আমি নিজেই তো······ শোন্—আমাদের হ'য়ে কাজ কর; কমিশন তো কম নয়! প্রথম বছরের প্রিমিয়ামের ওপর তোকে আমি শতকরা ষাট সত্তর পার্‌সেণ্ট পর্য্যন্ত পাইয়ে দেব। আর রিণিওয়ালের ওপরও মনে কর দশ পার্‌সেণ্ট পর্য্যন্ত পেতে পারিস্। একি সহজ কথা? লেগে পড়, লেগে পড়, দু'দিনে লাল হ'য়ে যাবি। আমি তোকে গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি—আমাদের কোম্পানীর মত এ রকম দেনেওয়ালা কোম্পানী তুই আর কোথাও পাবি না। নে—নে ফর্ম্ম টা ফিল আপ করে দে—দু'দিনে লাল হ'য়ে যাবি।" এই বলে দাদা তাকে আরও বেশী খুশী করে দেবার জন্যে জামার পকেট থেকে একটী জার্ম্মাণ সিলভারের ডিবা বার ক'রে তা থেকে একটী পান বের করে তাকে আপ্যায়িত ক'রলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফর্ম্মগুলোও তার দিকে এগিয়ে দিলেন। পান খেয়ে সে বলল: "আচ্ছা—তা'হলে আসি দাদা।"

"এ্যাঁ···" দাদার কথা শেষ হ'ল না, সে ঘর থেকে পথে বেরুল।

ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হ'য়ে এল। তার গন্তব্যস্থল আর কতদূর? কোন পার্কে রাত্রি বাস করা আইনতঃ অমার্জ্জনীয়; কোন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর রোয়াকে আশ্রয় নেওয়ারও বিপদ আছে। তবে কি করবে সে? কাল সে কালীঘাটের নাট-মন্দিরে রাত্রি বাস করবার সুযোগ করেছিল; কিন্তু আজ আবার সেইখানে ফিরে যায় কোন্

মুখে? তাছাড়া হেদুয়া তলার মোড় থেকে কালীঘাটের মন্দিরের দূরত্ব নিতান্ত অল্প নয়! পথ হাঁটার পরিশ্রমে যদি আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়? তখন কি হবে? তার কাছে তো আর একটাও পয়সা নেই—সে যে বড় কষ্ট! তখন কি করবে সে?

গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা তার কাছে ছেলে-মানুষী! প্রবঞ্চনার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করার প্রধান বাধা তার শিক্ষা! হাত পেতে ভিক্ষা করার কথা ভাবতে এখনও সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে! তবে কি করবে সে?

সহরের সব কয়টী রেলওয়ে ষ্টেশনে বার কয়েক রাত্রিবাস করে সে সেখানে পরিচিত হ'য়ে পড়েছে। ষ্টেশনটা কোম্পানীর যাত্রীদের জন্য—আশ্রয়-হীন দরিদ্রের জন্য নয়। এ সত্ত্বেও অবৈধভাবে তার মত যারা সেখানে রাত্রিবাস করবার চেষ্টা করে, তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কোম্পানী মাসিক মাহিনা দিয়ে যে সব জমাদার পুলিস মোতায়ন রেখেছে, তারা নিমকের অসম্মান করে না।

তার দুঃখ—ঈশ্বর কেন তাকে ভদ্রলোকের মত চেহারার সৌষ্ঠব দিলেন! যদি তার চেহারাটা ভদ্র সন্তানের মত না হয়ে কুলী-মজুরদের মতও হ'ত, তা'হলে হয়তো এই সব কঠোর আইনের ব্যতিক্রম হ'তে পারত।

এইরূপ অবান্তর চিন্তা করতে করতে কখন যে সে একটী গলির মধ্যে এসে পড়েছিল, তা সে জানতে পারেনি। তার চমক ভাঙ্গল সুমিষ্ট সানাইয়ের আওয়াজে। গলির মুখেই একটী বড় বাড়ীতে বোধহয় বিবাহ। ছাদের ওপর হোগলা বাঁধা; অনেক লোকের যাতায়াতে স্থানটী গম্-গম্ করছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে বাড়ীর ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। সানাইওয়ালার 'পরজ-বসন্ত' আলাপের উন্মাদনায় সে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছিল। সে মুগ্ধ হয়ে বাঁশীর সুর শুনতে লাগল। ক্লান্ত শরীরে শৃঙ্গারের আবেশ এত ভাল লাগে কেন!

—এই—এই—এই

সশব্দে বিরাট্ একটা মোটর ব্রেক কষল। আর একটু হ'লেই প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খেত সে। এমন ভাবে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই উৎসব আর তার সুমুখে সাজানো পথটি জুড়ে। সে অপ্রয়োজনীয়—সে একটা বাধা। ড্রাইভার মোটর থেকে রুখে এল। গেটের সুমুখে দাঁড়িয়ে যে প্রিয়দর্শন যুবকটী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ক'রছিল—সে তেড়ে এসে একটা চড়ই বসিয়ে দিলে। আর মোটরে আরোহিণী তরুণীটী সেই যে আতঙ্কে একটি অস্ফুট শব্দ ক'রে এক কোণ ঘেঁষে বসেচে—এখনও যেন তার ঘোর কাটেনি। ভয়ে ভয়ে এখনও সে তাকিয়ে আছে হতভাগ্য যুবকটির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে যেন তার ঘোর কেটে গেল। আবার একটি অস্ফুট শব্দ ক'রল সে। "মণ্টু দা"—এই বলে ক্ষিপ্রহস্তে সে গাড়ীর দরজা খুলতে লাগল। এদিকে অপরাধীর মুখেও একটা অদ্ভুত হাসির রেশ্ দেখা গেল। সেও ডাকল: "মিনু…" তার আত্মস্বাতন্ত্র্য, আর প্রতিষ্ঠা এতটুকু অবশিষ্ট নেই। বিরাট্ একটা কি যেন তাকে পরাজিত ক'রেছে, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছে। মিনু ডাকল মোটরের দরজা খুলে—আর সেও নীরবে মোটরে উ'ঠে ব'সল।

অর্দ্ধনিদ্রিত সহরের বুকের উপর দিয়ে মিনুর আষ্টার-বুইক নিঃশব্দে উড়ে চলছিল। ভেতরে মণ্টুদার একখানি হাত নিজের কোলের ওপর নিয়ে উচ্ছ্বসিত মিনু অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। মিনু আজ বড় প্রগল্‌ভা হ'য়ে উঠেছে।

"—আর মনে পড়ে সেই চিলে কোঠায় বসে তোমাতে আমাতে চা খেতে খেতে লুডো খেলা?—মেসো মশায় চা ছাড়াবার জন্যে তোমায় কি গালাগালটাই না দিতেন! উঃ—সত্যি তুমি কিন্তু বড্ড দুষ্টু ছিলে! আর সেই……" বাকীটা মিনু বলতে পারে না। তার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। মিনুর হাতের ওপর একটু চাপ দিয়ে মণ্টু বলল: "আর তুমি বুঝি বড় লক্ষ্মী ছিলে না? মা তো তোমাকে……" তার উরুর ওপর একটা প্রচণ্ড চপটাঘাত করে মিনু জোরে বলে উঠল:

"আ—হা—হা তাই বুঝি? মাসীমার তো তোমাকেই নজরে নজরে রাখতে দিন কেটে যেত! কিন্তু তুমি কি বেহায়া ছিলে? মা গো—কী অসভ্য ছেলে বাবা!……" বাকীটা বলা হ'ল না। চক্ষু মুদিত করে মিনু বোধহয়

অনেক দিন পূর্ব্বেকার একটা ভুলে যাওয়া মধুর স্মৃতি চখের ওপর ভেসে উঠতে দেখছিল। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল :

"তারপর তোমরা দেশে চলে গেলে! আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।"

সে মিনুকে একটু নাড়া দিয়ে বলল : "মিনু, এইবার বাড়ী যাও।"

সেইভাবেই চক্ষু মুদিত করে মণ্টুদার একটা হাত চেপে ধরে মিনু বললে : "নাঃ।"

"সত্যি মিনু, আমার কথা শোন—আজকে আমায় ছেড়ে দাও; কাল সকাল বেলায় তো তোমার কাছে গিয়ে হাজির হ'ব। তা'ছাড়া তোমার মামাতো ভাইয়ের বৌভাত আজ! হয়তো তোমার জন্যে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

মিনু সেইভাবেই বলল : "না।"

"লক্ষীটা মিনু, লোকে কি বলবে?"

"বলুক—তোমায় আর আমি ছেড়ে দেব না।"

"ছিঃ মিনু, তা' হয় না…"

এইবার মিনু চোখ খুলল। বিষাদের হাসি হেসে বলল : "তা হয় না—না? তোমার অনেক বাধা…"

আবার মিনু চক্ষু বুজল। যেন সে আর পারে না—যেন সে আজ বড় ক্লান্ত। সে আবার মণ্টুকে ঈষৎ নাড়া দিল। এইবার তার পানে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল : "কিন্তু জীবনের কি বৈচিত্র্য দেখ—সেই তুমি, সেই আমি! অথচ আজ একজন লক্ষপতি ব্যবসায়ীর মেয়ে আর একজন…কিন্তু তোমার কি আজ বাড়ী না গেলেই নয়?"

ইতস্ততঃ করে মণ্টু বলল : "কিন্তু কাল সকালেই তো তোমার কাছে যাচ্ছি মিনু"…তন্দ্রাচ্ছন্নের মত মিনু যেন আপনার মনেই বললে : "যদি আবার হারিয়ে যাও…"

"লক্ষীটী মিনু…"

সজাগ হ'য়ে উঠে বসে মিনু ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললে : "শীতল সিং, গাড়ী ষ্টেশনকো পাস্ লে চল্ না।"

মণ্টুকে ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে মিনুর গাড়ী পুনঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত্রি তখন প্রায় বারটা।

ষ্টেশনে ঢুকে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামঘরের এক বার্ণিস-চটা বেঞ্চের ওপর সে সংশয়াকুল চিত্তে শুয়ে পড়ল। তার আজ বড় আনন্দ! তন্দ্রা এসে তাকে ক্ষণিক শান্তি দান করল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে কতক্ষণ শুয়েছিল জানে না; হঠাৎ কার উগ্র কণ্ঠস্বরে তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়ে সে দেখল, একটি বাঙ্গালী সাহেব আর তিনজন খাকী-পোষাক-পরা রেল-পুলিস তারই পাশে দাঁড়িয়ে। সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি কি মৎলবে প্রত্যহ এখানে এসে শুয়ে থাক?" তন্দ্রার ঘোর তার বোধহয় তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটেনি, সে কোন উত্তর দিতে পারল না। সাহেব তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে মাটীতে সজোরে পদাঘাত করে বললেন : "young man, তোমাকে পূর্ব্বে তিনবার warning দেওয়া হয়েছে; তা সত্ত্বেও তুমি যখন আবার আমাদের বিরক্ত করতে সাহসী হয়েছ, তখন রেলওয়ে আইনানুযায়ী আমরা তোমার intention জানতে চেষ্টা করব। Now you are under Company's custody. সুন্দরসিং, বাবুকো লে চলো।"

সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুর ভাবনা হ'ল : "আমার আজকের ভার তো এঁরা নিলেন—কিন্তু কাল কি হবে? আর মিনু!"

লীলা

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আমার লীলার মাঝে তোমার লীলার শোভা,
তাইতো হ'ল এতই মধুর, চিত্ত লোভা।
তাইতো রসের ছুটলো ধারা ভাবের সাথে,
এই পৃথিবীর বক্ষ ছাপি' দিবস রাতে।

ভারতের কয়লাসম্পদ্

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পাথুরে কয়লা যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। 'কয়লা' শব্দের নামকরণ সম্বন্ধে ও ভারতে প্রাচীন কালে পাথুরে কয়লার প্রচলন ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব। পূর্ব্বে কয়লা বলিলে সাধারণতঃ কাঠ কয়লাই বুঝাইত ; কিন্তু বর্ত্তমান-কালে ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত কয়লাকেই বাংলাভাষায় "পাথুরে কয়লা" বলা হয়। অন্যান্য দেশেও এই পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, যথা, ইংরাজী ভাষায় বর্ত্তমানে "Coal" ও পূর্ব্বের বানান "Cole" ; ওয়েল্‌স্‌বাসীদের ভাষায় "glo" ; কর্ণওয়াল অধিবাসীদের কথায় 'Kolhan" ; আয়ারল্যাণ্ডের প্রচলিত ভাষায় "Gual" ; জার্মান ভাষায় "Kohle" ; ওলন্দাজ ভাষায় "Kool" ; সুইডেনে প্রচলিত ভাষায় "Kol" ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন দেশের কয়লার নামকরণ হইতে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই শব্দের উৎপত্তি বোধহয় সংস্কৃত শব্দ "কাল" হইতেই সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশে যে বহু প্রাচীন কাল হইতে কাঠ-কয়লার নানা প্রকার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ও পুরাকালে যে ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্য এই কাঠ-কয়লার সাহায্যেই হইত, সে বিষয়ে অনেক প্রমাণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বহু পুরাকালের কর্ম্মকার ও ধাতুশিল্পিগণ 'পাথুরে কয়লার' ব্যবহার করিত কিনা বা 'পাথুরে কয়লা' ভূগর্ভ হইতে খনন ও উদ্ধার করিয়া ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্যে ব্যবহার করিত কিনা, সে বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যদি প্রাচীন পুঁথিপত্র হইতে এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত পান, তবে আমাদের দেশের কয়লা-ব্যবহারের প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টী সম্পূর্ণ করা হইবে। বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গ্রীক্ দার্শনিক থিওফ্রাষ্টাস্ খৃষ্ট জন্মের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে 'পাথুরে কয়লার' অস্তিত্ব ও ইহার দাহ্য গুণ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; এবং চীন দেশের অধিবাসিগণ খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে কয়লার ব্যবহার জানিতেন, তাহা আজ অনেকেই স্বীকার করেন। তবে বাংলা ও বিহার প্রদেশের কতকগুলি গ্রামের, যথা, বরাকর, কালিপাহাড়ী, অঙ্গার পাথ্‌রা ইত্যাদি নাম করণ হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বে কয়লা-খননকার্য্য হইত। তবে এ বিষয়ে আমরা ইহার অধিক কোনও সঠিক প্রমাণ বা ঐ সকল স্থান হইতে প্রাচীন খনির ধ্বংসাবশেষ বা কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তবে বিগত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌এর সময় হইতে 'পাথুরে কয়লা'-খননকার্য্যের সূচনা যে বর্দ্ধমান জিলার সীতারামপুরের নিকট আরম্ভ হয়, তাহার সঠিক প্রমাণ সরকারের দপ্তরে লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত আছে।

ভারতের কয়লাসম্পদের পরিমাণ ও পরমায়ুঃ কত, সে বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। তাহার পূর্ব্বে পৃথিবীর কয়লাসম্পদের বিষয় দু' এক কথা বলা এ প্রসঙ্গে অবান্তর হইবে না।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ বহু দিনের পরিশ্রমের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীর নানা দেশের ভূগর্ভে প্রায় ছয় হাজার ফুট মধ্যে বিভিন্ন স্তরে সর্ব্বসমেত ৭৩৯৭৫৫'৩ কোটী টন কয়লা মজুত আছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "এনথ্রাসাইট" কয়লা শতকরা ৬'৭৫ ভাগ, "বিটুমিনাস" শ্রেণীভুক্ত কয়লা ৫২'৭৫ ভাগ ও "লিগনাইট", "পিট্" প্রভৃতি নিকৃষ্ট কয়লা ৪০'৫ ভাগ বর্ত্তমান। নিম্নে প্রদত্ত ১নং তালিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের কয়লাসম্পদের পরিমাণ বিবৃত হইল।

১নং তালিকা

(আন্তর্জ্জাতিক ভূতত্ত্বসম্মিলনের রিপোর্ট হইতে গৃহীত)

মহাদেশ	এনথ্রাসাইট কয়লা	বিটুমিনাস্ কয়লা	লিগনাইট পীট্ শ্রেণী ভুক্ত কয়লা	মোট কোটী টন	%
ওসেনিয়া	৬৫·৯	১৩৩৪৮·১	৩৬২৭	১৭০৪১	২·৪
আফ্রিকা	১১৬৬·২	৪৫১২·৩	১০৫·৪	৫৭৮৩·৯	·৮
য়ুরোপ	৫৪৩৪·৬	৬৯৩১৬·২	৩৬৬৮·২	৭৮৪১৯	১০·৬
এশিয়া	৪০৭৬৩·৭	৭৬০০৯·৮	১১১৮৫·১	১২৭৯৫৮·৬	১৭·৩
আমেরিকা	২২৫৪·২	২২৭১০৮	২৮১১৯০·৬	৫১০৫৫২·৮	৬৯
মোট কোটী টন	৪৯৬৮৪·৬	৩৯০২৯৪·৪	২৯৯৭৭৬·৩	৭৩৯৭৫৫·৩	

বিভিন্ন দেশের ভূতত্ত্ববিভাগের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীর কয়লাসম্পদের অল্পাধিক অর্দ্ধেকাংশ আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের (U. S. A.) ভূগর্ভে নিহিত আছে এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের কয়লা-সম্ভার পৃথিবীর সমস্ত কয়লার এক চতুর্থাংশ হইবে। বিভিন্ন দেশে মোট কয়লাসম্পদের শতকরা কত ভাগ মজুত আছে, তাহা ২ নং তালিকায় দেওয়া হইল।

২নং তালিকা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৫১·৮%	সাইবেরিয়া	২·৩%
কানাডা	১৬·৮%	অষ্ট্রেলিয়া	২·২%
চীন	১৩·৫%	রুশিয়া	·৮%
জার্ম্মাণী	৫·৭%	আফ্রিকা	·৮%
গ্রেট ব্রিটেন	২·৬%	ভারতবর্ষ	·৮৪%

ভারতের ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, অতীতে প্রধানতঃ দুইবার অর্থাৎ গণ্ডোয়ানা যুগে (২০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে) ও টারশায়ারী যুগে (৬ কোটী বৎসর পূর্ব্বে) এ দেশে তৎকালীন উদ্ভিদরাজির ধ্বংসাবশেষ হইতে বহু পরিমাণ 'পাথুরে কয়লার' সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুই যুগ ব্যতীত অপরাপর যুগেও যে-একেবারেই কয়লার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা নহে; তবে তাহাদের পরিমাণ অতি অল্প বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ ও বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধে করা হয় নাই।

১। গণ্ডোয়ানা কয়লাসম্পদ্

ভারতের ভূগর্ভে এক হাজার ফুট মধ্যে এক ফুট বা ততোধিক যে সমস্ত কয়লার স্তর বিদ্যমান আছে, তাহাদের হিসাব করিলে সর্ব্বসমেত কয়লার পরিমাণ হইবে ৬০০০ কোটী টন। তবে বর্ত্তমান খনিবিদ্যার সাহায্যে চার ফুটের নিম্নে কোন কয়লাস্তর হইতে কয়লা উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় না এবং যে কয়লায় শতকরা ২৫ ভাগ বা তদূর্দ্ধ ভস্ম বর্ত্তমান, সে কয়লাও বিশেষ কোন কার্য্যোপযোগী হয় না। এই দুই কারণে দেখা যাইতেছে যে, যদিও ভারতের ভূগর্ভে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৬০০০ কোটী টন (total reserve) কয়লা নিহিত আছে, তথাপি সমস্ত কয়লা উদ্ধার করা আমাদের সাধ্যাতীত এবং অপকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাও হয়ত আমাদের বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না। এই প্রকার আলোচনার ফলে আমরা বলিতে পারি যে, ভারতে ৪ ফুট বা তদূর্দ্ধ কয়লাস্তরের ও শতকরা ২৫ ভাগের নিম্নে ভস্মযুক্ত কয়লার সম্পদ্ (workable reserve) হইবে মাত্র ২০০০ কোটী টন (৩ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সম্যক্ উন্নতি না হইলে, বাকী ৪০০০ কোটী টন কয়লা দেশের কোনও উপকার সাধন করিতে পারিবে না। নিম্নে প্রদত্ত ৩ নং তালিকায় গণ্ডোয়ানা যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সর্ব্বমোট এবং কার্য্যকরী কয়লাসম্পদের সবিশেষ সংবাদ দেওয়া হইল।

৩নং তালিকা

কয়লার ক্ষেত্র (গণ্ডোয়ানা যুগের)	(Total Reserve) সর্ব্বসমেত কয়লা সম্পদ	(Workable Reserve) কার্য্যকরী সম্পদের পরিমাণ
	কোটী টন	কোটী টন
দার্জ্জিলিং ও পূর্ব্ব হিমালয়ের পাদদেশ	১৫	২
গিরিডি, দেওঘর, রাজমহাল পাহাড়	৩৫	১৩
দামোদর নদ তীরবর্ত্তী :—রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, রামগড়, কারানপুরা ইত্যাদি	২৫০০	১০০০
শোন নদ তীরবর্ত্তী, আওরাঙ্গা, উমারিয়া প্রভৃতি	১০০০	২০০
ছত্রিশগড় ও মহানদী তীরবর্ত্তী	৫০০	১২০
মোপানী, কানহান ও পেঞ্চ নদী তীরবর্ত্তী	১৫০	২৫
ওয়ার্দ্ধা ও গোদাবরী তীরবর্ত্তী	১৮০০	৬৪০
মোট কোটী টন	৬০০০	২০০০

২। টারশায়ারী কয়লাসম্পদ

টারশায়ারী যুগের কয়লাক্ষেত্রের সবিশেষ সংবাদ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই, তবে মোটামুটী যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসমেত ২৩০ কোটী টন কয়লা মজুত আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন এবং ৪নং তালিকায় তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হইল।

৪নং তালিকা

উত্তর পূর্ব্ব আসাম	১০০ কোটী টন
খাসিয়া ও গাড়ো পাহাড়	১০০ ,, ,,
পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান্ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২০ ,, ,,
বিকানীর (রাজপুতনা)	১০ ,, ,,
মোট	২৩০ কোটী টন

এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে গণ্ডোয়ানা-যুগের কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীভুক্ত ; কিন্তু ভস্মের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক ও টারশায়ারী যুগের কয়লা লিগ্‌নাইট্ শ্রেণীভুক্ত হইলেও অনেক স্থলে ভস্মের ভাগ অত্যন্ত অল্প দৃষ্ট হয়। ৩নং তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, গণ্ডোয়ানা-যুগের স্তরের মধ্যে মোট ২০০০ কোটী টন কার্য্যকরী (workable reserve) কয়লা মজুত আছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লার (অর্থাৎ যার ভস্মের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগের কম) পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০০ কোটী টন (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য) ও বাকী ১৫০০ কোটী টন অপকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা। ৫নং তালিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের উচ্চ শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ দেখান হইল।

৫নং তালিকা

গিরিডি	৪ কোটী টন	কুরাশিয়া, ঝিলিমিলি প্রভৃতি	৩ টন
	১৮০	তালচীর ইত্যাদি	২০ ,,
ঝরিয়া	১২৫	কানহান, পেঞ্চ নদীর তীরবর্ত্তী ক্ষেত্র	৩ ,,
বোকারো	৮০		
কারানপুরা	৭৫	বাল্লাপুর, সিঙ্গারাণী ইত্যাদি	৫ ,,
উটার জোহিল্লা ইত্যাদি	৫		
		মোট	৫০০ কোটী টন

উপরোক্ত উৎকৃষ্ট কয়লার মধ্যে অল্লাধিক ২০০ কোটী টন কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা অর্থাৎ ইহা হইতে ধাতু-শিল্পের উপযোগী উৎকৃষ্ট কোক্ প্রস্তুত হইতে পারে ও অবশিষ্ট ৩০০ কোটী টন কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লা ভূগর্ভে মজুত আছে। কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লা ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না বটে, তবে অপরাপর নানাবিধ কার্য্যের জন্য বিশেষ উপযোগী। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, আজ পর্য্যন্ত লৌহ-কারখানার বিশাল চুল্লীতে (Blast furnace) ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্য কোক কয়লা ব্যতীত অপর কোন বস্তু দ্বারা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় নাই বলিয়াই এই শ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে। অনেক ছোট ছোট চুল্লীতে (যথা সুইডেনে ও মহীশূর রাজ্যের ভদ্রাবতী কারখানায়) কাঠ-কয়লার ব্যবহার অবশ্য আছে ; তবে অতিকায় ও উন্নত শ্রেণীর বিশাল লৌহচুল্লীতে কোক কয়লাই অপরিহার্য্য। তবে ভবিষ্যতে কোক্ কয়লার অভাবে অন্য কোনও উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য এখনও গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয় নাই ও সে প্রসঙ্গের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা যে সকল ক্ষেত্রে মজুত আছে, তাহাদের নাম নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল।

৬নং তালিকা

গাণ্ডোয়ানা যুগ	রাণীগঞ্জ	২৫ কোটী টন
	ঝরিয়া	
	গিরিডি	
	বোকারো	৪৭
	কারানপুরা	
	মোট	২০০ কোটী টন

টারশায়ারী যুগ—উত্তর পূর্ব্ব আসাম—৬০ কোটী টন। ইহাতে গন্ধকের ভাগ কিছু অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান বলিয়া ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্যে বিশেষ উপযোগী নহে। তবে গন্ধকের ভাগ কোন উপায়ে দূর করিতে পারিলে, এই কয়লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদনকারী কয়লা বলিয়া সমাদর লাভ করিবে।

যে খননপদ্ধতি বর্ত্তমানে ভারতের কয়লাক্ষেত্রে প্রচলিত, তাহার দ্বারা ভূগর্ভস্থ স্তর হইতে অর্দ্ধেকের বেশী কয়লা উত্তোলন করা সম্ভবপর নহে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যদি কোনরূপ খনি-দুর্ঘটনা দ্বারা

উদ্ধার কার্য্যে বাধার সৃষ্টি না হয়, তবে ভূগর্ভস্থ কয়লা-সম্পদের মাত্র অর্দ্ধেকাংশ আমাদের হস্তগত হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে আইনবিধিবদ্ধ "বালুকাপূরণ" (sandstowing) প্রথা যদি সকল ক্ষেত্রে সুচারুভাবে ও অবিলম্বে প্রচলিত হয়, তবে তিন চতুর্থাংশ বা ততোধিক কয়লা খনি হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে ও তৎসহ খনি-দুর্ঘটনার লাঘব হইয়া খনিমজুরদেরও যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া খনিবিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লা খনি-দুর্ঘটনার ফলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং বর্ত্তমানে অসঙ্গত উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত কয়লার যে পরিমাণ অপচয় ঘটিতেছে, তাহাতে ভারতের কয়লাসম্পদের পরমায়ুঃ বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই অপব্যয়ের ফলে ধাতুশিল্পের উপযোগী কয়লার অভাব ঘটিবে ও তজ্জন্য ভারতে লৌহশিল্প ও অন্যান্য ধাতু-শিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নহে, তাহাও অনেক বৈজ্ঞানিক উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও এ বিষয়ের সমুচিত প্রতিবিধান করিতে পারিলে, দেশের একটী জটিল সমস্যার সমাধান করা হইবে।

ভারতের কয়লাসম্পদ্ যাহাতে বহু কাল স্থায়ী হইয়া ভারতবাসীর ও দেশের নানাবিধ শিল্প ও কারখানায় প্রভূত উপকার সাধন করিতে থাকে, ভারতবাসী মাত্রেরই উহা কাম্য। দেশের কয়লাসম্পদের স্থায়িত্ব বা পরমায়ুঃ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে, সর্ব্বাগ্রে দুইটী কথা মনে উদিত হয়। যথা—

১। বিজ্ঞানসম্মত উন্নত খননপ্রণালীর আশু প্রবর্ত্তন।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যথাযথ সদ্ব্যবহার।

এই দুই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের কয়লাসম্পদের সম্যক্ সংরক্ষণ ও পূর্ণ পরমায়ুঃ লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। খননকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, ভূগর্ভ হইতে অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ খনিতে অনেক পরিমাণে (প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী) কয়লাই ভূগর্ভে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে ও ভবিষ্যতে তাহার পুনরুদ্ধার একেবারেই অসম্ভব। ইহাই বর্ত্তমানে অনেক খনির অভ্যন্তরে অগ্ন্যুৎপাতের অন্যতম কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯২৫ সালে গঠিত "কোল গ্রেডিং বোর্ডের" কার্য্যপ্রণালীকে ও বর্ত্তমান অপরিমার্জ্জিত খননপ্রণালীকে অনেক বিশেষজ্ঞ দায়ী করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের আশু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন না হইলে, ভারতের কয়লাখনিগুলিতে এইরূপ দুর্ঘটনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে ও ঘন ঘন অগ্ন্যুৎ-পাতের ফলে কয়লাসম্পদ্ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সুখের বিষয় যে, খনি ও খননকার্য্যে নিরাপত্তার জন্য সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের "বালুকাপূরণ" (sandstowing) প্রণালী আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ও তজ্জন্য কয়লার উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক আদায় করিতেছেন ও খনি মালিক-দিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে কোন কোন খনিতে এইরূপ বালুকাভরণ প্রথা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে প্রচলিত হইতেছে; তবে এ বিষয়ে সরকারের আরও অধিক দৃষ্টি পড়িলেও, বালুকা-ভরণ প্রথা আরও ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত হইলে বা সমস্ত খনিতে ইহার প্রচলন বাধ্যতামূলক হইলে, ভারতের কয়লাসম্পদ্ যে আরও অধিককাল স্থায়ী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করার জন্য সমস্ত খনিমালিকদিগকে শুল্ক ভাণ্ডার ও সাধারণ কোষাগার হইতে যথাযোগ্য অর্থ-সাহায্য করা গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহার জন্য যদি Stowing Bill কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করা প্রয়োজন হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ছোট ছোট খনির মালিকদিগকে এজন্য কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক একটী বড় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিতে পারেন, তবে অনেক বাধাবিপত্তি সহজেই অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগুয়ান হইতে পারিবেন। বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়লার যথাযথ সদ্ব্যবহার-পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হইলে, উচ্চ শ্রেণীর কয়লা-সম্পদ্ যে অধিকতর দিন স্থায়ী হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমানে ভারতে অন্যূনাধিক ২॥০ কোটী টন কয়লা

বৎসরে উৎপন্ন হয়। ইহার হিসাব ৭ নং তালিকায় দেওয়া হইল।

৭ নং তালিকা (১৯৩৭ সালের উৎপন্ন)

আসাম	২৪৮, ৫৬৩ টন	রাজপুতানা	৩২, ৩৬৯ টন
বেলুচিস্থান	১৭, ৪৭৯ ,,	হায়দ্রাবাদ (নিজাম)	১, ০৭৬, ২৪১ ,,
বাংলা	৬,৫২৭, ৮২০ ,,	মধ্য ভারত (C. India)	৩৩৪, ২৯১ ,,
বিহার	১৩, ৮৩৬, ৭১৭ ,,	ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সি	১,২৪৪, ৯৮৮ ,,
উড়িষ্যা	৪৭, ১২৭ ,,		
মধ্যপ্রদেশ	১,৫০৪, ১৫৯ ,,		
পাঞ্জাব	১৬৬, ৬৩২ ,,		
		মোট	২৫,০৩৬, ৩৮৬ টন

উপরোক্ত প্রায় ২॥০ কোটী টনের মধ্যে ১॥০ কোটী টন উৎকৃষ্ট কোক উৎপাদনকারী কয়লা ও ১ কোটী টন কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লা। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যত পরিমাণ কোক-উৎপাদনকারী কয়লা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হয় তাহার সমস্তই কি ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না? উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাবনিকাশ লইলে জানা যায় যে, খনি হইতে উৎপন্ন ১॥০ কোটী টনের মধ্যে ধাতুনিষ্কাষণের জন্য মাত্র ২৬ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্টাংশ রেলওয়ে ও অপরাপর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ড তাহাদের বাষ্পীয় শকটের জন্য কেবলমাত্র কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লা ব্যবহার না করিয়া বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদনকারী কয়লাই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ভারতের বেসরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ও নানাবিধ কল-কারখানায় এই শ্রেণীর কয়লাই (বৎসরে গড়ে প্রায় ১৷০ কোটী টন) অবাধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অপব্যবহারের ফলে বিট-শ্রেণীর কোক-উৎপাদন-কারী কয়লার সম্ভার অচিরে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অনেক প্রতিবাদ ভারত গভর্ণমেণ্টে পেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোনও সুফল লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাহাড়ে যে অফুরন্ত লৌহপ্রস্তর বিদ্যমান, তাহার সন্ধান ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু উৎকৃষ্ট কোক কয়লার অভাবে ভবিষ্যতে ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্য যে বিপন্ন হইবে, সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন যাবৎ সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই কারণে মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্ট, দেশের কয়লাশিল্প ও অপরাপর প্রতিষ্ঠান যদি অবিলম্বে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার সদ্ব্যবহার বিষয়ে মনোযোগ দেন, তবেই দেশের প্রভূত কল্যাণ করা হইবে। এজন্য সর্ব্বসাধারণের চেষ্টায় উচ্চ শ্রেণীর কয়লার ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে যদি কোনরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয়, তবেই মঙ্গল এবং তাহাতেই দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইবে। যদি কয়লার যথাযথ ব্যবহারের প্রচলন হয়, তবে বৎসরে গড়ে ৩০ লক্ষ টন কোক-উৎপাদনকারী কয়লা উদ্ধার করিলেই সমস্ত ধাতুনিষ্কাষণ কার্য্য সুচারু-রূপেই চলিবে ও তাহার ফলে এই শ্রেণীর কয়লার পরমায়ুঃ হইবে অল্লাধিক ৩০০ বৎসর। কিন্তু যদি বর্ত্তমান দূষিত প্রণালীতে কার্য্য চলিতে থাকে অর্থাৎ বাৎসরিক ১৷০ কোটী টন ব্যবহারের ফলে ইহার পরমায়ুঃ হইবে মাত্র ৬৬ বৎসর। তবে "বালুকাপূরণ" প্রথা ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হওয়ার ফলে অবশ্য খনির নিরাপত্তা ও কয়লাসম্পদের স্থায়িত্ব আরও কিছু বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের উচ্চশ্রেণীর কয়লা-সম্পদ্ মোট ৫০০ কোটী টন; কিন্তু নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট অর্থাৎ ১৫০০ কোটী টন। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে, ভবিষ্যতে যদি গবেষণার ফলে সর্ব্বসাধারণের চেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর কয়লা বহুবিধ কার্য্যে উন্নত প্রণালীতে নিয়োজিত হইতে থাকে এবং নানাপ্রকার ব্যবহারবিধি বাধ্যতামূলক হয়, তবে উচ্চশ্রেণীর কয়লার পরমায়ুঃ আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এরূপ সাফল্যের অনেক দৃষ্টান্ত অপরাপর নানা দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিছু কিছু চলিতেছে। আরও অধিক চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ও সর্ব্বসাধারণের চেষ্টায় কয়লার যথাযথ সদ্ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হইলে, ভারতের কয়লাসম্ভার বহুকাল ধরিয়া নানাবিধ ধাতু ও অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করুক, ইহাই প্রার্থনা।*

* প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ১৩৪৯ সালের অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে চন্দননগরে প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(চতুর্থ পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

তথা প্রাণাঃ ॥১॥

তথা (যেরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ) প্রাণাঃ (প্রাণ উৎপদ্যমান বস্তু)।

প্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্যাসদেব এই অধ্যায়ে ইহাই প্রমাণ করিতেছেন। ইহার কারণ আছে। শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তির কথা আছে; কিন্তু এমন শ্রুতিও আছে, যাহাতে প্রাণের উৎপত্তির কথা নাই। এই হেতু এইরূপ সংশয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক—প্রাণকে উৎপদ্যমান অথবা অনুৎপদ্যমান বলিব? যথা, এক শ্রুতি বলিতেছেন—"তত্তেজোঽসৃজত" (তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন)। তারপর বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তির কথা উল্লিখিত হয় নাই। আবার এমন শ্রুতিও আছে, যাহাতে স্পষ্ট করিয়া প্রাণের অনুৎপত্তির কথাই বলা হইয়াছে। "এই আকাশ পূর্ব্বে সবই অসৎ ছিল" অর্থাৎ কিছুই ছিল না। ঋষি প্রশ্ন করিলেন—"কিম্ তদসদাসীৎ" অর্থাৎ কি অসৎ ছিল? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন "ঋষয়ঃ অগ্রেঽসদাসীৎ" প্রভৃতি অর্থাৎ ঋষিরাই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল। পুনরায় প্রশ্ন হইয়াছে—"কে তে ঋষয়ঃ" অর্থাৎ সেই ঋষিরা কে? উত্তর দেওয়া হইয়াছে "প্রাণাঃ বা ঋষয়ঃ।" অর্থাৎ প্রাণেরাই ঋষি। অতএব এতদ্দ্বারা প্রাণের অনুৎপত্তির কথাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই গেল এক পক্ষ শ্রুতির কথা। আবার অন্য পক্ষের শ্রুতি প্রাণোৎপত্তির কথা বলিতেছেন। যথা, "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবতি তস্মাৎ" অর্থাৎ সপ্ত প্রাণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। "সঃ প্রাণম্ অসৃজৎ" অর্থাৎ তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ শ্রুতিবিরোধ থাকায়, কেহ বলিবেন—প্রাণ উৎপন্ন, আবার কেহ বলিবেন—প্রাণ উৎপদ্যমান নহে। ব্যাসদেব এই হেতু বলিলেন—আকাশাদির ন্যায় প্রাণও উৎপদ্যমান।

যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তির কথা আছে, তাহা হইতে এমন ধারণা সঙ্গত নহে যে, শ্রুতি-বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি অশ্রবণ থাকা হেতু প্রাণোৎপত্তি নিষিদ্ধ হইতে পারে। যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তির কথা উক্ত হয় নাই, তাহা হইতে এইরূপই বুঝা যায় যে, ঐ সকলে প্রাণোৎপত্তির কথা না থাকিলেও, শ্রুত্যন্তরে প্রাণের উৎপত্তি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতি প্রাণের জন্মবত্তা স্বীকার করিয়াছে। যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের জন্মবত্তার কথা নাই, তাহার অর্থ ইহা নয় যে, উহা অস্বীকৃত হইয়াছে। পরন্তু উহা অশ্রবণ আছে মাত্র। তাহাতে প্রবল শ্রুতি-মতে যাহা যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নাকচ হয় না। এই হেতু যে সকল শ্রুতি বাক্যে প্রাণের উৎপত্তির কথা অবিশেষিত, কেবল অশ্রবণ মাত্র, সেই সকল শ্রুতির আশ্রয় লইয়া প্রাণের অনুৎপত্তির কথা স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। বিশেষভাবে প্রাণের উৎপত্তি-কথার প্রবল শ্রুতি-মত থাকা হেতু আকাশাদির ন্যায় প্রাণকে উৎপন্ন পদার্থই বলিতে হইবে।

গৌণোঽসম্ভবাৎ ॥২॥

গৌণ (গৌণার্থ গ্রহণ) অসম্ভবাৎ (সম্ভাবনা নাই, এই হেতু)।

কেহ কেহ বলিবেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণ, এইরূপ শ্রুতি-বাক্য থাকায়, শ্রুত্যন্তরে প্রাণের উৎপত্তি মুখ্যার্থে গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থেও ত গ্রহণ করা যায়। এইরূপ হইলে, উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য থাকে। তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—প্রাণের উৎপত্তি গৌণার্থে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কেন না প্রাণ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপদ্যমান না হয়, ইহার গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া যদি বলা হয় যে, প্রাণ উৎপন্ন পদার্থ নহে, উৎপন্নের মত প্রতীত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির প্রধান প্রতিজ্ঞাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রুতির উদ্দেশ্য এক-বিজ্ঞান সপ্রমাণ করা, যে বিজ্ঞান অবগত হইলে, সর্ব্ব বিজ্ঞান অবধৃত হয়। প্রাণ যদি অনুৎপন্ন হয়, গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া ইহা উৎপন্নের মত বলিলে, প্রাণ-বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, দুইটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে শ্রুতির যে মূল প্রতিজ্ঞা, তাহাই ব্যাহত হইয়া পড়ে। অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ যে অর্থে নিবারিত হয় না, সে অর্থ শ্রুতি-বাক্যের হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং প্রাণোৎপত্তির কথা গৌণার্থে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়।

তৎপ্রাক্ শ্রুতেঃ ॥৩॥

তৎ (জন্মবাদী পদ)। প্রাক্ (পূর্ব্বে)। শ্রুতেঃ (শ্রুতিতে শ্রবণ থাকা হেতু)।

অর্থাৎ মুণ্ডক্য উপনিষদে আছে "এতাস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুরিত্যাদি।" এই 'জায়তে' পদটী সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ বিষয়ে শ্রুত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি, মন ও আকাশাদি পর পর পদার্থে অনুবর্ত্তিত হইয়াছে। আকাশাদির জন্ম যখন মুখ্য, তখন আকাশাদির সহিত পঠিত প্রাণের জন্মও মুখ্য হইবে। তবে যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তিবিষয়ক বাক্য অশ্রুত আছে, তাহার কারণ প্রাণকে সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া ঐ সকল শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন—প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। তাহার পর আবার বলিতেছেন—তিনি ভূতনিবহের আদি কর্ত্তা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির খণ্ডপ্রলয়কালে প্রাণের লয় হয় না। কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই প্রাণের পরব্রহ্মে লীন হওয়ার কথা আছে। যেখানে শ্রুতিতে প্রাণসৃষ্টির কথা নাই, সেখানে সৃষ্টির মূল কারণ এই হিরণ্যগর্ভনামধারী প্রাণকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥৪॥

বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়) তৎপূর্ব্বকত্বাৎ (ব্রহ্মকারণকত্ব হেতু) অর্থাৎ এই বাক্-পদ প্রাণ-মনঃ-সংযুক্ত। ব্রহ্ম এই তিনেরই মূল, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত আছে। অতএব বাক্যের ও মনের ন্যায় প্রাণেরও জন্ম মুখ্য বলিতে হইবে। অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "তত্তেজোঽসৃজত"—এই প্রস্তাবে প্রাণের উৎপত্তির কথা নাই; তেজঃ, জল ও পৃথিবী উৎপত্তির কথা আছে। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তেজঃ, তাহা হইতে বাক্যোৎপত্তির কথা কিন্তু ছান্দোগ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যের ঐ প্রকরণেই বলা হইয়াছে—"আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্"—অতএব প্রাণও ব্রহ্ম-প্রভব, ইহা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয় না।

সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাৎ চ ॥৫॥

গতেঃ (শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়) সপ্তবিশেষিতত্বাৎ চ (সাতটী প্রাণ বিশেষভাবে কথিত থাকা হেতু)।

প্রাণ উৎপদ্যমান পদার্থ। তাহার সংখ্যা সম্বন্ধেও বিশেষ বর্ণনা শ্রুতিতে আছে। প্রাণের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উক্ত হইয়াছে। কোনও শ্রুতি বলেন—প্রাণ সাতটী। কোনও শ্রুতির মতে "অষ্টগ্রহাঃ" অর্থাৎ প্রাণ সাতটী, কিন্তু একটী অতিগ্রহ লইয়া ইহা আটটী। অন্য শ্রুতি বলেন—উত্তমাঙ্গস্থিত প্রাণ সাতটী, তন্নিম্নস্থ প্রাণ দুইটী। কোনও কোনও শ্রুতিতে প্রাণ-সংখ্যা দশটীও বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতে আবার দশটী প্রাণ এবং আত্মাকে লইয়া প্রাণের সংখ্যা একাদশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোনও কোনও শ্রুতিতে দ্বাদশ প্রাণেরও কথা আছে। প্রাণের সংখ্যা লইয়া এইরূপ শ্রুতিবিরোধের নিরাকরণ প্রয়োজনীয়। ব্যাসদেবের তাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অবতারণা।

মুখ্য প্রাণের কথা পরে বলা হইবে। এক্ষণে প্রাণের সংখ্যা কতগুলি, তাহাই নিরাকরণ করা হউক। শ্রুতিতে যখন প্রাণ-সংখ্যা লইয়া এত মত-বিরোধ, তখন প্রাণের সংখ্যা সাতটী ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? সূত্রকার ইহার সিদ্ধান্তের জন্য অতঃপর বলিতেছেন—

হস্তদয়াস্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥৬॥

তু (কিন্তু) হস্তাদয়ঃ (হস্তাদি প্রাণ) স্থিতে (অবধারিত হওয়ায়) অতঃ (অতঃপর) ন এবম্ (প্রাণ উক্তরূপ সপ্ত বলা যায় না)।

শ্রুতিতে হস্তাদিকেও প্রাণ বলা হইয়াছে। যে শ্রুতি সপ্ত প্রাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চক্ষুঃ, কর্ণ ও

নাসিকার দুই দুই করিয়া ছয়টী ছিদ্র ও রসনা, এই সাতটী ইন্দ্রিয়কেই প্রাণসংখ্যারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে প্রাণের সাতটী বিশেষ বিশেষ স্থানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষদে সাতের অধিক প্রাণ-সংখ্যা নির্ণীত হওয়ায়, উপরোক্ত সপ্ত ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির কথাই বলা হইয়াছে। যেমন পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও একটী মন লইয়া এগারটী প্রাণ-সংখ্যা হইলেও, উহারা একই প্রাণের বৃত্তিভেদ মাত্র। তদ্রূপ সাতটী উত্তমাঙ্গস্থিত প্রাণের বৃত্তি-সংখ্যাধিক্য হইলে, তাহা দোষের হয় না। একই বুদ্ধি; কিন্তু মন, চিত্ত ও অহংকার লইয়া বুদ্ধির সংখ্যা চার বলিলে দোষ হয় না। অষ্ট প্রাণ, নব প্রাণ প্রভৃতি প্রাণ-সংখ্যার উদাহরণ যতই হউক, উহা সপ্ত সংখ্যক প্রাণেরই প্রাণবৃত্তির সংখ্যা বলিতে হইবে। প্রাণ-সংখ্যা অধিক হইলে, তাহার মধ্যে অল্প সংখ্যক প্রাণ বাদ পড়ে না। ন্যায় শাস্ত্রে আছে "হীনাদিকসংখ্যা বিপ্রতিপত্তৌহ্যধিকা সংখ্যা সংগ্রাহ্যা ভবতি" অর্থাৎ যেখানে ন্যূনাধিক সংখ্যার বিরোধ, সেখানে অধিক সংখ্যাই গ্রহণ করিতে হয়। তাহার কারণ—অধিকের মধ্যেই অল্পের অন্তর্ভাব হইতে পারে, কিন্তু অল্পের মধ্যে অধিকের অন্তর্ভাব হয় না। যদি প্রাণের সপ্ত সংখ্যার অতিরিক্ত একাদশ সংখ্যাও শ্রুতিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সপ্ত সংখ্যা অধিক সংখ্যার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে; কিন্তু প্রাণ সপ্ত সংখ্যা বলিয়া ধরিলে একাদশ প্রাণ-সংখ্যা উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে না। শ্রুতি যখন বলিতেছেন "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" অর্থাৎ পুরুষের দশ প্রাণ ও আত্মা লইয়া একাদশ, তখন আত্মা শব্দে অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার; আর পাঁচটী জ্ঞান ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ লইয়া একাদশ সংখ্যক প্রাণই গ্রহণীয়।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ প্রাণের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বাক্যানুসারে প্রাণ-সংখ্যার আধিক্য স্বীকার করিলে, অল্প সংখ্যা একাদশ ও তাহার অন্তর্গত হইতে পারে। তবে কি হেতু প্রাণসংখ্যা একাদশ সংখ্যা মাত্র স্বীকার করা যায়? তদুত্তরে বলা যায়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ ও সম্ভোগ—জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়া এই দশটী ইন্দ্রিয় এবং এক অন্তঃকরণ, এতদতিরিক্ত কার্য্য-কূট না থাকায়, একাদশ প্রাণের অধিক দ্বাদশ প্রাণ কিরূপে স্বীকার করা যায়? অন্তঃকরণ এক, বৃত্তি অনেক হইতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন "এতৎ সর্ব্বম্ মনঃ এব" অর্থাৎ এই সবই মনই। এই হেতু মনের বৃত্তিসংখ্যা না ধরিয়া সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞাতা একই অন্তঃকরণকে স্বীকার করিতে হইবে। দুই শোত্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, এমন কি নাভিকেও ছিদ্র ধরিয়া তাহাকে দশ প্রাণ বলিয়াও শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্য-কূটের সংখ্যা যখন একাদশ, তখন প্রাণ-সংখ্যা একাদশ বলিয়াই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"সপ্তবৈ শীর্ষণ্যা প্রাণাঃ" অর্থাৎ শীর্ষদেশস্থ সাত প্রাণ আরও আছে; "গুহাশয়াঃ নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত"—গুহাবস্থিত হৃদয়শায়ী সাত সাত প্রাণ এই সকল শ্রুতিবাক্যের সহিত একাদশ সংখ্যক প্রাণস্বীকারে শ্রুতিবিরোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীর্ষদেশস্থ সপ্ত প্রাণ নিখিল প্রাণের অভিধায়ক, এ কথা বলা যাইতে পারে। হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ এইগুলি ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে গণ্য হইলে, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত প্রাণ ক্ষুণ্ণ হওয়ার হেতু নাই। শ্রুতির সপ্ত প্রাণই নামতঃ ও কার্য্যতঃ একাদশ প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব প্রাণের সংখ্যা একাদশ বলিলে, শ্রুতির সপ্ত প্রাণের সংখ্যার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, "অধিকের মধ্যে অল্পের অন্তর্ভাব হয়, অল্পের মধ্যে অধিকের অন্তর্ভাব হয় না" এই ন্যায়ানুসারে প্রাণের সপ্ত সংখ্যা একাদশ সংখ্যায় যখন গ্রাহ্য হইতেছে, তখন প্রাণ-সংখ্যা একাদশ বলিয়া স্বীকার করাই স্থির হইল।

অণবঃ চ ॥৭॥

প্রাণসকল সূক্ষ্ম।

প্রাণের সংখ্যানিরূপণের পর ইহার স্বভাব নিরূপিত হইতেছে। প্রাণকে অণু বলিয়া জানিবে। অণু শব্দের অর্থ কি? যাহা সূক্ষ্ম, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই অণু। প্রাণ যদি সূক্ষ্ম না হইত, তাহা হইলে মৃত্যুকালে প্রাণ-নির্গমন ব্যাপার লোকদৃষ্টির গোচর হইত। আর প্রাণ যদি পরিচ্ছিন্ন না হইয়া সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে

প্রাণের উৎক্রমণাদি ব্যাপার অসিদ্ধ হইত। অতএব প্রাণ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন। এইবার মুখ্য প্রাণের কথা।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥৮॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিয়াছেন "শ্রেষ্ঠো মুখ্যঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ।

এই মুখ্য প্রাণ যিনি শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, তিনি কি পূর্ব্বোক্ত প্রাণসকলের ন্যায় উৎপদ্যমান? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বুঝিয়াই ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রটীর অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে প্রাণের উদয় নাই, অস্ত নাই। এই মুখ্য প্রাণ জন্ম ও মরণের মধ্যে অবস্থান করেন। বায়ু পুরাণে আছে—যাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগে জন্মমৃত্যু ঘটে, সেই প্রাণের উৎপত্তি ও মরণ কিরূপে সম্ভব হইবে? মুখ্য প্রাণ যে অনুৎপন্ন, ইহাই এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়। মুখ্য প্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় ব্রহ্মবিকারী, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই অতিদেশ সূত্রটী রচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে প্রাণের উৎপত্তিবিষয়ক শ্রুতি-প্রমাণ দেওয়ার পরও এই অতিদেশ সূত্রের পুনঃ প্রয়োজন কি হেতু হইল? যাহারা নাসদাসীয় ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ অসৎ ছিল না, পরন্তু ব্রহ্মই ছিল, এইরূপ ব্রহ্মবাদপ্রধান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রচিত সূক্তের মন্ত্রে প্রত্যয়বান্, যথা—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতম্ ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস"—প্রলয়কালে মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, রাত্রি ও দিবার চিহ্ন ছিল না। স্বধা ছিল না, ব্রহ্ম মায়াযুক্ত ছিলেন না, বাতবর্জ্জিত-প্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্ম ব্যতীত তখন আর কিছুই ছিল না। এই যে শ্রুত্যুক্ত আনীৎ শব্দ, তাহার অর্থ প্রাণ-প্রচেষ্টা। এই প্রাণবোধক শব্দ থাকায়, প্রাণ অজ নিত্য বলিয়া প্রথিত হইতে পারে। সিদ্ধান্ত পক্ষে বলা হইতেছে এই যে, আনীৎ শব্দের সহিত অবাত শব্দ আছে। ঐ অবাত শব্দ প্রাণপ্রচেষ্টাকে বিশেষিত করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই আনীৎ শব্দ কারণ মাত্রের অস্তিত্ববোধক। অতএব প্রাণ এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাণের অনুৎপন্নতা এই মন্ত্রে প্রমাণিত হয় না। প্রাণকে যে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ—পুরুষের শুক্রনিষেককালে প্রাণ সর্ব্বপ্রথম ধৃতি লাভ করে। শুক্রের প্রাণবৃত্তি যদি প্রথমেই উদ্বুদ্ধ না হইত, যোনিস্থ শুক্র অপত্যাকারে পরিণত হইত না। শ্রোত্রাদি প্রাণ এই মুখ্য প্রাণের বহু পরে স্ব-স্ব বৃত্তি লাভ করে। এই হেতু মুখ্য প্রাণ অবশ্যই জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য অর্থাৎ অগ্রজ। মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। দর্শন-শ্রবণাদির প্রাণ মুখ্য প্রাণকে বলিতেছে "ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুম্"—আমরা তোমা ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারি না। মুখ্য প্রাণের গুণাধিক্যই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা *

শ্রীমতিলাল দাশ

হে মহান ব্রহ্মণস্পতি মহৎ কর কীর্ত্তিদানে
কীর্ত্তি দিল যথা দেবে উষিক্ পুত্র কথীবানে।১

ধনের স্বামী, হন্তা রোগের পুষ্টি করেন বিত্ত দানি'
ত্বরায় যিনি সুফল দাতা যাচ তাহার প্রসাদখানি।২
শত্রুজনের নিন্দা হতে রক্ষা করো বৃহস্পতি
মর্ত্ত্যজনের হিংসা যেন পায় না ছুঁতে মোদের মতি।৩
পায়না বিনাশ সে জন কভু, বাড়ান যারে বৃহস্পতি,
ইন্দ্র সোমে রক্ষা করেন, বীর সে লভে অমর গতি।৪
রক্ষা করেন পাপের হাতে অর্চ্চে যেবা বৃহস্পতি।
ইন্দ্র সোম ও দক্ষিণা দেয় আজ যে তারে সাধুমতি।৫
ইন্দ্র সখা কমনীয় হে অতুলন সদনপতি
দিব্য দাতা অর্চ্চি তোমা দেহ মোদের মেধা অতি।৬
প্রাজ্ঞ জনের যজ্ঞ বিফল, যে দেবতার প্রসাদ বিনা
ব্যাপ্ত করেন মোদের যত মানস কর্ম্ম, বুদ্ধি-লীনা।৭
বৃদ্ধি করেন বৃহস্পতি হবির্দাতা যজমানে,
সিদ্ধ করেন যজ্ঞ যত বহেন হবি স্বর্গ পানে।৮
দেখেছি সে নরাশংস অজেয় বীর ভুবন পরে,
দ্যুলোক সম তেজস্বী যে খ্যাতি যাহার ঘরে ঘরে।৯

* ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল অষ্টাদশ সূক্তের কাব্যানুবাদ: লেখকের যন্ত্রস্থ ঋগ্বেদ গ্রন্থ হইতে।

তন্ত্রের সার কথা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন যে, কলিযুগে তন্ত্রই মহৎ পথ—তন্ত্রসাধনা দ্বারা মানব সহজেই তাহার চরিত্র ও অধ্যাত্মবলের বিকাশ সংসাধন করিতে পারে। দেবাদিদেব জগদ্গুরু সদাশিবের বাক্যরাশি বলিয়া যে শাস্ত্র, আগম ও বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে—তাহাই তন্ত্র নামে পরিচিত। পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব এই জগৎপাবন শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই জনশ্রুতি। তন্ত্র সকল সিদ্ধপুরুষদের জীবনেরই উপলব্ধ সত্য। প্রাচীন প্রতি শাস্ত্রই বর্ত্তমানে নূতন ভাবে দেখিবার ও প্রতি শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সকল সত্য, তত্ত্ব ও চিরন্তন বিধানরাজি নির্ণয় করিবার সময় আসিয়াছে। কোনও শাস্ত্রকেই অন্ধভাবে শুধু অনুসরণ করিলে যেমন সত্যের আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি প্রাচীন কোনও শাস্ত্রকে সেকেলে বলিয়া উপেক্ষা করিলেও এমন অনেক সত্যের সন্ধান হারাইয়া যায়, যাহা শাশ্বত ও চির নবীন। সত্যের কাছে পুরাতন ও নূতন বলিয়া কিছু নাই। সত্যের ক্রমাবিষ্কারে অনেক পুরাতন ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়, যাহা বর্জ্জনীয়—কিন্তু অনেক তথ্য ও তত্ত্ব কালের কঠিন পরীক্ষায় চির স্থিররূপে দাঁড়াইয়া আছে ও থাকিবে।

তন্ত্রের অনেক উপকরণ বর্ত্তমানযুগের সাধনা ও আচার-ব্যবহারে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু উহাতে এমন অনেক সাধন-সত্য ও শিক্ষা আছে, যাহা বর্ত্তমান সময়ের সাধনা ও আচারের উপযোগী ক্রমবিকাশ-শীল নব সাধনায় পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া নব রূপান্তর পাইতে পারে।

তন্ত্রশাস্ত্র বহু প্রাচীন, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই ইহার প্রচলন আছে—ইহা নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ক্রমবিকশিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে মহানির্ব্বাণ বা কুলার্ণব প্রভৃতি প্রামাণ্য তন্ত্রের রূপ পাইয়াছে—বর্ত্তমানেও আমরা তন্ত্রের নব রূপ দেখিতে পাই।

তন্ত্রের সাধনায় নানা ভাব ও নানা আচার বিদ্যমান। ইহার কোনও না কোনও ভাবের অনুসরণ প্রায় সকল যুগের সকল শক্তিধর মহাপুরুষই করিয়া গিয়াছেন। শক্তিকে বাদ দিয়া সাধনা হয় না। তন্ত্র যেহেতু শক্তিমার্গ, সেহেতু একথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব প্রাগ্‌বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, বৌদ্ধশাস্ত্র, তান্ত্রিক, এমন কি বৈষ্ণব যুগেও স্বীকৃত হইয়াছে। তান্ত্রিক আচার্য্যগণ প্রাগৈতিহাসিক কুলপতিদের হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ঋষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অবতার শ্রীরামচন্দ্র, মহাভারতের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, এমন কি শ্রীচৈতন্যকেও শক্তির উপাসক ও গুপ্ত-তান্ত্রিক বলিয়া সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তি-সাধনার দিব্য-অবতার ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ভাগবত রূপান্তর তন্ত্রের দিব্যভাবের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, আরব, খৃষ্টীয় রোম্যান ক্যাথলিক জগৎ ও ভারতের সমগ্র ইতিহাসে তন্ত্র সাধনার বিভিন্ন রূপ ও রূপান্তরের ক্রমবিকাশ আমরা দেখিয়া থাকি। সুতরাং তন্ত্র মানে শুধু তথাকথিত চৌষট্টি তন্ত্রশাস্ত্র নহে—শক্তি সাধনার সর্ব্বপ্রকার অভিব্যক্তিকেই আমরা তন্ত্র নামে অভিহিত করিতে পারি। 'তন্' ধাতুর অর্থ হইতেছে বিস্তার। জ্ঞানের বিস্তার বা জ্ঞানের শক্তিপূর্ণ বিকাশ যে উপায়ে হয়, তাহাই তন্ত্র ও এই ব্যাপক অর্থেই তন্ত্রের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই ভাবে তন্ত্র বেদ-বিরোধী তো নয়ই, ইহা বেদবিজ্ঞানকেই বিস্তার করে বলিয়া "তন্ত্র" (যাহা তনিত বা বিস্তৃত হয় ও ত্রাণ করে) সার্থকনামা।

দার্শনিকতার দিক্ দিয়া প্রাচীন সকল তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হইয়াছে কাশ্মীর দেশে। তথায় অভিনাভ গুপ্ত নামক জনৈক কৌল-শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক দর্শনের যে সূত্র ও বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। মালিনী-বিজয়, তন্ত্রালোক প্রভৃতি গ্রন্থ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অভিনাভ গুপ্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন। শঙ্করের প্রচারিত মায়াবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই, তিনি শৈবদর্শন অনুসরণ করিয়া পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। শৈব-শাক্ত-দর্শনের ক্রম অনেকটা সাংখ্য-দর্শনের অনুরূপ, কিন্তু উহা সাংখ্য-তত্ত্বেরও উর্দ্ধের অনেক সত্যের সন্ধান দেয়। সাংখ্য প্রকৃতির চরম অবস্থাকে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলিয়া ঘোষণা করে। তন্ত্র কিন্তু প্রকৃতিকে এইখানেই শেষ করেন নাই, তন্ত্র সাংখ্যের প্রতিপাদ্য অবিদ্যাময়ী প্রকৃতির উর্দ্ধে ত্রিগুণের উপরে অপর এক পরাপ্রকৃতির বিশাল বিসার খুলিয়া ধরিয়াছেন।

পুরুষ সম্বন্ধেও তন্ত্রের জ্ঞান সুদূর-প্রসারিত—সাংখ্য পুরুষকে প্রকৃতির দ্রষ্টারূপে দাঁড় করাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু তান্ত্রিক পুরুষ সাংখ্যের পুরুষের (জীব) স্তর অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মেরও উপরে ঈশ্বর, সদাশিব (বিজ্ঞানময় Supermental) ও সর্ব্বশীর্ষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমশিব বা পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছেন। তান্ত্রিক শিব বা পরম পুরুষ একদিকে ত্রিকালাতীত পরব্রহ্ম হইলেও, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বভোক্তৃত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তাগুণে সদাই পূর্ণ। এই শিবের সহিত পরাপ্রকৃতি বা শক্তি তন্ত্রমতে সর্ব্বদাই একীভূতা। এই শক্তি সাংখ্যের গুণময়ী প্রকৃতির উপরে ঈশ্বর, সদাশিব ও পরম শিবের সহিত সম্মিলিতা ও আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি ও চিৎশক্তিরূপিনী সচ্চিদানন্দময়ী। শক্তির এই উর্দ্ধ প্রসারিত স্তরে শক্তির খেলাও জ্ঞানময়—সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত ও সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশস্বরূপ। তুরীয়াতীত কলাতীত অবস্থায়ও যেরূপ, সচলা বা লীলাকালেও সেরূপই ইহা পরিপূর্ণ। এই পরম শিব ও পরাশক্তি গীতার পুরুষোত্তম ও পরা-প্রকৃতির নামান্তর মাত্র। পরম পুরুষ ও পরাশক্তি অভিন্নরূপে সৃষ্টির অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির উর্দ্ধতম শিখরে নামিয়া আসিয়াছে—মায়া ও অবিদ্যার অনেক উর্দ্ধে।

পুরুষ-প্রকৃতির অজ্ঞানের খেলা আরম্ভ হইয়াছে যে প্রপঞ্চে, তাহাই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য। ইহা শক্তির নিম্নতর প্রকাশ; কিন্তু প্রকৃত শক্তির নিজস্ব রূপ তাহা নহে। শক্তির স্বাভাবিক রূপ রহিয়াছে উর্দ্ধের পরম লোক সকলে এবং ইহাই তন্ত্রের প্রতিপাদ্য শক্তিতত্ত্ব।

শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্বকে তাঁহার তত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন তন্ত্রেও শাক্ত-বৈষ্ণব উভয় তত্ত্বেরই সমন্বয় রহিয়াছে। প্রাচীন তন্ত্রকারগণ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, তাঁহারা জগৎকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মের আপাত অশুদ্ধ ক্রম-পরিণাম রূপে স্বীকার করিয়াছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকৃতিকে মহাপ্রকৃতির অবিদ্যাজনিত বিকৃতি বলিয়া দেখিয়াছেন। এই বিকৃতি মিথ্যা নহে, তবে এই বিকারকে অতিক্রম করা চলে—মহাপ্রকৃতির সহায়ে। আবার তন্ত্রের দিব্য পরিণতিতে এই বিকৃতিকে বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে রূপান্তরিতও করা যাইতে পারে, সেই মহাশক্তিরই সহায়ে। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের নব দিব্যতন্ত্র।

সৃষ্টি মাত্রেই যে ভ্রান্তির পরিণাম, একথা অসত্য—শ্রীঅরবিন্দের দিব্যতন্ত্রমতে বিজ্ঞান বা Supermindএর সহায়ে পরম সত্য মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিয়া মর জগতে অমৃতের ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং সৃষ্টির নিগূঢ় উদ্দেশ্যই তাই। ইহাই তন্ত্রের চরম বিকাশ ও সার কথা।

এক্ষেত্রে তান্ত্রিক একটি তালিকা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে, যথা:—
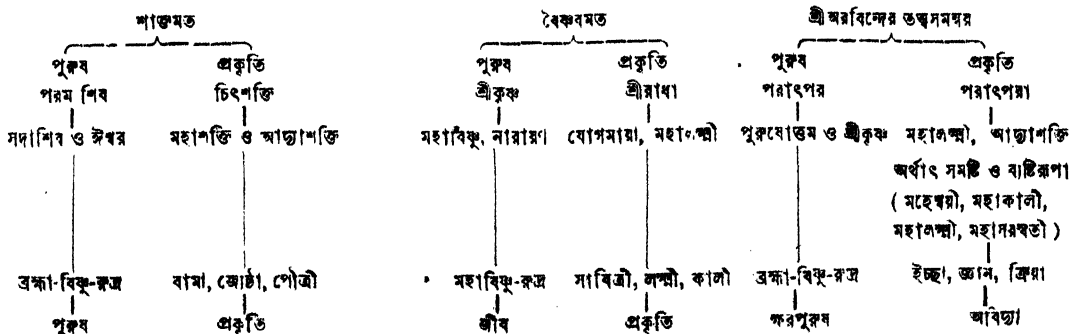
সত্যযুগ

শ্রীশুভদর্শন দত্ত

১

প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ। বৃক্ষ নিম্নে মৃগচর্মাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘ-দেহ, তেজঃপুঞ্জকলেবর এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধের মস্তকে শুভ্র কেশজাল, আবক্ষলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু। পরিধানে বল্কল, সুগৌর দেহ, প্রবীণ বয়স এবং মুখজ্যোতিঃ গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। পার্শ্বে গৈরিক বসনপরিহিত, পাঠরত একটী বালক এবং একটী বালিকা। দেহে, বর্ণে বৃদ্ধেরই অনুরূপ। বোধহয় তাঁহারই পুত্র-কন্যা।

বৃদ্ধ ভূর্জ্জপত্রে কি লিখিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকবালিকাকে পাঠের তাগিদ দিতেছিলেন, পড় বাবা—'সহনে র্ঘঃ।' বল মা—'তৃণানি ভূমিরুদকং বাকচতুর্থী চ সুনৃতা, এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।'

বালক-বালিকার পাঠে তেমন মন ছিল না। দূরে কি একটা ক্ষুদ্র জন্তু না কি যেন নড়াচড়া করিতেছে দেখিয়া উভয়েই একসঙ্গে বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—"ওটা কি বাবা! কি জানোয়ার?" বালক বলিল—'এটাই কি বাবা, বৃহল্লাঙ্গুল, সেই যে হিতোপদেশে—'

বালিকা বলিল—'না, না, তা' কেন হবে—তা' হলে ত মস্ত লেজ থাকত! ও নিশ্চয়ই হনুমান—নয় বাবা, সেই যে রামায়ণে—সেই সীতা উদ্ধার—'

বৃদ্ধ বালক-বালিকার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। চশমাখানি একটু পরিষ্কার করিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। সত্যই ত, কি যেন একটা জন্তু তাঁহার দিকে আসিতেছে। বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, এ তো জন্তু নয়, কোটপ্যাণ্টপরিহিত, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি একটা মানুষ। এরূপ পোষাক বালকবালিকা কখনও দেখে নাই বলিয়াই তাহারা এইরূপ ভুল বুঝিয়াছে। বৃদ্ধও যে দেখিয়াছেন তাহা নয়, তবে যোগবলে তিনি ত্রিকালদর্শী।

মনুষ্য ইতিমধ্যে আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"স্বাগতম্—আসুন, আসুন, অতিথি নারায়ণ। মা, গায়ত্রী, যাওত মা, এক কমণ্ডলু জল নিয়ে এস ত। বাবা সত্যবাক্, তুমি একটা কুশাসন নিয়ে এস।"

বালকবালিকা তৎক্ষণাৎ আদেশপালনে অগ্রসর হইল। তখনও কিন্তু তাহাদের সমস্যার কিছুই মীমাংসা হয় নাই। যাইতে যাইতে সত্যবাক্ বলিল—'হনুমানের বুঝি লেজ ছিল না—' গায়ত্রী বলিল—'থাকলেও বুড়ো হয়ে হয়ত খসে গিয়েছে। বয়স দেখছ না, ওঁরা যে চার-যুগে অমর। দেখলে না বাবার আদর-যত্ন—ও নিশ্চয়ই—' কথা শেষ না করিয়াই গায়ত্রী উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হইল। বৃদ্ধ যুক্তকরে বলিলেন—"অত্রাধিষ্ঠানম্ কুরু।"

মনুষ্য কপালে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল—অথবা সেলাম ঠুকিল এবং বৃদ্ধের দেওয়া আসন

নইলে উনি গাছের ডালে বসিবেন কেন?

গ্রহণ না করিয়া নিকটস্থ একটী ভগ্ন বৃক্ষ কাণ্ডে উপবেশন করিল। গায়ত্রী দাদার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। অর্থাৎ আমার কথাই ঠিক কিনা বোঝ। নইলে উনি গাছের ডালে বসিবেন কেন? অভ্যাস—।

বৃদ্ধ বলিলেন—"কস্ত্বম্। কুতঃ সমায়াতঃ, আপনি কে —কোথা হতে আসছেন—কি প্রয়োজন?"

মনুষ্য বলিল—"দেখুন, আমাকে আপনি সন্তান বলে' গ্রহণ করলে বড়ই আনন্দিত হই। বয়সের কথা বলতে পারি না, তবে আকারে আপনি আমার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ অপেক্ষাও বড়, একথা বল্‌লে বোধ হয় আপনার অসম্মান করা হবে না। 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললেই আমার যোগ্যের অতিরিক্ত সম্ভাষণ আমাকে করা হবে।"

"বেশ বাবা বেশ, অতি বিনয়ী তুমি, তবে ভাষাটা একটু প্রাকৃত। তা' হোক্। কি নাম বাবা তোমার?"

"অধমের নাম আর, এম, বসু।"

গায়ত্রী জিজ্ঞাসুনেত্রে কহিল—"হ্যাঁ বাবা, অষ্ট বসুর এক বসু নাকি!"

"না মা, ও মানুষের একটী পদবী।"

সত্যবাক্ বলিল—"হ্যাঁ বাবা, নামের আগে শ্রী বলেন না কেন?"

পিতা বলিলেন—"তখন মানুষ শ্রীহীন ছিল—যাও বাবা, তোমরা একটু খেলা করতে যাও।"

বালকবালিকার মন উত্তরোত্তর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের বহুদর্শী পিতার নিকট আরও অনেক প্রশ্ন করিবার ছিল। কিন্তু তাহা শিষ্টাচার-সম্মত নহে বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য ছাড়িয়া খেলিতে যাইতে তাহাদের মন সরিল না।

২

বসু মহাশয় বড়ই বিপন্ন এবং বিস্মিতচিত্তে বৃদ্ধের নিকট আসিয়াছেন। একদা এইখানেই তাঁহার বাড়ী ছিল। মহাত্মা হেন্‌রী সাহেবের নিকট হিন্দুযোগ শিক্ষা করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হন। অদ্য হঠাৎ তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি তাঁহার বাড়ী ঘর, আত্মীয়স্বজন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে যে একটী বৃহৎ সহর ছিল, একশত পাড়া ছিল, অগণিত গৃহ, দেবালয়, মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জা, সিনেমা, থিয়েটার, কত বড় বড় পুষ্করিণী, কত স্কুল কলেজ ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র তিনি দেখিতে পাইতেছেন না; ঐ যে অদূরে একটী পাষাণস্তূপের অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে, উহার উচ্চতা তখন প্রায় ৫০০ হাত ছিল। উহা তাঁহার বড়ই পরিচিত। কত বার তিনি তাঁহার সঙ্গীগণসহ উহার উপরে উঠিয়া এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছেন। উহার ঐ ভগ্নাংশটুকুই তাঁহার অবস্থানের একমাত্র স্মারক। উহা না থাকিলে তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না যে, এককালে তিনি এই স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন।

বৃদ্ধ মনোযোগ সহকারে তাঁহার সকল কথাই শুনিলেন। একটু কৌতূহলও হইল। বালক-বালিকার মুখে বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত বৃদ্ধ বলিলেন, "কুম্ভকযোগে এরূপ হওয়া সম্ভব। যোগবাশিষ্ঠে এর প্রমাণ আছে। স্থানট তোমার স্মরণে আসে কি বাবা!"

"আজ্ঞা হ্যাঁ—এ স্থানের নাম 'শতদলপুর'। বলিয়াই বসু মহাশয় তাঁহার পকেট হইতে একটী জমাট-বাঁধা ছোট ডায়েরী পুস্তক বাহির করিলেন। তাহার মলাটে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—'রমণীমোহন বসু, সাং শতদলপুর।' লেখাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট।

বৃদ্ধ পুনরায় চসমা মুছিলেন, বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ নামই মনে হয় বটে। অক্ষরগুলার রূপ অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ এ-সব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়াই বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেন, অন্য কেহ হইলে পারিত না। খাতাখানি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া আগন্তুককে ফেরৎ দিয়া বলিলেন—"শতদলপুর—বর্ত্তমানে এ স্থানের নাম 'সৎপূর্ণপুরিকা'—তা' তোমাদের শতদলের 'দল'গুলি কালস্রোতে ভেসে গিয়েছে, তার স্থানে কালক্রমে 'পর্ণ' গজিয়ে উঠেছে, এ আর এমন কিছু বিচিত্র নয়। আর কোন নিদর্শন আছে কি তোমার বাবা, কোন শিলালিপি বা তাম্রলিপি বা পুস্তক বা আর কিছু—"

"ছিল ত অনেক কিছুই, তবে কালের কুটিল চক্রে সবই দেখছি পিষে মিশে গিয়েছে": বসু মহাশয়ের স্বরে বিষাদের রেশ ছিল, বুঝি বা ইতিমধ্যে অনেক কথাই

তাঁহার স্মৃতিকে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে: "না, শিলা-লিপি-টিপি কিছু ছিল না। তবে বই অনেকগুলোই ছিল। এখন ত দেখছি সবই উইঢিপি, তার মধ্যে এই একখানা কেমন করে টিকে গিয়েছে জানি না—" এই বলিয়াই বসু মহাশয় তাঁহার পকেট হইতে একখানি বহি বাহির করিলেন।

নামে মাত্র বহি। জমাট-বাঁধান একটী বহির আকার মাত্র। উইয়ের কল্যাণে বোধহয় পূর্ব্বে তাহাতে রসের সঞ্চার হইয়া সরস হইয়াছিল, এখন তাহা শুখাইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন থাকিলে হয়ত বা পাথর হইয়া যাইত।

বৃদ্ধ পুনরায় চসমা পরিষ্কার করিয়া অতিশয় মনোযোগ সহকারে বইখানি পরীক্ষা করিলেন। জলে অল্প ভিজাইয়া বাঁশের চিয়াড়ী দ্বারা অতি কষ্টে অতি যত্নে বহির উপরের পাতাখানি খুলিলেন। 'ম' 'ঘ' 'দ' 'ধ' 'ব্য' এই কয়টী অক্ষর ছাড়া-ছাড়া ভাবে পড়িতে সমর্থ হইলেন। উল্লাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটী কি বহি বাবা?"

উত্তর হইল—"মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।"

মধুসূদন দত্তের নাম বৃদ্ধের জানা ছিল। তিনি নাকি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিয়া অমর হইয়াছেন। তাই এ যুগের তালিকাতেও তাঁহার নাম উঠিয়াছে। কবির সহিত তাঁহার বইখানিও প্রায় অমরত্বে উপনীত হইয়াছে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বইখানি এখনও নষ্ট না হইবার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে বৈকি! বৃদ্ধ বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। বিশেষতঃ মাইকেলের আবির্ভাব-তিরোভাবের সময় সম্বন্ধে তাঁহার বড়ই কৌতূহল ছিল। এই বইখানি তাঁহার অনেক কাজে আসিবে।

বহিখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বৃদ্ধ বলিলেন—"স্থান সম্বন্ধে অনেকটা আভাষ পাওয়া গেল, কাল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে কি বাবা!"

বসু মহাশয় অনেকক্ষণ কি সব চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন—"যে বৎসর এই বহিখানি আমি ক্রয় করি, তার পরের বৎসরে আমি প্রাণায়ামসিদ্ধ হই, একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এই বহিখানি সন ১৩৪৪ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। এই দেখুন"—বলিয়াই বসু মহাশয় বহিস্থিত কয়েকটী অক্ষরের প্রতি বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

সত্যই দেখা গেল—বহির নাম ও প্রণেতার নামের নীচে লেখা আছে—

চত্বারিংশ সংস্করণ
বসুমতী সাহিত্য মন্দির
সন ১৩৪৪ সাল,
ক লি কা তা।

বলা বাহুল্য, অক্ষরগুলি সমস্তই অস্পষ্ট ছিল। তবে বসু মহাশয়ের সহায়তায় বৃদ্ধের পড়িতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

বৃদ্ধ উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি কলিকালের লোক, এতক্ষণ এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে সংশয়াকারে দেখা দিয়েছিল, তোমার ঐ 'কলিকাতা' কথাটাই আমার সব গোল মিটিয়ে দিয়েছে। ঠিক ঠিক—" কথাগুলি বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

"আজ্ঞে, ও ত একটী সহর। আমাদের রাজধানী—।"

"তা' হলেই হলরে বাপু, কলিই হচ্ছেন কলিকালের রাজা। আর তাঁর রাজধানী—ওই একই কথা। কল্কি পুরাণেও তাই লেখে।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ খান-কয়েক পাঁজি-পুঁথি আনাইয়া গণনা করিতে বসিলেন।"

"এই দেখ—এখন আর সন-সালের চলন নাই। এখন চলছে ব্রহ্মাব্দ। এটা সত্যযুগ কিনা?—শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মনুর অধীনে ঊনবিংশ মহাযুগের সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। গত অষ্টাবিংশ মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগে তোমার জন্ম। তারপর একটা যুগই পার হয়ে গিয়েছে বাবা।"

"একটা যুগ—তা'হলে প্রায় বার বৎসর আমি সমাধিস্থ ছিলাম বলুন! তা' হতেও পারে বা!"

"না, না, তা' কেন। গণনায় দেখা যায়, তোমার জন্মের পর, ৪ লক্ষ ২১ হাজার বৎসরেরও অধিক অতীত হয়ে গিয়েছে।"

বসু মহাশয় ত অবাক্—বৃদ্ধ বলেন কি?—বসু মহাশয়ের সকল কথাই এই সে দিনের বলে' মনে হচ্ছে—

এ সব কি কুস্তকের প্রভাব—হবে ও বা! তবে বয়সের কথা শুনিয়া তিনি বেশ একটু গর্ব্বিত হইয়াছেন। বাল্যকালে গুরুজনগণ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—শতায়ুঃ হও। বয়সের একটা মাপকাঠি তাঁহাদের ছিল। এর অধিক অগ্রসর হইতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় নাই; তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদ যে চক্রবৃদ্ধিহারে, পুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জীভূত হইয়া, তাঁহাকে চার চারটে লক্ষায়ুর পারে পৌছাইয়া দিয়াছে, এ কি কম গৌরবের কথা!

৩

বসু মহাশয় নিজের অতীত চিন্তায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। বুঝিবা পুনরায় সমাধিস্থ হইয়াছেন। সত্যই ত, ব্যাপারটা কি? বসু মহাশয়ের অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করা ছিল। তিনি জানেন মৃত্যুর পর আত্মার গতির দেবযান ও পিতৃযান নামক দুইটা মাত্র পথ আছে। তা' ছাড়া তৃতীয় পথের সন্ধান ত তাঁহার জানা নাই। আর ও-সব পথে যাইতে মাত্র সূক্ষ্ম শরীরেরই অধিকার আছে। স্থূল শরীরের সেখানে কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। বসু মহাশয় তাঁহার শরীরের নানা স্থান বেশ করিয়া টিপিয়া, চিমটি কাটিয়া দেখিলেন—তাহাতে স্থূল শরীরের সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। তবে এসব কি? নেশা নয় ত? কিন্তু বসু মহাশয় ত কখনও কোন নেশার সেবা করেন নাই। তবে? এই কি পরলোক না নির্ব্বিকল্প সমাধি! একি স্বপ্ন না আর কিছু! বসু মহাশয় জীবিত না মৃত!

সত্যবাক্ বলিল—"বাবা, অতিথিসৎকারের সময় হইয়াছে।"

কথাটা বসু মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"সৎকার—কেন—আমি ত এখনও মরিনি।" বৃদ্ধ বলিলেন—"মাভৈঃ! সৎকার মানে পরিচর্য্যা।" বসু মহাশয় অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। কথাটা তাঁহারও শোনা আছে বটে, মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনাবশতঃ বিপরীত অর্থই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে গায়ত্রী বসু মহাশয়ের সেবার জন্য একরাশ ফলমূল আনিয়া উপস্থিত করিল।

বৃদ্ধ বিনীতভাবে বলিলেন—"অতিথিসৎকারের সামান্য আয়োজন। একটু জলযোগ করুন।"

ফলমূল যথেষ্টই ছিল, তবে বসু মহাশয়েরও ৪ লক্ষ বৎসরের ক্ষুধা সঞ্চিত ছিল। তিনি তাহার প্রায় সব-গুলিরই সদ্ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধকে অনুগৃহীত করিলেন।

আহারান্তে উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বৃদ্ধের সংসারের কথা, বসু মহাশয়ের সংসারের কথা, শিক্ষা-দীক্ষার কথা, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কথা, কত কি কথাই হইল।

পিতার সহিত এই নূতন প্রাণীটীর এত ভাব হওয়া গায়ত্রীর বেশ পছন্দ হইতেছিল না। ইহার সহিত একটু খেলা করিতে গায়ত্রীর বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল। পিতার কাণে কাণে গায়ত্রী বলিল—"বাবা, ইহাকে যেন ছাড়িয়া দিবেন না।"

বসু মহাশয় বলিলেন—"এটি বুঝি আপনার কন্যা। বিবাহ দিয়েছেন কি? বয়স ত হয়েছে বলে' মনে হয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"কত আর হবে, সবে সাত বছরে পড়েছে। অষ্টমে গৌরী দান করব ভেবেছি।"

"ও বাল্যবিবাহ! তা' সার্দ্দা আইন—এখন বুঝি ও সব বালাই নাই—তা মেয়েটি এরই মধ্যে বেশ লেখাপড়া শিখেছে দেখ্‌ছি। মেয়েদেরও বেশ ভাল ভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত—এ মতটা আমি খুবই পছন্দ করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"হাঁ, শাস্ত্রেও বলেছে—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

অতি সত্য কথা। তা মেয়েটী কোনও স্কুলে পড়তে যায় ত? আমার মনে হয় সহশিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী, আর তার মধ্যে ছেলেমেয়ের দেহ-মনের খোরাকও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যও থাকে ভাল, 'তা' ছাড়া অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষানীতি দ্বারাও অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।

"না বাবা, ও প্রথাটা আমরা একেবারেই পছন্দ করি না। মেয়েদের শিক্ষা আমাদের নিজেদেরই দেওয়া কর্ত্তব্য বলে' আমরা মনে করি। শাস্ত্র স্পষ্টই বলেছেন—'পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।' পিতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয় ভিন্ন অন্য

কাহারও হস্তে কন্যার শিক্ষার ভার সমর্পণ করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্ম।”

বসু মহাশয় বলিলেন—“কথাটা প্রণিধাণযোগ্য। দেশ, কালের সহিত মতেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখছি। আমার বেশ মনে হচ্ছে ঐ শিলাস্তূপের প্রায় ১০০ হাত দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড বিদ্যালয় ছিল। সেখানে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পাঠাভ্যাস তো করতই, উপরন্তু কত নাচ, গান, থিয়েটার পর্য্যন্ত হয়ে গেছে এবং তাতে ছেলেমেয়ে সমানভাবে যোগদান করেছে।”

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বসু মহাশয় তখনকার মত বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বসু মহাশয় বিশ্রাম করিতেছেন। গৃহ ঠিক নহে—গুহাও নয়—গর্ত্ত বলিলেই ঠিক বলা হয়। এক সময়ে তাহা গৃহ ছিল, ঠিক রাজপ্রাসাদ না হইলেও বেশ বড় ইষ্টকনির্মিত বাড়ীই ছিল, একথা বসু মহাশয়ের বেশ স্মরণেই আছে; কিন্তু উহার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম এখন মাটীর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া তাহাতেই আত্ম-গোপন করিয়াছে, মাত্র একটী সুড়ঙ্গ দ্বারা বাহিরের বাতাসের সহিত যোগসূত্র অচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। সমাধিস্থ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার গৃহও যেন সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল! গৃহ ও গৃহীর অবস্থা যেন একসূত্রে গ্রথিত।

বসু মহাশয়ের চিন্তার শেষ নাই। বায়স্কোপের ছবির মত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কত বিচিত্র চিত্র তাঁহার মানসপটে উদয় হইল, আবার মিলাইল। তাঁহার ঘর, বাড়ী, পুত্র, কন্যা, স্বজন, পরিজন, গাড়ী, ঘোড়া, হেনরী সাহেব, রেচক, পূরক, কুম্ভক, ঐ বৃদ্ধ, তাঁহার পুত্র-কন্যা এমন কি ঐ পাথরের স্তূপটা পর্য্যন্ত বাদ গেল না। সর্ব্বং মায়ামিদং অখিলং—জগতের সবই মায়া—এ সবও কি মায়া?—তবে বসু মহাশয় মানুষটাই বা কি? কোথায় তিনি ছিলেন, কি হইয়াছেন—

“উনি বোধ হয় জপে বসেছেন!”

“কিন্তু বেলা যে যায়, পরে ত আর ওঁর খাওয়া হবে না।”

সহসা বসু মহাশয়ের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—সেই বালক ও বালিকা। সঙ্গে কয়েকটী বড় বড় থালা, বাটী, গেলাস, নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বুঝিতে বাকী রহিল না ইহা সেই বৃদ্ধেরই অতিথিসৎকারের সামান্য আয়োজন। কিন্তু তৈজসপত্রগুলা কেমন যেন চক্‌চক্ করিতেছে। সোণার নাকি!

কিন্তু বেলা যে যায়, পরে ত আর ওঁর খাওয়া হবে না

আয়োজন বৃদ্ধের নিকট সামান্য বোধ হইলেও, বসু মহাশয়ের নিকট প্রচুর। তিনি যতদূর সম্ভব তাহার যোগ্য ব্যবহার করিলেন। আহারান্তে তিনি একটু বিপদে পড়িলেন—থালা-বাসন লইয়া। বাসনগুলি সোণারই বটে, বসু মহাশয় উহা ভালই চিনেন। এরূপ বহুমূল্য জিনিষগুলি একটু সাবধানে রাখার প্রয়োজন। বালক-বালিকা বহুক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি তাহার অন্ধকারের জালখানি এমনভাবে বিস্তার করিয়াছে যে, এক হাত দূরের বস্তুও আর ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বসু মহাশয় বুঝিলেন—আহারের অবকাশে, সময় তাহার অনেকটুকু অংশ অপহরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘন অন্ধকারের মধ্যে, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, বৃদ্ধের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহার পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। বাসনগুলি গর্ত্তের ভিতরে লইয়া রাখিতে পারিলে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইত।

কিন্তু সুড়ঙ্গ মুখের পরিসর অপেক্ষা থালা-বাসনগুলির আকার এত বড় যে, তাহা ভিতরে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। অগত্যা তাহা বাহিরেই অন্ধকারের আবরণের উপর নির্ভর করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হইল।

রাত্রে বসু মহাশয়ের ভাল নিদ্রা হইল না। রাজ্যের যত চোর-ডাকাতগুলা তাঁহার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া তাঁহার অন্নদাতার মূল্যবান্ জিনিষগুলি অপহরণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। চোরগুলা বিকট রবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ওরে ধনী, ওরে মূর্খ, ওরে দুষ্ট দে-দে কোথায় আর কি রত্ন লুকান আছে, যখের ধন আগুলিয়া বসিয়া আছিস্, শীঘ্র বাহির করিয়া দে, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, আর বিলম্ব সহ্য হয় না, কোথায় কি আছে শীঘ্র আনিয়া দে। বসু মহাশয়ের ইচ্ছা হইল—ছুটিয়া গিয়া তাঁহার অন্নদাতার জিনিষগুলি রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। কেহ যেন তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইত্যবসরে কতকগুলা অদ্ভুত জানোয়ার চীৎকার করিতে করিতে চোরগুলার দিকে অগ্রসর হইল। চোরগুলা ভয়ে পলাইয়া গেল। যাক্, বাঁচা গেল! বৃদ্ধের জিনিষগুলি ত রক্ষা হইল। কিন্তু একি! এই জানোয়ারগুলারও লক্ষ্য যে ঐ সোণার বাসনের উপর। বাসনগুলি লইয়া তাহারা টানাটানি, কাড়াকাড়ি, মারামারি করিতেছে যে! ভাল শিকারী বলিয়া বসু মহাশয়ের খ্যাতি আছে। এ সময়ে যদি একটা বন্দুক পাওয়া যাইত! ঐ না ঘরের কোণে একটা বন্দুক রহিয়াছে! তিনি তাড়াতাড়ি তাহা লইয়া ছুঁড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে সামান্য আওয়াজও হইল না। আরে দুর ছাই—এ যে পাথরের বন্দুক অথবা পূর্ব্বে হয়ত সত্যকার বন্দুক ছিল, এখন জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। ক্রোধে, ক্ষোভে বসু মহাশয় বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখেন সকাল হইয়াছে।

ত্বরিত গতিতে বসু মহাশয় বাহিরে আসিলেন। বাসনগুলা! কি আশ্চর্য্য একটা বাসনও যে সেখানে নাই! লজ্জায় তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। জীবনদাতার—জীবনদাতাই ত বটে—তাঁর বহুমূল্য জিনিষগুলি খোয়াইয়া, কেমন করিয়া তিনি তাঁহার নিকট মুখ দেখাইবেন। তিনিই বা ভাবিবেন কি? লোভে পড়িয়া বসু মহাশয়ই সেগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছে—এ কথা ভাবাও ত বিচিত্র নয়! অতি সতর্কতার সহিত তিনি চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, কোথাও একটী বাসনও দেখিতে পাইলেন না। পাইলেন একটী সোণার কড়ি।

৫

"তাইত হে, তোমার অনেক কথাই বুঝতে পারছি, কতক বা নাও পারছি। যা' পারছি না, তা' অনুমানে বুঝে নিচ্ছি—কিন্তু এ যে একেবারে নূতন কথা আমায় শোনালে তুমি—" চুরি!

"আজ্ঞে হাঁ—চুরিই গিয়েছে—আমি মিথ্যা কথা বলছি না, আমায় বিশ্বাস করুন। একখানা বাসনও সেখানে নাই। আরও যখন সংবাদ পেলাম, আপনার বাড়ী হতে আজ সকালে কেউ গিয়ে সেগুলি নিয়ে আসেন নি, এখন চুরি ভিন্ন আর কি হতে পারে? পুলিসকে খবর দিন। আর আমার ঘরখানাও না হয় একবার—"

"আরে থাম, থাম, সত্যযুগে কেউ মিথ্যা কথা বলে না, তবে তুমিই বা বলবে কেন! আর পুলিস-টুলিস্ আমাদের যুগে কিছু-নেই। ওসবের কোন প্রয়োজনই আমাদের নেই। ও সমস্তই আমাদের নিকট নূতন কথা। কিন্তু তুমি যে বললে চুরি গেছে—এ কথার অর্থ কি বলত? এ যে একেবারে আন্‌কোরা নূতন—চুরি মানে—

"আজ্ঞে, চুরি মানে—চুরি। এই নষ্ট আর কি—ষ্টোলেন—চুরি অর্থাৎ—আঃ কি করে' যে বোঝাব—"

"বাবা সত্যবাক্, নিয়ে এসত শব্দকল্পদ্রুমখানা—না, না, নূতনখানা নয়, ওত আমার কণ্ঠস্থ—ওর মধ্যে চুরি বলে' কোন শব্দই নাই—সেই পুরাতন, কলি-সংস্করণখানা নিয়ে এস।"

শব্দকল্পদ্রুম আসিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঐ ধরণের তিনটা শব্দ পাওয়া গেল—'চুড়ি" "ছুরি" এবং "চুরি"।

চুড়ি অর্থাৎ স্বর্ণনির্ম্মিত এক প্রকার গহনা বিশেষ। স্ত্রীলোকেরা তাহা হস্তে ধারণ করেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—"গহনারূপে স্বর্ণের ব্যবহার এখন আর হয় না। দুর্ব্বা ও পুষ্পের গহনাই এখনকার চলন। আচ্ছা, তারপর—

ছুরি—এক প্রকার ধারাল ক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ।

"ওর ত সকল প্রকার প্রয়োজনই শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমানে আমরা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মমতাবলম্বী, অহিংসাই আমাদের মূল মন্ত্র। তারপর—"

চুরি—না বলিয়া পরের দ্রব্য—

বসু মহাশয় উল্লাসে লাফাইয়া, চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, হাঁ—ঐ কথা—ঐ না বলিয়া—এতক্ষণ কথাটা মনে পড়ছিল না!"

বৃদ্ধ একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন—"তা' হলে তুমি বল্‌তে চাও যে, কেউ ঐ জিনিষগুলি নিয়ে গিয়েছে, আমাকে আর ফেরৎ না দিবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু তা' কেমন করে' সম্ভব হবে! এ রকম কোন প্রথা ত এ যুগে নাই—তবে কি কলি—উঁহু—আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয়—যথার্থই কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন, খাদ্যের সন্ধানও তিনি পেয়েছিলেন। তোমার পাত্রে ভুক্তাবিষ্ট কিছু ছিল ত?"

"তা' যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেত উচ্ছিষ্ট।"

"তা' হোক্, এতে কোন দোষ নাই, আতুরে নিয়মো নাস্তি। হাঁ, খাদ্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু খাদ্যের অধিকারীর সন্ধান পান নাই। বিনা মূল্যে কোন দ্রব্যগ্রহণ এ যুগে নিষেধ আছে, তাই ঐ সোণার কড়িটার বিনিময়ে তিনি ঐ খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর কোন অপরাধ হয় নাই।"

"তা' না হয় হ'ল। কিন্তু সোণার বাসনগুলি—" এই কথা বলিয়াই বসু মহাশয় জিজ্ঞাসু নেত্রে বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

"আর বাসনগুলি যদি কেহ নিয়েই থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই আমায় সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। সম্ভবতঃ তিনি বাসনের প্রকৃত অধিকারীর সন্ধান করছেন।"

পরক্ষণেই দেখা গেল, একটী কুকুর বৃদ্ধের সেই সোণার বাসনগুলি মুখে লইয়া একে একে তাঁহার বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসিল।

অদ্ভুত—অবাক্—আশ্চর্য্য! তবে সেই চোর-ডাকাত পশু জানোয়ারগুলা। সেই সবই তবে প্রহেলিকা! স্বপ্ন! —এই সোণার কড়িটা! তবে কি ঐ কুকুরই—বসু মহাশয়

একটি কুকুর সোণার বাসনগুলি মুখে লইয়া একে একে বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসিল

আর ভাবিতে পারিলেন না, মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

৬

"তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না ত বাবা! যখন যা' কিছু প্রয়োজন হবে বলবে, কোন কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না। নিজের বাড়ী ব'লেই মনে করবে।"

"আজ্ঞে না, অতি আরামে আছি আমি।"

"আর আজ মহারাজ শত্রুজিতের রাজসভায় রাজনটী সনকা দেবীর বিশ্বশান্তি নৃত্য দেখান হবে, তা' তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। আর এ স্থানটায় একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। এ স্থানটার সহিত পরিচিত হওয়ার তোমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আপস্তম্ভকে পুষ্পক রথটা আন্‌তে বলে দিয়েছি, প্রস্তুত থেক।"

"যে আজ্ঞে। তা' একেবারে পুষ্পক রথ কেন? গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, বড় জোর একটা মটর গাড়ী হ'লেই ত চলত।"

"ওসব একালে একেবারেই অচল বাবা। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ হাসিল করতে, গোযান, জলযান, কোন যানই আর ব্যোমযানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। তাই ওগুলোকে একেবারে বাদই দিতে হয়েছে।"

বসু মহাশয়ের দু' তিনখানা মোটরগাড়ী, ষ্টীম্-লঞ্চ ছিল। বড় ভাগ্য যে, সেগুলা মাটী হয়ে গিয়েছে—নইলে—যাক্ একটা দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছে।

"কিন্তু রেলগাড়ী! রেলগাড়ীও কি অচল?"

"রেল আমরা অনেক দিন তুলে ফেলেছি বাবা। মা বসুমতীকে তোমরা অষ্টেপৃষ্টে লোহার নিগড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিলে, আমাদের প্রাণে তা' সহ্য হয় নাই, মাকে আমরা সর্ব্বপ্রকারেই বন্ধনমুক্ত করেছি। একটা পিচ-ঢালা রাস্তাও আর দেখতে পাবে না। ও-সবের এখন কোনও প্রয়োজনও আর নাই। পুষ্পকের কৃপায় এখন আমরা নিমেষে বার যোজন পথ অতিক্রম করতে পারি! ইহা অপেক্ষাও দ্রুতগামী যানসৃষ্টির চেষ্টা আমরা করছি। কাজও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এখন একটা পরীক্ষা করে' নেওয়া মাত্র বাকী। এর আবিষ্কার কার্য্য সম্পন্ন হলে, আমরা যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারব। পুষ্পকের খাটুনীও অনেকটা কমে যাবে। অবশ্য এতে করে' সঙ্গে কোন মালপত্র নেওয়া যাবে না। এর নাম হবে মনোরথ।

দেখা গেল—অতি বিস্ময়ে বসু মহাশয় নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় ঈষদুন্মুক্ত রহিয়াছে এবং তাহা অতি ধীরে ধীরে নড়িতেছে, আর তাহার মধ্য হইতে আরও ধীরে কয়েকটী কথা বাহির হইয়া আসিতেছে—ম-নো-র-থ। শোনা যায়, সুন্দর নাকি একদিনে ছয় মাসের পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু এযে আশ্চর্য্য!

"দেখুন একটা কথা বলতে ভয় পাচ্ছি।"

"নির্ভয়ে বল বাবা।"

"আপনারা ত দেখ্‌ছি সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতির চরম সীমায় উঠেছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে ত তেমন উন্নতি দেখ্‌ছি না, বরং অবনতিই দেখছি। সেটা হচ্ছে কাগজপত্র। আমার মনে হচ্ছে আপনাকে যেন সেদিন ভূর্জ্জপত্রে লিখ্‌তে দেখেছি। বাণীর চর্চ্চা কি আপনারা এর পর ছেড়ে দিবেন?"

"বাণীর চর্চ্চা আমরা ছাড়ি নাই, ছাড়বও না। তবে কাগজপত্রের দিকে আমাদের তত লক্ষ্য নাই। বাণীকে আমরা মা বীণাপাণির বীণার ঝঙ্কারের মধ্যেই আবদ্ধ করে' রাখব। তুমি শ্রুতি-স্মৃতির কথা বোধহয় শুনেছ। বিদ্যাকে যদি আমরা স্মৃতিফলকে প্রতিফলিত করাতে পারি, তা' হলে আর ভূর্জ্জপত্রেরও আবশ্যক হবে না।"

"আর একটা কথা—"

"কুণ্ঠার কোন অপেক্ষা রাখিনি ত বাবা!"

"একা থাকি—একটা কিছু অস্ত্র—"

চোর-ডাকাত, বাঘ-ভালুকের মোহ বসু মহাশয়ের এখনও কাটে নাই।

"বলেছি ত বাবা, অস্ত্রের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, ওর কোন প্রয়োজনই এখন নাই। লৌহযুগের পরিবর্ত্তে এখন স্বর্ণযুগ এসেছে।"

"ফল-মাকড়, কলা-মূলা ছাড়াবার জন্যও কি অস্ত্রের প্রয়োজন নেই? গাছ হতে ফল-পাতা পাড়্‌তে বা কাটতে হলে—"

"গাছকে আমরা নির্য্যাতন করি না। গাছ স্বেচ্ছায় আমাদিগকে যা' উপঢৌকন দেয়, আমরা তাই গ্রহণ করি। গাছেরও প্রাণ আছে—গাছের গায়ে আঁচড় দেওয়াও একরূপ হিংসা—মহাপাপ—এটা খাঁটী অহিংসার যুগ—অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।"

বসু মহাশয়ের কলিবাস-কালেও অহিংসা আন্দোলন খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার পরিণতি যে এরূপ হইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বসু মহাশয় বড়ই আমিষপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু অহিংসার যেরূপ প্রিয় ও প্রসার, তাহাতে ত তাঁহাকে বাকী জীবনটা নিরামিষাশী থাকিয়াই কাটাইতে হইবে। বিধি-বিড়ম্বনায়

চার লক্ষ বৎসর বাঁচিতে হইয়াছে, আরও কত দিন বাঁচিতে হইবে কে জানে!

এই বুঝি মায়ের জগদ্ধাত্রী রূপ। বসু মহাশয় পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

"কিন্তু আত্মরক্ষা—তার ত প্রয়োজন আছে!"

"কিছু মাত্র না।"

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

আত্মা অবিনশ্বর, তার জন্ম-মৃত্যু নাই। যাহার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, যাহা নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়, কোন প্রকারেই যাহা নষ্ট হবে না, তার আবার রক্ষার প্রয়োজন কি? সে ত স্বয়ং রক্ষিত।

"বেশ বুঝতে পারলুম না। আচ্ছা, বাঘ-ভালুক—তারাও কি অহিংসা ব্রত গ্রহণ করেছে?"

"সামনে চেয়ে দেখনা বাবা! চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর।"

বসু মহাশয় সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—বৃদ্ধের কন্যা গায়ত্রী দেবী একটী শায়িত সিংহশিশুর পৃষ্ঠে নিজ দেহভার সংন্যস্ত করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে আর সিংহশিশু আনন্দে লেজ নাড়িতেছে। এই বুঝি মায়ের জগদ্ধাত্রী রূপ, বসু মহাশয় সেখান হইতেই পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

আগ্নেয়গিরির নিদ্রাভঙ্গ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ক্ষুব্ধ স্তব্ধ আমি ম্রিয়মাণ,
অন্তরে সঞ্চিত সদা তপ্ত দ্রব ধাতব নিঃস্রব,
বহিরঙ্গে তরুলতা, জনপদ, ঈর্ষ্যা-কলরব;
প্রচণ্ড আঘাতে আজি বক্ষে বাজি' উঠিছে বিষাণ।

ভূমিকম্প ভাবে জীব দেহ যবে ক্ষোভে কম্পমান;
নিদারুণ দুঃখ দিয়া জাগায়েছে আমারে মানব,
গম্ভীর নীরব ছিনু, দাম্ভিকের-ভাঙিব গরব,
জ্বলন্ত উৎক্ষিপ্ত স্রাবে সকলের নাশিব পরাণ।

সয়েছি অসহ্য জ্বালা, বদ্ধ ছিল ঊর্দ্ধস্থ বদন,
গর্ব্বিত মানুষ তাই রাত্রিন্দিব করি' অপঘাত,
শক্তিরে উপেক্ষা করি' দেছে মোরে দুঃসহ বেদন;
লব তার প্রতিশোধ, সর্ব্বনাশ করিব নির্ঘাৎ।
প্রতিহিংসা পূর্ণ করি' শক্তি মোর করিয়া প্রচার
সুদীর্ঘকালের তরে নিদ্রা যাব আমি পুনর্ব্বার।

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, পি-এইচ-ডি

৩

শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে গোটা কতক বড় বড় সমাজ-তাত্ত্বিক সংবাদ পাওয়া যায়। (১) তিনি তরুণ বয়সে নিজেই টোল খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। (২) তৎকালে নবদ্বীপের টোলে বৈদ্যজাতীয় মুরারি গুপ্তকেও পড়িতে দেখা যায়।

কায়স্থ বা অন্যজাতির লোককে টোলের ছাত্ররূপে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। অথচ চৈতন্যচরিতামৃতে বৈদ্যবংশীয় চন্দ্রশেখর দাসকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—

"কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥" (২৭)

আবার লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় যে, শচী ও জগন্নাথ মুরারিকে বলিতেছেন—

"তোরে বলি শূদ্র মুনি
সর্ব্বলোকে ব্যাখ্যানি।"(২৮)

(৩) এই যুগে ব্রাহ্মণ-শিশু জন্মগ্রহণ করিলে, মাসান্তে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার হইত—"পরিপূর্ণ হইল মাসেক এই মতে।" আবার শিশুর মাতা গীতবাদ্যের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া ষষ্ঠীর স্থানে যাইতেন, এবং খই, কলা, তৈল, সিন্দুর, গুয়া, পান সকলকে সম্মানার্থ দিতেন (২৮ক)। এই স্থানে আমরা ইহাও পাই যে, বালকের ব্যারাম হইলে "ষষ্ঠীর খেলা" বলিয়া তাহাকে নিমগাছের উপর রাখা হইত।[২৯] এই কুসংস্কার বা অনুষ্ঠান আজ আর বাংলাদেশে দেখা যায় না। আবার, শিশুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'বিষ্ণু-রক্ষা' ও 'দেবী-রক্ষা' পড়া হইত এবং ঘরের চারিদিকে মন্ত্র পড়া হইত (২৯ক)।

(৪) তখন পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকদের ভাষা লইয়া ঠাট্টা করিত (চৈ, ভা—আদি)। আবার তাহাদের "বাঙ্গাল" বলা হইত (২৯খ)। আর আমরা ইহাও পাই যে, পূর্ব্ববঙ্গকে বলা হইত "পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ—সর্ব্বলোকে গায়। গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে—এই সাক্ষী তার।"[৩০]

(৫) দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীর নবদ্বীপে পরাজয়ের গল্পে এবং মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে—'অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল'* সংবাদে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে, ভারতের পণ্ডিতদের মধ্যে intellectual isolation ছিল না।

(৬) চৈতন্যের বিবাহের খরচের তালিকা দেখিয়া অনুমান হয় যে, তখনকার দিনের খুব ঘটার বিবাহেতেও খরচ বেশী হইত না। সেকালে বিবাহের সময়ে "পাণী সাহিবারে" প্রথা ছিল—"চলিলা নাগরী সবে পাণী সাহিবারে"।† সেই সময়ে মালা-চন্দন দিয়া বরযাত্রীদের সন্তুষ্ট করা হইত; আজকালকার মত নিমন্ত্রণ খাওয়াইবার আড়ম্বর ছিল না। তবে বর দোলায় চড়িয়া বিবাহার্থ যাইত। বিবাহে 'নৃত্য-গীতবাদ্য-কোলাহল' হইত।‡

(৭) ঈশ্বরপুরী ও মাধবেন্দ্র পুরীর অস্তিত্বে ও অন্যান্য ন্যাসী সন্ন্যাসীর উল্লেখে বুঝা যায় যে, তৎকালে অনেক বাঙ্গালীও দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণকালে কাটোয়াতে মাথার চুল কাটায় বুঝা যায় যে, তৎকালে অনেকে বোধ হয় লম্বা চুলও রাখিতেন[৩১]।

(৮) সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন চৈতন্যদেব শান্তিপুরে যান, তখন অদ্বৈতের বাড়ীতে সকলের খাওয়ার সময়ে "হরিদাস ঠাকুরে আগু হবিষ্যান্ন দিল"(৩২)। তেমনি

(২৭) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি লীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ।

(২৮) লোচন দাস—"চৈতন্যমঙ্গল" পৃঃ ৫০। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে লেখক শুনিয়াছেন যে তথায় বৈদ্যেরা এখনও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। সেইযুগের বল্লাল-চরিতেও তদ্রূপ উল্লেখ হইয়াছে।

(২৮ক) চৈঃ ভাঃ, আদি—৪।১৭-২১।

(২৯) চৈ, ভা, আদি—পৃঃ ৩৫-৩৬।

(২৯ক) চৈ, ভা—আ, ৪।৭।

(২৯খ) চৈ, ভা, আদি, ১৫।২৭।

(৩০) „ „ পৃঃ ৭৪।

* চৈতন্যচরিতামৃত,—মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ; (চৈ, ভা,—আদি ৮৩-১১৭। † লোচনদাস—"চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ৬৫।

‡ চৈ, ভা—অন্ত্য ৪।৬৭।

(৩১) মস্তকে লম্বা কেশ রাখা ভারতের একটি প্রাচীন প্রথা। মেগাস্থিনিস্ এ-কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(৩২) জয়ানন্দ—"চৈতন্যমঙ্গল"—পৃঃ ৯৪।

অদ্বৈত একবার তাঁহাকে খাওয়াইবার সময়ে বলিয়াছিলেন :—"তোমারে খাওয়াইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।" আর একবার তিনি হরিদাসকে শ্রাদ্ধান্ন খাওয়াইয়াছিলেন—"আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ-পাত্র (৩২ক)।" অথচ সকলেই জানিতেন যে, তিনি পূর্ব্বে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর"*। আবার মুলুকোষপতি তাঁহাকে বলিয়াছেন—

"জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার॥" †

(৯) তাঁহার সন্ন্যাস-সময়ে পশ্চিম দেশ ভ্রমণকালে ভাবাবেশে অজ্ঞানাবস্থায় মাঠে পতিত দেখিয়া একজন সম্ভ্রান্ত পাঠান তাঁহার লোকজনকে বাঁধিয়াছিল। তিনি পরে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁহার রামদাস নাম হয়। এই সঙ্গে বিজুলী খাঁ[৩৩] নামে জনৈক পাঠান রাজকুমারের নাম উল্লেখ আছে। ইনিও পরে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'পাঠান বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত হন।

(১০) এই সময়ে বাঙ্গালীদের "গৌড়ীয়া" বলা হইত; এক গৌড়ীয়া কান্থা‡ ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে"; কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চায়[৩৪] দেখা যায় যে, দুইজন "বাঙ্গালী" তীর্থযাত্রীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের গুজরাটে সাক্ষাৎকার হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বঙ্গবাসীর "বাঙ্গালী" নামটীও প্রাচীন।

(১১) বৈষ্ণবরা খোলকে আগে 'মাদল' বলিতেন—

"মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল।
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥ (৩৫)

(৩২ক) চৈ, চ, আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ।

* চৈ, চ, অ, ১১শ পরিচ্ছেদ।

† চৈ, ভ, আ, ১৬, ৭৩।

(৩৩) "চৈতন্যচরিতামৃত" পৃঃ ১৯৩-১৯৪; পৃঃ ৯৪, কবিরের এক শিষ্যের নাম বিজলি খাঁ। ইতি কবীরের সমাধির উপর যে প্রস্তরফলক স্থাপিত করিয়াছিলেন, অযোধ্যা জেলার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উভয়ে এক নামধারী কিনা, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।

‡ চৈ, চ মধ্য ২০ প।

(৩৪) গোবিন্দদাসের করচা—পৃঃ ৬৩।

(৩৫) গোবিন্দদাসের করচা—পৃঃ ৮৪; চৈ, চ অ, ৭ পরিচ্ছেদ।

(১২) চৈতন্যদেব একদিন জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারে বসিয়া নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন :—

"বৈষ্ণবের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে।
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে॥" (৩৬)

কিন্তু মহাপ্রভু যখন কলির আচার বর্ণনা করেন, তখন তাঁহাকে সনাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয় :—

"শূদ্র সব ছাড়ি দেবে ব্রাহ্মণের সেবা
বিধবা ব্রাহ্মণী সব খাইবে আমিষ।
শূদ্র সব করিবেক পুরাণ ব্যাখ্যান
চণ্ডালিনী শূদ্র করিবেক একাদশী
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে
মোজা পাত্র লভি হাতে কামান ধরিবে" (৩৭)

(১৩) জয়ানন্দ বলেন, প্রতাপরুদ্র গৌড় জয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন—

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মানিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল।
কাঞ্চী দেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিব হেন না দেখিব সে কার্য্য॥

অবশেষে চৈতন্যদেবের পরামর্শে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে যুদ্ধ করিতে গেলেন।[৩৮]

(১৪) এইযুগেও বাঙ্গালীরা যে সাহসী ছিল না তাহার প্রমাণ বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। যখন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব নেতারা সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথি বাংলায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত কয়েকজন রাজপুত রক্ষী পাঠাইয়াছিলেন, কারণ রাস্তা দুর্গম আর বাঙ্গালী সঙ্গে দিলে কাজ চলিবে না, যেহেতু

"তবে সে পাঠান পঞ্চজনেরে বাঁধিলা।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥(৩৯)

(১৫) বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই একবার বৌদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] চৈতন্য কয়েক জন বৌদ্ধকে নিজের মতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। ইহা প্রতীত হয় যে, তখনকার ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না; যথা—"যদ্যপি অসম্ভাব্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে, তথাপি মিলিল প্রভু তাদের উদ্ধারিতে।"

(৩৬) জয়ানন্দ —পৃঃ ১০৬।
(৩৭) ,, —পৃঃ ১৩৯।
(৩৮) ,, —পৃঃ ৪৯০।
(৩৯) চৈ, চ, মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদ।
(৪০) ,, ,, মধ্য খণ্ড, ৩।১০৯।

(১৬) পশ্চিমের লোকদের তখনকার বাঙ্গালীরাও 'মেড়ো' নামে অভিহিত করিতেন।—"এই স্থানে ছিল এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ।"[৪১]

(১৭) চৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য ছিল। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জাতি নিয়া নানা বিতর্ক আছে। মুরারি গুপ্তের কড়চাতে উল্লিখিত আছে, "তেন জাতোঽসৌ যবনে কুলে"। গুপ্ত ইহাকে যবন কুলে জাত বলিয়াছেন।*

(১৮) চৈতন্যদেবের বাংলার বাহিরে ভ্রমণ একটা missionary activity হইয়াছিল। বহুকাল পরে একজন বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক নিজের দেশের বাহিরে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য এখনও বন্ধ হয় নাই। তাহা এখনও শনৈঃ শনৈঃ ও অজ্ঞাতসারে চলিতেছে।

(১৯) চৈতন্যদেব যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম্ম হইতে একটা পৃথক্ সম্প্রদায় গঠন করিতেছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায় যখন তাঁহার অনুমতিতেই তাঁহার শিষ্যেরা—গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব সমাজকে পরিচালিত করিবার জন্য "হরিভক্তিবিলাস" নামে একটী বিধি-ব্যবস্থার পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিগ্রন্থ। আবার তাঁহার সম্প্রদায়কে 'নিমানন্দী সম্প্রদায়' বলা হইত।†

(২০) চৈতন্য সন্ন্যাসিবর একবার গৌড় সহরে গিয়াছিলেন। তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া বাদ্‌সা হোসেনসাহ পারিষদদের হুকুম দেন যেন এই বাউল সন্ন্যাসীকে তাহার নিকট উপস্থিত করা হয়, কিন্তু রাত্রিতে রূপ-সনাতন ও কেশব ছত্রনাজি লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে গৌড় ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয়, কারণ বাদসাহের খেয়ালে বিশ্বাস নাই।

(২১) অন্যান্য প্রদেশে সেই সময়কার ধর্ম্মসংস্কারকদের কাহার কাহারও সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়।[৪২]

(৪১) গোবিন্দদাসের কড়চা—পৃঃ ৮২।

* মুরারী গুপ্তের কড়চা, ৪র্থ স্বর্গঃ ১১ শ্লোক।

† অনুরাগবল্লী—৮ম মঞ্জরী, পৃঃ ১১৩

(৪২) এই বিষয়ে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" দ্রষ্টব্য।

(২২) চৈতন্যের প্রচারকার্য্য যে সনাতন প্রথার বিরুদ্ধ ছিল, তাহা এই শ্লোকেই প্রমাণিত হয়—"সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ। নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ।*

(২৩) চৈতন্যের তিরোভাবের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আছে।

কিন্তু জয়ানন্দ বলিতেছেন—

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে
মায়া শরীর তথায় রহিলা যে পড়ি
চৈতন্য গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।" (৪৩)

জয়ানন্দের পুস্তকের এই সংবাদ সম্পর্কে নানা সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই গল্পকে যৌক্তিক ও স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

(২৪) বাঙ্গলাদেশে 'কয়া' নামে এক প্রকারের জল-ক্রীড়া ছিল—'গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে'†।

(২৫) চৈতন্যের জন্মের সময়ে ছুৎমার্গ বিশেষ প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইহা অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বালক নিমাই একবার বিপ্র অতিথির প্রসাদ খাওয়ায়, নারীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল—আয় নিমাই চাঙ্গাতি! কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি? কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন কুল, কেবা চিনে? তার ভাত খাই জাতি রাখিবা কেমনে? (চৈতন্য ভাগবত, আদি, ৫।৫৫-৫৬)

নিত্যানন্দের কর্ম্ম

চৈতন্যের তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ অবধূতকে বৈষ্ণব সমাজে নেতা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইনি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন। কথিত আছে, পুরীতে নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের বাংলায় প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে

* চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

(৪৩) জয়ানন্দ, পৃঃ ১৫০-১৫৫।

† চৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য ৮।১১৬।

নিভৃতে কয়েক দিন আলোচনা হয়[৪৪]। ইহার ফলে তিনি বাংলায় প্রেরিত হন। তিনি বাংলায় আসিয়া সূর্য্য সারখেলের কন্যা বসুধা দেবীকে বিবাহ করেন। উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্মণকে বিবাহ দিতে আপত্তি ছিল; যাহা হউক, তবু বিবাহ হয়। বিবাহের পর নিত্যানন্দকে একদিন শ্বশুর বাড়ীতে যাইবার সময়ে তাঁহার শ্যালিকা জাহ্নবী দেবী পরিবেশন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে জাহ্নবী দেবীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া যায়। তাহাতে তিনি তার হাত ধরিয়া ডানদিকে তাহাকে বসাইলেন এবং শ্বশুরকে বলিলেন "এই মেয়েটীও তোমার নিলুম"[৪৫]।

নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে[৪৬]। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার আরও একটী স্ত্রী ছিল। নিত্যানন্দের সর্ব্ব কর্ম্মই ব্রাহ্মণদের আচারের প্রতিকূল ছিল। অবধূত হইয়া সংসারে পুনঃ প্রবেশ করায়, তাঁহার "বান্তাসী" দোষ হইয়াছিল। তিনি জাতিগত স্পর্শদোষ মানিতেন না। তিনি সকলের বাড়ীতেই খাইতেন।

"কেন জাতি না খাইল যার ঘরে"[৪৭]। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াও, ব্রাহ্মণের আচার রক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়া কথিত আছে। প্রথমতঃ তাঁহার হাতে একটি দণ্ড থাকিত। এই দণ্ড তাঁহার উড়িষ্যাগমনকালে রাস্তায় নিত্যানন্দ ভাঙ্গিয়া দেন। এই দণ্ডটি কি? ইহা কি সাধারণ লাঠি, না, দশনামী দণ্ডী স্বামীদের দণ্ড? শেষোক্তটি দণ্ডীদের ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, শঙ্করাচার্য্য এই রীতি প্রবর্ত্তন করেন নাই; ইহা দণ্ডীদের ব্রাহ্মণাভিমানের প্রতীক। চৈতন্যের দণ্ড যদি দণ্ডীদের ন্যায় হয়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের দ্বারা ইহা ভাঙ্গিবার একটা বিশেষ অর্থ আছে। তিনি চৈতন্যের ব্রাহ্মণবংশের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। নিত্যানন্দ সর্ব্ব বিষয়ে সংস্কারক ছিলেন। যখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সঙ্গে উদ্ধারণ দত্তকে দেখিয়া বলিলেন—"এই লোকটী কে? ইহার পূর্ব্বাশ্রমের কি নাম ছিল?" —তখন নিত্যানন্দ উদ্ধারণের পরিচয় দিয়া বলেন—"ইনি কখনও রাঁধেন, আমি কখনও রাঁধি, এবং উভয়ে খাই।" আবার তাঁহার একমাত্র কন্যা গঙ্গার সহিত বারেন্দ্র কুলজাত ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়[৪৮]। তাঁহার আর একটী বড় কার্য্য হইতেছে খড়দহে কয়েক শত "ন্যাড়া-নেড়ীদের" বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করা। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্রই এই দীক্ষা দেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে ইহারা বৌদ্ধ সহজযান সম্প্রদায়ভুক্ত ন্যাড়াচার্য্যের দল। যখন মুসলমানেরা বাংলার জনসাধারণকে স্বীয় দলে স্রোতের ন্যায় টানিয়া লইতেছিল, আর অপর দিকে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্মের বহির্ভূত লোকদের অভিশপ্ত করিয়া সামাজিক নিপীড়ন করিতেছিল, তখন সকল প্রকার রাজশক্তির সহায়তা হইতে বঞ্চিত বৌদ্ধ, নাথপন্থী* প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ হয় মুসলমান, না হয় নব-সংস্থাপিত নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। উপরোক্ত ঘটনাটি তাহারই একটী পরিচয়। নিত্যানন্দের সহিত চৈতন্যের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা কেহই জানেন না; কিন্তু ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, নিত্যানন্দ এই নব-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় যাহাতে তৎকালে[৪৯] ব্রাহ্মণের ভাগ অতি বেশী, বৈদ্য তাহার নীচে এবং কায়স্থের সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়—তাহার দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিলেন। এই দ্বার এখনও রুদ্ধ হয় নাই। যেখানে ব্রাহ্মণেরা যান না বা যাইতে চান না, বৈষ্ণব প্রচারকেরা তথায় আজও যাইতেছেন। ইহার ফলে বাংলার বেশীর ভাগ হিন্দু আজ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। রাজা রামমোহন রায়, শিশিরকুমার

(৪৪) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৫ পরিচ্ছেদ। ভক্তি রত্নাকর—পৃ—৫৩৭

(৪৫) নিত্যানন্দ দাস—"প্রেমবিলাস"।

(৪৬) লালমোহন বিদ্যানিধি—"সম্বন্ধ নির্ণয়।"

(৪৭) চৈতন্য ভাগবত—মধ্য ২৩।৮২

৪৮। নিত্যানন্দ দাস—"প্রেম বিলাস", পৃঃ ২৪৯।

* লামা তারানাথ তাঁহার "বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস" (Schiefner কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত) পুস্তকে বলিয়াছেন যে গোরক্ষনাথের দল বাঙ্গলার তুরস্ক আক্রমণের পর "ঈশ্বর-পূজক" তীর্থিকদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে, কারণ এতদ্দ্বারা তাহারা তুরস্কাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। বোধ হয় নাথযোগী সম্প্রদায়ের যে-সব লোক আজ হিন্দু বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা সেই সময় হইতে হিন্দু সমাজের এক কোণে স্থান পান, যদিচ এই স্থান একেবারেই সুখের নয়।

৪৯। "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান", পৃঃ ৬০৯।

ঘোষ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, বেশীর ভাগ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শাক্ত এবং অন্যান্য জাতিগুলি বেশীর ভাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত[৫০]। এই ব্যাপারে class character বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। পাল ও সেন বংশের দরবারী শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ আভিজাতেরা হয় মহাযানপন্থী বৌদ্ধ, নয় তান্ত্রিক ছিলেন (উভয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদও বড় কম)। তাঁহাদের বংশধরদের অনেকই শাক্ত হইয়া রহিলেন। আর সহজযানী, হীনযানী, নাথপন্থী লোকেরা যাঁহারা মুসলমান হইলেন না, সেই সব গণশ্রেণীয় লোকেরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লেখক একবার তাঁহার কোন পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা কম কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "এইস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম আছে বলিয়াই কম।" কথাটা আংশিক-ভাবে সত্য বটে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ব্রাহ্মণদের কঠোরতা ও ছুঁৎমার্গ নাই। কাজেই ইহার অপেক্ষাকৃত উদার ছায়ায় অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যানন্দকে তাঁহার ভক্তগণ "পতিত পাবন" বলেন। তিনি স্বীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচরণ করিয়া সকলকে কোলে নিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় হিন্দু বাংলার প্রথম সমাজ-বৈপ্লবিক ছিলেন। (ক্রমশঃ)

৫০। "অমিয়-নিমাই-চরিত"—ষষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২১০। ও H. P. Shastri Introduction to N. N. Vaosu's "Modern Buddhim in Orissa", এবং রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী।

"আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে"

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

রৌদ্রছায়ার রচা-পথ দিয়ে বিরহী-মনের কথা
টানিয়া আনিল ধরণীর নীরবতা,
যক্ষ-বধূর অশ্রু সজল আঁখি
উজ্জয়িনীতে ঘোমটা টানিয়া রাখিতে পারেনি ঢাকি,
বিংশ শতকে সঘন-মেঘের গোপন-ছায়ার তলে
সহজ-দৌত্য নিত্য নিয়ত চলে।
প্রহরে প্রহরে আকাশের সীমা থেকে
মাটির ধূলিরে সেই বাণী দেয় ডেকে,
টুক্‌রো ক্ষণের প্রতিটি অশ্রুকণা
গোধূলি আলোয় পৃথিবীরে করে একান্ত উন্মনা,
লিখে দিয়ে যায় সবটুকু তার দিগন্ত আকাশেরে
উষার ললাটে সোনার সন্ধ্যা তাই রেখে দিয়ে ফেরে,
কত যুগ ধরি' অশ্রু হইল জমা
সঞ্চয় ভারে মাটির পৃথিবী আজি হলো অনুপমা।
তাই নিয়ে হলো নব মেঘদূত, নতুন কাব্যগীতি
সোণার আখরে লেখা পড়ে আছে উজ্জয়িনীর স্মৃতি।
রৌদ্রছায়ার রচা পথ দিয়ে যক্ষের বেদনারে,
কে পাঠালো এই পৃথিবীর গৃহে, কে পাঠালো বারে বারে
কে পাঠালো মেঘে, কে পাঠালো মনে মনে,
প্রতি দিবসের অশ্রুসজল ক্ষণে?
দূর অতীতের ঘোমটা খুলিয়া অনামিকা বিরহিনী
আজিকে ছায়ার আঁধারে দাঁড়ায়ে বাজাইল কিংকিনী।
ফাঁক হয়ে গেছে বন্ধ দুয়ারখানি,
কোন যুগ হ'তে রওনা হয়েছে কোন যুগে এলো বাণী,
ঝরণার ধারা মেঘে মেঘে আসে আকাশের কোল হতে
পথের শিলায় আঘাত হানিয়া স্রোতে,
স্পর্শ করিল পৃথিবীর তৃণ আর পৃথিবীর ধূলি,
শত সহস্র প্রহরীরা দিল সভ্রমে দ্বার খুলি';
সে ধারা ছুঁইল কত শত নীড় গোপন ছিদ্র পথে;
কঠিন প্রাচীর থামাতে পেলো না ঝরণারে কোন মতে।
যুগ হতে যুগে গোপন ছায়ার তলে
সহজ দৌত্য নিত্য নিয়ত চলে।

বিরহী যক্ষ বিচ্ছেদ ব্যথা বহি'
শতকের কাণে সেই কথা যায় কহি',
অলিগলি পথে, পল্লীর নিরালাতে
ফাঁকে ফাঁকে দিনে রাতে,
টুক্‌রো ক্ষণের অবসরটুকু ভরে'
দিয়ে যায় সেই বাণীর প্রবাহ কে জানে কেমন করে'।
আধুনিকা তার পাঠ্য পুঁথির পাতে
আনমনা হয়ে অশ্রু ফেলিছে অজানিত নিরালাতে,
হু হু করে মন ধেয়ে ধেয়ে চলে সজল আষাঢ় মেঘে
উজ্জয়িনীতে কখন তড়িৎ বেগে।
বিংশ শতকে নতুন উপাখ্যানে
এই পথে যেন টানিয়া এনেছে নতুন ছন্দ গানে।
যক্ষ-বধূর অশ্রু সজল আঁখি
উজ্জয়িনীতে ঘোমটার কোণে রাখিতে পারেনি ঢাকি'।
তরুণ মনের সব বেদনার তলে
সজল মেঘের গোপন দৌত্য নিত্য নিয়ত চলে।
তাই নিয়ে হলো নব মেঘদূত নতুন কাব্যগীতি,
সোণার আখরে লেখা পড়ে আছে উজ্জয়িনীর স্মৃতি।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর

জনৈক বন্ধু আমাকে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়াছিলেন। পত্রখানি খুলিয়া দেখি, "বিংশ-বার্ষিক প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব 'মেলা ও প্রদর্শনী" দেখিবার নিমিত্তই আমাকে এই পত্রখানি দেওয়া হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এই উৎসবে যোগদান করিয়া, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় বস্তুর সাহায্যে উদর-পূর্ত্তি করিয়া আসিব, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে না পারায় যত দুঃখিত আছি, উক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রখানি পাঠ করিয়া ততোধিক দুঃখিত হইলাম। পত্রখানির ভিতরে কয়েকটী মারাত্মক ভুল দেখিলাম। এই ভুলগুলি যে কেবল এই নিমন্ত্রণ-পত্রখানিতেই আছে, তাহা নহে। এরূপ ভুল বর্ত্তমান হাফ্-পেজি কবি এবং গল্প ও উপন্যাস-লেখক বাবুগণ সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। তবে কথা এই যে, যাহা ভুল তাহা চিরকালই ভুল। ভুল থাকা লেখা-পড়ার বাজারে চলিবে কেন? ভুল লিখিয়া বিড়ম্বনা করা অপেক্ষা ভুল করিয়া না লেখাই যুক্তিসঙ্গত। বাঙ্গালীকেও বাঙ্গালা-ভাষা যত্নসহকারে শিক্ষা করিতে হয়। ফাঁকি দিয়া কতদিন চলে! উক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রে যে ভুলগুলি দেখিতে পাইলাম, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

১। এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, "বিংশ বার্ষিক প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।" "বিংশ বার্ষিক" হইতে "প্রদর্শনী" পর্য্যন্ত পঞ্জাব-মেলের মত সুদীর্ঘ সমাস ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় লেখা ধৃষ্টতার পরিচায়ক। ইহা প্রথমতঃ শ্রুতি-কটু, দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা সহজে অর্থ-প্রতীতির ব্যাঘাত হয়। যখন "অনুষ্ঠিত হইবে", এই ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া রহিয়াছে, তখন "বিংশ"-শব্দের আদ্য-স্বরের বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু "বর্ষ"-শব্দের আদ্য-স্বরের বৃদ্ধি হইবে না। "বর্ষস্যাভবিষ্যতি" (পা ৭,৩,১৬)। অতএব "বৈংশ বর্ষিক"-পদ হওয়াই সুসঙ্গত। কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষায় ইহা শুনিতে অতি বিকট ও শ্রুতিকটু হয় বলিয়া এইরূপ-সাদাসিদে-ভাবে লিখিলেই যথেষ্ট হয়,—"বিংশ-বর্ষীয় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে অক্ষয়-তৃতীয়ার অথবা বিংশবর্ষে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে অক্ষয়-তৃতীয়ার" ইত্যাদি।

২। একস্থানে লিখিত হইয়াছে, "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী, যুগ্ম-সম্পাদক"। "যুগ্ম-সম্পাদক" হইতেই পারে না। "সম্পাদক-যুগ্ম" হইবে। স্বামীজী ও চৌধুরী মহাশয় বিলক্ষণ জানেন যে, "লোক-দ্বয়" পদ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু "দ্বয়-লোক" পদ কখনই ব্যবহৃত হয় না। 'যুগ্ম'-শব্দ বিশেষ্য,—বিশেষণ নহে।

৩। এক স্থানে দেখিলাম "প্রাতঃ ৫॥০ ঘটিকায় উপাসনা।" "প্রাতঃ" শব্দটী পাকা সংস্কৃত ও অব্যয়; এস্থলে ইহা ঠিক আছে। কোন ভুল নাই। তবে বাঙ্গালা-ভাষায় "প্রাতঃ"-শব্দ ব্যবহার করিলে ইহা বিকট বলিয়া বোধ হয়। "প্রাতঃকালে" লিখিলেই সোণার চাঁদ হয়।

৪। অপর এক স্থানে লেখা আছে, "১২টায় মধ্যাহ্ন উপাসনা।" "মধ্যাহ্ণ" না লিখিয়া "মধ্যাহ্ন" লিখিলেই ভাল দেখায়। হ্+দন্ত্য ন এবং হ্+মূর্দ্ধন্য ণ পৃথক্ বস্তু।

৫। এক স্থানে দেখিলাম, "কয়লাসম্পদ্ সম্বন্ধে বক্তৃতা।" যখন দন্ত্য স পরে আছে, তখন "কয়লাসম্পৎ" লেখাই উচিত। দ্ না হইয়া ৎ হইবে।

৬। অন্য এক স্থানে দেখিলাম, "হাস্যকৌতুক পরিবেশন।" "পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার "বর্ণ-পরিচয়ে" (প্রথম ভাগে) এই ভুলটী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পুস্তক পাঠ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী শিক্ষিত হইয়াছেন। এই হেতু, এই ভুলটী অদ্যাবধি যাবতীয় বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত বানান "পরিবেষণ" হইবে।

৭। এক স্থানে লিখিত রহিয়াছে, "পরিচালনাধীনে"। "অধীন" শব্দটী বিশেষণ। এই হেতু, "পরিচালনাধীনতায়" লেখা উচিত।

৮। অপর এক স্থানে দেখিলাম, "সভানেত্রী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী।" কয়েক বৎসর হইল, "সভানেত্রী"-শব্দটীর সৃষ্টি হইয়াছে। যিনি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি খুব চালাক লোক এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা! আজকাল স্ত্রীলোকও সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। যখন 'পুরুষ' সভার কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে আমরা 'সভাপতি' বলিয়া থাকি। কিন্তু স্ত্রীজাতি সভার কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিলে তাঁহাকে আমরা 'সভাপতি' বলিব কিনা? কথা এই, "সভাপতি"-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হইবে? উক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা মহাশয় ইহা না জানিয়া ও বিষম সমস্যায় পড়িয়া মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত অবশেষে "সভানেত্রী" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। "পিতামহ-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "ঠাকুর-মা" বলিলে যেরূপ হাস্যাস্পদ হইতে হয়, "সভাপতি"-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "সভানেত্রী" বলিলেও সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। উক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা বাবুর জানিয়া রাখা উচিত যে, "সভাপতি"-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "সভাপতিঃ" (মতি-শব্দবৎ) ও "সভাপত্নী" (নদী-শব্দবৎ) এই দুইটী পদই হইবে। ফাঁকি দেওয়া বেশী দিন চলে না, শীঘ্রই ধরা পড়িতে হয়!!!

৯। আর এক স্থানে দেখিলাম, "...নিয়োগী-কর্ত্তৃক বক্তৃতা।" "নিয়োগী" ইন্-ভাগান্ত শব্দ। অতএব "নিয়োগি-কর্ত্তৃক" লেখাই
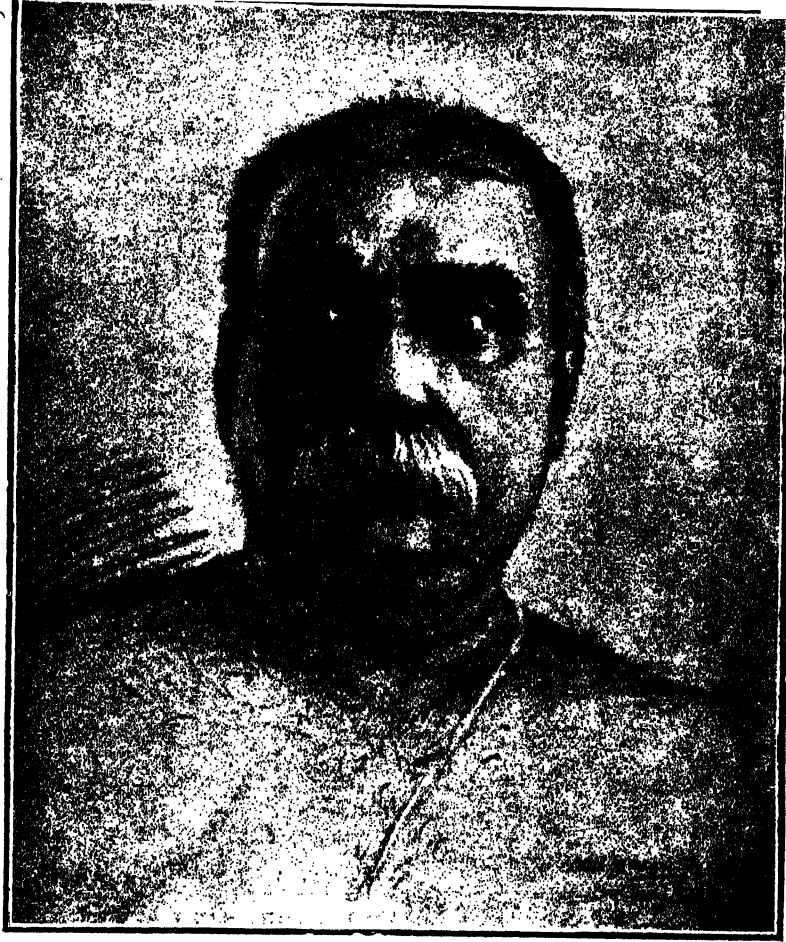
আশুতোষ-স্মরণে

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম. এ.

স্বর্গের দেবতা নামে মর্ত্তের ধূলায় ;
বিকৃত প্রলাপ বলি' দর্পের চূড়ায়
বসি' হাসে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক দল,
হে ঋত্বিক্ সত্যের সন্ধানী,
তবু আমি জানি ;—
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, ক্ষতি নাহি তায়,
যখনি স্মরণে জাগে, সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়
নত করি শির।
তোমার প্রশান্ত দীপ্ত আলেখ্য নির্ভীক
আমাদের স্মৃতিপটে জেগে ওঠে প্রভাতের প্রাথমিক
আলোকের মত !

স্নিগ্ধ শ্যাম ধরণীর হে মহামানব !
ওগো ভগীরথ ! জ্ঞানের যে পুণ্য ভাগীরথী
নিয়ে এলে তুচ্ছ করি' স্বার্থ-ক্ষুব্ধ যুক্তির বন্ধন,
আজি সে পেয়েছে ভাষা, বুকে ল'য়ে শত লক্ষ আশা
উল্লসিয়া, উচ্ছ্বসিয়া ছন্দে ছন্দে চলিয়াছে ছুটে।
তারি' অর্ঘ্য রচি' করপুটে ধন্য আমি আজ !
জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধরি' মানবের অন্ধতম পথে
যে রশ্মি ক'রেছ প্রোজ্জ্বল, আজিও ভাস্বর তাহা
মানবের মর্ম্মলোকতটে !
শ্রদ্ধার অঞ্জলি বহি' আজি এই ক্ষুদ্র আয়োজনে
আনিয়াছি অন্তরের গভীর ভাষায় আমার প্রণাম—
গ্রহণ করিও তাহা, হে চিরমহান্ !

পঞ্চদ্বীপ

(যাভা)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপাবলীর মধ্যে যাভাই প্রধান। সমগ্র ডাচ ইষ্টইণ্ডিজে যত লোক আছে, তাহার পাঁচ ভাগের চার ভাগ যাভায় বাস করে। যাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ গভর্ণর জেনারেল অবস্থান করিতেন। যাভাকে মানচিত্রে দেখিলে ছোট মনে হইবে; কিন্তু ইহা আয়তনে ওলন্দাজদের স্বদেশ নেদারল্যাণ্ডস বা হল্যাণ্ডের

যাভার পুজারিণী: উৎকীর্ণ শিলাচিত্র

চারগুণ বৃহত্তর। এখানকার আদিম অধিবাসী যাভানীজদের অধিকাংশই মালয়। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে ওলন্দাজই অধিক। প্রবাসীদের মধ্যে বহু চৈনিক বণিকের কাজ করে।

যাভার সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিরুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য। এখানকার তরু-লতা ও তৃণ-গুল্ম সবই বিরাট্। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থের প্রবণতাই যেন প্রকাণ্ড হইবার দিকে। পুষ্পপুঞ্জ ও পক্ষীদের বর্ণ-বৈচিত্র্য অন্যতম আকর্ষণের বস্তু। শুধু এত প্রকার নয়—এরূপ বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পক্ষী বোধহয় আর কোন দেশে নাই। এই দ্বীপে প্রায় চারিশত বিভিন্ন শ্রেণীর সমুজ্জল বর্ণরাগে রঞ্জিত পক্ষী লক্ষিত হয়। কমনীয় কলাপশালী কয়েক প্রকার ময়ূর এই বিচিত্রকায় বিহগবর্গের অন্যতম। ইহা ছাড়া বিচিত্র-কায় পোকা-মাকড় ও সরীসৃপও এখানে অনেক রকম আছে। এমন পুষ্প, পাদপ ও পক্ষী এখানে দেখা যায়, যাহারা এখনও অনামা। বৈজ্ঞানিকবর্গের দ্বারা তাহাদের নামকরণ এখনও হয় নাই।

শুধু নানা রকম ফুল নয়, নানা প্রকার ফলও এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। সাতশত রকম কলা এখানে জন্মায়। এমন ছোট-ছোট কলা আছে, যাহারা আকারে বালক-বালিকার অঙ্গুলির ন্যায়। অন্য দিকে বয়স্ক ব্যক্তির বাহুর ন্যায় বৃহৎ কদলীও দৃষ্ট হয়। ছোট কলাগুলি মানুষে খায়। খুব বড় কলাগুলি অশ্বদিগকে খাওয়ান হয়। ইহা খাইলে অশ্বগণ বলশালী হয় এবং তাহাদের দেহের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। এই দ্বীপে সর্ব্বত্রই কলার চাষ চলে। ওলন্দাজ সরকারেরও এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ছিল। যাভায় জাত চা, কফি ও কোকোর স্বাদ ও সুগন্ধ প্রশংসনীয়। নানা প্রকার সুগন্ধি মশলা এই দ্বীপের অন্যতম কৃষিজ সম্পদ্। মশলার গন্ধে যাভা দ্বীপটি সুরভিত।

যাভানীজরা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি হইলেও, সুগঠিত ও সুন্দর। ইহারা মালয় নামক জাতির অন্তর্গত অন্যতম সম্প্রদায় বা শাখা। যাভানীজরা বুদ্ধিমান্, দয়ালু এবং অত্যন্ত ভদ্র। যাভার প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থানে কৃষিকার্য্য চলে। অবশিষ্ট অংশ অরণ্য। ধান, কফি ও ইক্ষু, এই তিনটি জিনিষের চাষ যাভানীজ কৃষকদের জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায়। কৃষকরা গ্রামে বাস করে। এখানে গ্রামকে 'কাম্পং' বলা হয়। যাভানীজরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। তালজাতীয় তরুশ্রেণীবেষ্টিত, ছায়াশীতল গ্রামগুলি বিশেষ সুদৃশ্য। চারিদিকে পক্ষীকূজনমুখরিত মঞ্জুল কুঞ্জকানন—মধ্যে মধ্যে পল্লীর ছোট-ছোট কুটীর—যেন কোন দক্ষ চিত্রকরের আঁকা আলেখ্য চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত। কুটীরগুলি বাঁশ বা সেগুন কাঠে নির্ম্মিত। ছাউনি খড় বা তৃণের। আগ্নেয়গিরি প্রধান স্থান বলিয়া এই

সকল দ্বীপে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। ইহার উপযোগী করিয়া বাড়ী-ঘর প্রস্তুত। প্রায় প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে একটি ছোট ফুলের বাগান আবাসভূমির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। যাভার

যাভার দ্বৈত-নৃত্যের একটি দৃশ্য

গ্রামগুলিতে বহু চীনা কুলি শ্রমের কাজে নিযুক্ত আছে। ইহারা যাভানীজদের সহিত একত্র বাস করে না। চীনাদের গৃহগুলি একটু দূরে। ড্রাম বা ঢক্কা বাজাইয়া যাভায় প্রহর ঘোষণা করা হইয়া থাকে। কোন আশঙ্কার কারণ থাকিলেও, ঢাক বাজাইয়া গ্রামবাসীকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

যাভানীজদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিশালী তাহাদের গৃহগুলি বৃহত্তর। সাধারণতঃ তিনটি অংশ প্রত্যেকের গৃহেই থাকে। এই অংশগুলি পরস্পর এক প্রকার করিডর বা আবৃত পথের দ্বারা সংযুক্ত। 'ওমান' (অন্দর) নামক অংশে পরিবারবর্গ বাস করে। অতিথি অভ্যাগতকে 'পান্দোপো' নামক অংশে অভ্যর্থিত করা হয়। 'প্রিঙ্গিতান' নামক অংশটিতে অতিথিবর্গকে শুইতে দেওয়া হয়। ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, যাভানীজরা বিশেষ অতিথিবৎসল। এই সকল গৃহে বাতায়ন থাকে না এবং ধূম্রনির্গমের জন্য চিম্‌নিও নাই। অধিকাংশ সময়ে ইহারা বাহিরে বাস করে বলিয়া বাতায়ন বা চিমনির অভাব ইহারা অনুভব করে না। যাহারা বিশেষ দরিদ্র, তাহারা বাঁশ, কাঠ এবং ঘাস, এই তিনটি পদার্থকে এক জাতীয় বেতের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া কুটীর রচনা করিয়া বাস করে। পশ্চিম যাভায় কক্ষতল ভূতল হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে নির্ম্মিত হয়। ভূতল ও কক্ষতলের মধ্যবর্ত্তী অংশটিতে গো-মেষাদি পালিত পশুপাল রক্ষিত হয়।

প্রবল ও প্রগাঢ় পারিবারিক প্রীতি যাভানীজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পরিবারগুলি প্রায়ই বড়, কারণ এক এক যাভানীজ রমণী অনেকগুলি করিয়া সন্তানের জননী। যাভানীজ জনক-জননীর সন্তান-বাৎসল্য অসাধারণ। মালয় জাতিদের ভিতর মোরগের লড়াই সর্ব্বাপেক্ষ কৌতুকজনক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত। যাভায় ছেলেরা

অভিনেতার সাজসজ্জা: যবদ্বীপ

পতঙ্গের লড়াই এবং বয়স্কেরা মোরগের লড়াই দ্বারা কৌতুক অনুভব করে।

যাভানীজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। একাধিক পত্নী সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদের প্রায়ই থাকে।

বিবাহ উপলক্ষ্যে বিরাট্ ভোজের আয়োজন হয়। প্রত্যেক পরিবার কর্ত্তৃক বিবাহ-বাড়ীতে কিছু কিছু ভোজ্য পদার্থ প্রীতি-উপহার রূপে প্রদান করার প্রথা প্রচলিত। বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া নৃত্য-গীত, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ অনেক দিন ধরিয়া চলে।

যবদ্বীপবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাহারা ধান্যের চাষ প্রাচীন প্রথায় প্রচুর পরিশ্রম সহকারে করে। মাছ ধরা এবং শিকার করাও যাভানীজদের বিশেষ প্রিয়। ব্যাঘ্রশিকারও গর্ব্বের বিষয়। বাঘের দাঁত ও নখ ভূতপ্রেত প্রভৃতি অপদেবতার অনিষ্টকর প্রভাব প্রতিহত করিতে সমর্থ, এই বিশ্বাস যবদ্বীপবাসীর মনে বদ্ধমূল।

নৃত্যভঙ্গীতে সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যকুশলা শ্রীমতী রত্না : যাভা

বিস্ময়ের বিষয়, ব্যাঘ্রমাত্রই মারিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। এমন কতকগুলি বাঘ আছে, যাহারা বন্ধু বলিয়া বিবেচিত। এই সকল ব্যাঘ্র অনিষ্ট তো করেই না, পরন্তু তাহাদের দ্বারা অশেষ ইষ্টই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। ইহার কারণ—যাভানীজরা মনে করে—তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্যাঘ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছেন।

যাভানীজদিগকে ভক্ষ্যাহরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। প্রকৃতি দেবী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে নানা প্রকার ভোজ্য যেন সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই দ্বীপে গ্রীষ্ম ঋতু বার মাস বিরাজিত বলিয়া চাষ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। একটি ক্ষেত্রে যখন বীজ বপন করা হইতেছে, তখন আর একটি ক্ষেত্রে পক্ক শস্য শোভা পাইতেছে। আমাদের দেশের মত কাষ্ঠনির্ম্মিত লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় এবং মহিষ বা বলদের দ্বারা উহা চালিত হইয়া থাকে। যাভানীজরা অর্থ সঞ্চয় করিতে জানে না। ইহারা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া উৎসবাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করে। অতি তুচ্ছতম উপলক্ষ্যেও ইহারা নৃত্য-গীত, উৎসব ও ভোজের আয়োজন করিয়া থাকে।

যাভানীজরা মুসলমান। আরবরা আসিয়া মালয়দের মধ্যে ইসলামধর্ম্ম প্রথম প্রচার করিয়াছিল। একদা হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব যাভা, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া এই সকল দ্বীপ বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যবদ্বীপবাসীরা মুসলমান হইলেও, তাহাদের ভিতর এমন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, যাহা হিন্দু-প্রভাবের পরিচায়ক। এই দ্বীপের স্বল্পসংখ্যক নরনারী এখনও হিন্দুধর্ম্মই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলা চলে। তবে যাভা অপেক্ষা বলীদ্বীপে হিন্দু প্রভাবের স্পষ্টতর পরিচয় দৃষ্ট হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন এখনও যাভার যত্র তত্র বর্ত্তমান।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর যাভার রাজধানী বাটাভিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সহর। এই নগরীর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে পৃথিবীর সর্ব্বাধিক ইক্ষু, ধান্য এবং রবার প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। শহরটির বাড়ী, ঘর, পার্ক, রাস্তা, ঘাট সবই আধুনিক। দ্বীপের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত রেলপথগুলি এই সহরে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

মালয় বা যাভানীজদের পরিচ্ছদে বর্ণরাগের বাহুল্য বর্ত্তমান। ইহারা বিশেষভাবে নৃত্য, সঙ্গীত ও উৎসবপ্রিয়। যাভানীজ-স্ত্রীলোকদের প্রধান পরিচ্ছদ সারং। ইহা বগল হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রসারিত একখণ্ড প্রশস্ত বস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। যখন তাহারা বাড়ীর বাহিরে যায়, তখন সারং ছাড়াও একটি ছোট কোট গায়ে দেয়। আজকাল অনেক যাভানীজ-নারী মেমদের মত

পরিচ্ছদ পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা কেশ-কলাপকে বেণীবদ্ধ না করিয়া গুচ্ছকারে বা গুটাইয়া আলপিনের দ্বারা আটকাইয়া রাখে। পুরুষরা একপ্রকার

পুরাতন হিন্দুমন্দিরের উৎকীর্ণ গাত্রচিত্র : মধ্য যবদ্বীপ

ক্ষুদ্র বা খর্ব্বাকার পাগড়ী পরে। অঙ্গুরীয়ক, বলয় প্রভৃতি ভূষণ শুধু রমণীরা নয়, পুরুষরাও ব্যবহার করে। বালক বালিকার কণ্ঠে ও করদ্বয়ে অলঙ্কার প্রায়ই থাকে। যাভানীজদের পরিচ্ছদের বর্ণগত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের জন্য বাটাভিয়ার রাস্তাগুলি সর্ব্বদাই যেন উৎসবময়। বর্ম্মীজ, যাভানীজ প্রভৃতি জাতিদের বর্ণরাগানুরাগের পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। ইউরোপের রুম্যানিয়া ও হাঙ্গেরী এই দুইটি বল্কানরাষ্ট্রের নরনারীর বর্ণরাগের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজদিগের দ্বারা প্রস্তুত এরূপ গৃহও ব্যাটেভিয়ায় আছে। গৃহগুলি দর্শনযোগ্য। গীর্জ্জা-গৃহটি দুইশত বৎসরের। এই গীর্জ্জার ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্য উল্লেখ্যযোগ্য এবং উপাসনা বেদীটির সৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত টাউনহলটি সুদৃশ্য। টাইগার-ক্যানাল নামক খালের নিকটে চীনা পল্লী। এই পাড়ায় প্রায় ৩০ হাজার চীনার বাস। ইহারা দোকানদার, ফেরিওয়ালা ও কুলির কাজ করে। এই পাড়ার বাড়ী ও বাজারগুলি চৈনিক প্রণালীর। চৈনিক প্রণালীর প্যাগোডা বা দেবগৃহ—দেবগৃহের বক্ষে বুদ্ধ-বিগ্রহ—এই সকল দৃশ্য চীনা পল্লীকে একপ্রকার স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। বাটাভিয়া ছাড়া সেমারং এবং সুরবায়া নামক নগরদ্বয়ের নামও উল্লেখ-যোগ্য। যেমন বাটাভিয়া পশ্চিমাংশে তেমনই সুরাবায়া যাভার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। পশ্চিম এবং পূর্ব্ব উভয় দিক হইতে রেলপথ সুরাবায়ায় আসিয়াছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে এই শহরে থাকিতেন। এখানে ওলন্দাজদিগের প্রস্তুত অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীন প্রাকার এখনও দেখা যায়। এক দিকে বাটাভিয়া, অন্য দিকে সুরাবায়া, মধ্যস্থলে সেমারাং।

পাখা-নৃত্যে নৃত্যকুশলা শ্রীমতী জা: আধুনিকা এই যাভারমণী নৃত্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সুপরিচিতা

যাভার অভ্যন্তর ভাগে দুইটি বিচিত্রনামা রাষ্ট্র আছে। একটির নাম জকুজোকর্ত্তা, অপরটি সোয়েবাকর্ত্তা আখ্যায় অভিহিত। একটি রাজার এবং অপরটি সুলতানের দ্বারা প্রাচীন পন্থায় শাসিত। দেখিলে মনে হয়, আধুনিক সভ্যতার প্রবাহ এখানে আদৌ প্রবেশ করে নাই—যেন কালস্রোত বেগ বা গতি হারাইয়া এখানে স্তম্ভিত হইয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বের মতই এখানে বিচিত্র বেশে দরবার বসে। সুলতান বা রাজা এবং সভাসদবর্গ সবই সেকালের। সৌধ, প্রাসাদ সবই সে যুগের। মনে হয়, সহসা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিরাজিত সেই রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার রাজ্যে আসিয়াছি। এই সুলতান ও রাজাকে অবশ্যই ওলন্দাজ প্রাধান্য মানিতে হইত।

প্রায় হাজার মন্দির জকজায় (জকজোকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত নাম) দেখা যায়। এই সকল মন্দিরের বিচিত্র ও বিস্ময়কর ভাস্কর্য্য একদা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের বার্ত্তা ঘোষণা করে। এই রাজ্যের অধিবাসীরা বয়ন-বিদ্যায় ও রঞ্জন-শিল্পে বিশেষ পারদর্শী। এখানে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা সমগ্র যাভায় প্রসিদ্ধ। বিস্ময়ের বিষয় বিনা তাঁতে এই সকল বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। বস্ত্র প্রস্তুত হইবার পর উহাকে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়া থাকে।

এই দ্বীপের মধ্যস্থলে বিশ্ববিখ্যাত বোরবুদর। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সভ্যতার প্রভাব ইহার সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূজনীয় স্বামী সদানন্দ গিরির প্রবর্ত্তকে লিখিত প্রবন্ধ হইতে অতীতের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রবর্ত্তকের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার বৃত্তান্ত দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলাম। কোন কোন পাশ্চাত্য পর্য্যটকের মতেও মিশরের পিরামিড অপেক্ষাও বোরবুদুর অধিকতর বিস্ময়কর।

মোটের উপর যাভা পর্য্যটকের পক্ষে উপভোগ্য ও দর্শনীয়। সম্প্রতি ওলন্দাজাধিকৃত এই সকল দ্বীপাবলী জাপানের অধিকারে যাওয়ায় যাভা পুনরায় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আষাঢ়ে

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় মেঘে আকাশ ভ'রে,
পড়ছে ঝ'রে বাদলধারা।
বেপথু কোন্ বিরহিণীর
নয়ন নীর দয়িতহারা॥
গুমরে ওঠে বুকের মাঝে
সকাল সাঁঝে ব্যথার দেয়া।
সেই বেদনার পরশ লেগে
উঠ্‌ল জেগে কদম কেয়া॥
যক্ষপতি কুবের শাপে
বছর যাপে রামগিরিতে।
তাই কি কাঁদে ব্যাকুল হিয়া
যক্ষপ্রিয়া আকুল চিতে॥

নৃপতি সে, ভালবেসে
ভুল্‌ল শেষে, বৃথাই বলা।
তাই কি কাঁদে দিন-রজনী
অভিমানী শকুন্তলা॥
যক্ষবধূ বছর পরে
যক্ষে ঘরে পেয়েছিল।
দুষ্মন্তও শুনি আবার
পত্নীরে তার চিনেছিল॥
দুঃখ-সুখের দোদুল দোলায়
কান্না-খেলায় দুলছে মরত্।
প্রকৃতি কি জানায় নিতি
তারই স্মৃতি বর্ষা-শরৎ॥

সতেরো

ঘরের সিলিং থেকে সবুজ আলোটা নীচের দিকে ঝুলে র'য়েছে, একটা সুন্দর আর নিটোল স্বপ্ন যেন সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে আছে। জান্‌লা খোলা। বিছানার ওপরে শুয়ে মল্লিকা আকাশের দিকে চাইলো। ঘরে কেউ নেই—মাথাটা বিকেল থেকে ধ'রেছে—মল্লিকা চেয়ে রইলো। দিগন্তবিস্তৃত তারার তৈরী ছোট ছোট এই হীরক-কণার দিকে চেয়ে থাক্‌তে কিন্তু বেশ লাগে। কাকে যেন ভাব্‌তে ভাল লাগে—সে যেই হোক্! "তারার দিকে চেয়ে চেয়ে তোমায় মনে পড়লো"—কার লেখা? রবীন্দ্রনাথেরই বোধহয়, মল্লিকা মনে মনে সেই লাইনটা আবার আবৃত্তি করলো। ঘরটা নিস্তব্ধ, নির্জন—নলিনীকান্ত এই কিছুক্ষণ হ'ল গেছেন—সারাটা সময় কি কথাই যে বল্‌তে পারেন ভদ্রলোক—এঁদেরকেই কথাশিল্পী বলা উচিত। মল্লিকা পাশ ফিরে শু'ল—কিন্তু যেন ভাল লাগে না—কোনও কাজেই মন বস্‌ছে না—এটা ভাল লক্ষণ নয় কিন্তু, অসুখ টসুখ হ'বে নাকি মল্লিকার?—বলা যায় না—তার শরীর খারাপ হ'বার এটা একটা সুন্দর সিগ্‌ন্যাল!

মল্লিকার হঠাৎ গার্গীর কথা মনে এলো। মেয়েটা সত্যিই অদ্ভুত—কিছুতেই যেন বোঝা যায় না, সব সময়েই ওকে ঘিরে রহস্যময় একটা আবরণ, অথচ, মল্লিকার সামান্য একটু হাসি পেল—অথচ বিদ্যুৎ ওকে কতই গম্ভীর ক'রে চ'লে, হয়তো ভালও বাসে, মল্লিকা এইখানে একটু থাম্‌লো, বলা যায় না—মানুষের মুখ দেখে মনকে বোঝা খুব সহজ বলেই সহজ নয়—গার্গীটা সত্যিই অদ্ভুত বটে!

রাত বাড়ছে, মল্লিকা আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে বস্‌লো, 'নীলরাত্রি' খানা টেনে বার করলে, সত্যিই বিদ্যুৎ ভাল লেখে, খ্যাতি ওর অমূলক নয়, মল্লিকার মনে হ'ল আরও একবার বইটা পড়া উচিত। আস্তে টেব্‌ল ল্যাম্পটা বিছানার কাছে টেনে নিলে, তারপরে উপুড় হ'য়ে পড়লো বিছানার ওপরে, তারপরে বইটা খুল্‌লো, আবার গোড়া থেকেই আরম্ভ করা যাক্।

'খুট্' ক'রে দরজার ওদিক থেকে সামান্য একটা শব্দ ভেসে এলো, মল্লিকা চোখ খুল্‌লে, দরজা খুলে নলিনীকান্ত ঢুক্‌লেন—হাতে একতাড়া কি সব কাগজপত্র!

"ঘুমিয়েছেন নাকি মল্লিকা দেবী?" নলিনীকান্ত দরজার ওদিক থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, "সেই ম্যান্‌স্ক্রীপ্‌টা পেয়েছি—ওয়ান্ এ্যাক্ট প্লে—আমার স্যুট্‌কেশের ফাঁকেই ছিলো—আর মজা দেখুন আমি সারাদিন ওটাকে খুঁজে খুঁজে একেবারে হায়রান্।"

"সারাদিন তো এখানেই ছিলেন আপনি—" মল্লিকা বিছানার ওপরে সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো, "খুঁজ্‌লেন কখন?"

"ওই আপনার কাছে আসার আগে পর্য্যন্ত আর কি!" নলিনীকান্ত মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হ'লেন।

"সত্যি, আপনাকে এটা না শুনিয়ে আর পারলাম না, তাই এতো রাত্তিরেও বিরক্ত করতে এলাম আবার—"

মল্লিকা ততক্ষণে 'নীলরাত্রী' মুড়ে টেবিলের এক পাশে রেখে দিয়েছে, বল্‌লে, "না, বিরক্ত আর কি" একটু থেমে বল্‌লে, "ভালই তো আপনার নতুন Productionটা শোনা যাবে!"

নলিনীকান্ত কৃতার্থ হওয়ার হাসি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "দেখুন মল্লিকা দেবী, আমাদের দেশে, বড় দুঃখের বিষয়, পাঠক নেই—সকলেই লেখক, সকলেই কবি আর নাট্যকার; আপনি বল্‌তে পারেন, ক'জন ভাল পাঠক আছেন এই সমস্ত বাংলা দেশে? বল্‌তে পারেন?"

মল্লিকা সামান্য একটু হেসে মাথা নীচু করলে, বল্‌লে, "সে কথা ঠিকই—আপনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা ক'রেছেন দেখ্‌ছি—"

"বল কি, এ নিয়ে ভাব্‌বো না!—" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নলিনীকান্ত জীব কাট্‌লেন, বল্‌লেন, "আমায় ক্ষমা

করবেন, ভুলে আপনাকে 'তুমি' ব'লে ফেলেছি—খেয়াল ছিল না'।"

মল্লিকা হাস্‌লো, বল্‌লে, "এতদিন সেইটে না ব'লেই তো অন্যায় ক'রেছেন, জানেন তো বয়সে আমি কত ছোট আপনার থেকে—"

নলিনীকান্ত এবারে আর কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, শুধু হাস্‌লেন একবার, তারপরে মল্লিকার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে টেবিলের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ওটা কি বই?"

"নীল রাত্রি"—মল্লিকা বইটা হাতের ওপরে তুলে নিলে, "পড়েছেন নাকি?"

"নীল রাত্রি?" নলিনীকান্ত বাবু একটু অবাক্ হ'লেন, "নীলরাত্রি—মানে সেই বিদ্যুৎ বসুর লেখা?"

মল্লিকা মুখ টিপে হাস্‌লো, বল্‌লে, হঁ্যা, নামটা তো শুনেছেন দেখ্‌ছি!"

"কি আশ্চর্য্য! এ সব বই তোমরা পড়?" নলিনীকান্ত বিস্ময়ে মুখ কিছুটা বিস্ফারিত করলেন।

"কেন?—কি হ'য়েছে পড়লে?"

"বল কি?" নলিনীকান্ত খাটের এক পাশে এসে বস্‌লেন, "শুনেছি দারুণ অশ্লীল লেখা লেখে ছোক্‌রা—আরে রামঃ, ও কি তোমাদের পড়া উচিত?"

"শুনেছেন—পড়েন নি তো!" মল্লিকা আবার হাস্‌লো।

"না—পড়িনি বটে—তবে শুনেছি লেখাটা নাকি খুব জোরালো—বলার কায়দাটা নাকি সত্যিই প্রশংসনীয়—"

"পড়ে দেখ্‌বেন—" মল্লিকা বইটা নলিনীকান্তের দিকে ছুঁড়ে দিলো, "উনি তো প্রায়ই আসেন আমাদের এখানে—"

গায়ের ওপরে কেউ সাপ ছেড়ে দিলে হঠাৎ যেমন লোক লাফিয়ে ওঠে, ঠিক সেইভাবে নলিনীকান্ত খাট থেকে বিদ্যুৎগতিতে স'রে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন, "বল কি—সে ছোঁড়াটা এখানে আসে নাকি আবার?"

"হঁ্যা", মল্লিকা নিষ্প্রভ, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে, বল্‌লে, "তিনি ভদ্রলোক, তাঁর সম্বন্ধে আপনার একটু সচেতন হ'য়ে কথা বলা উচিত ছিল।"

"না—মানে, তুমি ভুলে বুঝো না—" মুহূর্তে নলিনীকান্তর মুখ সাদা হ'য়ে গেল, "ওটা এম্‌নি বল্‌লাম—তুমিও যেমন—মানে ওরকম তো সকলেই সকলকে বলে—"

"হঁ্যা তা জানি—" মল্লিকা 'নীলরাত্রি' খানা বিছানা থেকে তুলে নিলে, "আমার বড্ড মাথা ধ'রেছে, আপনি যদি দয়া ক'রে আরেক দিন আসেন—আজ ঠিক্ এ্যাপ্রিসিয়েট্ করতে পারবো না—"

নলিনীকান্ত মূঢ়ের মত—নির্বোধের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপরে পিছন ফিরে দরজাটা খুল্‌লেন, বল্‌লেন, "আচ্ছা—আজ তা'হ'লে চল্‌লাম—"

মল্লিকা সেই ভাবেই দুই হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালো।

ভোরের দিকে মল্লিকার আবার ঘুম ভেঙে গেলো, সমস্তটা রাত্তিরই এক রকম নিদ্রাহীনতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে—একটু ঘুম আসে তো তখনই ভেঙে যায়, মল্লিকা উঠে বস্‌লো—শরীরটাও যেন ভাল লাগ্‌ছে না।

একটা খেয়াল এলো মল্লিকার মনে। ভাব্‌লো ভোর বেলা বেড়াতে বেড়াতে একবার বিদ্যুতের বাড়ীটা ঘুরে আসা যাক, মর্ণিং-ওয়াকও হ'বে—ওর ডেরাটাও দেখা হ'বে। ঠিকানাটা—হঁ্যা, ঠিকানাটা তো তার তার কাছেই আছে—ঘুরে আসা যাক্।

মল্লিকা উঠে বস্‌লো—কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। নলিনীকান্তের সঙ্গে গত রাত্রির কথা কাটাকাটির ঘটনাটা মনে পড়লো। কিছু না বল্‌লেই হ'ত! মল্লিকারও যেমন দুর্বুদ্ধি—এতে সে গেলো চোটে—আরে! এ তো আগেই মল্লিকার বোঝা উচিত ছিল, নলিনীকান্ত ছাড়া এভাবে আর কে কথা বল্‌তে পারতো—কিছুটা না হয় বল্‌তেই দিতো মল্লিকা!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মল্লিকা পথে নাম্‌লো। ছ'টা বেজেছে, ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলো দু' একটা রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে—খানিকটা হেঁটে এসে মল্লিকা ট্রাম ধরলো।

সিঁড়ির ওপরেই মল্লিকা থমকে দাঁড়ালো, খুব ছোট আর সরু সিঁড়ি—ওপর থেকে এক ভদ্রলোক নামছিলেন, একটী ভদ্র মহিলাকে এইভাবে সিঁড়ির ওপরে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। মল্লিকাই আগে কথা কইলে, বল্‌লে,

"বিদ্যুৎবাবু এখানে থাকেন তো? মানে বিদ্যুৎ বসু, যিনি লেখেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে, নিয়ে যাচ্ছি।"

মল্লিকা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো।

ছোট্ট একটা অপরিসর ঘর—উত্তরের দিকে মাত্র একটা জানলা—মেঝের ওপরে মাদুর পাতা র'য়েছে, একধারে রাত্রির শোয়া বিছানাটা গোটানো, খানিকটা দূরে একটা ষ্টোভ, কতগুলো আলুর খোলা, একধারে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, তারি পাশে একটা মোটা ইংরিজি বই খোলা মাদুরের ওপরে, আর তারি কাছে বিদ্যুৎ পাশ ফিরে শুয়ে আছে, ঘুমচ্ছে বোধহয়!

ভদ্রলোক আগে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, "কয়েক দিন থেকে উনি বড় অসুস্থ, খুব টেম্পারেচার উঠেছে—কাল ডিলিরিয়ামও হ'য়েছিল রাত্তিরে।"

"তাই নাকি?" মল্লিকা দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এলো—প্রথমে কি যে করবে ঠিক ভেবে পেলো না, তারপরে এগিয়ে এলো, আস্তে এসে বিদ্যুতের পাশে বসলো, তারপরে একটা নিঃশব্দ গম্ভীর মুহূর্ত্ত পার হ'ল, তারপরে মল্লিকা আস্তে বিদ্যুতের কপালের ওপরে নিজের ডান হাতখানা রাখলো—উঃ, কপাল যে আগুন!

বিদ্যুৎ চোখ খুললে। লাল জবা ফুলের মতই প্রায়। মল্লিকার মুখের দিকে চাইলো কিছুক্ষণ, তারপরে অতি ধীরে বললে, "আপনি এসেছেন?"

মল্লিকা সামান্য হাসলো একটু, বললে, "হ্যাঁ, আপনি কথা বলবেন না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন—এত জ্বর—আমাকে একটা খবরও তো পাঠাতে হয়!"

বিদ্যুৎ এবারে সোজা হ'য়ে শু'ল, একটু হাসলো, "এর জন্যে ভাববেন না। দু' এক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে, আমার জ্বর তো, ও আমারি মত খেয়ালী!"

মল্লিকা আবার একটু হাসলো, তারপরে বললে, "লাষ্ট টেম্পারেচার নিয়েছেন কতক্ষণ?"

"সেই রাত্তিরে—এখন বোধহয় অনেক ক'মেছে।"

"না—আমার তো তা মনে হয় না—" মল্লিকা ভদ্রলোকের দিকে চাইলো—"থার্মোমিটারটা কোথায়?"

ভদ্রলোক ষ্টোভে চা করতে আরম্ভ ক'রেছিলেন, সেখান থেকে উঠে এসে থার্মোমিটার বের ক'রে দিলেন।

মল্লিকা নিজের হাতে সেটাকে ঝাড়লো, তারপরে বললে, "লাগান—"

বিদ্যুৎ হাসলো, বললে, "কেন আপনি আবার এত কষ্ট করছেন?"

"থামুন—যা বলছি শুনুন চুপ ক'রে—"

বিদ্যুৎ থার্মোমিটারটা বগলের মাঝখানে আটকে দিলে।

"টিপে দেবো মাথাটা একটু" মল্লিকা ভালভাবে বিদ্যুতের পাশে বসলো।

"না—না, থাক্ না—আপনি ভারি ব্যস্ত হচ্ছেন। আমার এখন কোন কষ্ট হচ্ছে না, কেন যে—"

মল্লিকা এক রকম ধমক দিয়েই বললে—"আচ্ছা থামুন, আপনাকে জিগ্‌গেস করাই আমার অন্যায় হ'য়েছে" বলে' সে বিদ্যুতের কপালের চার পাশ আঙুল দিয়ে টিপ্‌তে আরম্ভ করলো, "চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন এবারে—"

বিদ্যুৎ আবার একবার চোখ বুজলো—যন্ত্রণায় সমস্ত মাথাটা যেন খ'সে যাচ্ছে।

মল্লিকা থার্মোমিটারটা বের ক'রে নিলে, দেখে বললে, "এই আপনার কম জ্বর?"

বিদ্যুৎ চোখ খুললো, হাসলো একটু, বললে "কত?"

"চারের কাছাকাছি—ডাক্তার দেখিয়েছেন কোন?" মল্লিকা ভদ্রলোকের দিকে চাইলো।

"না, সে রকম কাউকে দেখাতে পারিনি আমরা।" ভদ্রলোক ভীত, শঙ্কিত গলায় বললেন, "এখানেই মেসে একজন থাকেন, তিনিই—।"

"ওঃ!" মল্লিকা ছেদ টানলো। "যান, আপনি দয়া ক'রে—শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুন—আমি এঁকে আমার ওখানে নিয়ে যাবো।"

বিদ্যুৎ আবার চোখ খুললো, বললে "এ কি পাগলামী করছেন আপনি? আমার জ্বর, আপনি তো জানেন না, ও যেমন আসে, ঠিক সেইভাবে যায়—কেন ব্যস্ত হ'চ্ছেন—"

"থামুন, আপনাকে আমি কোনও কথা বলতে

বলিনি—" মল্লিকার চোখেমুখে নিদারুণ উদ্বেগের চিহ্ন ভেসে উঠ্‌লো, "যান্‌, আপনি দেরী করবেন না," মল্লিকা আবার ভদ্রলোকের দিকে চাইলো।

ভদ্রলোক সামান্য একটু ইতস্তত: করছিলেন এতক্ষণ, মল্লিকার চোখের দিকে চেয়ে তিনি আর দাঁড়ালেন না। ষ্টোভটা একপাশে সরিয়ে উঠে পড়লেন, তারপরে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে নেমে গেলেন।

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "এ আপনি ভাল করলেন না মল্লিকা দেবী, কোথাকার পথের আবর্জনাকে টেনে এনে আপনি ঘরের বিপদকে বাড়াবেন না।"

"বল্‌ছি তো আপনি চুপ ক'রে থাকুন, কে আপনাকে কথা বল্‌তে ব'লেছে?" মল্লিকা একটু রাগের ভঙ্গী করলো, "পথের আবর্জনা কি অন্য কিছু, সে বিচার আপনার নয়—আমার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি, আমি বুঝ্‌বো, ঘুমোন চুপ ক'রে"—মল্লিকা জোরে জোরে বিদ্যুতের কপালের চারপাশ টিপে দিতে লাগ্‌লো।

বিদ্যুৎ আবার চোখ বুজ্‌লো, অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিলো।

দরজা ঠেলে সেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, বল্‌লেন, "ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি—চলুন তাহ'লে।"

মল্লিকা, উঠে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "এইটুকু রাস্তা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারবেন তো, না ধরবো আমরা দু'জনে?"

"কোনও দরকার নেই, আমি নিজেই পারবো।"

বিদ্যুৎ মাদুরের ওপরে উঠে বস্‌লো, মল্লিকা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "দরকার নেই, আমার কাঁধে একটা হাত দিন, আর আপনি—" ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে মল্লিকা কথা শেষ করলে, "আপনি ওঁর হাতটা ধরুন।"

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "অযথা আপনি এ কষ্ট করলেন আমার জন্যে—কোনও দরকার ছিল না—"

মল্লিকা এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না, আস্তে আস্তে দু'জনে বিদ্যুৎকে ধ'রে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলো, তারপরে সেই ভাবেই ওঠালে ট্যাক্সিতে, ভদ্রলোকটীর দিকে চেয়ে মল্লিকা বল্‌লে, "আপনিও আসুন—"

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে। (ক্রমশ:)

বিদ্রোহী বিপিনচন্দ্র

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্যাহ্ন-মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী বিপিনচন্দ্রের জন্ম। তাই কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, আজীবন তিনি বিদ্রোহের ধ্বজাই উড়াইয়া গিয়াছেন। সংস্কারমুক্ত, সবল, স্বাধীন ভারতবর্ষই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা-কামনার বস্তু।

তাঁহার সময়ে যে সব জননায়কেরা ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই যে যাঁহার বিষয় ও কাজকর্ম্মে বিত্ত-বিভব ও প্রভাবশালী হইয়া, দেশ-সেবায় এবং পরিণত বয়সে জনসেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তাঁহার মত মেধাবী ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির পক্ষে, সেই সময়ে যে কোন বড় পদ অধিকার করিয়া, বিত্ত-বিভবশালী হওয়া খুবই সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে এই ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন একটা আপনভোলা বিরাট্ বিদ্রোহী মন এবং মুক্তির মন্ত্র দিয়া। তাই যৌবনেই দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া দেশসেবার বেদীমূলে তিনি নিজকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে স্কুল-মাষ্টারী এবং পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরিয়ানরূপে তাঁহার স্বল্পকালের জন্য কর্ম্মময় জীবন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া লেখা এবং সম্পাদকতাই ছিল তাঁহার জীবনযাত্রানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তিনি ছিলেন বিত্তশালী পিতার একমাত্র পুত্র। ছেলের মেধাশক্তি, বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, কত না আশায় পিতা পুত্রকে সেই সময়ের সুদূর শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতা কলেজে অধ্যয়নের জন্য পাঠাইলেন—কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বাংলায় তখন জাতীয় জাগরণের অরুণালোক দেখা দিয়াছে, নানা

প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষসিংহেরা; নানা দিক্ দিয়া জাতীয় জাগরণের জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। রাজনৈতিক চেতনা তখনও তেমনভাবে জাগে নাই। কিন্তু সেই ধূমায়িত বহ্নির আঁচ আসিয়া কখন কেমন করিয়া বিপিনচন্দ্রের বিদ্রোহী মনেও ছোঁয়া দিয়া গেল, যাহার ফলে পিতার বিপুল বিত্ত ও অসীম স্নেহ-করুণা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল। আপনভোলা বৈরাগী বিদ্রোহী বিপিনচন্দ্র আপন অন্তরাবেগে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে যাত্রা করিলেন।

তরুণ সংস্কারমুক্ত বিপিনচন্দ্র সে-সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক হিসাবে দেশ-বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী একান্ত নিষ্ঠার সহিত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন আমেরিকায় বক্তৃতাশেষে তাঁর জনৈক বন্ধু বলিলেন, "মিঃ পাল, তুমি যা কিছু বল সবই সত্য, সুন্দর—কিন্তু পরাধীন জাতির কথা স্বাধীন জাতি শুনিবে না"—কথাটা তাঁর যেন সত্তাকে স্পর্শ করিল। এই একটি মাত্র খোঁচাতে তাঁর বিদ্রোহী মনে আগুন জ্বালিয়া উঠিল। তিনি যেন বিধাতার নির্দ্দিষ্ট জীবন-মিশনের সন্ধান পাইলেন। প্রচারক-পদে ইস্তাফা দিয়া, ১৯০০ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া, "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামে এক ইংরাজী সপ্তাহিক তিনি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারই মারফতে তিনি নির্ভীকচিত্তে জাগরণীর সুর গাহিয়া চলিলেন।

১৯০৫ সনে বলদর্পী লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদনকারীদের সমঝাইয়া দিতে গিয়া, ভারত-সচিব লর্ড মর্লীর দাম্ভিক উক্তি 'Bengal Partition is a settled fact.' জাতীয় চিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই আঘাতে বাংলার সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিল। বিদ্রোহী মন যাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই অনুকূল অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া সে সময়ে শ্রীঅরবিন্দ, এ রসুল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমবেত হইলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সুরের ঝঙ্কার তুলিলেন—

"এবার তোর মরা গাঙ্গে বাণ এসেছে
জয়-মা বলে' ভাসা তরী—"

প্রথম যৌবনে সেই যে বিপিনচন্দ্র জোয়ারে গা ভাসাইলেন, তাহা তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অটল অমোঘ ছিল।

বাংলার সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হইয়া সেদিন দম্ভদর্পী লর্ড কার্জ্জনের settled factকে unsettled factএ পরিণত করিয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজও নির্জ্জনে রমনার শূন্যমাঠ হাহাকার করিতেছে। বঙ্গ-ভঙ্গের রাজধানী ঢাকার "রমনা" সহর বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণের গোড়ার অধ্যায় বুকে ধরিয়া আজও মহিমান্বিত। ভেতো বাঙ্গালীর সেঁতসেঁতে জমিতে লর্ড কার্জ্জন কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির করিয়াছিলেন। আর আজিকার ভারত-ভঙ্গের কল্পনা-জল্পনা যে কি বাহির করিবে, তাহা কে জানে?

একটা সুপ্তিতে শয়ান জাতিকে জাগাইবার যে দুইটি অস্ত্রের প্রয়োজন, বিধাতা তাহা দিয়া বিদ্রোহী বিপিন চন্দ্রকে সুসজ্জিত করিয়াই পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখনীতে ছিল যুক্তি ও মুক্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর কণ্ঠে ছিল বাক্‌বিভূতি, জাগরণের দুন্দুভি। সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি ডাক দিলেন, "ওঠ, জাগ, ভাব দেখ কি অবস্থায় আছ।" যত বড় জন-সমাগমই হউক না কেন, সভায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া শ্রোতার চিত্তপটে ভাবাবেগের তরঙ্গ তুলিতে বিপিন-চন্দ্রের মত এমন অসাধারণ শক্তি ভারতবর্ষে সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত বড় একটা দেখা যায় না। জাগরণ পর্ব্বে বিদ্রোহী বিপিনচন্দ্রের অধুনা বিস্মৃতপ্রায় এই অমর অবদান স্বরাজ্যসাধনার ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধান্তে সেনাপতির গুণাগুণের সত্যকার বিচার হইবে। ১৯০৫ সন হইতে যে মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা লইয়া তাঁহার সঙ্গে যে সব মতভেদ দেখা দিল, তাহার ফলে যে অবজ্ঞা-অনাদর শেষ জীবনে তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তেজস্বী স্বকীয় স্বতন্ত্র বুদ্ধির মালিন্য ঘটাইতে পারে নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিপিনচন্দ্র ছিলেন আগাগোড়া বিদ্রোহী। বিদ্রোহই ছিল তাঁহার স্বরূপ। এই বিদ্রোহী বীর বিপিনচন্দ্রের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিয়া ধন্য হই।

জাতীয় জীবন-প্রবাহ

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য এম. এ

জাতীয় জীবন বিশ্বজীবন-প্রবাহের একটী বিশিষ্ট রূপ। দেশ, কাল ও যুগপ্রভাবে জাতীয় জীবনে যে উত্থান ও পতন লক্ষিত হয়, তাহা সমুদ্র-বক্ষে লহরীর মত বিশ্বজীবনপ্রবাহের স্বতঃ স্পন্দিত রূপমাত্র। লহরীগুলি যেমন চিরন্তন স্রোতোধারার লীলাময় উচ্ছ্বাস, জাতীয় জীবন তেমনই বিশ্ব-জীবনপ্রবাহের রূপায়িত অভিব্যক্তি। মানবতার সহিত মানবের যে সম্বন্ধ বিশ্ব-জীবনের সহিত জাতীয় জীবনের সম্বন্ধও অনুরূপ। ঋতুপরিবর্ত্তনে সমুদ্রের যেমন রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, তেমনই বিভিন্ন কাল ও যুগধর্ম্মে জাতীয় জীবনও ভিন্নরূপী হইয়া থাকে। মৌলিক জীবনধারা কিন্তু ঐ চিরন্তন সাগর-স্রোতের মত একই রহিয়া যায়—কাল ও যুগধর্ম্মের প্রভাব তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তরঙ্গলীলায় তাহার যে বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাহ্যিক বিকারমাত্র, মৌলিক নহে। শীতাতুর শান্ত তরঙ্গগুলি বরষায় উত্তাল ও উন্মাদধর্ম্মী হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু পুনরায় শীতাগমে বরষার উন্মাদনা হারাইয়া সহজ স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয় সেই একই সাগর-বক্ষে। কাল ও যুগধর্ম্মে জাতীয় জীবনের বাহ্যিক রূপায়ণ বিচিত্র হইলেও, জাতীয় জীবনের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না—মৌলিক সত্তাকে তিলমাত্র প্রভাবন্বিত করিতে পারে না। ইহা চিরন্তনের।

যুগ-বৈশিষ্ট্যের মত জাতীয় আদর্শ কিন্তু জাতীয় জীবনে আকস্মিক সম্পদ্ নহে, ইহা জাতীয় জীবনের আত্মিক বা মৌলিক ধর্ম্ম। কারণ, জাতীয় আদর্শ জীবন-প্রবাহের সহিত জাতির আত্ম-বৈশিষ্ট্যে সমুদ্ভূত। পাহাড়-ঝরা স্রোতস্বতী যেমন আত্মিক গতিধর্ম্মে ধরার বক্ষে বহিয়া গিয়া আপন পথের সৃষ্টি করে, তেমনই জীবনস্রোতঃ আপন গতিভঙ্গীতে স্বীয় আদর্শ গড়িয়া লয়। আদর্শ তাই জাতির জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতঃ, আকস্মিক নহে। অতএব স্বেচ্ছায় ইহাকে ত্যাগ বা গ্রহণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আদর্শ যখন জাতীয় জীবনবিকাশের সহিত আত্মিক ধর্ম্মে সমুদ্ভূত ও পরিপুষ্ট তখন তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সম্ভাবনা নাই এইজন্য যে, জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় আদর্শের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। তবে ইহা সম্ভব যে, জাতি স্বীয় আদর্শের হদিস না পাইয়া বিশ্ব জগতে যাহা কিছু যখন ভাল বলিয়া মনে করে, তাহাকেই আত্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে আত্মীয়তার আস্বাদ না পাইয়া, আত্মিক ধর্ম্মের স্বরূপ না দেখিতে পাইয়া, চলার পথে একের পর এক বিজাতীয় আদর্শ সকল গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারে। একটা চলমান জাতির পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

সত্যকার জাতীয়তা জাতির আত্মধর্ম্মে সমুদ্ভূত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বহু প্রাচীন জাতি আদর্শহীন হইয়া, আত্মবৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়া কালপ্রবাহে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারই বা কারণ কি? জাতীয় জীবনে উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনায় জাতির আদর্শচ্যুত হইবার এবং মৃত্যুর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জাতীয় জীবনে যখন যৌবনের জোয়ার আসে, যখন তাহার যৌবনধর্ম্ম প্রাণ-চাঞ্চল্যে সুবিকশিত হয়, আদর্শ তখন সেই যৌবন-তরঙ্গের শীর্ষস্থানে জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া লয়। সেই অত্যুচ্চ সীমারেখায় আদর্শ তাহার আপন স্থানটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শক্তির প্রেরণা যোগায়। জাতীয় জীবন-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সহিত আদর্শও সুপরিস্ফুট হয়, কিন্তু ভাটার টানে জাতীয় জীবন ক্ষীণপ্রবাহ হইলে, শক্তি-হীনতায় জাতি তাহার পরম শ্রেয়ের সন্ধান হারাইয়া ফেলে। জাতি স্বভাবধর্ম্মে আদর্শচ্যুত হয় না, কিন্তু অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য কিংবা বার্দ্ধক্যবশতঃ সনাতন আদর্শের আহ্বান শুনিয়াও অক্ষমতায় আর আগাইতে পারে না। এই জীবনী-শক্তিহীনতাকেই আমরা নামান্তর করিয়া আদর্শহীনতার আখ্যা দিয়া থাকি। আত্মিকধর্ম্মে জাতি কখনও আদর্শচ্যুত হইতেই পারে না, যেহেতু তাহা হইলে জাতীয়তার সংহত বন্ধনই লোপ পায়। জাতির তথাকথিত আদর্শহীনতা জীবন-দৌর্ব্বল্য কিংবা বার্দ্ধক্যের লক্ষণ মাত্র বলা চলে।

অতএব আদর্শকে জাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতির জীবনে আবার নবীন জোয়ারের বান বহাইতে হইবে। জাতির জীবনে নবীন জীবনসঞ্চারের সহিত আবার আত্মিক আদর্শপ্রাপ্তির প্রেরণাও তাহার সহজভাবেই আসিয়া থাকে—সে তাহার জীবনসর্ব্বস্বকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আবার অভিসারে ছুটিয়া চলে। এই যাত্রাপথে গ্রহণ ও বর্জ্জনের স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াই গতিশীলা নদীর মত তাহাকে চলিতে হয়। বর্ত্তমানে আমরা জাতীয় জীবনে এই নবীন উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। জাগ্রত জাতি এই গ্রহণ ও বর্জ্জন-পন্থা অবলম্বন করিয়া আজ নাজিজ্‌ম্‌ কাল ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বা বলশেভিজ্‌ম্‌, কখনও বা ডিমোক্র্যাসী, কখনও বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করিয়া এবং বিস্বাদে একের পর এক সকলকেই ত্যাগ করিয়া—দ্রুত স্বকীয় আত্মিক আদর্শের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই চলাটা আবর্ত্তনময় হইলেও, জীবনেরই লক্ষণ। গতির পথেই ভাঙ্গা-গড়া সম্ভব হয়। শুধু মরা-নদীরই কূল ভাঙ্গিবার ক্ষমতা থাকে না। তাই ভাঙ্গনের নেশার মধ্যে আজও এই জাতির প্রাণে আমরা নবীন যৌবনের আবির্ভাব দেখিতে পাই।

জীবনের চলস্রোতে যেদিন ভাটার টান আসিয়াছিল, এ জাতি সেদিন হীনবল ও তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুদীর্ঘ অবসাদের পর বিংশ শতাব্দীর প্রথমপ্রভাতে আবার যখন সে জাগরণচঞ্চল দৃষ্টিপাত করিল, তখন সবিস্ময়ে সে দেখিল, পশ্চিমা সভ্যতার সূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে উদ্ভাসিত। তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। উদ্‌ভ্রান্ত জাতি, বিকৃত বিহ্বল দৃষ্টিতে সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পাইল, তাহাকেই চির সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। সে দেখিল, পশ্চিম আজ বিজ্ঞানধর্ম্মে প্রবুদ্ধ ও দীক্ষিত। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং যুক্তিজালে যাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, তাহার অস্তিত্ব সেখানে অস্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুগের (Age of reasoning and science) এই বাস্তববাদিতাকে (Materialism) উদীয়মান ভারত জাতি একান্ত বিস্ময়ে গ্রহণ করিতে ছুটিল। নির্ব্বিচারে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের ও বস্তুতন্ত্রমতের সিদ্ধান্তগুলি অসহায়ের মত অন্ধভাবে সে মানিয়া লইল, কিন্তু গতির সমতাল শৃঙ্খলিত এ জাতি রক্ষা করিতে পারিল না। ব্যর্থ অনুকরণে সে এক পরকীয় গতি পাইল বটে, কিন্তু গন্তব্য ঠিক হইল না। শুধু একটা চলার নেশায় লক্ষ্যহীন পথ বাহিয়া সে দীর্ঘকাল আগাইয়া চলিল।

কিন্তু অবিরাম ও লক্ষ্যহীন গতিধর্ম্মে স্বভাবতঃ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ চলার পথে যখন শৈত্যের সংস্রবে আসে, বিতৃষ্ণা ও বিক্ষোভে ব্যত্যার সৃষ্টি করিয়া সে যেমন প্রভঞ্জনের রূপ ধারণ করে, তেমনই এই লক্ষ্যহীন চলার ক্লান্তিতে ও বিতৃষ্ণায় এ জাতি আজ স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সকল বিজাতীয় মত ও পথ সংশয়ের চক্ষে সে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বীয় গন্তব্য পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত সে হইয়াছে। আবার আত্মশক্তির স্বভাবধর্ম্মে অস্বাভাবিকতা জাতীয় দেহ হইতে আপনাআপনিই খসিয়া যাইতেছে।

অশীতিপর কবিগুরুর ভাষায় বলি, "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ্‌ এবং এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সেই বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেল। আজ আশা করে' আছি পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে।" ক্ষীণ জীবনীশক্তিতে দৃষ্টিহীন হইয়া সত্যের যে স্বরূপ আমরা দেখিতে না পাই, স্বাধিকার ও বিচারধর্ম্ম হারাইয়া ফেলি, কালের অনিরুদ্ধ গতিতে ধর্ম্মের সে গ্লানি অপসারিত হইয়া চির সত্য-সুন্দরের স্নিগ্ধ ও শান্তমূর্ত্তি স্বাভাবিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। রবীন্দ্রনাথের ঐ বাণীতে জাতির মর্ম্মবীণার সুর অতি স্পষ্ট ও সুমধুররূপে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। অনুকরণব্রতী জাতি দীর্ঘকালের ছুটাছুটিতে ও অপ্রাপ্তিতে আজ ক্লান্ত। বীতশ্রদ্ধায় তাহার জীবন ক্ষুব্ধ। সে তাই ফিরিয়া চাহিতেছে নিজ পথের অনুসন্ধানে—বিচার করিতে বসিয়াছে তাহার স্বাধিকার, আত্মবৈশিষ্ট্য, তাহার ধর্ম্ম ও আদর্শ। অনুকরণপন্থাকে অস্তাচলে বিদায় দিয়া জাতি পূর্ব্বের উদয়াচলে নব রবিকরে নূতন মন্ত্রের ও সৃষ্টির রেখা দেখিবার জন্য পুনঃ আজ ফিরিয়া চাহিতেছে। বর্ত্তমানের জাতীয় জীবন-সঙ্কটে ইহাই আশার কথা।

ব্যক্তিগত বর্ষফল : ১৩৪৯

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিষসিদ্ধান্তাচার্য্য

আমরা ইহা আশা করি যে, বাঙালী মাত্রেই তাঁর নিজ নিজ রাশি কি, তাহা জানেন, অন্ততঃ জানা উচিত। শুভাশুভ গ্রহের যোগাযোগ জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা একটু সজাগ হইয়া অনুধাবন করিলেই প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারেন। পারিলে মানুষ পূর্ব্বাহ্নেই অনেকখানি সাবধান হইতে পারেন এবং বর্ত্তমান দুর্য্যোগের দিনে বিহ্বলতার দরুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার হাত হইতেও কিছুটা রক্ষা পাইতে পারেন। জীবনের সঠিক বর্ষ, মাস বা দিন-ফল জানা সমগ্র গ্রহচক্রের বিচার দ্বারাই সম্ভব। তবুও "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক-পাঠিকার জন্য কেবলমাত্র রাশি-ফলই এখানে প্রদত্ত হইল।

মেষ—এ বৎসর আপনার পক্ষে গত বৎসর অপেক্ষাও অশুভ। কারণ পেটের পীড়া বা যে কোন স্থায়ী ব্যাধিও ঘটিতে পারে। অর্থের সঞ্চয় করা আপনার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে। মাতা, পিতা এবং ভ্রাতাদির কিম্বা আত্মীয় ও বন্ধুর বিচ্ছেদ বা বিয়োগ হইতে পারে। সন্তানের পুনঃ পুনঃ পীড়া ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলতার জন্য অশান্তি অনুভব হইবে। কোন বিশিষ্ট আত্মীয় বা বন্ধু প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিবে। যদি লেখাপড়া ও পরীক্ষাদি বিষয়ে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা সফল হইবে। কিন্তু ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রবাস বা ভ্রমণ দেখা যায়। যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভূমিকম্প ঝটিকা ও প্লাবনাদি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কিম্বা মহামারী হইতে আশঙ্কা আছে; এবং সঞ্চিত অর্থ, গৃহ বা দ্রব্যাদির হানি হওয়া সম্ভব। ঋণ করিয়া ব্যয় করাকেও সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানেও বাধা ঘটিবে। যদি আপনি ব্যবসা করিতে থাকেন, তাহা হইলে উহাতেও বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং নূতন করিয়া করিবার সুযোগও হইবে না। যদি চাকুরী করিতে থাকেন, তাহা হইলেও উহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিবে অথচ বেতনবৃদ্ধি দেখা যায় না। যশঃ, সম্মান ও আত্মশক্তির কিছু খর্ব্বতা হইতে পারে। নিজের ভুলও কাজের বিশৃঙ্খলতা জন্য অনুতাপ আসিতে পারে। জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্ত্তিক ও মাঘ মাস মঙ্গলজনক নহে।

বৃষ—গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর আপনার পক্ষে ভালই বলা যায়। কারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই যাইবে এবং ধনের সঞ্চয় করিতে পারিবেন। মাতার পীড়া বা বিয়োগ, বন্ধু-বিচ্ছেদ এবং প্রবাস ঘটিবে। মধ্যে মধ্যে পারিবারিক অশান্তিও দেখা যায়। কিন্তু সন্তান-লাভ কিম্বা সন্তানের লেখাপড়া ও পরীক্ষাদি বিষয়ে সুফল হইবে এবং সম্ভবস্থলে বিবাহ হইতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য খুব ভাল যাইবে না। পত্নীর জরায়ু বা উদরসংক্রান্ত পীড়া ও বায়ুপিত্তাধিক্য পীড়ার আশঙ্কা আছে। শত্রু দ্বারা বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই এবং যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কিম্বা মহামারী প্রভৃতি হইতে আশঙ্কার কারণ দেখা যায় না। পূর্ব্বকৃত ঋণ থাকিলে, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণও পরিশোধ হইবে। যদি আপনি নূতন কোন কাজ আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অন্যের সহযোগিতা পাইবেন। যদি ব্যবসা করিতে থাকেন, তাহাতে বর্ত্তমানে কিছু বাধা ঘটিবে, পরে উহা সামলাইয়া লইতে পারিবেন। লটারী, স্পেকুলেশন, ফটকা বা নূতন ব্যবসাদি নানা উপায়ের মধ্যে যে কোন দিক দিয়া অকস্মাৎ অর্থলাভের যোগ আছে। আয়ের নির্দ্দিষ্টতা না থাকিলেও, থোক্ টাকা পাইবার আশা আছে। কর্ম্মস্থলের পরিবর্ত্তন এবং কোন বন্ধু বা স্থানীয়জন হইতে আর্থিক ও মানসিক সুখ পাইবেন। যদি আপনি নট, অধ্যাপক কিম্বা চিকিৎসক হন, তাহা হইলে অর্থ, যশঃ ও সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। আপনার পক্ষে আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস মঙ্গলসূচক হইবে।

মিথুন—গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর আপনার পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভ হইলেও আর্থিক ফল ভাল নহে। স্বাস্থ্য মধ্যম এবং মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠ কাঠিন্যতা ও বায়ুপিত্তাধিক্য পীড়া ঘটিবে। সঞ্চিত অর্থও ব্যয় হইবে; কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। "কি করিব" "কি হইবে" ইত্যাদি রূপ আশঙ্কা প্রায়ই থাকিবে এবং কোন কাজেই নিঃসন্দেহ ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না। ভ্রাতার সহিত মনো-মালিন্য বা ভ্রাতৃ-পীড়ার সম্ভাবনা আছে। বন্ধু দ্বারা উপকারের আশা আছে; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পীড়া, বিচ্ছেদ বা বিয়োগও হইতে পারে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রতারিত হইতে পারেন। সন্তান-স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল। সন্তানলাভ কিম্বা সন্তানের বিদ্যাদি বিষয়ে উন্নতি দেখা যায়। পরীক্ষাদি বিষয়ে তাদৃশ ফল হইবে না। হঠাৎ ক্রোধের সঞ্চারহেতু ক্ষতি হইতে পারে। মনে ধর্ম্মভাব থাকিলেও, কার্য্যতঃ বাধা ঘটিবে। কোন অকরণীয় কর্ম্ম করার জন্য অপবাদ পাইতে পারেন। পত্নীস্থান অপেক্ষাকৃত ভাল বটে; কিন্তু পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাইবে না। কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য হইবে এবং শত্রুরা গুপ্তভাবে ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু শেষে অকৃত-কার্য্য হইবে। কর্ম্মস্থানে গোলমাল হেতু মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইবে। যদি আপনি ব্যবসা করিতে থাকেন, তাহা হইলে গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বাধা ঘটিবে; কিন্তু আশ্বিন হইতে কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ দেখা যায়। দেশের রাজনৈতিক কর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারেন। প্রবাস, ভ্রমণ বা অর্থব্যয় এবং ঝটিকা, ভূমিকম্প, প্লাবন ও মহামারী প্রভৃতি আগন্তুক বিপদেরও আশঙ্কা করা যায়। কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবেন। বৎসরের প্রথমার্দ্ধ আপনার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

কর্কট—আপনার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই যাইবে। সামান্য দেহপীড়া ঘটিলেও, কোন মারাত্মক পীড়ার সম্ভাবনা নাই। অর্থসঞ্চয় করিতে পারিবেন; স্নেহ হইতে অর্থলাভ হইবে। ভ্রাতৃ-স্থান

মন্দ নহে এবং নিজের পরাক্রম, যশঃ ও সম্মানাদি বৃদ্ধি পাইবে। গৃহ কিম্বা বন্ধু বৃদ্ধি দেখা যায়। কিছু দিনের জন্য স্থানান্তর গমনাগমন ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে। সন্তানলাভ বা সন্তানাদির বিবাহ ও কুটুম্ববৃদ্ধি হইতে পারে। শত্রুরা পদে পদে বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিলেও, অকৃত-কার্য্য হইবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মন্দ যাইবে না। বিবাদে কিম্বা রাজদ্বারে জয়ের আশা আছে। মহামারী কিম্বা ঝটিকাদি আকস্মিক বিপদ্ উপস্থিত হইলেও, তাহা হইতে রক্ষা পাইবেন। অকস্মাৎ অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। যদি আপনি চাকুরী করিতে থাকেন, তাহা হইলে আপনার পদোন্নতি হওয়া স্বাভাবিক এবং ব্যবসা করিতে থাকিলে, পূর্বকৃত ব্যবসার সহিত বর্ত্তমান সময়োপযোগী কোন ব্যবসার-সংশ্লিষ্ট হইতে পারে; কিম্বা নূতন করিয়াও ব্যবসা করিতে পারেন। যদি রঙ্গভূম্যাভিনয় কিম্বা আইনব্যবসায়ী হন, তাহা হইলেও ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন। চিকিৎসক হইলে, যথেষ্ট অর্থোপার্জন হইবে। আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ভিন্ন অপর মাসগুলি মঙ্গলপ্রদ।

সিংহ—দৈহিক অবস্থা সর্বতোভাবে শুভ না হইলেও, নিতান্ত অশুভ হইবে না। আপনি যদি ব্যবসাদার হন, তাহা হইলে আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে। কিন্তু যদি চাকুরীজীবী হন, তবে কর্মস্থলে শত্রুবৃদ্ধি হইবে এবং চাকুরীতে বাধা উপস্থিত হইতে পারে। আর যদি চিকিৎসক হন, তবে অর্থোপার্জন একবারে মন্দ হইবে না। যদি নট বা নটিকা হন, তবে আপনার কার্য্যে সুফললাভের আশা আছে। কোন কারণে ব্যয়বৃদ্ধি জন্য ঋণের সম্ভাবনাও আছে। সম্ভবস্থলে সন্তানলাভ বা পুত্র-কন্যার বিবাহ হইতে পারে। পরীক্ষাদি বিষয়ে তাদৃশ ফল দেখা যায় না। গুরুজনের পীড়া বা বিয়োগও হইতে পারে। বিশেষতঃ পিতার দিক্ দিয়া এবৎসর অশুভ দেখা যায়। পত্নী-বিষয়ক ফল গত বৎসর অপেক্ষা ভাল। দেশের রাজনৈতিক কর্মে আংশিক লিপ্ত থাকিবেন। কিছু সময়ের জন্য স্থানান্তর দেখা যায়। সাময়িকভাবে বন্ধু-বিচ্ছেদও হইতে পারে। আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে। জলপথে ভ্রমণ নিরাপদ্ নহে। নূতন মিত্র বা বন্ধুর সমাগম হইবে এবং কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিলে সফল হইবে। ধর্মার্থে ব্যয় এবং দেবতীর্থাদি দর্শনের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু নিজের ভুলের জন্য ক্ষতি ও অনুতাপ ঘটিবে। আপনার পক্ষে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস বিশেষ ভাল নহে।

কন্যা—এ বৎসর আপনার দৈহিক অবস্থা ভাল, কিন্তু মানসিক অশান্তি, বন্ধু-বিচ্ছেদ বা কলহ প্রভৃতি ঘটিবে। কোন না কোন কারণে মনে প্রায় শঙ্কা ও সন্দেহ জাগিবে। আর্থিক সুবিধা থাকিবে। আপনি যদি চাকুরীজীবী হন, তবে উচ্চস্থ বা অধস্তন কর্মচারীরা শত্রুভাবাপন্ন হইবে। শত্রু প্রবল থাকিলেও তদনুপাতে ক্ষতির পরিমাণ অল্পই হইবে। যদি ব্যবসাদার হন, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে। মাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির পীড়া বা জীবনাশঙ্কা ঘটিবে। অর্থের অযথা ব্যয় দেখা যায়। বাত কিম্বা শরীরের বাম ভাগে আঘাত প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। আত্মীয়ের পীড়া বা বিয়োগ জন্য শোক পাইতে পারেন। শ্বশুরকুল হইতে উপকৃত হইবেন, বহু লোকের আধিপত্যবিস্তার ও সম্মানবৃদ্ধি যোগ আছে। পুত্রের উন্নতি দেখা যায়। বিশিষ্ট সাহায্যকারীর সহিত অসদ্ভাব ঘটিবে। চিকিৎসক হইলে, বিশেষ সুবিধা দেখা যায় না। কিন্তু যদি নট হন, তবে আপনার প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ হইবে। ধর্মস্থান শুভ। স্থানান্তর গমনাগমনের যোগও আছে। আকস্মিক বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিবার যোগ দেখা যায়। পত্নীর স্বাস্থ্য প্রায় ভালই যাইবে এবং পীড়িত থাকিলে আরোগ্যলাভ করিবেন। জনসাধারণের সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে আসিবার সম্ভাবনা আছে। আপনার পক্ষে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস শুভজনক নহে।

তুলা—এবৎসরও আপনার পক্ষে বিশেষ শুভ নহে। কারণ উদরপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা কিম্বা বাত রোগের সম্ভাবনা আছে। প্রায় বিষয়ে অতৃপ্তি জন্য মনে আনন্দ বা শান্তি অনুভব করিতে পারিবেন না। কোন বিষয়ে চেষ্টা করিলে তাহাতে বাধা বা অকৃতকার্য্যতার ভাব দেখা যাইবে। সাংসারিক অশান্তি, প্রবাস, মাতা বা পুত্রের পীড়াদি জন্য অর্থব্যয় হইবে। লেখাপড়া ও পরীক্ষাদি বিষয়ে আশানুরূপ ফল হইবে না। কিন্তু ভ্রাতৃলাভ অথবা ভ্রাতার উন্নতি ও বিবাহযোগ দেখা যায়। শত্রুবৃদ্ধি হইবে এবং যশঃ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি দেখা যায় না। ঋণবৃদ্ধি এবং মামলামোকদ্দমা বা বিবাদ ঘটিতে পারে। কোন মহিলা হইতে ক্ষতিযোগ দেখা যায়, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হওয়া কিম্বা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বাস করা সম্ভব হইবে। ভূমিকম্প, ঝটিকা, প্লাবন বা মহামারী হইতেও আশঙ্কার কারণ আছে। বন্ধুস্থান ভাল নহে এবং শ্বশুরবাটীর দিক্ হইতেও শুভ দেখা যায় না। রাজকুল হইতে ক্ষতি হইতে পারে। আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা আশানুরূপ ব্যবহার পাইবেন না, আয়-ব্যয় এবং কর্ম বিষয়ে স্থিরতা দেখা যায় না। কাহারও নিকট পাওনা থাকিলে, তাহা সহজে আদায় হইবে না। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে। নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ আসিতে পারে। আপনার পক্ষে জ্যৈষ্ঠ, কার্ত্তিক, পৌষ ও মাঘ শুভসূচক নহে।

বৃশ্চিক—গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আপনার পক্ষে অশুভ। কারণ দৈহিক অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। উদর ও দন্ত-পীড়া বা বাত রোগ হইতে পারে। সঞ্চিত অর্থে বিঘ্ন, ভ্রাতার বা নিকটতম ব্যক্তির পীড়া বা বিয়োগ কিম্বা মনোমালিন্য ঘটিবে। আর্থিক অবস্থা তাদৃশ ভাল যাইবে না এবং নিজের কার্য্য-ব্যাপারে শঙ্কা ঘটিবে। মাতা বা পিতার পীড়া কিম্বা উভয়ের মধ্যে কাহারও বিয়োগ হইতে পারে। পুত্রাদি সম্বন্ধেও অশুভ দেখা যায়। লেখাপড়া ও পরীক্ষা বিষয়ে তাদৃশ সুফল হইবে না।

শত্রু দ্বারা পীড়িত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, পত্নীর জন্য উদ্বেগ ঘটিবে। ঋণযোগও দেখা যায়। আপনি যদি ব্যবসাদার হন, তাহা হইলে এ বৎসর ক্ষতির আশঙ্কা আছে; কিন্তু যদি চাকুরীজীবী হন, তবে আপনার পক্ষে যথেষ্ট ভাল বলা যায়। পতন বা আকস্মিক আঘাতাদিও ঘটিতে পারে। ব্যয়ের মাত্রা অধিক হেতু সময়ে সময়ে অর্থাভাব পরিলক্ষিত হইবে। বন্ধু দ্বারা কোনরূপ আর্থিক সুবিধা বা সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। রাজকোপেরও সম্ভাবনা আছে। গৃহ বা দ্রব্যাদির ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নহে। যুদ্ধসম্বন্ধীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারেন এবং প্রবাস-বাস সম্ভব। কুটুম্ব বা বন্ধুর সহিত বিরোধ দেখা যায়। নিজের ভুলের জন্য ক্ষতি বা অনুতাপ আসিতে পারে। আপনার পক্ষে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাস শুভপ্রদ নহে।

ধনু—আপনার গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শুভ দেখা যায়। কারণ দৈহিক অবস্থা ভাল এবং সময়ে সময়ে মনের অশান্তি হইলেও, মোটের উপর ভাল বলা চলে। অর্থবৃদ্ধি, মনের উৎকর্ষতা, নিজের আধিপত্যবিস্তার, কর্মস্থলে উন্নতি এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব ঘটিবে। ভ্রাতৃস্থান ভালই থাকিবে। মাতাপিতার পক্ষেও শুভ ফল দেখা যায়। শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করিবে। পরীক্ষাদিতে কৃতকার্য্য হইবেন। আপনি যদি চিকিৎসক, অধ্যাপক বা ব্যবসাদার হন, তাহা হইলে আপনার সুনামের আশা আছে! রঙ্গভূম্যাভিনয়ে আপনি বেশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন। যদি আপনি বিবাহিত না হন, তবে এ বৎসর বিবাহের সম্ভাবনা এবং পুত্রলাভযোগ দেখা যায়। কিন্তু পুত্রের পীড়াযোগও আছে। ধর্ম কার্য্যে মন থাকিবে ও সম্মানবৃদ্ধি হইবে। বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য ঘটিতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যাপারে কিম্বা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও মহামারী হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। ব্যয় যথেষ্ট হইলেও, আয়বৃদ্ধি হইবে; এই জন্য অর্থাভাব পরিলক্ষিত হয় না। ম্লেচ্ছসংসর্গে ভাগ্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ বা স্থানান্তরগমনাগমনের যোগ দেখা যায়! অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস ব্যতিরেকে অপর মাসগুলি প্রায়ই শুভজনক।

মকর—এ বৎসর আপনার দৈহিক অবস্থা মধ্যম। কারণ সময়ে সময়ে পেটে বায়ুর প্রাবল্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিবে। মানসিক অবস্থাও বেশ ভাল যাইবে না। ভ্রাতাদির পীড়া ঘটিবে। অর্থাগমে বাধা থাকিলেও, মোটামুটি চলিয়া যাইবে। কর্মস্থান প্রায় একরূপই থাকিবে। যদি আপনি নট হন, তাহা হইলে আপনার কৃতিত্ব ও যশঃ মন্দ হইবে না। গবেষণা বা লেখা আপনার পক্ষে শুভজনক হইবে। আইন-ব্যবসায়ী হইলে বিশেষ অশুভ হইবে না। কিন্তু ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্যে আশানুরূপ ফল হইবে না, বরং ক্ষতিও হইতে পারে। মাতাপিতা ও বন্ধুস্থান প্রায় একরূপ হইলেও, পিতা বা তৎস্থানীয় গুরুজনের সহিত সাংসারিক বিষয় লইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ আলাপ আলোচনা হইবে। স্ত্রীপুত্র হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারেন। গৃহাদিহানির আশঙ্কা দেখা যায় না। গুপ্ত শত্রু হইবে এবং তাহারা পরাজিতও হইবে। দূরস্থানীয় আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুজনিত শোক পাইতে পারেন। আত্মসম্মান সম্বন্ধে বেশী সচেতন থাকিবেন। বৎসরের প্রথমার্দ্ধ শুভ নহে।

কুম্ভ—শারীরিক অবস্থা মন্দ যাইবে না। মধ্যে মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা ঘটিলেও মোটের উপর স্বাস্থ্য ভালই যাইবে। ব্যয়াধিক্য ঘটিলেও, অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন। নানা প্রকারে অর্থ কিম্বা সম্পত্তি-লাভের আশা করা যায়। ঘোড়দৌড়, লটারী, ফটকা প্রভৃতি উপায়ে অকস্মাৎ বাঞ্ছিত অর্থলাভের আশা আছে। ভ্রাতাদি স্বাস্থ্য তাদৃশ ভাল যাইবে না। দাম্পত্যকলহ বা পীড়া কিম্বা পরস্পর পৃথক্‌ভাবে থাকার সম্ভাবনা আছে। সাংসারিক অশান্তি ও স্থানান্তর গমনা-গমনের যোগও দেখা যায়। নিকট আত্মীয়েরা শত্রুতাচরণ করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত বিফলমনোরথ হইবে। লেখাপড়া, প্রবন্ধপ্রকাশ কিম্বা পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সফলমনোরথ হইবেন। আপনার বিবাহ না হইয়া থাকিলে, এ বৎসর হইতে পারে। সম্ভব হইলে সন্তানলাভ, পুত্রকন্যার বিবাহ ও পুত্রের বিদ্যাদি বিষয়ে উন্নতি ঘটিবে। পিতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির হঠাৎ কঠিন পীড়া হইতে পারে। আপনি যদি কবি, চিকিৎসক বা অধ্যাপক হন, তবে এ বৎসর আপনার ব্যক্তিত্বকে সহজে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন এবং যশঃ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে। অন্যের সাহায্য অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা অনেক বিষয়ে সফলকাম হইবেন। আপনার পক্ষে জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ও পৌষ মাস শুভজনক নহে; অবশিষ্ট মাস মঙ্গলসূচক হইবে।

মীন—গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আপনার পক্ষে শুভ। সামান্য দেহপীড়া ঘটিলেও, শারীরিক অবস্থা ভালই যাইবে। নানা প্রকারে অর্থাদি লাভ হইবে। কিন্তু পিতৃসম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল দেখা যায় না। পিতার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালই যাইবে। কোন জনসাধারণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে আসিবার সম্ভাবনা আছে। লিখাপড়া বা পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইবে। কিছু অর্থ অযথা ব্যয় হইবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালই দেখা যায় এবং পীড়িত থাকিলেও, আরোগ্য লাভ করিবেন। শত্রু দ্বারা ক্ষতির তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের সহিত বন্ধুত্ব ঘটিবে। সন্তানসুখ তাদৃশ দেখা যায় না। যদি আপনি ব্যবসা বা চাকুরী করিতে থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ খারাপ দেখা যায় না; ব্যবসায়ে কিছু বাধা ঘটিলেও, পরে সামলাইয়া লইতে পারিবেন। যদি চিকিৎসক হন, তাহা হইলে বৎসরের প্রথমার্দ্ধ তাদৃশ ভাল দেখা যায় না; কিন্তু শেষার্দ্ধে অর্থ ও সম্মানলাভ হইবে এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। শ্বশুরবাটীর সহিত ঘন ঘন গতায়াত দ্বারা ঘনিষ্ঠতা ঘটিবে। আপনার পক্ষে বৎসরের প্রথমার্দ্ধ শুভপ্রদ নহে।

তরুণের দীক্ষা

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। জাতির জীবনে নামিয়াছিল একটা অপার্থিব প্রেরণা। বাংলার কুলুনাদিনী ভাগীরথীর কূলে, চন্দননগরের এক প্রান্তে, এই জাগরণের প্রবাহ জাতীয় জীবনের রক্তমাখা রাজসিক আবর্ত্ত বিশোধিত করিয়া যে নবসৃষ্টির শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা ইতিহাসেরই উপকরণ। সেদিন বিধাতার অব্যর্থ ইচ্ছা একদল রাষ্ট্রবিপ্লবীর জীবনকে মোড় ফিরাইয়া অনলস গঠনকর্ম্মীতে পরিণত করিয়াছিল—রূপান্তরিত করিয়াছিল তাহাদের ধ্বংসকরী প্রবৃত্তি ও শক্তিকে স্থায়ী ও কল্যাণ-পূত সৃষ্টিবীর্য্যে। এই সৃষ্টিবীর্য্যই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রাণ। স্বদেশী ও অসহযোগ উভয় যুগের সর্ব্বহারা তরুণ মিলিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। নির্ম্মাণ বা সংগঠনই ইহাদের জীবনসাধনার বিশেষ লক্ষ্য। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিশেষত্ব—এই সংগঠনের সাধ্য ও সাধন। সঙ্ঘের এই সৃষ্টিবীর্য্যই তাহাকে জাতি-নির্ম্মাণের নূতন পথ-গ্রহণে অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

দেশকর্ম্মে, দেশের মুক্তি ও কল্যাণ-সাধনে খাঁটি মানুষের বড় অভাব প্রাণে ব্যথাই সৃষ্টি করে। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ পাওয়া যায় না। বড় প্রয়োজন—মানুষের। দেশের তরুণেরা কর্ম্মহারা ও মর্ম্মহারা। ভাব আছে, শক্তি নাই। প্রতিভা আছে, সুযোগ নাই। ত্যাগ আছে, সংযম নাই। স্লোগান আছে, সাধনা নাই। ইহা জীবন নহে। শিক্ষার পিছনেও নাই কৃষ্টির বীর্য্য। অসংখ্য তরুণের জীবন তাই স্রোতের শেওলার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। দুশ্চিন্তায়, অক্ষমতায় পীড়িত তাহারা—স্বস্থ, স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মশীল, এমন কি উপার্জ্জনক্ষম হওয়ারও সুযোগটুকু পাইতেছে না।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বীয় জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার অবদানে এই যুবকদের জীবনে সঠিক পথের নির্দ্দেশ দিতে আগ্রহশীল হইয়া নব শিল্পকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। যে শিক্ষা যোগায় মাথায় বিমল আলো, হৃদয়ে অপার্থিব পবিত্রতা, আর প্রাণে দেয় সৃজনের অফুরন্ত বীর্য্য ও সামর্থ্য, সেই শিক্ষাই ভারতের প্রকৃত জাতীয় ও জাতি-গঠনকরী শিক্ষা। ইহারই পূর্ণতা শীলনে, কৃষ্টিতে। এই কৃষ্টি শুধু নিজের জন্য নয়, স্বজনের জন্য নয়—ইহা জাতির সাধন। জাতি বাঁচিয়া থাকে তাহার অম্লান কৃষ্টি আশ্রয় করিয়াই। বিশ বৎসর ধরিয়া একটী ক্ষুদ্র সমষ্টির জীবনে এই জাতীয় ও জাতিগঠনকরী শিক্ষা ও কৃষ্টি অনুশীলিত, পরীক্ষিত ও কার্য্যক্ষেত্রে সত্য-সত্যই সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, নিখিল বঙ্গীয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে পরম শ্রদ্ধাভাজন সঙ্ঘ-গুরু ও সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহোদয়ের উৎসাহে ও নির্দ্দেশক্রমে সঙ্ঘের পরীক্ষাসিদ্ধ এই শিক্ষার আদর্শ ও বিধান ধারাবাহিক ভাবে জাতীয় জীবনে প্রবর্ত্তন করার জন্য একটী উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের পরিকল্পনা প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পর দেশের তরুণদের জীবনে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও অমোঘ ধর্ম্মবীর্য্য সঞ্চার করিয়া, তাহাদের যথার্থ মানুষ ও স্বাবলম্বন-পরায়ণ দেশকর্ম্মীরূপে শিক্ষিত করার জন্য সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর-বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ এই ভাবেই "প্রবর্ত্তক কলেজ অফ কাল্চারের" উৎপত্তি। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী, পুণ্য শ্রীপঞ্চমী তিথিতে দেবী ভারতীর পূজার দিনে, আন্তর্জ্জাতিক মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগের পৌরোহিত্যে বোড়াইচণ্ডীতলায় প্রবর্ত্তক আশ্রমে ইহার উদ্বোধনোৎসব সুসম্পন্ন হয়। ইহার প্রথম সেশন ছয়মাস কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যায়ের ১০টী ছাত্র লইয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

সঙ্ঘের এই নব শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও সাধনবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ আচার্য্যগণ অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। অর্থনীতি, ভূতত্ত্ব, বৃহত্তর ভারত প্রভৃতি বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের জন্যও তত্তৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকবৃন্দ কয়েকটী বক্তৃতা দিয়া সঙ্ঘের সাহায্য করেন। দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-মূলক এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ছাত্রদের জীবনগঠনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। এই পদ্ধতি—সঙ্ঘ-নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের নিয়ম-নীতি ও সদাচার। ধর্ম্মশক্তি উপলব্ধি করার এই অনুভবসিদ্ধ প্রকরণগুলি অভ্যাসকারী ছাত্রদের জীবনে

অমৃতময় প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তৎসঙ্গে কর্ম্মজীবনে স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণাও ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রদান করা হয়। উক্ত ছয় মাস শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ হইলে, ডাঃ নাগেরই সভাপতিত্বে এই ছাত্রদের যথারীতি সমাবর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সাফল্যপত্র দেওয়া হয়। এই সকল ছাত্রই অতঃপর চারি মাস ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে জীবিকার্জ্জনমূলক কর্ম্মলাভের সুযোগ পাইয়াছে। প্রবর্ত্তক কলেজের প্রথম বার্ষিক শিক্ষানুষ্ঠানে এইভাবে শিক্ষার্থী তরুণগণ ভারতীয় ভাব ও আদর্শে শ্রদ্ধাশীল ও সংহতিনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে স্বাবলম্বী, কর্ম্মদক্ষ ও উপার্জ্জনক্ষম হওয়ারও শক্তি এবং ক্ষেত্র উভয়ই লাভ করিয়াছে।

অতঃপর, এই প্রথম সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যমটি অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন ও ১৯৪১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখেই ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেন্সালার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে কলেজের দ্বিতীয় সেশন আরম্ভ করা হয়। এবার শিক্ষাকাল ছয় মাস হইতে এক বৎসরে বিস্তৃত করা হয়। নবীন ছাত্রদের জন্য একটী নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া যাওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অন্তে অনেকগুলি প্রবেশেচ্ছু ছাত্র আমাদের কলেজে আবেদন করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করিতে পারে নাই। এই সেশনের ছাত্রসংখ্যা ৫ জন হইলেও, ইহাদের মধ্যে দুইজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এস-সি ও অবশিষ্ট ম্যাট্রিক পর্য্যায়ের। এই হেতু ইহাদের উপযোগী করিয়া শিক্ষণীয় পাঠ্যসূচীও একটু উচ্চতর করা হইয়াছে। এবারকার সেশনেও পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সঙ্ঘের প্রবীণ আচার্য্যগণই শিক্ষা ও প্রকরণের মধ্য দিয়া ছাত্রদের জীবন-গঠনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীকান্তিলাল চট্টোপাধ্যায় অর্থবিজ্ঞানে, অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় ভূতত্ত্বে, মনীষী শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে, চিত্রকলাবিশেষজ্ঞ শ্রীযামিনীকান্ত সেন চিত্রকলা সম্বন্ধে অধ্যাপনা বা বক্তৃতা করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগকে এই সুযোগে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সঙ্ঘের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ত্রিপ্রস্থানের সহিত পরিচয় করাইবার ব্যবস্থা করার জন্য শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘগুরুর বিশেষ নির্দ্দেশ আমরা পাইয়াছি। তাহারই সূচনাস্বরূপ প্রধান তিনখানি উপনিষৎ ও গীতার মর্ম্মগ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনের দুইটী পাদ বিশেষভাবে অধ্যাপনা করা হয়। মানবজীবনের ভিত্তি-স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যনীতির যুগোপযোগী সূত্র ও প্রকরণ সবিস্তার হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছাত্রগণ আত্মগঠনের যার পর নাই সহায়তা লাভ করে। সঙ্ঘের জীবননীতি ও সাধন-নীতির মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহারা ভারতের সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভার সহিত নিবিড়তর পরিচয়ের অধিকারী হয়। ভারতের সাধনা ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপর অভিনব আলোকপাত করিয়া উদীয়মান জাতির সম্মুখে সমুজ্জল ভবিষ্যতের কল্পচিত্র ফুটিয়া উঠে। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত খাদ্য যোগাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল তরুণের হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি যুগপৎ মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট করিয়া, একটা পূর্ণাঙ্গ মানব সাধনার আবাহনেই আমরা উদ্যুক্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগশিক্ষায় এই সকল দিক্ উপেক্ষিত হওয়ার ফলেই দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা পাইয়াও বাক্য ও লেখনী ছাড়া বাস্তবজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আর কোনও ভরসা ও শক্তিই খুঁজিয়া পায় না। প্রবর্ত্তক কলেজের ছাত্রগণ পূর্ণাঙ্গ জীবনানুশীলনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ও সেই স্বপ্নের জাগ্রত বিগ্রহস্বরূপ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ন্যায় স্বপ্রতিষ্ঠ সংস্থার সহিত নানাভাবে সংযুক্ত থাকিয়া, তাহারাও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার দুর্জ্জয় প্রেরণা ও দুর্ল্লভ সুযোগলাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া তাহারা একদিকে যেমন দুঃস্থ সংসার ও পারিবারিক জীবনের সহায়তাকল্পে উপার্জ্জনক্ষম হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছে ও করিবে, সেইরূপ অন্যদিকে তাহাদের অন্তরে দেশ ও জাতির সেবার যে পুণ্য আকাঙ্ক্ষা, তাহাও অনুকূল আব্‌হাওয়ায় প্রকৃষ্ট পথ পাইয়া, বিপুল আশার ক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত দেখিতেছে। এই উভয় দিক্ দিয়াই সৃষ্টিমূলক জাতীয় শিক্ষার বিধান প্রবর্ত্তক কলেজে সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন অতি ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সকল বৃহৎ সৃষ্টিই এইরূপ ক্ষুদ্র বীজকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ দিনের তপস্যায় বিপুল ও সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের পিছনে স্বপ্ন মহান্, আশা অনন্ত ও অপরিমেয়। দেশের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও বিচলিত না হইয়া, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ জাতিগঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিরচনায় স্থির চিত্তে অগ্রগামী হইয়াছে। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক; তার উপর যুগসুলভ ভাবভেদ ও কর্ম্মভেদ তাহাদের মনোরাজ্যেও গুরুতর বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে। ইহার উপর বর্ত্তমান সামরিক সঙ্কটময় পরিস্থিতি জটিলতর আকার ধারণ করায়, যে নৈরাশ্য ও অনির্দ্দেশ্যতার আব্‌হাওয়ায় উহা আজ জাতির যৌবনকে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা কোন মতেই অভিনন্দনীয় নহে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই অবস্থাতেই আত্মশক্তি উদ্যত করিয়া, তরুণ জাতির ভবিষ্যৎ সংগঠিত ও সুরক্ষিত করিতে চাহে। এই কলেজের মধ্য দিয়া তাই তাহার প্রয়াস—এক দল উন্মুখযৌবন তরুণের অনবদ্য জীবন বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ, আত্মোৎসর্গপরায়ণ অথচ কর্ম্মশিক্ষায় সুনিপুণ করিয়া গড়িয়া, দেশমাতৃকারই পূজায় অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করা। বাঙালী জাতিহিসাবে বাঁচিবার জন্য আজ তিনটী শ্রেয়োনীতি অবলম্বন করিয়া চলিবে—সুশিক্ষা, সংহতি ও স্বাবলম্বন। "প্রবর্ত্তক কলেজ অফ কাল্‌চার" এই ত্রি-সংগঠন নীতির অনুসরণে উদীয়মান তরুণ জাতির জীবন-গঠনে একান্ত যত্নশীল হইয়াছে। আমরা এই শুভ কর্ম্মে সকল দেশহিতকামী নারী-পুরুষেরই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করি।

প্রবর্ত্তক কলেজের দ্বিতীয় সেশনের ছাত্রদের মনে ও জীবনে তাহাদের এক বৎসরের শিক্ষা ও প্রকরণ-পালনের গুণে যে ছাপটুকু পড়িয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলেখ্য দিয়া অতঃপর এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তরুণের মন—তারই শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা।

মন চায় মনেরই স্পর্শ। প্রয়োজন—সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের আবিষ্কার ও সুপ্রতিষ্ঠাই শিক্ষা ও দীক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষ যদি মানুষের সহিত নয়, মানুষের মধ্য দিয়া চরম ও পরম ভাগবত তত্ত্বেরই সন্ধান পায়, সেই ভাগবত তত্ত্বের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধে যোগযুক্ত হইতে পারে, মানবজীবন সত্যই ইহাতে সফল ও কৃতার্থ হয়। যেখানে ইহা সম্ভব ও সিদ্ধ হয়, সেইখানেই ভারত-ভারতীর সত্য তীর্থ গড়িয়া উঠে।

শিক্ষা প্রস্তুতি মাত্র। ইহা নবজীবনের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে—ঐ পরিচয় ও সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই। মনের সহিত মনের, তথা পরম তত্ত্বের পরিচয় ও সম্বন্ধই এই নব জীবনের মূল সূত্র। মন চির চঞ্চল, উহা স্থির হয় তত্ত্বে। পরিচয়ে অনুরাগ-সৃষ্টি হয়। অনুরাগ ঘন হইয়াই প্রীতিময় সম্বন্ধের সেতুরচনা। প্রবর্ত্তকের উচ্চশিক্ষাতীর্থে এই শিক্ষার প্রেরণা ও ক্রমই সুষ্ঠুভাবে কার্য্য করিতেছে, ছাত্রদের নিম্নোক্ত আত্মাভিব্যক্তি তাহাই পরিস্ফুট করে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সঙ্ঘ-মন্ত্রের পুরশ্চরণব্রতে ব্রতী হইয়া এই পঞ্চ তরুণ হৃদয়ে যে অনুভূতি লাভ করে, সঙ্ঘগুরুর সমীপে প্রেরিত তাহারই মর্ম্মলিপিতে একজন ছাত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দত্ত লিখিতেছে—

"পুরশ্চরণের এই ছয় দিবস কি অপূর্ব্ব আনন্দে ও তৃপ্তিতে যে কাটিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না, তবে একটা অপার্থিব আনন্দে দেহ-মন আপ্লুত হইয়াছে। তখন মনে হইয়াছে—পৃথিবীর সমস্তই বুঝি আনন্দময়। সৃষ্টির মধ্যে হাসির ফোয়ারা ও প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। কোথাও এতটুকু মলিনতা নাই।… আশীর্ব্বাদ করুন—যেন সারা জীবন এই কর্ম্ম ও আনন্দের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে পারি।"

শ্রীললিতকুমার হালদারের কথা—

"খুব বেশী শারীরিক দুর্ব্বলতা নিয়াই পুরশ্চরণে ব্রতী হইয়াছিলাম। অবসন্ন শরীর-মন। মন্ত্রোচ্চারণে অক্ষমপ্রায় হইয়া উঠিয়াছি। তখন সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করিয়া মহাশক্তিকেই আবাহন করিয়াছি—মা, আর বুঝি সঙ্কল্প-রক্ষা হয় না! তখন অবসন্ন শরীর-মন যেন কি এক প্রেরণায় নূতন ভাবে চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ইহাতেই প্রত্যয় হয় যে, আমাদের পিছনে নিশ্চয়ই একটা অলক্ষ্য শক্তি কার্য্য করিতেছে। পুরশ্চরণের কয়দিন মনটা যেমন শান্ত ছিল, ঐভাবে যদি দিনগুলি কাটে, তবে জীবনের একটা বড় কাজই সুসম্পন্ন হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণদাস রায় লিখিয়াছে:—

"কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও পাইয়াছি প্রচুর আনন্দ।…সাঙ্গোপাসনায় নূতন অনুভূতি—বাহিরে উৎসবের জনকোলাহল, ভীষণ হট্টগোল আর

ভিতরে আমাদের কয়জনের মিলিত কণ্ঠে উপাসনার মন্ত্র সেই হট্টগোল ছাড়াইয়া উঠিয়াছে অনন্তের পানে অনন্ত ঝঙ্কার তুলিয়া। আমার তনুর প্রতি তন্ত্রীতে সেই মন্ত্রমুখরিত ধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠিয়া পুলকের শিহরণ আনিয়াছিল।......সঙ্ঘে আসিয়া আমি উপলব্ধি করিলাম—প্রত্যেকের মুখের পানে পানে তাকাইয়া যেন এরা আমার কত আপনার! কারও সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নাই, কিন্তু অনুভব করিলাম দেহে, মনে, প্রাণে আত্মীয়তার গভীর স্পর্শ—বুঝি নিজেরই অজ্ঞাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম।"

শ্রীমান্ জলধর সেনের হৃদয়ের অনুভূতি—

"বিভিন্ন মতবাদের খরস্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিলাম—কে আমার চোখে নব স্বপ্নের আলো তুলিয়া দিল! কাহার প্রেরণায় নব দৃষ্টি, নব জীবন লাভ করিলাম! কে আমায় ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের অমৃতময় সন্ধান দিল? আমার এই নবীন উপলব্ধি প্রকাশ করার মত সম্যক্ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি কিনা বলিতে পারি না, তবে সঙ্ঘ-জীবনের সহিত যে গভীরতম সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা যেন ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছি। আমার আকুতি ইষ্টশক্তিই পূর্ণ করুন।"

শ্রীউষাকান্ত রায়ের লিপি—

"ভাষাহীন কণ্ঠে মন্ত্রের সুর না জাগলেও, চক্ষের বিগলিত অশ্রু দিয়ে আজ নবীন সূর্য্য-রেখা টেনে পথ চলব বলে' বের হলাম। নবারুণের মাঝে ঐ যে তোমার সহাস্য মূর্ত্তি দেখা যায়—তোমায় আমার নমস্কার। দেব! এবার অন্তরের দিকে চেয়ে অন্তরের কথা জেনে নাও—তুমি যেখানে সর্ব্বজ্ঞাতা—আমি সেখানে কি প্রচার করতে পারি! আমি আজ মূক।

......পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোছনা ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। প্রসাদ নিয়ে বের হতেই শ্রীমন্দির-চূড়ে দেখি—পূর্ণিমার চাঁদ হাস্‌ছে আর তুমি ঈশারায় বল্‌ছ—'আলোর ভাসে চাঁদ—গলা রূপা ঝরে' প'ড়ে বিশ্বে।' স্বপ্নজগৎ—সুষুপ্তির সুপ্তদৃষ্টি—তখন আর বহু নাই। শুধু তুমি আর আমি—দীর্ঘ দিনের বিরহ, রাত্রির মিলনে সুখের অবধি নাই। জীবনের দান কুণ্ঠিত নয়—বেদনার অশ্রু তোমার বুকে ফেল্‌ব না। আমার হৃদয়ভরা অমৃতেই তোমায় অভিষিক্ত করতে চাই। প্রভু আর আমি—হ্যাঁ আমি, তোমারই পাগ্‌লা ছেলে উষা।"

তরুণদের নব মন্ত্রে দীক্ষা সার্থক হউক—এই প্রার্থনা!

ইউরোপের ভাবী রণাঙ্গন: ককেসাস্

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

অবিলম্বে ককেসাস্ অঞ্চলে জার্ম্মান আক্রমণ বিস্তারিত হইবে বলিয়া একটা আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনাও সুরু হইয়াছে। কার্চ্চের পতনের ফলে বর্ত্তমান জার্ম্মান সামরিক সংস্থান ও কৌশল যে পথ অবলম্বন করিতেছে তাহাতে এই আশঙ্কা অধিকতর সমর্থন লাভ করিবে। ককেসাসের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ছাড়াও অন্যান্য কারণে জার্ম্মান রাষ্ট্রনায়কের মনে ককেসাস্ অধিকারের স্বপ্ন বলবতী হইয়া উঠা স্বাভাবিক। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমল হইতেই জার্ম্মানী বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় রুশিয়ায় সমর-সম্ভার সরবরাহের যে প্রচেষ্টা মিত্র শক্তি করিতেছেন তাহা বাধা দিতে হইলেও জার্ম্মানীর ককেসাসের দিকে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। এই সব গুরুত্বের জন্য আমরা ককেসাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিতেছি।

বর্ত্তমানে যে অঞ্চলটি ককেসাস্ নামে পরিচিত, তাহা পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর এবং পূর্ব্বে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণে তুরস্ক এবং ইরাণ দেশ অবস্থিত এবং রষ্টভ-অফ-ডন হইতে আরম্ভ করিয়া কুমা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ইহার উত্তর সীমারেখা বিস্তৃত। ইহার মোট আয়তন ১৮০,০০০ বর্গ মাইল। আজার, বাইজান, জর্জ্জিয়া, আর্ম্মেনিয়া, দাঘেস্থান ও উত্তর ককেসাস্ অঞ্চল নামক কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টির নাম ককেসাস্।

উত্তর ককেসাস্ রুশিয়ার অন্যতম শস্য ভাণ্ডার। ইহা কুবান ও ষ্টাভরপোল নামক দুইটি এলাকায় বিভক্ত। ষ্টাভারপোল হইতে একটি রেলপথ দাঘেস্থানের মধ্য দিয়া কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরবর্ত্তী মাখাচকালা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইহার পর উহা কাস্পিয়ান সাগরের তীর ধরিয়া আজার-বাইজান রাষ্ট্রের রাজধানী বাকু পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বাকু সোভিয়েট-যুক্ত-রাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম

নগর। ইহার লোকসংখ্যা সাত লক্ষেরও বেশী। বাকু পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ তৈলখনি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত, ইহা একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও ব্যবসায় কেন্দ্র।

আজার-বাইজান রাষ্ট্র দক্ষিণদিকে পারস্য এবং পশ্চিম দিকে আর্ম্মেনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন মোট ৩৩ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষেরও অধিক। ইহাও একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। জর্জ্জিয়ার আয়তন ২৬৫০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা মোট ৩১১০০০০। জর্জ্জিয়াও শস্যপ্রধান দেশ, বহু প্রকারের বন্যজন্তুও এখানে দেখা যায়। জর্জ্জিয়ার রাজধানী টিফিলিস্ সুপ্রাচীন নগর। মোগল, পারশিক, তুর্কী প্রভৃতি নানা জাতি কর্ত্তৃক ইহা যুগে যুগে অধিকৃত হইয়াছিল। টিফিলিসের গীর্জ্জা বিখ্যাত। প্রকাশ ইহা অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। টিফিলিস হইতে বাকু, বাটুম, লেনিনাক্যান ও আর্ম্মেনীয়ার রাজধানী এরিভান পর্য্যন্ত কয়েকটি রেলপথ গিয়াছে।

আর্ম্মেনিয়ার আয়তন ১২ হাজার বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। আর্ম্মেনিয়া বিচিত্র খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানে স্বর্ণ, লৌহ, রূপা, তাম্র প্রভৃতি ধাতু ও কয়লা পাওয়া যায়। এই স্থানে তৈলেরও খনি আছে, কিন্তু এখনও ইহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলা যায় নাই। আর্ম্মেনিয়ার রাজধানী এরিভানের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার। ইহা একটি আধুনিক সহর।

ককেসাসের পর্ব্বতমালা উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে একটি প্রাচীর খাড়া করিয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম এশিয়ার সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে হইলে প্রত্যেক আক্রমণকারীকেই এই প্রাচীরের দ্বারপথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ককেসাসের মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই পর্ব্বতমালার এই বিশিষ্টতা দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ককেসাসের দুরারোহ পর্ব্বতমালা কৃষ্ণসাগরের তটভূমি হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রাচীনকালে এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া দুইটি পথ ছিল। প্রথম পথ ককেসাস্ পর্ব্বতমালার প্রায় মধ্যভাগ দিয়া বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মানচিত্রে Vladikankaz ও Tiflis-এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহা চিহ্নিত দেখা যাইবে। দ্বিতীয় পথটি ককেসাস্ পর্ব্বতের পূর্ব্ববর্ত্তী ঢালু পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই দুইটি পথ দিয়া প্রাচীন কালে বহু আক্রমনের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। এই জন্য সে যুগে এই দুইটি পথই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে আজ সব কিছু সম্ভব হইয়াছে। একদিন লৌহ ও প্রস্তরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া যে পথ দুইটিকে বন্ধ করা হইয়াছিল, আজ তাহাই রেলপথ পাতিবার প্রয়োজনে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমানে ককেসাসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাত্রীবাহী রেলওয়ে ট্রেন যথানিয়মে চলাচল করিতেছে। জারের আমলে ককেসাস্ অঞ্চল বিশেষভাবে অনাদৃত হইলেও সোভিয়েটের পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে এই স্থানটির ইদানীং যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আমেরিকা ও বৃটেন হইতে রুশিয়ায় যে সমরোপকরণ প্রেরিত হইতেছে তাহা পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর শাহপুর হইতে রেলপথে কাস্পিয়ান সাগরের তীরস্থ বন্দরশাহে প্রেরণ করা হইতেছে। তথা হইতে এই সমরসম্ভার ককেসাসের মধ্য দিয়া রেলপথে সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ককেসাসের গুরুত্ব এইখানে। বর্ত্তমানে কার্চ্চের পথ দিয়া জার্ম্মানী ককেসাসের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে এবং ক্রিমিয়ার সেবাস্তোপল নৌঘাঁটি দখল করিয়া কৃষ্ণ সাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক ইউরোপের পূর্ব্ব এবং এশিয়ার পশ্চিম দ্বার এই ককেসাসে পৌছিবার জন্য জার্ম্মানী মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে। শীঘ্রই ককেসাসের ভাগ্যে যে দারুণ ঝঞ্ঝা ঘনাইয়া উঠিবে তাহা যেন ক্রমশঃই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।
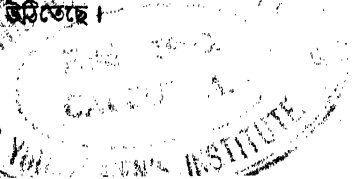
আশুতোষ স্মৃতি-বার্ষিকী :

বাঙ্গলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের মূর্ত্তপ্রতীক স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৫শে মে প্রাতঃকালে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর সংযোগস্থলে স্যার আশুতোষের সুবৃহৎ ধাতব মূর্ত্তির পাদদেশে এক মহতী স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়। বিচারপতি শ্রীযুত রূপেন্দ্রকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষের সুদীর্ঘ মূর্ত্তির পাদদেশে অগণিত শ্বেতপদ্মের সম্ভার শোভা পাইতেছিল এবং এই উপলক্ষে যে মণ্ডপসজ্জা করা হইয়াছিল তাহা সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অপরাহ্নে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পৌরোহিত্য করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী কর্ত্তৃক সুমধুর লীলাকীর্ত্তনান্তে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নবদ্বীপে পূর্ণিমা সম্মেলন :

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলনের সাহিত্যসেবিগণের উদ্যোগে একাদশ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুসাহিত্যিক শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের এই সংশয়পূর্ণ আব্‌হাওয়ায় সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যিক প্রেরণা জাতি-গঠনের প্রধান উপায়—এই মর্ম্মে সভায় একাধিক রচনা পঠিত হয়। সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক সভার কার্য্যবিবরণী পাঠের পর সভাপতি মহাশয় 'শশাঙ্ক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বহু সাহিত্যসেবীর উপস্থিতিতে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ভারতের সামরিক ব্যয় :

সম্প্রতি নিউ দিল্লীর একটি সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত সরবরাহ বিভাগ মোট ২৭৯ কোটি টাকার অধিক ক্রয়-চুক্তি (Contract of purches) করিয়াছেন। ১৯৪১-৪২ সালের আর্থিক বৎসরে এই ক্রয়ের পরিমাণ দেখা যায় ১৭২ কোটি টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭৮¼ কোটি টাকা। যুদ্ধারম্ভ হইতে অর্থাৎ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সাতমাসে ক্রয়ের পরিমাণ ২৮¼ কোটি টাকা। এই সংখ্যাগুলি দ্বারা ভারতের বিপুল সমরোদ্যমের একটা ধারণা করা যাইবে। অবস্থা বিচার করিলে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আগামী কয়মাসে এই ক্রয়ের পরিমাণ একটি সর্ব্বোচ্চ সংখ্যায় দাঁড়াইবে। যুদ্ধের প্রথম ছয়মাসে ক্রয়ের যে পরিমাণ ছিল তাহার তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের ক্রয়মূল্য শতকরা ৫০০৲ টাকারও অধিক দাঁড়াইবে।

চন্দননগর রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির আবেদন :

চন্দননগর রবীন্দ্রস্মৃতি-সমিতি কবির একটি স্থানীয় স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়াছেন। কবির কাব্য জীবনের উদ্বোধন হইয়াছিল চন্দননগরেরই একপ্রান্তে, এই হিসাবে ইহা জাতীয় প্রতিভার পীঠস্থান। ভবিষ্যৎ বংশীয়ের নিকট ও ভাবীযুগের কৌতূহলী পর্য্যটকের নিকট চন্দননগরের আকর্ষণ ষ্ট্রাটফোর্ডের কবির সমতুল্য হইবে। চন্দননগর রবীন্দ্র-স্মৃতি সমিতির এই শুভ প্রচেষ্টাকে দেশবাসী মুক্ত-হস্তে সাহায্য করিবেন, ইহা আমরা আশা করি। সমস্ত সাহায্য নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির, চন্দননগর, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

পরলোকে রমাপ্রসাদ চন্দ :

খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে এলাহাবাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। বার বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। রাজসাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটি ও বরেন্দ্র মিউজিয়মেও চন্দ মহাশয় যোগদান করেন। জাতিতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৪ সালে আন্তর্জ্জাতিক জাতি-বিজ্ঞান কংগ্রেসের লণ্ডন অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান

করেন। বাংলার ইতিহাসকে যাঁহারা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, সেই মুষ্টিমেয় সংখ্যকের মধ্যে তিনি একজন। তাঁহার মৃত্যুতে জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র হইতে একটি প্রতিভা অপসারিত হইল। আমরা এই জ্ঞানব্রতী সাধকের আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা :

বোম্বাইয়ের শ্রদ্ধেয় ব্যবসায়ী ও জননায়ক স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবন সায়াহ্নে এই প্রবীণ জননায়ক দেশের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিসক্যাল কমিশনের সভাপতি, বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে কর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সুলভ নয়। বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিলেও তাঁহার বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালী ও নীতির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা :

খুলনা জেলার অন্তর্গত মিকৃশিমিল গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক স্বামী অমৃতানন্দজী গত ২৭শে মে উক্ত গ্রামে গমন করেন। সঙ্ঘের আজীবন সভ্য ও অনুরাগী সুহৃদ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র কর মহাশয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহিত যুক্ত হইয়া সঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পল্লীমঙ্গল ও জনশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিজগ্রাম মিকৃশিমিলে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। এই উপলক্ষে ২৮শে মে বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯॥০ টার সময় গ্রামের প্রধান বৈষ্ণবভক্ত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ কর মহাশয় স্বামীজীকে উদ্বোধন সভার সভাপতিত্বে বরণ করেন। দীর্ঘ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামী অমৃতানন্দজী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন সাধনার কথা বিবৃত করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকেই এই বিদ্যালয়টির প্রতি স্নেহানুকূল্য প্রদর্শন করিতে আবেদন জানান। সভাপতির বক্তৃতা শেষে গ্রামের বর্ষীয়ান মনীষী শ্রীযুত সীতানাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সভায় পল্লীর জাতিনির্ব্বিশেষে বহু লোকের সমাগম হয়।

বৈমানিক শরদিন্দু দাশগুপ্ত :

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, তরুণ বৈমানিক শ্রীমান শরদিন্দু দাশগুপ্ত ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স ভলান্টিয়ার্স রিজার্ভ-এ সম্রাটের কমিশন প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাইলট অফিসার দাশগুপ্ত হাওড়া সদর মহকুমার অবসর-প্রাপ্ত সাবডিভিসন্যাল অফিসার ও বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান জুট

বৈমানিক শরদিন্দু দাশগুপ্ত

মিলস্ এ্যাসোসিয়েসনস্-এর লেবার অফিসার রায় গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীমান শরদিন্দু ভারতীয় বিমান বিভাগে নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সভ্য হিসাবে বিমান পরিচালনা শিক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীমানের বয়স ২১ বৎসর মাত্র। বর্ত্তমানের এই জরুরী অবস্থার ফলে বিমান শিক্ষার যে বিস্তৃততর ক্ষেত্র যুবকগণের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, আমরা আশা করি, বাঙ্গালার তরুণ সম্প্রদায় সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন। শ্রীমান শরদিন্দু

সাহসী ও আদর্শবাদী। তাঁহার ভবিষ্যৎ সাফল্যময় হউক, ইহাই কামনা করি।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার :

৩৮ ডি, চেৎলা রোড, আলিপুরস্থ সাধু অজিতানন্দজী ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের জন্য একটি দৈবপ্রাপ্ত ঔষধ বিনা মূল্যে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, এই ঔষধ ব্যবহারে বহু লোক নাকি ম্যালেরিয়া রোগ হইতে নিরাময় হইতেছেন। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বাংলার একটি বৃহৎ অংশ উৎখাত হইতে চলিয়াছে, তার উপর কুইনিনের অভাবও ঘটিয়াছে, এই অবস্থায় সাধু অজিতানন্দজীর এই ঔষধটি জনসাধারণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। উপরোক্ত ঠিকানায় সাক্ষাৎমত বা ঠিকানাসহ ছয় পয়সার একটি খাম পাঠাইলে সবিশেষ জানা যাইবে।

গোটাপাড়ায় পল্লী-সংগঠন :

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় পল্লী খুলনা-বাগেরহাট মহকুমাস্থ গোটাপাড়ায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন। একটি উপাসনা-কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রাম-রক্ষীবাহিনী প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি সঙ্ঘের পল্লী-সংগঠন উদ্দেশ্য অনেকখানি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। সম্প্রতি মূলকেন্দ্র হইতে সঙ্ঘের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ সভ্য ও প্রবর্ত্তক ফার্নিসার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহলধর পাল গোটাপাড়ায় এইসব কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এককালীন কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ভবিষ্যতে আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই কেন্দ্রটি যাহাতে শীঘ্রই মূলকেন্দ্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় সেই চেষ্টাও উপেনবাবু করিতেছেন।

* * *

গোটাপাড়ার কয়েকজন সঙ্ঘকর্ম্মীর উদ্যোগে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীঅনিলকুমার বসুর পৌরোহিত্যে ৺প্রফুল্লকুমার বসুর যে স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সঙ্ঘগুরুর বাণী পঠিত হয় ও প্রফুল্লকুমারের গুণাবলী আলোচিত হয়।

পরলোকে এস্, এন্, নন্দী :

কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে স্বরূপগঞ্জে আকস্মিক বজ্রাঘাতে মিঃ এস্, এন্, নন্দীর মৃত্যু-সংবাদে আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছি। সম্প্রতি বিয়োগব্যথাকাতর মিঃ নন্দীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও ঐ স্বরূপগঞ্জ প্রবাসেই নিশার আঁধারে ঘুমন্ত অবস্থায় গুরুতররূপে দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আহত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যুদ্ধের হিড়িকে কলিকাতার স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া মিঃ নন্দী সপরিবারে স্বরূপগঞ্জে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বিলাত-ফেরত হইলেও মিঃ নন্দীর সরল, অনাড়ম্বর, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জীবন সত্যই অসাধারণ ছিল। তিনি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও আজীবন সভ্য ছিলেন এবং প্রবর্ত্তক-পত্রিকারও দীর্ঘ-কালের গ্রাহক ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি এবং তাঁহার পরিবারবর্গের আরোগ্য কামনা করি।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ছিন্নহার

শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন সরখেল
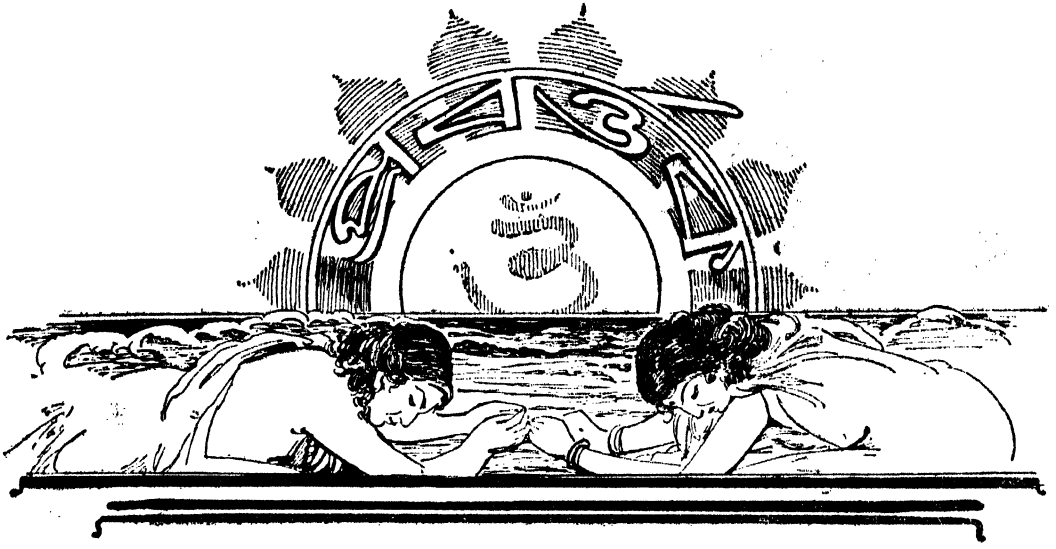
সপ্তবিংশ বর্ষ ১৩৪৯ সাল	শ্রাবণ	প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা

মা-ভৈঃ

আমি নিঃসংশয়; তোমরা নিঃসংশয় হও। আদর্শ রেখ না। সংস্কার রেখ না। কোনও আশ্রয় রেখ না। জ্ঞান-বস্তু ভিন্ন-বস্তুকে আশ্রয় করে' আসে না। এক-তত্ত্বকে আশ্রয় করে'ই জ্ঞানোদয় হয়। একনিষ্ঠ যে, তারই অনুভূতির উদয়। তখনই উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনি উঠে—"আমি তোমারই।"

স্বরূপের সাধনা। ইষ্ট-বস্তুকে আশ্রয় করে' স্বরূপের যে জ্ঞান, তাহা সত্যই অমৃত। উপলব্ধির বস্তু কোনও কারণে বিস্মৃতির মাঝে লয় পায় না। যাহা নিত্য, তাহা যদি কেহ একবার প্রাপ্ত হয়, অবস্থা ও ঘটনার দায়ে তাহা হারিয়ে যাওয়ার আর ভয় নেই।

ইষ্টে তোমাদের প্রতিষ্ঠা স্থির হোক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দে তোমাদের সবখানি পূর্ণ হোক। সকল আসক্তি, সকল কামনা কেন্দ্রীকৃত হোক ভগবানে। একই ব্রহ্মানন্দ বিদ্যানন্দে ও বিষয়ানন্দে বিস্তৃত হয়। বিষয় থেকে ইষ্টে চিত্ত নিয়ন্ত্রিত কর—ব্রহ্মানন্দ-লাভ হবে। করার কিছুই নেই, শুধু পাওয়ার জন্য তন্ময়তা। শূন্যপাত্রেই অমৃত-সঞ্চয় হয়। মা-ভৈঃ!!

শ্রীম—

ঐক্যের সাধনা

সঙ্ঘ ঐক্যের বীর্য্য। এই ঐক্য—মনের, মতের ও মর্ম্মের। ভিতরের এই ত্রিবিধ ঐক্যই বাহিরে বস্তুবীর্য্যে ফুটিয়া উঠিলে, তাহা সঙ্ঘশক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্ঘশক্তিই জাতির মেরুদণ্ড।

মনের ঐক্য সহজে হয় ও ভাঙ্গে। চঞ্চল-ধর্ম্মী মন—তার ভাল-লাগা, না-লাগা কিছু স্থায়ী নির্ভরযোগ্য জিনিষ নয়। পরস্পর ভাল-লাগা, না-লাগার উপর যে মনের মিলন, তাহা এইজন্য চিরস্থায়ী সম্বন্ধে পরিণত নাও হইতে পারে।

মনের মিল মতের মিলের সহায়তা পাইলে, সে মিলন দৃঢ়তর হয়। বিভিন্ন রুচির মানুষও এক মতে বিশ্বাসী হইয়া এক পথে চলিতে পারে। দীর্ঘদিন এক পথে চলিতে চলিতে অন্তরের পরিচয় গভীর হয়, প্রীতির সম্বন্ধ নিবিড়-ঘন মধুর ও স্থায়ী হয়—এক লক্ষ্যে গতির বেগ দ্রুততর এবং মিলিত উৎসাহে সেই এক পথের যাত্রীদল সমুজ্জ্বল প্রাণে অগ্রসর হয়।

সোণায় সোহাগা হয়, যখন আবার সংহতির মধ্যে মর্ম্মের মিলন-সূত্র আবিষ্কৃত হয়। এই মর্ম্মের মিলনই সঙ্ঘ-জীবন। ইহা খাঁটি যোগজ অধ্যাত্মবীর্য্য।

সঙ্ঘের সাধন—অধ্যাত্মসাধন। কারণ ইহার মূল-শক্তি—মর্ম্মের ঐক্য। যাহা সত্তা, যাহা আত্মা, যাহা ভগবানকে লইয়া পরম যোগ তাহাই সঙ্ঘের আসল ঐক্যভূমি। মর্ম্মের যোগ এই অধ্যাত্মমিলনই।

অধ্যাত্ম-মিলনের পথে কখনও কখনও মতভেদ অস্বাভাবিক নয়। মতভেদের কারণ চিন্তার ভেদ। তাহার হেতু মানসিক শিক্ষা, রুচি, পরিদৃষ্টি (outlook) ও অভিনিবেশের তারতম্য। একই লক্ষ্যমুখে যে সাধক-বৃন্দ চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে বিষয়বিশেষে মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে। চিন্তাভেদ ভাষাভেদ সৃষ্টি করে। ভাষাভেদ লোকচক্ষে বিষম বুদ্ধিভেদেরই পরিচয়রূপে প্রতীত হইয়া নানা অনর্থেরও হেতু হইতে পারে। এ সকল কি সঙ্ঘজীবনের দৌর্ব্বল্যের কারণ নয়? সমষ্টিজীবনে কোনও সমস্যা লইয়া চিন্তাভেদ, মতভেদ উৎপন্ন হইলে, তাহার সমাধান ও সমীকরণের উপায় কি?

মর্ম্মের যোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চিন্তার প্রণালী-ভেদে সমষ্টিসাধকদের মধ্যে বিষয়বিশেষে মত-বৈষম্য উপস্থিত হইলেও, তাহাতে সংহতিশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ গণতন্ত্রেও দেখা যায়, মত ও পথ লইয়া পার্ল্যামেণ্টে বহু তর্ক-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি হইলেও, তর্ক ও আলোচনাক্ষেত্রের বাহিরে, আসল কার্য্যক্ষেত্রে স্বাধীন স্বদেশনিষ্ঠ জাতির প্রাণপুরুষগণ অখণ্ড শক্তিপ্রয়োগে কুণ্ঠিত হন না। মত-বিরোধের অভিব্যক্তি বাহিরে; চিন্তায় ও ভাষায় যতই তাহা আত্মপ্রকাশ করুক, শক্তি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডব পঞ্চোত্তর ভ্রাতৃ-শতকের প্রতি বৃদ্ধ গুরুর যে উপদেশবাণী, তাহা উঁহাদের মর্ম্মগত স্বজাতিনিষ্ঠার গুণে সত্যসত্যই সার্থক হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু সঙ্ঘতন্ত্র গণতন্ত্র নয়। বহুর মতে একের বা লঘিষ্ঠের আত্মবলি, ইহা সঙ্ঘসাধনার নীতি নহে। সঙ্ঘ আবার ফ্যাসিজম বা নাৎসিবাদের ন্যায় এক বা মুষ্টিমেয় কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছায় কাহারও বলপূর্ব্বক মতশাসনও শ্রেয়োনীতি মনে করে না। এই উভয় নীতিই ঐক্যসাধনের অসম্পূর্ণ বা বিকৃত চেষ্টা বলিয়া ইহার কোনটীই যথার্থ ও পরিপূর্ণ মতৈক্য সিদ্ধ করে না। তাই গণতান্ত্রিক বা কর্ত্তৃতান্ত্রিক উভয়বিধ সংহতিই উত্তম ও সন্তোষজনক মানব - সংহতি - গঠনের আদর্শবিধান এ পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই।

গণতন্ত্রে মতের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি আছে; কিন্তু নিবিড়ঘন ঐক্যের বীর্য্য সেখানে খুবই দুর্ল্লভ। পক্ষান্তরে কর্ত্তৃতন্ত্র হুকুমতন্ত্র হইতে ক্রমে জুলুম-তন্ত্রে পর্য্যবসিত হয় — ইহাই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। নিরোধ ও নিগ্রহ-নীতি ইহার পক্ষে অপরিহার্য্য। এই গণতন্ত্র ও কর্ত্তৃতন্ত্রের

যতগুলি রূপভেদ ও ভঙ্গী - বৈচিত্র্য আছে — যথা, একপক্ষে প্রজাতন্ত্র (republicanism), রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (state-socialism), আর্থিক সাম্যতন্ত্র (guild-socialism and syndicalism), এবং সোভিয়েট-তন্ত্র (communism) ও অপর পক্ষে রাজতন্ত্র (monarchism), অভিজাত-তন্ত্র (oligarchy), সমাজতন্ত্র (feudalism) এবং একনায়ক-তন্ত্র (dictatorship or totalitariamism)—সঙ্গীতের ষড়জ হইতে নিখাদের মধ্যবর্ত্তী সুর-ভেদের ন্যায় এইগুলি পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর জীবননীতিরই অন্তর্ব্বর্ত্তী লঘু-গুরু ক্রমভেদেরই মূর্চ্ছনা। এ সকলই কিন্তু সঙ্ঘক্ষেত্রে অচল। সঙ্ঘের ঐক্যনীতি ইহার কোন নীতিরই সহিত সম্পূর্ণ একার্থক বা সঙ্গতিযুক্ত নহে। সঙ্ঘ ঈশ্বরতন্ত্র জীবনশাসন। সঙ্ঘের ধর্ম্ম—পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি-ধর্ম্ম।

সঙ্ঘে মত-বৈষম্যের সমাধান পূর্ণতারই উৎসে গিয়া। এইখানেই সকল দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভঙ্গীর সমন্বয়। বেদান্তের চতুঃসূত্রের ইহাই তো সেই "তত্তু সমন্বয়াৎ", যাহা শাস্ত্রনিষ্ঠ অসংখ্য মত-বিরোধকে ব্রহ্মমূলে লইয়া গিয়াই ব্যাসদর্শনকে সমন্বয়ের যথার্থ 'ব্রহ্মসূত্র' আখ্যা দিয়াছে।

শ্রুতিনিষ্ঠ মতবিরোধের সমন্বয়ই ব্রহ্মসূত্রে ভগবান বেদব্যাস খুঁজিয়াছেন ও পাইয়াছেন। সংহতিজীবনে মর্ম্মের ঐক্যই সেই ব্রহ্মসূত্র। ফল্গুপ্রবাহের মত ইহাই সঙ্ঘের চিত্ত ও চিন্তার সহস্র ভেদ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও বহমান। সেই মূলসূত্রেই মত ও মনের, চিন্তা ও চিত্তের সমন্বয়। মর্ম্মসূত্র এক বলিয়াই সঙ্ঘের প্রত্যেকে অপরের মতে ও মনে শ্রদ্ধাশীল, প্রীতিপরায়ণ। এই শ্রদ্ধাই পরস্পরকে বুঝিবার পরম সহায়; প্রীতি পরিচয়েরই রসায়ণ। যেখানে আত্মার গভীর সম্বন্ধ ইষ্টতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া, সেখানে এই আন্তরিক শ্রদ্ধার অভাব কখনও হয় না। ইষ্টের মধ্যেই তুমি ও আমি—তাই তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ সহস্র বৈপরীত্যেও প্রীতিময়, সহানুভূতিপূর্ণ। এই অন্তর-যুক্তিই আসল বন্ধন। শ্রদ্ধা ও প্রীতি সত্তারই স্বভাব-ধর্ম্ম। শ্রদ্ধা আদৌ মর্ম্মের স্বীকৃতি; চিন্তা বা মনের স্বীকৃতি তাহার পরে। তুমি যাহা চিন্তা কর, বিশ্বাস কর, তাহা আমি মানিয়া লইতে না পারিলেও, তোমার চিন্তাধারার প্রতি আমার শ্রদ্ধার হানি হইবে কেন? তোমার কথার তীক্ষ্ণ যুক্তি আমার কথার শাণিততর যুক্তি দিয়া আমি কাটিতে পারি, তর্ক করিতে, সমালোচনা করিতে পারি একাগ্র ও নির্ম্মম হইয়া—কিন্তু সে তোমাকে আরও ভাল করিয়া ও নিবিড়তরভাবে বুঝিবার জন্যই। ইহাতে প্রীতিরই বা লাঘব কিম্বা অপলাপ হইবে কেন? এইরূপ মর্ম্মযোগে—মর্ম্মের স্বীকৃতি ও সম্প্রসারণের রসায়ণে—যে ঐক্যমার্গ, তাহাতেই সঙ্ঘসাধক নির্ভয়ে অগ্রসর হন। সমন্বয়ের সম্যক্ অন্বয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গতি এই জন্যই সঙ্ঘ-সাধনাতেই অবশ্যম্ভাবী।

মর্ম্মের ঐক্য—ইষ্টযোগে। বলিয়াছি, ইহা অধ্যাত্ম-সাধন। চিন্তা ও মনের ঐক্যও এরূপ অধ্যাত্ম-সাধনসাপেক্ষ। সে সাধন—মন ও মতের শোধন। সঙ্ঘে যে মন বিরোধ সৃষ্টি করে, যে মত বেসুরা শুনায়, তাহার শোধন ও রূপান্তর আন্তরিক যৌগিক উপায়েই উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়; নতুবা কোনও বাহ্য বা কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অনর্থক বিক্ষোভই বাড়ায়, মৌলিক নিদানগত সঙ্গতি অর্থাৎ সমন্বয় তাহাতে মিলে না।

অসম্পূর্ণ মন, অপরিপক্ক চিন্তা যে বীর্য্য লইয়া আবির্ভূত হয়, তাহা সঙ্ঘের কেন্দ্রপুরুষ বা সমষ্টি-চক্রের চেতনায় যে কোনও কারণে হউক প্রতিহত হইলে, উহাকে সঙ্গতির জন্যই মরমী সাধক পুনঃ উৎস-মূলে প্রেরণ করিবেন। এই স্ব-কারণে লয়—বৃত্তির শুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্যই। শুদ্ধি—ব্রহ্মে সংযুক্তি। পূর্ণতা—বৃত্তির লয়ে বা রূপান্তরে। প্রেরণা যদি সত্য হয়, তাহা এই উৎসর্গের রসায়ণে সমধিক শোধিত ও শতগুণ গতিবীর্য্য ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় ফিরিয়া আসিবে; অন্যথা উহার কার্য্যশক্তি ফুরাইয়া থাকিলে, আত্যন্তিক লয়ই অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যাবৃত্ত শুদ্ধ চিন্তা সমষ্টির অভিনব অন্তর-স্ফুরণ ও অন্তরপরিবর্ত্তনেরও কারণ হইতে পারে। সে স্ফুরণ ও পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত—অথবা যৌগিক প্রক্রিয়া বলিয়াই ইহাতে জোর-জুলুম, নিগ্রহ-নিপীড়ন স্বতঃ বা পরতঃ কোনও দিক্ দিয়াই নাই।

এই নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনেই আমরা সম-রস, সম প্রকৃতি লাভ করিব। সমান মন, সহ-চিত্ত-বুদ্ধি তখন সহজ হইবে। স্বাধীনতার ঐক্যবীর্য্য এই পথেই অধিগত

হইবে। সঙ্ঘতন্ত্র যদি ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত জীবনের দিব্য প্রেম ও পূর্ণ ঐক্যমূলক নববিধান হয়, সেই আদর্শ নব-বিধান লক্ষ্যে রাখিয়া অখণ্ড ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থান ভারতের ভাগ্য বিধাতাই সুনিয়ন্ত্রিত ও সফল করিবেন।

প্রচার

প্রচার কর্ম্মের নহে, ধর্ম্মের। ধর্ম্ম—যোগ, ভাগবত জীবন। সাধনার প্রণালী—যোগ। সিদ্ধি—ভাগবতজীবন। উভয়ই ধর্ম্ম-শব্দের দ্বারা ব্যাপ্য। ধর্ম্মপ্রচারক সাধ্য ও সাধনা দুইই প্রচার করিবেন—কায়, মন, বাক্যে।

কায়যোগে প্রচার—অভ্যাস ও আচার। নিয়ম-নিষ্ঠা এই আচারেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটার ন্যায় করিয়া চলাই সর্ব্বোত্তম প্রচারের নীতি। আচারের অনুশীলন যাহার জীবনে যতখানি সিদ্ধ, তাহার মধ্য দিয়া ততখানি কায়িক প্রচার শক্তিগর্ভ ও সার্থক হয়।

মানস প্রচার—নব নব চিন্তার স্ফুরণে ও প্রকাশে। উহার মূলশক্তি—সত্য, সম্বন্ধ ও সংযম। নিরূপিত কেন্দ্রে একান্ত শরণ, তাঁহার নিকট আপনার সবখানি অকপট অকুণ্ঠচিত্তে খুলিয়া ধরা, ষোল আনা বিশ্বাস ও প্রত্যয়—এইগুলিই সত্যের সাধন। সম্বন্ধও—মনের সহিত ঈশ্বরের ও ঈশ্বরপ্রতীক বা গুরুবিগ্রহের নিবিড় পরিচয় ও সংযুক্তি। প্রতি চিন্তায় ও কর্ম্মে এই সম্বন্ধের সূত্রে যদি আকর্ষণ না পড়ে, তবে মন সম্বন্ধের রসে পরিপূর্ণ অভিষিক্ত হয় নাই। চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া সম্বন্ধ ক্রমে মর্ম্মগত হয়। যেমন নারীর পতি-সম্বন্ধই তাহার মর্ম্মগত সতী-ধর্ম্ম। পতির চিন্তা, পতির সেবা তাহার সেই মর্ম্মগত সতী-ধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত স্বভাব-কর্ম্ম। সংযম—ইন্দ্রিয় ও মনের আত্মপ্রতিষ্ঠিত যুক্ত-চৈতন্য।

মানস প্রচার—ধ্যানে, জ্ঞানে, চরিত্রের প্রভাব-সঞ্চারণায়। মানস প্রচারের সার্থক পরিচয়—আদর্শের ব্যাপ্তি ও আকর্ষণসঞ্চারে। এমন প্রচারককে ঘিরিয়া স্বতঃই একটা অনুরাগের আবহাওয়া, একটা ভাবময় পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়া উঠে। তাহার অন্তরোৎসৃত ভাবরাশি চারিদিকে তরঙ্গের ন্যায় ছড়াইয়া নিকট ও দূরের মানুষের প্রাণে অনির্দ্দেশ্য অনুরণন উঠায়—বিরুদ্ধ বা নিরপেক্ষ বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জকেও উহা বুঝি ক্রমে ক্রমে স্ব-ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া তুলে। মানস প্রচারের এই ব্যাপ্তিলক্ষণ যেখানে নাই, সেইখানে প্রচারের বীর্য্য স্তিমিত অথবা তাহা এখনও পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয় নাই।

তৃতীয় প্রচার—লেখনী ও বাক্যে। ইহা তৃতীয় হইলেও, উপেক্ষার নহে। আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম, উভয়ই বাক্যকে সহায় করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। বাক্যসহযোগেই আমরা একের অন্তর-ভাব অন্যের অন্তরে সহজে সঞ্চারিত করিতে পারি। বাক্যের মন্ত্রশক্তি দিয়াই গড়ি মত ও মন; জন-মত-গঠন বা সংহতিজীবন সচেতন করিয়া তুলিতে হইলে, বিধিমত লেখা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা অতিশয় প্রয়োজনীয়। শুধু দেখিতে হইবে—এই লেখা ও কথা যেন শূন্যগর্ভ, অসংলগ্ন না হয়—তাহা ছন্দ ও যুক্তির অনুসরণ করিয়া যেন একটা সাধনসিদ্ধ সমষ্টিরই যথার্থ অভিব্যক্তি হয়, লেখনী ও বাক্যের পিছনে থাকে জীবনের বীর্য্য, বস্তুতন্ত্র উপলব্ধি ও প্রাণশক্তি।

এই ত্রিবিধ প্রচার-শক্তি যেখানে আশ্রয় পায়, সেই চিহ্নিত প্রচারকের মধ্য দিয়াই সঙ্ঘের ব্যাপ্তি ও প্রসার, সঙ্ঘশক্তির দুর্জ্জয় প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে।

কৃপণের দুঃখ

(হিন্দী হইতে)

শ্রীঅনিলা কয়াল

কৃপণেরে কহে কৃপণের প্রিয়া,—
"ও-বদন কেন ম্লান?
গাঁঠ হ'তে কিছু গেল কি পড়িয়া?
করেছ কারেও দান?"

"গাঁঠ হ'তে কিছু পড়ে নাই প্রিয়া,
করিনি তো দান কারে,—
অন্যে দিতেছে দেখিলাম, তাই
মলিন দুঃখ-ভারে!"

সেবাস্তোপোল

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

দূরে কৃষ্ণসাগর, দিগন্তের পায়ে যেন মসী-শৃঙ্খল। তরঙ্গভঙ্গের মৃদু কল্লোল পাগলের প্রলাপের মত ভেসে আসে বাতাসের অলস পাখায়। উপকূলভাগে অনুচ্চ গৈরিক পাহাড়ের বেড়া দিয়ে প্রকৃতি রচনা করে রেখেছে রক্ষাব্যূহ। পাহাড়ের আড়ালে সেবাস্তোপোল দুর্গ-শিখরে লাল ফৌজের রক্ত-পতাকা।

এমন একদিন ছিল, যখন এ পাহাড়গুলি মুখর হ'য়ে উঠত রুশ নরনারীর কলকণ্ঠে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জারের আমলের এই ঊষর উপকূলকে সযত্নে সাজিয়ে তুলেছিল পুষ্প-পত্রসম্ভারে। এ মনোরম স্থানটি ব্যবহৃত হ'ত বলশেভিক শ্রমিকদের অবকাশবিনোদনের স্বাস্থ্য-নিবাসরূপে।

জার্ম্মানীর ধারাল-নখর থাবা হিংস্র লালসায় উঠল কেঁপে। স্বাস্থ্যনিবাস রূপান্তরিত হ'ল সৈন্য-নিবাসে। উপকূলের বাতাস আর আনন্দমুখর জীবনের ছন্দে দুলে উঠে না, রক্ষী বিমানবাহিনীর রুক্ষ চীৎকারে করে আর্ত্তনাদ। স্বাস্থ্যনিবাসের যাতে শান্তিভঙ্গ না হয়, সে জন্য জাহাজকে যেতে হ'ত যথাসম্ভব নীরবে, আজ টহলদারী যুদ্ধ-জাহাজের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে কৃষ্ণসাগরকে করে তুলেছে করাল।

আঁধার পৃথিবীর মুখে মসী মাখিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির দান যে চাঁদ, সেও মানুষের রক্তাক্ত হানাহানি দেখে আত্ম-গোপন করেছে মেঘের আড়ালে। লতাপাতায় আচ্ছাদিত রুশ-রক্ষী কামানের ব্যাটারীগুলি প্রস্তুত করে' সতর্ক সজাগ দৃষ্টিতে কৃষ্ণসাগরের আঁধারের দিকে চোখ মেলে অপেক্ষমান।

—ওটা তোমাদের কসাক রক্তের দোষ।

—তার মানে?—রাগতভাবে বাল্‌জাক্‌ উঠে বসল।

—তার মানে!—হেসে ডাউনিয়া বলল—চটে 'মটে তড়াক্‌ করে উঠে বসার মধ্যেই তার মানে খুঁজে দেখ।

লজ্জিত বাল্‌জাক্‌ মেসিনগানের হাতলে হাত রেখে বলল, অমন চিম্‌টি কাটা কথায় কার না রাগ হয়?

—আমাদের কখনো অমন সামান্য কথা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখেছ?

দুজনেই আবার নীরব। পেট্রোভিচ্‌ দুরবীণে চোখ লাগিয়ে এদের কথা শুনছিল। কথা সে কিছু কম কয়; কিন্তু অন্যে কথা বলুক অনর্গল, সে তার একনিষ্ঠ শ্রোতা। পেট্রোভিচ্‌ প্রত্যাশা করছিল, নিশ্চয়ই বাল্‌জাক্‌ খুব ধারাল দেখে একটা জবাব দেবে। ধারাল দূরের কথা, বাল্‌জাকের তরপ হ'তে ভোঁতা একটা জবাবও না আসাতে পেট্রোভিচের কাছে বড় খাপছাড়া লাগল।

পেট্রোভিচ্‌ পা বাড়িয়ে বাল্‌জাকের পিঠে 'টুক্‌' করে একটা ঠোক্কর দিয়ে সুবোধ বালকের মত যেমন ছিল তেমনি দুরবীণে মনোযোগ দিল। সে ভাবল, ঠোক্করকে কেন্দ্র করে আবার বুঝি ওদের বচসা চলবে। শুনেও তার যেন কত তৃপ্তি!

বাল্‌জাক্‌ বিরাশী শিক্কা ওজনের এক কিল বসিয়ে দিল ডাউনিয়ার পিঠে। ডাউনিয়া লম্বা বিনুণী দিয়ে চটাৎ করে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলল—বা—রে! আমি কি তোর বৌ যে ঠেঙ্গাচ্ছিস? তাইত বলি, কসাকদের কি আর একটা দোষ!

—ঠোক্করটা যে দিলে, সেটা কি ফাউ যাবে?

—মিথ্যে কথা, আমি ঠোক্কর দিইনি।

—হাঁরে পেট্রোভিচ্‌! রুক্ষ গলায় বালজাক ডাকল।

—হুঁ।

—ঠোক্কর দিলি যে বড়?

—উঁহুঃ।

সাগরের কাল বুকে আঁধার জমেছে দানবের হিংসার মত। হঠাৎ একটু আলো দূরে......বহু দূরে। আবার সব কালো।

পেট্রোভিচ্‌ চেঁচিয়ে উঠল, ডাউনিয়া, আলো সাগরের বুকে......

—কোন দিকে

—৫০° ডিক্রী কোণে।

ফোনে মুখ দিয়ে কান্‌ট্রোলে ডাউনিয়া খবর দিল: আলো—সাগরের বুকে পঞ্চাশ ডিক্রী কোণে।

জেনারেলের ক্যাম্পে সংবাদ পৌছতেই সর্ব্বত্র যথাযথ

নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। স্তব্ধ পাহাড়ী পল্লীর পেছনে বিমানের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শোনা গেল লৌহ ঘর্ষণের শব্দ। নৈশ আঁধারের স্তব্ধতা গেল ভেঙ্গে। সুশৃঙ্খল ত্রিকোণ সারিতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান বহর। সন্ধানী আলোক বাহিনীতে কার্ব্বন অজগরের মত গর্জ্জন করতে লাগল। কামান আদেশের অপেক্ষায় এখনো স্তব্ধ। দূরপাল্লার মেসিন গান শত্রুকে পেতে চায় আরও কাছে। নৌবহর কৃষ্ণসাগরকে তোলপাড় করে ছুটেছে শত্রুর সন্ধানে।

আবার আলো, কিছুটা কাছে, আরও উজ্জ্বল। বাল্জাক্ শক্ত হাতে ট্রাইগার ধরল। ডাউনিয়া এক কাণে ফোনের রিসিভার ধরে অন্য কাণ রেডিওর পাশে রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। পেট্রোভিচ্ দুরবীণে আত্মস্থ। বিমান হ'তে বেতারে খবর এল— ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিরাট্ শত্রু নৌ বহর, দেড় হাজার কিলোমিটারে লক্ষ্য স্থির কর......চালাও কামান।

এক সঙ্গে উপকূল রক্ষী শত শত কামান হ'তে কালানল বজ্র নির্ঘোষে শত্রু বহরের উপর ফেটে পড়ল। জার্ম্মাণ নৌ বহর হ'তে এল তার তীব্র প্রত্যুত্তর। শত্রুর রক্ষী বিমান আকাশে উঠে রুশ স্কোয়াড্রনগুলির পথরোধ করে দাঁড়াল। নৈশ আকাশ বিধ্বংসী-হানাহানিতে হ'য়ে উঠল লাল। জার্ম্মাণ-ডেষ্ট্রয়ারগুলি রণতরীর রক্ষায় নিযুক্ত রইল; সাবমেরিন ও ইউবোট এগিয়ে এসে রুশ-বহর আক্রমণ করল। লাল-বহর শিলা-বৃষ্টির মত শত্রু সাবমেরিণের উপর ডেফ্থ চার্জ্জ বর্ষণ করতে লাগল। মাঝে মাঝে জলস্তম্ভের মত সাগরের জল উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে আকাশের দিকে। প্রবল ঘূর্ণী-বারির বক্ষ ভেদ করে' সাগরতলের রহস্যময় দেশ হ'তে যেন উঠে আসে সমাধী সঙ্গীত। কমাণ্ডার তার কাস্তে আর হাতুড়ী চিহ্নিত টুপী খুলে নতশীরে জানায় বীরের যথাযোগ্য সম্মান।

বেতারে ঘোষিত হ'ল: টর্পেডো আঘাতে লাল-বাহিনীর রণতরী আলাস্কা ডুবে যাচ্ছে।

ডাউনিয়া রেডিওর মুখ চেপে ধরল। শিকারী বেড়ালের মত ক্ষণিকের জন্য চোখ দু'টো তার জ্বলে উঠল। সে আত্মসম্বরণ করল। আপন মনে বিড়্ বিড়্ করে বলল, বিদায় পিতা (ডাউনিয়ার পিতা আলাস্কার কমাণ্ডার)। তুমি গেলে কিন্তু পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে রইল তোমার একমাত্র কন্যা ডাউনিয়া। আশীর্ব্বাদ কর যেন প্রাণ বলি দিয়েও জাতির জয় দিতে পারি।

আলাস্কা ডুবে যাচ্ছে, সর্ব্বশক্তি নিয়োগে তবুও শত্রুকে লক্ষ্য করে চালাচ্ছে কামান। প্রতিটি গোলাবর্ষণের ধাক্কায় দু'তিন ইঞ্চি করে জাহাজ যাচ্ছে তলিয়ে। প্রত্যেকটি নাবিক ও সৈনিক তখ্নও কর্ত্তব্য-সাধনে অটল।

কমাণ্ডারের চোখ দু'টো কামান দাগার আব্ছা আলোকে দেখা যায়—কত তীক্ষ্ণ আর প্রতিহিংসাকাতর। শণের মত শাদা চুলগুলি বারুদের ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে গেছে। বাতাস তা' নিয়ে খেলা করছে। চারপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অজস্র গোলাগুলি। কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, ঐতিহাসিক মীনারের মত কমাণ্ডার যেন নীরব সাক্ষী। স্বপক্ষ বিপক্ষের কত ঘায়েল-বিমান ঝরা-পাতার মত ঘুরতে ঘুরতে রচনা করছে সলিল সমাধি। শত্রুর একখানা জাহাজ আগুন ধরে গেল ডুবে।

নিমজ্জমান আলাস্কার অত্যাচার বুঝি অসহনীয়। ছোঁ-মারা একখানা জার্ম্মান-বিমান ডাইভ্ করে' নেমে এল একবারে আলাস্কার উপর। আলাস্কার মূর্চ্ছিতপ্রায় বিমান-বিধ্বংশী কামান তবুও একটু শেষ রক্ত উদ্গীরণ করলে। আলাস্কার আশে পাশে পড়ল কয়েকটি টর্পেডো-বোমা। আঘাতে আঘাতে মুমূর্ষু আলাস্কা বার কয়েক দুলে উঠল। উড়ন্ত রুশ-বিমানের মেসিন গান আলাস্কার মরণ বার্ত্তা ছড়িয়ে দিল বাতাসে।

শেষ শয্যায় শায়িত আহত আলাস্কার কমাণ্ডারের সামনে ট্রান্সমিটার ধরা হ'ল। দেশবাসীর প্রতি তাঁর অন্তিম আবেদন: রুশ অপরাজেয় অমর। আলাস্কার প্রতিশোধ......বর্ব্বর শত্রুকে যেন ক্ষমা না করা হয়। বি-দা-য়। ডা...উ...নি...: একটা গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ রেডিওতে শুষ্ক বাতাসের মত ধ্বনিত হ'ল।

আলাস্কা অতলে তলিয়ে গেল।

অবিরাম কামান ও বোমার বর্ষণ চলেছে। ডাউনিয়ার শোক করারও অবকাশ নাই। কন্ট্রোলের নির্দ্দেশ মত ব্যাটারীকে চালনা করা যে তারই হাতে! ক্ষণিকের

ঔদাসীন্য বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারে। পিতার অন্তিম ইচ্ছা তাকে আরও উদ্দীপ্ত আর হিংস্র করে তুলল। টুপীটি একটু ঠেলে পরপারের যাত্রী পিতাকে সে কেবল অভিবাদন করল।

হঠাৎ সম্মুখে জার্মান-বহরের তীব্রতা কিছুটা কমে এল। গাঢ় ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষ কৃষ্ণ-সাগরের বুকে যবনিকার আড়াল সৃষ্টি করল। রুশ কামান তখনো সক্রীয়। আবরণের পরপারে শোনা যায় মাঝে মাঝে দু' একটি অতি বিস্ফোরণের শব্দ। রুশদের চোখে নেমে আসে আশার আলো—শত্রুর বুঝি একখানা জাহাজ ঘায়েল হ'ল।

ক্রমে ধোঁয়ার আবরণ আরও গাঢ়তর হ'ল। সার্চ্চ-লাইটের আলো জমাট ধোঁয়ার আবরণ—গাত্রে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে। কামান শ্রেণী ক্ষণিকের জন্য আত্ম-সম্বরণ করতে বাধ্য হ'ল। পেট্রোভিচ্ বিরক্ত হ'য়ে বলল, মিছামিছি দূরবীণ চোখে লাগিয়ে থেকে কি লাভ? শয়তানগুলো গা ঢাকা দিয়েছে।

বাল্‌জাক্ আঙ্গুল ফুটিয়ে ডাকল, ডাউনিয়া!

ডাউনিয়া উত্তর দিল না।

রেডিও-সেটের উপর মাথা রেখে ডাউনিয়া তাকিয়ে আছে কৃষ্ণসাগরের অন্তহীন কালোর দিকে, যেখানে একটু আগে সলিল-সমাধি হয়েছে আলাস্কার সহিত তার স্নেহময় পিতার। ডাউনিয়ার আঁখিকোণ বেয়ে দু' ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

রুশ পর্য্যবেক্ষক-বিমানগুলি ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে' এগিয়ে গেল শত্রু বহরের দিকে। শত্রুপক্ষ বাধা দিতে এগিয়ে এল। বিমানরক্ষী জঙ্গীবিমানগুলি তাদের সম্মুখীন হ'ল। রুশ নৌ-বহর আবরণের আড়ালে তখন পাহারায় নিযুক্ত।

বিমান হ'তে বেতারে খবর এল: শত্রু নিজেদের বহর সুসংবদ্ধ করেছে। নৌবহরের পেছনে বহু সৈন্যবাহী ও বিমানবাহী জাহাজ অপেক্ষা করছে সুযোগের অপেক্ষায় ......তারা তিনভাগে বিভক্ত হ'য়ে প্রধান অংশ এগিয়ে আসছে সামনের দিকে, অবশিষ্ট বাম ও দক্ষিণ বাহুর দিকে যাচ্ছে, সৈন্যবাহী জাহাজ দূরে দূরে অনুসরণ করছে। উপকূল রক্ষী, হুঁসিয়ার!

ততক্ষণে রুশ-বিমান হ'তে অতিবেগুনি আলোক-সম্পাতে ধোঁয়ার আবরণ তুলে দেওয়া হ'য়েছে। দূরে শত্রু-বহর কালোর বুকে ইতস্ততঃ ছড়ানো কয়টি বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

রুশের উপকূলরক্ষী ব্যাটারীগুলির কাছে কিছু পদাতিক বাহিনী এসে জমা হ'ল। যান্ত্রীক বাহিনী সর্ব্বত্র টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। বিমান হ'তে যাতে জার্ম্মানী পশ্চাদভাগে সৈন্য নামাতে না পারে, সে জন্য সেবাস্তো-পোলের আকাশ সার্চ্চ লাইটের আলোকে দিনের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। প্যারাস্যুটে শত্রুর অবতরণের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব অতিরিক্ত স্থল বাহিনী ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান।

জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে আবার রণ-দেবতা ধ্বংসের প্রলয়-নাচনে নেচে উঠল। জার্ম্মান নৌবহর তোপের উপর তোপ দেগে এগিয়ে আসছে—চোখে লুণ্ঠনকারীর লালসাভরা ঔজ্জ্বল্য। রুশ পক্ষ দিচ্ছে তার সমুচিত উত্তর; অন্তরে তাদের আত্মরক্ষার অপূর্ব্ব দৃঢ়তা। রুশের বিমান-বহর শত্রুকে করে আক্রমণ, শত্রু-বিমান সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে এগিয়ে আসতে চায় কূলের দিকে। রুশ-বিমান তাদের অনুসরণ করে, ডাইভ করে' শত্রু প্রতিপক্ষকে করে লক্ষ্যভ্রষ্ট। বিমানধ্বংসী অনেকগুলি কামান উপকূল হ'তে একসাথে গর্জ্জে উঠে।

পেট্রোভিচ্ চেঁচিয়ে উঠল: শত্রু সাবমেরিন উপকূলের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রধান বহরের পাশ কাটিয়ে ধেয়ে আসছে।

কাছে—খুবই কাছে জলের উপর ভেসে উঠল ডুবন্ত দানব। রুশ ব্যাটারী লক্ষ্য করে জার্ম্মানরা অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল।

ঝন্-ঝন্, ফট্-ফট্—একটা বীভৎস নারকীয় দৃশ্য। বাল্‌জাক কন্ট্রোলের নির্দ্দেশ অনুসরণ করে' অবিরাম গুলি চালাতে লাগল। ঢালুর দিকে বসান হাল্‌কা কামানগুলি একযোগে নেকড়ের মত ঝাপিয়ে পড়ল শত্রুর সাবমেরিনের উপর। বারুদের ধোঁয়া বাল্‌জাকের চোখ দু'টো ধাঁধিয়ে দিতে চায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট শ্যেনের মত তবুও দৃষ্টি তার প্রতিহিংসার আশে অপলক।

গুড়ুম্!!

কয়েক গজ মাত্র দূরে পড়ল বোমা। ডাউনিয়া ফোনে বোমা পড়ার সাঙ্কেতিক শব্দ 'কন্‌ট্রোল'কে জানাল। উৎক্ষীপ্ত কাঁকর-বালীর আবরণে বোমা-বিচ্ছুরিত মৃত্যুদূত সার্পনেলসমূহ চুপিসারে করল অভিসার। পেট্রোভিচের দুরবীণ ঢালুর দিকে গড়িয়ে ডাউনিয়ার গায়ে এসে ঠেকল—যুদ্ধহত রাজপুত্তের অমঙ্গল বারতা নিয়ে যেমন ছুটে আসত আহত অশ্ব তার প্রভুর পুরদ্বার উদ্দেশ্যে।

ডাউনিয়া চমকে সেদিকে তাকাল, পেট্রোভিচ নাই। একতাল রক্ত-মাংস যেন ইঙ্গিত করছে পেট্রোভিচের পরিণতির মর্ম্মন্তুদ ইতিহাসের দিকে।

কন্‌ট্রোলে বোমা বর্ষণের ইঙ্গিত পৌঁছনোর ক্ষণপরেই ভ্রাম্যমান এম্বুলেন্স ও রিজার্ভ সৈন্য এসে গেল। পেট্রোভিচের শূন্য স্থানের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে' ডাউনিয়া বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুরবীণ তুলে দিলে জনৈক সৈনিকের হাতে। ঠিক এমনি সময়ে আলোকোজ্জ্বল আকাশ হ'তে শত শত বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দুলে-দুলে নামতে লাগল অনেকগুলি প্যারাস্যুট। টহলদার বাহিনী ব্রেনগান উঁচিয়ে প্রস্তুত...আরও কিছুটা নিচে নামল...এবার পরিষ্কার দেখা যায়, এক একটা প্যারাস্যুটিষ্ট জার্ম্মান যেন মুক্ত সঙ্গীন উঁচিয়ে নেমে আসছে।

ব্রেনগানের আওতায় তারা এসে গেছে। সব কয়টা বন্দুক একসঙ্গে উদ্গীরণ করল তপ্ত সীসা। কোথায় জার্ম্মান? ঈশ্বরের হাহাকারের মত সেবাস্তোপোলের আকাশকে খান খান করে' দিল অনেকগুলি ভয়াল বিস্ফোরণ। মানুষ তারা নয়—মানুষের আকারে সজ্জিত বোমা! বাতাসের চাপে অনেক কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। আগুন তার সর্ব্বগ্রাসী জিহ্বায় লেহন করল সেবাস্তোপোলের গৈরিক মাটি পর্য্যন্ত। সমগ্র স্থলভাগ আগুনের আলোকে লাল। শত্রুর কাছে রুশদের যুদ্ধ ব্যবস্থার গোপনীয়তা বুঝি আর চাপা থাকে না।

—ঈ-বোট—তাগ্ কর।

বালজাক নীরব।

ডাউনিয়া ডাকল, বাল্‌জাক্, কি করছ? ঈ-বোট যে আমাদের লক্ষ্য করেই এগিয়ে আস্‌ছে। চালাও—চালাও বন্দুক, শয়তানগুলোকে ডুবিয়ে দাও।

মেসিন গানের এক ঝলক গুলী ডাউনিয়ার মাথার উপর দিয়ে অজানা ভাষায় জানিয়ে গেল কি দুর্ব্বোধ্য ইঙ্গিত।

ডাউনিয়া আবার ডাকল, বাল্‌জাক্! কণ্ঠে তার অনেকখানি উৎকণ্ঠা।

বাল্‌জাক্ তবুও নীরব।

ডাউনিয়া পা বাড়িয়ে বাল্‌জাক্‌কে ঠেলা দিয়ে বলল, গুলী কর—ওরা যে এসে গেল! বাল্‌জাক্!

প্রিয় সঙ্গিনীর এ পরশটুকুর জন্যই বুঝি বা সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। বাল্‌জাকের নিস্পন্দ দেহ একখণ্ড পাষাণের মত গড়িয়ে এসে ডাউনিয়ার ডান দিকে স্থান নিল। ডাউনিয়া আবেগভরে ব্যথাকাতর দৃষ্টি মেলে একবার চাইল বালজাকের রক্তাক্ত মুখের দিকে।

আবার গুড়ুম্!!!

বুকফাটা একটা আর্ত্তনাদ আবর্ত্তিত হয়ে পড়ল বাতাসের বুকে। ডাউনিয়া ঢলে পড়ল বাল্‌জাকের পাশে। কপোল গড়িয়ে নেমে এল রক্তের ধারা।

কেটে গেছে রাতের আঁধার। পূব আকাশে সূর্য্য উঠেছে—তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি অমলিন। অতি কষ্টে, অতি ধীরে ডাউনিয়া মাথা তুল্‌ল। সারা মুখ তার বারুদের ধোঁয়ায় কালো। কালোর উপরে উজ্জ্বল রক্তস্রোত কালোকে করে তুলেছে মহিমার সমারোহে সুন্দর। ব্যথানত কম্পিত দৃষ্টি তুলে প্রথম সে তাকালে দূরের সেবাস্তোপোল দুর্গ-শিখরের দিকে। বিজয়ীর নাজীর জয়-পতাকা স্বস্তিকা বায়ুভরে আন্দোলিত হ'য়ে ডাউনিয়াকে যেন ব্যঙ্গ করছিল।

ডাউনিয়ার কালো মুখের উপর নেমে এল বিষাদের গাঢ় কালিমা। দুর্ব্বল দেহ তার লুটিয়ে পড়ল বাল্‌জাকের বুকের উপর। মরণের পটভূমিতে এ বুঝি মিলনের পরম পরিচয়। কিন্তু কতক্ষণ? ধীরে ধীরে নিঃশেষে নিবে গেল ডাউনিয়ার জীবনের আলো। তবুও সেবাস্তোপোলের চরম ভাগ্য প্রত্যক্ষ করার জন্যই বুঝি নির্ব্বাণের আগে একবার জলেছিল তার প্রাণ-প্রদীপখানি।

পরীক্ষার পরিণাম

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সুনীলা এবারেও ম্যাট্রিক দেবে। এর আগেও সে দিয়েছিল—দু'-দু'বার;—কিন্তু ওই 'ইতিহাস'! অন্য সব সাব্‌জেক্টগুলোয় যাওবা থাকে পাস-মার্ক, কিন্তু ইতিহাসের বেলায় হাল ছেড়ে দেয় সুনীলা। সাদা খাতা সাব্‌মিট ক'রে এসে তো আর পাসের নম্বর আশা করা যায় না।...অনেক চেষ্টা ক'রেও হ'য়ে উঠ্‌ছে না।...ভোর রাত থাকতে ছাদের উপর উঠেও চীৎকার ক'রে পড়ে দেখেছে; ও কিন্তু হবার নয়। আজও ওর বুদ্ধদেবের জন্ম-তারিখের সঙ্গে বাবরের মৃত্যুর তারিখ যায় জড়িয়ে; আগে ক্লাইব না আগে ওয়ারেণ হেষ্টিংস—তা ও মাথা চুলকে চুলকে, চুল উঠিয়ে ফেল্‌লেও বল্‌তে পারে না; পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট যে বেণ্টিংয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি নয়, তা ও ভুলতে পারে না কিছুতেই।

কিন্তু এই সুনীলা বাস্কেট-বল খেলায় মেথডিষ্ট স্কুলকে একা চোদ্দটা গোল গুণে গুণে দিয়েছে,—ব্যাডমিণ্টন ফাইনালে সুপ্রিয়া সরকারের চোখে এমন একটা 'স্ম্যাশ' ক'রে তাকে কাৎ করেছে যে, আজও পর্য্যন্ত সুপ্রিয়াকে 'জীরো পাওয়ার'-এর চশমা ব্যবহার করতে হয়। যেমন আমাদের অনেক বন্ধুকে দেখলে বল্‌তে ইচ্ছা হয়: 'বন্ধু, তুমি নারী হ'লে না কেন?' তেমনি সুনীলার সম্বন্ধেও বলা চলে: 'সুনীলা, তুমি পুরুষ হ'লে না কেন?'

এবার সুনীলা দৃঢ়সঙ্কল্প, ইতিহাসে পাস ও ক'রবেই।

সুযোগও গেল জুটে। ভোরবেলা হৈ-চৈ আওয়াজে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সুনীলা দে'খল—ভাড়াটে এসেছে পাশের বাড়ীতে। পাশের বাড়ী সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা মেয়েদের মজ্জাগত। বারান্দায় ঝুঁকে দেখ্‌তে লাগল ও।

পাশের বাড়ীতে এসেছে অজিত বোস তার বিধবা মা আর কুমারী বোনকে নিয়ে। অজিত বোসকে ও দেখেছিল ওদের স্কুলেরই দু'তিনটে উৎসবে আর অজিত বোসই যে ইতিহাসের পেপার সেট করার ভার পেয়েছে, এ খবর সুনীলা রাখত অনেক আগেই।

অজিত বোস একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় সুনীলার কাছে। ম্যাট্রিক ক্লাসেই যে ইতিহাসের তল খুঁজে পায় না সুনীলা, অজিত বোস নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সেই ইতিহাসেই পেয়েছে ফার্ষ্ট ক্লাস এবং তার পরেও সেই ইতিহাসকে বেঁকিয়ে দুমড়ে প্রকাণ্ড একটা থিসিস্ পাঠিয়েছে ঐতিহাসিকদের দরবারে—যার ফলে আটাশ বছর বয়সেই ও একজন পি, এইচ, ডি। আর ভাবতে পারে না সুনীলা।...অনেক আগে ও দেখেছিল এক সার্কাসের খেলা—একটা লোক ছ'টা কাঠের বল নিয়ে লুফ্‌ছে পর পর—তেমনি পারে নাকি লোকটা ইতিহাসের বল নিয়ে লোফালুফি করতে?...

সুনীলার ঘর থেকে অজিতের ষ্টাডি দেখা যায়। মুখে বসন্তের দাগে ভর্ত্তি, কুচকুচে কালো অজিত রাত্রে যখন বইয়ের গোছা নিয়ে বসে টেবিলের ধারে, তখন সুনীলা জানলার দরজাটা চেপে ধরে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে তার দিকে, ইচ্ছা ক'রে শোনায়—চুড়ির আওয়াজ, চাবীর শব্দ। অজিতও মাঝে মাঝে দেখে চোখ তুলে;—ছাগলের চোখের মত চোখ—ভাবহীন, কটাক্ষহীন।...ঘৃণা হয় সুনীলার, কিন্তু নিরুপায়! ইতিহাসে পাস তাকে করতেই হবে। এত কুপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না—অন্ততঃ সুনীলার তাই মত। কিন্তু সমস্ত কদর্য্যতাকে ঢেকে রেখেছে ওর ইতিহাসের জ্ঞান। কুপুরুষের পঙ্কে যেন ফুটেছে ইতিহাসের শতদল! চমৎকার উপমা—মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট হয় সুনীলা।

প্রভা অজিতের বোন। সুনীলা মনে মনে নাম রাখে—'জগদম্বা'। গোল গোল চোখ, শিরাবহুল কুশ্রী অবয়ব, হাসলে দাঁতের মাড়ি শুদ্ধ দেখা যায়, মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ;—বিড়ি খায় নাকি মেয়েটা!...উপায় নেই; এর সঙ্গেই ভাব করতে হ'ল সুনীলার—সইও পাতাতে হ'ল। ইতিহাসে তাকে পাস ক'রতেই হ'বে।

সুনীলা কুৎসিৎ নয়। অত্যন্ত গৌরবর্ণা না হ'লেও, লাবণ্যময়ী। সুনীলা হাসে;—ইতিহাসবিৎ অজিতকে জয় করার যা কিছু অস্ত্র সবই আছে তার তূণীরে পূর্ণভাবে। পরীক্ষার দেরী এখনও মাস তিনেক ... অজিতকে করতলগত করার পক্ষে প্রচুর সময়।

স্কুল-ফেরৎ রোজ যায় সুনীলা অজিতদের বাড়ী। অজিত আস্‌বার আগেই তার পড়ার ঘর সাজিয়ে রাখে যত্ন ক'রে,

—প্রভাও সাহায্য করে তাকে। মিশর, চীন, ফ্রান্স—নানাদেশের নানা রংয়ের মোটা মোটা বাঁধানো সব ইতিহাসের বই। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সুনীলা। ভাবে মনে মনে: এই সব বই দিয়ে ও গড়বে প্রকাণ্ড সেতু—তারপর সেই সেতুর উপর দিয়ে সগৌরবে পার হ'বে সে ম্যাট্রিক-সমুদ্র। প্রভা বোঝে না অত। দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত তার বিদ্যা; তাও দ্বিতীয় ভাগের সবটা নয়—'অখ্যাতি' আর 'কুখ্যাতি'র পাতায় রক্তপাত হ'য়ে বিদ্যা তার শেষ হ'য়েছে। সে বই সাজাতে গেলে উল্টাই সাজিয়ে বসে। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সে দাদার ঘরেই ঢোকে না।

অজিত ফেরবার সাথে সাথেই ধরা প'ড়ে গেছে—এমন একটা মুখের ভাব ক'রে সরে দাঁড়ায় সুনীলা। প্রভা আসে এগিয়ে: "সই রোজ তোমার ঘর গুছিয়ে দেয় দাদা; আর বই পড়তে ও খুব ভালবাসে। রাতদিন তোমার বইগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে' থাকে।"…প্রভা হাসে মাড়ি শুদ্ধ দাঁত বের করে'—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসি, উত্তরে অজিতও হাসে—চোখ দুটো তার ছোট হ'য়ে আসে হাসির আবেগে।…ঐ ইতিহাসের বিরাট্ বইগুলোর পটভূমিকায় বিশ্রী দেখায় এদের। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-মানবী যেন—মানুষের চেয়েও শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল যাদের বেশী।

একদিন আলাপ হয়। দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবি দেখছিল সুনীলা একমনে, হঠাৎ কাশির শব্দে চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে দেখল, অজিত। সারা দেহে একটা সলজ্জ আড়ষ্টভাব এনে স'রে দাঁড়াল সুনীলা। অজিতের দৃষ্টি যেন লেহন করছে ওকে।

"তুমি বুঝি বই পড়তে খুব ভালবাস?"—অজিতের গলা। "হ্যাঁ, ওঃ আপনার কত ইতিহাসের বই!"—কথাগুলো বলতে একটুও বাধল না সুনীলার। এ সব যেন রিহার্সেল দেওয়া ছিল তার।

"—ইতিহাস তোমার ভাল লাগে?"

—"খুব interesting," সলজ্জে ব'ললে সুনীলা।

"বেশত, তোমার যখন যে বই ইচ্ছা খুলে দেখতে পার। আমি ঘরে না থাকলেও ক্ষতি নেই। এই নাও চাবী।"

এতটা কিন্তু সুনীলাও আশা করে নি। একদিনে এতটা, এযে স্বপ্নেরও অগোচর। চাবীটা সপ্রতিভ ভাবে হাতে ক'রে নেয় সুনীলা; ভাবে মনে মনে: শুধু তোমার আলমারীর নয়, তোমার হৃদয়-দুর্গের চাবীও এই উঠল আমার আঁচলে।

সুনীলা আসে—বইগুলোর পাতা উল্টোয় আর যায়। আসল কাজের হয় না কিছুই। প্রভাটাও গোমুখ্য। সেদিক্ দিয়েও কিছু হবার যো নেই। একদিন সুনীলা ব'লেও ছিল: "হ্যাঁ ভাই, তোমার দাদা নাকি এবার ইতিহাসের পেপার সেট করেছেন?" প্রভা চীৎকার ক'রে হেসে উঠেছে কথা শুনে, মাড়ি বা'র করে, চোখ ছোট ক'রে সে হেসে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে: "হায়, হায়—আমাকে খুব বিদ্বান ভাবো দাদার মত—না? হায় হায়"—আবার সেই লুটিয়ে পড়া হাসি। ব'ললে, "আমি ওসব কিচ্ছু বুঝিনে ভাই।"

মাথায় আগুন জলে উঠে সুনীলার। চেয়ারের ভাঙা হাতলটা দিয়ে দাঁত কটা ভেঙ্গে দেবে নাকি জগদম্বার! কিন্তু…ইতিহাস…। সুনীলা কষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নেয়।

মাঝে মাঝে অজিত ইতিহাসের নানা গল্প সুরু করে সুনীলা আর প্রভার সঙ্গে। রাজা আর্থার আর তার দৈবদত্ত তরবারি এক্সক্যালিবার, কার্থেজের বলিষ্ঠ বাহু—হ্যানিবল, ম্যারী অ্যান্টয়নেটের জীবনের অশ্রু-সজল পরিসমাপ্তি—আরও কত কি! শুনতে সুনীলার মন্দ লাগে না; কিন্তু বুকের পাতা আর পরীক্ষার খাতায় প্রভেদ আকাশ-পাতাল। এ সব গল্প মনে রাখবার প্রয়োজন নেই বলেই হয়ত ওর মনে থাকবে।

ইতিহাসের এ সব গল্প প্রভাকেও যেন একটু নাড়া দেয় ব'লে মনে হয়। কারণ একদিন প্রভাদের বাড়ী পা দিয়েই সুনীলা চম্‌কে উঠে। প্রভার একি অপূর্ব্ব সাজ! মালকোচা মেরে শাড়ীটা পরেছে, গায়ে দিয়েছে তার দাদার পাঞ্জাবী, হাতে গলায় কতগুলো কাগজের সাপ জড়ানো আর একহাতে টিঞ্চার আইডিনের শিশি।…সুনীলাকে দেখে প্রভা লুটিয়ে পড়ল: "দ্যাখ ভাই, আমি ক্লিওপেট্রো হয়েছি।' সুনীলা নির্ব্বাক্। খানিক পরে দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করে: "কিন্তু হাতে ও আয়োডিনের

বোতল কেন?" প্রভা বলে: "বিষ"।···সুনীলা ভুলে গেছে সবটা, তবু ওর আবছা মনে পড়ছে—যে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে বিষের কি একটা সম্বন্ধ ছিল বটে!

এমনি চলে দিনের পর দিন।···কিন্তু একদিন।······

সুনীলা একটা মোটা বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল ব'সে ব'সে। প্রভা একটু আগে উঠে গিয়েছে বাতি জ্বাল্‌তে। পিছনে নরম স্পর্শ পেয়ে ও চম্‌কে উঠল। ফিরে দেখে অজিত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আলগোছে সুনীলার গলায় ফেলে দিয়েছে একছড়া বেলফুলের মালা। সারা শরীর যেন জ্বলে উঠল সুনীলার। পেলবকোমল হাতদুটি মুষ্টিতে পরিণত হ'ল—ওকি মারবে নাকি অজিতকে? হয়ত মারত—কিন্তু পরীক্ষার আর ঠিক পনের দিন বাকী, ইতিহাসে পাস যে তাকে করতেই হ'বে। ঘরে বাইরে ম্যাট্রিক পাস না করার জন্য একটা লজ্জাকর পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তাকে উদ্ধার পেতেই হ'বে। তার খুড়তুতো বোন রীণা, তার চেয়েও বছর চারেকের ছোট, সে গত বছরে পাস করেছে ম্যাট্রিক, তাও পাস করেছে ইতিহাসে 'লেটার' নিয়ে। রীণার সঙ্গে তারপর থেকে তার মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। কিছুক্ষণ ভেবে নিল সুনীলা। বেশ, তাই হোক্—ইতিহাসের যূপকাষ্ঠে তার নারীত্ব সে বলিদান দেবে, কিন্তু পরীক্ষার পর একবার সে দেখে নেবে ইতিহাসবিৎ অজিত বোস্‌কে! ভজুয়ার হাণ্টার কিংবা নিজের পায়ের স্লিপার যেটা পাওয়া যাবে কাছে।

সুনীলা সকুণ্ঠ একটা ভঙ্গী ক'রে বল্‌ল, "যান্‌, ভারী দুষ্টু আপনি, প্রভা যদি এসে পড়ত!"

"আসুকগে, ছোট বোনকে ভয় করতে হবে না কি!" —তারপর প্রেমনিবেদনের পালা। নতজানু হ'য়ে, মাঝে মাঝে গলা কাঁপিয়ে—সে এক ক্ল্যাসিকাল ব্যাপার! সুনীলাকে দেখামাত্র অজিতের মনের বিহঙ্গ নাকি বলেছিল: ওরে যার পথ চেয়ে তুই ব'সে আছিস্‌, সে যে আপনি এল তোর দ্বারে। সুনীলা যদি বিমুখ হয়, তবে ব্যথায় জর্জ্জরিত প্রাণ সে রাখবে কিসের আশায়। ইত্যাদি···

চমক্‌ লাগে সুনীলার। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন পেণ্ডুলামের মত দুলতে আরম্ভ করে। সুনীলা কি বল্‌বে, ভেবে উঠতে পারল না; বন্ধুদের কাছে শুনেছিল যে, এ সময় কথা না বলাই সমীচিন। কাজেই সে ঘাড় নীচু ক'রে নখ দিয়ে ইতিহাসের বইয়ের মলাটটা ছিঁড়তে লাগল।···প্রভা এসে পড়ায়, সে পেল মুক্তি; কিন্তু প্রভা ছাড়ল না তাকে—ঠাট্টায়, বিদ্রূপে উৎব্যস্ত করে তুলল।

সুনীলা এ বাড়ীতে আসা কমিয়ে দিলে। প্রায় দিন সাতেক এলই না, এমন কি জানালার ধারেও তাকে দাঁড়াতে দেখা গেল না।···তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা এসে হাজির। এর আগে সুনীলাকে এত যত্ন করে' সাজতে দেখা যায়নি। মনে হয় সারা বিকেলটা ও প্রসাধনেই নষ্ট করেছে। উঁকি মেরে রান্নাঘরে দেখল যে, প্রভা তার মার সাহায্যে ব্যস্ত; ও আর দাঁড়াল না। আস্তে পা ফেলে ঢুকল অজিতের ঘরে। ঘরটা অন্ধকার। জানালার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে অজিত ওদেরই বাড়ীর দিকে চেয়ে বসে আছে। মনে মনে হাসি পেল সুনীলার।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু কাশ্‌লে সুনীলা। লাফিয়ে অজিত মুখ ফেরাল: "আরে, এই যে তুমি! এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে বল ত? প্রভাকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েও হায়রান হ'য়ে গেছি।" সারা মুখে একটা গাঢ় ম্লানিমা সুনীলার, স্বরেও কাতরতা। বলে: "বড্ড মুস্কিলে পড়েছি। সাতদিন পরেই পরীক্ষা—অথচ ইতিহাসটা কিছুতেই বাগিয়ে আন্‌তে পারছি না।"··· অজিত হাসে—অবজ্ঞার হাসি: "এই কথা"—ও ভুরু কুঁচকে বলে: "ইতিহাসের ভাবনা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। ঘণ্টা দুয়েক সময় বিকেলে দাও আমাকে, পাস আমি তোমায় করিয়ে দেব।" সুনীলা সারা শরীরে একটা লাবণ্যের ঢেউ তোলে, আর তোলে তার পেন্ট-করা ভুরু, বলে আবদারের সুরে: "কিন্তু অনেক পড়া যে বাকী, পারবেন এ ক'দিনে?" অজিতের চোখ আসে কুঁচকে। আর দেখা যায় না—এত ছোট ক'রে ফেলেছে ওর চোখ। পারিপার্শ্বিকতার আবেষ্টনী ও মুছে ফেলে একেবারে, লাফিয়ে এসে সুনীলার একটা হাত টেনে নেয়

নিজের হাতে। ওর ঠোঁট দুটো চকচক ক'রছে নেকড়ের মত, উত্তেজনায় ওর চ্যাপ্টা নাকটা কামারের হাপরের মত ফুলছে—আবেগে অদ্ভুত এক শব্দ বের হ'ল ওর গলা থেকে: "পারব বৈকি নীলা—নিশ্চয় পারব।" কথাটার শেষে ও হাসে এবারও অবজ্ঞার হাসি—যে পারে গন্ধমাদন আনতে, তাকে শুধু বিশল্যকরণী আনতে পাঠানোই বোকামী—এমনি ভাবের একটা হাসি। সুনীলার একটা হাত তখনও ধরা রয়েছে ওর হাতে—আর হাতটা ওর কাঁপছে থর থর ক'রে। "বল আসবে?" —চোখে অশেষ জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রশ্ন করে অজিত: "কাল থেকেই?"...ব্যাকুলতা যেন উপচে পড়ছে, আর পড়ছে ওর সারা গা বেয়ে—তাও বোঝা যাচ্ছে বেশ! এবার সুনীলা ছাড়ে তার পাশুপত অস্ত্র—বিষাক্ততম তীর তার তূণীরের। মাথাটা একটু হেলিয়ে দেয় অজিতের দিকে;—ওর কোঁকড়ানো চুলের রাশ সুড়সুড়ি দেয় অজিতের কাঁধে, চোখদুটো লাস্যে চটুল হ'য়ে ওঠে। বলে সুনীলা: "তুমি তো ইচ্ছে করলেই পাস করাতে পার আমাকে। পেপার-সেটার তো তুমিই, কোয়েশ্চেন তো সবই তোমার জানা।"—ভীষণভাবে ঘনায়িত হ'য়ে আসে সুনীলা অজিতের বুকের কাছে। সুনীলার মুখে 'তুমি' আহ্বান! আনন্দে আত্মহারা হয় অজিত!! সুখের সপ্তম স্বর্গ ওর বগলে!!!...ও নাচবে, ভীষণ রকম নাচ একটা নাচবে ও। এত বড় একটা আনন্দের তাল সামলাতে হ'লে কিছু একটা ক'রতেই হ'বে ওকে!...... সুনীলার রক্ত করবীর মত রাঙা হাতখানিতে সশব্দে একটা চুমো খেয়ে বসে অজিত। "দুষ্টু"—ও বলে গদগদ কণ্ঠে: "সব খবরই তো রাখ তুমি।"......সুনীলার স্যাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপটা আলগা হ'য়ে আসে। বিশ্রী কাণ্ড বুঝি আরম্ভ হয় এবার,—নাঃ, সামলে নিয়েছে সুনীলা। ..."কিন্তু অনেকদিন আগে পেপার চ'লে গেছে আমার কাছ থেকে; সব কি আর মনে আছে!"—অজিত বিনিয়ে বিনিয়ে বলে: "দেখি চেষ্টা ক'রে।"...টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ টেনে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা পেন্সিলও। সুনীলার চোখ দুটি কৃতজ্ঞতায় মাখানো—ওর মুচকি হাসি উৎসাহিত ক'রে তোলে অজিতকে। লিখতে সুরু করে;—সুনীলা ওর পিছনে ঝুঁকে পড়েছে। কালো চুলের গোছা ঢেকে দিয়েছে অজিতের কাঁধ—ওর শাড়ীর গাঢ় লাল রংয়ের পাড়টা ভেঙে পড়েছে অজিতের বাঁ হাতের উপরে। অজিত লিখে চলেছে—সুনীলার দুটি চোখে বিজয়িনীর আনন্দ-উচ্ছ্বাস। সে শুধু ইতিহাস নয়—একটি পুরুষকেও জয় ক'রেছে।

"এই নাও"—অজিত হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে দেয় সুনীলার হাতে, "পাঁচটা প্রশ্ন লিখে দিলুম,—মুখস্থ ক'রলে তোমার লেটার পাওয়া আটকায় কে?" 'ধন্যবাদ'—কি মিষ্ট আওয়াজ সুনীলার,—শীর্ণা ঝর্ণা যেন কলঝঙ্কারে লাফিয়ে চলেছে একটি উপল হ'তে আর একটি উপলে।

"পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই যাব তোমার বাবার কাছে, কেমন?"—জিজ্ঞাসা করে অজিত—চোখে তার উপচীয়মান অত্যুগ্র কামনা।

"জানি না যাও—দুষ্টু কোথাকার!"—সারা মুখে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিল' সুনীলার;—ও তর-তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে চলে আসে নীচে।

ব্যস্! সেই আসাই শেষ। সুনীলা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে অজিতকে—কি ধাতুর মেয়ে সে! প্রভার দূতিগিরির উত্তরে বলেছে স্পষ্ট ক'রে—ব'লেছে কঠিন ভাষায়: 'এতদিন সে খেলেছে তার দাদাকে নিয়ে, যে খেলা খেলে তন্বী মেয়েরা তাদের পোষা লোমওয়ালা কুকুরদের নিয়ে।' প্রভা মাথা নীচু ক'রে ফিরে যায়। দু'দিন পরেই দেখা যায়—অজিতরা বাড়ী বদল করছে। বাক্স-বিছানা গাড়ীতে চাপিয়ে চলেছে আর এক শাখায় নীড় বাঁধতে। বিজয়িনী হাসি হাসে সুনীলা: 'স্কাউণ্ড্রেল্, লেখাপড়াই জগতে সব নয়। মেয়েদের অন্তর জয় করার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্ হ'তে তুমি বঞ্চিত! কোন সাহসে চাও তুমি —সুনীলা-পুষ্প-স্তবক ঘিরে গুঞ্জন করতে।'......ড্রেসিং-টেবিলের সামনে ব'সে ও আলগোছে গালে ছোঁয়ায় হিমাভ-হিমানী। গায় আধুনিকতম গানের দু'এক কলি। ও আজ বিজিতা—এ চিন্তা ওকে ফুলিয়ে দিয়েছে—ফাঁপিয়ে দিয়েছে। শত্রু শুধু পরাজিত নয়—বিধ্বস্ত সম্পূর্ণরূপে—পলায়িত। খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠে সুনীলা। ইতিহাসের প্রশ্নগুলো খুলে পড়ে আবার—এ যেন শত্রুর

পরিত্যক্ত দুর্গ—যা আজ ওর কর-কবলিত। লক্ষ্মীবাঈয়ের চেয়েও বড় মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

আসল ইতিহাসের পরীক্ষার দিন। আকাশ যেন উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে সুনীলার কাছে—ধরিত্রীর প্রতি ধূলিকণা যেন ওর কাছে এনেছে বাণী। ইতিহাসের প্রশ্ন অনাগত মুহূর্ত্তের রহস্যজালে আবৃত নয় আর—ওর কাছে তারা দিনের আলোর মত স্পষ্ট।…এবার ও ইতিহাসে করবে পাস,—পাস ক'রবে ম্যাট্রিক। ভাবতেও যেন ওর শিহরণ জাগে দেহে—চোখের কোণে জাগে ভবিষ্যের স্বপ্নিল-আভাষ। মর্ম্মরায়িত মনের বেণুকুঞ্জে চলে অবাস্তবের নীড়-রচনা। মীনাক্ষী,—যে ওর প্রাণের বন্ধু—পর পর তিনদিন ক্লাস পালিয়ে যাকে নিয়ে ও দেখতে গেছে 'দেবদাস',—নিজের মীনা-করা ব্রোচ অকাতরে তুলে দিয়েছে যার হাতে—তার কাছ থেকে পর্য্যন্ত গোপন করেছে সুনীলা ইতিহাসের প্রশ্নপত্র।

কিন্তু আজ পরীক্ষা।…

সারা হল গিজ-গিজ ক'রছে পরীক্ষাথিনীতে। সকলেই লিখে চলেছে মাথা নীচু ক'রে। তাদের স্বল্প চুড়ির ছন্দায়িত শব্দ ভেসে আসছে ওর কাণে। কিন্তু একি! সুনীলা ব'সে আছে মাথাটা চেপে ধ'রে,—কপালের শিরাগুলো ওর জ্বলছে দপ্‌দপ্‌ ক'রে। খাতায় তার কালীর একটি আঁচড়ও এখনও পড়েনি। আর একঘণ্টার মধ্যেই খাতা যাবে নিয়ে—তখনও হয়ত পড়বে না একটি আঁচড় ওর খাতায়। এবার কাঁদছে ও—টানা চোখদুটি বেয়ে হিমাভ-হিমানী আর লাল্‌চে রুজ ভিজিয়ে—ধরিত্রীর অজস্র ক্রন্দন যেন ঝ'রে পড়ছে। ও ভেঙে পড়েছে—ভেঙে পড়েছে ওর সযত্নে বাঁধা মেঘের মত নিবিড় কালো চুলের রাশ।…একটি প্রশ্নও আসেনি—যে প্রশ্ন ও কণ্ঠস্থ ক'রেছে সারা দিনের সুদীর্ঘ অবসরে, মধ্যরাত্রির শান্ত অবকাশে। যেখানে আসার কথা তৈমুরের বিজয়-অভিযান—সেখানে দেখছে ও স্পষ্ট ক'রে ছাপা রয়েছে অশোকের রাজ্য-শাসনপ্রণালী। সারা প্রশ্নপত্র তন্ন তন্ন ক'রেও ও খুঁজে পাচ্ছে না—আকবরের কথা। গুপ্তবংশ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত।

বেদনায়, হতাশায়, পরাজয়ে সুনীলা ভেঙ্গে পড়ল—পরীক্ষার টেব্‌লের উপরে।

ব্যষ্টির মুক্তিতে কভু বিশ্বের নাহিক মুক্তি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নিভৃত নির্জ্জনে বসি' নিঃশ্রেয়স লভিবার নিরন্তর ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায়
বিশাল বৈরাগ্য নিয়া নীরবে রহিলি তুই যোগাসনে সিদ্ধিপ্রতীক্ষায়;
তোর কি তপস্যা শুধু আপনার মোক্ষ লাগি' মিশে যেতে অব্যক্ত ভূমায়?
কি ফল লভিবি শেষে তোর যদি আত্মারাম চিরদিন আত্মাতে ঘুমায়!
তরঙ্গিত সংসারের তীরে তুই কেন এত সুশঙ্কিত বিষ্ণুমায়া হেরি'
তোর কি জাগে না প্রাণে আধ্যাত্মিক সভ্যতার বাজাইতে জয়শঙ্খ ভেরী
যান্ত্রিক সভ্যতা-যুগে?—যে সভ্যতা মানবের আত্মধর্ম্ম দিল বিসর্জ্জন,
যে সভ্যতা মানবের মর্ম্মে মর্ম্মে স্বার্থতার করিতেছে বিপুল নর্ত্তন!

দুস্তর হিমাদ্রিপথে গহন অরণ্যে বসি' মায়াভীত রিক্তবাহী তুমি,
ভেবেছ কি একবার লক্ষ প্রাণী কাঁদে যদি, কাঁদে জন্ম-গৌরবের ভূমি,
দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝাবর্ত্তে, ব্যর্থ হবে সাধনার হোমানলে তব আত্মদান,
ব্যষ্টির মুক্তিতে কভু বিশ্বের নাহিক মুক্তি—সর্ব্বজীবে চাহি মুক্ত প্রাণ।
তোর কি পড়ে না মনে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি-বলে সৃষ্টি নব জাগে
ভারতের সিন্ধুতটে! তোর কি পড়ে না মনে আজি হতে বহুবর্ষ আগে
মারাঠার মহাকাব্য গৈরিক পতাকা দিয়া রচে' গেল গুরু রামদাস,
'ভগোয়া ঝাণ্ডা'র কথা তুই কি ভুলিয়া গেলি? সে ঝাণ্ডায় ছিল চিদাভাস।

তোরে যে গাঁথিতে হ'বে আলোকের বরমাল্য আজিকার ভাবভ্রষ্ট পথে,
তোরে যে ফিরাতে হ'বে আরণ্যক সভ্যতারে অতীতের অস্তাচল হ'তে!
ওরে তুই ফিরে আয়, বৈরাগ্যের সাথে কর ঐশ্বর্য্যের শুভ যোগাযোগ,
সে ঐশ্বর্য্য ভাগবত জন্মের দিব্যযুগ-প্রভাতের হবে রাজভোগ।

বেদাঙ্গ

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়—এই হইতেছে প্রস্থানত্রয়। সংস্কৃতি-লাভের জন্য বিশ্বমানবের পক্ষে এই তিন আশ্রয় ব্যতীত চতুর্থ আশ্রয় নাই। ভারতের শ্রুতি হইতেছে—'the embodiment of the Eternal Truth.' ইহা অপৌরুষেয়বাদ অর্থাৎ ব্যক্তিবাদ নয়। স্মৃতি হইতেছে 'the laws from an immemorial age to achieve that Eternal Truth.' ন্যায় হইতেছে—'Logic.'

প্রথমে শ্রুতির কথা। এই দেশে শ্রুতির অপর নাম বেদ। ইহার তত্ত্ব অনুভবনীয়। এই শ্রুতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিবার জন্য ভারতের ঋষিরা ইহার ছয়টি অঙ্গ নিরূপণ করিয়াছেন, যথা—

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥—(শব্দরত্নাবলী)

অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ—এই ষড়ঙ্গযুক্ত শাস্ত্রকে বেদ বলে।

এবার শিক্ষার কথা। শিক্ষা বিষয়টা সর্ব্বপ্রথমে বোধগম্য করিতে হইবে। "অকারাদি বর্ণানাং স্থলকরণ-প্রযত্নবোধিকা অ কু-এ হ বিসর্জ্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যা ইত্যাদিকা শিক্ষা।" অর্থাৎ অকারাদি বর্ণের উচ্চারণস্থান যাহা দ্বারা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়, তাহাই শিক্ষা। টীকাকার ভরত পাণিনির কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন—'পূর্ব্ব-ঋষিগণের সঙ্কলিত শাস্ত্র এবং তাঁহাদের কথিত লোক-বেদাচার, শব্দার্থ-বোধ এবং চৌষট্টি বর্ণমালার উচ্চারণ বিধির জ্ঞানই শিক্ষা।'

প্রথম বর্ণমালাসৃষ্টির পূর্ব্বক্রম বর্ণনা-প্রসঙ্গে ঋষিরা বলিয়াছেন—আত্মা বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, মন ও কায়ার সাহায্যে বায়ুবেগ আশ্রয় করিয়া শব্দ সৃষ্টি করেন। প্রাতঃ-কালীন ও মাধ্যন্দিন যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য গায়ত্র্যাদি ছন্দের উচ্চারণে মস্তিষ্কস্থান ও মুখ-গহ্বর হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া মারুত পঞ্চধাবিভক্ত বর্ণমালা সৃষ্টি করিল। স্বরজ্ঞান, কালজ্ঞান এবং স্থানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বর্ণজ্ঞানী বলে। স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। উদাত্ত স্বরের মধ্যে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্তে ঋষভ ও ধৈবত, স্বরিতে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম। কাল—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। স্থান অষ্টধা, যথা—হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। বর্ণজ্ঞান না হইলে, শাস্ত্রগ্রন্থপাঠে অধিকার জন্মে না। প্রত্যেক বর্ণটির উচ্চারণস্থান যেমন সুনির্দ্দিষ্ট আছে, তেমনি প্রত্যেক স্থান হইতে বর্ণগুলি কিরূপ স্বরে, সুরে ও মাত্রায় উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহারও বিধান আছে। কোন বর্ণটি কণ্ঠোচ্চারিত, কোন বর্ণটি দন্ত, তালু প্রভৃতি দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াই আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করি। ভারতীয় শিক্ষাবিজ্ঞানানুযায়ী প্রত্যেক বর্ণটিকে তাহার স্বস্থান হইতে উচ্চারণ করার সাধনা আজ আমরা করি না এবং প্রত্যেক বর্ণটি স্ব-স্ব স্থান হইতে উচ্চারিত করার সময়ে কোন বর্ণটি কিরূপ মাত্রায় উচ্চারিত হইবে, তাহারও সাধন জানি না। শিক্ষার অভাবে এই বিশাল আর্য্যজাতি শুধু আচারগত ও স্বভাবগত ভেদ ও পার্থক্যে যে ছন্নছাড়া হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু এই শিক্ষার অভাবেই ভাষাভেদে আমরা স্ব স্ব অভিব্যক্তি দিয়া স্বজাতির নিকটই ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হইতেছি। শিক্ষার এই সনাতন শাসন-প্রবর্ত্তনের অভাবেই এক-ভাষাভাষী আর্য্যজাতি বহুধা বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, বর্ণবিজ্ঞান-সাধনার অভাবে এক বাংলা ভাষাই স্থানে স্থানে এমন বিচিত্র বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, উহা যে আমাদের এক অখণ্ড মাতৃভাষা তাহা আর চেনা যায় না। উড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। একটা বিশাল জাতিগঠনের জন্য ধর্ম্মগত ও রাষ্ট্রগত ঐক্যই যথেষ্ট নহে, ভাষাগত ঐক্যের জন্যও আমাদের শিক্ষা-বিজ্ঞানের যথারীতি প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চারণ যথাযথ না হইলে, একই ভাষা নানাভাবে, নানা আকৃতিতে চলিয়া যায়। উচ্চারণভেদেই ভাষাভেদ ঘটে। ভাষা-ভেদের সঙ্গে সঙ্গে এক অখণ্ড জাতি বহুধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই হেতু জাতিগঠনের জন্য শিক্ষার অনুশাসন কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা না বলিলেও চলে।

উচ্চারণদোষে বিষয়বস্তুর প্রকৃত মর্ম্ম যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতি উপাদেয় বিষয়ও শ্রুতিকটু হয়। গ্রন্থপাঠের নীতির কথাও তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিতে

ব্যস্থর করেন নাই। উত্তম শ্রোতার ন্যায় যোগ্য পাঠকেরও প্রয়োজন হয়। পাঠ সম্বন্ধে তাই আচার্য্যগণের অভিমত—

"মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যং লয়-সমর্থশ্চ ষড়েতে পাঠক-গুণাঃ॥"

অর্থাৎ মাধুর্য্য, অক্ষরের যথাযথ অভিব্যক্তি, পদচ্ছেদ, সুস্বর, ধৈর্য্য, লয়সমর্থ—এই ছয়টি পাঠকের গুণ।

পাঠ করিতে হইলে, প্রত্যেক অক্ষরটি সুস্পষ্ট, মাধুর্য্য-মণ্ডিত, সুস্বরে ও প্রত্যেক পদটি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হওয়া চাই এবং উচ্চারণের তালসাম্য রক্ষা করিয়া ধীরতার সহিত পাঠ করা বিধেয়। বিকৃত কণ্ঠে, ক্ষিপ্র, এক পদের সহিত অন্যপদ সংজড়িত করিয়া গ্রন্থপাঠে পাঠকের অন্তরেও পাঠ্য বিষয়ের অনুভূতি যেমন রেখাপাত করে না, শ্রোতার অন্তরেও তেমনি বিষয় প্রতিপন্ন হয় না।

সঙ্গীতাদির রাগরাগিণীর আলাপের যেমন কালনির্ণয় আছে অর্থাৎ প্রাতঃকালে ভৈরবী, সন্ধ্যায় পূরবী প্রভৃতি রাগিণীর আলাপের নিয়ম আছে, তদ্রূপ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্নভেদে পাঠেরও উচ্চারণস্থান সুনির্ণীত হইয়াছে। প্রাতঃকালীন পাঠ প্রধানতঃ হৃদয়মূল হইতে উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মধ্যাহ্ন-পাঠের স্বর কণ্ঠ হইতে এবং সায়াহ্নে শীর্ষমূল হইতে পাঠোচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, শিক্ষায় আমাদের অন্তর্যন্ত্র-গুলিরও অনুশীলন হয়। আত্মজ্ঞানের পক্ষে শিক্ষার প্রয়োজনের কথা তাই অধিক করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

বেদ গ্রন্থমাত্র নহে। মানবমূর্ত্তির ন্যায় বেদ একটি অধ্যাত্মবিগ্রহ। মানুষের ন্যায় বেদও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট। অঙ্গহীন আকৃতি যেমন অনাদরণীয় এবং অকর্ম্মণ্য, অঙ্গহীন বেদও তদ্রূপ শ্রবণের অযোগ্য ও ফলপ্রদ নহে। বেদাঙ্গের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

অর্থাৎ ছন্দঃ বেদের চরণ, কল্প হস্ত, জ্যোতিষ-শাস্ত্র চক্ষুঃ, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা এবং ব্যাকরণ মুখ। অতএব বেদাঙ্গ সহিত বেদপাঠ করিলে, ব্রহ্মলোকেও সে পূজিত হয়।

শিক্ষার পর কল্পশাস্ত্রের কথা। বেদের মার্গ দুইটি—কর্ম্ম ও জ্ঞান। কর্ম্ম কামজ। জ্ঞান মোক্ষপ্রদ। কর্ম্ম কোন না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নানাবিধ যজ্ঞকর্ম্ম। এই কর্ম্মের জন্যই ঋষিরা বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বিধি বলিতে প্রবর্ত্তন ও নিষেধ, এই উভয়ার্থক বাক্যই বুঝায়। ইহা করিতে হয়, ইহা করিতে নাই, এইরূপ শাসন-বাক্য বিধিশাস্ত্রের অন্তর্গত। বসন্ত-কালে উপনয়ন বিধি, প্রাবৃটে উপনয়ন-কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে—এই সকলই কল্পশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়। ইহা ব্যতীত বেদ-প্রবর্ত্তিত যজ্ঞাদি কিরূপ উপচারে, কি নিয়মে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার বিষয়ও কল্পশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। বেদে আছে—অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবে, সূর্য্যোদয়ে বা অনুদয়ে হোম করিবে, ইন্দ্র-বরুণাদি দেবতার আরাধনা করিবে, সায়ংসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপিতে হইবে। এই সকল বেদবিধি পালন করিতে হইলে, তাহার একটা নিয়মশৃঙ্খলা চাই। কল্প এই সব যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধিবাদ।

যজ্ঞ-শব্দের অর্থ কালক্রমে আমাদের নিকট খুব সুস্পষ্ট হইয়াছে। গীতায় ঈশ্বরারাধনারূপ কর্ম্মকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। যে সকল উপায়ে দিব্যজীবন গড়িয়া উঠে, সেই সকল নিয়মের অন্তর্গত করিয়া উপাসনাদির সহিত জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আহার, নিদ্রাদিরূপ কর্ম্মও যজ্ঞ-নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা কিছু আহার কর, কর্ম্ম কর, দান-পূজা প্রভৃতি কর অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশে সকল কর্ম্মই গীতাকারের কথায় যজ্ঞ আখ্যা পাইয়াছে। যাহা যজ্ঞ, তাহা দেবোদ্দেশেই সাধিত হয়। তাহার নিয়ম ও যথাবিহিত অনুষ্ঠানাদির কথা নিশ্চিতভাবে শাস্ত্রে নিবদ্ধ হওয়া চাই। জীবের জন্মকাল হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বকর্ম্মকে দিব্যনিয়মানুবর্ত্তী করার পক্ষে কল্পশাস্ত্র পরম সহায় বলিতে হইবে। গীতাকার তাই মন্ত্রহীন এবং শাস্ত্রাবিহিত কর্ম্মকে ব্যর্থ বলিয়াছেন। বেদ যদি হয় সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালের সত্য, তাহা হইলে এই সত্যকে শিক্ষার আশ্রয়ে জানা এবং এই সত্যের অনুসরণে শৃঙ্খলিত বিধির আশ্রয় কল্পশাস্ত্রকে স্বীকার করা অনিবার্য্য হয়। শিক্ষায় আমরা সত্যের অনুভূতি পাই, আর কল্পের সাহায্যে সত্য কৃতমূর্ত্তি ধারণ করে। এইজন্য শিক্ষা হইয়াছে বেদের ঘ্রাণ এবং কল্প বেদের হস্তস্বরূপ।

কল্পশাস্ত্র অনন্তবিধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি অখণ্ড জাতিগঠনের পক্ষে সেই জাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মশৃঙ্খলার বিধান কল্পশাস্ত্রেরই অন্তর্গত হইবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা দরকার—যে কর্ম্ম বৈদিক (বেদ বলিতে শুধু লিখিত গ্রন্থ নহে) অর্থাৎ বিশদ করিয়া বলিতে হইলে বলিব—যে কর্ম্ম ঋতময়, তাহাই বেদাশ্রিত এবং এই কর্ম্মকে সুনিয়মিত করিতে না পারিলে, কর্ম্মের বিশৃঙ্খলাহেতু মানব-সমষ্টির মধ্যে ঐক্য-রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। এই জন্য আর্য্য জাতি বেদ-প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও জাতি গড়ার জন্য শিক্ষার অনুশাসনের সহিত বৈদিক সভ্যতা-রক্ষায় জাতির সংস্কৃতি-সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির সুগঠিত বিধান ও সেই বিধান-সমূহ একত্র করিয়া গ্রন্থনিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাই কল্প নামে বেদাঙ্গের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বেদের ন্যায় এই কল্পশাস্ত্রও কোন একখানি মাত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। জাতির প্রকৃষ্টতর গতির সঙ্গে সত্যসন্ধ জীবনে কর্ম্মবৈচিত্র্য অনিবার্য্য হয় এবং সেই সঙ্গে নব নব কল্পসূত্র পূর্ব্ব কল্পশাস্ত্রাদির সহিত সংযোজিত হইয়া, বিরাট্ মূর্ত্তিতে ক্রমবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রাচীন বৈদিক যুগের কোন একটি যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, তাৎকালীন কল্পশাস্ত্রের অনুশাসন অবশ্যই পালনীয়। যুগের সঙ্গে সঙ্গে নব নব জীবননীতি ও সদনুষ্ঠান আবির্ভূত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও সুষ্ঠু বিধান যদি জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত না হয়, তবে উহাও কালক্রমে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে শাস্ত্রবিধিহীন হইয়া জাতির সংহতিশক্তিকে পঙ্গু ও ক্লীব করিয়া দিবে। জাতির প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি যত নিরাপদ্, নব যুগে কালোপযোগী অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন সেইরূপ নিরাপদ্ নহে। কেননা কোন সংহতির বা জাতির মধ্যে যে কোন কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠানেরই প্রবর্ত্তন করা হউক না কেন, তাহার মূলে কল্পশাস্ত্র নির্দ্দোষরূপে রচনা করিতে হইবে। কল্প স্থির না হইলে, অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন স্বৈরাচারের নামান্তর হয়। এই হেতু বেদ যেমন অনাদি যুগ ধরিয়া ঋক্-সম্ভারপূর্ণ, কল্প তদ্রূপ পুষ্টকলেবর হইয়া জাতিকে কৃতকর্ম্মা করিয়া তুলিতেছে।

এবার ব্যাকরণের কথা বলিব। যে শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বিশুদ্ধভাবে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ—ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। সকল ভাষার গোড়ায় ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি তত্তৎ ভাষা সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রদান করে, তাহা হইতে বিশুদ্ধভাবে লিখন ও কথন আয়ত্ত হয়। শুধু লিখিতে ও বলিতে ব্যাকরণের প্রয়োজন ব্যতীত, গ্রন্থাদির আলোচিত বিষয়ের সঠিকার্থ বুঝিবার পক্ষেও ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। বেদ একটি অপৌরুষেয় ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদের ভাষা দেবভাষা। এই বেদই একটা বিশাল জাতিকে যে ভাষা দিয়াছে, সেই ভাষার মর্ম্মোপলব্ধি করা ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। ব্যাকরণকে তাই বেদাঙ্গের মুখস্বরূপ বলা হইয়াছে।

বেদ মন্ত্রময়। মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান শিক্ষাশাস্ত্রে আছে। মন্ত্র-সাধনের বিধি কল্পশাস্ত্রে মিলিবে। কিন্তু মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান প্রয়োজনীয়। শিক্ষার অনেকাংশই কালে ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্র শব্দের দীর্ঘ-হ্রস্বাদি স্বরজ্ঞান, শব্দের ছেদ, সন্ধি আদি প্রকরণ ব্যাকরণের অন্তর্গত হইয়াছে। ইহার উপর মন্ত্রমালার প্রকৃতি-প্রত্যয়, শব্দরূপ ও অর্থ-হৃদয়ঙ্গমহেতু তদ্ধিত, সমাস, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণাদি বিভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে মিলে। অতএব ব্যাকরণকে বেদের বদনস্বরূপ বলায়, যথার্থ উপমাই দেওয়া হইয়াছে।

বেদ ত্রিকালব্যাপী। শুনা যায়—ইহা স্বর্গলোকেও প্রচলিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়—বেদ অনন্ত যুগ ও ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। প্রাচীন ভারতে দেবাসুর-সংগ্রামের কথা সর্ব্বজনবিদিত। ইহার অর্থ, আর্য্য জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও পৃথিবীতে দেবজাতি বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাঁহাদের মধ্যেও বেদগ্রন্থই ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে প্রচলিত ছিল। মন্ত্রময় বেদ—এই মন্ত্র যথাবিধি সুরে ও ছন্দে উচ্চারিত হইত। এই দিব্য যুগেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্রাদি দেবতারাও যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন। বেদপ্রতিষ্ঠিত এই দেবজাতির বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য সেই যুগেও বেদাঙ্গগুলির প্রবর্ত্তন ছিল। আমরা এই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যাকরণ-প্রণেতা অগ্নিদেবের নাম শুনিতে পাই। আজিও

অগ্নিপুরাণে দেখিতে পাই—ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ সংযুক্ত রহিয়াছে। স্বয়ং মহেশ্বর একজন উত্তম ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন। স্বর্গ হইতে গঙ্গাবতরণের ন্যায় সাঙ্গবেদ আর্য্য জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়। অনেক বৈয়াকরণিকের মধ্যে মহামতি পাণিনিকেই আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছি। পাণিনির স্তুতি কীর্ত্তন করিতে গিয়া টীকাকার ভরত বলিয়াছেন—

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ"

অর্থাৎ "যিনি মহেশ্বরের নিকট হইতে আগম-সহিত অকারাদি বর্ণ অধিগত করিয়া, সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্ররচনা করিলেন, সেই আচার্য্য পাণিনিকে নমস্কার।

যিনি মানবের বাক্যসমূহ বিশুদ্ধ শব্দরূপ বারিদ্বারা বিধৌত করিলেন এবং অজ্ঞানরূপ তমঃ বিনষ্ট করিলেন, সেই আচার্য্য পাণিনিকে নমস্কার।

এই পাণিনি বর্ত্তমান ব্যাকরণপ্রণেতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক। বেদের ভাষার বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ স্তুতি নামে কথিত হয়। শিক্ষাশাস্ত্রে উচ্চারণের বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়। ছন্দঃশাস্ত্রে স্তুতির তাল-লয়-মাত্রাদি বোধ জন্মে। কিন্তু স্তুতিমন্ত্রের মর্ম্মবোধের জন্য আমাদিগকে বৈয়াকরণিকদিগের নিকটই ঋণী হইতে হয়। বেদমন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারণ করিলেই বেদমন্ত্রসাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মন্ত্রার্থ অবগত হইতে হয়। মন্ত্র ধ্বনি ও অর্থযুক্ত হইয়াই আমাদের মনকে বিশুদ্ধ করে। এই হেতু ব্যাকরণ বেদের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত।

বেদাঙ্গের চতুর্থ অঙ্গ—নিরুক্ত। টীকাকার ভরত বলেন, "বর্ণাগমঃ বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ ইত্যাদিনা নিশ্চয়েনোক্তম্ নিরুক্তম্॥" অর্থাৎ বর্ণের উৎপত্তি, বর্ণের বিপর্য্যয় প্রভৃতির নিশ্চয় প্রকার উক্তিকেই নিরুক্ত বলে।

ব্যাকরণের সাহায্যে পদচ্ছেদ, শব্দাদির প্রকৃতি-প্রত্যয়, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা আমরা গ্রন্থাদিতে বর্ণিত বিষয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি। বেদের ভাষা অতি প্রাচীন, বৈদিক শব্দাদির অর্থ, অসংখ্য দেবতাগণের নামের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের জন্য এবং বিশেষভাবে বেদসূত্রের অর্থবোধের জন্য আমাদিগকে নিরুক্তকারের আশ্রয় লইতে হয়। অতি প্রাচীন যুগে বেদার্থপ্রতিপাদনের জন্য বহু নিরুক্তকারের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল নিরুক্ত গ্রন্থ আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। মহামতি যাস্কের নিরুক্তই আজও প্রচলিত থাকিয়া বেদাধ্যয়নের সহায়তা করে এবং বেদার্থ-প্রতিপাদনে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অভিধানে শব্দার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু বেদমন্ত্রের কোন শব্দ কোন অর্থে প্রযুজ্য হইবে, অভিধান-কথিত অর্থে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। একই অর্থে অনেক শব্দের ব্যবহার বেদে কথিত হইয়াছে। ব্যাকরণের দ্বারা এই সকল শব্দের লক্ষণ জানা যায়; কিন্তু এক অর্থ-বাচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ঠিক কি ভাব লইয়া বেদমন্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মাবধারণের জন্য নিরুক্তই একমাত্র গ্রন্থ। কেননা, বস্তুমাত্রেরই অর্থবাদ অন্যান্য শাস্ত্রে যেরূপ আছে, তাহা বস্তুর সবখানিকে পরিস্ফুট করে না। বেদ-বর্ণিত প্রতি বিষয়টি, প্রতি শব্দ গভীর অভিসন্ধিমূলক। এই জন্য বেদের শব্দার্থ-নির্ণয়ে বস্তুর কেবল আধ্যাত্মিক দিক্ নহে, তাহার ভৌতিক অর্থ এবং আধিদৈব অর্থও বিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়। বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগে যে সকল বস্তু-বিষয়ে শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, তাহার ত্রিবিধ অর্থ জ্ঞানগত করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে, নিরুক্তের অর্থবাদই একমাত্র আশ্রয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমরা দেখিতে পাই—বেদভাষ্য-রচনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহার শব্দার্থের একদেশতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য সায়নকৃত ভাষ্যে আমরা দৈব ও আধিভূত অর্থই পরিজ্ঞাত হই। বেদের শব্দার্থে একটা আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। নিরুক্তকার শব্দ লইয়া তাহার এমন এক সুনিপুণ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে, একই অর্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রকরণ বিশ্লেষণ করিয়া, সেই শব্দের ভাব কি অর্থে গ্রহণীয়, তাহা নিরুক্তকারের সাহায্যেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি পৃথিবী, অগ্নি, স্বর্গ প্রভৃতি

বস্তুর বহু নামের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। সেই স্বরূপের রূপেই একই বস্তুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায়টি বেদাধ্যায়ীর নিকট ধরা পড়িয়া যায়। গো, স্বর্গ, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের নামান্তরে কোথায় কোনটি আধিভৌতিক, কোথায় বা দৈব, কোথায় বা আধ্যাত্মিক অথবা ইহাদের মধ্যে দুইটী কিম্বা সমগ্র অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, নিরুক্ত-কথিত শব্দের অর্থবাদ ও প্রকরণবাদ ব্যতীত আর কুত্রাপি তাহা নিশ্চয়রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা নিরুক্তের ১৪শ অধ্যায়ে নিখিল পুরুষার্থসাধনের বেদমন্ত্র-নির্ণয়ে ৩৭টি প্রকরণ-বিভাগ লক্ষ্য করি। (১) বস্তুর নাম এবং সেই অখ্যাত নামের উপসর্গ-লক্ষণাদি নির্ণয়। (২) মন্ত্রের ভাববিকার লক্ষণ (৩) সর্ব্ববস্তুর আখ্যাত যথানির্দ্দিষ্ট নামের পক্ষ-প্রতিপক্ষ-বিচারের দ্বারা অবধারণ (৪) বহু ধাতু হইতে উৎপন্ন একই শব্দের অর্থ কোথায় কিরূপে প্রযুজ্য, তাহা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অবধারণ (৫) পদবিভাগ পরিজ্ঞাত হইয়া, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া, দেবতাদের লিঙ্গ-সঙ্কট হইতে উহার যথার্থ অর্থ যাজ্ঞিকদের নিকট প্রদর্শিত করা (৬) অর্থজ্ঞের প্রশংসা (৭) অনর্থজ্ঞানাবধারণ (৮) বেদ-বেদাঙ্গ-ব্যূহ (৯) প্রয়োজন-সাধনের জন্য বেদের নির্ঘণ্টরচনা (১০) প্রকরণত্রয় বিভাগের দ্বারা নির্ঘণ্টের প্রধান দেবতাদিগের নামবিভাগ (১১) নিশ্চয়াত্মক বচনের শব্দবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ (১২) অর্থপ্রাধান্য হেতু ও সামর্থ্যপ্রদর্শনের জন্য উপধার (অর্থাৎ অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণের) লোপ ও বিকার, বর্ণের লোপ ও বিপর্য্যয় হয়, এই উপদেশ হেতু আদি অন্ত্য বর্ণের ব্যপত্তিতে (নাশে) উপহিত বর্ণের দৃষ্টান্ত-চিন্তা (১৩) অন্তঃস্থ অন্তর্ধাতু নিমিত্তহেতু সম্প্রসারণীয় ও অসম্প্রসারণীয় উভয়ের প্রকৃতি ও ধাতুর নির্ব্বচন অর্থাৎ নিশ্চয়োক্তির উপদেশ (১৪) ভাষিকপ্রায় বৃত্তিসমূহ হইতে শ্রুতি-বাক্যের অর্থপ্রসিদ্ধি (১৫) নৈগমপ্রায় বৃত্তিসমূহ হইতে ভাষিকের শব্দ ও অর্থপ্রসিদ্ধি (১৬) দেশ-ব্যবস্থা হেতু শব্দ ও রূপের কথন (১৭) তদ্ধিত, সমাস ও নামের নিশ্চয়োক্তির লক্ষণ (১৮) শিষ্যের লক্ষণ (১৯) বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা তত্ত্বপর্য্যায়ভেদ, সংখ্যাসন্দিগ্ধ উদাহরণহেতু নিশ্চয়াত্মক উক্তি দ্বারা নামাখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত ইত্যাদির নির্ঘণ্টপ্রকরণের উপক্রমণিকা (২০) অনেকার্থ-যুক্ত অজ্ঞাত সংস্কারের অনুক্রমণিকা (২১) পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক মন্ত্র-লক্ষণ (২২) নিদান-পরিজ্ঞান ব্যাখ্যার্থ এবং অনির্দ্দিষ্ট দেবতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান-প্রদানার্থ অধ্যাত্মোপদেশের স্বরূপ-নির্ণয় (২৩) স্তুতি, আশীর্ব্বাদ, শপথ, অভিশাপ, দুঃখ ও নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদিসূচক মন্ত্রের হেতুনির্দ্দেশ (২৪) জন্মবৈচিত্র্য (২৫) স্থানত্রয়ের ভেদ-হেতু স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষ প্রত্যেকের নামাবলী (২৬) উৎপত্তি সম্বন্ধহেতু পৃথক্ পৃথক্ শব্দার্থ (২৭) দেবতাদের নাম ও আকারচিন্তন (২৮-৩৩) ভক্তিপূর্ণ স্তুতি ও কর্ম্মসূক্ত-সমূহের নির্ঘণ্ট (৩৪) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদের অভিধেয় ও অভিধান সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি এবং তৎসম্বন্ধে শ্রুতির উদাহরণ (৩৫) ঐ সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক বাক্যসমূহের বিচারে ব্যুৎপত্তি-লাভের অনুক্রমণিকা ব্যাখ্যার্থ দেবতাদের প্রকরণনির্ণয় (৩৬) অপরাবিদ্যালাভের উপায়-নির্দ্ধারণ (৩৭) যথাযথ মন্ত্রের দ্বারা কোন দেবতাকে কি ভাবে আহ্বান করিলে কি ফল-লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক উক্তি ও নির্দ্দেশ।

অতএব বৈদিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থেই যে বিশদীকৃত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। এই হেতু নিরুক্ত গ্রন্থকে বেদের শ্রবণেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে।

নিরুক্তের পর জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা। জ্যোতিষ বেদের পঞ্চম অঙ্গ। বেদের দশম মণ্ডলে ২য় সূক্তের এক ঋকে পাওয়া যায়—অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন, "কোন সময়ে কোন কোন্ দেবতার আরাধনা করিতে হয়, অগ্নি সেই সেই সময়ে সেই সেই দেবতাকে আহ্বান করিয়া আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ করুন।" বৈদিক যজ্ঞাদির জন্য যথানির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ব্যতীত মানুষের জন্ম, কর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সর্ব্ব বিষয়ের অনুষ্ঠানের জন্য শুভাশুভ কাল-নির্ণয়ের প্রয়োজন ঋষিরা অনুভব করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সেই জ্ঞান দিতে পারে। সূর্য্যাদি গ্রহ-সংস্থানের নিয়মানুসারেই কালাকাল-নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। গ্রহাদির স্থিতি ও গতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জন্মিয়া থাকে। ভূমণ্ডল

ও এতদবস্থিত স্থাবর-জঙ্গমের উপর গ্রহাদির সম্পর্ক সুধীজন-বিদিত। প্রভুর সহিত ভৃত্যের, পতির সহিত পত্নীর প্রভৃতি জাগতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কালাকালের বিচার না রাখিলে, সম্বন্ধের ব্যত্যয় হয়। এই বিষয়ে লোক-দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিবাহবন্ধন যথালগ্নে না হইলে, পতি-পত্নীর মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ হয়, পতির পত্নীবিয়োগ হয়, নারীর বৈধব্য ঘটে—এ সকল কথা নূতন নহে। শুভাশুভ কর্ম্ম কালের অপেক্ষা রাখে। রাজদর্শনেও কালাকালের বিচার আছে। অতএব জীবের সহিত গ্রহাদির সম্বন্ধ থাকায়, কোন গ্রহ কোন কালে প্রশস্ত ফল প্রদান করে, কাহার ভাগ্যদেবতা কোন সময়ে ভাল-মন্দ ফল দান করেন, এ সমস্তই জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়। প্রাচীনকালে যজ্ঞাদির কাল নির্ণয় করার পক্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান-লাভের বিশেষ প্রয়োজন হইত। শুধু তাহা নহে, পরন্তু কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্ম কোন সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করার পক্ষেও জ্যোতিষ এ জাতির চক্ষুঃ-স্বরূপ ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এই জন্যই বেদের চক্ষুঃ স্বরূপ বলা হইয়াছে।

পরমাত্মা উপাধিভেদে বহু হইয়াছেন। এই বহুত্বের এবং অদ্বয় ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে কালের ব্যবধান, তাহাতে অসংখ্য অভিমানী দেবতারা উদ্ভূত হইয়াছেন। ধর্ম্মকর্ম্মে ভূতশুদ্ধিরই শুধু প্রয়োজন হয় না, পরন্তু অন্তরীক্ষচারী দেবতাদিগকেও প্রসন্ন করিতে হয়। এই দেবতাদিগের মধ্যে রবি, চন্দ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদিগকেও অন্তরীক্ষ-দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধুনা জ্যোতিষশাস্ত্রে নবগ্রহ ব্যতীত বেদোক্ত ইন্দ্র, প্রজাপতি, রুদ্র ও বরুণ গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পাঞ্চভৌতিক জীবনক্ষেত্রের পশ্চাতে এই সকল অন্তরীক্ষচারী গ্রহাদির সংস্থান এবং তদনুযায়ী শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতির কাল-নির্ণয়ের পক্ষে জ্যোতিষশাস্ত্র আশুফলপ্রদ। বেদে দেবতাদিগের উপাসনা এবং তাঁহাদের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য অসংখ্য ঋক্ রচিত হইয়াছে। সেই সেই দেবতাদিগের শক্তি, সামর্থ্য, গুণ, প্রকৃতি, তাঁহাদের ভাব ও গতি প্রভৃতি বিষয়ের সঠিক বিবরণ জ্যোতিষশাস্ত্রে পাওয়া যায় বলিয়াই, ইহা বেদের অঙ্গরূপে স্থান পাইয়াছে। পরাশর মুনি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কালাকাল-নির্ণয়হেতু জ্যোতিষের সূত্র রচনা করেন। অতএব বেদজ্ঞান-লাভের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের কিরূপ প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বেদাঙ্গের ষষ্ঠ অঙ্গ ছন্দঃ। শিক্ষায় স্বরবিজ্ঞানের সঙ্কেত পাওয়া যায়; কিন্তু স্বরের উপযোগিতা অর্থাৎ স্বরার্থস্মরণে উচ্চারণ-নীতি ছন্দঃশাস্ত্রেই আছে। বেদ ছন্দের বীজস্বরূপ। ছন্দোবোধ না হইলে, কোন বীজের কিরূপ উপযোগিতা তাহা নির্ণয় করা যায় না। কোন বীজমন্ত্রের কোন রস, কোন গুণ, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, ছন্দঃশাস্ত্রই অবলম্বনীয়। বেদের মন্ত্র শ্রুতিমধুর হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। মন্ত্রবীর্য্য অন্তরে প্রবেশ করা চাই। ছন্দোজ্ঞান হইলে, শিক্ষা ও ব্যাকরণাদি দ্বারা বেদ-মন্ত্রের অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সহজেই তাহা হৃদয়গত করিতে পারি। বেদের ছন্দঃ প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত। উহাদের নাম—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী। ছন্দঃ লঘু-গুরু স্বরমিশ্রিত হইয়া সুমধুর সুরে উচ্চারিত হয়। গায়ত্রী ২৪ অক্ষরে, তিন চরণে নিবদ্ধ। ২৮টি অক্ষর লইয়া উষ্ণিক ছন্দঃ রচিত হয়। অনুষ্টুপে ৩২টি, বৃহতীতে ৩৬টি, পঙ্‌ক্তিতে ৪০টি, ত্রিষ্টুভে ৪৪টি এবং জগতীতে ৪৮টি অক্ষর আছে। এই সাতটি ছন্দঃ বৈদিক ছন্দঃ নামে কথিত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে এই সপ্ত ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। পিঙ্গলাচার্য্য ছন্দঃশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য। পিঙ্গলসূত্র বেদের ছন্দোবোধের ভিত্তিস্বরূপ।

বেদের ছন্দকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। অতি প্রাচীন কালে যে বৈদিক ছন্দঃ, তাহাই পরবর্ত্তী যুগে লৌকিক ছন্দে পরিবর্ত্তিত হয়। মহর্ষি বাল্মীকি লৌকিক ছন্দের প্রবর্ত্তক। বাল্মীকির লৌকিক ছন্দের পর ছন্দঃ-শাস্ত্রে দুই শতের অধিক ছন্দঃ প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য এই দুই শত প্রকার ছন্দঃ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না। অন্ততঃ ৫০ প্রকার ছন্দঃ সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছন্দকে যে বেদের চরণ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ—বেদ-মন্ত্রের শব্দবোধ শিক্ষাশাস্ত্রে হয়, মন্ত্রোচ্চারণের নীতি

ব্যাকরণ দিয়া থাকে, কল্প শব্দমন্ত্র কার্য্যতঃ সিদ্ধ করার বিধান দিয়া থাকে, নিরুক্ত-সাহায্যে মন্ত্রার্থ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, জ্যোতিষ হইতে আমাদের জীবন-বিজ্ঞানের পশ্চাতে অভিমানী দেবতাদিগের গুণ ও প্রকৃতি অবগত হই, কিন্তু ছন্দঃ ব্যতীত বেদ-মন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। মন্ত্র-বীর্য্যই জগৎ-রচনার হেতু। এই জগৎ গতিশীল মন্ত্র-প্রভাবে। বেদ-মন্ত্র সর্ব্বদাই ফলপ্রদ। মন্ত্র জ্ঞান দেয়। মন্ত্র শক্তি দেয়। জ্ঞানের দ্বারা বেদোক্ত অসংখ্য দেবতা-গণের অন্তরে এক অদ্বয় ব্রহ্মকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কর্ম্মে অলক্ষ্য দেবতাগণের গুণ ও শক্তি অনুভব পূর্ব্বক তদাত্ম হইয়া আমরা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম সজীব হইয়া উঠে না, যদি আমরা ছন্দঃশাস্ত্রে সমুচিত ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে না পারি।

বেদের ভাষা মন্ত্রময়। মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ হইয়া নানা ঋকে ধ্বনিময় হইয়া সঙ্গীত রচনা করে। মন্ত্রে আমরা অধি-দেবতার সাক্ষাৎকার পাই। কিন্তু সেই মন্ত্র সজীব করিয়া তুলিতে না পারিলে, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় সবই নিষ্ফল হয়। বৈদিক মন্ত্র আমাদের সচেতন করে। উপাসনার ঋকে আমরা প্রাণের সন্ধান পাই। বেদোক্ত কর্ম্মে আত্মবিগ্রহ গড়িয়া তুলি। কিন্তু ছন্দের পরশপাথর স্পর্শ না দিলে, সবই অচল হইয়া রহে—সবই স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। গতির আনন্দে জীবনের অভিযান সুরু হয় না। ছন্দকে চরণের দৃষ্টান্তে মর্য্যাদা দেখাইয়া শাস্ত্রবিদ্‌গণ যোগ্য উক্তিই করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য—দেশের মুক্তি ও উন্নতি যেমন আজ সহজ কর্ম্ম নহে বলিয়া বুঝিলেও, ইহার জন্য আমাদের বুকের উত্তাপ আজও শীতল হয় না, তদ্রূপ ভারতের সংস্কৃতি-রক্ষার ভিত্তিস্বরূপ বেদাঙ্গের অনুশীলন যতই দুরূহ বলিয়া মনে হউক, এই দিকে যেন আমরা উদ্যমহীন না হই। পবিত্র ভারতবর্ষের বুকে প্রাচীন যুগের স্মৃতিবিজড়িত অসংখ্য নদী, পর্ব্বত ও জনপদ যেমন আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনার প্রেরণা দেয়, তেমনি ভারতের অদ্বিতীয় সংস্কৃতি বেদ অমর হইয়া এই পতিত জাতির ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে আমাদের জীবনে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের অশেষবিধ দুর্গতির মধ্যে, অতি-বড় দুর্দ্দিনেও জীবন-সংগ্রামের সহিত সাঙ্গ বেদকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-সংস্কৃতির উপর ভারতকে পুনঃ বিজয়ী করিতে পারি। এই আকূতিতেই উদীয়মান তরুণকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—এমন মানুষই যেন ভারতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা নিশ্চিতভাবে বেদকে আশ্রয় করিয়া বলিতে পারিবে—

> "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
> তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥"

মনে রাখিতে হইবে—এই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অপৌরুষেয় বেদবিগ্রহ—সনাতন পরমাত্মা। আর পার্থ ভারতের আর্য্য সন্তান—উপাধিভূত চৈতন্য। যোগের জন্য আজ পার্থের ও সনাতন বেদের অভ্যুত্থান কামনা করি।

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

অমৃতের সুসন্তান, উঠ, জাগ, তাঁর কথা শুন,
পুরুষসত্তম যিনি, বাণী তাঁর কহি পুনঃ পুনঃ ;
আমি শুনিয়াছি কাণে, দেখিয়াছি দিব্য চোখে তাঁরে
—আদিত্যের বর্ণ তাঁর সূচীভেদ্য তমসার পারে।

আমি মৃত্যুপারগত, তুমি মৃত্যুপারে যাবে যদি,
প্রত্যক্ষ করিবে তাঁরে অতিবাহি' মৃত্যু-মহানদী—
শুদ্ধ, বুদ্ধ, সুমহান্, স্বপ্রকাশ, পরম সুন্দর,
আনন্দ চিন্ময় রসে হেরিবে সে পীযুষ-নির্ঝর।

রিক্তা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রমা শয্যার উপর পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতেছে, বার বার তাহার অঞ্চল ভিজিয়া উঠিতেছে, তথাপি তাহার কান্নার নিবৃত্তি হইতেছে না। বুকের ভিতর হইতে তাহার কান্না উঠিয়া আসিতেছে সমুদ্র বেলার অফুরন্ত ঢেউয়ের মত।

সঙ্গে সঙ্গে রমা কাঁপিতেছে। তাহার সমস্ত অন্তর মথিয়া রুদ্ধ আবেগ বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছে, কিন্তু বাহির হইতে পারিতেছে না। আহত সর্পের মত ক্ষণে ক্ষণে তাহার দেহ কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। ক্রোধে কাঁপিতেছে রমা।

স্বামী আজ জোর করিয়া তাহার হাত হইতে চাবীর গোছা কাড়িয়া নিয়াছে। এই অপমান সে সহ্য করিতে পারে না। এই মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হওয়াই ছিল ভাল, এত লোকের মৃত্যু হয় সংসারে, তাহার মৃত্যু হয় না কেন?

তাহার মনের ভিতর ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল, কি এমন হইয়াছিল যে, স্বামী এ-ভাবে তাহাকে অপমান করিতে পারে? তাহার শ্বাশুড়ীর বয়স হইয়াছে। কিছুই মনে থাকে না তাঁর। তাঁহার হাতে যদি লোহার সিন্দুকের চাবী সে না রাখিতে চায়, তবে সে অন্যায় করিবে কিসে?

আজই তো সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল। লোহার সিন্দুকের চাবী বিছানার উপর ফেলিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন তিনি নদীতে। যদি চাকরেরা কেউ দেখিয়া একটা অসতর্ক মুহূর্ত্তে সব কিছু লইয়া বাহির হইয়া যাইত, তাহা হইলে কি উপায় হইত তখন?

ইহার পর চাবী আর শ্বাশুড়ীকে ফিরত না দিয়া, কি অন্যায় করিয়াছে সে? কিন্তু চাবী সে ফিরত দিবে না বলিয়া, তাহার নিজের চাবী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইবে তাহার স্বামী! যদি আজ তার স্বামী তাহাকে মারিত, তাহা হইলেও তাহার এত দুঃখ হইত না।

রমার ক্ষুব্ধ চিন্তা হঠাৎ বাধা পাইল। শ্বাশুড়ী আসিয়া কহিলেন, একি বৌমা, তুমি খাবে না আজ? এখনও শুয়ে আছ!

রমার কলহটা হইয়াছে স্বামীর সহিত। শ্বাশুড়ীর সহিত হয় নাই। কিন্তু এই শ্বাশুড়ীর জন্যই তো কলহ। মা পারেন না, তবু মায়ের হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়া মাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। শ্বাশুড়ীর দিকে চাহিতে রমার সমস্ত শরীর যেন আবার নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কোন উত্তর করিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল।

অন্নদা এবার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, ভাতের উপর রাগ করতে নেই বৌমা। আগে খেয়ে এসে তারপর শোও।

কিন্তু রমা ইহাতে শান্ত হইল না। সহসা ফিরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া কহিল, না আমি খাবো না, আপনি যান।

ঝি-চাকর দুটো যে বসে আছে তোমার জন্য। তাদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

আমি খেতে বলে' দিয়েছি তাদের; বলিয়া রমা চুপ করিল।

অন্নদা কর্ত্তব্য বোধেই এবং হয়তো ভালবাসিয়াই বৌকে তুলিয়া নিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ফিরিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। যে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না, তাহাকে তিনি সন্তুষ্ট করিবেন কি দিয়া? বৌকে সুখী করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটিই তো তিনি রাখেন নাই। সংসারে টাকা পয়সা দিয়া যতটা সুখ বৌকে দেওয়া যায়, তা তিনি দিয়াছেন। কিন্তু শ্বাশুড়ীর হাতের ভিক্ষা সে চায় না। সংসারের কর্ত্তৃত্ব সে চায়। সে চাহিয়াছিল বৌকে মেয়ের মত করিয়া লইতে। কিন্তু বৌ ভাব করিতে চায় না। সে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। সে যুদ্ধই চায়—সন্ধি চায় না। যে-পর্য্যন্ত আসমুদ্র রাজ্য ও রাজপুত্র হস্তগত না হয়, সে-পর্য্যন্ত সে থামিবে না

বৌ যে না খাইয়া পড়িয়া রহিল, এ-জন্য তাঁহার বুকের ভিতর কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, অশোক আসিয়া না বলিলে, বৌ খাইবে না। সুতরাং তাঁহার চলিয়া যাইতেই হইল

বেলা পাঁচটায় অশোক ফিরিয়া আসিল অফিস হইতে। বাড়ি আসিতেই মা তাহাকে জানাইলেন, বৌ আজ ভাত খায়নি এখন পর্য্যন্ত।

আজ সারা দিন অশোক ইহাই আশঙ্কা করিতেছিল। আজ অফিসে সে একটুও প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে নাই। সংসারে এমন অশান্তি থাকিলে, কেউ কি হাসিতে পারে? কার সংসারে এমন হয়? মায়ের হাতে সংসার রহিয়াছে। তিনিই সব দেখিয়া শুনিয়া করিতেছেন। তাঁহার মনে অসীম দুঃখ দিয়া তাঁহার হাত হইতে এখনই সংসার কাড়িয়া নিবার দরকার কি? স্বামীর ভালবাসা রমা পাইয়াছে। সংসারে কিছুরই অভাব নাই তার। সিনেমা, থিয়েটার যখন খুশি তখনই দেখিতেছে। ইচ্ছামাত্র সব কিছু সে পায়। তবু মায়ের হাত হইতে সিন্ধুকের চাবিটি কাড়িয়া না নিলেই কি নয়? এইজন্য রাগ করিয়া না খাইয়া থাকা শোভন না সঙ্গত?

অত্যন্ত সন্তর্পণে অশোক প্রবেশ করিল শয়ন ঘরে।

রমা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চোখের জলের লুপ্ত চিহ্ন তখনও তার চোখে মুখে লাগিয়া রহিয়াছে, নদী-সৈকতে ফেলে-যাওয়া কোমল পদচিহ্নের মত। ফুলের মত দল মেলিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে রমা। অশোক তাহার মুখ-খানির দিকে তাকাইয়া রহিল। ঐ মুখখানির দিকে যখন সে তাকায় তখন সে রমার সকল অপরাধ ভুলিয়া যায়। কতক্ষণ অজ্ঞাতসারে কাটিয়া গেল। তাহার পর রমার মাথার উপর একখানা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে সে ডাকিল, রমা!

রমা চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়াই দেখিল স্বামী। আবার তাহার দুই চোখে প্লাবন নামিয়া আসিল। অশোক তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ তুমি খাও নাই রমা? রমা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আর আমার খেয়ে কাজ নেই। আমাকে মেরে ফেল তোমরা।

অশোক অস্থির হইয়া কহিল, ওকি কথা রমা! ওঠ, খাবে চল।

না, আমি আর খাব না। যে স্বামীর ভালবাসা হারায়, তার না খেয়ে মরাই ভাল।

অশোকের মনের দৃঢ়তা এক লহমায় কোথায় উবিয়া গেল। সে কহিল, চাবী নিয়েছি বলে তোমার রাগ! এই নাও চাবী, বলিয়া নিজের ড্রয়ার হইতে চাবী বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু রমার হাতে চাবী দিবার পূর্ব্বে সিন্দুকের চাবীটি সে পৃথক করিয়া লইল।

রমা মুহূর্ত্তের জন্য একবার চক্ষু মেলিল। মেলিয়া দেখিল, তাহার চাবী শুধু স্বামী দিয়াছে—সিন্দুকের চাবী তাহাতে নাই। রমা হাত দিয়া চাবীর গোছা মেজেতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, না আমি চাইনে।

কেন, কি হ'ল আবার?

কিন্তু রমা মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। অশোক আবার তাহার মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলাইয়া শেষে আদর করিয়া কহিল, কেন, কি হয়েছে বল।

এইবার রমা কহিল, দিলে তুমি সবই দেবে। না হয় আমি কিছুই চাইনে।

অশোক প্রতিবাদ করিল, কেন, মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে দরকার কি?

এতে দুঃখ দেওয়ায় কি আছে? যে যে-কাজ পারে না, তাকে সে-কাজ দেওয়া কেন? তাঁর এখন ধর্ম্মকর্ম্মের সময়। সিন্দুকের চাবী দিয়েই তাঁর দরকার কি?

দরকার কিছু নাই সত্যই। রমার কাছে সিন্দুকের চাবী যে অনেক নিরাপদ, তাহাতে সন্দেহ কি আছে? কিন্তু ইহাতে যে তাহার মা দুঃখ পাইবেন, তাহা সে ভুলিয়া যাইতে পারে কেমন করিয়া? সে কি তাহার মাকে কখনও দুঃখ দিতে পারে? কত কষ্ট সহিয়া তাহার মা তাহাকে মানুষ করিয়াছেন! তাহাকে চার বৎসরের রাখিয়া পিতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতার দীর্ঘ অসুখে সংসারের সকল অর্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। মা তখন একটি গৃহস্থের বাড়ীতে রান্না করিয়া কত দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন! সেই মাকে সে অবমানিত করিবে?

অশোক অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল। সে কহিল, না, ও-চাবী তুমি পাবে না। মায়ের মনে দুঃখ দেওয়া হ'বে না।

রমা উঠিল না—খাইল না—আবার ফোঁপাইয়া

ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চাবী না পাইয়া সে উঠিবে না। চাবী তাহাকে পাইতেই হইবে। যদি সামান্য একটা চাবী সে স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিতে না পারে, তবে সে নারী হইয়া জন্মিয়াছিল কেন!

রাত্রে বৌ খায় নাই। পরের দিন ঘুম হইতে উঠিয়াই অন্নদা বৌয়ের জন্য কতকটা অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গৃহ হইতে বাহির হইতেই তিনি দেখিলেন, বিগত দিনের কিছুমাত্র গ্লানি তাহার মুখে নাই। সমস্ত মেঘ নিশ্চিহ্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে একটা নগ্ন দাম্ভিকতা—অনমনীয়, কঠোর, উগ্র। তাহার চোখ দুইটি যেন বলিতেছে, এটা আমার বাড়ী, আমার ঘর, এ-বাড়ীর কর্ত্রী আমি, এখানে আর কারো প্রভুত্ব আমি চাই না।

অন্নদা সর্ব্বদাই দেখিয়াছেন, বৌয়ের সঙ্গে কলহ করিয়া কখনই তিনি জিতেন না। ছেলে হয়তো মায়ের পক্ষ নিয়া রুখিয়া যায়, কিন্তু কখনই শেষ রক্ষা করিতে পারে না। বৌয়ের উপর রাগ তার হয়। কিন্তু কখনই তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মুহূর্ত্তের জন্য একবার সে আতস বাজির মত জ্বলিয়া উঠে। তাহার পরই সব উলট-পালট হইয়া যায়।

অন্নদা বুঝিয়াছিলেন, কি হইয়াছে। তথাপি বৌয়ের খাওয়া সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কতক্ষণ পর ছেলেকে কহিলেন, সিন্দুকের চাবী দে তো একবার, টাকা বের করতে হ'বে।

অশোক অসঙ্কোচে কহিল, তুমি আর সিন্দুকের চাবী ছুঁতে যেয়ো না মা। দাও ওকে সব ছেড়ে, দেখি ও কিসে সন্তুষ্ট হয়। বলিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল!

ছেলে চলিয়া গেল। কিন্তু অন্নদা দেবী যেন শুব্ধ হইয়া গেলেন। যে-ছেলে তাঁর, সেই ছেলের সংসার আর তাঁর নয়! আজ হইতে ছেলের সংসারের উপর তাঁর আর কোন অধিকার থাকিবে না। কত আশায় বুক বাঁধিয়া ছেলেকে তিনি মানুষ করিয়াছেন! সমস্তটা জীবন রন্ধনশালার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া কত সোনার স্বপনই না তিনি দেখিয়াছেন! আজ সকল স্বপ্ন তাঁহার শূন্যে মিলাইয়া গেল! তিনি ভাবিয়াছিলেন, চিরটা জীবনই তাঁহার দুঃখে গিয়াছে। ছেলে মানুষ হইবার পর তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইবে। তিনি ভিখারিণী ছিলেন, আবার তিনি রাণী হইবেন। এই তিনি রাণী হইলেন! কত আশা লইয়াই না ছেলেকে তিনি বিবাহ করাইয়াছিলেন! এই তাঁহার সকল আশা পুর্ণ হইল!

দিন কয়েক পর অশোক একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, মা!

অন্নদা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, কি রে বাবা?

বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা।

ক্ষুধা যে অশোকের খুব বেশী পাইয়াছে তা' নয়। কিন্তু মাকে একবার ডাক দিলেই মা যে কত খুশী হন, তা' সে জানে। অন্নদা দেবী কহিলেন, আমি হালুয়া তৈয়ের করে' রেখেছি তোর জন্য। এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি। তুই হাত মুখ ধুয়ে নে।

প্রতিদিন অন্নদা নিজ হাতে ছেলের জলখাবার তৈয়ার করিয়া রাখেন। কোন দিন সন্দেশ, কোন দিন হালুয়া, কোন দিন বা আর কিছু। এই কাজটি পরম নিষ্ঠার সহিত তিনি করেন, দৈনিক শিবপূজার মত। অশোক হাত মুখ ধুইয়া আসিতেই তিনি হালুয়া আনিয়া ছেলের টেবিলের উপর রাখিলেন।

রমা কাছে দাঁড়াইয়া স্বামীকে বাতাস করিতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল খাবারের দিকে। সে দেখিল—হালুয়ার ভিতর দীর্ঘ একটা চুল জড়াইয়া আছে। এইরূপ একটা দিনের জন্যই সে পল গণিয়া গণিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি পাখা রাখিয়া দিয়া হালুয়া হইতে চুলটা টানিয়া বাহির করিল।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা?

দেখ কি সর্ব্বনাশ, কত বড় একটা চুল রয়েছে! এটা পেটের ভিতর গেলে কি আর রক্ষে ছিল! মা এখন চোখে দেখেন না ভাল, তবু মায়ের সব করা চাই। বলিয়া রমা ছোঁ মারিয়া বাটিটা তুলিয়া নিয়া উঠানের কুকুরটার সম্মুখে সমস্তগুলি হালুয়া ঢালিয়া দিয়া আসিল।

অশোক দুঃখিত কণ্ঠে কহিল, ফেলে দিয়ে এলে একেবারে!

হাঁ, ফেলে দিয়ে এলাম। আজ থেকে আমিই খাবার তৈয়ের করব। আর কারও কিছু করতে হবে না, বলিয়া দ্রুতপদে ভাঁড়ারের দিকে রমা চলিয়া গেল।

অশোক মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাইল। শ্রাবণের মেঘের মত অশ্রুজলে মুখখানি থমথম করিতেছে। সে মাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, দেখো কি পাগল! একদিন একটা চুল না পড়ে কার রান্নায়! চলে গেল নিজে খাবার তৈয়ের করতে!

অন্নদা আজ আর অভিযোগ করিলেন না। তিনি জানেন, বৌ যখন হাত দিয়াছে, তখন আর সে এই দায়িত্ব হাতছাড়া করিবে না। কহিলেন, থাক বাছা, বৌমা করতে চায়, বৌমাই করুক। আমি তো সত্যই এখন চোখে দেখিনা ভাল, বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন।

কিন্তু আজ ঘরে আসিতেই তাঁহার মনে হইল, ছেলের উপর সকল স্বত্ব আজ যেন তিনি বৌকে দানপত্র করিয়া দিয়া আসিলেন। সমস্ত দিনের ভিতর ছেলের সঙ্গলাভ করিবার ইহাই ছিল তাঁহার শেষ অবসর। বৌ আজ তাহাও ছল করিয়া কাড়িয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে ত্রুটি ধরিয়া ধরিয়া বৌ সংসারের সকল অধিকার হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়াছে। তাহাতে আঘাত পাইয়াছেন তিনি যথেষ্ট, তথাপি তিনি সকলি সহ্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এখন হইতে ছেলের উপরও আর তাঁহার কোন দখল থাকিবে না? অথচ এই ছেলে তাঁহারি পেটে হইয়াছে! তাঁহারি রক্তমাংসের এক অংশ এই ছেলে। যে তাঁহার একান্তভাবে আপনার, সে কেমন করিয়া পর হইবে? তাহার উপর তাঁহার দখল থাকিবে না, ইহা হয় কেমন করিয়া? বৌমারও তো এমনি ছেলে হইবে! সেও আর তাহার থাকিবে না!

বাহিরে প্রবল মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। অন্নদা একবার মেঘমলিন আকাশের দিকে তাকাইলেন। নিবিড়, গাঢ়, কৃষ্ণ মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, এ-মেঘ আর কোন দিন কাটিবে না।

ঘরের ভিতর জল আসিতেছিল। অন্নদা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

সত্যেন্দ্র-স্মরণে*

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সত্যেন দত্ত
বাংলার গর্ব্বে গর্ব্বিত—মত্ত
সত্যেন দত্ত!
কাব্যের ছন্দে
সাহিত্যে দ্বন্দ্বে
একলাই নির্ভীক,
একলাই সব দিক্
একলাই ঘর্ ঘর্
ঘোরাচ্ছে ঘর্ঘর
চরকার মন্ত্র
বাংলার যন্ত্র···

ঘাটলায় মাত্‌লায়
বর্ষায় - বাদ্‌লায়—
বীজ ধান বুন্‌ছে
সব্বাই শুন্‌ছে
দেশে দেশে
পড়ছে সাড়া
"দাঁড়া আপনার
পায়ে দাঁড়া।"
সত্য এ সত্য
সত্যেন দত্ত॥

যৌবনে আগ্‌লা
একদম পাগ্‌লা
ঝর্ণায় নাচ্‌ছে
বন্যায় কাঁদ্‌ছে
ফুল নিয়ে কৌতুক
আনন্দ যৌতুক
[illegible]
নূতন সৃষ্টি
নূতন দৃশ্যে
আন্‌ছে বিশ্বে-

সুন্দর শুদ্ধ
বাংলার বুদ্ধ
মহাজাতির
বাজে কাড়া
"দাঁড়া আপনার
পায়ে দাঁড়া—
শেখায় নব নব
বৈদিক তত্ত্ব
বাংলার গর্ব্বে
গর্ব্বিত মত্ত···
সত্যেন দত্ত।

* সত্যেন্দ্র-সাহিত্য-সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্বর্গত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ২০তম মৃত্যু-বার্ষিকী সভায় পঠিত।

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি

৪

পরবর্ত্তী যুগ

এই সম্প্রদায়ে অদ্বৈত গোস্বামী একজন বড় নেতা এবং চৈতন্যের অগ্রগামী ছিলেন। ইঁহার বড় কাজ হইতেছে ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত করা। পূর্ব্বেই ইঁহার কথা বলা হইয়াছে। ইঁহার বিষয়ে ঈশান নাগর বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম

* * *

হরিদাস কহে মুঞি অস্পৃশ্য পামর
মোর অঙ্গ ছুঁই কেনে অপরাধী হহ॥
প্রভু কহে নাহি বুঝি সজ্জাতি দুর্জ্জাতি
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব জাতি॥"(১)

হরিদাসের সঙ্গে মেলামেশার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈতকে জাতে ঠেলিয়াছিলেন—"প্রভুরে পাষণ্ডগণ বন্ধন করিল।"[২]। পরে হরিদাস শান্তিপুরে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা নারায়ণকে উৎসর্গীকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি খান নাই। পরে ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন—

"সাধু যে যতন করি অন্ন সমর্পিলা
পিছে দ্বিজগণ অন্ন পরশ করিলা।

* * *

ব্রাহ্মণ সমাজে দেখি ব্রহ্ম হরিদাসে।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কহে মৃদু ভাসে॥
প্রিয় হরিদাস কিবা ভাব প্রকাশিলা।
বহু ব্রাহ্মণগণের জাতি নাশ কইলা॥" (৩)

এই হরিদাসকে অদ্বৈত শ্রাদ্ধে খাওয়াইয়াছিলেন—,

"দ্বিজ থুইঞা হরিদাসে দিল শ্রাদ্ধ পাত্র

* * *

প্রভু কহে তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল।"(৪)

এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রথমাবস্থায় কি প্রকারের বৈপ্লবিক ছিলেন। সনাতনবাদীরা তাঁহাদের কর্ম্ম একদম পছন্দ করিতেন না। এইজন্যই শ্রীঅচ্যুতকে বারাণসীতে দিগম্বরন্যাসী বলিয়াছিলেন—

"বেদের বিরুদ্ধ কার্য্য করে সর্ব্বক্ষণ
যবন সংসর্গে নাহি মানয়ে দূষণ।"(৫)

আর চৈতন্য পুরীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পদসেবা করাতে আপত্তি করায়, ঈশান নাগর পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—

'এই ভাবি যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িনু তখন।"(৬)

পুরীতে হরিদাস, রূপসনাতন কখনও মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, এবং অন্যান্য ভক্তদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেন না। ইহা দীনতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না। নিশ্চয়ই সমাজগত কোন খোঁটা ছিল। রূপ-সনাতনের বংশে যে কোন সামাজিক দোষ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আর হরিদাস ঠাকুর যে মুসলমান ছিলেন তাহাও এড়ান যায় না। তাঁহাকে এখন ব্রাহ্মণবংশজাত বলা হইতেছে। অথচ চৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন—"জাতি, কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মিলে নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।" †

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন—

"হরিদাসে দেখি কাজী বন্ধন করিল।
যবন হইয়া কেন হিন্দুধর্ম্ম আচরিল।"(৭)

পুনঃ—

"হরিদাসে দেখি কহে যবনের পতি।
কাহে হিন্দুআনী কর হঞা উত্তম জাতি॥(৮)

আবার মুলুকপতি বলিলেন কেন—

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত।" *

১। "অদ্বৈত প্রকাশ"—৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৮১
২। অদ্বৈত প্রকাশ—৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৯৪
৩। অদ্বৈত প্রকাশ—৯ম অধ্যায় পৃঃ ৯৩
৪। ,, ,,— ,, ,, পৃঃ ৯৫

৫। "অদ্বৈতপ্রকাশ"—১৭শ অধ্যায়, পৃঃ ১৮৬।
৬। অদ্বৈত প্রকাশ—১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ২০০।
† চৈতন্যভাগবত—আ, ১৬-১৬-২৩৭।
৭। নিত্যানন্দদাস—"প্রেমবিলাস", পৃঃ ২৩৫।
৮। ঈশান নাগর—"অদ্বৈত প্রকাশ", ৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৮৮।
* চৈঃ ভাঃ—আদিখণ্ড, ১৬।৭২। এতদ্দ্বারা আমরা দেখি যে, তখনকার মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত একত্রে আহার করিতেন না।

এবং কাজীর বিচারে তিনি বাইশ বাজারে কোড়া খাইতেনও না। শ্রীচৈতন্য পুরীতে নরেন্দ্রসরোবরে সপারিষদ ভাগবৎ পাঠ শুনিতেছেন এবং তথায় হরিদাস দণ্ডায়মান আছেন। এইরূপ একটী চিত্র নাকি প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় অঙ্কিত হইয়াছিল! এই চিত্রটী ঘুরিতে ঘুরিতে মুর্শিদাবাদে কুঞ্জঘাটের রাজাদের বাড়ীতে সুরক্ষিত হইয়া আছে এবং তাহার ফটো সর্ব্বত্র পাওয়া যায়*। লেখক এই আসল চিত্রটি দেখিয়াছেন। নরতাত্ত্বিক চক্ষে এই চিত্রটিকে দেখিলে চৈতন্য প্রভৃতির বাঙ্গালীর মুখ বেশ ধরা পড়ে। আর হরিদাসের বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার বাঁকা নাক (acquiline) এবং গোঁপ-দাঁড়িযুক্ত মুখ দেখিয়া Rohilla type বলিয়া মনে হয়।

হরিদাসকে যেমন হিন্দুরা ব্রাহ্মণ সন্তান বলিতেছেন, কবীর ও দাদুরও† বিষয়েও তদ্রূপ গোলমাল আছে। শিখেরাও বলেন যে এককালে অনেক মুসলমান শিখ হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে কথা গোপন করা হইতেছে! এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় বলিতেছেন—"...এই সকল দেখিয়া মনে হয়, হরিদাস যবনকুলসম্ভূত ছিলেন"।‡

কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত একজন সাহিত্যিক লেখককে বলিয়াছিলেন যে, হরিদাসের জন্ম বিষয়ে একটী সঠিক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম ছিল ইব্রাহিম ও তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ আলি। লেখক এই পুঁথি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, দুই বৎসরেরও অধিককাল তাঁহাকে ঘুরাঘুরি করিতে হইয়াছে। শেষে লেখককে বলা হইল যে, উহা তাঁহাদের Museum-এ সংরক্ষিত আছে। তথায় লেখক গমন করিলে তত্রত্য অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলেন যে, সময়াভাব বশতঃ দেখান গেল না। কিন্তু ইঁহারা যে পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহা উল্লিখিত আছে। লেখক পুনরায় উক্ত সাহিত্যিকের নিকট গমন করেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুস্তকের কিয়দংশ কোন এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা তিনি লেখককে পাঠাইয়া দিবেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদই নাই। লেখক বিমানবাবুর পুস্তকে দেখিলেন, ইঁহাদের পুঁথির অসম্পূর্ণ যে তালিকাটি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে এই পুঁথির উল্লেখ নাই। যদি সত্যই এমন কোন পুঁথি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রামাণিকতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়। নিত্যানন্দ অদ্বৈতের তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দত্ত (ঠাকুর মহাশয়) ও শ্যামানন্দ গোস্বামী—ইঁহারাই বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের নিকট হইতেই আমরা এই সংবাদ পাই যে বাংলার "বার ভূঁইয়ার" অন্যতম শ্রীনিবাসের পুঁথির গাড়ী ডাকাত দিয়া লুট করাইয়া লন এবং পরে তাহা স্বীকারও করেন। বিষ্ণুপুরে রচিত প্রাচীন একটী কবিতাতে ইহা বর্ণিত আছে যে, শ্রীনিবাস পুঁথির গাড়ী হারাইয়া যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বীর হাম্বিরের পরিচয় কালে বলেন যে রাজা জাতিতে ছত্রী রাজপুত, লুঠ করিয়া ও মানুষ কাটিয়া ফেলে ১। এতদ্দ্বারা আমরা এই তত্ত্ব পাই যে, একজন বড় সামন্ত রাজাও লুঠতরাজ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেছেন। অবশ্য বীর হাম্বির বৈষ্ণব হইবার পর বৈষ্ণব লেখকেরা ইহার অলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়া আসল জিনিষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নরোত্তম দত্ত খেতুরীর রাজার একমাত্র পুত্র এবং ইহার পিতা গৌড়ের সুলতানের প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁহার এবং সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্যদাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ গোস্বামীর ত্যাগ বাংলায় অতুলনীয়। ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণদের শিষ্য করিতেন এবং আশীর্ব্বাদকালে ব্রাহ্মণদের

ইহার অর্থ—শাসকশ্রেণী শাসিতদের সহিত সাম্যভাবাপন্ন ছিলেন না। রাজনীতিক পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থাকে ধর্ম্মের রূপ দিয়া এই প্রাচীর মধ্যযুগে তোলা হইয়াছিল। ইহাই শ্রেণীস্বার্থের তৎকালীন রূপ। পরে মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে সেই প্রথার অনুসরণ করেন।

* দীনেশচন্দ্র সেন—History of Bengali Literature.

† কবীর সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামকুমার বর্ম্মা কৃত, 'হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস' এবং দাদু সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত 'দাদু' দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী—পৃঃ ২৮৮।

১। History of the Bishnupur Raj by Abhayapada Biswas.

মাথায় পা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ চটিয়া যান ; কিন্তু বৈষ্ণব নেতারা বলিলেন :—

"নরোত্তমে যে পাপিষ্ঠ শূদ্র বলি কয়
সবংশে সে পাপিষ্ঠ নরকেতে যায়।"

ইহার বিপক্ষে ব্রাহ্মণরা বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈলা সর্ব্বনাশ
* * *
কোথা হইতে বৈষ্ণব মত আনি প্রচারিল।
যত দেবদেবী পূজা সব উঠাইল ॥
* * *
মৎস্য-মাংস সব ত্যাগ, নিরামিষ খায়
সংকীর্ত্তনে নাচে কাঁদে পাগলের প্রায় ॥(১০)

নরোত্তম দাসের সম্বন্ধে ৺শিশিরবাবু বলিয়াছেন যে, ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, 'নাহি মানি দেবী-দেবা'। ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থলে যাগযজ্ঞ দেবী-দেবার পূজা, এমন কি জাতিবিচার পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল[১১]। ইনি বলিয়াছেন, "না করিবে অন্য দেব নিন্দন-বন্দন"। শ্যামানন্দ গোস্বামী সদ্‌গোপবংশীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণবংশ ব্যতীত অন্য জাতীয় যে কয়জন গোস্বামী পদ পাইয়াছিলেন, শ্যামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ইনিও ব্রাহ্মণ-শিষ্যের মাথায় পা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইহারই একটী পদাবলীতে আছে—

"ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করাইল কোলাকুলি
পরতেকে দেখ একবার।"(১২)

বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর একমাত্র পুত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। সেইজন্য তাঁহারও "বীরভদ্রি" দোষ হয়[১৩]। নিত্যানন্দের বংশবিস্তার নামক গ্রন্থে আছে যে, তিনি বসুধা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন পুস্তকে বলা হইয়াছে যে তিনি জাহ্নবী বা জাহ্নবা[১৪]দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার এক সহোদরা হয়—নাম গঙ্গা। ইহার বিষয়ে বলা হইয়াছে—

"সন্ন্যাসীর কন্যা কেহ বিভা করিতে না চায়।
মাধব আচার্য্য বিয়ে করে গুরুর আজ্ঞায় ॥"(১৫)

দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "গঙ্গাবংশীয় জনৈক পণ্ডিত আমাকে নানা প্রমাণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র নহে, এমন কি জাহ্নবী দেবী তাহার মতে পুরুষ। তিনি নায়িকাভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিতেন। কিন্তু পণ্ডিতটী যেরূপ যুক্তি ও প্রমাণের বহর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলীতে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে"[১৬]। লেখকের আত্মীয় এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ৺ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত সিমুলিয়ার ৺ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামীর সহিত একবার তর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ যে বিবাহ করিয়াছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। ইহার প্রত্যুত্তরে গোস্বামী মহাশয় বুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"ইহার প্রমাণ আমি।" ইহার পর রামবাবু রামকৃষ্ণের কাছে এই কথা উত্থাপন করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন —"বীরভদ্র নিত্যানন্দের মানস পুত্র ; তিনি বিবাহ করেন নি"। লেখক এই কথা রামবাবুর শিষ্য কাঁকুড়-গাছির যোগোদ্যানে (রামকৃষ্ণের সমাধিস্থল) ৺স্বামী যোগবিনোদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। এইসব ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা প্রতীত হয় যে, নিত্যানন্দের বিবাহ প্রচলিত সনাতন সামাজিক পদ্ধতির প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল। তাহাকে ঢাকিবার জন্যই নানা প্রকারের কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে।

বীরভদ্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পিতার কার্য্যের ধারা আরও প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইনি দুইটী বিবাহ করেন এবং নিজের শ্বশুর যদুনন্দনকে শিষ্য করেন[১৭] এবং নারায়ণী দেবী তাঁর স্ত্রীদের মন্ত্র দেন। বীরভদ্র সম্পর্কে বলা হইতেছে—

"বীরচন্দ্র গোসাঞি প্রভু ঈশ্বর অবতার
* * *

১০। "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ১৯৩।
১১। "শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত"—ষষ্ঠ খণ্ড ; ৩য় সং ২৭৮।
১২। "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী"—পৃঃ ১০।
১৩। "সম্বন্ধনির্ণয় দ্রষ্টব্য।
১৪। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩২৫ ; "সম্বন্ধনির্ণয়,' দ্রষ্টব্য।
১৫। "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২০৪।
১৬। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পাদটীকা, পৃঃ ৩২৫।
১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তী—ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০১৬।

হরিনাম দিয়া উদ্ধার করে পতিত জন।
হিন্দু মুসলমান কিছু না করে গণন।(১৮)

বীরচন্দ্র একবার গৌড়ের সুলতানের সম্মুখে হাজির হইয়াছিলেন।

"পাদ্‌সাহ বলে তুমি ফকিরসুজন।
আমার গৃহেতে আজি করহ ভোজন॥
শুনিয়া বীরভদ্র প্রভু মৃদু মৃদু হাসে।
যবনের গৃহে খাইলে হিন্দুর জাতিনাশ॥
তবে যদি তোমা সবার খানা দেহ মোরে।
খাইব নিশ্চিত এই কহিব তোমারে।
পাদ্‌সাহ শুনিয়া হাসিল তখন
বাবুর্চ্চি খানা শীঘ্র কর আনয়ন॥

*   *   *

এইরূপে তিনবার খানা আনাইল।
নানাবিধ ফুল তাহে দেখিতে পাইল॥
পাদসাহ বলে গোঁসাই ঠাকুরপ্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান॥"(১৯)

এই গল্প হইতে বুঝা যায় যে, একটা অলৌকিক (miracle) কার্য্যের উল্লেখ করা হইতেছে। এই সময়ে ভারতে মুসলমান পীর, সুফি ও ফকিরগণ অলৌকিক কার্য্যাদি দেখাইয়া জনসাধারণকে নিজেদের ধর্ম্মে আনয়ন করিতেছেন। বৈষ্ণবপ্রধানগণও ঐরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছেন।

বীরচন্দ্র খেতুড়ীর মহোৎসবে গিয়াছিলেন এবং তথায় এক বড় বক্তৃতা করিয়া নরোত্তমের ওকালতি করিয়াছিলেন :—

"এই নরোত্তম কায়স্থকুলোদ্ভব হয়
শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়।
কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হইতে বড়
যিঁহো শাস্ত্র মানে তিঁহো মানে করিহ দৃঢ়।

*   *   *

নরোত্তম মহাপ্রভু প্রেম অবতার

*   *   *

নিত্যানন্দের কলা তাঁরে ঈশ্বর বলি মান।
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত করাবে দর্শন।

এত কহি বীরচন্দ্র বিরত হইলা।
যজ্ঞোপবীত দেখাইতে সবে আজ্ঞা কইলা॥
তইছে নরোত্তম গোঁসাঞি সবার আজ্ঞা মতে।
হৃদয় চিরি দেখাইলা শ্রীযজ্ঞোপবীতে॥"(২০)

শ্যামানন্দ সম্পর্কেও এই প্রকারের গল্প আছে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বিধান রক্ষা করিয়া ইঁহারা উদার হইয়া চেলার দল সৃষ্টি করিতেছিলেন। কিন্তু কথা এই যে, এইসব গল্পগুলি পরের যুগের সৃষ্ট কিনা? কার্য্যতঃ দেখা যায়—তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতেছিলেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীনারায়ণীর গর্ভজাত সন্তান। তাঁহার জন্ম বিষয়ে বদনাম আছে। প্রচলিত গল্প এই যে, নারায়ণী বালবিধবা ছিলেন। তিনি চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট খাইয়া গর্ভবতী হন।

"চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী
যারে সেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সেই আসি অবিলম্বে হয় উৎপন্ন॥
এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥"(২১)

আবার অন্যত্র—

"প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিণী হৈলা,
লোকমানে কলঙ্ক বহিল, সুন্দর তনয় এক হৈল।+

হালে নাকি এক পুঁথি বাহির হইয়াছে; তাহাতে তাঁহার পিতার নাম উল্লেখ আছে। অথচ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বলিতেছেন—

"কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেঁ হোঁ। তার সনে নারায়ণীর হইল বিবাহ॥ তাঁর গর্ভে জন্মিল বৃন্দাবন দাস।...বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলিলেন স্বর্গে।"[২২]

অন্যপক্ষে ইহাও কথিত আছে—

"প্রভুর চর্ব্বিত পান স্নেহবশে কৈলা দান।
বালিকা গর্ভিণী হৈলা লোকমানে কলঙ্ক বহিলা॥"*

এই ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, এখানেও আসল কথাটা চাপা রাখা হইয়াছে।

১৮। নরহরি চক্রবর্ত্তী—ভক্তিরত্নাকর—পৃঃ ২৫০।
১৯। " " " পৃঃ ২৫৩।

২০। নরহরি চক্রবর্ত্তী—ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১৮৯।
২১। "চৈতন্যভাগবত"—মধ্যকাণ্ড।
+ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত—পৃঃ ৩০৫।
২২। "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২২২।
* শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত—পৃঃ ৩১৫।

হুগলী জেলার থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট অভিরাম স্বামী বাস করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে ইনি মুসলমানদের সঙ্গে আহার করিতেন।

"অভিরাম লীলামৃত" পুস্তকে (পৃঃ ১২) ইহার শক্তি বা পত্নী মালিনীকে "যবনী" এবং ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ১২৭) ব্রাহ্মণকন্যা বলা হইয়াছে। এখানেও অনুমান হয় যে, আসল ব্যাপার চাপা দিবার চেষ্টা করা[২৩] হইয়াছে।

সমসাময়িক সংবাদ

বৈষ্ণব সাহিত্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক সংবাদ পাওয়া যায়। নরোত্তম বিলাসে উল্লিখিত আছে, জাহ্নবী দেবী একদল ব্রাহ্মণ দস্যুর মন ফিরাইয়া তাহাদিগকে ভক্ত করিয়াছিলেন: 'শুনি অশ্রুযুক্ত হইয়া কহে সর্ব্বজন। বঙ্গদেশী দস্যু মোরা, বিপ্র দুরাচার। প্রায় চাঁদরায় কর্ত্তা হন মো সবার।...শুনিতেই মো সবার ফিরি গেল মন।"[২৩ক]

এই চাঁদরায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। বাদসাহের সৈন্যদলকে ইনি পরাজিত করিয়া রাজকর পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেন। ইঁহার সঙ্গে ছিলেন কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি মুখুটি প্রভৃতি একদল ব্রাহ্মণ দস্যু। ইঁহাদের সম্বন্ধে সংবাদ এইরূপ:—"পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল।...... যুদ্ধ করি যবনেরে কৈলা পরাজয়॥ নানা দেশ লুঠে, রাজ্য করয়ে বিস্তার। ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসার॥"[২৪] আবার,—"জলা পন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়। দুষ্ট পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুঠি খায়॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা। পরে হরিদাস নাম তাহার হইলা।"[২৫] পুনঃ, "রাঘবেন্দ্র রায়ের হয় দুই কুমার। মহাদস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার।"[২৬] এতৎসঙ্গে মুসলমান দস্যুরও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, "আর শাখা যবন দস্যু শের খাঁ নাম যাঁর। শ্রীচৈতন্য দাস-নাম এবে তাঁর॥" এই শের খাঁর বিষয়ে অন্যত্র বলা হইয়াছে —তিনি বাদসাহের আত্মীয়,[২৭] এবং মেদিনীপুরের কোন স্থানের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কুতুবুদ্দিন নামে জনৈক দস্যুদলপতির নামোল্লেখও এই সঙ্গে আছে, এই দল জাহ্নবী দেবীর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়।*

বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহাদিগকে দস্যু আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ডাকাতি করা ভদ্রলোকের এবং বীরদের কর্ম্ম ছিল। প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত পরস্বাপহরণ করা এবং cattle lifting করা প্রাচীন বীরদের ধর্ম্ম ছিল। এই সব বিষয়ে ইলিয়াডের আখিলিউস্ এবং মহাভারতের ভীষ্মও বাদ যান না। যখন রাজনীতিক ধর্ম্ম "জোর যার, মুল্লুক তার" এবং যার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক, সে-ই স্বাধীন রাজা বলিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিত, তখন এই সব ব্যক্তিদের নীচ ডাকাত বলিয়া ঘৃণা করা ঠিক নয়। ইহা ছিল যুগধর্ম্ম। বাংলার সামন্ততন্ত্রীয় যুগের শেষকালে ইহারাই ছিল stark mass-troopers। সার ওয়াল্টার স্কটের রচনাবলীতে এই প্রকারের নাইটদের যে বর্ণনা আছে—

> "Penance father will I none,
> Prayer know I hardly one,
> Save to patter an Ave Mary,
> When I ride on a border foray."......
> (Lay of the last ministrel)

তাহা এই বাঙ্গালী mass-troopersদের প্রতিও প্রযুজ্য। চাঁদরায় বাদশাহকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন। তিনি বাদশাহী সনদ লইয়া ক্ষুদ্র ভুঁইয়া-রাজা হন নাই। অমিয় নিমাইচরিতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার এক লক্ষ ফৌজ ছিল! তাহা হইলে তিনি কি প্রকারের ডাকাত ছিলেন?

অবশ্য এই চাঁদ রায় বিক্রমপুরের ভৌমিক চাঁদ রায় নহেন। সেইযুগে ভারতের বাহির হইতে দলে দলে বিদেশীদের বাংলায় আসিয়া বাহুবলে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার যে অধিকার ছিল, চাঁদ রায় প্রভৃতির তাহাই ছিল। বরং এই সব সংবাদে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী

২৩। চৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ১৯।
২৩ ক। "নরোত্তম বিলাস"—১০ম বিলাস, পৃষ্ঠা ১৬৬
২৪। "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ১৮৮
২৫। ঐ পৃঃ ২০৯
২৬। ঐ পৃঃ ঐ

২৭। "শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণীতে" উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৯
* "প্রেম বিলাস", পৃঃ ১৮৫

জীবনের চিত্র কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পায়। ইহাদের মধ্যে দেখা যায়, তৎকালে বাংলার হিন্দুরা নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের জীবনের অন্যদিকের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না! বৈষ্ণব ভক্তেরা ইহাদের দস্যু ও পাষণ্ডী বলিয়াই শেষ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আর একটি রাজনীতিক সংবাদ পাওয়া যায়। রঘুনাথদাস গোস্বামীর পিতা হিরণ্যদাস সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন। তিনি বিশ লক্ষ টাকা প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন, এবং তন্মধ্য হইতে বাদশাহকে বার লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর প্রদান করিতেন। ঐ স্থানের পদচ্যুত মুসলমান শাসনকর্ত্তা বাদশাহের নিকট অভিযোগ করে যে, এই রাজা যেই পরিমাণ রাজকর দেয়, সেই পরিমাণ টাকা অন্যান্য উপায়েও প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করেন; কিন্তু সেই টাকা দরবারকে ফাঁকি দেয়। আবার হরিদাস ঠাকুরের জমিদার রামচন্দ্র খাঁর অপকীর্ত্তির বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে, ইনি বাদশাহকে কর দিতেন না। অবশেষে বাদশাহ লোক পাঠাইয়া তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুরূপ কার্য্যও হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই সব রাজা বা জমিদারেরা কি সর্ত্তানুসারে (tenure) জমিভোগ করিত? পূর্ব্ববর্ণিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বাদশাহ একটা জমিদারীতে একজনকে তাড়াইয়া অপর একজনকে বসাইতে পারিতেন। খাজনা বন্ধ হইলেই জমিদারী হস্তান্তরিত হইত। ইহা পরবর্ত্তী মোগল যুগে "ঠিকাদারী প্রথারই" অনুরূপ। এইরূপ অনুমিত হয় যে, জমিদারীতে তৎকালের জমিদারদের কোন স্থায়ী স্বত্ব ছিল না।* আবার, এই সময়ের অত্যাচারী জমিদারের সংবাদও পাওয়া যায়: "রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপহতি। তাহা শান্তি হৈল রাজা করিল পিরীতি"†।

বৈষ্ণব সাহিত্য বলে, হরিদাস ঠাকুর যখন খুলনা জেলায় বেনাপোলে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার জমিদার এক বেশ্যা পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু প্রেমবিলাসে উল্লিখিত আছে, "কাজীর প্রেরিত বেশ্যা তথায় আসিলা। মোগলবংশীয়া বেশ্যা পরমা সুন্দরী।"[২৮] এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, কাহার সংবাদ ঠিক? হরিদাস ঠাকুরের অন্তর্ধানের বহু পরে লিখিত হইয়াছিল। সেইজন্যই বোধ হয় গল্পটা গোলমাল হইয়াছিল। হরিদাসের সময়ে ভারতবর্ষে মোগল ছিল না এবং প্রেমবিলাস লিখিবার সময় বোধ হয় বাংলায় মোগলের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আর গ্রন্থকার যখন কাজী কর্ত্তৃক এই রমণীকে প্রেরণ করাইতেছেন, তখন মোগল বাদশাহের কাজী নিশ্চয়ই মোগল-রমণী পাঠাইয়াছিলেন, এই ধারণা গ্রন্থকার হয়ত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিম্বা হরিদাসের মুসলমান-জন্মের উপর জোর দিবার জন্যই কি মুসলমান কাজীর দ্বারা মুসলমান বেশ্যা পাঠাইবার গল্পটী সৃষ্টি হইয়াছিল? (ক্রমশঃ)

* খোন্দকার ফজলে রবি খাঁ—"বাঙ্গলার মুসলমানের আদি বৃত্তান্ত," অনুবাদক আব্দুল হামিদ খাঁ দ্রষ্টব্য। ইনি বলেন, "সম্পত্তিতে তাঁহাদের অধিকার ছিল না। তাঁহারা অপরাধের জন্য ডিস্‌মিস্ বা বরতরফ হইতেন।" পৃঃ ৭৪।

† প্রেমবিলাস—১ম বিলাস।

২৮। "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২৩৫।

ভ্রম সংশোধন: আষাঢ় সংখ্যা প্রবর্ত্তকের ১৮১ পৃষ্ঠা ২য় কলমের ১৬ লাইনে "বিশ্বাস করেন" স্থলে "বিশ্বাস করেন না" পাঠ হইবে।

গান

শ্রীনরেন্দ্র বসু

কেঁদোনা, থাম থাম কেতকী
বনছায়ে বাজে ব্যথা এত কি?
এলোনা যে দিল শুধু মায়া
আলোকিত অরূপের ছায়া,
বাণী তার নাহি নিলে কায়া
গান তব প্রাণ ছুঁয়ে যেত কি?

আঁখিরে যে দিল চির-ফাঁকী,
হৃদয়ে তারি ছবি আঁকি;
ব্যথাতুর বাদলের রাতি
জ্বালে মৃদু স্মরণের বাতি
স্বপনের মালাখানি গাঁথি
সবহারা পেতে চায় কত কী॥

কাল-বৈশাখী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

এবারের কাল-বৈশাখী—

কড়-কড়-কড়-কড়···কড়াৎ-কড়াৎ···

—কাণে আঙুল দিলাম।

সেই আলোতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মিলন-অবসর আসিয়াছে—বৎসরে যাহা একবারই আসে। তিনি ছাদে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। আমি পায়ে ধরিয়া বলিলাম —মা, কাণ গিয়েছে···এবার প্রাণ যাবে···এই দুর্যোগে আর যাবেন না—

শাশুড়ী মাতা শুনিতে পাইলেন না···পাইলে আমায় ক্ষমা করিতেন না। তিনি ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার বিবাহের পর এই পাঁচ বৎসর যাইতেছে। একমাত্র ছেলে ইনি—বিধবা মা'র জন্য বিলাত যাইবার সরকারী বৃত্তি ছাড়িয়া দেন। আর এঁর সঙ্গে তখন বিবাহ না হইলে, আমি আজ কোথায় থাকিতাম কে জানে?—হয়তো সুদূর মালয়ে—ব্যবসার জন্য বাবাকে যেখানে থাকিতে হইত সেইখানে। মা'র মৃত্যুর পরে বাবা কিছুতেই আমায় কলেজ-বোর্ডিংএ রাখিয়া যাইতেন না। এঁরা ব্রাহ্ম পরিবার—বিবাহের সময়ে কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বাবা বলিয়াছিলেন, আমাদেরই পাল্‌টি ঘর ···আর এক পুরুষে ব্রাহ্ম—বিশেষ এমন পাত্র, এমন শাশুড়ী···মা-হারা মেয়ে আমার মা পাবে···

আমি শাশুড়ী পাইয়াছিলাম দেবীর মত। নাম ছিল নন্দিনী—রূপেও ছিলেন নন্দিনী। তবে অতি মাত্রায় পিউরিটান্। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ আমায় মুগ্ধ করিল। কিন্তু তাঁহার সব বিচারবুদ্ধি ভাসিয়া যাইত এই দিনে—কালবৈশাখীর দুন্দুভি যেদিন আকাশে প্রথম বাজিয়া উঠিত। শাশুড়ী মাতার কাছে এটা ছিল উৎসবের দিন—অন্যের কাছে যাহাই হোক। এটা ছিল শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন।

৭ই বৈশাখ বৈকালে আমার শ্বশুর মহাশয় মারা যান। তিনি সরকারী বড় কাজ করিতেন। রৌদ্রে' ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া ফেন্ট হইয়া যান। তাঁহাকে লিফ্‌টে করিয়া তেতলায় এই শুইবার ঘরে আনা হয়। আর জ্ঞান হয় না। সৎকার করিতে যাইবার আগে শাশুড়ী ঠাকুরাণী একটি অনুরোধ জানান। সম্মুখের ছাদে পত্রপুষ্পের গাছে ঘেরা শ্বেত পাথরের ঐ বেদীটি ছিল শ্বশুর মহাশয়ের বিরাম-কুঞ্জ। স্বামী-স্ত্রীর কত সুখ-স্মৃতি ঐ স্থানটির সঙ্গে বিজড়িত আছে। স্বামীর চিরনিদ্রিত দেহটি শেষ একবার সেখানে শোয়াইয়া দিতে তিনি অনুরোধ করেন। তাহাই করা হয়। সেখানে বসিয়া অতি স্থিরচিত্তে তিনি নিজের দীর্ঘ কেশ নিজের হাতে কাটিয়া নিজ স্বামীর চরণে উপহার দেন। এই কেশের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁহার কতই না নাম ছিল···স্বামী আদর করিয়া ডাকিতেন—সুকেশিনী। তাহার পর একে একে সব অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দেন। তাহার পর···? তাহার পর সব ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া-ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যায়—স্বামীর দেহের উপর আছড়াইয়া পড়েন। ইন্দ্র দেবতা তখন ডাকিয়া ওঠে আকুল আর্ত্তনাদে···কালবৈশাখী এই সদ্য বিধবার শোকোচ্ছ্বাসে যেন পাগল হইয়া ওঠে!

সেই হইতে আজ ছয় বৎসর তিনি এই কালবৈশাখীতে স্মরণোৎসব করিতেছেন। কোন তিথি ধরিয়া নয়—কোন তারিখ ধরিয়াও নয় ··· কালবৈশাখী যেদিন প্রথম নামে সেইদিন। সারা বৎসর ধরিয়া তিনি এই দিনটী প্রতীক্ষা করেন।

আমি প্রথম আসিয়া দেখিলাম, শাশুড়ী ঠাকুরাণী শুনিতে পান না। তাঁহার স্বামীর প্রথম বার্ষিকী যখন তিনি সমাধা করেন, ঐ বেদীর পদতলে তখন মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত হইতেছিল। তাহাতেই তিনি নাকি বধির হইয়া যান। সেইজন্যই আমার স্বামী তাড়াতাড়ি আমাকে বিবাহ করেন। মা'কে সর্ব্বদা দেখা-শোনার ভার আমার উপরই পড়ে।

গত বৎসরের ঘটনা···

অকস্মাৎ দড়াম্—দড়াম্···আকাশ ভাঙিয়া পড়িল বুঝি! শাশুড়ী ঠাকুরাণীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া আছি। কাছে যাইতে সাহসে কুলাইতেছে না। অথচ তিনি আত্মহারা হইয়া ঐ বেদীর চারিদিকে

ঘুরিতেছেন···হাসিতেছেন···শুইয়া পড়িতেছেন; তাহার উপর···দুই হাত দিয়া বুকে কাহাকে যেন চাপিয়া ধরিতেছেন।

উনি আসিয়া পড়িলেন না তো—। ফোন্ করিয়া পাইতেছি না। নিশ্চয় বাহির হইয়াছেন। ঝড়-বৃষ্টি সিনেট্-মিটিং কিছুই আটকাইতে পারিবে না। আকাশে যে মেঘই ছিল না কলেজে যাইবার সময়ে—থাকিলে যাইতেন না। কাল-বৈশাখীর অপেক্ষায় কতদিনই এমন যান না—।

গড়াম্—গড়াম্—গড়াম্···

আগুনের দলাটা যেন আমাদের ছাদেই পড়িল!

চোখ ধাঁধিয়া গেল।

দেখিলাম শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী অসহায়ের মত কি খুঁজিতেছেন···হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন···আকুল হইয়া এদিক্-ওদিক্ চাহিতেছেন।

চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘরে নিয়া আসিলাম।

—এই ভাবে গত বার তিনি অন্ধ হইয়া যান।

এখন তিনি অন্ধ ও বধির।

এবার চৈত্র মাস হইতেই আমরা সাবধান হইতেছি। কাল-বৈশাখীতে কিছুতেই তাঁহাকে ছাদে যাইতে দিব না, ঠিক হইয়াছে। রাত্রে আমরা দুইজনে তাঁহার দুই পাশে শুইয়া থাকি—যদি উঠিয়া যান এই ভয়ে।

কালবৈশাখীর এখনও দেরী আছে ভাবিয়া উনি সাহস করিয়া কলেজে গেলেন।

দুপুরে শ্বাশুড়ী-বৌ পাখার তলায় শুইয়া আছি—গুমট্ লাগিতেছে।

তিনি বলিলেন—বৌমা আজ ক'বছর হোল?

আমি বলিলাম—ছ'বছর।

তিনি বলিলেন—তাই হ'বে···এই কাল-বৈশাখীতে ছ'বছর। চোখ-কাণ গিয়েছে—কিন্তু কাল-বোশেখী কখন আসবে, তা' আমি জানি।

কেন জানি না আমার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া কত আদর করিলেন···চুমা খাইলেন···মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। আমার স্বামীর নাম করিয়া বলিলেন···কাল-বোশেখীর সাড়া পেলে সে কোথা হতে ছুটে আসবে!

বলিলাম—ফোন্ কোরব?

তিনি আপন মনেই বলিয়া যাইতেছিলেন—এই দিন তিনি আসেন···অন্তরে পাই—কখনও তিনি ডাকেন নি··· আজ ডাকছেন···

আমি তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, জানি না।

ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক ঠক্-ঠক্···ঘর-দোর কাঁপিতেছিল—

হঠাৎ জাগিয়া দেখি কাল-বৈশাখী নামিয়াছে—বাতাস ডাকিতেছে শোঁ-শোঁ।··· রণ-দামামা বাজিতেছে! ঝন্-ঝন্ করিয়া সাশির শব্দ হইল···শিলা-বৃষ্টি সুরু হইয়াছে।

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী?—ছাদে?

সেই প্রলয়ঝঞ্ঝার মাঝে ছাদে দৌড়িয়া গেলাম···সর্ব্ব দেহে শিল আসিয়া বিঁধিতেছে।

এঁ্যাঃ—

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিস্পন্দ দেহ বুকে করিয়া তুলিয়া আনিলাম···

প্রভেদ

(সাদি)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি.এল., বাণীকণ্ঠ

সাধুসজ্জনে দশজনে মিলি'
সুখে বসি' রয় এক তৃণাসনে
বিশাল রাজ্যে দুই নরপতি
রহিবারে নারে মিলি একসনে।

রোটিকা খণ্ড পেলে সজ্জন
অর্দ্ধখণ্ড দেয় দীন ভ্রাতৃজনে,
সাম্রাজ্যাধিপতি হ'লেও নৃপতি
পররাজ্যলোভ না ছাড়িবে মনে।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মাটির মরতে মানুষ মরেছে কারা?
মাটির মায়েরে মনোমন্দিরে পূজিতে শিখেনি যারা।
যারা শিখিয়াছে বিলাস গর্ব্ব
নিজেরে করিতে নিজেই খর্ব্ব
ঠিক দেখো ভাই, ধরার ধূলাতে তারাই হয়েছে সারা।

হে দেশবন্ধু, নহ তাহাদের তুমি,
জন্মিয়া যারা জীবনে জগতে জানেনি জন্মভূমি।
তুমি জানিয়াছ সেবা ও ধর্ম্মে
দেখায়েছ তাহা আপন কর্ম্মে,
বিস্মিত চিতে সমাধি-সৌধে তাইতো আমরা নমি'।

ত্যাগের মন্ত্র শুনালে যাদের কাণে
অমৃত তারা মৃত্যুবিজয়ী মৃত্যুরে নাহি মানে।
আমরা গড়েছি স্মৃতির তীর্থ
তুমি গড়িয়াছ নিখিল চিত্ত
তাইতো হে কবি, স্বদেশপ্রেমিক, নন্দিত জয়-গানে।

শিল্পের লক্ষণ

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'শিলানি পাতি রক্ষতি যৎ তৎ শিল্পম'। শিলকে অর্থাৎ চরিত্রকে যা অধঃপতন হতে রক্ষা করে তাহারই নাম শিল্প। চরিত্রকে রক্ষা করবার নিমিত্ত উচ্চ ভাবের ও চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন।

শিল্প তিন প্রকার, কথা-শিল্প বা সাহিত্য (Literary Art), রূপ-শিল্প (Plastic Art) ও সুর-শিল্প (Musical Art). সাহিত্যে বা কথা-শিল্পে কথার মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতে বা সুর-শিল্পে সুরের মধ্য দিয়ে এবং রূপ-শিল্পে রূপের মধ্য দিয়ে, এই তিন প্রকার বিভিন্ন পথে মানুষ আত্মপ্রকাশের নিরন্তর চেষ্টা করছে। এই ভাবের আত্ম-প্রকাশের সাধনার নাম শিল্প। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চার্লস্ দার্বিণ তাঁহার বিখ্যাত 'আত্মচরিতে' লিখেছেন :—"শিল্প সাধনা বা শিল্প-চর্চ্চা থেকে স্খলিত হ'লে আমাদের চরিত্র হানির সম্ভবনা আছে।"

তিন প্রকার শিল্পের মধ্যে সুর-শিল্প ও রূপ-শিল্প হ'ল ভাব-মূলক বা ভাব-প্রবণ (emotional) এবং কথা-শিল্প বা সাহিত্য হ'ল চিন্তা-প্রধান বা চিন্তা-মূলক (intellectual)। এই তিনটি শিল্পের মধ্যে হ'ল দুইটী বিভাগ— প্রথমটী হ'ল ভাব-মূলক ও দ্বিতীয়টী হ'ল ভাবনা-মূলক।

ভাব-মূলক শিল্পের ও ভাবনা-মূলক শিল্পের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্। ভাব-মূলক শিল্পের আরাধনায় যে সব মূর্ত্তি গড়ে উঠে, আর ভাবনা-মূলক শিল্পের সাধনায় যে মূর্ত্তির আবির্ভাব হয় তারা ভাবে, রসে ও উদ্দীপনায় সম্পূর্ণ পৃথক্। ভাবনাকে অতিক্রম করেই ভাবের কাজ-কারবার। এমন অনেক ভাব ও রস আছে যা ভাব-মূলক ও ভাবনা-মূলক উভয় শিল্পের দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু অনন্ত বিশ্বে এমন অনেক ভাবও আছে যা কথা-শিল্পের নাগালের বাইরে; অব্যক্ত তখন এই ভাব-মূলক শিল্পের সেতু দিয়ে সেই ভাব-রাজ্যে যাওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। ভাব-মূলক শিল্পের স্থান ভাবনা-মূলক শিল্পের উপরে। কথা-শিল্পের মধ্যে এই জগতের কোলাহলের সুর, বাস্তব জগতের আনন্দময় ও নিরানন্দময় জীবনের একটা ছাপ থাকে। কিন্তু ভাব-মূলক শিল্পের জগতে আমাদের এই চোখে দেখা জগতটা সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়, আর শোনা যায় ওপারের কাঁসর-ঘন্টা। শিল্প হিসাবে ভাব-মূলক শিল্প এবং ভাবনা-মূলক শিল্প ভাই বটে, কিন্তু সতাল ভাই। ভাব-মূলক শিল্পকে বুঝতে হ'লে তাকে সুর বা রূপের মধ্যে দিয়ে বুঝতে হ'বে। কথার মধ্যে ওকে খুঁজতে গেলে বিফল মনোরথ হ'তে হ'বে। কথার ঘরে ভাব-মূলক শিল্পের বাসা নয়। ভাষার মধ্যে ভাব-মূলক শিল্পকে খুঁজতে গেলে তার জীবন্ত চঞ্চল নৃত্য-মূর্ত্তি শিব-রূপ না পেয়ে, পাওয়া যাবে তার শবদেহ।

খ্যাতনামা চিত্রকরের বা সঙ্গীতজ্ঞের স্পর্শে যে কমনীয়তা ও উপলব্ধির যে সূক্ষ্মতা আছে তা সুধু শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় না। সুকুমার কলার প্রতি একটা অন্তর্নিহিত আকর্ষণ নিয়ে অগ্রসর না হ'লে শিল্পীর শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হ'বে না। শিল্পীরা সব সময়ে অন্যকে আনন্দ দেবার জন্য রূপ বা রসসৃষ্টি করেন না। নিজেরা বিশুদ্ধ আনন্দ পাবার জন্যে এই রসচক্র গঠন করেন। তবুও তাহার অন্যকে আনন্দ দেবার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। আর এই অন্যকে আনন্দ দেবার, অন্যের মনে রঙ ধরাবার, অন্যকে উদ্বোধিত করবার ও উজ্জ্বল করবার শক্তি যার যত বেশী সেইটেই হ'ল তত উচ্চ স্তরের সৃষ্টি। আর এটাই হ'ল আসল শিল্পের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। এই বিষয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-রসিক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন :— শিল্পীর কৌশলে একটা জড় বস্তু রূপের ও বর্ণের সাজ পরে—এমন একটা অধিকারী হয়—যে রূপান্তরিত জড়-বস্তু অন্যকে চেতনা দেবার, অন্যের চিত্তে শক্তি জাগাবার শক্তি রাখে। এই জড়ের বিশিষ্ট রূপের আধারে শিল্প-সাধক তাঁর মনের অনেকখানি ঢেলে দিতে পারেন। এই জন্য শিল্পীর মনের জলন্ত ছাপ নিয়ে, শিল্পীর মনের রাগে রঞ্জিত হয়ে,—শিল্পীর রস-রচনা অন্য রসিকের মনে একই রসে, একই রাগে রঞ্জিত করবার উহা শক্তি অর্জ্জন করে। এই রঞ্জিত করবার শক্তি যে শিল্প বস্তুর যত অধিক পরিমাণে আছে,—সেটা তত উচ্চ অঙ্গের শিল্প-সৃষ্টি।"

ভূস্বর্গ রোডেশিয়া ঃ আফ্রিকা

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

প্রায় সমগ্র আফ্রিকাই ইউরোপীয় শ্বেত জাতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। বেওয়ারিশ মাল পেয়ে যে যেখানে পেরেছে নিজেদের পতাকা তুলে অধিকার পোক্ত করেছে। বাধা দিবার কেউ ছিল না, এখনও নাই বলা যায়। তবুও কেবলমাত্র শোষণ করে এই সাম্রাজ্য এরা বেশীদিন রাখতে পারবে না। অতি লোভের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা, তা এদের ভাগ্যে ঘটবে অর্থাৎ এই শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি কামড়াকামড়ি করে মরবে। বর্ত্তমানে এ সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আফ্রিকার যে সব অঞ্চলে এই শ্বেত জাতির লোক গেছে সেখানেই তারা রাস্তা, ঘাট, প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘর, বিজলী, গাড়ী প্রভৃতি সমন্বিত আধুনিক সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে নগর পত্তন করেছে। ইহাতে আপত্তি ছিল না, যদি এরা ঐ দেশের মানুষকেও এর সমান অংশভাগী করতো। করা দূরে থাকুক, কাফ্রী নিগ্রো নেটিভ আদমী যে মানুষ, ইহাই তারা ভাবতে পারে না। ভোগ বিলাস এমনি এদের অন্ধ করেছে যে, দু'চোখ মেলে এই সত্যের মুখোমুখি চাইতেও এরা সাহস করে না। কালচক্রের নিষ্পেষণে পশ্চিমের স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই কালো আফ্রিকাবাসীর সাদা মনের উপর মনে রাখবার মত সত্যের কোন গভীর রেখাপাত এরা করতে পারেনি বলে এই শ্বেত সভ্যতার প্রভাব একদিন বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে। ভুক্তভোগী বলে আফ্রিকার পথে-পথে বার-বার এই কথাটা আমার মনে হয়েছে।

১৯৩৭ সালের ১৯শে নভেম্বর আমি আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে জাহাজযোগে অবতরণ করি। আফ্রিকায় আসা ইহাই আমার প্রথম। দূর হ'তে জাহাজ থেকে আফ্রিকার প্রাকৃতিক শোভা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অবতরণের হাঙ্গামার কথা আর এখানে বলবো না। মোম্বাসা বৃটিশ কেনায়ার সর্ব্বপ্রথম বন্দর—ভারত মহাসাগরের উপরে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের উপকূল ধরে বৃটিশ রাজ্য কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিয়াকা, জাঞ্জিবর, নিয়াছাল্যাণ্ড (Nyasa Land) প্রভৃতি দেশগুলি ভ্রমণ করে পোর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকার বেইরা (Beira) বন্দরে জাহাজযোগে উপস্থিত হই।

সমুদ্র হইতে আফ্রিকার পাড়ের মনোরম দৃশ্য

এই পোর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা একটা আজব দেশ। এখানে প্রবেশ করতে হ'লে আমাদের দেশের প্রায় হাজার ছয়েক টাকা জমা দিতে হয়। আমার কাছে এত টাকা নাই, কোন রকমে পথ খরচটার সম্বল আছে মাত্র। ইমিগ্রেসন অফিসে আমাকে নিয়ে এক হল্লা লেগে গেল। টাকা জমা না দিলে কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না, আমিও না-ছোড় বান্দা। আমাকে ভাঙ্গা ইংরেজিতে পোর্ত্তুগীজ অফিসার প্রশ্ন করলে, "তুমি কোন্ দেশের লোক?"

আমি প্রত্যুত্তর করলাম, "I am a world-Tourist—a man of the world." আমার ভিজা বই ও বহু দেশ ভ্রমণের চিহ্ন সমন্বিত খাতাখানি খুলে ধরলাম। এবং জোর করেই শুনিয়ে দিলাম যে, মধ্য যুগের এইরূপ সংকীর্ণ জমিদারী মনোবৃত্তি আর চলবে না। এই দেশের বুকের উপর দিয়ে চলার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শেষ
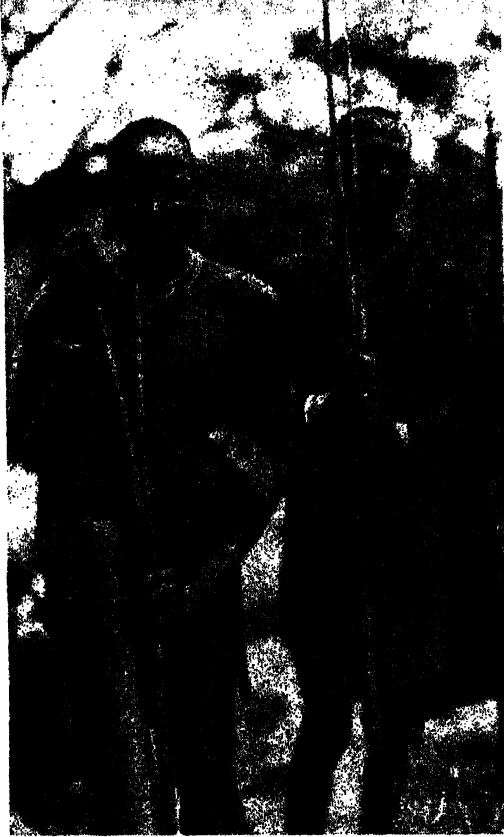
মাসাই জাতীয় আফ্রিকাবাসী: ইহারা বিশেষ নম্র স্বভাবের

পর্য্যন্ত আমার পাশপোর্ট জমা রেখে ইমিগ্রেশন বিভাগ আমাকে তাদের দেশ-ভ্রমণের ছাড়পত্র দিল।

এই দেবভূমিতে প্রবেশের যেরূপ কড়াকড়ি আসলে কিন্তু দেশটি তেমন উপভোগ্য নয়। মানচিত্রে পাঠকগণ দেখবেন যে ভারত মহাসাগরের অনেকখানি উপকূল ভাগ ধরে দেশটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি বিস্তৃত। ইহার ঠিক পূর্ব্বেই সাগরবেষ্টিত ফরাসী মাদাগাস্কর দেশটি অবস্থিত। একদা এই পোর্ত্তুগীজরা সাত সমুদ্র বেড়ে বাণিজ্য ও দস্যুতায় দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে এদের জীবনের সে দুর্দ্দাম গতি যেন থেমে এসেছে। যতটুকু সাম্রাজ্য আছে তাই যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে পড়ে আছে। বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের অভাবহেতু পোর্ত্তুগীজ অধিকৃত দেশগুলির মধ্য-যুগের চেহারা বদ্‌লে আধুনিক হ'তে পারেনি। তা'ছাড়া এদের ব্যবহারও তেমন ভদ্র নয়। এই দেশটি সম্বন্ধে একখানা বই লিখবার আমার ইচ্ছা রইলো। বেইরা বন্দর হ'তে আড়াআড়ি প্রায় সোজা পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে আমি সাইকেলে রওনা হলাম। প্রায় ২০০ মাইল ক্রমোচ্চ গিরিপথ অতিক্রম করে ইম্‌তালি সহরে পৌছলাম। এই পথের নয়ন মনোহারী শোভা আজও আমার চোখে মায়া-স্থষ্টি করে। ইম্‌তালি পোর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা ও বৃটিশ রোডেশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী সহর। মোম্বাসা হ'তে ইম্‌তালি পৌছনোব যে কাহিনী এখানে দিলাম তা পাঠকের পড়তে হয়তো আট সেকেণ্ডও লাগবে না, কিন্তু এই ভ্রমণে আমার প্রায় আট মাস লেগেছিল। পুস্ বাইক ঠেলে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করে আমার যে অস্থির প্রাণ আফ্রিকার দুর্গম মরু-কান্তার-কানন-অরণ্য-পর্ব্বত পেরিয়ে উদ্দাম হয়ে সেদিন ছুটেছিল, আজ বর্ষণমুখর আষাঢ় বেলায় কলকাতার এক মেসের কোণে আরাম কেদারায় বসে তার মুখোমুখি হ'তে আমারই সাহস হয় না, বরং সে কথা ভাবতেও আশ্চর্য্য বিস্ময় লাগে। তবে চোখ বুজে আজও সে সব দেশের ছবি দেখি। আমার মন এখনও বেড়িয়ে বেড়ায় ঐ সব দেশের ভূ-মরুতে। আফ্রিকায় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। প্রত্যহ সংবাদপত্র খুলে আফ্রিকার কথা দেখি। স্থান খুঁজবার জন্য ছাপানো ম্যাপ খুলতে হয় না, মনের মানচিত্রে আফ্রিকার জীবন্ত ছবি আমি দেখতে পাই। জীবনে চলবার পথে এ সম্পদ্ আমায় সত্যিই পরম আনন্দ দেয়।

আমার বক্ষ্যমান প্রবন্ধের শিরোনামা হ'তেই পাঠকগণ বুঝবেন যে, মোম্বাসা-ইম্‌তালি পথের ভ্রমণ-লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইম্‌তালি হ'তে আমি এবার আমার ভ্রমণ-কাহিনী সুরু করবো। এর পূর্ব্বে আমার এই ফেলে আসা

চলতি পথের মাত্র তিন-চার দিনের যে ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি, তা থেকেই দীর্ঘ আট মাসের ঘটনা-বাহুল্য অনেকটা অনুমিত হ'বে।

দেশটা যতদূর মনে পড়ে নিয়াছাল্যাণ্ড হ'বে। ভোর থেকে অবিরাম পথ চলছি। উঁচু নীচু নির্জ্জন পথ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। গায়ের জল গায়েই শুকায়। বেলা প্রায় চারটে। ক্লান্ত রবি দিক চক্রবালে এলিয়ে পড়েছে। সূর্য্যের উঠা ও ডুবার সঙ্গে মানুষের বিশেষ আমার মত পথ-চলতি মানুষের মনের সম্বন্ধ প্রচুর। আমিও অবসাদে প্রায় ভেঙ্গে পড়েছি। জঙ্গল-পথে প্রাণপণে সাইকেল চালিয়েছি কোন লোকালয়ে পৌঁছনোর জন্য। দূর থেকে একটা বড় বাড়ী চোখে পড়লো। আফ্রিকার এরূপ ধরণের বড় গোছের বাড়ীগুলি প্রায়ই হোটেল হয়ে থাকে। আশায় বুক বেঁধে চলেছি। গোটা পাঁচেকের সময়ে ছোট্ট একটি আধা-সহরে পৌঁছলাম। মিনিট পনের কুড়ীর মধ্যেই অনতিদীর্ঘ রাস্তাগুলিতে একটা চক্র দিলাম কোন ভারতীয় চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু চোখে পড়লো না। সম্ভবতঃ কোন ভারতীয়ের বসতি এখানে ছিল না। অগত্যা সেই হোটেলের সামনে গিয়েই দাঁড়ালাম। সাদা সাহেবদের হোটেল। কালা আদমীর এখানে প্রবেশ-নিষেধ। অবশ্য এমন কিছু নিষেধ-পত্র টাঙ্গানো না থাকলেও এদেশে এটা স্বতঃসিদ্ধ। প্রয়োজনের তাগিদে সাহস করে গিয়ে উঠলাম এবং বললাম, আজ রাত্রে এখানে আমায় থাকতে হ'বে। আমি ভূ-পর্য্যটক, এ পরিচয়ও দিলাম। পোর্ত্তুগীজ সাহেবের সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য বললাম যে, আমি একজন ভারতীয় গোয়ানীজ। মনে করলাম, গোয়া তো ওদেরই সাম্রাজ্য, হয়তো মনটা গলতে পারে। ষ্টীলের মত শক্ত মন কালা মানুষের গরজ বোঝে না—কুকুরের চেয়েও অধম মনে করে। সেই যে 'স্থান নেই' (no room) বললে, তা আর টললো না। বিমুখ ও ভীষণ বিপন্ন হ'য়ে ফিরলাম। এদিকে সন্ধ্যার ঘোর দ্রুত ঘনিয়ে আসছে।

হোটেলের বাঁ পাশটায় নীচের একটা আঁধারপ্রায় চোরা কুঠরীতে এক নিগ্রোর দেশলাই-সিগারেটের দোকান। দোকানদার স্বরূপটি মনে হ'ল দোঁ-আঁশলা। সাদা মানুষের কালো চামড়ার উপর যত বিরূপতায়ই থাকুক, আসলে ওদের সংযমের বাঁধন কিন্তু ভীষণ আল্‌গা। সহরের এই সাদা-কালোয় মিশ্র প্রাণীগুলো সাধারণতঃ বেশী খচ্চর হয়, একথা জেনেও দোকানদারটিকে অনুরোধ করলাম, আমার এক রাত্রির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে।

দোকানদারটি সহজেই রাজী হয়ে গেল এবং সহরের উপান্তে জঙ্গলের ধারে আমায় একটা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেল। রাত্রের জন্য একটি ছোকরা চাকরও নিযুক্ত করে দিয়ে গেল এবং বলে গেল, এক রাত্রের জন্য ছয় পয়সা তাকে দিতে হ'বে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আশে পাশে লোকজন নেই, তবুও মাথা গুঁজতে পারবো বলে সান্ত্বনা হ'ল। ঘরে বিচালী বিছানো ছিল, আমি তার ওপরই বিছানাটা বিছিয়ে কাত হয়ে পড়লাম। চাকর ছোকরাটি বাজার করতে গেল। কাফি, চাউল, ডিম প্রভৃতির জন্য একটা টাকা দিলাম। সন্ধ্যে ঘোর হয়ে আসে, ছেলেটি তবুও ফেরে না। অনেকক্ষণ আশায় আশায় অপেক্ষা করলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটির ফেরার আশা ত্যাগ করতেই হ'ল। এক কাপ কাফির জন্য বেশী অস্থিরতা বোধ হ'তে লাগলো। সাইকেলটা বাইরে ছিল, কুঁড়ের ভিতরে এনে ঝাঁপ বন্ধ করে দিলাম। আরও বিপন্ন হয়ে পড়লাম যখন দেখলাম, ছেলেটি আমার টর্চ্চের ব্যাটারী, ঝোলা থেকে দেশলাই ও সিগারেটের কেসগুলো এমন কি সাইকেলের বাতি থেকে

মিঃ কালীপদ দাস :
প্রধান শিক্ষক উগাণ্ডা হাই স্কুল

কেরোসিন তেলটুকু পর্য্যন্ত ঢেলে নিয়ে গেছে। এই অচেনা মুল্লুকে কি আর করি! দরজাটা ভাল করে এঁটে-সেটে ভিতরে বসলাম। মাটি থেকে গোল করে বিচিলি দিয়ে ঘেরা ঘর। ঘরের মাথাটা ক্রমশঃ সরু হয়ে একটা পয়েণ্টে মিলেছে। বিটকাটা একটা লতা দিয়ে বাঁধা—অনেকটা আমাদের দেশের খড়ের গাদার মত। সম্বলের মধ্যে পকেটের গোটা পাঁচেক সিগারেট এবং দেশলাইয়ের গোটা পনের বিশ কাঠি। যে আশঙ্কা করছিলাম তাই-ই ঘটলো। রাত্রি গোটা দশেক হ'বে। একটু সড়্-সড়্ শব্দ হ'ল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে

বোয়াবাব বৃক্ষ :
এই বিশেষ বৃক্ষ আফ্রিকা ভিন্ন অন্য কোথাও জন্মায় না

বিচিলিতে আগুন ধরালাম। আলোয় দেখি একটা অজগরের অর্দ্ধেকটা ঘরের মধ্যে। চম্‌কে উঠলাম। তাড়াতাড়ি বড় ছোরাখানা বের করে এক কোপে সাপটাকে দ্বিখণ্ডিত করলাম। আমাদের দেশের ঢোঁড়া সাপের মত আফ্রিকার এই অজগরের বিষ নেই। দু' ফুট আড়াই ফুট লম্বা হ'বে এবং আগাগোড়া বর্ত্তুলকায়। এরা সাধারণতঃ শিকারকে কামড়ায় ও জড়িয়ে চেপে মারে। উজ্জ্বল আগুন জ্বালান থাকলে সর্ব্বাবস্থায়ই অনেকটা নিরাপদ। ঘরের চারিদিকে সড়্-সড়্ খস্-খস্ শব্দ। বুঝলাম একটা নয়, এক পাল অজগরের আগমন হয়েছে হয়তো আমার রক্তের গন্ধ পেয়েই। আগুনটা একটু উজ্জ্বলতর করে ঘরের বেড়ার আল্‌গা স্থানগুলো বন্ধ করে দিলাম। সারা রাত্রি বসে বসে দুটো চারটে খড় আহুতি দিয়ে কোন রকমে আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখলাম। ছোরা হাতে সন্ত্রস্ত ও সশঙ্ক অবস্থায় আধা আলোয় বসে বসে এই দোঁ-আঁশলা নিগ্রো তরুণটীর ঘৃণিত জঘন্য আচরণের কথা আর সাদা চামড়ার হোটেল-আউলার দুর্ব্যবহারের কথা যতই মনে হতে লাগলো, ততই যেন আমার মাথায় খুন চাপতে সুরু করলো। আমি ঈশ্বর মানিনে, নচেৎ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে হয়তো এই দুর্ব্বিপাকে শান্তি ও সান্ত্বনা মিলতো। এই দারুণ সঙ্কটময় রাত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে, সাদা-কালোর এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিকার করতেই হ'বে।

ভোরের আলোর আভাষ পেতেই মনটা আশ্বস্ত হ'ল। ঝাঁপ খুলে বাইরে এসে ধড়ে যেন প্রাণ এল, যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। অবসাদে, ক্লান্তিতে, নিদ্রাহীনতায় নিজেকে বীভৎস মনে হ'তে লাগলো। পিপাসায় ছাতি ফেটে পড়ছে। এক পেয়ালা কাফীর জন্য হিংস্র হয়ে উঠলাম। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাত্‌তাড়ী গুটিয়ে সেই সহরে ফিরলাম। নিগ্রোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি দরজা বন্ধ। দশটার আগে এখানে কোন দোকানপাট খোলে না। কি করি—পথ ধরলাম। প্রতিহিংসার আর প্রতিকার হ'ল না।

অনেকটা দূর আসার পরে একটা রেল ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। ষ্টেশন অর্থে আমাদের ই, বি, আর, রেলের একটা গুমটি ঘর। আসামের লামডিং সেক্‌শনের মত বহু দূরে দূরে নির্জ্জন স্থানে এই সব নিরালা ষ্টেশন। একজনই প্রায় সব কাজ করে। ঘরে সাহেব ও মেম বসে। তরুণী মেম কি যেন একটা বুনছে। বাইক দরজায় হেলান দিয়ে রেখে আমি সোজা ঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই সাহেবটা মারমুখ হ'য়ে রুখে উঠলো, get out. সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। সাহেবের দক্ষিণ হাত প্রসারিত আর মুষ্টিবদ্ধ।

আমি ততোধিক স্বর চড়িয়ে বললাম, stop, one word more and I murder you. মেমের দিকে

তাকিয়ে আদেশই করলাম, Miss, you go and get a cup of coffee for me. I need it.

সাহেবটা যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। নিগ্রোর দিকে একটু চোখ তুলে তাকালেই সে লেজ গুটিয়ে পলায় এবং ইহা দেখতেই তারা অভ্যস্ত। সাহেবের মত এমন চটপট ইংরেজি বলা এবং এই ঔদ্ধত্য তাদের একটু স্তম্ভিত করে তুলেছিল। তা ছাড়া আমার রক্তবর্ণ চোখ এবং মুখের চেহারা ও এই নির্জ্জন বনাঞ্চল তাদের অনেকটা শঙ্কিত করে তুলেছিল। নিমেষে এই ঘটনা ঘটে গেল। সাহেবকে কথা বলার অবসর না দিয়ে মেমকে আমি পুনরায় একটু স্বর নামিয়ে মিনতি মাখানো কণ্ঠে বললাম, please go, I need a cup of coffee. A cup will suffice.

একটু ইতস্তত: করলেও মেমটা সত্যিই উঠলো। আমি একটা টুল টেনে জেঁকে বসলাম। সাহেব একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলে, what are you.

আমার সমগ্র পরিচয় দিলাম। গত রাত্রের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলাম। প্রসঙ্গক্রমে শুনিয়ে দিলাম, সাদা লোকগুলো বিশ্বটা শুধু তাদের ভোগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মনে করে। কিন্তু দিন ঘনিয়ে এসেছে, এ সুবিধা আর বেশী দিন ভোগ করতে হ'বে না। কালা আদমীরও এ পৃথিবীর বুকে বাঁচবার সমান অধিকার আছে এবং এ অধিকার তারা অচিরেই অর্জ্জন করবে।

মিনিট দশেকও হয়নি, মেম নিজেই এক কাপ কাফি ও খান চারেক বিস্কুট নিয়ে এল। কাফি পান করে একটু সুস্থ হলাম। ধন্যবাদ দিয়ে উঠলাম। ওরাই আমাকে বলে দিলে যে, মাইল পাঁচেক দূরে একজন ভারতীয় আছে।

বেলা গোটা দশেক হবে। ভারতীয়ের বাসায় পৌছলাম। বোম্বে অঞ্চলের ধনী মুসলমান, সপরিবারে বাস করেন। ভদ্রলোকের নিজের মোটর আছে এবং আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা করেন। আমায় পেয়ে খুব খুসী হলেন। আমি বিশেষ ক্লান্ত জেনে স্নানের গরম জল, লুঙ্গি, চটি, তোয়ালে সব মিনিট কুড়িকের মধ্যেই ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রচুর জলযোগের আয়োজন। তারপর দুগ্ধফেননিভ গদির উপর গভীর নিদ্রা। পোলাও, মাংস, ডিম, দধি প্রভৃতি সহযোগে আকণ্ঠ মধ্যাহ্ন ভোজন হ'ল সব একসঙ্গে বসে। অপরাহ্নে ভদ্রলোকের ছেলে দুটোকে একটু ইংরেজি পড়ালাম। নানা দেশ-বিদেশের কত গল্প হ'ল। রাত্রে বললাম, আমি এ আরাম ছেড়ে আর দিন কতক নড়ছি না।

ভদ্রলোক বললেন, এক মাস, এক বছর না হয় সারা জীবনই থাকুন না। দু' বেলা দুটো মুরগীর দাম চার আনার বেশী নয়। আপনি থাকলে সত্যিই আমি খুব খুশী হ'ব।

পরের দিন বেলা দশটার মধ্যে নাওয়া-খাওয়া সেরে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যায় ফিরলাম। ভদ্রলোক বললেন,

আফ্রিকার ভারতীয়ের গৃহে অতিথি লেখক

আমার থাকার জন্য আলাদা ঘর ইত্যাদি সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। দু' মাসের কম কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না।

তার পরের দিন আকাশ-পথে সূর্য্যদেব চলতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পথচারী মনও উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। প্রাতঃকালীন টিফিন শেষ করেই আমি বিদায় নিলাম। ভদ্রলোক ব্যথিত অন্তরেই বিদায় দিয়ে মোটা কিছু পথ-খরচা দিয়ে দিলেন। আর তাঁরই এক ধনী নিগ্রো বন্ধুর ঠিকানা দিয়ে বললেন, সেখানে যেন আমি বিশ্রাম করে যাই। তিনি ডাকে তাকে পত্র দিয়ে সব জানিয়ে দিবেন, বললেন।

আবার সুরু হ'ল আমার পথ-চলা।

মিশর

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

মিশরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রোমেলের যান্ত্রিক সৈন্যদল মিশরের সীমান্তরেখা অতিক্রম করিয়া এল এলামিনের নিকট মিত্র শক্তির সহিত পুনরায় শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, মিশরের যুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিবর্গ তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োযিত করিবেন। ইহা অসম্ভব নয়। মিশরের সংঘর্ষ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইতিহাসে হয়তো নূতন পৃষ্ঠা যোজনা করিবে।

মিশরের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ হইতে মিশরের পৃথক থাকিবার কথাই বলা হইয়াছে। মিশরের বর্ত্তমান রাজা ফারুক তরুণ বয়স্ক হইলেও বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতামত পোষণ করেন। তাঁহার মতামতের কঠোরতা ইতিমধ্যেই মিশরের রাষ্ট্রনীতিতে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমতঃ গণতন্ত্রের বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি ঘৃণা করেন এবং এই গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী দলের নেতা নাহাস পাসার নেতৃত্ব মিশরের কল্যাণকর বলিয়া তিনি মনে করেন না। দ্বিতীয়তঃ মিশরের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যের হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানা এই নবীন রাষ্ট্রনায়কের বিশেষ মনঃপুত নয়।

বর্ত্তমানে মিশরের প্রধান মন্ত্রীরূপে যিনি মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন তাঁহার রাষ্ট্রনীতিক মতামত সুস্পষ্ট। প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাসার এই ক্ষমতা লাভের পশ্চাতে রহিয়াছে মিশরের জাতীয় আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। গত মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট উইলসন যখন বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করেন সেই সময় জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরে বিখ্যাত 'ওয়াফ দল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়তাবাদী দলের আন্দোলনের ফলে দেশে যে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহার জন্য জগলুল পাশা এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা নির্ব্বাসন বরণ করেন। ১৯২২ সালে ইঙ্গ-মিশর চুক্তি দ্বারা এই জাতীয়তাবাদী-গণের দাবী আংশিকভাবে মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় দলের অনেকেই ইহাতে খুসী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। মিশরে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব লোপের জন্য ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি আবার আন্দোলন সুরু হয়। এই সময়ে মিশরের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশার নেতৃত্বে 'নীল কোর্ত্তা' দল নামে একটি দলের উদ্ভব হয়। ১৯৩৬ সালে বৃটেন দ্বিতীয় বার মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন এবং এই সম্পর্কে যে চুক্তি হয় তাহাতে মিশরে ইংরেজদের বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য সুয়েজ খাল অঞ্চলে ১০ হাজার সৈন্যের একটি ঘাঁটি স্থাপন, ৪০০ বিমান পোত ও বৈমানিক রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। আফ্রিকায় যুদ্ধ বাধিলে মিশরের মধ্য দিয়া বৃটিশ সৈন্যের চলাচলের দাবীও স্বীকৃত হয়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৩৬ সালের সন্ধিসর্ত্ত অনুযায়ী মিশর জার্ম্মানী এবং ইটালীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। মিশরে ইটালী ও জার্ম্মানীর যে ৫ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি ছিল তাহাও আটক করা হইয়াছে।

১৮৭৫ সাল হইতে মিশরের উপর ইংরাজদিগের নজর পড়ে। এই সময়ে বৃটেনের খ্যাতনামা রাষ্ট্রনীতিক ডিসরেলী খেদিভ ইসমাইলের নিকট হইতে দুই কোটি টাকা মূল্যে সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার কিনিয়া লন। এই কূটনীতিক রাষ্ট্রনায়কের দূরপ্রসারী দৃষ্টি—সাম্রাজ্যের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। সুয়েজ পরবর্ত্তী যুগে বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান ঘাটিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

মিশরের ভিতর দিয়া নীল নদ প্রবাহিত, এই নদের তীরবর্ত্তী অঞ্চল ও বদ্বীপ লইয়া মিশর দেশ গঠিত। ইহার অধিকাংশই মরু অঞ্চল। মিশরের আয়তন ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গ মাইল তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গ মাইলই মরুভূমি। মিশরের লোক সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি হইবে। ভৌগোলিক আর কোন বিশেষত্ব ইহার আছে বলিয়া মনে হয় না। সুপ্রাচীন সভ্যতা ও পিরামিডের জন্য মিশর বিশ্বেতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে।

মেঘ ও রৌদ্র

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
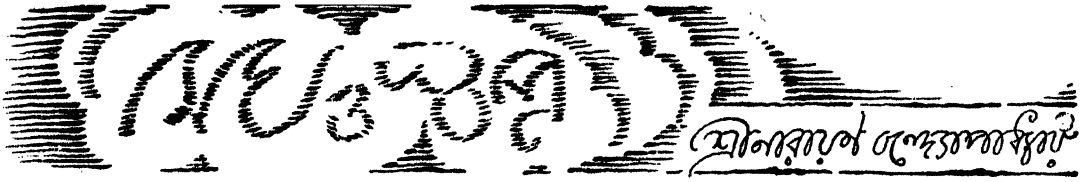
আঠারো

সন্ধ্যার পর ঘরটাকে ভারী রহস্যময় লাগতো বিদ্যুতের। সন্ধ্যার পর কেমন যেন একটা অপূর্ব অনুভূতিতে সে ভ'রে উঠতো—ঘরের নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিদ্যুৎ শুয়ে থাকতো—আর কিছুক্ষণ পরে খুট্ ক'রে কে যেন এসে দেয়ালের সুইচ টিপে দিতো—সমস্তটা ঘর সবুজ বাল্‌বের আলোয় ভ'রে উঠতো। ঘরের মধ্যে মনে হ'ত একটী নিটোল সবুজ স্বপ্ন যেন বাতাসে বাতাসে পাখা মেলেছে—সেই সবুজের সমুদ্রে বিদ্যুতের মনে হ'ত সে যেন আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। ভারী সুন্দর একটী শান্ত অনুভূতি!

মল্লিকা এগিয়ে আস্‌তো, কপালের ওপরে তার ঠাণ্ডা আর মোমের মতো নরম হাতখানা রাখতো, বল্‌তো, "কেমন লাগছে এখন? মাথাটা ছেড়েছে একটুও?"

বিদ্যুৎ সামান্য হাস্‌তো, বল্‌তো, "ছাড়বেই, আপনি যে ভাবে আমার সেবা আরম্ভ করলেন, তাতে অসুখ তো অসুখ, স্বয়ং মৃত্যুও এখানে আস্‌তে পারবে না।"

মল্লিকা হাস্‌তো। কাছে, খাটের একপাশে এসে বস্‌তো ব'ল্‌তো, "আপনি কথাশিল্পী জানি, কিন্তু ঠিক এইভাবে কথাকে যে রচনা করতে পারবেন তা জান্‌তাম না— আপনাকে এখানে এনে রাখতে পেরেছি, সেটা যে আমার কত বড় সৌভাগ্য, তা আজ কি করেই বা বোঝাই আপনাকে!"

বেশ কয়েকটা দিন কাট্‌লো—মল্লিকা যে ডাক্তারের ব্যবস্থা ক'রেছে, তাঁকে বিদ্যুতের আনা এক রকম স্বপ্ন ছিল বলা যায়—বিদ্যুতের অবস্থা অনেকটা ভাল'র দিকে!

মাঝের কয়েকটা দিন কাট্‌লো। একদিন মঞ্জুদি এলেন। দিন কয়েকের জন্যে তিনি মফঃস্বলে গিয়েছিলেন, সঙ্ঘের কাজেই। এসেই একেবারে সোজা বিদ্যুতের ঘরে ঢুক্‌লেন, বল্‌লেন, "কী রকম, হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে আন্‌লেন যে?"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লো, "হ্যাঁ, অনেক দিনই সুস্থ ছিলাম, এবার একটু অসুস্থ হ'তে ইচ্ছে হ'ল কিনা!"

ঘরের সকলেই হেসে উঠলেন, মঞ্জুদি কাছে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বস্‌লেন, বল্‌লেন, "আপনার কথার মধ্যে কিন্তু অনেকখানি সত্য আছে, এ-রকমভাবে মল্লিকা-দেবীর হাতের নরম সেবা পাওয়ার লোভ কার না হয় বলুন?"

বিদ্যুৎ একটু অপ্রতিভ হ'ল, বল্‌লে, "সে কথা ঠিক—উনি একদিন প্রাণ দিয়ে আমার সেবা ক'রেছেন—এক রকম ওঁর জন্যেই তো এবার বাঁচলাম।"

মল্লিকা এবারে কাছে এগিয়ে এল, বল্‌লে, "প্রথমতঃ দেখুন, বাড়িয়ে বলারো একটা সীমা থাকে—আপনি সেই সীমাকে ছাড়াচ্ছেন, আর দ্বিতীয়তঃ আপনি চুপ ক'রে থাকুন, অসুখ আপনার আজো সারেনি মনে রাখবেন।"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো।

চুপচাপ কয়েকটা মুহূর্ত পার হ'ল। তারপর মঞ্জুদি কয়েকটা কথা বল্‌লেন—যশোরে তাঁদের সঙ্ঘের যে কার্য্যকরী সমিতিতে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটেছিলো, তাই নিয়েই খানিকটা আলোচনা করলেন—বল্‌লেন, মল্লিকারো একবার সেখানে এই সময়ে গেলে ভাল হ'ত, সঙ্ঘের পরিচালনায় কোথাও কোন দিন যেন কোন ত্রুটী না ঘটে, এটা বড় রকম অ-গৌরবের বিষয় হ'বে তা' হ'লে, যেখানে মঞ্জুদি র'য়েছেন—যেখানে মল্লিকা র'য়েছে—সেখানে এ-বিশৃঙ্খলা যেন ভুলেও পদপাত না করে!

মল্লিকা মাথা নীচু ক'রে সব শুন্‌লো, বল্‌লে, "আমি যেতে পারতাম দিদি, ছুটীও পেতাম, কিন্তু এখন আর হয় না—আপনি তো ক'রে এসেছেন কিছু ব্যবস্থা, পরে দেখা যাবে—"

মঞ্জুদি চুপ ক'রে রইলেন, অনেকক্ষণ পরে বল্‌লেন, "তোর সংগে আমার কতোগুলো কথা আছে—পরে দেখা করিস্ একবার" বলে'ই উঠে দাঁড়ালেন, বিদ্যুতের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা ভাই, চলি এখন, কতগুলো জরুরী কাজ হাতে র'য়েছে, শেষ করতেই হ'বে।"

"আচ্ছা—" বিদ্যুৎ বিছানায় শুয়েই দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো—হাত দুটোকে ভারী হাল্কা মনে হোল বিদ্যুতের! ভারী ভঙ্গুর আর দুর্বল!

বেলা প'ড়ে আস্ছিল। জান্লা দিয়ে পশ্চিমদিকের খানিকটা আভাস বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কতগুলো লাল মেঘ ভেসে চ'লেছে—বিদ্যুৎ জান্লা দিয়ে বাইরে চাইলো।

মল্লিকা কিছুক্ষণ হ'ল ওষুধ খাইয়ে নীচে নেমে গেছে গা ধুতে! সমস্ত দুপুর আজ খুব জ্বর ছিল—মাথার যন্ত্রণা অসম্ভব রকম বেড়ে উঠছিল, এখন সামান্য একটু টেম্পারেচার নেমেছে—মাথার যন্ত্রণাটাই বড় বেশী অস্বস্তিকর!

খুট্ ক'রে দরজায় একটু শব্দ হ'ল। দরজা ঠেলে আস্তে, অতি ধীরে গার্গী ঘরে ঢুক্লো—মুখ তার ম্লান—চোখে অশরীরী যেন কোন্ আশঙ্কার ছায়া—আস্তে বিদ্যুতের বিছানার দিকে এগিয়ে এল।

বিদ্যুৎ কিছুই বুঝ্তে পারলো না, জান্লার দিকে চেয়ে সেই ভাবেই সে আস্তে আস্তে চোখ বুজ্লে।

গার্গী আরো কাছে এগিয়ে এল, তারপরে আস্তে কপালের ওপরে একবার হাতটা রাখ্তে গেলো—কিন্তু কি ভেবে আবার সরিয়ে নিলো, ভাব্লে হঠাৎ হাত রাখ্লে চম্‌কে উঠ্তে পারে—দরকার নেই—একটু পরেই না হয়—

বিদ্যুৎ চোখ খুল্লে,—"তুমি?" আস্তে, অতি আস্তে বিদ্যুৎ উচ্চারণ করলে, "বোসো—ওখানে মোড়াটা আছে বোধ হয়—"

গার্গী খাটের একপাশে আস্তে বস্লো, তারপরে কপালের ওপরে তার সেই কম্পিত ভীরু হাতখানা একবার রাখ্লে, বল্লে, "আমাকেও জানানো তুমি অনুচিত ভেবেছিলে বিদ্যুৎ?"

বিদ্যুৎ হাস্লো, বল্লে, "না, তা আমি কিছুই ভাবিনি, তোমাকে জানাবার আমার সময় ছিল না—মল্লিকা দেবীই আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এসেছেন, তারপরে কয়েকটা নিরবিচ্ছিন্ন চেতনাহীন দিন নিঃশব্দে কেটে গেছে।"

"হ্যাঁ, সে সবই আমি শুনেছি" গার্গী চুপ করলো, বিদ্যুতের কপালে আরো একবার হাত রাখ্লো, বল্লে "টিপে দেবো মাথাটা একটু?"

"না—থাক্—" বিদ্যুৎ একটু হাস্তে চেষ্টা করলো।

গার্গী কপালের ওপরে আরেকবার হাত রাখ্লে, বল্লে, "এখনো তো বেশ গা গরম র'য়েছে, লাষ্ট টেম্পারেচার কত?"

"কি জানি?" বিদ্যুৎ আবার জান্লার দিকে চাইলে, "মল্লিকা দেবীই সব জানেন—"

গার্গী বিদ্যুতের কপালের চার পাশ হাত দিয়ে টিপে দিতে লাগ্লো। জান্লার বাইরে সন্ধ্যা নাম্‌ছে। ঘরের মধ্যে চারদিক নিস্তব্ধ—দেয়ালের বড় ঘড়িটার শুধু টিক্ টীক্ শব্দ জেগে র'য়েছে সেই অপরূপ নৈঃশব্দ্যের ভিতরে। আর কিছু নেই—গার্গী সোজা হ'য়ে বিদ্যুতের বিছানার পাশে বস্লো।

"একটা কথা বল্‌বো বিদ্যুৎ?"

বিদ্যুৎ চোখ খুল্লো, বল্লে, "বল—"

"জীবনটাকে বেশ ভাল লাগ্লো কিন্তু—" বিদ্যুৎ একটু বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টি ফেল্লো—গার্গীর চোখের ওপরে, বল্লে, "ঠিক বুঝ্তে পারছি না—"

"বুঝ্বে—এখনো হয় তো সেই সময় আসেনি।"

বিদ্যুৎ চুপ ক'রে রইলো। ঘরের ঘড়ির সেই একরকম শব্দ অনবরতঃ বেজে চ'লেছে।

"আমার একটা অনুরোধ ছিল তোমার কাছে—"

বিদ্যুৎ চোখ নামিয়ে নিয়েছিল, আবার গার্গীর দিকে চাইলো, বল্লে, "কি?"

"শরীরটা তোমার নিজের, পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার তোমারই—সেই অধিকারকে অবমাননা ক'র না।"

এবারে বিদ্যুৎ হাস্লো, বল্লে, "তোমাকে আমার মনের একান্ত অজস্র ধন্যবাদ—তুমি বিশ্বাস ক'র—জীবনে এই বড় কথাটাই আমি কোনদিন ভাবিনি।"

"সে কথা আমি জানি—" গার্গী ম্লান, নিষ্প্রভ গলায় উত্তর দিলে। "তবু মাঝে মাঝে কেমন বিশ্রী একটা

দুর্বলতা আসে, তখন প্রকাশ না ক'রে পারি না, এর জন্যে দুঃখকে বহুবারই সাথী করলাম জীবনে—"

"তোমার কথাগুলো কিন্তু আশ্চর্য্য রকম নিটোল গার্গী—" বিদ্যুৎ নিজের মাথার চুলে একবার হাত দিলে, "এত ভাল লাগে!"

গার্গী সামান্য একটু হাস্‌লো, বল্‌লে, "হ্যাঁ, শুধু কথাই শিখেছিলাম—আর কিছু পারলাম না—"।

"পারলে না?" বিদ্যুৎ গার্গীর মুখের দিকে চাইলো —"কিন্তু আমার তো মনে হয় তুমিই পেরেছো, ফাঁকি পড়লাম আমিই—একটা মানুষ নিজের জীবনকে এভাবে যে প্রতি মুহূর্ত্তে ঠকাতে পারে, তা' আমি নিজের মধ্যেই দেখ্‌লাম। গার্গী, তুমি দুঃখ ক'র না—বরং আমার ওপর তোমার সহানুভূতি দেখানোর অবকাশ আছে—সেই সহানুভূতিই দেখিও!"

গার্গী চোখ তুল্‌লে—পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে বিদ্যুতের দিকে, বল্‌লে, "ছোটো বেলায়—ঠিক ছোট নয়, কৈশোর অতিক্রম করছি তখন, বাবা আমাকে উপনিষদ্‌ পড়িয়েছিলেন—বিশেষ কয়েকটা শ্লোকের অর্থ আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে দিয়েছিলেন, সেই কথা, আর তার প্রভাব আজো আমার সমস্ত জীবনে ছড়িয়ে আছে—প্রতি পলেই আমি সেই কথাকে অনুসরণ করছি—জানি আমি পারছি না—তবু, তবু চেষ্টার আমার ত্রুটি নেই বিদ্যুৎ!"

"তা' আমি জানি—"

"জানো?"

—হাঁ জানি—"অসতো-মা সদ্‌-গময়ো তমসো-মা জ্যোতির্গময়ঃ—"

"কি ক'রে জান্‌লে?" গার্গী বিদ্যুতের আরো কাছে সরে এল।

"তুমিই বলেছিলে—"

"আমিই বলেছিলাম?—গার্গীর সমস্ত চোখের দৃষ্টিতে যেন পরম সান্ত্বনা নেমে এল, "তুমি জানো তা' হ'লে?"

"হ্যাঁ, গার্গী, আমি জান্‌তাম্‌—"

"আশা ক'রেছিলাম" গার্গী সেইভাবেই বল্‌লে, "আমার জীবনে এই পরম প্রার্থনাকে আমি পূর্ণ ক'রে তুল্‌বো, হে পুষণ, অসত্য থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও—অন্ধকার থেকে আমায় নিয়ে এস আলোতে, আর আমি ভ'রে উঠি, আর আমি পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠি আমার জীবনে, কিন্তু বিদ্যুৎ" গার্গী সামান্য থাম্‌লো, "তা' হ'ল না, অসত্য থেকে আরো অসত্যেই আমি নেমে এলাম, অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারেই আমার নির্বাসন।"

বিদ্যুৎ চুপ ক'রে রইলো, তারপরে বল্‌লে, "এ তোমার মনের ভুল গার্গী, গভীরভাবে ভেবো—ফাঁকি তুমি পড়োনি কোন দিন—"

মল্লিকা ঘরে ঢুক্‌লো। বাথ্‌-রুম থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে—সমস্ত গায়ে তার জলের দাগ—কাপড়ও ছাড়া হয়নি—ঘরের মধ্যে কার সংগে বিদ্যুৎ কথা বল্‌ছে, তাই দেখবার জন্যে হঠাৎ ঢুকে পড়লো।

"আরে তুমি যে—" মল্লিকা দরজার কাছাকাছি দাঁড়ালো, বসো ভাই, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

"হ্যাঁ, আমিই এলাম" খাটের পাশ থেকে গার্গী উঠে দাঁড়ালো, "তোমরা তো কোনো খবরই দিলে না, কাজেই অযাচিতভাবেই এলাম—"

"কি যে বলিস্‌?" মল্লিকা দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে হাস্‌লো—"বোস্‌—তোর সংগে কথা আছে।"

মল্লিকা দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গেলো।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে গভীর নৈঃশব্দ্য নেমে এল সমস্ত ঘরে—বাইরে ক্রমশঃ অন্ধকার নাম্‌ছে। গার্গী উঠে সুইচ্‌টা টিপে দিলে।

"থাক্‌না—নাইবা জ্বাল্‌লে আলোটা", বিদ্যুৎ ক্লান্তভাবে কথা কইলে।

"অসুবিধে হ'বে না তোমার?" গার্গী আলোটা নিভিয়ে দিলে।

"না" বিদ্যুৎ বল্‌লে, "তুমি আমার কাছে এস।"

গার্গী এগিয়ে এল, বিদ্যুৎ গার্গীর একখানা হাত কাছে টেনে নিলে, "তুমি আমায় ভুল বুঝোনা গার্গী—"

"আমি কোনো দিনই বুঝিনি তা—" গার্গীর গলার স্বর ভারী হ'য়ে এল, "আজ উঠি আবার আস্‌ব আমি—" গার্গী হাতটা ছাড়িয়ে নিলে।

মল্লিকা ঘরে ঢুক্‌লো, "একী রে, আলো জ্বালিস্ নি এখনো, মল্লিকা সুইচটা টিপে দিলে, এদিকে রাত্তির হ'য়ে গেছে যে—"

গার্গী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—একটা রঙীন শাড়ী প'রে এসেছে মল্লিকা—মৃদু একটু সেণ্টের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে ওর গা থেকে—মল্লিকা এগিয়ে এল।

"অনেক ভেবে, তোকে আর খবর দিইনি ভাই। তোর নানারকম কাজ—তার ওপরে—"

গার্গী সামান্য একটু হাস্‌লো, বল্‌লে "তার জন্যে আট্‌কাতো না, যাক্—" গার্গী দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

"এখুনি যাচ্ছিস নাকি?" মল্লিকা আরো কাছে এগিয়ে এল, "তোর সংগে যে কথা ছিল—"

"বল না—"

"চল ওঘরে যাই—মঞ্জুদির সংগে দরকার আছে।"

এক মুহূর্ত্ত কী ভাব্‌লো গার্গী, তারপরে বিদ্যুতের দিকে চাইলো, তারপরে বল্‌লে, "চল—"

বিদ্যুৎ দরজার দিকে চেয়ে রইলো, ওরা দুজনে, আস্তে দরজা ভেজিয়ে নীচে নেমে গেল।

মঞ্জুদি একটা মোটা খাতা খুলে কি যেন লিখছিলেন, ওরা ঢুক্‌তেই সেটা বন্ধ ক'রে রেখে দিলেন, বল্‌লেন, "এই যে গার্গী এসেছ? ব'স তোমরা!"

গার্গী আর মল্লিকা একটা খাটের ওপরে এসে বস্‌লো।

মঞ্জুদি ফাউণ্টেনটা বন্ধ ক'রে টেবিলের একপাশে রেখে দিলেন, বল্‌লেন "মল্লিকা, তোর সংগেই আমার একটা বিশেষ আলোচনার বিষয় আছে, আশা করি, সময় হ'বে।"

গার্গীর মুখের রক্ত যেন মুহূর্ত্তে শুকিয়ে গেল—মল্লিকারও প্রায় তাই, বল্‌লে, "বলো, তোমার কথা শুন্‌বার মত সময় কেন হ'বেনা আমার?"

"তবে শোনো" মঞ্জুদি একমুহূর্ত্ত চুপ করলেন, তারপরে মল্লিকার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আমি এখানে ফিরে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি—আর আশা করি, তুমি এর কারণটাও উপলব্ধি করতে পারছ নিশ্চয়।"

মল্লিকা মাথা নীচু ক'রে রইলো।

"তোমরা কি আমাকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করবার পরামর্শ দিতে চাও মল্লিকা? যে সঙ্ঘ, যে সভা, যে আদর্শ আমি প্রাণ দিয়ে তিলে তিলে গড়ে' তুল্‌লাম, যার জন্যে আমার সমস্ত জীবনের পাথেয়-সম্পদ্‌কে নিঃশেষে দু'হাতে বিলিয়ে দিলাম, যার জন্যে আমি অবনত মস্তকে সমস্ত অপমান মাথায় তুলে' নিয়েছি, তার জন্যেই এবার আমার কি তোমরা মৃত্যু কামনা কর মল্লিকা?—আমি বুঝিনা, মানুষের এই নির্বুদ্ধিতা কেমন ভাবে আসে! সে দেখ্‌ছে—সে বুঝ্‌ছে; অথচ তবু সে এগিয়ে যাচ্ছে সেই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে—তার আর কোন দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—তাকে এত সাবধান করার পরও সে তাই করবে!"

মঞ্জুদির চোখ দুটো জ্বল্‌তে লাগ্‌ল, "তোমরা কেন বারে বারে ভুলে যাও। জীবনে লঘুতাই একমাত্র কাম্য নয়—তার আরো একটা দিক আছে—সেই দিক্‌টাকেই লক্ষ্য রেখে মানুষের চলা উচিত—জীবনে রঙ্‌টাই বড়ো কথা নয়—তার পরিপূর্ণতা রঙ্‌এর মধ্যে নেই—বেঁচে থাকা—বেঁচে থাকা মানে উচ্ছ্বাস নয় মল্লিকা!"

উত্তেজনায় মঞ্জুদি যেন হাঁপাতে লাগ্‌লেন, মল্লিকার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমাদের আমি আন্তরিক ধিক্কার দিই—তোমাদের লজ্জা করা উচিত, এত বড় একটা সঙ্ঘের, এত বড় আদর্শের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে প্রতি পলে পলে নেমে চ'লেছো তোমরা সেই মহানরকের দিকে—এ সব কথা মনে করে লজ্জায় আমার সমস্ত শরীর শির-শির্ ক'রে উঠ্‌ছে—ছিঃ, ছিঃ, আমি এই সব অপোগণ্ড শিশুদের নিয়ে শূন্যে সৌধ সৃষ্টি করতে গিয়েছিলাম—এই সব মূঢ় নির্বোধ কর্ত্তব্যহীনা সহযোগিণীদের নিয়ে!—ঘৃণায় আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠেছে—এত যে পরিশ্রম করলাম, সবই ব্যর্থ হ'ল—সবই আমার নিষ্ফল"—মঞ্জুদি গার্গী আর মল্লিকার দিকে আর একবার চাইলেন, "লজ্জা করা উচিত—লজ্জায় ঘৃণায় তোমাদের ম'রে যাওয়া উচিত মল্লিকা।"

মল্লিকা মাথা তুল্‌লো। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে," আমাকে ক্ষমা কর মঞ্জুদি, আমি বুঝ্‌তে পারিনি—আর হ'বে না। আমাকে বিশ্বাস কর।"

মঞ্জুদি উত্তর দিলেন না, জানলার মধ্যে দিয়ে শুধু ক্রুর দৃষ্টিতে দূরের দীর্ঘায়িত পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

আর একটী মুহূর্ত্ত এল জীবনে, এই মুহূর্ত্তগুলিরই বড় বেশী প্রয়োজন হয়—কিন্তু সময়ে তা' আসে না, যখন আসে, তখন হয় অনেক দেরী হ'য়ে গেছে—না হয় অনেক দেরী আছে, গার্গী তাই ভাব্‌লো, সময়ে এলে জীবনটাকে সুপরিচিত করা যেতে পারতো হয় তো!

বাইরে বারান্দার ওপরে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনো হ'য়ে নেমেছে। গার্গী ঈজিচেয়ারটাকে একেবারে শেষপ্রান্তে টেনে নিয়ে এল। এখান থেকে সহরের রাস্তাগুলিকে ভারী সুন্দর দেখায়। বিশেষ করে' সন্ধ্যার পরে। ঘন রাত্রি নাম্‌ছে চারদিকে, পথের দু'পাশের আলোগুলিতে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা—সমস্ত সহরে কখন মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ ছুঁইয়ে দিয়েছে! তারি আলোয়—তারি বেদনায় সারা পথ-ঘাট ম্লান হ'য়ে উঠ্‌লো!

গার্গী চেয়ে রইলো—ভুল মানুষেই করে, একথা ঠিক—কিন্তু গার্গীর দুঃখ হ'ল জীবনে সে ভুল বড় মর্মান্তিক ভাবে করলো—গার্গীর এবারে একটু অবহিত হওয়া উচিত, আবও বা কত সে নাম্‌বে? আরো কত নীচে?

চৈত্রের সেই সন্ধ্যাকে মনে পড়লো গার্গীর, কী ছেলে-মানুষিই ক'রে ছিল সেদিন! মোহ—মোহ জিনিষটা বড় খারাপ—মানুষকে অনেকখানি নীচে নামিয়ে দেয়। গংগার ধারে ব'সে সেই মুহূর্ত্তের দুর্বলতা—পাগ্‌লামী! গার্গীর হাসি পেল—অনেক আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল তার!

আজ মঞ্জুদি ঠিক কথাই বলেছেন। জীবনে লঘুতাই একমাত্র জিনিষ নয়—তার আরেকটা দিক্‌ আছে, সেই দিক্‌টাকেই লক্ষ্য রেখে মানুষের চলা উচিত। জীবনে রঙ্‌টাই বড় কথা নয়, তার পরিপূর্ণতা রংয়ের মধ্যে নেই—বেঁচে থাকা মানে উচ্ছ্বাস নয়!

মঞ্জুদি, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, গার্গীর মনে হ'ল। তোমার শাসন-কঠিন হাতের দৃঢ় পরিচালনায় হয়তো আমি আবার বেঁচে উঠ্‌তে পারবো—যে পতন, যে স্খলিত পতন আমার জীবনে নেমে এসেছিল, তাকে তুমিই হাত দিয়ে ঠেকালে, তোমার পায়ে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা রইলো।

গার্গী পথের দিকে চাইলো—স্তিমিত আলোগুলো জ্বল্‌ছে, চারদিকে অন্ধকার—আর সেই অন্ধকারে গার্গী চোখ বুজ্‌লে, সমস্ত মাথা তার ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছে। তার মনে হ'ল—কে এক বিরাট্‌ পুরুষ তার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসা, স্ফীত বক্ষ, হাতে তার একটা দণ্ড, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টির দ্যুতি—গম্ভীর তার মুখ। অথচ দেখ্‌লে মনে হয় সহানুভূতিতে যে কোনো মুহূর্ত্তে সে কোমল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। তাঁরই গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এলো: "এ তোমার মনের ভুল গার্গী, গভীর ভাবে ভেবে দেখ, ফাঁকী তুমি পড়োনি কোনদিন।"

গার্গী মাথা তুল্‌লে। কোথায় সেই পুরুষ? সাম্‌নে কেবল কতগুলি পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার, আর পথের ধারে মৃত পাণ্ডুর কতগুলি দীর্ঘ দীপদণ্ড, আর সময়ের স্রোত—হু হু ক'রে সেই নির্ম্মম সময়ের স্রোত—সেই গতিপ্রবাহ ভেসে চলেছে। গার্গী আবার চোখ বুজ্‌লো।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীইন্দু গুপ্ত

আকুল প্রাণের ব্যাকুল সুরে তোমার পরশ পাই—
মোর জীবনের রাখাল ওগো গর্ব্ব আমার তাই।
মগন হয়ে তোমার রূপে
চুপে চুপে রসের কূপে—
স্বপন-লোকের চন্দ্রালোকে তোমার পানে চাই।

ওগো বিরাট্‌, আমার মাঠে তোমার বেণু বাজে
নিত্য নূতন দিবস রাতে সুখের স্বপন মাঝে।
দূর করে দিই অশ্রু হাসি
তোমায় শুধু ভালবাসি
এই চেতনার আনন্দে আজ সকল ভুলে যাই।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

(চতুর্থ পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥৯॥

ন বায়ুক্রিয়ে (মুখ্যপ্রাণ বায়ু নহে), পৃথগুপদেশাৎ (শ্রুতিতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে, এই হেতু)।

মুখ্য প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করা হইতেছে। শ্রুতিতে আছে—"য প্রাণঃ স এষ বায়ুঃ" অর্থাৎ যে প্রাণ, সেই বায়ু। এই প্রাণবায়ু পঞ্চভাগে বিভক্ত :—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান। শ্রুতি ব্যতীত সাংখ্যবাদীরাও বলেন, "সামান্যা করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ।" ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তিই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন—প্রাণ এইরূপ বায়ু নহে, যেহেতু শ্রুতিতে ইহার পৃথক্ উপদেশ আছে। যথা—"প্রাণ এষ প্রাণ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ", প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তিনি বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হন, তাপ প্রদান করেন। প্রাণ যদি বায়ু হইবে, তবে এইরূপ পৃথক্ উপদেশের হেতু কি? প্রাণ ইন্দ্রিয়ও নহে। শ্রুতিতে প্রাণকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" অর্থাৎ তাহা হইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু জন্মিয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে রহিয়াছে—যে প্রাণ, সেই বায়ু। এই শ্রুতিবাক্যের সহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? বায়ু ব্রহ্মভূত। সেই বায়ু অধ্যাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চব্যূহে জীবাধারে অবস্থিত। বাহ্যবায়ু অপেক্ষা এই বায়ুর বৈশিষ্ট্য আছে। এই বায়ুই প্রাণ নামে অভিহিত হয়। উহা ঠিক বাহ্য বায়ু নহে এবং একেবারেই বায়ু হইতে পৃথক্ বস্তুও নহে। যে শ্রুতিবাক্য প্রাণকে বায়ু বলে, আর যে শ্রুতিবাক্য তদ্বিপরীত উক্তি করে, এই দুয়ের মধ্যে অবিরোধ ইহাই যে, প্রাণ আসলে বায়ু নহে, এবং যে শ্রুতিবাক্য প্রাণকে বায়ু বলিয়াছে, সেই শ্রুত্যুক্ত বায়ু বাহ্য বায়ু হইতে বিশেষ গুণযুক্ত হইয়া প্রাণক্রিয়া সম্পাদন করে। পরন্তু প্রাণ স্বতন্ত্র পদার্থ। তারপরও প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাণ যখন জীবের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বস্তু, তখন প্রাণের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আছে কিনা? কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—মৃত্যু প্রাণকে গ্রাস করে না, প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্।" জননীর ন্যায় প্রাণ অন্যান্য প্রাণসকলকে পুত্রবৎ রক্ষা করে। এই সকল শ্রুতি-বচনে জীবাত্মার ন্যায় প্রাণেরও প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। তদুত্তরে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা হইতেছে।

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥১০॥

তু (তু শব্দে পূর্ব্বাশঙ্কা নিরসিত করা হইতেছে), চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুরাদির ন্যায়), তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ (তাহার সহিত সমানভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে) অর্থাৎ শাস্ত্রে মুখ্য প্রাণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত উপদিষ্ট হওয়ায়, উহাও ভোক্তার ভোগোপকরণরূপেই গণ্য হইয়াছে।

"সমানধর্ম্মাণাঞ্চ সহশাসনং যুক্তম্" অর্থাৎ সমধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থের সহপাঠ যুক্ত হয়, এই ন্যায়ব্যাখ্যানুসারে প্রাণও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সহশিষ্ট অর্থাৎ একসঙ্গে উপদিষ্ট হওয়া হেতু, জীবের ন্যায় উহার কর্তৃত্ব না থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় উহা ভোক্তৃত্বের উপকরণহিসাবেই গ্রহণীয় হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণও একটী করণ হয়, তখন তাহার চক্ষুরাদির ন্যায় রূপাদি বিষয় থাকা সঙ্গত হইবে? প্রাণের এমন অসাধারণ বিষয়ত্ব কিছুই নাই। আর প্রাণ যদি করণ হইবে, তাহা হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় না বলিয়া দ্বাদশ করণ গণনাই সঙ্গত হয়, এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের প্রয়োজন হইতেছে।

অকরণত্বাৎ ন দোষঃ, তথাহি দর্শয়তি ॥১১॥

ন দোষঃ (প্রাণের বিষয়বস্তু না থাকা দোষের হয় না) কুতঃ অকরণত্বাৎ (চক্ষুরাদি যেমন করণ, প্রাণ

সেইরূপ করণ নহে, এই হেতু) তথাহি দর্শয়তি (শ্রুতিতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে)।

প্রাণকে চক্ষুরাদির ন্যায় করণ বলিলে, চক্ষুর যেমন রূপাদি বিষয় আছে, প্রাণেরও সেইরূপ কিছু থাকার প্রয়োজন বটে। কিন্তু প্রাণ এই পক্ষে অকরণ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেমন জ্ঞানক্রিয়ার করণ, প্রাণ সেরূপ নহে। দেহাদির ন্যায় প্রাণও আত্মার ভোগোপকরণ। প্রাণের করণত্ব না থাকিলেও, তাহার প্রয়োজন আছে, তাহার একটী বিশেষ কার্য্য আছে। প্রাণের এই কার্য্য বুঝাইতে গিয়া শ্রুতির এই গল্পটী উপভোগ্য। পূর্ব্বে যে মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণ সকলের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া কে শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিল। শ্রুতিতে তাহার সিদ্ধান্ত আছে। "যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" অর্থাৎ যিনি উৎক্রান্ত হইলে, এই শরীর অতিশয় ঘৃণার্হ হইবে, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। তারপর চক্ষু-কর্ণ-বাগাদি একে একে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইল। যখন যে উৎক্রান্ত হয়, তখন শরীরে তাহার কার্য্যই বন্ধ হইয়া যায়, পরন্তু শরীর পূর্ব্ববৎ সজীব থাকে। ইহার পর প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হওয়ার উদ্যোগ করিল, তখন দেখা গেল—সকল ইন্দ্রিয়গণই বৃত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে এবং শরীরও মৃতবৎ প্রতীত হইতেছে। তখন শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থান মুখ্য প্রাণের কার্য্য বলিয়া প্রাণকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইল। মুখ্য প্রাণ অন্যান্য প্রাণ সকলকে বলিল—তোমরা মুগ্ধ হইও না, আমি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া এই শরীর ধৃত রাখিয়াছি। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং" প্রাণের দ্বারাই এই অবরণীয় শরীর রক্ষিত হয়। প্রাণ যখন যে অঙ্গ ত্যাগ করে, সে অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হয়। আত্মাও প্রাণসৃষ্টির পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন "কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতেঽহং প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত" অর্থাৎ কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইতে পারিব, কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব? সেই আত্মা অতঃপর প্রাণ সৃজন করিলেন।

এই সকল শ্রুতির দ্বারা জীবের উৎক্রান্তি ও স্থিতি প্রাণের কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইল।

পঞ্চবৃত্তিঃ মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥১২॥

মনোবৎ (মনের ন্যায়), পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচটী বৃত্তি) ব্যপদিশ্যতে (শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।

শ্রুতিতে প্রাণের পাঁচটী বৃত্তির কথা আছে। এই পাঁচটী বৃত্তির নাম প্রাণাদি পঞ্চবায়ু নামে অভিহিত। প্রাক্-বৃত্তি প্রাণের। ইহা দ্বারা উচ্ছ্বাসাদি কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। অবাক্-বৃত্তির নাম অপান। প্রাণ যেমন ঊর্দ্ধবৃত্তি, অপান তদ্রূপ অধোবৃত্তি। এই বৃত্তিদ্বারা মলমূত্রাদি ত্যাগক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অপান ও প্রাণবায়ুর সন্ধিস্থলে ব্যান বায়ু বর্ত্তমান। ইহাই বীর্য্যাগ্নি-স্বরূপ অগ্নিমথনাদি করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে। উদান বৃত্তি জীবের উৎক্রান্ত্যাদির সময়ে কার্য্য করিয়া থাকে। সমান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত থাকিয়া শরীরের সমতা রক্ষা করে এবং ভুক্তান্ন হইতে রস-রক্তাদি সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয়। মনের পঞ্চবৃত্তির ন্যায় প্রাণেরও পঞ্চবৃত্তি বর্ণিত হইল। দর্শনাদি মনের পঞ্চবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য বৃত্তিও আছে; এইরূপ প্রাণেরও বহুবিধ বৃত্তির পরিচয় থাকিলেও, এই পাঁচটী প্রাণবৃত্তিই প্রধান। অতএব প্রাণও মনের ন্যায় অকরণ হইলেও, জীবের ভোগোপকরণ বলা যাইতে পারে।

অণুশ্চ ॥১৩॥

প্রাণ অণুও বটে।

অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্য প্রাণও অণু। কিন্তু শ্রুতিতে আছে "সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" অর্থাৎ প্রাণ ক্ষুদ্র জন্তুর সমান, মশকের সমান, সর্পের সমান। এই ত্রিলোকের সমান, এমন কি সর্ব্বজগতের সমান। প্রাণের এই শেষোক্ত ব্যাপিত্বকথনে অণুত্বের অপলাপ হয়, কিন্তু প্রাণকে এই শ্রুতিতে অধিদৈব ও অধ্যাত্মহিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণের বিভুত্ব আধিদৈবিকভাবে গ্রহণীয়। আধ্যাত্মিক হিসাবে প্রাণের অণুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রাণকে যে প্লুষির অর্থাৎ মশক অপেক্ষা ক্ষুদ্র জন্তুর সমান বলা

হইয়াছে, তাহাতে প্রতি জীববর্ত্তী প্রাণের পরিচ্ছেদ কথাই বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥১৪॥

তু (কিন্তু), জ্যোতিরাদ্যাধিষ্ঠানম্ (অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান), তদামননাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে)।

অর্থাৎ অগ্নি অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। শ্রুতিতে আছে "অগ্নির্ব্বাক্‌ভূত্বা মুখম্ প্রাবিশৎ" অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন। আবার ইহাও আছে "বায়ুঃ প্রাণভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ।" এই সকল শ্রুতিবচনে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণসকল আপন আপন মহিমায় কার্য্য করে না, পরন্তু প্রাণগণের কার্য্যপ্রবৃত্তি দেবতাবিশেষের অনুগ্রহে জন্মিয়া থাকে। এরূপ হইলে, জীবের ভোক্তৃত্ব না থাকিয়া দেবতাগণেরই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু জীবই ভোক্তা, এ কথা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। দেবতাদিগের অধিষ্ঠান-সূত্রের অবতারণায় প্রাণগণের স্বাধীন কর্ম্ম-প্রবৃত্তি অস্বীকৃত হওয়ায়, ইন্দ্রিয়াদিস্থিত দেবতাগণেরই ত ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত হইল, এই আশঙ্কানিরসনের জন্য পরবর্ত্তী সূত্র বলা হইতেছে।

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥১৫॥

প্রাণবতা (প্রাণধারী জীব) শব্দাৎ (শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে)।

অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রমাণে জীবেরই ভোক্তৃত্ব কথা পাওয়া যায়, দেবতার নহে।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জীবই ইন্দ্রিয়াদি করণের অধিষ্ঠাতা না হন কেন ? জীবের ভোক্তৃত্ব হেতু ইন্দ্রিয়াদি প্রাণবৃত্তির ন্যায় প্রত্যেক বৃত্তির পশ্চাতে অসংখ্য দেবতার অধিষ্ঠান আছে। এক এক বৃত্তিবিশিষ্ট এক একটী করণ জীবের রাজ্য। প্রতি রাজ্যের এক একজন অধীশ্বর আছেন। চক্ষুর পশ্চাতে সূর্য্য, মনের পশ্চাতে সোম, এইরূপ প্রত্যেক করণের পশ্চাতে দেবতাগণ অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহরাজ্য পরিচালনা করেন। শরীর এক, ইন্দ্রিয়াদি বহু। জীব শরীরের স্বামী। শরীরের ভোক্তৃত্ব বহু দেবতার পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য জীবই ভোক্তা, দেবতাগণ নহেন।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥১৬॥

চ (আরও) তস্য (সেই জীবের) নিত্যত্বাৎ (নিত্য-সম্বন্ধ হেতু জীবই ভোক্তা)।

শরীরের সহিত জীবেরই নিত্য সম্বন্ধ। কর্ম্ম-নির্ব্বাহক দেবতাদিগের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ নাই। যেমন পরকীয় কুঠার লইয়া বৃক্ষ ছেদন করিলে, কুঠার ছেদনকর্ত্তার কেবল করণ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ দেবতাগণও কর্ম্ম-সিদ্ধির করণরূপেই ব্যবহৃত হন। জীবের কর্ম্মের সহিত ভোক্তৃত্বের সম্বন্ধ তাহাদের নাই। জীব যখন উৎক্রমণ করেন, প্রাণ অন্যান্য প্রাণ সকলের সহিত তাহারই অনুসরণ করে। দেবতারা অনুসরণ করেন না। জীবের সহিত প্রাণের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু জীবই ভোক্তা, দেবতাগণ নহেন।

তে ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥১৭॥

শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র (মুখ্য প্রাণ ব্যতীত), তে (অন্য একাদশ প্রাণ), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকল), তদ্ব্যপদেশাৎ (শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন)।

এই সূত্র প্রমাণ করিয়াছে—এক মুখ্য প্রাণ, অন্যান্য প্রাণগুলি পৃথক্ বস্তু। ঐগুলি কি একাদশ ইন্দ্রিয় নামে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ? শ্রুতি বলিয়াছেন "এতস্মা-জ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি"—ইহা হইতে প্রমাণ হয়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় পরস্পর পৃথক্ বস্তু। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যে মনও আছে। তবে কি প্রাণের মত মনও ইন্দ্রিয়বাচ্য নহে ? এই অবস্থায় মনকে যদি ইন্দ্রিয়বাচ্য করা হয়, প্রাণ সম্বন্ধে ইহার অন্যথা হইবে কেন ? তদুত্তরে বলা যায় যে, মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া স্মৃতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণকে কোথাও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অতএব একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাণ-কার্য্য হইলেও, উহারা মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ।

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিতে পৃথক্ আলোচনা হইয়াছে।

মুখ্য প্রাণই ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, এ কথা শ্রুতিতে আছে।

এবং শ্রুতি বলিতেছেন—তাহারা অর্থাৎ ইতর প্রাণেরা মুখ্য প্রাণকে বলিল। এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে স্বতন্ত্রই হইবে।

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥১৯॥

চ (আরও) বৈলক্ষণ্যাৎ (বিরুদ্ধ ধর্ম্মবত্ত্ব হেতু)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তৃতীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, একদা দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর একে অন্যকে অতিক্রম করিতে চাহিলে, দেবগণ একে একে বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনকে উদ্গাতৃ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অসুরগণ উক্ত বাগাদিভিমানী দেবতাগণকে পাপযুক্ত করিলেন। ইহাতে দেবগণ কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন দেবতাগণ মুখ্য প্রাণকে "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্তং ন উদ্গায়েতি"—এই মুখ্য প্রাণ উদ্গাতৃ-কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, অসুরেরা পর্য্যুদস্ত হয়। এই শ্রুত্যুক্ত উপাখ্যানে মুখ্য প্রাণের স্বাতন্ত্র্যই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাণের অতীন্দ্রিয়ত্ব থাকা হেতু অসুরগণ প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অপরাপর ইন্দ্রিয়দিগের ধর্ম্ম—বাহ্যরূপাদি বিষয়জ্ঞানের উৎপাদন। মুখ্য প্রাণের ধর্ম্ম—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধারণ। অতএব উভয়ের ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২০॥

সংজ্ঞা (নাম) মূর্ত্তি (আকৃতি), ক্লৃপ্তিঃ (কল্পনা), ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত (ত্রিবৃতকারী পরমেশ্বর, জীব নহে) উপদেশাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু)।

অর্থাৎ গো, অশ্ব, মনুষ্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি নাম ও তাহাদের আকৃতি, এ সমস্তই ঈশ্বরের কল্পসৃষ্টি, জীবের নহে।

জীব ও ঈশ্বর, দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকা হেতু এইরূপ সূত্র রচনা করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ থাকা সত্ত্বেও, এই ভেদব্যপদেশের হেতু কি? ব্যাসদেব বুঝাইতে চাহেন—ব্রহ্ম ও জীব তত্ত্বতঃ এক হইলেও, বস্তুতঃ পার্থক্য আছে। গীতাকার বলিয়াছেন—ঈশ্বরের একাংশে এই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। জগৎ ঈশ্বরেরই অংশ, এ সিদ্ধান্ত অকাট্য; কিন্তু উহা অংশ, পূর্ণ নহে, এই যুক্তিতে বলা যায় যে, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, কিন্তু জীব ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম অনুপাধিক, জীব ঔপাধিক। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই ভেদবৈশিষ্ট্যের মূল্য কম নহে।

পূর্ব্ব পক্ষ নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন তুলিতে পারেন, এ সৃষ্টি জীবের না ব্রহ্মের? শ্রুতি বলিতেছেন—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তস্যাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি"; সেই দেবতা এইরূপ আলোচনা করিলেন, 'এখন আমি এই তিন দেবতায় জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে ব্যক্ত হইব এবং এই তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করিব।' এই "আমি" পরমেশ্বরই হইবেন; কেননা "সেই দেবতা" এইরূপ সূত্রোপক্রমণের পর "ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ ব্যক্ত করিব, ইহা অহং-বোধেরই উক্তি। মাঝে যে "জীবেন আত্মানুপ্রবিশ্য" শব্দ আছে, তাহাতে স্পষ্টই "অনুপ্রবিশ্য" পদের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইয়াছে, "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত নহে। অতএব এই সূত্রার্থ লইয়া পূর্ব্ব পক্ষের সংশয় নিরর্থক। অগ্রে ত্রিবৃৎকরণ, পরে নামরূপের সৃষ্টি। এই ত্রিবৃৎ-করণ সম্বন্ধে শ্রুতিতে নির্দ্দেশ আছে "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" অর্থাৎ অগ্নির রক্তরূপ তাহা তেজের, যাহা শুক্লরূপ তাহা জলের, যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা পৃথিবীর। প্রথম অগ্ন্যাদির কল্পনা, এই কল্পনা হইতে আকৃতির অভিব্যক্তি। আকৃতির সৃষ্টিতে নামের আরোপ হয়। জগতে যাবতীয় বস্তু ভাবনা হইতে উদ্ভূত হইয়া নাম ও রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে পঞ্চভূত লইয়া সৃষ্টির প্রকরণ দর্শিত হইয়াছে। তাহার নাম পঞ্চীকরণ। ছান্দোগ্যে ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ আছে। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস, এই তিন লইয়া ত্রিবৃৎকরণ হয়। ভূতমিশ্রণ বা ত্রিবৃৎকরণ না হইলে, বস্তুর বর্ণ বা আকৃতি অব্যক্ত থাকে। উহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিদেবতার সমাহার বা মিশ্রণ-মূর্ত্তি বলা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ত্রিবৃৎ-করণের প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থের সূক্ষ্মাংশ লইয়া, অগ্নির সহিত জল ও মৃত্তিকার মিশ্রণে, এইরূপ সূক্ষ্ম জলভূতের সহিত সূক্ষ্ম অগ্নি ও মৃত্তিকার কিছু অংশ, আবার সূক্ষ্ম মৃত্তিকার সহিত সূক্ষ্ম জল ও

অগ্নির কিছু অংশ মিশাইয়া ত্রিবৃৎ-করণে স্থূল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছিল। জগতের যাবতীয় সৃষ্টি এই ত্রিবৃৎ-করণে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুতেই এই ভূতত্রয়ের অংশ আছে। কোন বস্তুতে পার্থিব, কোন বস্তুতে জলীয়, আবার কোন বস্তুতে তেজের অংশাধিক্য থাকে। এই সৃষ্টি জীবের নহে, পরমেশ্বরের।

মাংসাদি ভৌমম্ যথাশব্দম্ ইতরয়োঃ চ ॥২১॥

মাংসাদি (মাংসাদি পদার্থ), ভৌমম্ (ত্রিবৃৎকৃত মৃত্তিকার বিকার), ইতরয়োঃ চ (তেজের ও জলেরও) যথাশব্দম্ (শ্রুতিতে এইরূপ বিকারের কথা উক্ত হইয়াছে।)

যথা "অন্নমশিতং ত্রেধাবিধীয়তে"—অর্থাৎ অন্ন ভক্ষিত হইলে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়।

অন্ন শুধুই স্থূল নহে। ভৌম পদার্থ হইতেই ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই অন্নের স্থূলাংশ হইতেই বিষ্ঠা উৎপন্ন হয়। অন্নের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভৌম তত্ত্ব, তাহা হইতে মনের সৃষ্টি। সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যমাংশ দিয়া শরীরের মাংসবৃদ্ধি হয়। জল ও তেজঃ ধাতুর স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্যমাংশ হইতেও এইরূপ পরিণতি দেখা যায়। জলের স্থূলাংশ মূত্রে, মধ্যমাংশ রক্তে ও সূক্ষ্মাংশ প্রাণের পুষ্টি করে। তেজঃ-ধাতুর স্থূল-বিকার অস্থি, মধ্যম বিকার মজ্জা ও সূক্ষ্ম বিকার বাক্‌শক্তি।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—স্থূল-সৃষ্টি মাত্রেই যখন ত্রিবৃৎ অর্থাৎ জলে ভৌম ও তেজ আছে, ভৌমে জল ও তেজঃ উভয়েই আছে, তেজেও পৃথিবী ও জল আছে, তবে আবার তিনটীকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উপদেশ দেওয়ার হেতু কি? তদুত্তরে উপসংহার সূত্র ব্যক্ত হইতেছে।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২২॥

তু (পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদ নিষেধার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) বৈশেষ্যাৎ (স্ব স্ব ভাগের আধিক্য হেতু) তদ্বাদস্তদ্বাদঃ (এই শব্দ দুইটী উপসংহার-বাক্যের লক্ষণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে)।

সৃষ্টির পশ্চাতে ভূতাদির ত্রিবৃৎ-করণ আছে। এই ত্রিবৃৎ-করণের এক এক পদার্থে এক এক ভূতাধিক্য হইয়া থাকে। অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপে জল, ভৌমে অন্নের আধিক্য। যতক্ষণ অমিশ্র সূক্ষ্ম ভূত, ততক্ষণ তাহা জগতের ব্যবহারে আসে না। সূক্ষ্ম-ভূত ত্রিবৃৎ-করণে স্থূল মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেও, এক এক বস্তুতে ইহার এক একটীর আধিক্য থাকিয়া যায়। ভাগাধিক্যবশতঃই তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনের বিশেষবাদ আমাদের নিকট অনুভূত হয়।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

বর্তমান

শ্রীনীতীশচন্দ্র মজুমদার

বিবর্ণ ধূসর দিন জরাজীর্ণ ভবিষ্যৎ, ঝিমায় প্রান্তরে-
নিদ্রাহীন রাত্রি তার কোনদিন হবে নাকি শেষ?

ভবিষ্যৎ ঝিমায় প্রান্তরে,—মৌনতার মত বর্তমান
আমাদের প্রহরে প্রহরে জ্বালায়েছে তীব্র দাবানল
সে অনলে ভস্ম হবো, তবু তারে করেছি আপন,
পাশব-প্রবৃত্তি যেমন নির্বিচারে দেয় আত্মবলি,
তৃপ্তির ঠিকানা চায় ধ্বংসের ভীষণ গহ্বরে;
সে তার চরম প্রাপ্তি সেইখানেই চরিতার্থতা।

মনুর শাসননীতি অন্ধকারে কেঁদে ফেরে হেথা
নিজেরা নিয়ম গড়ে ব্যবহার করে নিজে নিজেই

এ বর্তমান চমৎকার, চমৎকার সুবিধায় গড়া—
তবু বলি মৃত্যু হোক, মৃত্যু হোক বারাঙ্গনা-বৃত্তি এ দিনের,
মহাকাল নামি আসুক মেলি হেথা তৃতীয় নয়ন।

সবুজ সহজ দিন সেই সব শান্ত তপোবনশ্রেণী—
রক্তিম ফাল্গুন সম গন্ধে গানে জীবন যেথায়
উঠেছিল লতায়ে লতায়ে, তাহাদের ঘিরি চারিদিকে
এরা করে উপহাস, ব্যঙ্গের চাহনি হানে সদা,—
সত্যের মুখোস পরি' করে শুধু মিথ্যার অর্চ্চনা।

কি কুৎসিৎ পঙ্কিল জীবন নপুংসক এই বর্তমানের,
না আছে অতীত তার, ভবিষ্যের মেলেনা সন্ধান।

সমাবর্ত্তনোৎসব

শ্রীউষাকান্ত রায়

বন-মর্ম্মরের ভাষা আছে, পাখীর কাকলিতে সুর আছে, গান আছে নদীর কুলু-কুলু ধ্বনিতে। ভাষাহীন কেউ নয়, তবু সাধনা চলেছে প্রতি যুগে হৃদয়ের আবেগকে প্রকাশ করতে একটা অপরূপ সুর-লহরীর সাহায্যে। জাতি-জীবনেরও ভাষা আছে—প্রকাশ আছে—কর্ম্ম আছে—আছে সব কিছুই; এই সব কিছুকে আয়ত্ত করতেই সাধকের সাধনা—যোগীর যোগ—তপস্বীর তপশ্চরণ—গৃহীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। দ্বিনয়ন মানুষের চোখের সামনে যখনই উদ্ভাসিত হয় অপরূপ কিছু, তখনই তার মনে জাগে ত্রিনয়নের আবির্ভাবের কথা।

আজিকার সমাবর্ত্তনোৎসবে এ কথাই ঘুরে ফিরে মনে জাগ্‌ছে যে, দ্রষ্টার ত্রিনয়নে ফুটে উঠেছিল এই আজিকার মহান্ উৎসবের কথা সেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিনে। অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতায় বাণীবিদ্যাপীঠের যত ছিল সাধক, সবাই চলে আসছে বাইরে—জাতি সেদিন ভুল বুঝ্‌তে চলেছিল; এই যুগভ্রষ্টা সেদিন জাতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্‌গঠনের প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়েই চন্দননগরের এক অশ্বত্থ-বট-বিটপীর ছায়াশীতল তলে, কোকিল-কুজিত বনানীর অভ্যন্তরে ও পবিত্র গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনির মাঝেই ভারতীয় দর্শন ও উপনিষদাবৃত্তির জলদ-নিঃস্বন প্রকৃতির সাথে ঐক্যতানের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন যারা এসেছিল, সবাই ছিল ব্রতনিষ্ঠ সেবকস্বরূপ। পূজার আশীষ তারা আজ লাভ করেছে। আজ তাদের মধ্যে কেউ হ'য়েছে বাণী মায়ের সেবক—কেউ বা লক্ষ্মীর বরপুত্র, কেউ বা দেশ-বিদেশের নানা প্রবাহের ভেতর হ'তে প্রমাণ করছে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', কেউ বা যন্ত্রদানবকে নিজের বশে এনে তার নিকট হ'তে আদায় করে' নিচ্ছে তার কর্ম্মোৎপাদনশক্তির ফলকে। এখানেই শেষ নয়—ক্ষুধার্ত্তের মুখে তুলে দিতে অন্ন—লজ্জা ঘুচাতে বস্ত্র, গৃহ-সজ্জার নানা আসবাব প্রদান করে' জাতিকে করে' তুলছে সুষ্ঠু। শিক্ষাই জাতির প্রাণ। বাংলার মুমূর্ষু প্রাণশক্তিকে মৃতসঞ্জীবনী-প্রদানে পরিপূর্ণ, জাগ্রত ও চেনতাশালী করবার মানসে আজ বাংলার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে বিপ্লব-যুগের সেই মহান্ ঋত্বিক্‌রাই গড়ে' তুলছে কত বিদ্যাপীঠ। মূক জাতির কণ্ঠে ভাষা দিতে, সত্য, প্রেম ও নিষ্ঠায় উদ্‌বুদ্ধ করতে আজ সবাই নিজেদের উৎসর্গ করে' দিয়েছে গঠনের প্রয়াসে। ভাঙ্গবার মন্ত্র ভুলে' যেয়ে গড়বার গানে আজ সবাই বিভোর। আমি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ-স্রষ্টা পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায়ের কথাই বলছি।

তারপর এল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমী; সাধনার পুণ্যপীঠ আবার নূতন রূপে, নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আন্তর্জ্জাতিক সাধনার ভিতর দিয়ে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে প্রকট করে' ধরবার প্রয়োজনীয়তা আজ অধিক। বস্তু-তান্ত্রিক জগতে আজ একটা তুলনা করবার যুগ এসেছে—অথচ তুলনা করবার সামর্থ্য বা ক্ষমতা জাতির নেই। বিদেশীর শিক্ষায় আমাদের রক্তের শাশ্বত সনাতন রক্তবীজ লুপ্তপ্রায়। তারই পূর্ণজাগরণ কল্পে আবার এই শিক্ষার কেন্দ্র নূতন ভাবে প্রকাশ পেল অথচ মূল মর্ম্ম বজায় রইল শাশ্বত বন্ধনীতেই। চন্দননগরে প্রবর্ত্তক কলেজ অফ্ কালচার-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হ'ল।

বাংলার আকাশে বাতাসে আহ্বান-লিপি ছড়িয়ে পড়ল; এই আহ্বানে প্রথমবার সাড়া দিল নয় জন; দ্বিতীয় বার দেশের ঘনায়মান সঙ্কট-পরিস্থিতিতে এল পাঁচ জন মাত্র। নদীর বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই পঞ্চ ছাত্র ভারতের বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, মন্ত্র, বর্ণ-মাতৃকা, অধ্যাত্ম-যোগ অনুসরণ ক'রে সঙ্ঘগুরু কর্ত্তৃক 'পঞ্চ শিখ' নামে অভিহিত হ'ল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের বীজ রোপিত হ'ল তাদের বুদ্ধিশক্তি ও মননের মাঝে। শিক্ষাকাল শেষ হ'ল—এল সমাবর্ত্তনোৎসবের গোধূলি-লগ্ন। সে ছিল ১৯৪২ সালের ২৮শে জুন রবিবার।

প্রায় দুই শতাধিক নরনারীর সমাগমে মিলনায়তন এক অধ্যাত্ম-ভাবরাজ্যে সমাহিত। হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কিং-জর্জ্জ ফিফ্‌থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, পি-আর-এস মহোদয় উৎসবের পৌরোহিত্য করলেন।

উৎসবের উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইল এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে বললেন,—

"প্রথম পর্য্যায়ের ছাত্রদের শিক্ষার উদ্যোগপর্ব্ব ও সমাবর্ত্তনোৎসবের পৌরোহিত্য করেছিলেন মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগ। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ছাত্রদের শিক্ষারম্ভের উৎসবে পুরোহিতরূপে যিনি আসেন, তিনি হ'লেন ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হ'তে বর্ত্তমান পর্য্যায়ের ছাত্রদের শিক্ষারম্ভ হয়। এই দশ মাসে ছাত্রদের শিক্ষা-সমাপন কখনই সম্ভব নয়—শুধু মাত্র তাহাদিগকে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানমূলক শিক্ষার সূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে—আর দেওয়া হ'য়েছে ছাত্রদের জীবন-গঠনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি—সঙ্ঘ নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ জীবনযাপনের নিয়ম-নীতি ও সদাচার। ধর্ম্মশক্তি উপলব্ধি করবার এই অনুভব-সিদ্ধ প্রকরণাভ্যাসের ফলে ছাত্রদের জীবনে প্রকাশ পেয়েছে এক অমৃতময় প্রভাব। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ চায় বাংলার তরুণ জাতির ভবিষ্যৎকে সংগঠিত ও সুরক্ষিত করতে। সঙ্ঘের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য, কিন্তু সঙ্ঘের দীর্ঘ দিনের তপস্যায় এটা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে, সকল বৃহৎ সৃষ্টিই এরূপ ক্ষুদ্র বীজকে আশ্রয় ক'রে বিপুল ও সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। এই বীজ ধারণ ক'রে আছে মহান্ স্বপ্ন, আশা অনন্ত ও অপরিমেয় শক্তি। যে সমস্ত তরুণ আজ কলেজের সাফল্য-পত্র লাভ করবে, তাদের হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি যুগপৎ মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট করা হ'য়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত খাদ্য পরিবেশন করা হ'য়েছে। এই কলেজ ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ জীবনানুশীলনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করতে ও সেই স্বপ্নের জাগ্রত বিগ্রহকে স্বপ্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাথে সংযুক্ত হ'বার প্রেরণা দিয়ে আসছে। সংসার ও পারিবারিক জীবন-যাপনের যে যোগ্যতা এবং দেশ ও জাতির সেবার পুণ্য আকাঙ্ক্ষা আজ ছাত্রদের শিক্ষায় রূপায়িত হ'য়েছে। সৃষ্টিমূলক জাতীয় শিক্ষার বিধান আজ ছাত্রেরা লাভ করেছে এবং এই শিক্ষার বিধান ক'রেই এই কলেজ সার্থক হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানের এই জাতিগত, দেশগত ও ধর্ম্মগত দুর্দ্দিনে, এই কলেজের ছাত্রগণ দেশের সুদৃঢ় ভিত্তি-রচনায় আজ হ'তে আত্মনিয়োগ করল। আজিকার এই উৎসবে সমবেত নরনারীর আশীষ লাভ ক'রে তারা জয়যুক্ত হোক—ইহাই আমি কামনা করি।"

চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর ও দেশশ্রী শ্রীযুত হরিহর শেঠ মহাশয়ের শুভবাণী পঠিত হ'ল। শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত সঙ্ঘগুরুর প্রেরিত আশীর্ব্বাণীও পাঠ করলেন:

সঙ্ঘগুরুর আশীর্ব্বাণী

সঙ্ঘের শক্তি সামান্য, কিন্তু এই সামান্য শক্তির মূল্য কম নহে। একদল উৎসর্গীকৃত সন্তানের আহুত প্রাণের অর্ঘ্য দিয়া তাহাদের সৃষ্টি-শতদল বিকশিত হয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কলেজ অব্ কালচার এইরূপ পবিত্র রক্ত শতদলের একটি পাঁপড়ি বলিয়া আমি ইহার গৌরব সামান্য বলিয়া মনে করি না। আয়োজন নগণ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে মহনীয় আদর্শ ও অভীষ্ট, তাহার পরিধি সুদূরপ্রসারিত। আমি প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচারের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের ঋত্বিক্ পঞ্চশিখস্বরূপ ছাত্রদের অভিনন্দিত করি।

সৃষ্টি কোন না কোন অভীষ্টপূর্ত্তির লক্ষ্যেই ফুলের মত বিশ্বপ্রপঞ্চে বিকশিত হয়। প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচার এইহেতু বিনা উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নহে, এই কথা বলাই বাহুল্য। ইহার উদ্দেশ্য অনুষ্ঠান-পত্রে সুলিখিত—ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা। সেই ধর্ম্ম—যাহা জাতীয়, যাহা আমাদের সনাতন সংস্কৃতি, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই যে জীবন, সেই লক্ষ্যে প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচারের গতি নির্ণয় হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচারে যে সকল ছাত্র নিয়ম ও সংযমের বিধান সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানে অভিষিক্ত হইয়া আজ জয়টীকা ললাটে পরিবে, তাহারাই হইবে কলেজ অব কালচারের গৌরবস্তম্ভ। কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় যদি হয়, তাহার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকদেরও কলঙ্কভাগী হইতে হইবে। এই হেতু উভয় পক্ষের দায়িত্বের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা আমাদের বিবেচ্য। ছাত্রেরাও আজ যেমন সমাবর্ত্তনোৎসবের জয়ধ্বজা উড়াইয়া গৌরবের সহিত অভিযানে উদ্যত, কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালকবর্গ তুল্যভাবে উল্লসিত হইয়া তাহাদের প্রগতির পথ সতত নিরঙ্কুশ করার জন্য উদ্যত থাকিবেন। এইখানে বর্ত্তমান সুকঠোর তপস্যার অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াইয়াও আজিকার অনুষ্ঠানের দায়িত্ববোধ হইতে আমিও মুক্ত নহি। এই শ্যামতরুলতা পরিবেষ্টিত বাংলার হিমালয়ের নিভৃত কোলে বসিয়া আমি তাই তোমাদের অভিনন্দনের সহিত আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতেছি। আমার অকুণ্ঠ বাণীবর্ষণ তোমাদের ধারণসামর্থ্যে জয়যুক্ত হোক, এই প্রার্থনা হিমালয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার নিকট সততই করিতেছি।

প্রথম উদ্দেশ্যের কথা লইয়াই কিছু আলোচনা করিব। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা সার্থক করিতে হইলে, ধর্ম্ম ও জীবন সম্বন্ধে তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন হইবে। ধর্ম্ম ও জীবন বলিতে তোমাদের বুঝিতে হইবে—এই ধর্ম্মও যেমন কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে, জীবনও তদ্রূপ একটা সঙ্কীর্ণ দেহ অথবা পরিবার বা দেশ ও জাতির মধ্যে পরিচ্ছন্ন নহে। ধর্ম্মও ভূমা, জীবনও ভূমার অভিব্যক্তি। দৃষ্টি যদি সঙ্কীর্ণ হয়, ধর্ম্ম ও জীবন সঙ্কীর্ণ হইবে। কলেজ অব কালচারে এই দুইটা অতি পরিচিত বস্তুই তোমাদের নিকট বৃহৎ করিয়া ধরা হইয়াছে। তোমরা তাহা নিশ্চয় বিদিত হইয়াই ললাট প্রসারিত করিয়া দিতেছ জয়টীকাধারণের জন্য।

তবুও যে আমি তোমাদের এই দুই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে যে অপার্থিব দরদের সম্বন্ধ, তাহারই অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিও।

ধর্ম্ম কর্ম্মেরই নামান্তর। যে কর্ম্মে জীবনের পুষ্টি ও তুষ্টি, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য, তাহাই ত ধর্ম্ম নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জীবনের সমৃদ্ধির অনুকূল কর্ম্মই ধর্ম্মাখ্যা পায়। জীবন যদি শুধুই দেহগত, পারিবারিক অথবা দেশও সম্প্রদায়গত করিয়া দেখ, তদনুক্রমে তোমার কর্ম্মও নিয়মিত হইবে। যে দেহের সীমারেখার মধ্যে জীবনকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার যে ধর্ম্ম, আর যাহার জীবন তদপেক্ষা ক্রমানুসারে সুবিস্তৃত, ক্রমানুসারেই তাহার ধর্ম্ম পৃথক্ ধরণের হইবে। আসলে জীবনের বিস্তৃতির উপরই ধর্ম্মের বৃহত্তর বিগ্রহ সৃষ্ট হয়। শিক্ষার মধ্য দিয়া জীবনের আনন্ত্য্য যদি উপলব্ধিগম্য হইয়া থাকে, তবেই তোমরা ধর্ম্মামৃত লাভ করিয়াছ—এই কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

জীবন দেহগত যে নহে, পরিবারগত বা দেশ ও জাতিগত নহে, তাহা আমি বলিতেছি না; কিন্তু জীবনকে যদি শুধু দেহগত করিয়াই দেখা যায়, এই স্বল্প-পরিসর দেহজ্ঞানের মধ্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পারিবারিক জীবনের স্থান সঙ্কুলান হয় না। আবার পারিবারিক জীবনই যদি কেবল তোমার লক্ষ্য হয়, ঐ অপরিসর জীবনের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা বৃহৎ দেশ ও জাতীয় জীবন স্থান পাইতে পারে না। তাই তোমাদের সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে ভূমার জীবন লইয়া। এই বৃহতের মধ্যে বহু অল্পপরিধি বিশিষ্ট জীবন তবেই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। কিন্তু যদি তোমরা জীবনের পরিধি ক্ষুদ্র করিয়া ফেল, বৃহৎ হইতে নিশ্চয় বঞ্চিত হইবে এবং ধর্ম্মকেও তোমরা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিবে।

শিক্ষায় জ্ঞানের বিস্তার হয়। যে শিক্ষায় জ্ঞানবিস্তার নাই, জীবনের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়, সেই শিক্ষা সুশিক্ষা নহে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আমরা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছি। যতই আমরা সঙ্কীর্ণ হইতেছি, ততই আমরা মরণের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। ক্ষুদ্র হইতে হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার ইহাই ত সনাতন পথ। কিন্তু বাঁচার প্রেরণা অমর বলিয়া আমরা মৃত্যুর কশাঘাতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে জীবনের সন্ধানে ছুটিতে চাহি। কিন্তু শিক্ষার আলোকাভাবে অন্ধকার পথে আমরা কবন্ধের ন্যায় জটলা পাকাইয়াই মরি। পথের সন্ধান না পাইয়া মরণবিপ্লবে জীবনের আহুতি দিয়া ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হই। এ দৃষ্টান্ত মরণ-নেশায় আত্মহারা মানুষের সম্মুখে নিরর্থক হয়। কিন্তু তোমরা আমার মর্ম্মবাণী বুঝিবার শিক্ষা পাইয়াছ। সুপথের সন্ধানে তোমাদের কবন্ধ নৃত্যের আর প্রয়োজন নাই। অনন্ত অসীম জীবনপারাবারে পাড়ি দিয়া ভূমার ধর্ম্মই তোমাদের অনুসরণীয় হইবে।

জগতের যে সকল স্বাধীন জাতির জীবন দেখিয়া এতদিন আমরা আকৃষ্টচিত্ত হইতেছিলাম, আজ তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া আমরাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহার কারণ অন্য কিছু নহে. স্বাধীন জাতিসকলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বড় জোর স্ব-স্ব জাতি ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার মধ্য দিয়া তাহাদের জীবন গড়ার অবকাশ হইয়াছিল। আজ তাহাদেরও এই জীবন-পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বজীবনের স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। জীবনের সত্য পরিচয় বিমুক্ত হইয়া বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের জাতি দৈহিক, পারিবারিক, ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে জীবন-সাধনার পরীক্ষা দিয়া আজ ভূমার শিক্ষানিকেতনে উপনীত হইতে চাহে। ভারতের এই সনাতন শিক্ষার দুয়ার মানব-প্রকৃতির উপেক্ষায় বাহ্যতঃ রুদ্ধদ্বার করিয়া রাখা হইয়াছিল; অন্তরে কিন্তু তাহার চলিয়াছিল এই শিক্ষার অমর ফল্গুপ্রবাহ। সে ছিল ভারতের হিমালয়ের ন্যায় অচল স্থির, জড়ের ন্যায় সমাধিমগ্ন। আজ বিশ্বের শিক্ষা-সভ্যতা যখন দেউলিয়া হইয়া পড়িতেছে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের রুদ্ধ দুয়ার এইবার খুলিতে হইবে। বিগত দুই বৎসরের সেই আশায় আজিকার উদ্ভূত বিদ্যার্থী তোমাদের জীবনের পরিধি দিক্‌চক্রবালকেও অতিক্রম করিয়া ছুটিতেছে। তাই তোমাদের ধর্ম্মও সীমাহীন, সনাতন। এই পরমানুভূতির উপাধিপত্রই তোমাদের হস্তে কর্ত্তৃপক্ষ অর্পণ করিতেছেন। তোমরা ইহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিও না।

তোমরা প্রশ্ন করিতে পার—আমাদের দেশে একদিন যখন ভূমার শিক্ষাই ছিল, তবে সেই শিক্ষার প্রভাব এমন করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল কেন? ভারতে ভূমার শিক্ষাও যখন অধঃপতনের হেতু হয়, তখন ভারতেতর স্বাধীনজাতি-সমূহের মধ্যে শিক্ষার পরিধিচক্র ভূমার অপেক্ষা অনতি-বিস্তৃত হইলেই বা ক্ষতি কি? সঙ্কট ত উভয়ক্ষেত্রেই তুল্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলিব—ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির মূলে বৃহতের শিক্ষা ছিল বলিয়াই আমরা অতি বড় দুর্গতির দিনেও বাঁচিতে পারিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বাঁচিব। কিন্তু ভারতের জাতিসকলের মধ্যে বিদ্যার পরিধিচক্র অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, তাহারা এইরূপ দীর্ঘ দুর্দ্দিনে আত্মসংস্কৃতি-রক্ষায় সমর্থ হইবে না। অতীতের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে। যদি বল—আদৌ এই শোচনীয় পরিণাম ভারতের ভাগ্যে ঘটিল কেন? তাহার উত্তর—শিক্ষার বহনশক্তি প্রাকৃত বিধানে চিরদিন তুল্যভাবে চলে না। জাতীয় সামর্থ্যের একটা পরমায়ুঃ আছে। ভারতের সেই আয়ুঃ শেষ হইলে, তাহার জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। কিন্তু জাতির আত্মিক আশ্রয়ে প্রাচীন শিক্ষার প্রভাব থাকিয়া গিয়াছে। এই হেতু তাহার পুনরুত্থান-যুগে সে অধিকতর বৃহৎ জীবনের অধিকারী হইবে।

যখন যুগসন্ধিকাল উপস্থিত হয়, তখন একটা অসাধারণ জীবন-দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মানুষের প্রত্যেক আদিম অবস্থার সন্ধিক্ষণে যখনই উন্নততর অবস্থার সূচনা হইয়াছে, তখনই আমরা

এইরূপ অসাধারণ জীবনের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াছি। প্রাচীন ভারতের ঋষি-চরিত্রের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলেও, আমরা মধ্যযুগে ষড়দর্শনের ঋষিকুলকে লক্ষ্য করি। কপিল, কণাদ, ব্যাস, গৌতম, জৈমিনি, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় অসাধারণ চরিত্রের মানুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই ভারত আজও ভারত হইয়াই বাঁচিবার স্পর্দ্ধা করে। ভারতের শঙ্কর, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবনবৃত্তান্ত ভারত-শক্তির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আজ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সঙ্কট-যুগ। তাই বিদ্যার্থীদের আমি অসাধারণ জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে বলিব। আমরা অর্ব্বাচীন যুগের শিক্ষায় হয়ত বড় বৈজ্ঞানিক হইয়াছি, ভূতত্ত্ববিৎ, স্থপতিবিদ্যাবিশারদ প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যায় মাথা তুলিয়াছি; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, উহা বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা বিদ্যাবিৎ হইয়াও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হই না। বড় জোর আমাদের এই বিদ্যার প্রভাব একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনে গণ্ডীবদ্ধ হইয়াই নিঃশেষ হয়—জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ত দূরের কথা। এমন হয়, তাহার কারণই হইতেছে—আমাদের প্রতিভা ভূমার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, একান্ত ব্যক্তিগত। ইহা কচিৎ জাতিচেতনার সীমায় পৌঁছিয়া থাকে; কিন্তু তাহা এতই আকস্মিক যে, উহা অদৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিদ্যার প্রভাব বলা ধৃষ্টতা হইবে।

ভূমার চেতনায় উন্নীত হইয়া আমরা এই বৃহতের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত সর্ব্বপ্রকার জীবনস্তরের নিদর্শন ফলাইতে পারি। ভূমার চেতনা যদি কল্পিত না হইয়া বাস্তব হয়, তাহা হইলে তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। কিন্তু আজ এই বিপদের দিনে আমাদের ভূমার শিক্ষার একটা অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। অতীতের জ্ঞানগরিমার প্রকাশ-মাহাত্ম্য যেমন অসাধারণ ঋষি চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়, ত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণের অভিব্যক্তি দিতে গিয়া যেমন আমরা শঙ্কর, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গের আবির্ভাব লক্ষ্য করি, তেমনি আজ পূর্ণাঙ্গ জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমার চৈতন্যে একদল মানুষের অসাধারণ জীবনদৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইয়াছে। জীবনের ছন্দঃ যে সুরেই ঝঙ্কৃত হউক, অন্তর্নিহিত মূল সুরটি এখানকার শিক্ষার সহিত মিলাইয়া, তোমাদের জীবনরাগিণী যদি বাজিতে থাকে, তবেই শ্রম আমাদের সার্থক হইয়াছে, শিক্ষাও তোমাদের পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এই সঙ্গে একটা বিশেষ কথা উল্লেখ করিবার আছে। ভূমার জীবন হইলেই যে তাহার ব্যক্তিগত জীবন, সমাজজীবন, জাতীয় জীবন হইবে না, এইরূপ কেহ যেন মনে না করে। তোমাদের প্রত্যেকের জীবন-পরিচয় আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত। আমি বলিতে পারি—জীবনের এমন কোন ছন্দঃ নাই, যাহা এই ভূমার চেতনায় সমাহৃত না হইতে পারে। অতএব তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনপথের দিশারীরূপে চেতনার প্রদীপ এই প্রতিষ্ঠান তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। তোমরা হও অগ্রগামী। যদি সত্যই প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচারের শিক্ষানীতির তোমরা অনুসারী হও, একটা প্রতিষ্ঠিত সংহতি-শক্তি তোমাদের পশ্চাদ্ভাগ সতত রক্ষা করিবে—ইহা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

আরও কয়েকটি কথা বলিয়া আমার বাণী সমাপ্ত করিব। ভূমার চেতনা ভিত্তি করিয়া যে দেশ ও জাতির মধ্যে তোমরা জন্মিয়াছ, সেই দেশ ও জাতির সার্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থান-কামনাই শুধু প্রার্থনীয় নহে—এইরূপ না হইলে, পরীক্ষার কষ্টিপাথরে শিক্ষার উৎকর্ষ প্রমাণিতই হয় না। ভূমার শিক্ষা যদি পাইয়া থাক, তোমাদের জীবন নিশ্চয়ই দেশ ও জাতির শ্রেয়ঃসাধনে সতত উদ্যত থাকিবে। এই সংহতি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নহে, জাতিগঠনের প্রশস্ত ভিত্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্টভাবে এখানে প্রসারিত আছে। ইহার সহিত যোগসূত্র কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিবে না। জাতির লক্ষ্য যদি এক হয়, প্রণালীভেদে গতি কোথাও ভ্রান্ত হয় না। উপনিষদের ঋষির ন্যায় বলিব—ব্রহ্মৈক্যই যখন লক্ষ্য, তখন বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালীর বৈকল্পিক যে কোন একটি নিষ্ঠাসহকারে আশ্রয় করিয়া চলিলে, সকলেই লক্ষ্যে উপনীত হইবে। প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচার এইরূপ একটি প্রণালী তোমাদের দেখাইয়া দিয়াছে। ইহা সৃষ্টিমুখী প্রেরণা। গঠনই এই সাধনার সাধ্য। লক্ষ্যে পৌঁছানই ইহার সিদ্ধি। আমি আশা করিতে পারি—তোমরা অবহিত হইয়া আমরণ সেই পথ আশ্রয় করিবে।

বিগত দশ মাস তোমরা যে শিক্ষা ও সাধনার উত্তম অনুভূতি পাইয়াছ, আচার্য্যগণের পরীক্ষায় তাহাতে কৃতকৃতার্থ হইয়া আজ উপাধিপত্র হাতে লইয়া ফিরিতেছ—ইহাই আমি তোমাদের বিদ্যা-সমাপ্তি বলিয়া স্বীকার করি না। আগামী দুই মাসের অবকাশ তোমাদের আত্মানুভূতির পরীক্ষাকাল বলিয়াই আমি ধরিয়া লইতে পারি। এই দুই মাস তোমরা তোমাদের স্বভাবক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া এইখানকার শিক্ষাপ্রভাবের পরিচয় অধিকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অমৃতে তোমরা যদি অভিষিক্ত হইয়া থাক, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—তোমরা ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচারের বাহিরে কর্ম্মক্ষেত্রে একাগ্রচিত্তে জীবনের অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে। শিক্ষাক্ষেত্রের পর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তোমাদের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে, নব চাতুর্ম্মাস্যব্রতের পর তোমাদের ললাটে আবার আমি জয়টীকা পরাইয়া দিব—যে টীকার অমর বীর্য্যে তোমাদের জীবন সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এই প্রত্যয় আমার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহে।

এই অবকাশকালে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহিত সংযুক্তিরক্ষার জন্য ভাব ও বস্তু, এই দুইয়ের সাধনাই বাঞ্ছনীয়, ভাবের দিক্ দিয়া তোমরা নিয়মিত উপাসনা করিবে, ধ্যান করিবে, আমাদের স্মরণে রাখিবে।

বস্তুর দিক্ দিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচখানি "মুক্তিমন্ত্র" তুলিয়া দিতেছি। সৃজনীশক্তির প্রেরণা তোমরা যেমন শত শত লোকের নিকট প্রচার করিবে, তদ্রূপ এই পুস্তক কয়খানি যোগ্য লোকের নিকট মুল্য-বিনিময়ে প্রদান করিবে। আর এই নব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যোগ্য ছাত্রসংগ্রহ তোমাদের কর্ম্ম হইবে। ভাব অদৃশ্য। সেখানে আমরা মানুষকে ভুলাইয়া চলিতে পারি। বস্তুর ক্ষেত্রে মনের ফাঁকি অচল। তাই তোমাদের অন্তরে বাহিরে কর্ম্মপ্রসূ হওয়ার নিদর্শন দেখার জন্য এই অতি সামান্য দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করিলাম।

উপসংহারে বলিব—মর্ত্ত্য জীবনে পরকে স্থাপন করার মন্ত্রসিদ্ধি যাহাদের না হয়, তাহারা কোন লোকে পরমের সহিত যুক্তি পায় না। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই ভূমার শিক্ষার প্রমাণের জন্য আজও সর্ব্বহারা সন্ন্যাসীর সংহতি। উহা চাহিতেছে—দিব্য মানুষ, দিব্য সমাজ, দিব্য জাতি। তোমাদের ইহার শ্রেষ্ঠ উপাদানস্বরূপ প্রসারিত হৃদয়ে আলিঙ্গন দিতেছি। তোমরা দিব্য সম্বন্ধের সুদৃঢ় বন্ধনে আমাকে তথা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে অভিন্নরূপে গ্রহণ কর। ইহাই তোমাদের নব জীবনের দিব্য পথ।

তারপর একে একে শ্রীকৃষ্ণদাস রায়, শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত, শ্রীজলধর সেন, শ্রীললিতমোহন হালদার ও শ্রীউষাকান্ত রায়, এই পাঁচজন শিক্ষার্থী সঙ্ঘের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-প্রকরণের মধ্য দিয়া কলেজের শিক্ষা-সাধনায় যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করেছে, তার অভিব্যক্তি দিল। অনন্তর সভাপতি মহোদয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এই সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন ঃ

সভাপতির অভিভাষণ

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বদেশ-গঠনব্রত সাধনে নানা দিকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠান হইতে দেশের স্থায়ী কল্যাণ হইবে, আশা করা যায়। সঙ্ঘের সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি আমাদের সকলের কাম্য।

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এই শিক্ষায়তন বয়সে তরুণ এবং ইহা প্রবর্ত্তক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রীতির সামগ্রী। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির দোষ ও অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া প্রবর্ত্তকগণ ভারতীয় চিরাগত সংস্কারের অনুকূল অথচ কালোপযোগী শিক্ষার জন্য এই আয়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান দেশে অধিক নাই; কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। ঠিক কি ভাবে এরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা যায়, আধুনিক ভারতে এই শিক্ষা-কল্পনা কোনরূপে মূর্ত্ত হইলে জনপ্রীতি আকর্ষণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, এ বিষয়ে আমাদের অনেকের সম্যক্ ধারণা নাই। যাঁহাদের চিত্ত প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধে কার্য্যোপযোগী কল্পনা করা কঠিন। তবে অভাবের গাঢ় উপলব্ধি হইলে, উৎসাহের সহিত পরীক্ষা ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেই অভাব-পূরণের সুগম পথ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এইরূপ পরীক্ষাভাবে এই শিক্ষায়তন স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। পরিচালকগণের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থির অনুরাগের সহিত অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত থাকিয়া উৎসাহেরই স্ফুরণ করিতেছে।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রধানতঃ দুইটী অভিযোগ আনা যায়। এ বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত উহার যোগ নাই এবং উহা দ্বারা জীবিকার্জনের ও দেশের আর্থিক উন্নতিসাধনের বিশেষ সহায়তা হয় না। প্রথম অভিযোগটী কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। Prospectusএ পড়িলাম Prabartak College of Cultureএর অন্যতম উদ্দেশ্য—'Revival of Indian culture'.

ইংরাজী culture শব্দের আধুনিক বাংলায় অনুবাদ সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। সংস্কৃতির অর্থ ব্যক্তিগত চিত্তসংস্কারের অনুরূপ সমাজগত চিত্ত-সম্পদ্। বুদ্ধি, রুচি ও শীলগত ত্রিবিধ প্রসাদই ব্যক্তি-চিত্তের সংস্কার বা শ্রী। সমাজের চিত্ত-সম্পদ্ও বিদ্যা, কলা ও নীতি ভেদে ত্রিবিধ। বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বিদ্যায়, রুচির প্রতিষ্ঠা কলায় ও শীলের প্রতিষ্ঠা নীতি বা ধর্ম্মে। সংস্কৃতিকে এইভাবে চিত্তসংস্কারের প্রতিষ্ঠাভূত কল্যাণমূর্ত্তি বলা যায়। সামাজিক সংস্কৃতির দ্বারা ব্যক্তিচিত্তের সংস্কার সাধন বা শ্রীসম্পাদনই শিক্ষা এবং শিক্ষারই ফলে এই সংস্কৃতির স্থিতি, পুষ্টি ও স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়। সমাজ-ভেদে সংস্কৃতির ভেদ হয়, সমাজ মাত্রেরই সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। সমাজ-নিরপেক্ষ শিক্ষা নিষ্ফল হয়। নিজ সমাজের সংস্কৃতিবিশেষের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে, ব্যক্তিচিত্তের প্রাণশক্তি রুদ্ধ হয়। শিক্ষা অন্তরে প্রবেশ করে না, পরিপাকের অভাবে চিত্তপুষ্টির ব্যাঘাত হয় ও নূতনত্ব উন্মেষরূপে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি পরাহত হয়। গীতায় উপদিষ্ট যে স্বধর্ম, তাহা নিজ সমাজের সংস্কৃতিবৈশিষ্ট্য অর্থে গ্রহণ করা যায়। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ'। পরধর্ম্ম বা পর-সমাজের সংস্কৃতিকেও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু স্বধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় সাধন না করিলে শিক্ষা হয় না। সংস্কৃতি অন্তরে শব্দমাত্রভাবে সঞ্চিত হয়, তাহা দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয়, ভূতাবেশের ন্যায় তাহার আবেশে এক প্রকার আত্মহারা হইয়া থাকিতে হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষা আমাদের চিরাগত সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ না থাকায়, কখন শাব্দিক শিক্ষাক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হয়, কখন আপাত প্রবল বলিয়া আমাদের চিত্তবৈশিষ্ট্য অভিভূত করিয়া যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় আমাদিগকে চালিত করে। নিজস্ব সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের অভাবে যে আত্ম-মর্য্যাদাবোধ উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির মূল তাহার প্রায়শঃ লুপ্ত হয়। বস্তু-বিজ্ঞানাদি শিক্ষায় সমাজ-বৈশিষ্ট্যের সহিত বিশেষ সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু যে শিক্ষা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে হৃদয় স্পর্শ করে, সেই শিক্ষা সমাজের সংস্কৃতির সহিত সমন্বিত না হইলে ব্যর্থ হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে সেইরূপ শিক্ষায় প্রায়শঃ ব্যর্থতা অনুভূত হইয়া থাকে।

কখন প্রচ্ছন্নভাবে ঘোর অকল্যাণও সাধিত হইতেছে। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ধারসাধন এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীন সংস্কার ও সংস্কৃতির সহিত প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহুতর বিরোধ সত্ত্বেও শিক্ষার্থিগণ প্রধানতঃ জীবিকার্জ্জনের জন্য ইহার আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন। নিম্নস্তরের সরকারী কর্ম্ম চালাইবার লোক পাইবার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি প্রথম এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই আমলে দেশের ভদ্রলোক শ্রেণীর বৃত্তিকৃচ্ছ্র হওয়ায় ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষায় তাহাদের আগ্রহ জন্মায়। এই জন্য অন্ততঃ বাঙালাদেশে এযাবৎ চাকরীই মধ্যবিত্ত লোকের জীবিকা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এখন এই চাকরী দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, অন্যভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা ও সুযোগেরও অভাব। সুতরাং বহু ভদ্র শ্রেণীর যুবক আজ একদিকে জীবিকাহীন, অপর দিকে প্রাচীন সংস্কারভ্রষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সেই জন্য এই প্রতিষ্ঠানে স্বাবলম্বনবৃত্তির শিক্ষা ও সুযোগের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কার সংরক্ষণ ও উদ্বোধনোদ্দেশ্যে দেশে অন্যান্য শিক্ষায়তনও স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে যেখানে জীবিকাসমস্যা-সমাধানের ব্যবস্থা নাই, সেখানে সাফল্যলাভের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। দেহ ক্ষীণ হইলে মনও ক্ষীণ হয়, এই ন্যায়ে জীবিকার উপায় না হইলে স্বধর্ম্মচর্য্যাতে ব্যাঘাত হয় বুঝা যায়।

শিক্ষার্থিদের বলি—তোমরাই এই শিক্ষায়তনের ভরসাস্থল। আধুনিক ভারতে তোমাদের গন্তব্য পথ অতি বন্ধুর। দেশসেবাই তোমাদের ব্রত। এই ব্রতপালনে দেশাত্মবোধই প্রধান বলা যাইতে পারে। দেশকে না চিনিলে দেশাত্মবোধ হয় না, দেশের নিজস্ব চিত্ত-সম্পদের গৌরব না বুঝিলে দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না, দেশের চিরাগত সংস্কৃতি হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ না হইলে দেশসেবায় পূর্ণ অধিকার হয় না। এই উদ্বোধনই তোমাদের এখানে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবল প্রাচীন ভাবে স্থিতিই দেশের কল্যাণ নয়, চিরনূতন জগতে কখন বিরোধ, কখন মৈত্রীর দ্বারা প্রাচীন ভাবকে নবীন করিয়া স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠাই দেশের কল্যাণ। এই স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা, দুই দিকেই বহু বাধাবিঘ্ন আছে! আধুনিক জগতে আমাদের স্থান ক্রমেই সংকীর্ণ হইতেছে, আমাদের বিরোধী শক্তিসমূহ অতি প্রবল, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও দেহগত সর্ব্বশক্তি সংহত-ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই জীবনব্যাপী ব্রতগ্রহণের অধিকার এই শিক্ষায়তন তোমাদিগকে দিতেছেন। ব্রতের উদ্যাপনের ভার তোমাদের। তোমরা অনেক আশায় প্রবর্ত্তিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করিয়া দেশের গৌরবস্থল হও, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।"

অতঃপর সভাপতি মহোদয় পরীক্ষোত্তীর্ণ পঞ্চ ছাত্রকে সাফল্য-পত্র প্রদান করলেন। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত নলিন-চন্দ্র দত্ত উপস্থিত নরনারী ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে, উৎসবযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়।

মাতৃ-তীর্থে*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৬ই আষাঢ়, রবিবার চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে মাতৃ-উৎসব। দিন দুই আগেই নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। মনটা সেই হইতেই স্ফূর্ত্তিতে ভরপুর। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি দেখিব, কত জনের সহিত আলাপ হইবে। রসগোল্লা তো আছেই, আরও কত রসে ডুবিব।

রবিবার সকাল হইতেই পেটের মধ্যে গোলযোগ সুরু হইল। আগের রাত্রে একটু গুরুতর আহার হইয়াছিল। মহাচিন্তায় পড়িলাম। বেলা ৯টায় স্নান সারিয়া শয়ন করিলাম। দাঁড়াইয়াও ঘুমান অভ্যাস কিনা, তাই সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রা আসিল। বেলা ১২টায় উঠিয়া দৈ-ভাত খাইয়া, ছাতা বগলে লইয়া 'দুর্গা-দুর্গা' বলিয়া রওনা হইলাম। ৩টার ট্রেণ ধরিয়া সাড়ে-চারিটায় সঙ্ঘে পৌছিলাম।

প্রথমেই দেখা নলিনদার সঙ্গে। নলিনদা তো আহ্লাদে আটখানা। প্রথমেই দর্শন করিলাম শ্রীমন্দির আর সঙ্ঘ-গুরুর থাকিবার, লিখিবার ও বসিবার ঘর। কি চমৎকার —মনোরম—নির্জ্জন স্থান! সামনেই পূতসলিলা ভাগীরথী। আত্মার সহজ স্নিগ্ধ স্পর্শে প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া গেল। তারপর

* [সুপ্রসিদ্ধ কমলালয় লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, কৃতকর্ম্মা, ভক্তসাধক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত পত্র হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। প্রঃ সঃ]

নলিনদার সঙ্গে আশ্রমে আসিলাম। সহস্র সবুজ দল-বেষ্টিত শ্বেত-পদ্মের মত মাতৃ-মন্দির। দূর হইতেই মাতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণটা যেন কেমন হইয়া গেল। মনে হইল যেন দেবীর সাক্ষৎ-দর্শন লাভ করিলাম। একটু দূরেই নির্ব্বাক্ নিষ্পলক দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম। কত ক্ষণ জানি না। তারপর মন্দিরের চারিধারের বারান্দায় বার বার প্রদক্ষিণ করিলাম। একবার মূর্ত্তির দিকে তাকাই, আর একবার মা-গঙ্গার দিকে তাকাই। ধূসর সন্ধ্যা। স্নিগ্ধ পবন চামর ব্যজন করিয়া যাইতেছিল। অপূর্ব্ব আনন্দ-হিল্লোলে মন-প্রাণ দুলিয়া উঠিল, জুড়াইল ও মজিল। ময়ূরের ডাক কাণে আসিতেই হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। চোখ মেলিয়া দেখি, পল্লব-ঘেরা আম্রশাখায় ময়ূর-ময়ূরী সুখ-মগ্ন। ওদিকে হরিণ-হরিণীর চঞ্চল চলা-ফেরা। যমুনাও যেন ষোল কলা পূর্ণ করিয়া উজান বহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, হঠাৎই মনে হইল, সকলিই তো মিলিল; কিন্তু যদি "গোকুলচন্দ্র ব্রজে নাহি এল!" আকস্মিকই অভাববোধ হইল সঙ্ঘগুরুর। পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, একের অভাবে যেন সবই শব। সকলি শূন্য, শূন্য এ গোকুল, শূন্য মাঠ-ঘাট-বাট। অন্তরটা ডুকরিয়া উঠিল, হে সঙ্ঘদেবতা, তুমি এমন সময়ে কোথায়?

সন্ধ্যায় নারী-মন্দিরে গেলাম। সান্ধ্য উৎসব এখানেই হইতেছিল। সান্ধ্যোপসনার পরে মেয়েরা সমস্বরে কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন-লীলা-কীর্ত্তন হইতেছিল। প্রধান গায়িকা বিমলাবালা, আর এক জনার নাম ঠিক মনে নাই। রসগোল্লা নাই বটে, তবে সমগ্র আব্‌হাওয়াটা রসে ভরপুর। হ্যাঁ, একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আসিবার সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবেই চন্দননগর বাজারের নিকট একটি বড় বেল ফুলের গড়ে এবং ১৬ গাছি বেলের মালা পাইয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। এও তাঁরি কৃপা। দেখিলাম, মেয়েরা মনের মত করিয়া সেই মালা দিয়া সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘজননীর ছবি দু'খানি সাজাইয়াছেন। মালা সার্থক হইয়াছে বলিয়া খুব আনন্দ হইল। বৃষ্টি ছিল না, আকাশভরা খণ্ড খণ্ড মেঘের মেলা বসিয়াছে। কীর্ত্তন শেষ হইলে, রাত্রি ৯টায় মাতৃ-উপাসনা হইল। ছন্দে-গাঁথা এই জীবন-প্রবাহ সত্যই আমায় মুগ্ধ করিল।

পরের দৃশ্য রান্নাবাড়ী। এ যেন এক বিরাট্ ব্যাপার। প্রচুর আয়োজন। পেটটার অবস্থাও ভাল নয়। সংযম রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। ৪০।৫০ জন ছেলে-মেয়ে আমাকে ঘিরিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। মেয়েদের আমি 'রসগোল্লা দাদু', আর ছেলেদের 'টেবলেট দাদু'। হিমগিরির ক্রোড়ে কিছুদিন সঙ্ঘগুরুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণধন আসিয়া আমার সব গোপন তথ্য পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অপরাধের মধ্যে আমার নিজের আবিষ্কৃত হজমিগুলী যোয়ান-টেবলেট আমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকে এবং উহা যত্রতত্র বিলাইয়াও থাকি। রঙ্গ-রহস্য-গল্পের ফোয়ারা ছুটিল—হাসির খৈ রাশি হইয়া জমিল। অবশেষে আশ্রমে ফিরিয়া শয়নে পদ্মলাভ করিলাম। রাত্রি এর মধ্যে অনেক দূর গড়াইয়া চলিয়াছিল।

এক ঘুম শেষ না হইতেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মিনিট পাঁচেক হইবে। সমকণ্ঠের প্রার্থনার সুর কাণে আসিল। উঠিয়া প্রার্থনায় যোগ দিলাম। তখনও ভোর হয় নাই। নিশুতি পল্লী। নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে প্রথম প্রভাতের এ উদ্গান একটা নূতন অনুভূতির দ্বার খুলিয়া দিল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া আবার সাড়ে পাঁচটায় উপাসনা ও স্বাধ্যায়। তারপর যে যার কাজে লাগিয়া গেল। আমি আর কি করি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, কাঠের কারখানা, গোশালা, তাঁতশালা, মেয়েদের ছাপাখানা, ঢেঁকিশালা, পাখীর চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখিলাম। তারপর গঙ্গাস্নান—রান্না-বাড়ীতে গমন ও আধ সের খাঁটি দুগ্ধপান। অতঃপর বিদায়-পর্ব্ব…অ-বলাই থাক।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ পরিদর্শন এই আমার প্রথম হইলেও, বেশ অনুভব করিতেছি, ইহা আমার চিরন্তনের।

ভ্রম সংশোধন: বিগত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত তন্ত্রের সারকথা শীর্ষক প্রবন্ধের তন্ত্রের তত্ত্বতালিকায় (পৃঃ ১৬৯) শাক্তমত-এর নিম্নে বামা, জ্যেষ্ঠা, পৌত্রী স্থলে বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী হইবে। বৈষ্ণব মত—মহাবিষ্ণু রুদ্র স্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হইবে। শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বসমন্বয়—মহালক্ষ্মী ও আদ্যাশক্তি স্থলে মহাশক্তি ও আদ্যাশক্তি হইবে।

কীর্ত্তন-গীতি-প্রবেশিকা — (স্বরলিপি সহ কীর্ত্তন গান)—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে সুর ও স্বরলিপির পুস্তক আছে সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের খাঁটি সুর, তাল লইয়া রায় বাহাদুরের ন্যায় অপর কোন সুধী, জ্ঞানী ও কীর্ত্তন বিশেষজ্ঞ এরূপ যোগ্যতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। এই পুস্তক দ্বারা কীর্ত্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা যে বহুল পরিমাণে উপকৃত হইবেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের মূল্যবান অংশটি হইতেছে গ্রন্থকারের নাতিদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ ভূমিকা। ভূমিকাটিতে গ্রন্থকার অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত যে কয়টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সে-গুলি হইতেছে—কীর্ত্তন গানের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তৃতি, কীর্ত্তন গানের প্রকার ভেদ, কীর্ত্তন গানের গৌরচন্দ্রিকার স্থান, কীর্ত্তন গানের ভাব ও সুরের সঙ্গতি।

ভূমিকার পরিশেষে কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের 'কীর্ত্তন-সঙ্গীতে-তাল' ও ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের 'কীর্ত্তনে-রাগ-রাগিণী' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছে।

কীর্ত্তনের পদ-নির্ব্বাচন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আথরগুলির সন্নিবেশে প্রতিটি পদ যে কেবলমাত্র অলঙ্কৃতই হইয়াছে তাহাই নহে পদগুলিতে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আথরগুলির ভিতর দিয়া আমরা গ্রন্থকারের সুন্দরসবোধের ও দরদী মনের পরিচয় পাই। স্বরলিপির সংযোজনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা সুর ও তাল সাধারণের নিকটও সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সম্বন্ধ-নির্ণয়—(চতুর্থ পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড) বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও কুল-পরিচয়—৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। মূল্য এক টাকা বার আনা।

পুস্তকটির চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইহার অন্যান্য খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই পুস্তক রচনাদ্বারা বাংলা দেশের লুপ্তপ্রায় সামাজিক ইতিহাসের তথ্য-সন্ধান সম্ভব হইবে। ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থকার এই অনুসন্ধান ব্যাপারে যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ধারা রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় ইহার পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলা দেশের সমাজ-তত্ত্ব ও কুল পরিচয় সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকের নিকট পুস্তকটির যথেষ্ট মূল্য আছে।

অগ্নি শিখা—শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায় প্রণীত। প্রকাশক: গ্রন্থকার, অষ্টগ্রাম ময়মনসিংহ। মূল্য আট আনা।

লেখকের কয়েকটি কবিতা পড়িয়া আমরা সত্যই আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার রচনার একটা আদর্শ ও লক্ষ্য-পথ আছে, ইহা আশার কথা। আইডিয়া কোথাও স্পষ্টতার অভিমানে বায়বীয় হইয়া উঠে নাই। দোষ ত্রুটী থাকিলেও, লেখকের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে ইহা প্রশংসার যোগ্য।

তুর্কী-বীর কামাল পাশা—রেজাউল করিম, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক: নূর লাইব্রেরী, পাবলিশার, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

লেখক জাতীয়তামূলক পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা নব্য-তুরস্কের স্রষ্টা কামাল আতাতুর্কের জীবনের মূল কয়েকটি কাহিনীকে সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কামালের জীবনের যে শিক্ষা তাহা ভারতবাসী গ্রহণ করুক, ইহা লেখক চাহিয়াছেন,—লেখকের এই উদ্দেশ্য প্রশংসার্হ। এই আদর্শহীন দেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার যে প্রচুর সার্থকতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শরত-প্রতিভা—শ্রীসতীশচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, কার্গো সুপারিনটেণ্ডেণ্টস্ অফিস, বি, আই, এস, এন্, কোং, রেঙ্গুন। পৃঃ সংখ্যা ১৮১। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে অবস্থানকালে লেখকের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল। রেঙ্গুনের ঘটনাবলী ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র বাঙালীর অন্তরকে যতটা গভীরভাবে নাড়া দিয়াছেন অপর কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক তাহা করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের জীবন-কাহিনী জানিবার আগ্রহ থাকা সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক, বিশেষ করিয়া তাঁহার ব্রহ্ম প্রবাসের অজ্ঞাতবাসের দিনগুলির কথা। ইতিপূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাসকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকখানি পুস্তক বাজারে বাহির হইয়াছে—এই সকল পুস্তকে বর্ণিত বহু ঘটনা লইয়া যথেষ্ট প্রতিবাদও হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটি শরৎচন্দ্রের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই। তবে পুস্তকটি যে সাধারণ পাঠকের নিকট যথেষ্ট আকর্ষনীয় হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

রণাঙ্গনে মাতৃ-উৎসব

ডাঃ হারাণচন্দ্র রায়

[প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ডাক্তার একনিষ্ঠ সাধক ও সভ্য শ্রীহারাণচন্দ্র রায় বৃটিশ সামরিক মেডিকাল মিশনে যোগদান করিয়াছেন। মানব-সেবাই তাঁর এই যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিপুল দায়িত্ব ও কর্ম্মভারের মধ্যেও তিনি নিয়মিত উপাসনা, ধ্যান ইত্যাদি করিয়া থাকেন। ৬ই আষাঢ় (২১শে জুন) সঙ্ঘ-ধর্ম্মীর একটি পবিত্র দিন। সঙ্ঘ-জননীর আবির্ভাবোপলক্ষে সঙ্ঘের মূল ও শাখাকেন্দ্রসমূহে এইদিনে মাতৃশক্তিকে আবাহন করা হইয়া থাকে। স্বজন স্বগোষ্ঠী হইতে বহুদূরে সম্পূর্ণ অভিনব সামরিক পরিবেশের মধ্যেও মাতৃভক্ত সঙ্ঘ-সন্তান ডাক্তার হারাণচন্দ্র এই দিনটি কি ভাবে পালন করিয়াছিল, তাহা তাহার পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মাতৃশক্তি সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষা করিতেছে। ইষ্টের কল্যাণ-কামনা এবং সমগ্র সঙ্ঘ-চেতনা তাহাকে সতত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই পত্রে ইহাও দেখা যাইবে যে, নির্ম্মম সামরিক আবেষ্টনীর মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কত কমনীয়—আত্মিক শক্তির আবেদন কত গভীর ও সুদূর-প্রসারী।]

আজ আমাদের মাতৃ-উৎসব। সঙ্ঘের ভাই-বোনেরা উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা! সুদূর এই প্রবাসে মায়েরই এক সন্তান আমিও সেই আনন্দের আস্বাদ পেতে চাই, তাই এই উৎসবের আয়োজন এখানেও করেছি। কি ভাবে করলাম, সেই কথাটাই এখানে বলছি।

উৎসব-সূচী পেয়েই এক দিনের (21st June, ৬ই আষাঢ়) off duty-র জন্য আমাদের officer commandingকে অনুরোধ করলাম। প্রথমে তিনি কথাটা আমোলই দিলেন না। হয়তো আমি কথাটা তাঁকে ঠিকমত বুঝাতে পারিনি, তাছাড়া কাজও প্রচুর। একেবারে সময় নেই। আগামী কালই উৎসব। নিরুপায় হয়ে মায়েরই শরণ-গ্রহণ করলাম। মায়ের অপূর্ব্ব করুণায় অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটে গেল।

আমাদের second-in-command খুব অমায়িক মানুষ। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও একটু ঘনিষ্ঠতর। তাঁকে গিয়ে আমার অভিপ্রায়ের কথা খুলে বললাম। তিনি একটুখানি কি ভাবলেন। তারপরই বললেন, "Alright I will have it done."

নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে অজস্র অন্তরের ধন্যবাদ জানালাম।

"But you must give us a feast" হেসে তিনি রহস্য করলেন।

ইহা গত কালের ঘটনা। আজই মাত্র সকালে off duty-র order পেলাম। আমার tent-এ আমরা তিনজন থাকি—দু'জন বাঙ্গালী আর একজন European officer. ভারী চমৎকার সদাশয় ভদ্রলোক এই অফিচারটি। এঁর ভগ্নিও এখানকার একজন Sister-in-charge. এঁদের চরিত্র এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর কি বলবো! সত্যই

ডাঃ হারাণচন্দ্র রায়

প্রশংসার যোগ্য। আমি এঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই। সাহেবটি সঙ্ঘগুরুর (শ্রীমতিলাল রায়) 'Temple of Inspiration' বইখানি প্রত্যেক দিন সকালে নিয়মিত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন এবং প্রাতঃকালে আমি যখন ধ্যান করি, তিনিও তখন মৌন হয়ে থাকেন। আমার আত্মিক সাধনাকে তিনি শুধু শ্রদ্ধা করেন না, রীতিমত যেন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এই মাতৃ-উৎসবে তিনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করছেন। আগের দিন বৈকাল থেকেই আমাদের তাঁবুকে এমন চমৎকার ভাবে ইনি পত্র-পুষ্প দিয়ে সাজিয়েছেন যে, একটা মন্দিরের আবহাওয়া সুস্পষ্ট অনুভব করছি। সিষ্টারটি গুরুদেবের (শ্রীমতিলাল রায়) ফটোখানা পরম যত্নের সহিত বিচিত্র পুষ্পে সজ্জিত করেছেন।

প্রাতঃকালে আমরা চারজনে প্রথমে ধ্যান করলাম। তারপর মায়ের অধ্যাত্ম শক্তির উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করলাম। একটা অসীম তৃপ্তি বুকটাকে ভরাট্ করে তুললো। বেলা আটটায় colonel-এর অনুমতি নিয়ে আমার ward-এর convalscent রোগিদের প্রত্যেককে দুই আনার খাবার পরিবেশন করা হ'ল। প্রায় টাকা কুড়িক খরচ হ'ল।

সারাদিন রাত্রির ভোজের আয়োজনে কাটলো। সম্পূর্ণ ভারতীয় মতে লুচি মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা রাত্রি আটটায় Dinner; মোটের উপর আমরা ৩২ জন অফিসার। এর মধ্যে ১১ জন ভারতীয় আর ২১ জন ইউরোপীয়ান। মুখ বদ্‌লাতে পারা যাবে বলে সাহেবরা ভারী উৎফুল্ল। সকলেরই আনন্দের আর সীমা নেই। আমাদের officer-commanding একবার আমার করমর্দ্দন করে বললেন, "Roy, long live your mother!" সবচেয়ে মজা এই যে, এই ভোজে Higher ও Junior officers-এর মধ্যে কোন ভেদ রইলো না। সকলেই আজ এক টেবিলে বসে আহার করলেন। টাকা পঁচিশেক খরচ হ'ল। হাতেও টাকা ছিল না। সব টাকাই major নিজেই advance করেছেন।

অপার আনন্দ পেলাম। মায়ের অনির্ব্বচনীয় করুণায় আমি অভিষিক্ত। মায়ের কোল ছেড়ে এসে মাঝে মাঝে আমার মনটা গুমরে উঠতো। আজ আমি কি তৃপ্তি ও আনন্দই যে পেলাম, তা বলার নয়। মাতৃশক্তির অপূর্ব্ব অনুভূতিতে আজ আমি অভিভূত। ভাষায় তা ব্যক্ত করবার নয়। আশা করি, তোমরা তা অন্তর দিয়ে অনুভব করবে। আমি মাতৃহারা হয়ে সঙ্ঘে এসেছিলাম। আজ আমি উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারি, মা আমার আছে—আছেই—আছেন। তাঁর স্নেহ করুণ-দৃষ্টি আমার সকল বধা-বিপদ থেকে রক্ষা করবেনই। আজ আমার অন্তর থেকে কেবলই প্রার্থনা জাগছে, "হে ভগবান, আমার আর কেহ নেই, শুধু তুমি আর আমি।" সর্ব্বাবস্থায়ই আজ আমি সত্য সত্যই অভীঃ।

খুব তাড়াতাড়ি। তবুও টাটকা খবরটা তোমাদের দেওয়ার জন্য আজই চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত হলেও, আমি ভরসা করি, আমার ক্ষুদ্র লিপি উৎসবের পরম সার্থকতা বহন করে নিয়ে যাবে। অধিক কি, আমার প্রেম প্রীতি নিও এবং সকলকে দিও। ইতি—

তোমাদের হারাণ

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

রুশিয়াঃ হিটলারের বসন্তকালীন অভিযান লইয়া সমর পণ্ডিতগণের গবেষণার অন্ত ছিল না। রুশের প্রচার সচীব মঃ লজভস্কির মতে জার্ম্মানীর আর আক্রমণমূলক যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই এবং ১৯৪২ সালেই জার্ম্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ এখন বলা যাইতে পারে যে, হিটলারের গ্রীষ্মাভিযান সুরু হইয়াছে। রুশিয়ার উপর জার্ম্মানীর এই চাপ কমাইবার জন্য সাম্প্রতিক ইঙ্গ-রুশ চুক্তিতে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সর্ত্ত হইয়াছে এবং এই রণাঙ্গন-সৃষ্টির কথা বৃটিশ সামরিক ও বে-সামরিক মহলে প্রকাশ্যেই বিঘোষিত হইয়াছে। বৃটিশের বিমান-বহর বিশেষ সক্রীয় হইলেও, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ-সৃষ্টির সম্ভাব্য সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ বিদ্যমান।

বর্ত্তমানে ঘটনা দাঁড়াইয়াছে এই যে, কার্চ্চ এবং সিবাষ্টপোলের পতন হওয়ায় কৃষ্ণসাগরে জার্ম্মান আধিপত্য অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিবাস্তোপোল পৃথিবীর দুর্ভেদ্যতম দুর্গ। উহা একে প্রাকৃতিক পরিরক্ষণী দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহার উপর আধুনিকতম যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট পরিণতির ইহা উজ্জ্বলতম নিদর্শন। রুশ সৈন্যের বীরত্ব অতুলনীয়। তাহাদের শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও অস্ত্রধারণ-ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। বর্ত্তমান সময়ে রুশ সৈন্য ব্যতীত আর কোনও সেনাবাহিনী এতদিন সিবাস্তোপোলের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর এই প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইত কিনা সন্দেহ। সিবাস্তোপোল বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। সিবাস্তোপোলের পতনের

পর রুশ রণাঙ্গনের থমথমে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। খারকভ হইতে জার্ম্মান বাহিনী যে অভিযান সুরু করে তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এখন খারকভ-কুরস্ক-ভরোনিজ-কুপিয়ান্স অঞ্চলে ভীষণ রকম এক সঙ্গীন লড়াই চলিয়াছে। আধুনিকতম মারাত্মক সজ্জাসহ জার্ম্মান-বাহিনী ডন নদীর তীরে সমুপস্থিত এবং স্থানে স্থানে ডন নদী অতিক্রমও করিয়াছে। উত্তরে কালিনিন ফ্রন্টেও জার্ম্মানী চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে হিংস্র উন্মাদ গতিতে জার্ম্মানী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাইয়াছে তাহাতে মনে হয়, অনতিবিলম্বেই রষ্টভ ও মস্কো বিপন্ন হইবে এবং ককেশাসের পথ উন্মুক্ত হইবে। এই অবস্থায় নিকট প্রাচ্য রণাঙ্গণে তুরস্কের এবং সুদূর প্রাচ্য রণাঙ্গণে জাপানেরও রুশীয় যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন-সৃষ্টিরও ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ। রুশ-ভল্লুক দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এই রণাঙ্গন-সৃষ্টি ক্রমেই কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

সংগ্রামরত রাশিয়ার বীর সৈনিকগণ

মধ্য-প্রাচ্য রণাঙ্গন ঃ শত্রুপক্ষ লাইবিয়া হইতে মিত্রপক্ষীয়গণকে হটাইয়া মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া হইতে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে এল-এলমিনে ঘাঁটি করিয়াছে। তোব্রুকের পতন এবং মিশরের অভ্যন্তরে শত্রুবাহিনীর দ্রুতগতি প্রবেশ অপ্রত্যাশিত এবং অসাধারণ। ইহা সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছে। জেনারেল রোমেলের সৈন্যগণ যদি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করিতে পারে, তাহা হইলে সিবাস্তোপোল ও আলেকজান্দ্রিয়া এই উভয় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বেদখল হওয়ায় প্রাচ্য রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর যথেষ্ট শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইবে। উহাতে রুশ-রণাঙ্গন ও প্রাচ্য-রণাঙ্গন যুক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। বৃটনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান দ্বারস্বরূপ ও বৃটিশ সামরিক ষ্ট্রাটেজির প্রধান কেন্দ্র সুয়েজ খাল বিপন্ন হইয়া পড়িলে মিত্র শক্তির বিশেষ সামরিক অসুবিধা দেখা দিবে। অবশ্য মিত্রশক্তি ইতিমধ্যে মধ্য-প্রাচ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং শত্রু-বাহিনীর গতি শুধু প্রতিরোধ করে নাই, স্থান বিশেষে হটাইয়াও দিয়াছে। মোটের উপর মধ্য প্রাচ্য - রণাঙ্গনেই এখন পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। একদিকে জেনারেল রোমেলের বাহিনীর সুয়েজ আক্রমণের প্রচেষ্টা, অপর দিকে ককেসাশ ও তুরস্কের ভিতর দিয়া জার্ম্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ এই উভয় ব্যাপার মিলিয়া মধ্য প্রাচ্য-রণাঙ্গণকে বেশ ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে।

সুদূর প্রাচ্য রণাঙ্গন ঃ সুদূর প্রাচ্যের ঝটিকার সাময়িক বিরাম ঘটিয়াছে। প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশ দখল করিয়া জাপান আপাততঃ নিষ্ক্রীয় বলিয়া মনে হইতেছে, যদিও চীনদেশের উপর এখনও তাহার প্রবল আক্রমণ বিদ্যমান। চীনের অধিনায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেকের অভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রনীতি ও রণনীতি-কুশলতায় জাপান ছয় বৎসরেও চীনদেশ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। চীন - যুদ্ধের ফলাফল আর কিছু দিনের মধ্যেই বুঝা যাইবে। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের গতি-

প্রকৃতির উপর জাপানের সাইবেরিয়া আক্রমণ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। ব্লাডিভষ্টকে অবস্থিত রুশ-বিমান-বহর ও নৌবহর জাপানের কণ্টকস্বরূপ। সুতরাং সুযোগ পাইলে উহা উৎপাটন করিতে জাপান যে সক্রীয় হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

চিয়াং কাইশেক ও মাদাম চিয়াং কাইশেক

প্রশান্তমহাসাগরে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নৌ ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে জাপানের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ ঘটিতেছে। উহাদের ফলাফল অমীমাংসিত রহিয়াছে। এলুসিয়েন দ্বীপপুঞ্জের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি জাপানের দখলে আসিয়াছে। উহাতে আমেরিকা মহাদেশের এবং রুশ-মার্কিণ যোগাযোগের পক্ষে কিছু শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। তবুও মনে হয় যে, চীনদেশ ও রুশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ না করিয়া আমেরিকার দিকে জাপান মনোনিবেশ করিবে না এবং করিতেও পারে না। ব্রহ্মে অবস্থিত জাপানী বাহিনীর এখন বর্ষাকাল পর্য্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আগামী শীতের প্রারম্ভে আবার আসাম ও বঙ্গদেশের পক্ষে শঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে।

ভারতঃ আয়ারলণ্ড, মিশর ও ভারত এই তিনটী দেশ বৃটিশ প্রভুশক্তির আয়ত্বাধীনে অবস্থিত। উহাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও ঐতিহ্য আছে। উহারা এজন্যই ইংলণ্ডের বিপদকে নিজেদের বিপদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। ফলে আয়ারলণ্ডের ডি'ভেলেরা, মিশরের নাহাসপাশা, ও ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী শত্রুপক্ষ বা মিত্রপক্ষ কোনও পক্ষেরই সহায়তা করিতে প্রস্তুত নহেন। রাষ্ট্রীয় কূটনীতি পরিচালনায় বৃটিশ মন্ত্রীগণের অদূরদর্শিতাই ঐ তিনটা দেশের বর্ত্তমান মনোভাবের কারণ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এবং ভারতীয় কমরেডগণের ফ্যাসিষ্টবিরোধী প্রচার কার্য্য সত্বেও, ভারতীয় জনসাধারণ এই যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। ইহা নিজের 'করম দোষই' বলিতে হইবে।

ভূমধ্যসাগর ও মধ্য প্রাচ্য-রণাঙ্গন

সাময়িকী
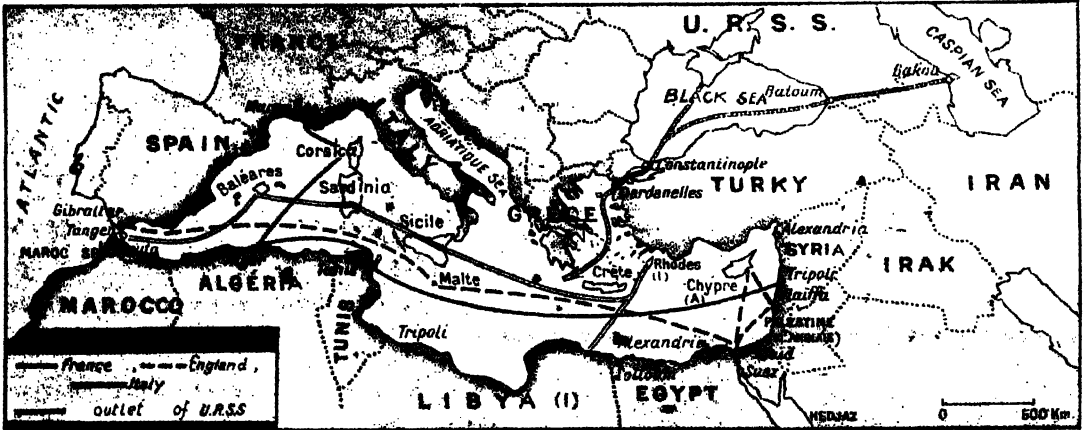
পরলোকে ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও :

ভারত সরকারের অসামরিক জনরক্ষা সচিব ডাঃ রাও রাঘবেন্দ্র গত ১৫ই জুন মারা গিয়াছেন। বিগত ২১শে জুলাই তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে বেসামরিক জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যপদে নিযুক্ত হন। এক সময়ে তিনি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। তাহার পর রাজনৈতিক জীবনে তাঁর একটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। ডাঃ রাও দুইবার মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। গত ১৯৩৬ সালে তিনি মধ্য-প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি মধ্য-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং ১৯৩৯ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত ভারত সচিবের দপ্তরখানার পরামর্শদাতা ছিলেন। ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাওয়ের মৃত্যুতে একটী কর্ম্মবহুল প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অবসান ঘটিল, যাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না।

সঙ্ঘ-জননীর স্মৃতিপূজা :

৬ই আষাঢ়, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সন্তানমণ্ডলী যথারীতি অধ্যাত্মসঙ্ঘজননীর স্মরণোৎসব সম্পন্ন করে। চন্দননগর মূলকেন্দ্রে এই উপলক্ষে প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় তাঁহারা সঙ্ঘ-মন্দিরে সমবেত হন। পরে সম্মিলিত উপাসনা, মাতৃপূজা, পুষ্পাঞ্জলি, নারীমন্দির কর্ত্তৃক মাতৃনাম জপ ও মাতৃ-কীর্ত্তন প্রভৃতি সারাদিনব্যাপী অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের প্রবাহ চলিয়াছিল। পুণ্যময়ী সঙ্ঘমাতৃকার এই আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে সঙ্ঘগুরুর একটী অনুপ্রেরণাময়ী বাণী পঠিত হইয়াছিল। প্রবর্ত্তক কলেজের ছাত্রগণ এবং স্কুলের ছাত্রাবাসের বালক-বালিকাগণও মহোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। মাতৃ-শক্তির অমর প্রেরণা সঙ্ঘের অধ্যাত্মজীবনে অপ্রাকৃত দিব্য স্বভাব দান করিয়াছে ও উহাই প্রতিনিয়ত সঙ্ঘের প্রত্যেক নারী-পুরুষের প্রাণে অমৃত সঞ্চার করিতেছে।

পরলোকে নাট্যকার রুডলফ্ বেসিয়ার :

বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার রুডলফ্ বেসিয়ার পরলোক গমন করিয়াছেন। রুডলফ্ বেসিয়ার ১৮৭৮ সালে জাভায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ সাল হইতে তাঁহার নাট্য রচনার আরম্ভ। তাহার সব চেয়ে প্রসিদ্ধ নাটক হইতেছে ব্যারেটস্ অফ্ উইম্পোল ষ্ট্রীট—ইহা ১৯৩০ সালে রচিত হয়।

প্রধান মন্ত্রীর আবেদন :

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক নিখিল ভারত প্রগতিশীল মুসলিম লীগ গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের সর্ব্বত্র বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিকট তিনি একটি সুদীর্ঘ আবেদন-পত্রও প্রচার করিয়াছেন। এই পত্রে মিঃ জিন্না-মুসলিম লীগের চক্রান্ত ও দেশের স্বার্থবিরোধী কার্য্য-কলাপের আলোচনা করিয়া নূতন লীগ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিবৃত করিয়াছেন।

প্রবর্ত্তক ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন :

গত ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জুন নিখিল বঙ্গীয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহমণ্ডলীর ষাণ্মাসিক অধিবেশন চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সঙ্ঘের প্রতিনিধি-সভ্যগণ আগমন করেন। স্থানীয় আজীবন ও সহযোগী সঙ্ঘ-সভ্যগণও অধিবেশনের শুভকামনায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে অধিবেশনের প্রারম্ভে সঙ্ঘ প্রশস্তি উচ্চারণান্তে সঙ্ঘগুরুর প্রেরিত একটী বিশেষ নির্দ্দেশ-বাণী পঠিত হয়। সভায় বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির উপযোগী বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলিচিত এবং কয়েকটী বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলন :

গত ২০শে জুন সায়াহ্নে কলিকাতার টাউনহলে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া উভয় সম্প্রদায়ের বহু নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক আওতার বাহিরে দল-নিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

ইতিপূর্ব্বে আর একবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বে হইয়াছিল তাহা ফলবতী হয় নাই। তখন সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমণ্ডল দেশের শাসন কার্য্য চালাইতেছিলেন—দেশের শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে সেদিন যেন একটানা আঁধারের রাজত্ব চলিতেছিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিত্বের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা দেশের বিশ্বাসভাজন। আমরা আশা করি, সাময়িক বাদানুবাদ ও স্বার্থের কলহকে পশ্চাতে রাখিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক মিলনের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণ:

১৫ জন সভ্যসহ বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই দ্বিতীয়বার শাসন পরিষদের রদবদল হইল। ইহার মধ্যে ১১ জন বে-সরকারী ভারতীয়, ১ জন বে-সরকারী ইউরোপীয় এবং প্রধান সেনাপতিসহ ৩ জন ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী। বে-সরকারীভাবে যাঁহারা সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও কিছু না বলিবার থাকিলেও ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবী তাঁহাদের কতখানি, তাহা সন্দেহের বিষয়। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিমূলক করিবার যে দাবী দীর্ঘ কাল ধরিয়া সংবাদপত্রাদিতে চলিয়া আসিতেছে তাহা এবারেও উপেক্ষিত হইল। এ সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বড়লাট নিম্নলিখিতরূপে সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়াছেন। স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার—প্রচার বিভাগ; স্যার জে, পি শ্রীবাস্তব—জনরক্ষা; স্যার ই. সি. বেন্থল—সামরিক ডাকপত্র চলাচল বিভাগ; স্যার মহম্মদ ওসমান—ডাক ও বিমান বিভাগ; স্যার ফিরোজ খাঁ নূন—দেশরক্ষা বিভাগ; শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার—বাণিজ্য বিভাগ; স্যার যোগেন্দ্র সিং—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ; ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর—শ্রমিক বিভাগ; মিঃ অ্যানে—বহির্ভারতীয় বিভাগ; স্যার জেরেমি রাইসম্যান—অর্থ বিভাগ; স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল—স্বরাষ্ট্র বিভাগ; স্যার সুলতান আমেদ—আইন বিভাগ; স্যার এইচ, পি, মোদি—সরবরাহ বিভাগ। প্রধান সেনাপতির দপ্তর ভবিষ্যতে সমর দপ্তর বলিয়া অভিহিত হইবে। স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ও নবনগরের জাম সাহেব বৃটিশের সমরকালীন মন্ত্রি সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

মেঘদূত উৎসব:

গত ১লা আষাঢ় পি, এফ, ক্লাবের উদ্যোগে মহাকবি কালিদাসের অমর রচনা মেঘদূত উৎসব ৫৪।এ হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয় অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। উপস্থিত সাহিত্যিকগণ মেঘদূত সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পর, সভাপতি মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও মেঘদূত সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। সঙ্গীত ও জলযোগের পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত একখানি ছবি
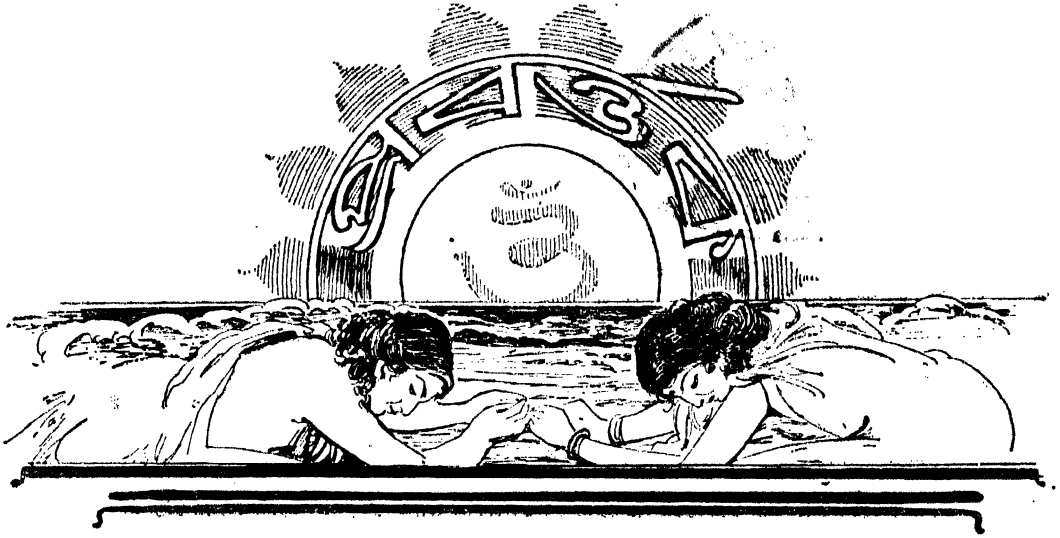
সপ্তবিংশ বর্ষ ১৩৪৯ সাল	ভাদ্র	প্রথম খণ্ড ৫ম সংখ্যা

যোগ-জীবন

যোগ ও ধর্ম্ম এক বস্তু নয়। ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। করিলে হয়—না করিলে হয় না। যোগ বীজাঙ্কুরের ন্যায় আধারে আশ্রয় পাইলে, উহা স্বতঃই মূর্ত্তি লইতে থাকে। ভারত ধর্ম্মের দেশ; কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে যোগবীর্য্য বপনের দিন আসন্ন হইয়াছে।

সেই পুরাতন কথাই বলি—এই যোগ বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পরম্পরানুসারে রাজর্ষিগণ পাইয়াছিলেন। কালে ইহা নষ্ট হইলে শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র পার্থকে ধর্ম্মক্ষেত্রেই এই যোগবীর্য্য দান করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই যোগ কোথায়ও মূর্ত্ত হয় নাই; হইলেও, তাহা কোন জাতিকে সিদ্ধ করে নাই—পূর্ব্বের ন্যায় ইহা ব্যক্তির গণ্ডীতে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য ফুকারিয়া বলিতেছে, এই যোগ ব্যক্তির জন্য নয়, জাতির জন্য, ইহা ধর্ম্মরাজ্যের জন্য—যে রাজ্যে বিরাজ করিবে অক্ষুণ্ণ শ্রী, অপ্রতিহত জয়, অক্ষয় সম্পদ, ঋতময় সত্য, ঈশ্বরযুক্ত জীবন।

ধর্ম্মের লক্ষ্য ত্যাগ, ভোগ প্রভৃতি অনেক কিছু; যোগের লক্ষ্য ভগবান। ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী; যোগীও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইবে। যোগীর জাতিই ভবিষ্যৎ যুগের ধর্ম্মরাজ্য সৃজনের অধিকারী। এই হেতু যোগী হও।

আমি জানি—এই যোগ অনেক জন্ম সংসিদ্ধির উপর নির্ভর করে। কে বলিবে যে, তোমার রক্তধারায় সেই ঋষিরক্তের ধারা ধরিয়া বহু জন্ম ধর্ম্ম-সাধনার পর, ব্রহ্মণে যোগবীর্য্যধারণের শুভজন্ম সম্পাদন করে নাই?

বিশ্বাস কর, সহস্র সহস্র বৎসরের ধর্ম্মপ্রাণ ভারত আজ যোগজীবনলাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; তুমিও ইহার জন্য চিহ্নিত অধিকারী। আজ ভারতে সংস্কৃতি-স্মরণের পুণ্যক্ষণে, জাতিগঠনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের আহ্বান কাণ পাতিয়া গ্রহণ কর এবং ধর্ম্মের ভিত্তির উপর যোগবীর্য্য-ধারণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই যোগজীবনের অভ্যুত্থানে, বিশ্বের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান কর। ধরিত্রীর গর্ভবেদনার ইহাই হেতু। ভারতের জীবনে নবজাতির জন্ম সিদ্ধ হইলে, বসুন্ধরায় শান্তি ও আলোর প্রতিষ্ঠা হইবে। জীমূত গর্জ্জনে তাই আমার কর্ণে বাজিতেছে—"তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।"

শ্রীম—

শক্তির সংঘর্ষে ভারত

শক্তির সংঘর্ষ চলিয়াছে। এ সংঘর্ষ বিশ্বব্যাপী হইলেও, ইহার অধ্যাত্ম-কেন্দ্র যে ভারতবর্ষ, তাহা যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। অন্যত্রও চলিয়াছে স্বার্থ ও আদর্শের সংঘাত—এক পক্ষের স্বার্থ ও আদর্শ অন্য পক্ষের স্বার্থ ও আদর্শ হইতে শুধু বিভিন্ন নয়, পরস্পর-বিরোধী হওয়ায়, তাহারা আজ একে অন্যের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত। 'হয় অরাম, নয় অরাবণ'—এই মত প্রত্যেক পক্ষেরই দৃঢ় মরণ-পণ সঙ্কল্প। তবুও সে সংগ্রাম মূলতঃ জড়বাদের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ। দ্বন্দ্বশীল উভয় পক্ষই জড়শক্তির সাধনায় বিশ্বাসী, জড় আয়ুধ প্রহরণ সঞ্চালনায় সিদ্ধহস্ত। সংগ্রামের লক্ষ্যও তত্ত্বতঃ আর যাহাই হউক, আসলে তখন স্ব-স্ব জাতীয় স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা। মানুষ রক্ত দিতেছে—আদর্শের আহ্বানে বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ জাতির ধন-প্রাণ-মান রক্ষারই জন্য।

এই নিদারুণ শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের আত্মা এখনও প্রত্যক্ষ আহ্বান পায় নাই। তাহাকে লইয়া পরোক্ষে, নেপথ্যে বহু কাণাকাণি ও টানাটানিও চলিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মার সাড়া দিবার মত সময় ও সুযোগ এখনও ঘটে নাই। ভারতের আত্মা যেমন ভাবে, যেরূপ নিবিড়তা ও আন্তরিকতার সহিত অধ্যাত্মক্ষেত্রে সাড়া দিতে পারে, এমন আর কোনও ক্ষেত্রে সরাসরি পারে না, এ কথা যাঁহারা জানেন বা অন্ততঃ বিশ্বাসও করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগ-সঙ্কটে ভারতাত্মার এই তটস্থ অবস্থার মধ্যেও এক সুগভীর আত্মপ্রস্তুতিরই আয়োজন লক্ষ্য করিবেন।

অদৃষ্টচক্রে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা আজ অত্যন্ত কঠিন সমস্যাপূর্ণ। পরাধীন নিরস্ত্র ভারত জাতি একদিকে জটিল দুর্ভেদ্য অন্তঃ-সমস্যায় ছিন্ন-ভিন্ন, অন্য দিকে প্রবল শাসক-জাতির সহানুভূতি ও সহযোগিতায় বঞ্চিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে স্বকীয় সকল শক্তি অখণ্ড মনে-প্রাণে উদ্যত করিতে সে অক্ষম। লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহার এই বর্ত্তমান নিরুপায় অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন নহে। তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করার কথা এখানে উঠে না। তৃতীয় পক্ষও যাঁহার ইচ্ছাধীন, সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তির বিধানেই ভারতের রাষ্ট্রনীতি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, গূঢ় অভিসন্ধি-পূর্ণ সন্ধি-পর্য্যায়ে উপস্থিত। রাজনৈতিক চাল-বেচালের মধ্য দিয়া এই কূট সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির কোনও স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মীমাংসার সূত্র আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এমনি নিঃসহায় চক্রান্তপূর্ণ অবস্থা ও ব্যবস্থার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ভারতের বন্দী জাতীয়াত্মা যে ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত কণ্ঠে মুক্তির জন্যই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে, ইহা বিচিত্র নয়। সে বিক্ষোভের প্রকাশ কি অবাঞ্ছনীয় আকার ও মাত্রা পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পরাধীন উপায়ান্তরশূন্য ভারত আজ নিজ অন্তরের মর্ম্মদাহ ঢালিয়াই যদি বিশ্বের অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপণ করিতে চাহে, তাহার জন্য তাহাকেও দায়ী করা নিষ্ঠুরতা।

এইখানে তৃতীয় শক্তিরই সঙ্কেত আমরা একটু ধরিতে চেষ্টা করিব। এই তৃতীয় শক্তিই ভারতের অধ্যাত্ম শক্তি। অবস্থার ঘূর্ণীচক্রে জাতির মনই বিমূঢ় হইতে পারে, জাতির আত্মা কিন্তু স্বীয় শাশ্বত সত্য হইতে বিচলিত হইবে কেন? ভারতের সনাতন সত্য তাহার অধ্যাত্মভাব ও জীবন। এই ভাব শুধু ব্যক্তিগত মানুষের ধর্ম্মানুভূতি নহে, ইহা একটা মহাজাতির সমষ্টি-ধর্ম্মের জাগরণ। ভারতের জাতি-সত্তা সেই স্বভাব ও স্ব-ধর্ম্ম লইয়া অভ্যুত্থিত হইতে চাহিলে, তাহার সেই জাগরণের গতিবেগ কেহই আর রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

শক্তির সহিত শক্তির সংঘাতেও এই আত্মার জাগরণ আমরা অসম্ভব মনে করিব না। বিশ্বের প্রলয়-রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিঃস্ব, রিক্ত ভারতাত্মা আজ হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, জিঘাংসার প্রতিশোধে প্রতিজিঘাংসার

কলরোল তুলিতে চায় নাই। তাহার অন্তরের চাওয়া মুক্তি; এ মুক্তি নিজের এবং বিশ্বজাতির কল্যাণের জন্য। তাই তার এই মুক্তিলিপ্সা বিশ্বমানবের সহানুভূতিরই যোগ্য। আমরা আশা করিব—ভারতের শাসকজাতিও পরাধীন ভারতের এই চাওয়া এমনই সহানুভূতি ও আন্তরিক শুভমতি যোগেই গ্রহণ করিবেন। ভারতের মুক্তি-সাধনা সত্য হইলে, বিশ্বজাতির মুক্তিসাধনাও একদিন সর্ব্বত্র সিদ্ধ হইবে।

দুর্দ্দিনের আশু প্রতিকারের জন্য যে চেষ্টা তাহার মধ্যে সত্তার চাওয়া পূর্ণ বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশ পায় না। এরূপ চেষ্টা কোনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষ বা জাতির পক্ষে খুব স্বাভাবিক হইলেও, সে চেষ্টা অবস্থার স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনিতে সমর্থ হয় না, বরং অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে গিয়া তাহা স্থিতিশীল অবস্থাকে আরও জটিল ও দুরায়ত্ত করিয়া তুলে। এক অবস্থার প্রতিবিধান করিতে না করিতে আরও জটিলতর সমস্যাময় পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়। ইহাতে জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না।

প্রতিক্রিয়া জীবনের লক্ষণ হইলেও উহাই সমস্যার প্রতিকারে সবখানি যথেষ্ট নয়। শক্তির সহিত শক্তির সংঘাতে যে অগ্ন্যুৎপাত, তাহা সকল সময়েই চৈতন্যের বিজয়ী হিন্দোল নয়। তপস্যার অপচয়ও সম্ভব, যদি উহা জ্ঞাননিষ্ঠায় উন হয়। মানুষ বা জাতি যখন অবস্থার দায়ে বা আঘাতের পীড়নে হতাশ ও অতিষ্ঠ হইয়া কিছু করে, আত্মার জাগরণ-বীর্য্য তির্য্যক্ রেখায়ও দেখা দেয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণে ক্ষণে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা রাখিয়াই চলে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষী জাগরণের ভঙ্গী ব্যাপক হইলেও, যদি মূল প্রাণ ঝিমাইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তর-সত্তা তার সর্ব্বাঙ্গ উজাড় করিয়া তাহাতে পরিপূর্ণ সাড়া দিতে নাও পারে।

প্রতিপক্ষের ভেদনীতি জাতির অখণ্ড জাগরণ-বীর্য্যে হুল ফুটাইয়া ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে না। জাগরণ-শক্তি যতক্ষণ ঋণাত্মক, ততক্ষণই এ অনর্থ স্বাভাবিক। বিজয়ী তপস্যা বাধা ও অনর্থের মূল উপাড়িয়াই স্ববীর্য্য প্রকটিত করে। তার গণনা স্বপ্রতিষ্ঠ; কিন্তু আকাশবৃত্তি ইহা নহে। সংগ্রামে শক্তির পরিমাপে বা চালে যদি কোথাও ভুল থাকিয়া যায়, সে ভুল প্রকৃতির কষ্টিপাথরে ধরা পড়িবেই। তাহারও প্রতি দণ্ড অত্যন্ত বিষম। কিন্তু ইহাতেও ভয়ের বা চিন্তার কিছুই নাই। মার খাইয়া খাইয়াই কত দেশ ও জাতিকে অভিজ্ঞতার পাঠ গ্রহণ করিতে হইতেছে না কি? একটা বিশাল জনসঙ্ঘের এরূপ শক্তির ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া চলা ছাড়া উপায়ান্তরই বা কি আছে।

প্রতিক্রিয়ার উপরে দাঁড়াইয়া আত্মার ঊর্দ্ধগ শক্তি যদি কোথাও উৎসৃত হয়, সেইখানে জাতির প্রাণ গতির উল্লাসে উল্লাসিত। ইহা বেদনা বা অভিমানের মর্ম্মদাহ নহে—ইহা প্রবুদ্ধ আত্মার সম্বেগ। অনপেক্ষ সৃষ্টিই তাহার লক্ষণ। সংঘাতে ও প্রতিঘাতে জাতির প্রাণ এই দিকেই ক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছে। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের জন্য চাই জাতীয়াত্মার নবজন্ম।

নিরুপায়, অস্ত্রহীন ভারত জড়ত্বে আস্থাশূন্য না হইয়াও, ঈশ্বরশক্তির আকর্ষণেই শুধু অধ্যাত্মবল আশ্রয় করিয়া জাগিতে চাহিতেছে। এক ঈশ্বর নির্ভরশীল তাপস তাহার কর্ণধার। বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষিবর্গ মুগ্ধ বিস্ময়ে না হউক, সম্ভ্রমে অথবা সংশয়ে আজ তাহার প্রতি স্তব্ধ নিঃশ্বাসে চাহিয়া। ভারত-শক্তির গতি-নিয়ন্ত্রণ আজ বিশ্ব শক্তি-পুঞ্জেরই কেন্দ্র-তম সমস্যা। এইখানেই বিশ্বের জীবন-সংগ্রাম জড় হইতে অধ্যাত্ম পর্য্যায়ে আসিয়া ক্রমে উপনীত। ভারতের অধ্যাত্ম প্রক্ষেপ যুগ-শক্তিরই অভিনব লীলাতরঙ্গ।

ইহা গতির সূচনা মাত্র। ঈশ্বরসিদ্ধ জাগ্রত প্রাণই তাহার সাফল্য ঘোষণা করিতে পারে। নতুবা অর্দ্ধপথে কত অস্ফুট মানবপ্রয়াস সাফল্যের অঞ্চল-প্রান্ত চুম্বন করার পূর্ব্বেই মূর্চ্ছিত ও ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তপস্যারও একটা মোহ আছে। দুঃখ-বরণের যে মহিমা, যে দীপ্তি, যে আকর্ষণ, তাহা ঈশ্বর পথের পথিককে স্বধর্ম্মে বিচলিত করিলে উহা দুঃখেরই হইবে। তরুণ ভারত সাড়া দিবে একমাত্র ঈশ্বরেরই ডাকে, কোনও মানুষের নয়। অন্তহীন তৃপ্তি ও শক্তি—ঈশ্বরেরই আকর্ষণে। এখানে কোনও রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোনও নৈতিক প্রশ্নোত্তরই নাই। ভারতের মূল তত্ত্ব ধর্ম্ম। সে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়, পরন্তু আধ্যাত্ম-যোগধর্ম্ম। সে

যুক্ত চৈতন্যের নাদধ্বনি যেখানেই শ্রুত হউক, তাহা ভারতাত্মারই অনাহত মর্ম্ম-রাগিণী। যতটুকু যোগ, ততটুকু ঈশ্বর-শক্তি আর ততটুকুই জাতীয় জীবনে বস্তুতন্ত্র সাফল্য। এই নিরিখ ধরিয়াই ভারতের জাতিশক্তি অগ্রসর হইলে, কোথাও তার গতিভেদ, প্রবাহরোধ অথবা পরাজয়ও নাই।

ত্রি-তত্ত্ব

যত মত, তত পথ। কিন্তু বহু মতের সমীকরণ আবশ্যক; নতুবা একটা জাতি হয় না, সংহতি হয় না। বহু পথেরও সমাধান চায়; অন্যথায় গতি-ভেদ অনিবার্য্য।

স্ব-মতে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। ইহাই সিদ্ধির উপায়। সাধনায় মতভেদ সাধনবিভ্রাটেরই কারণ হয়। এক পথে চলিতে চলিতে অন্য পথে পাদক্ষেপ মধুলোভী ভ্রমর-ধর্ম্মে অভিজ্ঞতার হেতু হইলেও অমৃত সঞ্চয় করায় না। বহু মত ও পথে বিশ্বাসী সাধক লইয়া যখন সংহতি-ধর্ম্ম গড়ে না, তখন স্ব-স্ব মতে ও পথে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াও কেমন করিয়া অখণ্ড সমষ্টি-জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই সমস্যা চিন্তনীয়।

মতের মূল বিশ্বাস—অন্তরের প্রত্যয়। কে কেমন করিয়া কোথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহা সত্যই রহস্যময়। একের চিন্তাপদ্ধতি অন্যের চিন্তাপদ্ধতির সহিত মিলে না। সিদ্ধান্ত তাই প্রায়শঃ ভিন্ন হয়। ক্বচিৎ বিভিন্ন চিন্তা-প্রণালীর মধ্য দিয়াও একই প্রকার, এমন কি সমসিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যে একেবারেই যায় না, অবশ্য তাহা নহে।

চিন্তাভঙ্গীর ভেদ দৃক্-ভঙ্গীর বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষের আছে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী—ইহাই তাহার মৌলিক স্বকীয়তা। এই বিশেষ ধর্ম্মই জীবের জীবত্ব—তাহার নিজস্ব বৈশেষিকত্ব। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেমন করিয়া সমদৃষ্টি, সম-মন সম্ভব হয়? জীবের জীবধর্ম্মই কি তাহাতে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয় না?

সম-ভাব প্রকৃতির ধর্ম্ম নয়। চিরবৈচিত্র্যই তাহার সম্পদ্। বিভিন্ন গুণ ও কর্ম্মের বিকাশ বিভিন্ন দ্রষ্টৃ-পুরুষের বিশিষ্ট দৃক্-ভঙ্গী আশ্রয় করিয়া। ইহা সাংখ্যমত। বেদান্তে ও গীতায় এই বহু দ্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কূটস্থ অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া পুরুষোত্তমেই কেন্দ্রীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ অসংখ্য দ্রষ্টা পুরুষ একই সর্ব্বদর্শী পরম পুরুষেরই। অসংখ্য দৃষ্টি-কেন্দ্র মাত্র এই তত্ত্ব-বিজ্ঞানে বিশেষ ও সামান্য উভয় ধর্ম্মেরই সমাধান হইয়াছে। এই শাস্ত্রালোকেই সঙ্ঘ বা জাতি-তত্ত্বও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সঙ্ঘত্ব বা জাতীয়তা ইহাতে পায় দার্শনিক প্রতিষ্ঠা। এই ভাবে সঙ্ঘত্ব বা জাতিত্ব হয় কূটস্থ অক্ষর-পুরুষের ন্যায় বহুত্বের আশ্রয়-তত্ত্ব। তাহার মূলে আছেন পুরুষোত্তম।

এই দার্শনিক জ্ঞানের ত্রিপ্রস্থান: প্রথম—বিশেষ-জ্ঞান। ইহা প্রত্যক্ষগোচর। দ্বিতীয়—সামান্য জ্ঞান—ইহা অনুমেয়। তৃতীয়—সামান্য-বিশেষের যে মূল কারণ, উহার জ্ঞান অপরোক্ষানুভবগম্য। প্রত্যক্ষ তুমি, আমি, সে—সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টি, জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতি মানুষ—ইহারাই বিশেষ, ইহারাই ক্ষর-তত্ত্ব। এই তুমি, আমি, সে—বহু ব্যষ্টির সমষ্টিই সামান্য। সে সামান্যের বহু ভাব; ব্যাপ্তিভেদেই এই ভাব-ভেদ। যথা, সংহতি, জাতি, মহাজাতি ইত্যাদি। বিশেষ ও সামান্য—ইহারা পরস্পর আশ্রয়াশ্রিত অথবা অনন্যাশ্রয়ী। প্রতি ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির সাধারণভাবে অবস্থিতি; আবার ব্যক্তির গুণ, কর্ম্ম, চরিত্রের বিকাশে ও উৎসর্গেই সংহতির শ্রী, বিজয়, উন্নতি ও মহিমার প্রকাশ নির্ভর করে। এক হিসাবে, ব্যষ্টি সমষ্টিরই অভিব্যক্তি, যেমন সমুদ্রেরই অভিব্যক্তি তাহার অসংখ্য বীচিমালা। সংহতি বা জাতির অখণ্ড জীবনসূত্রেই সকল উৎসর্গ-সাধকের জীবন-সাধনা—অবধৃত, সম্মিলিত ও সমীকৃত। হিন্দুশাস্ত্রে যে নর ও নারায়ণ তত্ত্ব, তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য্য মনে হয় ইহাই। নর—জীব, ব্যষ্টি মানব। নারায়ণ—সমষ্টি মানব, যাঁহাকে আধুনিক ভাষায় আমরা বিশ্বমানব আখ্যা দিয়া থাকি। সংহতি, জাতি, মহাজাতি—এই সব ব্যাপ্তি-ভেদে ঐ সমষ্টি মানব বা নারায়ণ-তত্ত্বেরই বিভিন্ন পর্য্যায়। নরোত্তম—পুরুষোত্তম-তত্ত্বেরই অনুবাদ বা বিগ্রহ মূর্ত্তি।

সঙ্ঘ-জীবনে অথবা জাতি-জীবনে যে বহু দৃষ্টি ও চরিত্র, বহু মত ও পথের সমাবেশ দেখা যায়, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব বিশিষ্ট ধর্ম্মে অবিচল নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াও যদি সমষ্টি-পুরুষ বা নারায়ণী শক্তির আবিষ্কার আপনার মধ্যে করিতে পারে, সেই সাধারণ তত্ত্বেই ব্যষ্টি-সাধনার সাধ্য, সাধন-বীর্য্য ও সাধন-কর্তৃত্ব নিঃশেষে উজাড় করিয়া উৎসর্গ করে, তবেই হয় সঙ্ঘশক্তি লাভ—জাতি-শক্তির অভ্যুদয়ও এইরূপেই সংসিদ্ধ হয়। উৎসর্গেই সমত্ব অর্থাৎ সমান আকৃতি, হৃদয় ও মন, অন্তর্ম্মুখী জীবন-সাম্যলাভ হয়। সেই উৎসর্গীকৃত সমষ্টি বীর্য্যই সঙ্ঘের সঙ্ঘত্ব, জাতীর জাতীয়তা।

খৃষ্টান যখন 'God the father', 'God, the son' ও 'God the Holy Ghost'-এর কথা বলেন অথবা বৌদ্ধ উচ্চারণ করেন—'বুদ্ধং-ধর্ম্মং-সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, এই মন্ত্র—তখন এই একই ত্রিতত্ত্বের কথাই সম্ভবতঃ তাঁহারা চিন্তা করেন—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই উপাস্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে ঐ একই ত্রিশক্তিই। খৃষ্টধর্ম্মীর পিতা ঈশ্বর, আর্য্য হিন্দুর ইনিই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। নরোত্তম কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা খৃষ্ট যিনি ঈশ্বর-পুত্র (son of God) প্রভৃতি সেই সর্ব্বোত্তম পর তত্ত্বেরই অবতার বা বিভূতি। তেমনি Holy Ghost-ই নারায়ণী মাতৃশক্তি—ইনিই সঙ্ঘবীর্য্য বা জাতিশক্তি। আর God the son-ই মানব পুত্র খৃষ্ট (Christ, the son of man), হিন্দুভারতের ইনিই নর-তত্ত্ব—দার্শনিক ভাষায় জীব বা Individual Man। নারায়ণই দার্শনিকের Universal consciousness; আর নরোত্তম-তত্ত্বই Transcendental. উদীয়মান জাতি এই ত্রি-তত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া সঙ্ঘ, জাতি, মানবতার সেবায় আপনাকে উৎসর্গ ও ইষ্টস্বরূপ পরমেশ্বরেই আপনার পরিপূর্ণ পূর্ণতার আবিষ্কারে একান্ত স্বরূপনিষ্ঠ হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

অর্থ-সৃষ্টি

ব্যক্তির ন্যায়, সমষ্টিরও চাই অর্থসিদ্ধি। কর্ম্মের ইহা প্রাথমিক কিন্তু অপরিহার্য্য উপকরণ। সে কর্ম্ম জীবিকার জন্য চাকুরী, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কিম্বা মিশনের সেবা, শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার যাহাই হউক, উহার অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন অর্থের, প্রচুর অর্থের। অর্থ ধনশক্তি, ঐশ্বর্য্য। শিল্প-বাণিজ্যের জন্য চাই অর্থ। শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য—স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠীর জন্য চাই—অর্থ। ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চাই অর্থ। এই অর্থ কেন আসিবে—কোথা হইতে আসিবে অথবা কেমন করিয়া আসিবে, তাহাই বিচার্য্য।

প্রথম টাকার জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই টাকা—এই একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে। সিংহগ্রীব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দই সম্ভবতঃ এই কথাটা ব্যবহার করার পর, কথাটা খুবই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খাঁটি মানুষ যদি কিছু করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ও যোগ্যতা লইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার কখনই অর্থাভাবে কাজ আটকায় না—ইহাই বুঝি কথাটার নির্গলিতার্থ। এই কথাটাই চিন্তনীয়।

প্রথমতঃ, অভাব থাকিলেই টাকা আসিবে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কেহ ভাগ্যগুণে না চাহিয়াও, বিপুল অর্থ পায়; কেহ দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রম করিয়াও, দুই বেলা দুই মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বুভুক্ষু পোষ্যবর্গের ক্ষুধার অন্ন, প্রয়োজনীয় লজ্জাবস্ত্র যোগাইতে পারে না। এখানে চাহিদা ও পূরণের যে প্রাকৃতিক বিধান, তাহা যেন থই পায় না। তবে অভাব-পূরণের ঠিক নিয়ম কি? অব্যর্থ উপায় কিছু আছে কিনা?

অভাব নেতি-মূলক শব্দবাচ্য হইলেও, বস্তুতঃ বড়ই বাস্তব, কঠোর, জাজ্জ্বল্যমান সত্য। ক্ষুধার অন্ন সম্মুখে বস্তুরূপে না পাইলেও, বুভুক্ষার অন্ত্রপীড়ন কি 'নেতি' বলিয়া উপেক্ষা করা চলে? এমনই সকল অভাবই—দেহের বা মনের প্রয়োজন, তাহার কোনটাই নগণ্য নহে। শরীর ও মনকে নিপীড়িত করিয়াই তাহারা আপনাকে জানাইয়া দেয়। তাহাদের প্রত্যেকটাই চিন্তার চেয়ে সত্য, কল্পনার চেয়ে মুখর—তাহারা প্রকৃতিরই নিজস্ব প্রেরণা।

এই প্রেরণার সর্ব্বত্র পূরণ হয় না কেন? প্রকৃতি নিজে একদিকে যাহা চায়, তাহা অন্য দিকে আবার সহজে দিতে চায় না। অভাব পূরণ করিতে প্রকৃতির দান অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্তমুখী হইয়া কাড়িয়া লইতেই হয়। যাহার কাড়িবার শক্তি বেশী, সে হয়ত বেশী পায়। জোর যার, মুল্লুক তার—ইহাই কি তবে প্রকৃতির স্বাভাবিক সাধারণ নিয়ম?

শক্তি চাই—প্রকৃতির ইঙ্গিত ইহাই। সে শক্তি—দেহের হউক, বুদ্ধির হউক। আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টি-রূপেও শক্তির ভেদ-বিচার আছে। আসল কথা, শক্তির প্রয়োগ না করিলে, শক্তির প্রতিক্রিয়াও জাগে না; অভাবের তাড়ণায় আদায়ের যোগ্যতা উদ্যত করিতে না পারিলে, অভাবের পূরণও কদাপি হয় না। ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিতে হয় কঠোরনিষ্ঠায় ও তপস্যায়; ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া লক্ষ মুদ্রার স্বপ্ন অর্থহীন দুঃস্বপ্নই। পুরুষকার-হীন ব্যক্তির হস্তে যদি কোথাও দৈবাৎ অর্থমুষ্টি দেখা যায়, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম অথবা তাহার পিছনে অন্য সূক্ষ্মতর নিয়মের ব্যাখ্যা অন্বেষণীয়। কিন্তু সাধারণ প্রাকৃত নিয়ম—শক্তির প্রয়োগ ও অভাবপূরণ।

শক্তির প্রসাদরূপেই তবে আমরা অর্থকে পাইতে পারি ও এই ভাবেই অর্থ বরণীয়। শক্তির জাগরণ—দেহ ও মনের বিধিনিষ্ঠ শ্রমে ও তপস্যায়। শক্তি-সাধনা অভাবাত্মক নয়, পূরণাত্মক। ভিতরে একটা ভরাট, পূর্ণ, স্বস্থ বস্তুর সন্ধান না পাইলে, এই শক্তি-সাধনার সূত্রও ঠিক ধরা পড়ে না। সেই পূর্ণবস্তুই—অন্তর্য্যামী ঈশ্বর-বীর্য্য। অর্থের সাধনার ভিত্তিরূপে তাই পরমার্থের সাধন চাই। সমুদায় কর্ম্মশক্তির মূল উৎস এইখানেই।

ঈশ্বর-নিষ্ঠ তপস্যার বিধি ও আচরণ প্রাণের জড়তা-সূত্র খুলিয়া দিবেই। জড়তামুক্ত প্রাণই নিরলস শ্রম দিবার অধিকারী। শ্রমশক্তি সুনির্দ্দিষ্ট, ধারাবাহিক ও অকুণ্ঠ কর্ম্মপরায়ণ হইলে, ক্রমে একটা স্বচ্ছ-শুদ্ধ জীবন-ধারা সাধকের সম্মুখে প্রসারিত হয়। এই জীবন-ধারাই বহিয়া আনে বাহিরে সুযোগ ও সহায়, অন্তরেও বর্দ্ধমান আত্মপ্রত্যয়ের সহিত ক্রম-স্ফুরিত অব্যর্থ বিজ্ঞান ও কর্ম্ম-কৌশল। সৃষ্টিধর্ম্মী সমষ্টি-সাধকের তো কথাই নাই, সাধারণ গৃহস্থ-সাধকও স্ব-স্ব দৃষ্টির পরিধি-মধ্যে এইভাবে আত্মশক্তির স্ফুরণ করিয়া, স্বকীয় পারিবারিক অভাব-মোচন বা অন্যান্য সকল প্রয়োজনপূরণেরই সুযোগ, ক্ষেত্র ও অবস্থা সবই সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। প্রাণশক্তি বিশুদ্ধ হইলেই, সৃজন-বীর্য্যও জাগ্রত হয়। সৃজনীশক্তি-বোধনের আর কোনও দ্বিতীয় সুপথ নাই।

সমষ্টির জীবনে অর্থের তপস্যা একান্ত সৃষ্টিমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দয়ার দান লইয়া যে সংহতি, তাহার আয়ুঃ যত দীর্ঘ হউক, উহা যে জাতির বাঁচিবার আয়োজন নহে, ইহা অবধারিত। অর্থ সৃষ্টি করিয়াই যে সংহতি গড়ে, তাহাই পায় মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সেই সংহতিই মরা জাতিকে দিতে পারে নূতন প্রাণ, জাগরণের বিদ্যুদ্বীর্য্য। সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টিপ্রাণ হইবে সৃষ্টিশক্তিধর নিপুণ জীবন-শিল্পী। সমষ্টির শ্রী, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য সমষ্টি প্রাণের নির্ম্মল দ্যোতনা লইয়াই বাহিরে ফুটিয়া উঠে; এই মূল-প্রাণে একাত্ম হইতে পারিলে, প্রতি ব্যষ্টি-মানুষও হইতে পারে সেই সৃষ্টিবীর্য্যের অধিকারী, তাহারই প্রবহনের বিশুদ্ধ প্রণালী। সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত সাধনায় এইটুকুই যাহা কিছু পার্থক্য। প্রত্যেকেরই চাই শক্তির অনুভূতি, পূরণাত্মক ভাব, স্বচ্ছ জড়তামুক্ত জাগ্রত প্রাণ। সেই উদ্যত প্রাণের লক্ষ্য বা প্রয়োজন স্পষ্ট হইলেই, তাহার কর্ম্মবিজ্ঞানও আপনি স্পষ্ট হইবে। সংহতি-সাধকের প্রথম লক্ষ্য—সমষ্টির যে বিরাট্ প্রয়োজন, তাহার কোন বিশেষ অংশ বা ধারা তাহার মধ্য দিয়া সিদ্ধ হইতে চায়, উহারই নিরূপণ। এই বিশেষ সৃষ্টিই তাহার তপস্যার লক্ষ্য। লক্ষ্য স্থির হইলে, প্রাণশক্তি অটুট, অখণ্ড ও নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গধারায় চালিয়া সেই মুখে অগ্রসর হইলেই কর্ম্মসৃষ্টি হইবে—কর্ম্মের সহিত কর্ম্মের প্রধান উপকরণ-স্বরূপ মানুষ ও অর্থ অর্থাৎ জনবল ও ধনবল, দুইই অনিবার্য্যক্রমে আসিবে—ইহা যৌগিক নিয়মেরই আকর্ষণ।

মহাত্মাজী : যেমনটি দেখিয়াছি

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিখ্যাত দাণ্ডী মার্চ্চে যোগ দিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমরা ছিলাম মাত্র দুইজন বাঙালী। ইহার বিষদ বিবরণ আমি সেই সময়েই বিচিত্রা ও প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি। প্রায় এক যুগের কথা। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনার যে বিশেষ চিত্রটি আজও আমার মনে সুস্পষ্ট ও সজীব হইয়া আছে তাহাই এখানে বলিতেছি।

৫ই এপ্রিল, (১৯৩০) ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার তীর্থভূমি দাণ্ডীতে সদলবলে মহাত্মাজী পৌছিলেন। আমি শান্তিনিকেতন হইতে সোজা দাণ্ডীতে গিয়া দলে ভিড়িলাম। সম্মুখে উন্মুক্ত সমুদ্র। বারিধিবেলায় তাঁবু পড়িয়াছে। একটু বিশ্রামান্তে মহাত্মাজীকে কেন্দ্র করিয়া আমরা উপাসনা করিলাম। একদিকে সাগরের চঞ্চল ঢেউ অবিরাম পাড়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে, অপর দিকে হিমালয়ের মত প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে মহাত্মাজী ধ্যানমগ্ন। মুগ্ধ হইলাম। অবাধ মুক্ত ময়দানে গভীর নিদ্রাসুখ সকল পথ-শ্রম দূর করিল।

পরদিন সূর্য্য অনুদয়েই শয্যা ত্যাগ করিলাম। তারপর উপাসনা। সারা দিনটার কঠোরতম চেহারা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দিবারম্ভেই আইন অমান্য করিয়া লবণ তৈয়ারী সুরু হইবে। মুক্ত প্রাঙ্গনে মহাত্মাজী তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন। মন্ত্রের উদ্গান উঠিল। সমবেত কণ্ঠের স্তবপাঠ শ্রবণে মধু বর্ষণ করিল। আমি নির্নিমেষ নয়নে মহাত্মাজীর প্রতি চাহিয়া রহিলাম। এত বড় আসন্ন গুরু অগ্নিপরীক্ষার সমগ্র দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়াও মানুষ যে এমন ধীর-স্থির-অচলপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। সমগ্র আবহাওয়া একটা অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম ভাবে ভরপুর হইয়া উঠিল। আকাশ-

বাতাসে এতটুকু উত্তেজনা-চাঞ্চল্য কোথাও নাই। মহাত্মাজী শরীর দিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করেন না—করেন আত্মার দ্বারা, এ কথা সেই দিন সেই শুভমুহূর্ত্তে আমার কাছে দিনের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সন্দিগ্ধ অন্তর-মন নিঃশংসয় নির্ভীক হইল।

সমগ্র কর্ম্মই মহাত্মার ছন্দোবদ্ধ। সামান্য বিষয়েও এতটুকু বিশৃঙ্খলা হইবার জো নাই। উপাসনা হইতে উঠিয়াই তিনি সমস্ত কর্ম্মভার বণ্টন করিয়া দিলেন। অগণিত নরনারী রথ-যাত্রার ভীড় লাগাইয়াছে। দেশ-বিদেশের রিপোর্টার, ভারতের সমগ্র প্রদেশাগত দর্শকবৃন্দ মহাত্মার এই অভিনব আন্দোলনের সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত। তিনি সকলকেই দূরে থাকিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। দূরে-অদূরে পুলিস ও মিলিটারী ক্যাম্প।

তারপরেই মহাত্মাজী তাঁর নির্দ্দিষ্ট বিরাশী জনের সৈন্যবাহিনী লইয়া সমুদ্র-স্নানে চলিলেন। এক টুক্‌রো কৌপিন মাত্র পরিয়া তিনিই প্রথমে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আমরা অনুগামী হইলাম। বালকের মত তিনি সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি সুরু করিয়া দিলেন। সাগর-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁর এই শিশুসুলভ চপলতা দেখিয়া মনে হইল, এই মানুষ কি করিয়া সংগ্রাম চালনা করিবেন!

পাড়ে উঠিয়া তিনি মুহূর্ত্তে গম্ভীর কঠিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটুখানি স্তব্ধ হইলেন, তারপরই লবণাক্ত একটু মাটি তুলিয়া লইয়া আমাদের লবণ তৈরীর আদেশ দিলেন। সে ছিল ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০।

মধ্যাহ্ন গড়াইয়া গিয়াছে। মহাত্মার ক্যাম্পের অদূরে বসিয়া আমি ক্লান্তি বিনোদন করিতেছি এমনি সময়ে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক আমায় ইঙ্গিত করিলেন যে, মহাত্মাজী আমাকে ডাকিতেছেন। আমি নূতন আসিয়াছি। মহাত্মার সঙ্গে আমার পূর্ব্বে তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই; যদিও শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। ভাবিলাম, কোন অপরাধ করি নাই তো? নেতার আহ্বান, কাঁপিতে কাঁপিতে চলিলাম। মহাত্মাজী নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই স্মিতহাস্যে অভিনন্দন জানাইলেন। অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য সে হাসি! সমগ্র শরীর-মন শীতল হইয়া গেল। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। মহাত্মাজী মৌন। তাঁর অত্যুজ্জ্বল আঁখির অন্তর্ভেদি দৃষ্টি আমায় অভিসিক্ত আর অভিভূত করিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ চিত্ত-মন বিগলিত হইল। আমার যেন প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই; মৌন-নীরবতার মধ্যেই অন্তর বিনিময় হইল। উঠিবার সময়ে তিনি আমার হাতে এক টুক্‌রো কাগজ দিলেন। হিন্দুস্থানী লেখা, কিছুই বুঝিলাম না। ফিরিবার পথে বার বার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ কি রকম অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ! এত বড় কাণ্ড চলিয়াছে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া, অথচ মানুষটির মুখে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন নাই, যেন কোন কিছুই ঘটে নাই। আশ্চর্য্য রকম নির্ব্বিকার মহাত্মাজী! ভাবিলাম, হয়তো মহাত্মা কোন কার্য্যের ভার দিয়াছেন। তাই শ্লিপখানা লইয়া আমাদের ক্যাপ্টেন ছগনলাল যোশীর হাতে দিলাম। তিনি শ্লিপখানিতে চোখ বুলাইয়াই হাসিয়া ফেলিলেন। ফেরত দিয়া বলিলেন, এ তোমার আশীর্ব্বাদ।*

* মহাত্মাজীর শ্লিপের বঙ্গানুবাদ এইরূপ: "ভাই অক্ষয়বাবু, তোমায় পবিত্রতা ও সরলতা আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি। আমার ইচ্ছা এখানে আরও দুই তিন দিন থাকিবার পরে সবরমতীতে এক পক্ষ কাল কাটাইয়া বাংলায় সতীশবাবুর সঙ্গে কাজ কর। মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ৬।৪।৩০"।

মহাত্মাজীর স্বহস্তলিখিত এই পত্রখানি বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতনের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। লেখক—

যুগমানব মহাত্মাজী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

অন্যায় অসত্য দ্বন্দ্বে বিক্ষোভিছে নিখিল মানব
জঘন্য জিঘাংসা-বৃত্তি কুৎসিতের করিছে সৃজন,
হিংসার কুটিল চক্রে মানুষেরা হয়েছে দানব
অস্থির বিক্ষুব্ধ প্রাণে মানবত্ব দিয়া বিসর্জ্জন।

হে যুগ-যাজ্ঞিক, বিভ্রান্তের এই মৃত্যু-অভিযানে
তোমার মুক্তির বাণী অমৃতের দিল পরশন,
...তার প্রেরণা দিল জরাজীর্ণ কঙ্কালের প্রাণে
বিভ্রান্ত বিশ্বের বক্ষে কল্যাণের করি আবাহন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশধর দত্ত, এম. এ. ; পি.এইচ্. ডি.

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। প্রত্যেক বিষয়েই একটা মত ব্যক্ত করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, এমন কি ধর্ম্ম বললেই হয়। কিন্তু অধিকাংশ মতের পিছনেই অভিজ্ঞতা নেই বলে তার মূল্যও কম। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে মতবাদের অধিকাংশই এইরূপ। যাঁরা চিরকাল ভারতীয় classical সঙ্গীতই শুধু চর্চ্চা করে' এসেছেন তাঁরা, কিংবা যাঁরা মাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতেই আবদ্ধ, এঁদের কেউই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রতিভার প্রকৃত সমঝদার নন—এই আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়েছে, তার অধিকাংশই শুধু সঙ্গীতের ব্যাকরণ নিয়ে। কিন্তু সঙ্গীত হ'ল শিল্প, এবং সব শিল্পই মানুষের ভাবের নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যঞ্জনা। সঙ্গীতে সেই অভিব্যঞ্জনা ধ্বনিতে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। সেই মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, তাঁরাই সঙ্গীতের প্রকৃত রসের সংবাদ পেয়েছেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। মানুষের কোনও সৃষ্টিই এমন নয় যে, নূতনের সঙ্গে পুরাণোর কোনও পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায়ে ভারতীয় classical সঙ্গীতের আব্‌হাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ওস্তাদ যদুভট্ট, মৌলাবক্স প্রভৃতি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী মুখরিত রাখ্‌ত। তা'ছাড়া ছিল শ্রীকণ্ঠ এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ওস্তাদেরা। কিন্তু এ সবকে ছাপিয়ে যিনি উত্তরকালে রবীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রতিভার প্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন, তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর সাধনা ছিল সমান। রবীন্দ্রনাথও সুর-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তখন কলসভরার কাজে ছিলেন ব্যস্ত। কবি নিজের জীবনে বাধ্যতামূলক কোনও বন্ধনকেই স্বীকার করেন নি; সঙ্গীতের ব্যাকরণের পথে তাই তাঁর সাধনা অগ্রসর হ'ল না, হ'ল তার স্বরূপের অভিব্যক্তির পথে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির সঙ্গে যথেষ্টভাবেই পরিচিত ছিলেন, যদিও এই পরিচয়ে আত্মবিসর্জ্জন নেই। ছন্দঃ ও তালের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় অল্প নয়; কিন্তু তিনি তাকে চলার পথে পায়ের বেড়ি হিসাবে গ্রহণ করেন নি, করেছিলেন নূপুর হিসেবে।

অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত পাশ্চাত্য সুরের ও পদ্ধতিরই অনুকরণ। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশ্লেষণ করেন, তবে বুঝতে পারবেন—এ ধারণা কত ভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন, সে কথা অবশ্য সত্য। বিলিতি পুরাণো যুগের "Darling, you are growing old", "Come into the garden, Mand," "Goodbye Sweet heart, Goodbye" প্রভৃতি গান, এবং Tom Moore-এর Irish Melodies তিনি গাইতেন। এখানে স্মরণযোগ্য যে, তাঁর সেকালের লেখা "পুরাণো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়" গানটির সুর তিনি দিয়েছিলেন 'আইরিশ বিনাব্‌ল্'। কিন্তু এ শুধু সুর নিয়ে পরীক্ষা; পরবর্ত্তী যুগ সাক্ষ্য দেয় যে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূল ভাবের সঙ্গে এর কোনও প্রাণের সম্বন্ধ নেই। আমাদের ভুললে চলবে না যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম সঙ্গীতের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং তাতে অসংখ্য রাগ-রাগিণী শুদ্ধ ঠাটে এবং শুদ্ধ তালে বাঁধা। আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ধ্রুপদের অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ, এই চারটি অঙ্গ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত গানেই নিয়েছেন। কবির এ যুগের অনেক গানেও আমরা বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী পাই। যেমন ভৈরবীতে—"তোমায় কিছু দেব বলে' চায় যে আমার মন," ভৈরবে—"পোহালো পোহালো বিভাবরী", ইমনে—"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে", খাম্বাজে—"কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা", বাগেশ্রীতে—"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কোথা থেকে", পূরবীতে—"এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না"—প্রভৃতি। এ ছাড়া বেহাগ, মল্লার, ছায়ানট, সাহানা, সারঙ্গ, সিন্ধু, আসাবরী, কেদারা, কামোদ, বসন্ত, বাহার—প্রভৃতি অসংখ্য রাগ-রাগিণী রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকের আরও ধারণা এই যে, রবীন্দ্রনাথের গানে তালের কোনও স্থান নেই। এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। ছন্দঃ থেকেই তালের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের এমন কোনও গান নেই, যা ছন্দে বাঁধা নয়। শুধু তাই নয়, তিনি নূতন ছন্দঃ, নূতন তালও সৃষ্টি করছেন। কতকগুলি ছন্দঃ হ'ল স্বাভাবিক, এমন কি প্রকৃতিও সেই ছন্দেই কথা কয়। সমস্ত সমপদী ছন্দই এই শ্রেণীর। এর মধ্যে চতুর্ম্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক তাল খুবই স্বাভাবিক; এবং রবীন্দ্রনাথের গানে এরা অবলীলাক্রমেই এসে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি একবার দিনেন্দ্র ঠাকুরকে বলেছিলেন, —"আমি যে গানই বাঁধি তুই বলিস তা' কাশ্মিরী খেম্‌টা।" এর কারণ হ'ল এই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত মূলতঃ চঞ্চল ছন্দেই রচিত। অবশ্য তিনি 'বিদ্যুমালা', 'তোটক' ও 'প্রামাণিকা' ছন্দঃ থেকে উদ্ভূত ত্রিতাল ও দাদরা তালই শুধু গ্রহণ করেন নি, 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' ও 'হরি গীতিকা' থেকে উদ্ভূত বিষমপদী ঝাঁপতাল ও তেওরা তালও তিনি গ্রহণ করেছেন গানে। উদাহরণ হিসাবে—"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো" ঝাঁপতালে এবং "তুই পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্" তেওরায়—উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত গানে—তিনি ঝাঁপতালকে উল্টে 'ঝম্পক' তালের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও একটি নয় মাত্রার বিষমপদী তালের সৃষ্টি করেছেন; "দুয়ার মোর পথ পাশে" গানটি তার উদাহরণ। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের jazz বা waltzও স্বাভাবিক ছন্দঃ; কিন্তু Orchestra সঙ্গীতে ওদের যা রূপ, melody-প্রধান সঙ্গীতে ওদের সে রূপ নয়। কিন্তু ছন্দোবৈচিত্র্যে ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের কাছে jazz বা waltz শিশুমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে রূপ দেবার জন্য কতকগুলি রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। এ মিশ্রণে কোনও দোষ নেই, বরং এই মিশ্রণ প্রতিভা দ্বারাই সম্ভব। ভারতীয় classical সঙ্গীতেও এইরূপ মিশ্রণ চলিত আছে। দুটি রাগিণীর মিশ্রণে উৎপন্ন রাগিণীকে বলা হয় "সালঙ্ক", এবং ততোধিক হ'লে বলা হয় "সঙ্কীর্ণ"। সুতরাং এই মিশ্রণ অশাস্ত্রীয় নয়। অনেক নূতন রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি এই মিশ্রণেই সম্ভব হয়েছে। যেমন, মিঞা-মল্লার, গৌড়-মল্লার, বিলাসখানি-তোড়ী, শ্যাম-কল্যাণ, বসন্ত-বাহার, ইমনি-বিলাব‌ল্ প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে যে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ আমরা পাই, তা' সম্ভব হয়েছে তাঁর প্রতিভা দ্বারা; কবির অন্তরের আবেগ তার আপনার গতিবেগে এই মিশ্রণকে সহজসিদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলেছে। তাঁর "ডাকিল মোরে জাগার সাথী"তে ভৈরবী ও তোড়ীর মিশ্রণ, "আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্যপানে চেয়ে আছে"—এই গানে খাম্বাজ ও সিন্ধুর মিশ্রণ, "ভোরের বেলা কখন এসে পরশ করে' গেছে হেসে"তে ভৈরবী ও জৌনপুরির মিশ্রণ, "দিনগুলি মোর সোণার খাঁচায় রইল না" গানে ইমন ও ভূপালীর মিশ্রণ, "তোমারি ঝরণাতলার নির্জ্জনে"-তে ছায়ানট আর ইমনের মিশ্রণ, "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে" গানে ইমন আর বেহাগের সংমিশ্রণ—এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া তিনি লোক সঙ্গীত থেকেও সুর সংগ্রহ করেছেন। বাউল এবং কীর্ত্তনের সুর তাঁর অনেক গানকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। "আমি স্বপন পারের ডাক শুনেছি", "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে", "এইতো ভাল লোগছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়" প্রভৃতি গানে বাউলের ঢং সহজেই চোখে পড়ে। "কবে তুমি আসবে বলে' রইব না বসে"তে কীর্ত্তনের ব্যাকুলতা সুস্পষ্ট।

কিন্তু এই অসংখ্য রাগ-রাগিণীর মধ্যে কয়েকটি মাত্র কবির অত্যন্ত প্রিয়; কারণ তাঁর সঙ্গীতের মর্ম্মবাণীটির সঙ্গে এই বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীগুলির অন্তর্নিহিত মূল ভাবের একটি একাত্মবোধ আছে। এই কয়েকটি বিশেষ রাগিণীর মধ্যে ভৈরবী, বেহাগ, মল্লার ও পূরবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভৈরবী রাগিণী শান্তরস প্রধান, এর মধ্যেকার যে গতিবেগ তা' হ'ল আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে। এই আবেগ প্রচ্ছন্ন বেদনার কিংবা প্রশান্ত গভীর আনন্দের হ'তে পারে। "কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে" এই গানটিতে অচঞ্চল গভীর বেদনার আত্মপ্রকাশ যেন ভৈরবীরই আত্মপ্রকাশ। তেমনি মল্লার রাগিণীতে বর্ষনোন্মুখ নিবিড় আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের সঞ্চরণের সঙ্গে অন্তরের একাকিত্বের ও সচেতন প্রতীক্ষার

এমনি একটি মিল আছে যে, যাঁরা "আজ শ্রাবণের নিমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে" "কাঁপিছে দেহলতা থরথর" প্রভৃতি গান শুনেছেন, তাঁরা অনুভব করতে পারবেন। আবার বেহাগ রাগিণীর মর্ম্মকথা হ'ল নিংশব্দ রাত্রির অবসরে মানুষের নিঃসঙ্গ মনের ব্যাকুলতা, জীবনে অসংখ্য বিরোধ ও বিক্ষোভের ভারে ক্লান্ত অবসন্ন অন্তরের একান্ত আত্মসমর্পণ। রবীন্দ্রনাথের "আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে, আসবে যদি শূন্য হাতে" কিংবা "এ পথে আমি যে গেছি বার বার" গান যাঁদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই বুঝবেন—এর সঙ্গে বেহাগ রাগিণীর মূল সুরটি কত একান্তভাবে মিলেছে। পূরবী রাগিণীতে দিনান্তের বিষণ্ণতা, রক্তিম আকাশে দিবালোকের বিদায়ের নীরব সঙ্কেত, এবং সেই সঙ্গে মানুষের সারাদিনের কর্ম্মব্যস্ত মনের একটি ক্ষণিক উদাসীনতা; অথবা প্রায়-সমাগত রাত্রির রহস্যে অস্পষ্ট অন্তরের অরণ্যে চিত্তের অভিসার সুরের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের "এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক্‌না", কিংবা "দিন শেষের রাঙা মুকুল জাগলো চিতে" গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা পূরবীর এই মর্ম্মকথার সঙ্গে পরিচিত।

ভারতীয় classical সঙ্গীতের রাগরাগিণী এক একটি মহীরুহের মত তার অসংখ্য শাখার বিস্তারে পরিব্যাপ্ত, তার পত্র-পল্লবের সমাহারে সজীব, তার ফলপুষ্পের বর্ণ-সুষমায় বিচিত্র; শিকড় তার পৃথিবীর মাটীতে, গতি তার আকাশপথে। মানুষের অন্তরে তার জন্ম, বিশ্বের অন্তরে তার পরিণতি। কিন্তু এই বহু বিচিত্রতার মধ্যেই এক-একটি রাগ বা রাগিণী আপনার বৈশিষ্ট্যে অন্যটি থেকে পৃথক্‌। মানুষের মন থেকে উদ্বেলিত হয়ে ওঠা বাস্তবতা-বিহীন ধ্বনিতে একটি অবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশই হ'ল মার্গ-সঙ্গীতের স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বহুল বিস্তারিত মহীরুহের মত নয়, একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ফুটে ওঠা ফুলের মত। তার প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার স্বকীয়তায়, তার সুগন্ধের আত্মনিবেদনে, তার বর্ণবৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনায়, বাতাসের স্পর্শে, তার মন্থর অঙ্গ-সঞ্চালনে—সে একটি সুস্পষ্ট সম্পূর্ণতা। এই সম্পূর্ণতা হ'ল এমন একটি ভাব, যা' সমস্ত চিত্তকে সেই সময়ের জন্য আকুলিত করে' নিজেকে বাহিরের পৃথিবীতে এনে ফেলে। এক কথায়, বস্তু আর তার আকারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথের গানে ভাব ও কথার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। Emotion-কে আশ্রয় করে' সেই ভাব জেগে ওঠে, সুরের মধ্যে পায় গতি আর কথার মধ্যে পায় রূপ। রূপ ও রস আত্মগত সংস্কারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, অথচ আত্মগত হ'লেও এই ভাব ব্যক্তিগত নয়, সকল মানুষেরই অন্তরের বাণী। সঙ্গীত ব'লে নয়, সমস্ত শিল্পের গোড়ার কথাই হ'ল এই।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে অংশ melody-প্রধান, তার রসও এই প্রকার আত্মগত; তবে ভাবের মধ্যে অসীম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার তেমন ইঙ্গিত নেই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে interpretation বা ভাব-বিশ্লেষণের স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এই interpretationই সঙ্গীতে রূপসৃষ্টি করে। রবীন্দ্র সঙ্গীতে কবিতার কথাই সেই রূপের বাহন। সঙ্গীতে বাণী চিত্র হ'য়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে, কিন্তু এই রকম imagery পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শুধু কথার দ্বারা ফুটে ওঠে না, তাকে ফোটাতে হ'লে ব্যাখ্যা চাই। সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি উপকূলে এসে আছড়ে পড়ছে, পিছনের অরণ্য ব্যাকুল ক্রন্দনে গুমরে উঠছে, দূরে পথের পাশে রাশি রাশি ড্যাফোডিল্‌ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে, আর অন্তরে উঠছে কলরোল—এই সমস্তই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রকাশ পায়—বেহালার ছড়িতে পঞ্চম-নিখাদ-খরজকে কেন্দ্র ক'রে সমুদ্র তরঙ্গের ছল্‌ছলাৎ শব্দ, বাঁশীতে রেখাবকে আশ্রয় ক'রে অরণ্যের আকুলতা, ড্রামে আর পিয়ানোয় ড্যাফোডিলের আবেগ, এবং গিটারে ধৈবত কম্পন তুলে অন্তরের কলোরোল। এই সমস্তকে মিলিয়ে একটি অপরূপ সঙ্গতি, একটি harmony গড়ে উঠে—এক নিঃশব্দ রাত্রে সমুদ্রের তীরে উপবিষ্টা একটি নারীর জীবনে প্রেমের সাধনায় ব্যর্থতার কথাই প্রকাশিত করে। এই হ'ল interpretation বা সঙ্গীতের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের গানে যদি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোনও প্রভাব থাকে, তবে তা' এই যে, তিনিও কথা, সুর ও ছন্দের সঙ্গতির মধ্য দিয়ে একটি বিশিষ্ট ভাবকে রসঘন ক'রে তুলতে চেয়েছেন। সেইজন্য সেই ভাবটিকে নিজের ক'রে না নিতে পারলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ঠিক

মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এইখানে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত নানাপ্রকার যন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে যে ভাবটিকে আকার দেয়, রবীন্দ্রনাথ শুধু কণ্ঠের বাণী দিয়ে তাকে—মূর্ত্তি দেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যসঙ্গীতের এই ভাব শুধু মানুষের পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা আনন্দের, তা' সীমাকে সম্পূর্ণ ভেবে দেহ-মনের গণ্ডীর ভেতরেই আবদ্ধ; কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব সীমার প্রাকার ভেঙ্গে অসীমেও গিয়ে পড়ে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকে অতিক্রম ক'রে ইন্দ্রিয়াতীতের পানেও তার যাত্রা। এর কারণ—mystic বা মরমী কবিদের কাছে চোখের দেখা জগৎ খুবই ছোট, সেইজন্য মনের দেখা জগতে তাঁদের গতিবিধি।

শেষে এই কথাই বল্‌তে চাই যে, সাহিত্য, কাব্য, রূপশিল্প-সাধনার মতই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সাধনার মূল কথাও হ'ল এই যে, ভাবের সাধনায় তিনি বস্তুকে পরিত্যাগ করেন নি, বস্তুর মধ্য দিয়েই তিনি বস্তুকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেই কবির সঙ্গীতের জগৎ শেষ হ'য়ে যায় নি, ইন্দ্রিয়াতীত একটি পরম ঐক্যের উপলব্ধিতে কবি-মানস অকুণ্ঠিত বিস্ময়াবেগে সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পঞ্চ-পাণ্ডবের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ

বৈশম্পায়ন উবাচ :—

''পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ॥
পঞ্চদশাব্দো ভীমস্তু চতুর্দ্দশাব্দো ধনঞ্জয়ঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষট্ চ মাসাঞ্জতুগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দান্ তথৈকঞ্চ বনমুদ্যূতনির্জিতাঃ॥
ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজ্যং সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়্ভির্মহাত্মানঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য ইষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাপি আয়ুরষ্টোত্তরং শতম্॥''(১)

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে কহিতেছেন :—

"হে কুরু-কুল-গৌরব মহারাজ জনমেজয়! পাণ্ডব-গণের জীবিত-কাল শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির ষোড়শ-বর্ষ বয়সে, ভীম পঞ্চদশ-বর্ষ বয়সে, অর্জ্জুন চতুর্দ্দশ-বর্ষ বয়সে, এবং নকুল ও সহদেব ত্রয়োদশ-বর্ষ বয়সে (শতশৃঙ্গ-পর্ব্বত হইতে) হস্তিনা-পুরে গমন করেন। সে স্থানে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত ত্রয়োদশ বর্ষ বাস করিয়া জতুগৃহে গমন করেন এবং এই জতুগৃহে ছয় মাস কাল বসতি করিয়া এই স্থান হইতে বহির্গত হন। তৎপরে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। তদনন্তর তাঁহারা একচক্রা-নগরীতে ছয় মাস, দ্রুপদ-রাজের গৃহে এক বৎসর, এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত হস্তিনায় পাঁচ বৎসর বাস করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া তেইস বৎসর অবস্থিতি করেন। সে স্থান হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির পাশা-খেলায় পরাজিত হইলে তাঁহারা কাম্যক ও দ্বৈত-বনে দ্বাদশ বৎসর বসতি এবং বিরাট-ভবনে এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস করেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং তৎপরে পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণে অচলা ভক্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন। হস্তিনাপুর হইতে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে যুধিষ্ঠিরের ছয় মাস লাগিয়াছিল। উক্ত সময়গুলি যোগ করিলে দেখা যায় যে, স্বর্গারোহণ-কালে যুধিষ্ঠিরের বয়ঃক্রম ১০৮ বৎসর ৬ মাস হইয়াছিল।"

(১) পি-পি এস্ শাস্ত্রী বি, এ, (অক্সন্) সম্পাদিত মান্দ্রাজ-সংস্করণ "মহাভারত" হইতে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল। বর্দ্ধমান-রাজবাটী-সংস্করণ, এসিয়াটিক-সোসাইটী-সংস্করণ ও বঙ্গবাসি-সংস্করণ "সংস্কৃত মহাভারতে" উক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় দাক্ষিণাত্যের লোক। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রচলিত "মহাভারত" হইতেই তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্লোকগুলি অতি সুন্দর। পঞ্চ-পাণ্ডবের জন্ম হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মৎ-সম্পাদিত "সটীক সচিত্র ও বিশুদ্ধ অষ্টাদশ-পর্ব্ব কাশীরামদাস-মহাভারত", দ্বিতীয়-খণ্ড, ১৫৪২ পৃষ্ঠা দেখুন।

সাত রাজার ধন

শ্রীঅবনী রায়

গোপালের মাথায় চিরুণি চালাইতে চালাইতে অসমাপ্ত গল্পের সূত্র ধরিয়া স্বরমা বলিয়া চলিল,—

রাজকন্যা তখন অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছিল ; রাজপুত্র পাশে দাঁড়িয়ে।

রাজপুত্র অতি সন্তর্পণে তার সর্ব্বাঙ্গে সোণার কাঠি বুলিয়ে দিলে, অমনি রাজকুমারীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। নিদ্রালু নয়নের অলস জড়িমা কাটিয়ে রাজকন্যা তখন চোখ চাইলে। দেখলে, রাজ্যের রূপ-সৌন্দর্য্য গায়ে মেখে রাজকুমার দাঁড়িয়ে। চোখে তার পৃথিবীর রূপ বদ্‌লে গেল। আকাশের নীলিমা, চাঁদের মধুরিমা, ফুলের গন্ধ, পাখীর কলতান—সব মিলে রাজকুমারীর চোখে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করল। রাজকুমারী অভিভূতা হ'ল।

রাজকুমার তখন মধুর কণ্ঠে কথা কইলে, বল্‌ল,—রাজকুমারি ! আমি এসেছি।

রাজকুমারী জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি ?

রাজকুমার জবাব দিলে—আমি স্বপনপুরীর রাজপুত্র।

রাজকুমারীর বিস্ময়ের অবধি নাই ; বল্‌লে—অ্যাঁ, স্বপনপুরীর রাজপুত্র তুমি ? আমার ঘরে ? কিন্তু কেন এলে ? ঘুমিয়ে ছিলুম, ঘুমিয়েই থাকতুম। এমন অসময়ে এমনি অনাহুতের মত কেন তুমি আমার শান্তি নষ্ট করতে এলে ? এলেই যদি, এত রূপ নিয়ে এলে কেন ?

শান্ত কোমল কণ্ঠে রাজকুমার বল্‌লে—শোনো রাজকন্যা, যে-দিন দূতের মুখে তোমার রূপগুণের সংবাদ পাই, সে-দিন থেকে তুমি আমার স্বপ্নের রাণী। শুধু তোমার জন্যেই এত দূর এসেছি।

রাজকুমারী তা' বিশ্বাস করতে পারল না ; বল্লে—সত্যি বল্‌চ ? স্বপনপুরীর রাজপুত্র তুমি, তুমি এত বড় রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর, তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তুমি রূপবান্। তোমায় আমি পাব, এত বড় ভাগ্যি আমার হ'বে ?

রাজকুমার হাসি মুখে জবাব দিলে, তোমায় পেলে আমি ধন্য।

রাজ্যিময় ঢক্কা প'ড়ে গেলো, রাজকুমারীর বিয়ে হ'বে স্বপনপুরীর রাজপুত্রের সঙ্গে। রাণীর আহ্লাদের সীমা নাই। রাজার মনে তখনও অবিশ্বাস, সত্যি কি এমন ভাগ্যি তাঁর হ'বে ?

কিন্তু সে ভাগ্যি তাঁর হ'ল। রাজকুমার সত্য সত্যই এক শুভ লগ্নে সোণার টোপর মাথায় দিয়ে, সোণার রথে চড়ে বহু লোকলস্কর পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে আজব পুরীতে এসে উপস্থিত। বিবিধ বাদ্যভাণ্ড, নাচগান, আনন্দোজ্জ্বল, খাওয়ানো-দাওয়ানোর আড়ম্বরের মধ্যে কি ক'রে যে কয়দিন কাটলো, কারু হুঁস নেই।

বহু মূল্য মণি মুক্তা হীরা-জহরতের অলঙ্কার গায়ে জড়িয়ে রাজকন্যা যখন বরণ ডালা হাতে নিয়ে রাজপুত্রের পাশে এসে দাঁড়ালো, তখন উপস্থিত সকলে বলাবলি করলে—আহা, দু'টিতে মানিয়েছে বেশ, জোড়মাণিক—যেন বিদ্যুতের সঙ্গে চাঁদের মিলন।

তারপর বিদায়ের পালা। সখিরা হিংসা করল, বল্‌ল, রাজকুমারি, তোর ভাগ্যি ভাল, এমন রত্ন তুই পেলি। কিন্তু আমাদের অনুরোধ, আর যা-ই করিস্ সখি, স্বামী-সৌভাগ্যে অন্ধ হোয়ে তোর এ-সব পুরোনো বান্ধবীদের ভুলে থাকিস্‌নে যেন।

মা বল্‌লেন—যে ধন তুমি পেলে মা, তার জন্যে নারীদের যুগ যুগ তপস্যা কত্তে হয়।

বাবা বল্‌লেন—এ রত্ন যে তোমার জন্য আমি পাবো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি, তাকে সুখী করো।

তারপর স্বামীগৃহে—

মহারাজের আর আনন্দ ধরে না ; বল্‌লেন—বৌ তো নয়, লক্ষ্মী প্রতিমা !

রাণীমা উত্তরে বল্‌লেন—সোণার চাঁদ।

আহা, রাজকুমারীর সে কি সুখের দিন ! স্বামীর সোহাগ, শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর-আপ্যায়ন, দেবর-ননদাদির শ্রদ্ধা-ভক্তি, সাত মহলা বাড়ী, কুসুমিত কুঞ্জবন, পদ্মদীঘি, তার অভাব কিসের ?

একটানা আনন্দোল্লাস, আদর-আপ্যায়ণের ভিতরে কি ক'রে যে তার দিনগুলি যেতে লাগ্‌লো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারপাঁচ বছর কেটে গেলো। ইতিমধ্যে রাজকুমারীর আদর-সোহাগ শতগুণ বেড়ে গেছে। তার এক ছেলে হয়েছে। আহা, ছেলে তো নয়, হীরের টুকরো! যে দেখে সে-ই বলে, রাজপুত্রের যোগ্যি চেহারাই বটে! যেমনি রূপ, তেমনি গঠন। রাজকুমারী রত্নগর্ভা।

গোপাল এতক্ষণ নির্ণিমেষে বামুনদির মুখপানে তাকাইয়া নিঃশব্দে তার গল্প শুনিতেছিল। এমনি তার বলিবার ভঙ্গী। এবার সে কথা কহিল, তাহার অভিমানে ঘা লাগিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিল,—আমার চেয়েও সুন্দর?

হাসিমুখে চুমো খাইয়া সুরমা গোপালকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—না, ঠিক তোমারই মত,—এই মুখ, এই চোখ।

গোপাল খুব খুসী হইল, বলিল,—আমি খুব সুন্দর, না, বামুনদিদি?

গোপালের চাঁদমুখে চুমো খাইয়া সুরমা আবার বলিল,—হাঁ, খুব সুন্দর, সাতরাজার ধন এক মাণিক তুমি।

গোপাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—তারপর?

—তারপর আর না-ই শুন্‌লে গোপাল; আজ এই থাক্।

গোপাল জেদ ধরিল, বলিল,—না, না, সে হ'বে না, সে হ'বে না, রোজই আর নয়, এই থাক্, সে হ'বে না। আজ বল্‌তেই হ'বে শেষ পর্য্যন্ত।

সুরমা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিতে পারিল না। পুঞ্জীভূত বেদনারাশি কথার সূত্র ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল; বলিল, কিন্তু অতি ভাল কারো সয় না, গোপাল! রাজকুমারীরও সইলো না। এবার তার কপাল ভাঙ্‌লো।

গোপাল সুরমার মুখপানে চাহিল; দেখিল,—তার চোখে জল। সে বিস্মিত হইল; বলিল,—একি? বামুনদি, কাঁদ্‌ছো?

চোখের জল মুছিয়া সুরমা বলিল,—রাজকুমারীর দুঃখে বুক ফেটে যায়, গোপাল! এত আদর-আপ্যায়ণ, সোহাগ-সম্ভ্রম,—এবার তার সব গেলো। হঠাৎ ওলাওঠায় রাজপুত্র মারা গেলো।

এক ফোঁটা গোপাল। গল্পের রাজকুমারের মরা-বাঁচায় কার কি যায় আসে, গোপাল তার কি বোঝে! কিন্তু গল্প বলিবার সময় বামুনদিদির এই সৃষ্টিছাড়া চোখের জল দেখিয়া সে-ও বিচলিত না হইয়া পারিল না। বলিল,—মরে গেলো! রাজকুমার মরে গেলো! তারপর রাজকুমারীর কি হ'ল বামুনদি?

—তা' বল্‌তেই তো বসেছি গোপাল! এত আদর সোহাগের বিনিময়ে অশেষ লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করবার জন্যে হতভাগিনী তখনো বেঁচে রইলো, নইলে আজ এই গল্প বল্‌তাম কিসের?......সিঁথির সিন্দুর মুছ্‌বারও হতভাগিনী সময় পেলো না। শ্বশুর বল্‌লেন,—অলপ্পেয়ে; শাশুড়ী নাম দিলেন তার অলক্ষ্মী। আর আর সবাই বল্‌লে,—পোড়াকপালী।

এসব অনাদরের বিশেষণ সহ্য করেও পোড়াকপালিনী রাজকন্যা একমাত্র শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে স্বামীর ভিটেয় টিকে রইলো। মৃত্যুকালে রাজপুত্র রাজকন্যার ডানহাতখানা দু'হাতে চেপে ধরে বলেছিলো,—দুঃখ করো না, রাজকুমারী! আমি যাচ্ছি, কিন্তু যে মাণিক তুমি কোলে পেলে সাত রাজার ধন একত্র কর্‌লেও তার দাম হয় না। তাকে মানুষ করো, তোমার সব দুঃখ দূর হ'বে।

রাজকন্যাও এই ভেবেই শান্ত হ'ল। যখনই স্বামীর চিন্তায় সে অধীর হয়ে ওঠে, তখনই 'সাতরাজার ধন এক মাণিক' পুত্রকে বুকে জড়িয়ে শান্তি পায়, শিশু-পুত্রের লাবণ্য মাখা বদনপানে চেয়ে ভবিষ্যতের সুখের স্বর্গ রচনা করে।

গোপাল কি বুঝিল সে-ই জানে, কিন্তু বামুনদিদির মুখপানে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া রহিল। গোপালের কচিদেহ আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া সুরমা কহিল,—স্বামী গেছে, কিন্তু রেখে গেছে তার নাক, মুখ, চোখ, ভ্রূ-যুগলের অবিকল ছাপ এই শিশু-পুত্রের মুখে।

এভাবে আরও কিছুকাল কাটলো। কিন্তু হতভাগিনীর কপালে এত আগুন জমা ছিল, কে তা' জান্‌তো? একদিন ভাঙ্গাকপালের ছিদ্রপথে ভিতরের জমান সব আগুন বেরিয়ে এসে তার শেষ অবলম্বনটি পর্য্যন্ত পুড়িয়ে

দিয়ে গেলো, দুদিন যেতে না যেতেই ছেলেকেও ধরলো জ্বরে। এজ্বর যখন ছাড়্লো, তখন সব শেষ!

গোপাল সইতে পারিল না, উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ছেলেটিও মারা গেলো?

সুরমা বলিল, হাঁ। অবাধ অশ্রু সুরমার গণ্ডবাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল,—ছেলেকে চিতায় তুলে দিয়ে রাজকুমারী যখন রাজপুরীতে প্রবেশ করল, তখন দেখ্লে, আদর-সোহাগের সিংহ-দরজা তার জন্যে একটাও খোলা নাই।

শ্বশুর-শাশুড়ী এবার নাম রাখ্লেন তার রাক্ষুসী·····

দেবর বল্লে,—এখন থেকে শুধু খোরপোষ······

জায়ের কণ্ঠে তীব্র ঝাঁজ; বল্লে,—সংসারের ভাল-মন্দয় কেন কথা কইতে আসো শুনি?···তোমার নিজের কাজে মন দাও। অর্থাৎ সেদিন থেকে স্থির হয়ে গেলো, শুধু খোরপোষের বিনিময়ে নিজের কাজ, অর্থাৎ দাসীবৃত্তি করে' তাকে চিরটা কাল স্বামীর ভিটেয় কাটিয়ে দিতে হ'বে।

গোপাল বলিল,—তারপর?

—হাঁ, তারও পর আছে বৈ কি। রাণীপণা থেকে দাসীপণা! হতভাগিণী অভিমানিনী রাজকন্যা অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস সইতে পার্লে না। একদিন সকলের অলক্ষ্যে রাজকন্যা রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়্লো।

—একাকী?

—হাঁ।

—কোথায় গেলো?

—কোথায় আর যাবে? পথে দাঁড়ালো।

—কেন, বাপের বাড়ী?

—সেখানেও যে দাদা বৌদি আছে গোপাল!

—কিন্তু বাপ-মা?

—হাঁ, তাঁরা ছিলেন। কিন্তু স্বামী যার নেই, তার কেউ থাকে না, গোপাল! দুর্ব্বলের প্রতি সবলের করুণার দান হাত পেতে গ্রহণ করবার মত সৎসাহস তার ছিল না, তা সে দান বাপ, মা, ভাই, বোন, যার কাছ থেকেই আসুক।

সুরমা চুপ করিল। একটু দম নেওয়া তার দরকার। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। কিন্তু গোপাল অধৈর্য্য হইয়া উঠিল; বলিল,—কিন্তু পথে বেরিয়ে রাণী কি খেলে বলো না, বামুনদি?

—যা পেলে, খেলে; না পেলে উপোষ দিলে।

—কোথায় থাক্তো?

—কেন, গাছতলায়?

—ভয় করতো না?

—না, যার স্বামীপুত্র বেঁচে নেই, তার ভয় থাক্তে নেই?

— তারপর?

—তারপর রাজকন্যা একদিন ভিক্ষায় বেরিয়েছে; একে রাজকন্যা, তায় দু'দিনের উপবাস, তাতে পথ হাঁটার নেই অভ্যাস। নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পথের ধারে বসে বসে সে কাঁদছিলো। এমন সময়ে এক প্রবীন ভদ্রলোক এসে তাকে শুধালো,—কে গা তুমি, বসে বসে কাঁদছো?

রাজপুত্রী বল্লে,—আমি ভিখারিণী।

ভদ্রলোক বল্লে—ভিখারিণীর মত তো তোমার চেহারা নয়, মা?

—চেহারায় কি কারো ভাগ্যি লিখা থাকে, বাবা?

—কিন্তু এ দু'টো চোখকে কি দিয়ে ঠকাবে মা? এ চোখ—এ মুখ! এমনটি তো কোন ভিখারিণীতে সম্ভব নয়। তুমি নিশ্চয়ই কোন বড় লোকের মেয়ে। বল, তুমি কে?

—আমি ভিখারিণী। এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার বর্ত্তমানে নেই, বাবা।

—কি দুঃখ তোমার? তুমি কি চাও?

—কি চাই? চাই একটা আশ্রয়। কোন সদাশয় ব্যক্তি যদি দয়া করে,—···

—কি কাজ তুমি কর্তে পারো?

—ভালো রাঁধতে জানি বাবা! আর ছেলে মানুষ কর্তে পারি।

ভদ্রলোকের তখন এমনি একজন লোকের দরকার ছিল, তার ছেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তাই খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে বল্লেন, যদি কিছু মনে না কর মা—আমার

একটি ছেলে আছে, পারবে তুমি মানুষ করতে?—তুমি লিখতে পড়তে জান?

—জানি কিছু।

—তোমার যদি আপত্তি না থাকে,—

—একটা আশ্রয় পেলে বর্ত্তে যাই।

সেদিন থেকে ভদ্রলোক রাজকুমারীকে থাকতে দিলেন, খেতে দিলেন। বড় দয়ার শরীর তাঁর। বিনিময়ে রাজকুমারী তার ছেলেকে মানুষ করবার ভার নিলেন। আস্তে আস্তে রাজকুমারী তার বাড়ীর রাঁধুনিগিরীতেও বহাল হ'য়ে গেলো। তারপর সেখানে এসে রাজকুমারী আর একটা জিনিষ যা পেলে, তা অনেক রাঁধুনির ভাগ্যেই জোটে না।

—কি? নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে গোপাল প্রশ্ন করলে।

—তার ঐ হারানো মাণিক, সাত রাজার ধন।

—সে না মরে……গোপাল বুঝি ঘুমাইয়া পড়িল।

—না সে মরেনি: সুরমার চোখে উত্তেজনা: দু'দিন গা-ঢাকা দিয়ে দুষ্টু ছেলে মার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলো মাত্র। সুরমা আরও ঘনো হইয়া আসিল। নিদ্রিত গোপালকে বুভুক্ষু বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাকে অভিষিক্ত করিল।

বিদ্রোহিণী

শ্রীসমীর ঘোষ

রেখা দিয়ে টানা সীমানার বেড়া চূর্ণ সুনিশ্চয়!
আর কেন তবে ঘিরে রেখে মিছে মজুরীর অপচয়?
দামী যাহা ছিল হোলে নিঃশেষ
রক্তাম্বরে কেন এই বেশ?
বিদ্রোহিণীরে বিদ্রূপ করে অভ্রংলিহ আশা
যৌবন যবে প্রাচীন ক্রমশঃ, তখনি বেঁধেছি বাসা!

পথে প্রান্তরে উদ্ধত হোয়ে ডাকে বন্ধুর দিন—
অবয়ব ঘিরে উদ্যত আজ ভাংগনের সংগীন।
অসন্তোষের ছাই ঢাকা আয়ু
পুড়িয়ে গিয়েছে স্বপ্নালু স্নায়ু
মুছে ধুয়ে গেছে সুপুষ্ট যতো দিগন্ত কলেবর—
মোহময় বাঁশী মুখর তখন: মিলিয়াছে অবসর!

শান্ত-স্নিগ্ধ আকাশ বাতাস তূর্য-ধ্বনিতে ঢাকা—
আত্মপ্রচার সুর্ধ-বীর্যে নিজেরে পরায় পাখা।
অধৈর্য যারা আশা উন্মাদ
তারা নাকি আজ বাধালো বিবাদ
সে বিষবাদে রাজনীতি আর রণ-নীতি পাশাপাশি
মজুরী গলায় পরায় শুনেছি বণিকের গড়া ফাঁসি!

এরি মাঝখানে বাড়তি আমরা—দিন কাটছিল বেশ—
নির্বিচারেতে বরণ করেছি জরতীর উন্মেষ!
তারি মাঝে তব মত্ত আঁচল,
বাচন ভংগী তীক্ষ্ণ চপল।
কিছু না মানার বিরাট্ দাবীর বিপুল উন্মাদনা
শান্তির সব বর্ণ মুছলো, তুমি বলো: মন্দনা!

তোমারি সংগে পংগু জীবন 'মন্দনা' কই বলে
পাঁজরশালায় বুকের হাপরে আগুন কই বা জ্বলে!
সমুদ্র আজ যতো ভৈরব
এ জীবনে কই ততো কলরব—
প্রান্তর আজ যতো সংকুল—কই ততো যৌবন?
তোমার স্পর্শে গড়লো কোথায় অভ্রংলিহ মন!

পথে প্রান্তরে এলো এলো আজ শত্রুবন্ধুর দিন—
তুমি এলে—জানি চলবে না থাকা উদাস অন্তরীণ!
তবু মনে হয় হোয়ে গেছে দেরী—
তা না হোলে তব মন্দ্রিত ভেরী
ডেকেছে যখন ভাবনা কি আর? যৌবন রঙ্গীন্
আকিঞ্চয়ের ফুলে মুগ্ধ—যখন সম্মুখে সংগীন!!

নব-বিধান স্বপ্ন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুদ্ধের কার্য্য-কারণ সূত্রে, যুদ্ধে লিপ্ত ও নির্লিপ্ত, জয়ী ও জিত গণনায়কগণের মুখে আমরা যে নব-বিধানের অমোঘ অভয় বাণী শুনিতেছি, তাহার দৃঢ় ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, জানিবার কৌতূহল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রচুর। একমাত্র ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, মানুষের কোন প্রচেষ্টাই কার্য্যকরী হয় না। চিরস্থায়ী দূরের কথা, দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম্ম কোথায়?

ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম্ম পদ নিষ্পন্ন হয়। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ বা পোষণ করা। যাহা সকল মনুষ্যকে প্রতিপালন অর্থাৎ পরিপোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বাহন ধৃতি, রীতি ও নীতি। ধর্ম্মের প্রথম সোপান সত্য। সত্য ব্যতীত ধর্ম্ম নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে সত্যের স্থান স্বল্প। মিথ্যাই সেখানে রাজা এবং শঠতাই সেখানে মন্ত্রী। কূটনীতিই রাষ্ট্রনীতি। ছলনাই রাজনৈতিক চাতুর্য্য।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান অহিংসা। মনে, বাক্যে ও কার্য্যে। রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংসা অচল। কারণ হিংসা ব্যতীত অভ্যুদয় নাই। বর্ত্তমান বিধানে মিথ্যা ও হিংসা প্রবল। সুতরাং নব-বিধানে সত্য ও অহিংসার অধিকার অতীব প্রয়োজন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সুতরাং, প্রয়োজন ও নিষ্প্রয়োজনের অছিলায়, সত্য ও অহিংসার নিত্য নূতন ভাষ্য রচিত হইতেছে। এ প্রক্রিয়া নূতন নহে; অতি প্রাচীন

সত্য বিশ্বাসের মূল। পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্ম—আদান-প্রদান-বাক্যে নিবদ্ধ। অতএব সত্য বাক্যপ্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। নিয়ম ও নীতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যবদ্ধ হইয়াই মানুষ নীতি-নির্দ্ধারণ ও নিয়ম-সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করিয়া থাকে। সত্যই লোকযাত্রা নির্ব্বাহের শ্রেষ্ঠ উপায়। লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থেই ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম এবং মানব মাত্রেরই পরম গতি। একমাত্র সত্যেই লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিত। সত্য প্রতিপালন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং মিথ্যা ব্যবহার অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ; যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম তাহাই অপ্রকাশ; যাহা অপ্রকাশ তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। ফলতঃ সত্যই ধর্ম্মের আধার। এই সত্যের ত্রয়োদশ লক্ষণ—অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অহিংসা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্য সকলেরই পালনীয়। সুতরাং অহিংসা ও সত্য বচন মানবের পরম কল্যাণকর, যেমন গৃহস্থাশ্রমে, তেমনি ব্যবহারিক জীবনে;—যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে। যাহা সাধারণের হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই পরম পবিত্র ব্রত এবং অনৃশংসতাই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। শ্রেয়ঃ-সাধনই ধর্ম্ম।

রাজনীতি ক্ষেত্রে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে আমরা গত বিশ বৎসরে অহিংসার বহু বিচিত্র ভাষ্য লাভ করিয়াছি। মহাত্মার মতে অকপট সত্য ও অনাবিল আনৃশংস্যই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, নিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয় প্রয়োজনে।

কূট তার্কিকেরা তর্ক করেন, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাগণ অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই পৃথিবীতে হিংসা কে না করে? এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ। ভ্রমন করিতে করিতে প্রাণিগণ কতশত জীবজন্তুর প্রাণ সংহার করে। শয়ন ও উপবেশন কালে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমরা অনেক প্রাণী বিনষ্ট করি। কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে অনেক হিংসা করিতে হয়। কৃষক ভূমি কর্ষণ কালে বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করে। পৃথিবীর ন্যায় আকাশও বহু জীবে পরিপূর্ণ। কোথাও অণুমাত্রও প্রাণিশূন্য স্থান নাই। লোকে অজ্ঞাতসারে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। কি বৃক্ষ, কি ফল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে। এমন কি

ব্রীহী প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে লোকে বীজ বলে, তাহাও জীব। অহিংসা-নিয়ত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন; তবে অহিংসার নিমিত্ত তাঁহারা সাতিশয় যত্নশীল; এই হেতু তাঁহাদের হিংসা দোষ অতি অল্প পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। বৃক্ষ ও ওষধি ছিন্ন করিলেও হিংসা-দোষ ঘটে। অতএব লোকে পশু বধ করিয়া যে তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে, তাহাও নিন্দনীয় নহে। কারণ, ওষধি, লতা, পশু, মৃগ ও পক্ষীসকল যে লোকের ভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।

কূটতার্কিকের যুক্তি—এই, জীবলোকে কেহ হিংসা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। বিধাতা স্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থকে জীবের জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অনেক প্রাণী প্রাণি-ভক্ষণ দ্বারা জীবনধারণ করে। নকুল মুষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্র ব্যাঘ্র কুক্কুরকে এবং মনুষ্য বহু জীবকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বলবান জন্তু দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণধারণ করে; ইহা হয়ত বলবানের অত্যাচার—শক্তির অপব্যবহার, ইতরের প্রতি উচ্চতরের জিঘাংসা। কিন্তু, এমন অনেক জীব আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে। মৎস্যগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। ফলতঃ এই জীবলোকে হিংসা না করিয়া কাহারও জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। ভূতলে, সলিলে ও আকাশে বহু সংখ্যক জীব বাস করে এবং লোকে প্রাণধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের বিনাশ সাধন করিতেছে। এই পৃথিবীতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব আছে যে, লোকের অক্ষি পক্ষ্মের আঘাতেও তাহাদের প্রাণ নাশ হয়। সুতরাং ইহজগতে কেহই অহিংসক নাই। ফলতঃ, সৃষ্টি-প্রকরণ হিংসার পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত।

স্থূলতঃ ইহা সত্য। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে স্বেচ্ছা-কৃত ও অনিচ্ছাকৃত, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, কৃতকর্ম্মের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য অনুসৃত হয়। স্বেচ্ছাকৃত হিংসা এবং অনিচ্ছাকৃত; জ্ঞাতসারে হত্যা এবং অজ্ঞাতসারে হত্যা, এই উভয়ের গুরুত্ব ও দায়িত্ব কখনই সমপরিমাণ হইতে পারে না। রাজদ্বারেও এই উভয়ের পার্থক্য আইনানুমোদিত এবং দণ্ডের পরিমাণও তুল্য নহে। জীবই জীবের জীবন—ইহাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু জীব দুই প্রকার—ইতর ও শ্রেষ্ঠ। ইতর জীব কার্য্য করে জন্মগত সহজাত সংস্কার বশে; আর সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ কার্য্য করে যুক্তিবশে। মূক অসহায় ইতর জীবের পক্ষে যাহা বিধাতার বিধান; বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক ও বাক্-শক্তি সম্পন্ন মানবের পক্ষে তাহা বিধি নহে। শ্বাপদ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। কোন এক আদিম যুগে, অসভ্য বর্ব্বর মানুষও তাহা করিত। ভগবৎ প্রদত্ত বুদ্ধি-বিবেক পরিচালনার ফলে, সুসভ্য সুশিক্ষিত মানুষ তাহা করে না। পরন্তু, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহায্যে, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে—প্রকৃতির প্রাচুর্য্যকে করতলগত করিয়া ভোগ-বিলাসের অনন্ত পথ আবিষ্কৃত করিয়াছে। কিন্তু কৃমিকীট হইতে পশুরাজ সিংহ পর্য্যন্ত ভূচর, খেচর ও জলচর জীবজন্তুর পক্ষে তাহা অসম্ভব। বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে, ভিন্ন ভিন্ন জনহিতকর উদ্দেশ্যে, কোন জন্তুকে কেবলমাত্র আমিষাশী এবং কোন প্রাণীকে নিরামিষাশী করিয়াছেন। উভয় প্রকার উপাদানেই জীবন ধারণ সম্ভব। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহিংস উপায় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব নহে—অতি সহজ। এই নিমিত্তই নীতিশাস্ত্রবিদ্ লিখিয়াছেন,—

> স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
> অস্য দগ্ধোদরস্বার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

শাকান্নে জীবনধারণ করিলে স্বাস্থ্য ও সুখের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না; পরন্তু রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া, সাত্ত্বিক বৃত্তির সম্যক্ পরিস্ফুরণ দ্বারা মানব-চিত্তে দেবতার আসন দৃঢ় করে। নীচ বৃত্তি দমন পূর্ব্বক উচ্চ বৃত্তির স্ফুরণ করা, উহা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। ভোগের নিবৃত্তি নাই; ভোগবিলাসের অন্ত নাই; যথার্থ স্বাস্থ্য ও সুখের নিদান, প্রবৃত্তির প্রশ্রয় নহে—নিবৃত্তির পরম ও চরম শান্তি।

কূট তার্কিক বলিবেন—উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। সত্য বটে; কিন্তু ইহাতেও বিধাতার বিধানের বৈচিত্র্য আছে। মানবের প্রধান উপজীবিকা ওষধি প্রসূত শস্য। ফল প্রসব করিয়াই ওষধি জীবনলীলা সম্বরণ করে। যে সকল

উদ্ভিদ্ ফল প্রসব করিয়া শুষ্ক হয় না, তাহাদের ফল দীর্ঘস্থায়ী নহে। ফল পাকিলে পচিয়া যায় অথবা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। সুতরাং উদ্ভিজ্জ আহার, প্রাণী বধ করিয়া তাহার মাংসাহারের ন্যায় হিংসাত্মক কর্ম্ম নহে। অহিংস নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে, বিধাতা তাহাদের প্রাণধারণার্থ প্রচুর শাকসব্জি, লতাগুল্ম, ফলফুল ও কন্দমূল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণি-হিংসা না করিয়া জীবন ধারণের প্রচুর উপায় বিধাতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রস্তুত রাখিয়াছেন। কিন্তু কূট তার্কিকগণের আর একটি কুটিলতর যুক্তি আছে। তাঁহারা বলেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তা কে—ঈশ্বর না পুরুষ? যদি বিধাতা সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা হন এবং মানুষ তাঁহার নিয়োগানুযায়ী হিংস্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই পরমেশ্বরকেই ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য অদৃষ্ট প্রভাবে হিংস্র কর্ম্ম করিয়া কি নিমিত্ত পাপভাগী হইবে? কিন্তু সংস্কার-প্রণোদিত বুদ্ধি-বিবেকহীন হিংস্র জন্তুর পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য স্ব-বৃত্তি, বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান-বিবেক-সম্পন্ন মানবের পক্ষে তাহা কখনও স্বধর্ম্ম হইতে পারে না। শস্ত্র প্রহারকর্ত্তা শস্ত্র প্রহার দ্বারা পশু বধ করিলে, শস্ত্র নির্ম্মাতা কখনও সেই অপরাধে লিপ্ত হইতে পারে না। বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের অপব্যবহার দ্বারা যদি কোন পশুপ্রকৃতি মানব ভ্রাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, তাহার জন্য বৈজ্ঞানিক কখনও দায়ী হইতে পারেন না। জগতে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই বিদ্যমান আছে। যে যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে সেইরূপ ফলভাগী হইতে হয়। শারীরিক অত্যাচার করিলে, যেমন ব্যাধি ভোগ করিতে হয়; মানসিক অনাচারেরও তেমনি ফল ভোগ করিতে হয়। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার—কার্য্যকারণ নিয়ন্তা বিধাতার নহে। সুতরাং প্রাণিগণ সর্ব্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরস্পরের প্রাণ নাশ করে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় যুক্তি, বিশেষতঃ যুদ্ধে এই পৃথিবীতে কেহ কেহ সন্ধির, কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে। কেহ বা ঐ উভয়ের প্রশংসা করেন না। কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক রাজ্যরক্ষা অথবা রাজ্য গ্রহণ এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জন বাসকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। কেহ ভোগ, কেহ ত্যাগ; কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা; কেহ দান, কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করেন। সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের প্রাচীন ঋষিরা অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু অহিংসা ও সত্যবাদকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। কৃষি, বাণিজ্য, মৃগয়া ব্যতীত জীবন ধারণ দুষ্কর। জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, মানুষ কিছু কিছু জীব হিংসা করে। প্রতি গৃহস্থের ঝাঁটা, বঁটি, ঢেঁকি প্রভৃতি পাঁচটি হিংসা-যন্ত্র আছে। স্বাস্থ্যরক্ষা জীবনধারণের প্রধান উপায়; সেই স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে মানবকে বাধ্য হইয়া হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ আছে। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত কিংবা সম্পূর্ণ গুণযুক্ত হয় না। বিপদগ্রস্ত হইলে আত্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা অথবা আশ্রিত রক্ষার্থে হিংসা করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে অল্প মাত্র হিংসা করাই শ্রেয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত হিংসা সর্ব্বথা নিতান্ত নিন্দনীয়। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া, প্রবলের বিনাশ সাধন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে, প্রবল জন্তুকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলের পরিত্রাণই প্রধান ধর্ম্ম।

এই জীবলোকে হিংসা ব্যতীত জীবিকা লাভ দুরূহ, সন্দেহ নাই। এমন কি একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি যে, এই জগতীতলস্থ যাবতীয় পদার্থেরই প্রাণ আছে। হিংসা ভিন্ন গন্ধপ্রাণ, রসাস্বাদন, বায়ুসেবন, শব্দপ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রাণিগণের হিংসা না করাই পরম ধর্ম্ম। প্রত্যক্ষ হিংসাই দোষাবহ। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বা সুখী নাই এবং কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ ও সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট এবং দুঃখে একান্ত ভীত

হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে তাহাদের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা অন্যেরও প্রিয়কর জ্ঞান করাই বিধেয়। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্টাচরণ করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণসংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এই হেতু মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

জীবগণকে অভয় প্রদান করা সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মরূপী যক্ষ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন — "প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান।" অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান, এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। যজ্ঞার্থে পশু-বধও নিন্দনীয়। হিংসাকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীলতা, সরল ব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-পরাজয় ও সত্য—ইহাদের কোনটিই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ; কারণ, যাঁহারা সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না। যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কামনা-পরিশূন্য হইয়া স্নেহসংকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনিই ধর্ম্মশীল।

হিংসা ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কারণ, মানুষ—মানুষ, পশু নহে। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই তপস্যা। কেবলমাত্র শরীর-শোষণ তপস্যা নহে। অহিংসাই সমুদায় ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও কখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় বটে; কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হিংসা-বৃত্তি আশ্রয় করিলে, মানুষের প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট গতি লাভ করে। কোনও জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ে আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। হিংসা করিলে হিংসিত এবং প্রতিপালন করিলে প্রতিপালিত হওয়াই স্বাভাবিক; সুতরাং হিংসা না করিয়া প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য।

সকলের সহিত মৈত্রীভাব-সংস্থাপনই শ্রেয়োলাভের প্রধান উপায়। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য; সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়, সত্য প্রভাবে যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়। অতএব বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে, যুধ্যমান জাতিসকল যে নববিধানের পরিকল্পনা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে পরিপোষণ করিতেছেন, তাহা অহিংস ও সত্য, অনৃশংসতা ও দয়া, ন্যায় ও নিষ্ঠা এবং নিয়ম ও নীতির উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অলীক স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। সাধু ইচ্ছা ব্যতীত সাধু উদ্দেশ্য সফল হয় না এবং সাধু উপায়ই তাহার প্রধান অবলম্বন। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি এবং অহিংসাই একমাত্র সুখ-নিদান। সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং অকপট ব্যবহার যেমন ধর্ম্মনীতির, তেমনি রাষ্ট্রনীতিরও পাদপীঠ। অনসূয়া উভয়ের পট-ভূমিকা। পরপীড়ন ও পরস্বাপহরণ কখনই ধর্ম্ম নহে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সার্ব্বজনীন প্রচার ও প্রয়োগ ব্যতীত নববিধানের কল্পনা বৃথা। কিন্তু তাহা কি সম্ভব?

স্বপ্ন

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম. এ.

মোর স্বপ্নে আঁখি জুড়ে ভাসিলে যখন,
মনে হলো সর্ব্ব অঙ্গে উদয়-গগন
আসিল নামিয়া তার শুভ্র-রূপ নিয়া,
রাত্রি-অন্ধ মোর প্রাণে আলো বিকশিয়া।

তব অঙ্গ-জ্যোতিঃ-রেখা স্বর্ণ-স্রোত-ধারে,
ধৌত করে' দিল মোর হিয়া-কারাগারে;
করে' দিল মুক্তি-মৌন মোর বন্দী প্রাণ,
এসেছিলে নিশিশেষে তুমি সে মহান্।

জর্জ্জ বানার্ড শ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত বি-এ

কিছুদিন আগে আমেরিকার একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিতর্কের বিষয় ছিল "শ কি সভ্যতার শত্রু?" তর্কের শেষে শ সভ্যতার শত্রু বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সামান্য ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, শ চিন্তা-জগতে কি আলোড়ন উপস্থিত করেছেন।

একাধারে প্রবন্ধকার (Essayist), নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তবে নাট্যকার হিসাবেই তাঁর খ্যাতি বেশী। শ তাঁর মতবাদ প্রধানতঃ তাঁর নাটকগুলির মধ্যে দিয়েই প্রচার করেন। ইংল্যাণ্ডে শ-এর নাটকগুলির প্রচুর সমাদর, সেখানকার মৃতপ্রায় রঙ্গমঞ্চগুলি একরূপ শ-এর নাটকের দ্বারাই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বছরের পর বছর ধ'রে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ শ-এর নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর মতবাদ পরিপাক করে' আসছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শ্রোতাদের চরিত্র নিয়েই শ-এর কারবার, তবু শ তাঁর জনপ্রিয়তা হারান নি। তাঁর নাটকের অভিনয় দেখে শ্রোতারা প্রচুর আমোদ পেয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। শ-এর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল যে তাঁরাই, এ তাঁদের খেয়াল থাকে না।

আধুনিক সভ্যতার যেখানে আত্ম-প্রবঞ্চনা ও অসত্য নিহিত আছে শ তাকে উদ্ঘাটিত করে' লোক সমক্ষে ধরেছেন। চিরাচরিত বহুমত ও প্রথাকে তিনি অসার বলে' প্রতিপন্ন করেছেন। প্রচলিত নীতি ও বিশ্বাসকে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে' নেবার প্রেরণা দেওয়াই হল শ-এর কাজ। Romanticism মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। মানুষের চোখ থেকে এই মোহের অঞ্জন মুছে, জগৎকে তার প্রকৃত পরিবেশের মধ্যে দেখার উপযুক্ত সত্য-দৃষ্টি দান—এই হ'ল শ-এর সাহিত্যের মূল বাণী। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য শ'কে জীবনে বহু অপযশঃ ও গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে বহুদিন যাবৎ তাঁর Mrs Warren's Profession বইখানা নিষিদ্ধ ছিল, পরে এই নিষেধ তুলে' নেওয়া হয়।

অনেকে শ-কে ধ্বংসকারী শক্তি বলে' থাকেন; এ কথা সত্য, তবে সভ্যতাকে শ ধ্বংস করতে চান না; তিনি ধ্বংস করতে চান বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গীভূত মেকী নৈতিকতা ও মেকী সভ্যতাকে। শ-এর বিরুদ্ধবাদীরা আরও বলেন—শ নৈরাশ্যবাদী (Pessimist)। এর উত্তরে বলা যায়, শ নৈরাশ্যবাদী, তবে জীবনকে তিনি ঘৃণা করেন না, তাঁর সাহিত্যে কোথাও জীবনবিতৃষ্ণার চিহ্ন নেই, একটী বিমল প্রসন্নতার ধারা তাঁর সমস্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান। গূঢ়ার্থযুক্ত, সপ্রতিভ বাক্য রচনায় শ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এইটী তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

দীর্ঘকাল অখ্যাত অজ্ঞাত জীবন-যাপন করবার পর শ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। দেশ-বিদেশে খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর শ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য-সেবীর পরম আকাঙ্ক্ষিত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে শ অকলঙ্ক চরিত্রবান ভদ্রলোক। তিনি নিরামিষভোজী, মদ্য, সিগারেট, নস্য প্রভৃতি কোন মাদক দ্রব্য তিনি ব্যবহার করেন না। প্রাত্যহিক জীবনে তিনি শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতী, দায়িত্বজ্ঞান-হীনতাকে তিনি বড় ঘৃণা করেন। দানশীলতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নোবেল পুরস্কার-লব্ধ সমস্ত অর্থই তিনি ইংল্যাণ্ড ও সুইডেনের সংস্কৃতিগত মৈত্রী-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হ'লেও তিনি ছোট বড় সকল সাহিত্যিক ও শিল্পীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন। ইংল্যাণ্ডে শ সমাজ-তন্ত্র-বাদের একজন বিশিষ্ট প্রচারক ও সমর্থক।

শ-এর রচনার দোষ-ত্রুটি আছে। স্বাভাবিক উৎসাহের বশে অনেক স্থানে তাঁর সাহিত্য শিল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে নি, তবু অসীম শ্রদ্ধা ও ক্ষমা তাঁর প্রাপ্য; কেননা, মনুষ্য সমাজকে তিনি চিন্তাশক্তির সম্যক্ ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন—এ কাজে আজও তিনি অক্লান্ত। শ-এর সামসময়িক বিখ্যাত মনীষী G. K. Chesterton তাঁর শ সম্বন্ধীয় পুস্তকের এক স্থানে বলেছেন—"Shaw is like venus of Milo; all that there is of him is admirable" Chesterton-এর এই উক্তি শ-এর অগণিত ভক্তেরা অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন করেন।

বিচার

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পের লেখক শুধু আমি—নায়ক হ'য়েছে সরোজ রায় আর সুধীর সেন।

তারিখে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সরোজ রায় আর সুধীর সেন একই সঙ্গে অমলা দেবীকে ভালবেসেছিল। অমলা দেবীর মত সুদক্ষ, সুন্দরী অভিনেত্রী সে সময়ে আর কেউ ছিল না। সরোজ রায় ও সুধীর সেন—এদের মত হাস্যরসের অভিনেতাও খুব কম ছিল। তিন জনেই আবার নব নাট্য সম্প্রদায়ের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল।

সরোজ রায়কে লোকে এত ভালবাসতো যে ষ্টেজে উঠে দাঁড়িয়ে সে কোন কথা বলার আগেই লোকে তাকে দেখে হাসতে সুরু করতো, আর সুধীর সেনও এমন জনপ্রিয় ছিল যে, তার চুপ ক'রে থাকার ভংগী দেখেই সকলে হাসিতে ফেটে পড়তো।

কিন্তু তারা দু'জনে সত্যিই বড় বন্ধু ছিল। আর অমলা দেবীও তাদের দু'জনকে সমানই ভালবাসতো। তারা দু'জনই তার কাছে বলতো যে, সে তাদের দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে বিয়ে করুক—তার মতের উপর তাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সে কিন্তু বলতো যে, তাদের মধ্যে যে ভাল অভিনেতা তাকেই সে বিয়ে করবে।

শোন কথা! কোন অভিনেতা, কোন সমালোচক, কোন দর্শক, তাদের দু'জনের মধ্যে ভাল অভিনেতা যে কে, তা কেউ বলতে পারে না। শুধু একলা অমলা দেবীর পক্ষেই এ রকম কথা বলা সম্ভব ছিল।

অসহায়ভাবে সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—এটা কি ক'রে স্থির হ'বে? কার কথা তুমি মেনে নেবে?

সুধীর বললো—হাঁা, সত্যি কথা। কে বিচারক হ'বে?

অমলা বললো—দেশই স্থির করবে। আমরা দর্শকের মনোরঞ্জন করি; তাই আমি জনমতই গ্রাহ্য করবো।

কিন্তু দর্শকেরা তাদের দু'জনকে ঠিক সমানই ভালবাসে। সেদিক দিয়ে কোন আশাই আর তাদের রইল না। তারা বুঝলো যে, তাদের বিয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রইল। কোনও উপায়েই তারা দু'জনে দেখতে পেল না।

সরোজ একদিন সুধীরকে বললো—ছাখ, আমরা দু'জনেই অভিনেতা, সুতরাং আমরা দুজনেই নিজেকে বড় অভিনেতা ব'লে মনে করি। অথচ আমরা যখন মারা যাব, তখন পর্য্যন্তও আমাদের এই ভাঁড়ামি করা ছাড়া আর অন্য কোন অভিনয়ই করা হ'বে না। আমার মনে হয়, আমাদের বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং বেশ কঠিন ভূমিকায় নামা উচিত।

সুধীরও সায় দিয়ে বললো—আমারও ঠিক তাই মনে হয়। আর তাইতেই বোঝা যাবে কে বড় অভিনেতা।

সরোজ বললো—কিন্তু তাতেও এক অসুবিধা আছে। কর্ত্তৃপক্ষ যে আমাদের কিছুতেই ওরকম ভূমিকায় নামতে দেবেন না।

সুধীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো—সত্যিই তাই।

দিন কয়েক পরে সরোজ একদিন সুধীরকে ডেকে বললো—ছাখ, একটা মতলব মাথায় এসেছে। আমি একটা সভা ডাকবো স্থির করেছি, অবশ্য অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের নামে। সভায় এক নরঘাতক গুণ্ডা এসে তার জীবনের সমস্ত অপরাধ সকলের কাছে স্বীকার করবে—এই হ'বে বিষয়। আর আমিই হ'ব সেই নরঘাতক।

সুধীর বললো—কিন্তু লোকের কাছে ধরা পড়ে যাবে।

সরোজ হেসে বললো—সেইখানেই ত আমার অভিনয়ের আসল প্রতিভা। কেউ জানতে পারবে না যে নরঘাতক হয়েছে সরোজ রায়—সকলে ভয়-বিহ্বল হ'য়ে শুনবে আমার কাহিনী। তার পরদিন কাগজে প্রকাশ হ'বে এই গল্প। সমস্ত দেশ অবাক হ'য়ে যাবে—এই অভিনয়ে তারা আমার জয়ধ্বনি করবে। আর আমার জয়ের পথ পরিষ্কার!

সুধীর তবু বললো—কিন্তু পুলিশ কি সম্মত হবে?

সরোজ বললো—সে ভার আমার। আর এতে তো আমি দেশের উপকারই করতে যাচ্ছি। যাতে নরহত্যা না হয়, আমি তো সেই কথাই সকলের সামনে বলবো।

সুধীর একটু মনমরা হ'ল, কিন্তু সে সরোজের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিল। অমলাও হেসে বললো—যদি জিততে পার তো বুঝছই……

সরোজের সে কি উৎসাহ আর উদ্দীপনা! এই

অভিনয়ের উপর তার সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে। সব কাজ শেষ ক'রে সে অমলা ও সুধীরকে নিমন্ত্রণ করলো পরদিন সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। তারা সাগ্রহে সম্মত হ'ল। সরোজ সারারাত ধ'রে তার বক্তৃতা তৈরী করতে লাগলো।

সভা আরম্ভ হ'ল। সরোজ উঠে দাঁড়িয়ে অমলা ও সুধীরকে তৃতীয় সারিতে ব'সে থাকতে দেখলো। সে একবার তাদের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করলে। তার ছদ্মবেশ সত্যিই অপূর্ব্ব হ'য়েছিল।

সমবেত ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ—

সকলেই উৎসুক চোখে তার মুখের দিকে তাকালো। মেয়েরা আধভয়ে সেই নরঘাতক গুণ্ডার দিকে তাকিয়ে শক্ত ক'রে চেয়ার আঁকড়ে ধরলো।

প্রথমে সে তার ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার কথা বেশ হাসিয়ে হাসিয়ে বলতে লাগলো। অমলা বললো—ও পারবে না। প্রথম থেকেই রসিকতা সুরু করেছে। সুধীর বললো—আগে সবটা শোন। এর পরে কি বলে তার জন্য প্রস্তুত হও।

সুধীরের কথাই সত্য হ'ল। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। মুখ, চোখ হিংস্র, কুটিল ও বিভীৎস হ'য়ে উঠলো। সভাশুদ্ধ সকলে শিউরে কেঁপে উঠলো। সকলে ছাইয়ের মত সাদা মুখে শুনতে লাগলো তার সব হত্যার কাহিনী—কেমন ভাবে সে নিঃসহায় পথচারীদের বুকের উপর ছুরি বসাতো, কি ক'রে সে মায়ের বুকের উপর থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ছিনিয়ে এনে গলা টিপে মারতো। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—আমি নরঘাতক, আমি মুক্তি চাই—চির মুক্তি। সারা সভা নিস্তব্ধ—সূচ পড়ার শব্দও শোনা যায়!

যখন তার বক্তৃতা শেষ হ'ল কেউ হাততালি দিল না, কেউ কোন কথা বললো না—তার কপালে জয়টীকা তৎক্ষণে আঁকা হ'য়ে গেছে। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সবজ সভা ত্যাগ করলো। তার আগেই বুঝি ঈর্ষায় অসুস্থ হয়ে সুধীর চলে গেছে।

সরোজের সৌভাগ্যে অমলা তার পিঠ চাপড়াতে লাগলো। এমন কি এক বৃদ্ধ জমিদার কর্ম্মচারী-মারফৎ তাকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে অভিনন্দন জানালেন।

সরোজ বললো—যাওয়া উচিত হ'বে কি?

অমলা বললো—নিশ্চয়ই।

বাড়ীটা বেশীদূর নয়। জমিদার প্রস্তুতই ছিলেন।

জমিদার বললেন—আপনার এই বক্তৃতা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। সত্যিই-সুন্দর বলেছেন আপনি।

সরোজ মাথা নীচু করে রইল।

এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ জমিদার বললেন—একটু চা খান। আমার চা খাওয়া মানা, নয়তো একসঙ্গে বসে খেতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

সরোজ মুখ খুললো—আপনার অতিথি হওয়া—

তিনি বাধা দিলেন—না, না। আর কতদিন, আমি তো আর বেশীদিন নেই। আমি আপনাকে কেন ডেকেছি এখন তাই বলি। আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন যে, রাজেন ব'লে একটি ছেলেকে আপনি অতর্কিতভাবে নৃশংসের মতো হত্যা করেছেন—

চা খেতে খেতে সরোজ বললো—হ্যাঁ।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সে নিশ্চয়ই মুক্তি পাওয়ার জন্য লড়েছিল?

সরোজ বললো—হ্যাঁ, তার সাহস দেখে আমি সত্যই আশ্চর্য্য হ'য়েছিলাম।

বৃদ্ধের চোখে হিংস্রভাব ফুটে উঠলো, বললেন—সেই সাহসী, নিরপরাধ যুবককে কাপুরুষের মত খুন করতে আপনার লজ্জা করলো না? কাপুরুষ—

সরোজ বলে উঠলো—কি বলছেন!

বৃদ্ধ জমিদার টল্‌তে লাগলেন, বললেন—ঠিকই বলছি। রাজেন আমার একমাত্র ছেলে। আমার জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। ওঃ, তাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতাম। আর···আর আপনি তাকে নিজের হাতে খুন করেছেন!

সরোজ স্খলিত কণ্ঠে বললো—আপনার ছেলে?

বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে উঠলেন—হ্যাঁ, আমার ছেলে। আমিও তার প্রতিহিংসা নেব। সেই জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমিও আপনাকে খুন করবো। আপনার ওই চায়ে আমি বিষ মিশিয়েছি—

সরোজ চমকে উঠলো। হাতের ধাক্কায় শূন্য চায়ের

কাপ উল্টে গেল। সে বলে উঠলো—এই চা… ! তার হাত পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

বৃদ্ধ জমিদার পাগলের মত অট্টহাসি হাসলেন—হ্যাঁ, ওই চা। আমি আমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি। এতক্ষণে যা হবার হ'য়ে গেছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার সব শেষ হ'বে। আমার প্রতিহিংসাও পূর্ণ হ'বে।

সরোজ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার সারা শরীর কেমন যেন করতে লাগলো। সমস্ত রক্ত যেন তার জমে আস্ছে। এখনই রক্ত চলাচল বুঝি বন্ধ হ'য়ে আসবে।

বৃদ্ধ জমিদার বলে যেতে লাগলেন—আমি আপনাকে ভয় করি না। আমি বৃদ্ধ, স্থবির—আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না। কিন্তু মৃত্যু আপনার হবেই। কি করবেন ?

কিছুক্ষণ তারা দুজন দুজনের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইল—সরোজ ভয়ে পঙ্গু হ'য়ে আর বৃদ্ধ জমিদারটি সারা মুখে পাগলের হাসি নিয়ে।……আস্তে আস্তে বিবশ বিহ্বলতায় সরোজ মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

তারপর জমিদারের মুখ থেকে রঙ গেল মুছে, মাথার উপর থেকে একটা পরচুলা গেল স'রে।

যখন সব ঘটনা প্রকাশিত হ'ল, দেশ শুদ্ধ সকলে সুধীর সেনের জয়ধ্বনিতে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলো ; কারণ, যদিও সরোজ রায় দেশশুদ্ধ সকলকে ঠকিয়েছে, কিন্তু সুধীর সেন সরোজ রায়কেও ঠকাতে পেরেছে।

সুধীর সেন ও অমলা দেবীর বিয়েতে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রথম এগিয়ে গেল সরোজ রায়…*

* Meraick-এর Judgement of Paris-এর ছায়ায়।

ওঠে বাণী অনাহত গম্ভীর মহান

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

অশ্রু-জলে অবনত ধরণীর আঁখি
হয় থাকি' থাকি।
আপনার অদৃষ্টেরে করে পরিহাস
সকরুণ ফেলি' দীর্ঘশ্বাস.
মরণ কামনা করি'
ধূলায় লুণ্ঠিত তার শিথিল কবরী।

সন্তানে সন্তানে আজি হয় হানাহানি।
অবহেলি' মাতৃ-বাণী
করে অভিযান,—
ভ্রাতৃ-রক্তে রাঙাইয়া শাণিত কৃপাণ।
সে রক্তে আঁকিয়া টীকা নিজ দগ্ধ ভালে
আপন গৌরব মানি' নৃত্য তার হয় তালে তালে
উল্লাস বিহ্বল;
হিংসার বহ্নিতে রাঙা রুদ্র আঁখি-তল।

প্রেমের সমাধি মাঝে অট্টহাসি হাসে শয়তান,—
রক্তের প্লাবন হেরি' করতালি দিয়া অফুরান।
আকাশের ধ্যান ভাঙে দুর্ব্বলের করুণ ক্রন্দনে ;
মুকুলে শুকায়ে যায় শিশুফুল কুসুম-কাননে।

প্রতিধ্বনি তার
মাতৃ-হৃদয়ের দ্বারে আছাড়িয়া পড়ে অনিবার
বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গের প্রায়।
তাহারি আঘাত লাগি আত্মা তার বিষণ্ণ ব্যথায়
চাহে লুকাবারে
অজ্ঞাত ভুবন-পারে।

আপনার বিধাতারে জানাইয়া সজল মিনতি
বলে সে কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে অতি,—
ক্ষম' প্রভু ক্ষম মোরে মৃত্যু শুধু দিয়া
চাহিনা বাঁচিতে আর সন্তানের জননী হইয়া ! ‥

ওঠে বাণী অনাহত গম্ভীর মহান
অনাগত দিবসের গাহি জয়গান,—
হে কল্যাণি !
আমি জানি
ফিরাইয়া আসিবে পুনঃ অনুতাপে বিগলিত প্রাণ
প্রেমের নির্ম্মাল্য রচি একদিন তোমার সন্তান।
তোমার চরণ-তলে হ'বে নব দীক্ষা সবাকার
সেদিনের বাকী নাহি আর !…

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরুদ্ধ পক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিসমূহের বিরুদ্ধ সূত্রগুলি বিশ্লেষিত করিয়া, তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। জীবাতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মোদ্ভূত এবং জীবের ভোগোপকরণ, এ কথাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় অধ্যায় সূচিত হইল। এই অধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, উপাসনার ভেদাভেদ, জীবের ব্রহ্মভাব, মোক্ষ, মোক্ষের উপায় প্রভৃতি বিষয় নিরূপিত হইবে। প্রথম সূত্রেই বলা হইতেছে—

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ
প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥১॥

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ (দেহান্তরগ্রহণার্থ দেহী) সংপরিষ্বক্তঃ (ভূত-সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া) রংহতি (গমন করেন), প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ (শ্রুতির প্রশ্নোত্তর হইতে ইহাই জানা যায়)।

অর্থাৎ শ্রুতি বলেন—জীব যখন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দেহী সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করেন। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জীব এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন-কালে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিয়া জন্মান্তর পরিগ্রহ করেন।

শ্রুতি বলেন "হস্তবৈগ্রহঃ" অর্থাৎ হস্ত গ্রহ নামে কথিত। গ্রহ শব্দের অর্থ বন্ধন। জীব যাহা দ্বারা পরমাত্মা হইতে গৃহীত হয়, তাহার নাম গ্রহ। জীব শরীরাদি দ্বারা গৃহীত, সুতরাং শরীরও গ্রহ। জীব এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যান, তাহাও পূর্ব্ব শরীর হইতে বন্ধন-মুক্ত হইয়া গমন করেন না। সূক্ষ্মভূত সকলে বেষ্টিত হইয়াই তিনি উৎক্রমণ করেন। সূক্ষ্ম গ্রহই স্থূল গ্রহে পরিণত হয়। প্রাণাদি সূক্ষ্ম-পঞ্চ, পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটী সূক্ষ্মবস্তু, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম—এইগুলিও গ্রহ নামে স্মৃতিকার উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলির অন্য নাম পুর্য্যষ্টক। স্মৃতি বলিতেছেন "পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ" পুর্য্যষ্টক প্রাণাদি লিঙ্গ-শরীরে জীব বদ্ধ হন। তাহার দ্বারাই তাঁহার বন্ধন এবং তাহা হইতে বিমুক্তি তাঁহার মোক্ষ—এই স্মৃতিবাক্যে জীবের মোক্ষের প্রতিবন্ধকতা এই গ্রহ-বন্ধনেই ঘটে। কিন্তু জীব গ্রহ-সংজ্ঞক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াই দেহান্তর প্রাপ্ত হন। সংশয় হয়—জীব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন সত্য সত্যই তাঁহার ভাবী দেহের গঠনের জন্য পূর্ব্ব দেহের সূক্ষ্ম উপকরণাদি লইয়া যান কিনা? এইরূপ সংশয়ের কারণ শ্রুতিতে দেখা যায় "সঃ এতাস্তেজমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ" সেই জীব এই সকল তেজমাত্রাঃ সঙ্গে লইয়া গমন করেন। এই শ্রুতিবাক্য চক্ষুরাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সূক্ষ্মভূতাদির কথা উল্লেখ করেন নাই। না করার হেতু "সুলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রা" দেহী নবদেহগঠনের জন্য সর্ব্বত্র ভূতমাত্রা সুলভেই পাইতে পারেন। অতএব দেহান্তকালে ঐ সকল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—দেহী সূক্ষ্মভূত সকলে পরিবেষ্টিত হইয়াই দেহান্তর প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রুতির প্রশ্নোত্তরে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় বলিয়া উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতির সে প্রশ্নোত্তর রাজা প্রবাহন ও শ্বেতকেতুর কথোপকথনে প্রকাশ হইয়াছে। রাজা প্রশ্ন করিতেছেন—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" অর্থাৎ আপ পঞ্চাগ্নিতে আহুত হইয়া কিরূপে পুরুষ শব্দবাচ্য হয়? শ্বেতকেতু উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেন "দ্যুঃপর্জ্জন্য পৃথিবী পুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্ন রেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দর্শয়িত্বা ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি"—দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ—এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ,

রূপ পঞ্চাহুতি"; তারপর পুনরায় বলিলেন, 'এই প্রকার পঞ্চমুখী আহুতিতে জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ পুরুষ-শব্দবাচ্য হইয়া থাকেন। ইহার মর্ম্মার্থ—দেহত্যাগ করিয়া জীব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া মেঘলোকে অধিরোহণ করেন, তারপর বৃষ্টিধারারূপে পৃথিবীতে শস্যের মধ্য দিয়া পুরুষে, তারপর শুক্ররূপে স্ত্রীতে আগমন করেন। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ জল। শ্রদ্ধা সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ, এই পঞ্চ প্রকার আপ। রেতঃ-বস্তুই শুক্র। এই শুক্ররূপে নারীতে উপগত হইয়া জীব-পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়। অতএব জীবের নিষ্ক্রমণ অপ-পরিবেষ্টিত হইয়াই ঘটে, ইহা বুঝা যায়। আবার আর এক শ্রুতি বলেন—জীব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাহার গতি হয় জলৌকার ন্যায় অর্থাৎ জলৌকা যেমন এক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় পরিত্যাগ করে, জীবও তদ্রূপ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্ত্তী দেহ পাইয়া থাকে। এইরূপ হইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সহিত পরবর্ত্তী শ্রুতির মতভেদ হয়। কিন্তু এরূপ বিরোধ হওয়ার কারণ নাই; কেননা জীবের প্রয়াণকালে বর্ত্তমান দেহের অকথ্য যন্ত্রণায় তাহার দেহাভিমান দূর হইয়া যায়। তখন সে অপ-পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবী দেহ-লাভের কল্পনা করিয়া থাকে। জীবদ্দশায় যেরূপ কর্ম্ম-সংস্কার জন্মে, এই ভাবী দেহগঠনের ভাবনায় তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। জীব এই ভাবনাময় দেহ কল্পনা করিয়াই সে পূর্ব্ব দেহত্যাগ করে। অতএব যে শ্রুতি জলৌকার ন্যায় জীবের দেহত্যাগ প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বিরুদ্ধবাদ নহে।

বৈদিক জন্মান্তরবাদের সহিত অন্যান্য দার্শনিকদের মত-পার্থক্য অনেক আছে। সাংখ্যের মতে জানা যায় যে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্যাপক, তখন কর্ম্মপ্রভাবেই নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তি সকল আবির্ভূত হইবে। যেমন দেহ নূতন হইবে, কর্ম্মই সেই দেহে ইন্দ্রিয়গণকে উৎপন্ন করিয়া লইবে। দেহীকে সূক্ষ্ম ভূতাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া উৎক্রমণ করিতে হইবে কেন? বৌদ্ধবাদীরাও এই কথা সমর্থন করেন। ধারাবাহিক অহং-জ্ঞানই আত্মা। তাহাতে শব্দাদি জ্ঞান বৃত্তিরূপেই পরিণত হয়। সূক্ষ্ম ভূতাদি সঙ্গে লইয়া জীবের জন্মান্তরের কোন কথা ইহার মধ্যে নাই। বৈশেষিকেরা বলেন—ইন্দ্রিয়াদির কেন্দ্র সূক্ষ্ম মনই জীবের সঙ্গে যায়। সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টির প্রয়োজন হয় না। পরে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদি উদ্ভূত হইয়া থাকে। জৈনেরা বলেন—এক বৃক্ষ হইতে পক্ষী যেমন অন্য বৃক্ষে যায়, আত্মার দেহান্তরও ঠিক এই প্রকার। কিছু লইয়া যাওয়ার কথা কল্পনা মাত্র। শ্রুতিবাধিত মতবাদসমূহ অপ্রামাণ্য বলিয়া বহুক্ষেত্রে পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। পুনরায় তাহাদের মতবাদনিরসনের প্রচেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতি তবুও যখন বলিতেছেন—"সূক্ষ্ম অপ-সমেত জীব গমন করিয়া থাকেন", এই শ্রুতিবাক্যে অন্যান্য ভূতাদির উল্লেখ না থাকায়, প্রতিবাদীরা তখন বলিতে পারেন—ভূতাদির সূক্ষ্মাংশ লইয়াই কি জীব দেহান্তরিত হয়? এ কথা ব্যাসের কল্পনা মাত্র। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥২॥

তু (তু শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কাপরিহারার্থ) ত্র্যাত্মকত্বাৎ (ত্রি-আত্ম অর্থাৎ জল, অগ্নি ও মৃত্তিকা—এই তিন ভূত-সূক্ষ্মের সমষ্টি) ভূয়স্ত্বাৎ (অপের বাহুল্য হেতু জলবাচী অপ্-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে)।

জীব অপ্ আশ্রয় করিয়া গমন করেন বলায়, তাহা জলমাত্র নহে, ইহা উক্ত শ্রুতির ত্রিবৃৎ-করণ প্রসঙ্গের অনুধাবনে বুঝা যাইবে। ত্রিবৃৎ-কৃত ভূতই দেহাদির উৎপাদক। জল আত্মার অনুগমমান বলিলে, অপরাপর ভূতও জীবের অনুগামী হয়—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কেননা তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই তিন লইয়া ত্রিবৃৎকরণ এবং তাহার ফলে দেহোৎপত্তি। দেহে এই ত্রিধাতুই বাত, পিত্ত, কফরূপে লক্ষিত হয়। যখন ত্রিবৃৎ ব্যতীত দেহ জন্মে না, তখন পুরুষ সূক্ষ্ম আপ লইয়া গমন করেন অর্থে, ভূতত্রয়ের মধ্যে জলাংশের আধিক্যহেতু এইরূপ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীতে জলের অংশই অধিক। শরীরেও কি রস-রক্তাদির আধিক্য দেখা যায় না? দেহবীজ যে শুক্র, তাহাতেও জলাধিক্য আছে। অতএব জলের আধিক্য-হেতুই শ্রুতিতে অপ্ শব্দের উল্লেখ ভূতাদির প্রাধান্য দেখিয়াই করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যান্য সূক্ষ্মভূতাদিও আছে। কর্ম্ম দেহের নিমিত্ত-কারণ। শুধুই নিমিত্ত-কারণ দেহরচনার পক্ষে

যথেষ্ট নহে। ইহার জন্য উপাদান-করণের প্রয়োজন হয়। সূক্ষ্ম ভূতাদিই উপাদান-কারণ। তাই দেহী কর্ম্মের সঙ্গে (কর্ম্ম অর্থে সঙ্কল্প বা পুরুষকার ও অদৃষ্ট) সূক্ষ্ম ভূতাদি লইয়াই প্রস্থান করেন। সূক্ষ্মভূতাদি শুধুই অপ্ নহে, পরন্তু পঞ্চভূত, প্রাণাদি পঞ্চ প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

দেহান্তর-প্রতিপত্তির জন্য প্রাণের গতির কথা শোনা যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিও যেমন জীবের সঙ্গে যায়, প্রাণও তাহার অনুগমন করে। শ্রুতি তাই বলিতেছেন "তমুৎ-ক্রান্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি" অর্থাৎ জীব উৎক্রমণোদ্যত হইলে প্রাণও তাহার অনুগমন করে এবং এই মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণে সকল প্রাণই উৎক্রমণোদ্যত হয়। যেমন জীবদ্দশায় প্রাণগণ নিরাশ্রয় নয়, অন্য অবস্থাতেও তাহার অন্যথা হয় না। প্রাণ জলভূত আশ্রয় করিয়া জীবের সহগমন করে।

অগ্ন্যাদিগিতিশ্রুতেরিতিচেন্নভাক্তত্বাৎ ॥ ৪

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ (অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় প্রাণাদি গমন করে, শ্রুতিতে এইরূপ আছে) ইতি চেৎ (এই শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা প্রাণাদি জীবের অনুগমন করে না, এইরূপ যদি বলি) ন (না, সেরূপ বলিতে পার না) [কেননা তাহা] ভাক্তত্বাৎ (গৌণত্ব হেতু)।

শ্রুতি বলিয়াছেন—মরণকালে বাগাদি প্রাণ অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে। শ্রুতিবাক্য যথা—"তত্রাস্য পুরুষস্য মৃতাস্যাঽগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণা" তখন এই মৃত পুরুষের অগ্নিতে বাক্ ও বায়ুতে প্রাণ গমন করে। সংশয়-পক্ষ বলেন—এই শ্রুতি-প্রমাণে প্রাণ জীবের অনুগমন করে না, দেবতাদের অনুগমন করে বুঝায়। ব্যাসদেব এতদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাণের এই গমন মুখ্যার্থে গ্রহণীয় নহে। কেননা শ্রুতিতে এ কথাও আছে "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ", লোম সকল ঔষধিতে ও কেশ সকল বনস্পতিতে গমন করে। লোম ও কেশ কি ঔষধি ও বনস্পতিতে সত্যই গমন করে? বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা যে ঔপচারিক, ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। প্রাণই জীবের উপাধি। জীবের গমনাগমন প্রাণাশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? তবে যে শ্রুতি বলিয়াছেন—বাক্য ও প্রাণ অগ্নি ও জলে লয় পায়, তাহার অর্থ জীবনে বাক্‌পতি অগ্নি ও প্রাণপতি জল যেমন সহায়ক, মরণকালেও বাক্ ও প্রাণের অভিমানী জল ও অগ্নিদেবতা তদ্রূপ সহায়তাই করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবাতিরিক্ত সব কিছুই পশ্চাতে তত্তদভিমানিনী দেবতারা অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে কার্য্যকরী করিয়া রাখেন। বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ জলে লয় হওয়া অর্থে এইগুলি তত্তদভিমানিনী দেবতায় সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় লইয়া জীবের অনুগমন করে।

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এবহ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

প্রথমে (প্রথমে) অশ্রবণাৎ অগ্নিতে জলের উল্লেখ শ্রুতি বাক্যে না থাকায়) ইতি চেৎ (যদি বলি জল জীবের অনুগামী হয় না) ন (না, তাহা বলিতে পার না), [কেন বলিতে পার না?] হি (যে হেতু) তা এব (শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ জলেই বুঝিতে হইবে) উপপত্তেঃ (এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিলে শ্রুতির উক্তি অনুভূত হইবে)।

শ্রুতিতে আছে "তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাম্ জুহ্বতি", দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন। অতএব শ্রদ্ধার সহিতই ভূতাদির গমন প্রতিপাদিত হয়। আপের আহুতির কথা শ্রুতিতে নাই। তদুত্তরে বলা যায়, বেদে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ 'আপ' এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, "শ্রদ্ধা বা আপঃ", শ্রদ্ধাই আপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ প্রয়োগ থাকায়, 'শ্রদ্ধা' জল বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষের হয় না। শ্রদ্ধাও যেমন সূক্ষ্ম, দেহবীজ আপও তদ্রূপ সূক্ষ্ম। শ্রুতিতে শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, উহা আপেরই গৌণার্থ। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আপোহাস্মৈ শ্রদ্ধাং সংপমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে" অর্থাৎ আপই পুণ্যকর্ম্মে যজমানদের শ্রদ্ধা দান করে। অতএব অগ্নিতে জলের আহুতি শ্রুতিতে না থাকায় যে আপত্তির কথা উঠিয়াছিল, তাহার খণ্ডন হইল।

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৬॥

অশ্রুতত্বাৎ (শ্রুতিতে উক্ত প্রকরণে জীববোধক শব্দ নাই) ইতি চেৎ (জীব আপবেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পায়, ইহা অসিদ্ধ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) ইষ্টাদি কারিণাং (ইষ্টাদিকারী জীবের অপের সহিত

গতি) প্রতীতেঃ (এই বাক্যে আপের সহিত জীবের গমন প্রতীত হয়)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আপ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া জীবের দেহান্তরের কথা তাহাতে নির্ণীত হয় না। শ্রুতিতে আপ-বোধক শব্দ আছে বটে, কিন্তু জীববোধক শব্দ নাই।

এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করার জন্য বলা হইতেছে, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে। এই ইষ্টাদি কর্ম্ম হইতেছে যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান। বাপী, কূপ, তড়াগ-প্রতিষ্ঠার নাম পূর্ত্ত। এইরূপ কর্ম্মকারীরা পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন। শ্রুতি বলিতেছেন "আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমোরাজা ইতি" আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্তি। এই চন্দ্রমা সোমরাজ, আর সেই সোম কিরূপে উৎপন্ন হয়? "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমোরাজা সম্ভবতি" অর্থাৎ দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে সোম রাজা উৎপন্ন হন। শ্রুতিতে সোমরাজ শব্দ থাকায়, শ্রদ্ধা-শব্দ জল-শব্দের বাক্যান্তরে আপের সহিতই চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির কথা কথিত হইতেছে। যজ্ঞ-কর্ম্মের সাধন যে অগ্নিহোত্র, দশপৌর্ণমাসাদিপর্ব্ব, তাহার উপকরণাদি দধি, দুগ্ধ, সোম-রস, এই সবই আপ বলিয়া গণ্য। হোমের দ্বারা এই সকল আহুত বস্তু সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাই যজ্ঞকারীদের আশ্রয় করে। জীবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও এক প্রকার হোম। শবকে শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পুরোহিতের কণ্ঠে আজিও মন্ত্র উচ্চারিত হয় "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" অর্থাৎ এই ব্যক্তি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যথা—তুমি কি সায়ং ও প্রাতে আহুতির উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের উৎপত্তির কথা বিদিত আছ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেন—সেই সেই আহুতি হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরীক্ষপথে দ্যুলোকে গমন করে, আহ্বানীয়কে প্রতিষ্ঠা দান করে, দ্যুলোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা পুনঃ প্রত্যাগত হয়। অনন্তর মর্ত্ত্যে পুরুষের স্ত্রী দেহে হুত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে পরিণত হয়। এই প্রকরণ-বাক্যে স্পষ্টই প্রতীত হয়, অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য কর্ম্মের আহুতি সূক্ষ্ম শরীরে যজমানের ফলোৎপাদনের জন্য লোকান্তর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। জীবও আহুত হইয়া ধূমময় আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগের জন্য উৎক্রমণ করিয়া থাকে। যদিও শ্রুতিতে উৎক্রমণ পক্ষে জীববোধক শব্দ নাই, তত্রাচ উপরোক্ত প্রকরণবাক্য-সকলের মধ্যে জীবের পরলোক-গমন সুস্পষ্ট হয়। তবুও প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রুতিতে আছে—যাঁহারা ধূমাবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃযানপথে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্র প্রাপ্ত হয়। ইহারা দেবতাদিগের অন্ন, যথা—"এষ সোমরাজা তদ্দেবানাম্ অন্নম্ তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি" অর্থাৎ এই চন্দ্র রাজা দেবতাদিগের অন্ন, দেবতারা ইহাকে ভক্ষণ করেন। আরও আছে "তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাং স্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায় স্বেত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি" অর্থাৎ তাহারা চন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদের চন্দ্ররাজের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিতে করিতে তাহাদের ভক্ষণ করেন।

প্রতিপক্ষ বলেন—জীব আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া জন্মে ও আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া উৎক্রমণ করে এবং ঐহিক জগতে ইষ্টাদি কর্ম্মজনিত চন্দ্রলোকে গিয়া ফল ভোগ করে, আবার ভোগান্তে আপোময় বীজের ন্যায় নারী ও পুরুষের মধ্য দিয়া পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপরোক্ত শ্রুতি-বচনের দ্বারা বুঝা যায়—জীবেরা চন্দ্র প্রাপ্ত হওয়া মাত্র দেবতাগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। দেবতাদের উদরস্থ হইয়া তাহারা কি প্রকারে স্বকর্ম্ম ফলভোগ করিবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥৭॥

ভাক্তং (ঐরূপ অন্ন-কথন মুখ্য নহে) হি (যেহেতু) অনাত্মবিত্ত্বাৎ (তাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা অবিদিত অনাত্মা অতএব পশুবৎ দেবভোগ্য) তথাহি দর্শয়তি (শ্রুতি এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন)।

মূল সূত্রে "বা" শব্দ আছে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি বিশোধিত হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে, জীব চন্দ্রবৎ হইলে দেবতারা যখন তাহা ভক্ষণ করেন, তখন ব্যাঘ্রের উদরস্থ প্রাণীর ন্যায় তাহার কর্ম্মফলভোগাদির অবকাশ

রহিল কই ? বক্ষ্যমান সূত্রে বলা হইতেছে, জীবের ঐ চন্দ্রের ন্যায় অন্নত্ব মুখ্যার্থে গ্রহণীয় নহে। অন্নের ন্যায় পরলোকে জীব যদি চর্ব্বণ দ্বারা দেবতাদিগের গলাধঃকৃত হইবে, তাহা হইলে শ্রুতিতে বলিবে কেন "স্বর্গকামঃ যজ্ঞে" স্বর্গকামনায় যাগ করিবে। স্বর্গে যদি দেবতাদের ভোগ্য-স্বরূপ যাইতে হয় অর্থাৎ সিংহ, ব্যাঘ্রের ন্যায় দেবতারা যদি জীবকে ভোজ্য করিয়া লন, তবে জীবধর্ম্মে এই যজ্ঞোপদেশ নিরর্থক হয়। শাস্ত্রের আনর্থক্য স্বীকার্য্য নহে ; অতএব অন্ন শব্দ গৌণার্থে গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—দেবতারা অন্নপ্রায় পরলোকগত জীবকে ভক্ষণ করেন। এই ভক্ষণ চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ নহে, ভোগের সাধন বলাই সঙ্গত। লৌকিক বাক্যে আছে "বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশাম্" প্রজাগণ রাজগণের অন্ন, এবং পশুরা প্রজাদের অন্ন। এতদর্থে অন্ন বলিয়া রাজা কি প্রজার চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিয়া ভক্ষণ করেন ? অথবা বৈশ্যেরা পশুদের উদরস্থ করে ? অন্ন অর্থে ভোগ্যবস্তু। সংসারে স্ত্রীপুত্র, মিত্র প্রভৃতি জীবের ভোগ্য। ভোগ্য বলিয়া ভক্ষ্য বস্তু নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতি এ কথাও বলিয়াছেন "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেত দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি"—দেবতারা ভোজন করেন না, তাহারা সেই সেই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। অমৃত শব্দের অর্থ সুখ-সাধন দ্রব্য। দেবতারা নয়নে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দৃষ্টিসুখ ভোগ করেন। ভূতাদির আশ্রয়ে দেবতাদিগের এই ভোগ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ।

মর্ত্ত্যজীব পুণ্যকর্ম্মজনিত যে সূক্ষ্মতনু লাভ করে, তাহা অমৃতস্বরূপ। এই পূত সূক্ষ্ম তনু দেবতাদের ভোগোপকরণ। শ্রুতি কিন্তু এই সকল পুণ্যকর্ম্মকারীদের অনাত্মবিৎ বলিয়াছেন। গীতায় আছে—যাহারা বেদের পুষ্পিত বাক্যে অপহৃত চিত্ত হইয়া জন্মকর্ম্মফলপ্রদ স্বর্গ কামনা করে, তাহারা বুদ্ধি সমাধি-লাভ করে না। বেদের ত্রৈগুণ্য বিষয় পরিহার করিয়া হে অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণ-বর্জ্জিত হও। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখে এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকে তাঁহাকে বেদ-নিন্দুক আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। গীতায় তিনি শ্রুতির মহিমাই অনুবৃত্তি করিয়াছেন। শ্রুতি ইষ্টাদি পুণ্যকর্ম্মকারীরা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, তাহারা দেবগণের উপভোগ্য, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবাং স দেবী নাম"। অনন্তর যে অন্য দেবতাদের উপাসনা করে, আমি এই ও উনি আমার উপাস্য—এইরূপ ভেদবুদ্ধি আশ্রয় করে, সে আপনাকে জানে না। পশুর ন্যায় দেবতাগণ তাহাদের দেখিয়া থাকেন। অর্থাৎ পশুরা যেমন গৃহস্থের ভোগের কারণ হয়, জীবগণ তদ্রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা পরলোকে দেবতাদের বাহন হইয়া পশুর ন্যায় দেবসেবা করিয়া থাকে।

এই উক্তির প্রতিধ্বনি গীতাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা বেদবিরহিত মত নহে, পরন্তু বেদেরই সমর্থন—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। গীতায় যেমন আছে, "অন্তবত্তু ফলম্ তেষাম্ তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" অল্পমেধসা জীবের জন্য বেদের কাম্য কর্ম্ম বিহিত আছে। সে কর্ম্ম চিরস্থায়ী ফল প্রদান করে না। তাই গীতাকার বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

যজ্ঞকারী প্রার্থিত ফলভোগান্তে ক্ষীণপুণ্য হইয়া মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করে। শ্রুতি বলিতেছেন, "স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে"—সোমলোকে তাহারা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানা-মানন্দাঃ স এব কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভি-সম্পদ্যন্তে"। অনন্তর যাঁহারা পিতৃলোক জয় করিয়া যে আনন্দলাভ করেন, তাহা কর্ম্মদেবদিগের তুল্য আনন্দ। যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্বলাভ করেন, তাঁহারাই কর্ম্মদেব। ইষ্টাদি কর্ম্মের এই প্রশংসাবাণী শ্রুতিতে থাকায়, তাহাদের অন্ন বলা হেতু দেবতাগিগের ভক্ষ্যস্বরূপ যে ইহা নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। এখানে অন্ন-শব্দ গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর জীবনে "রংহতি অনপরিম্বক্তঃ" অর্থাৎ অপের পরিবেষ্টনে দেহান্তর ও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। একথায়ও আপত্তি নিষেধিত হইল। (ক্রমশঃ)

সূর্য্যাস্ত

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্তব্ধ হয়ে গেছে চারিদিক। সূর্য স'রে যাচ্ছে পশ্চিমে। মলিন বিবর্ণ সোনার মত ধূলিময় পথগুলি প'ড়ে আছে। জন নেই, যান নেই, কোলাহল নেই। গ্রামখানি স্তব্ধ।

লিয়াং-চিন্-পাও মুখ তুলে জানালায় চাইল: ধূ ধূ করছে প্রান্তর। পথের পাশের বাড়ীগুলি কোনটা গেছে গুঁড়িয়ে,—কোনটা নির্জীবিত নগ্ন কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে। মাঠের ফসল সম্পূর্ণ হয়নি কাটা,—কে এক দুরন্ত দৈত্য যেন তাদের মাঠের মধ্যে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত ক'রে চ'লে গেছে।

আকাশটা যেন এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে! দু'একটা হাল্কা সাদা মেঘ ভাসছে এদিক-ওদিক,—আর কিছু নয়—একটা পাখীও নয়। জাপানী বিমানগুলো গেছে ফিরে, হয়ত নিচ্ছে ক্ষণিকের একটু বিশ্রাম। কিন্তু আবার যদি আসে, আবার যদি আরম্ভ হয় সেই নৃশংস হত্যার তাণ্ডব! ...লিয়াং-চিন্-পাও শিউরে দু'চোখ বুজল।

বিছানার ওপর অসুস্থ স্ত্রী ন'ড়ে উঠেছে। আবার বুঝি বেদনাটা জাগছে বেচারীর। জানালা থেকে চিন্-পাও স্ত্রীর শিয়রে এসে বসলো, একখানি হাত রাখল তার কপালে,—রেখে ব'লে উঠ্ল, "কী গো, বেদনাটা বাড়ছে বুঝি এখন?"

অসহ্য যন্ত্রণায় চিন্-পাওয়ের স্ত্রীর মুখখানি নীল হ'য়ে আসছে, কোমরে হাত দুটো রেখে কোনরকমে সে ব'লে উঠ্ল, "ডাক্তার কখন আসবে?"

ডাক্তার! লিয়াং-চিন্-পাও সন্তর্পণে একটি নিঃশ্বাস ফেল্লে। জাপানী বোমার ভয়ে এ গ্রামে আর একটি জনপ্রাণীও নেই, সব গেছে পালিয়ে। সহর এখান থেকে অনেক দূরে,—তা'ছাড়া গ্রামের সংগে তার সব যোগাযোগ জাপানীরা দিয়েছে ছিন্ন ক'রে। নিঃসম্বল নিঃসহায় চিন্-পাওয়ের জন্য ডাক্তার আসবে কোথা থেকে! তবুও ব্যথিত স্ত্রীর করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে চিন্-পাওকে মিথ্যা বল্‌তে হ'লো, বল্লে, "ডাক্তার! হাঁা, এখুনি এসে পড়বে।"

"কিন্তু, বড্ড যে কষ্ট হচ্ছে আমার!"

কষ্ট! লিয়াং-চিন্-পাও স্ত্রীর মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কষ্ট,—তা একটু হোক্। এ কষ্টের মত আনন্দ আর নেই। দীর্ঘ পনেরো বৎসর কেটে গেছে তাদের বিয়ে হ'য়েছে। কিন্তু একটি সন্তানও আসেনি তাদের মাঝে,—তাদের এতো চাওয়ার মধ্যেও! কিন্তু আজ, আজ আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের! এ' আনন্দের আছে প্রসব-বেদনার কষ্ট, কিন্তু তা আর কতটুকু! নাই বা রইল কোনো আত্মীয় পরিজন, নাই বা রইল কোনো প্রতিবাসী, নাই বা রইল কোনো ভূসম্পত্তি,—যাক্—সমস্ত ধংস হ'য়ে যাক্ জাপানী বোমায়,—কিন্তু শুধু—শুধু বেঁচে থাক্ ঐ চির-আকাঙ্ক্ষিত অমৃতময় শিশু,—ভ'রে তুলুক সমস্ত অভাব তার নবীন রক্তের উষ্ণতা দিয়ে—উচ্ছলতা দিয়ে! আবার হ'বে, আবার সব হ'বে এই শিশু বেঁচে থাকলে। দরিদ্র গ্রাম্য চৈনিক মাতাপিতার রক্ত বহুক তার শিরায়-শিরায়! চীনদেশের নবীন শিশু, বড়ো হ'য়ে উঠুক আবার আপন গৌরব নিয়ে!

চিন্-পাওয়ের স্ত্রী এই সময়ে আবার অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লো, "ওগো, সময় যে হ'য়ে এলো, ডাক্তার না আসে, ডাকো না প্রতিবাসী কাউকে?"

একটু হাসলো চিন্-পাও। ডাকবে কাকে? গ্রামখানি আজ একেবারে জনহীন। সবাই পালিয়েছে, শুধু তারা—শুধু তারাই আঁকড়ে প'ড়ে আছে তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিকে!—যেখানে লিয়াং-চিন্-পাওরা বংশানুক্রমে নিয়েছে জন্ম, সেখানেই আবাহন করতে এক অমৃতময় নবীন শিশুকে!

চিন্-পাও উঠে দাঁড়ালো। সময় হ'য়েছে, সময় হ'য়ে এসেছে সেই আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের এই পৃথিবীর মুখ দেখ্‌বার! নাই বা থাক্‌লো ডাক্তার, নাই বা থাকল কোনো ধাত্রী, নাই বা থাকল পরিজন, চিন্-পাও একাই সব ভার নেবে—একাই করবে সমস্ত!

* * *

তাই হ'লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্বিঘ্নে শিশু হ'লো ভূমিষ্ঠ। চির-আকাঙ্ক্ষিত অমৃতময় শিশু! তাকে কোলে নিতেই আনন্দে চিন্-পাওয়ের বক্ষ উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল।

সমস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে এই নবীন প্রাণের জাগরণ! স্ত্রীর উৎসুক দৃষ্টির দিকে চেয়ে সে বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "খোকা! খোকা হ'য়েছে আমাদের!"

স্ত্রীর মুখে ফুটে উঠ্‌ল তৃপ্তির হাসি। তার খোকা,—তার শিশু—একান্ত তা'র! সমস্ত গ্লানি—সমস্ত বেদনা যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল মুছে! একান্ত আগ্রহে হাত দুখানি সে বাড়িয়ে দিলে,—"ওগো দাও, আমার কোলে একটু দাও!"

"দাঁড়াও",—চিন্‌-পাও ব'লে উঠ্‌ল, "আগে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আসি? হ্যাঁ, ভাল কথা, গরম জল লাগ্‌বে যে, গরম জল,—ঠাণ্ডা জলে চল্‌বে না।"

"গরম জল? দাঁড়াও,"—স্ত্রী এবারে একটু ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। কিন্তু চিন্‌-পাও বাধা দিলে, বল্লে, "আহা করো কী, করো কী! এই দুর্বল শরীর, উঠ্‌লে যে মারা পড়্‌বে! আরে দেখোই না, সব আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। রান্নাঘরে উনুনে আগুন ছিল দেখে এসেছি, একটু গরম জল ক'রে নিতে আর ক'মিনিটই বা লাগ্‌বে?" চিন্‌-পাও ছেলেকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে চললো।

ঘরে আর কেউ রইল না। একা লিয়াং-চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রী। পাশের জানালায় নজর কর্‌লে দেখা যায় মাঠ—আর এককালি আকাশ। সূর্য-কিরণ ছড়িয়ে আছে মাঠে। চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রীর ভারী ভালো লাগ্‌ল। তার শিশু, একান্ত ক'রে তার! অপরের শিশুকে কোলে নিয়ে আদর কর্‌লে তার মা মুখ ভার কর্‌ত;—এবার আর কর্‌বে না, এবার যে সে নিজেই মা,—এ যে তার নিজেরই শিশু! তার নিজের সন্তান! ক্রমশঃ বড়ো হ'য়ে উঠ্‌বে, প্রতিবাসীর ছেলেদের মত যাবে পাঠশালায়—পড়্‌বে বই। তারপরে আরো বড়ো হ'বে। কিন্তু তা' বলে সকলের মত অতো শীগ্‌গির শীগ্‌গির মাঠে গিয়ে শস্যের তত্ত্বাবধান করা,—এ' সে তার ছেলেকে কিছুতেই করতে দেবে না। স্কুলের পাঠ শেষ হ'লে সে তাকে পাঠাবে সহরে,—সেখানে সে পড়্‌বে—আরও পড়্‌বে,—সেখানে কত বড় বড় স্কুল কলেজ! অবশ্য এতে প্রতিবাসীরা একটু মুখ ভার-ভার কর্‌বে, তা' করুক,—ছেলের বড়ো হ'য়ে ওঠার কাছে ও'সব কিছুই নয়। খোকা হ'বে মস্ত পণ্ডিত, কর্‌বে চাকুরী, আন্‌বে অনেক টাকা! তারপরে সে খোকার বিয়ে দেবে। টুকটুকে সুন্দরী একটি বউ হ'বে তার। সেই ও'পাড়ার মিন্‌-চাওদের মেজো ছেলের বউ হয়েছিল যেমন্ টুক্‌টুকে আর সুন্দর, ঠিক সেই রকম। ছেলে আর বউ তাকে ডাক্‌বে 'মা' বলে। মা, মা হয়েছে সে আজ! কী সুন্দর তার শিশু, তার সন্তান,—তাকে সে কোলে নিতে এখনো পারেনি;—এইবার নেবে, পরিষ্কার হ'য়ে এ'ঘরে এলে তাকে কোলে নেবে! তার শিশু, একান্ত ভাবে তারই!—ওঃ ঈশ্বর, কী ব'লে যে ধন্যবাদ জানাবো তোমায়!—চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রী আকাশের দিকে লক্ষ্য ক'রে দু'হাত মুঠো কর্‌ল।

ক্রম্ ক্রম্,—হঠাৎ ভীষণ শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে আকাশ থেকে যেন আশীর্ব্বাদ কর্‌তেই ধ্বংসের দেবতা ধরিত্রীর বুকে নেমে পড়্‌লেন। বোমার শব্দ—আর জাপানী বিমানের ঘর্ঘর মুহূর্ত্তে যেন একসংগে করতালি দিয়ে উঠ্‌ল! চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রী শিউরে দু' চোখ বুজ্‌লো। যখন চোখ খুল্‌লো, তখন চারিদিক ভ'রে গেছে ধূমরাশিতে।...ওঃ ঈশ্বর ধন্যবাদ তোমায়! রক্ষা পেয়েছে, বোমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এই ঘরখানি! চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রী এবারে শয্যা ছেড়ে উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। অজস্র ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, রক্ষা পেয়েছে সে, রক্ষা পেয়েছে তার ঘর!

কিন্তু এতো দেরী কেন? সেই যে রান্না ঘরে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে স্বামী ঢুকেছে, এখনো বেরোয় না কেন? আর সত্যই ত, পুরুষদের দিয়ে কী আর ও'সব কাজ হয়? যে কাজ পাঁচ মিনিটের, সেটাতে ওরা লাগিয়ে দেবে দশ মিনিট! চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রী এবারে উঠে আস্তে আস্তে মেঝের উপরে দাঁড়ালো। শরীরটা বড়ো দুর্বল, মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে। কিন্তু তবুও, তবুও তাকে রান্নাঘরে যেতে হ'বে, স্বামী ঠিকমত পার্‌ছে কিনা, কে জানে? ধীরে ধীরে সে দেয়াল ধ'রে ধ'রে রান্নাঘরের দিকে এগুতে লাগ্‌ল।

সূর্য্য তখন ডুব্‌ছে;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঠের শেষে ডুবে গেল। ভারী সুন্দর—শান্ত একটি সূর্য্যাস্ত। চিন্‌-পাওয়ের স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু একী! কোথায় তার স্বামী—কোথায় তার শিশু-সন্তান! সারাটা রান্নাঘর জাপানী বোমার নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলায় একেবারে ধূলিসাৎ! স্বামী আর শিশুর চিহ্নটুকুও সেখানে নেই।

—অদূরে ধূ ধূ কর্‌ছে প্রান্তর,—সূর্য্যদেব ডুবে গেছেন।*

* চীনের আধুনিকা লেখিকা 'মিস্ মান্‌-কুয়েই-লি'র "Uuder the Bombs" গল্প অবলম্বনে।

শিক্ষা ও ধর্ম্ম

অধ্যাপক রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি

প্রবর্ত্তকের শ্রাবণ সংখ্যায় সমাবর্ত্তন উপলক্ষে সঙ্ঘ-গুরুর আশীর্ব্বাণী প্রকাশিত হয়েছে দেখলুম; এটার সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধিৎসা খুবই। অনেককাল আগে বিবেকানন্দজীর কোন রচনায় পেয়েছিলাম, Godless education. তিনি বর্ত্তমান কালের শিক্ষাকে উদ্দেশ করেই বলেছিলেন, Godless education. কথাটা তখন আমি তলিয়ে বুঝিনি; আমাদের স্কুলে moral class বস্‌তো শনিবার-শনিবার। তাতে অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগ পড়ান হ'ত। আমি ভেবেছিলুম, সেই রকম একটা কিছু হ'বে। উত্তরকালে যত এসম্বন্ধে ভেবিছি তত নূতন নূতন অনুভূতি জেগেছে। আজ সঙ্ঘগুরুর প্রদত্ত আশীর্ব্বাণীতে সেই সব কথাই আবার স্মরণ করানো, "ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা।" আধুনিক কালের কোন একটা কিছু অবলম্বন বিহীন শিক্ষা আমায় বার বার পীড়িত করেছে। আমি দেখেছি যুবক, কৃতি—খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে-না-গোছের, তার অবস্থা; কেমন যেন মুসড়ে পড়ে, কাজকর্ম্মে তেমন যে আনন্দ পায় তা বলে বোধহয় না, শেষকালে অবসরের আলস্যবিনোদন করে ছবি দেখে' আর সিগারেট পুড়িয়ে। কিন্তু জ্বলুনি ত তার কমে না! বোধ হয় এ কথা সত্যি, The son of man has nowhere to rest his head. সাজানো সংসারের অতৃপ্তির মাঝে ত্যাগের বাঁশি বেজে থাকে। এ কেবল অধ্যাত্ম অবলম্বন হ'লে অনুভূত হয়, মনের অহরহ উদ্বেলিত তরঙ্গ অনেক শান্ত হয়ে আসে। মন আমাদের স্বার্থকেন্দ্রী, তাই অন্যের সুবিধা-অসুবিধা, দুঃখ-সুখ সম্বন্ধে আমরা এত অচেতন। সত্যকার শিক্ষা আমাদের পরার্থ-অভিসারী করে। আমরা স্কুল কলেজে যা' শিক্ষা পেয়ে থাকি তা' আমাদের জীবনে বেঁচে থাকবার খোরাক এককালে যোগাত, আজকাল তাও যোগাচ্ছে না, চাকুরী মেলা ভার হয়েছে। আমাদের অর্থানুগ শিক্ষা বিশ্বাতিগ হ'বে কেবলমাত্র অধ্যাত্ম অবলম্বনের উপর। আমি ত তাই মনে করে আসছি। ঠিক কি ভুল জানিনে। নিজের সঙ্কীর্ণ জীবনকে ব্যাপকতর করে' দেখতে হ'লে, ঈশ্বরানুগ শিক্ষা বই আর গতি কৈ! এ প্রশান্তির দিকে কি ছাত্র, কি অভিভাবকদের দৃষ্টি নেই কেন? আমি ভাবি যে, কেবল, দুবেলা আহ্নিক, জপ-ধ্যানেই আমাদের ধর্ম্মজীবন পর্য্যবসিত নয়, সদাচার সৎনিষ্ঠা প্রতি মুহূর্ত্তের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। ঠাকুর বলতেন মন-মুখ এক করার কথা; সে অনেক বড় কথা—তবু অল্পবিস্তর অভ্যাস-প্রচেষ্টা রাখা চলতে পারে ত? সমস্ত জীবনটাকে যদি ধরে নিই শিক্ষাবস্থা, জীবনটা গড়ে তোলাই সে শিক্ষার উদ্দেশ্য। জীবন নিখুঁত নয় বলেই ত তাকে গড়ার কথা উঠছে। প্রচেষ্টায় সাফল্যের চাইতে নিষ্ফলতাই জমে উঠবে বেশি, তবুও তার মাস-মাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমার দৃষ্টিশক্তি বাড়াবে না কি? পুঁথি আহরিত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে মানি, তবু যেন মনে হয়, সংগ্রহটাই মানুষের সব নয়। বেশি সার পেলে গাছের বাড় বাড়ে, কিন্তু ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। আমি কামনা করি, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষায়তনের বিদ্যার্থীরা যেন অপরের সুখ-সুবিধা বোধের দিকে সচেতন থাকে; যেন তারা শিক্ষার সৌরভটি মনে-প্রাণে গ্রহণ ও বিতরণ করে, কেবল শিক্ষার ভার বয়ে ঘুরে না বেড়ায়। "ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জীবনের প্রতিষ্ঠায়" তাদের যেন আত্মবিস্মৃতি ঘটে, তাদের হৃদয় যেন সম্প্রসারিত হয়। জড় বিজ্ঞান আমাদের অধ্যাত্ম বিষয়ে অবিশ্বাসী করেছে, দর্শনকে আমাদের দেশাচারে লোকাচারে সঙ্কীর্ণ করেছে, এ দুটোর সামঞ্জস্য কবে হ'বে কে জানে?*

* দার্জ্জিলিঙের সেন্ট জোসেফ কলেজের অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল। প্রঃ সঃ

দেশপ্রিয়-স্মরণে

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্ত-অশ্বে সূর্য্যের মতো জ্যোতিঃকণা বিথারিয়া
তুমি এসেছিলে এই ধরণীর কোলে,
তোমার আলোকে আলোকিত হ'ল পথ ঘাট প্রান্তর,
অন্ধকারের যাত্রীরা পেলো দিশা,
যারা হেঁটেছিলো যুগ যুগ ধরি' সর্ব্বনাশের পথে
যারা ভেসেছিলো অন্যায় আর অত্যাচারের স্রোতে,
বন্ধুর মতো তাহাদের তুমি নিজে এসে দিলে কোল
তাদের চেনালে জন্মভূমির রূপ
কতো গরীয়সী, কতো মহিয়সী সে যে!

আজ তুমি নাই—নির্জন ঘরে বসে আছি চুপচাপ
তোমার বিরাট্ মহান্ মূর্তি কেবলি পড়িছে মনে
কাল এসে হায় অসময়ে তোমা মুছে নিলে নিঃশেষে,
ঝ'রে পড়ে গেলো এক নিমেষেই বিপুল সম্ভাবনা!
হে বিরাট্! আমি তবু জানি, তবু জানি,
সাধনা তোমার ব্যর্থ হ'বে না কভু
সারা ধরণীর প্রিয় তুমি আজ, শুধু নহ দেশপ্রিয়,
আজিকে তোমার স্মৃতির বাসরে প্রণাম রাখিল দেশ
সার্থক করো করিয়া গ্রহণ তারে।

ভূস্বর্গ রোডেশিয়াঃ আফ্রিকা

(ইম্‌তালি)

ভূপর্য্যাটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পোর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকার সীমান্ত ছাড়িয়ে যখন ইম্‌তালীতে পৌছলাম, মনে হলো যেন স্বর্গরাজ্যে এসেছি। আকাশে-বাতাসে সর্ব্বত্র প্রফুল্ল শ্রী ও সৌন্দর্য্যের অনুভব করলাম। ইম্‌তালী, পোর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকার বেইরা বন্দর হতে প্রায় দু'শ মাইল। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে

জাঞ্জিবর সুন্দরী : আফ্রিকা। এরা বিচিত্র রঙিন পোষাকপ্রিয়। জাপান আফ্রিকার অভ্যন্তরেও বাজার বিস্তার করেছে

ক্রমোচ্চ পার্ব্বত্য পথ। ইম্‌তালীর উচ্চতা সমুদ্র তীর হতে অন্ততঃ সারে চার হাজার ফুট। তার পরই প্রায় সমতল ভূমি। এত উঁচুতে এত বড় সমতল ভূখণ্ড আর কোথাও আছে কিনা, জানি না; অন্ততঃ আমার চোখে পড়েনি। শুনেছি তিব্বতে এইরূপ উঁচু পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড সমতল দৃষ্ট হয়। তিব্বতে যাইনি বলে তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শিলিগুড়ি হতে দার্জ্জিলিঙে যাবার পথে অনেকটা কার্শিয়াং-এর মত ইম্‌তালি। নিম্নভূমির জামাজোড়া বদলে গরম পরিচ্ছদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

ইম্‌তালী সহরটাতে আসার পর মনে হলো যেন কোন ইউরোপীয়ান গ্রামে এসেছি। গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রশস্ত একটা পথ লম্বালম্বি চলে গেছে। পথের দু'ধারে বড় বড় দোকান ইউরোপীয় পণ্যে বোঝাই। দোকান-গুলির পেছনে ছোট ছোট গলি। এই সব গলিতে ভারতীয়, ইউরোপীয় এবং অর্দ্ধ নিগ্রোরা আরামে দিন কাটায়। কিন্তু সহরে কোথাও একজনও খাঁটী নিগ্রোকে বাস করতে দেখিনি। আমি কখন লিখ্‌ছি গ্রাম, আবার কখন লিখছি সহর। এতে হয়ত অনেকের ধাঁধাঁ লাগতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ইম্‌তালী ইউরোপীয় ধরণের গ্রামমাত্র। আশে পাশে কোথাও গোলাবাড়ী নেই। গোলাবাড়ী (Firm house) থাকাটাই হলো আমাদের দেশে গ্রামের লক্ষণ। ইউরোপীয় গোলাবাড়ী বল্‌তে যা বুঝায় তা বৃহৎ এবং তাতে অনেক লোক খেটে থাকে। ভারতে তেমন গোলাবাড়ী নাই বললেও চলে। ভারতে ইহা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতের কোথাও ইউরোপীয় ধরণের গ্রাম কি সহর নেই। এমন কি এদেশে যাকে বলি আমরা City বা নগরী তাও ঠিক ওদেশের নগরের সঙ্গে তুল্য নয়। এই হিসেবে আমাদের কলিকাতা গ্রাম এবং সহরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। ইউরোপের সহরে বা গ্রামে অথবা নগরীতে কোথাও গরু এবং মানুষ একত্রে থাকে না। কলিকাতাকে গোলাবাড়ী সমন্বিত অর্দ্ধ গ্রাম বলা চলে। শ্বেত সাহেবরা মনের মত করে ইম্‌তালিকে রচনা করেছে। পথে-পথে, গৃহে-গৃহে, কুঞ্জে-কুঞ্জে বিজলী বাতির বাহার দেখে মনে হলো জাপানের বারবণিতাপূর্ণ ষ্ট্রীটকেও যেন ইহা হার মানিয়েছে। স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মত বিচিত্র আলো নৈশ পথকে স্বপ্নময় করে তুলেছে। পথিপার্শ্বে সযত্ন রোপিত বৃক্ষরাজি সারা সহরকে

নন্দন কাননের রূপ দিয়েছে। এরূপ সুদৃশ্য মনোহারী স্থান একমাত্র প্রিটরিয়াতেই দেখেছি, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দেখিনি। নীলাভ ছোট ছোট ফুলের গুচ্ছ বৃক্ষ শ্রেণীকে সুন্দরতম করে তুলেছে। সুস্নিগ্ধ বাতাসের অপূর্ব্ব সুন্দর গন্ধ পথচারীর মনকে আমোদিত করে। সত্যই ইম্‌তালিতে এলে মানুষ এখানের মায়ায় মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত অর্থ নৈতীক উন্নতি না হবার জন্য, কৃষিরও উন্নতি হয়নি। আমরা আজও মধ্য যুগের বাজার পদ্ধতি মেনে চল্‌ছি। যুগের সঙ্গে সমান পদক্ষেপ ফেলে আমরা চলতে পারিনি। আধুনিক ও প্রাচীন এই দুই রকম বাজার পদ্ধতিই আফ্রিকায় এখনও প্রচলিত। রোডোসিয়াতে ডমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর থেকে পুরাতন রীতি লোপ পেয়ে জীবনধারা দ্রুত আধুনিক রূপ পাচ্ছে।

যে কোন জিনিষই চাষা উৎপাদন করে তার হিসাব সঠিকভাবে বাজার সরকারকে (Market Clerk or producers Association Clerk) দিতে হয়। তাতে অন্যথা করলে গুরুতর শাস্তি পেতে হয়। শাস্তির ঠেলায় কোনরূপ চালাকী চলে না। প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যেরই পাইকারী বাজার আছে। এই বাজারে উৎপন্ন জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সব্‌জীর কথাই ধরা যাক। সব্‌জী - উৎপাদনকারী সপ্তাহে দুইদিন মাত্র সব্‌জী বিক্রয়ার্থে পাইকারী বাজারে এনে থাকে। অন্যান্য দিন যদি অপ্রকাশ্যে যার তার কাছে তার গোলাবাড়ীতে বসেই কিছু সব্‌জী বিক্রয় করে এবং তা ধরা পড়ে, তবে তাকে এজন্য প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে হয়। সেজন্য অনেক সময়ে সব্‌জী-উৎপাদনকারী কাহাকে সব্‌জী উপহার পর্য্যন্ত দিতে রাজি হয় না।

সব্‌জী এবং ফল উৎপাদনকারীরা পাইকারী বাজারে এসেই তাদের উৎপাদন দ্রব্য সাজিয়ে রাখে এবং Producer's Association-এর কেরাণীর জন্য অপেক্ষা করে। কেরাণী সকালে সাতটার সময় আসেন এবং একদিক থেকে এক একটি পুরো "ষ্টক" নিলামে বিক্রি করেন। নীলামে বিক্রির টাকা তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাকে রসিদ দিয়ে থাকেন। যখনই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কোনও একটা দ্রব্য উপযুক্ত দামে নিলামে চড়ছে না, তখনই তার বিক্রয় বন্ধ হয়, এবং ওজন দরে তা Producer's Association ক্রয় করে' তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে' ফেলেন। সেজন্য মারকেটের কাছেই একটি মেশিনও থাকে। জিনিষ নষ্ট হবে ভয়েই অনেক সব্‌জী এবং ফল উৎপাদনকারী অনর্থক কিছুই বেশি উৎপাদন

গোলাবাড়ীর নারী শ্রমিক। এরাও বিচিত্র অলঙ্কারপ্রিয়

করে না। উৎপাদনকারীরাই চাহিদা ঠিক ক'রে সকল জিনিষ উৎপাদনের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকে। এতে সময়ের লাঘব হয়, মজুরকে তার উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়া হয় এবং সকল বিষয় সুশৃঙ্খল হয়ে দেশটার সর্ব্বত্র সুখের বিরাজ করবার সুব্যবস্থা হয়। আমরা প্রলিটারিয়েট বলে একটা শব্দ উচ্চারণ করি, কিন্তু তার অর্থ মোটেই বুঝি না। তার মানে না বুঝ্‌বার একমাত্র কারণ হলো আমাদের দেশে পাশ্চাত্য মজুরী প্রথা এখনও আমদানি হয়নি।

যাও। আরো চীৎকার করে বললাম, কেন—কিহেতু? আমার গায়ের রং কালো বলে বুঝি। এই ফুটানি খাটবে না, আমাকে এখানেই টিকিট দিতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত পোষ্টমাষ্টার আমাকে টিকিট দিতে বাধ্য হ'ল।

ব্রাহ্মণ তো আমার কাণ্ড দেখে অবাক। আমি বললাম, এই ভাবে নিজের দাবী আদায় করেন না কেন। যত 'নাই' দিবেন ততই তারা পেয়ে বসবে। মহাত্মা গান্ধী এই আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপুল আন্দোলন চালিয়েছিলেন। আমি অনেক স্থলেই এই ভাবে কৃতকার্য্য হয়েছি। আমার কথা না শুনলে আমি দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার ও হল্লা লাগিয়ে দিতাম। অবশ্য এই সব শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী প্রভুত্ব করে' করে' উদ্ধত হয়ে পড়েছে। অনেক সময়ে দুর্ব্বল দেখলে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমার পারিবারিক বন্ধন নেই, জেল-ফাঁসিকে ভয় করবার কিছু নেই। একটা লাথি মারলে আমি তার প্রত্যুত্তরে তিনটা লাথি মারার শক্তিও রাখি এবং তার জন্য প্রস্তুতও হয়ে থাকি। তবে একটা জিনিষ আমি বরাবর সর্ব্ব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি। শক্তিমান জাতি এরা। শক্তির দাপটে দুনিয়া শাসন করছে। শক্তিকে এদের অধিকাংশই শ্রদ্ধা করে। এদের নীরব সমর্থন আমি বহু ক্ষেত্রে পেয়েছি। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে' বলার দরকার। ধরুন পাঁচ জন ইউরোপীয় আছে আর আমি একা। একজনের সঙ্গে বচসা হ'ল, বললাম, আসুন বল পরীক্ষা করি (come on fight)। যদি সাহস করলো তো বল পরীক্ষা হ'ল। বিজিত জয়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সরে পড়লো। এ ক্ষেত্রে বাকী চারজন গায়েপড়া হয়ে মারপিট না করাই ওদের রীতি। আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টোটা। শক্তের ভক্ত আর নরমের যম। একটা ছাড়া-চোরকে ধরতে সাহস হবে না, কিন্তু ধরা পড়লে তার উপর বীরত্ব দেখাতে সহস্র লোক কিল-চড় উঁচিয়ে এগিয়ে আসবে। দীর্ঘ পরাধীনতায় কাপুরুষতা আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বৃহৎ জাতীয় আদর্শে আমাদের ঐক্য দরকার সেখানে একটুখানি ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রলোভনই আমাদের আদর্শচ্যুৎ করতে পারে। আমাদের নির্য্যাতীত হবার হেতুও এই-ই।

ইম্‌তালির নেতা সেই পাঠান-ভাইয়ের প্রচেষ্টায় লাইব্রেরী হলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের এক সম্মিলিত সভা হ'ল। সভায় আমি আমার দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। সভায় তখন তখনই আমাকে দশ পাউণ্ড উপহার দেওয়া হ'ল। জাম্বাবীর ধ্বংসস্তূপ, ভিক্টোরিয়া লেক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখে যাবার জন্য বলা হ'ল।

তিন দিন পরে ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইম্‌তালি ত্যাগ করলাম। লালজির পরিবারের স্মৃতি আমি এখনও স্মরণ করে আনন্দ পাই। বিদায়ের সময়ে লালজি আমার 'ভিসা-বুকে' লিখে দিলেন: Wishing you all the best success in your adventureous travels, we will never forget your smiling face. জানি না, লালজির আর এই ভবঘুরেকে মনে আছে কি না; এই বর্ষণমুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় বার বার লালজির সহাস্য প্রফুল্ল আননখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

১৭ই শ্রাবণ

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

জন্ম হতে জন্মান্তরে চলিয়াছ অক্লান্ত চরণ—
উৎসর্গের আত্মদানে জ্যোতিঃ-রেখা সৃষ্টির সাধন।

দধীচির পুণ্য কান্তি তপোমূর্ত্তি, যোগশুদ্ধ প্রাণ,
চট্টলার গিরিশিরে উড়াইলে বিজয় নিশান।

সঙ্ঘযোগী, সহতীর্থ, লহ আজি প্রেম-আলিঙ্গন—
ইষ্ট মুখে শুভাশীষ, শুভ হোক সতের শ্রাবণ ॥*

---

* চট্টল সঙ্ঘ-তীর্থের সহ-সভাপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের ৪৮তম বর্ষীয় জন্মতিথি উপলক্ষে রচিত।

শ্রীরথযাত্রা

শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

গত ৩০শে আষাঢ় ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষভাবে নীলাচলে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত শ্রীরথযাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবটী পরমার্থের লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষের একটী বিশেষ গৌরবময় অনুষ্ঠান। কারণ ইহার স্মৃতির সহিত রহিয়াছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসাধু-দিগের বিনাশান্তে সাধু-শিরোমণিগণের আনন্দ-বিধানার্থ বৃন্দাবনে শুভ-প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা।

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকেই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ—অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্ব-শক্তিমান্, অপ্রাকৃত-রস-সমুদ্র পরমেশ্বর। তিনি বিভু-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। প্রকট-লীলায় তিনি মাত্র দশ বৎসর আট মাস ব্রজে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি কপটতা, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির প্রতীক পূতনা, অঘাসুর, বৃষাসুর প্রমুখ বহু অসুর বধ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছেন। বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ হইতে না হইতেই তিনি পিতাকে বন্দীকারী প্রবলপ্রতাপ নৃপতি সানুচর কংসকে বধ করিয়া নিগৃহীত রাজ্যচ্যুত
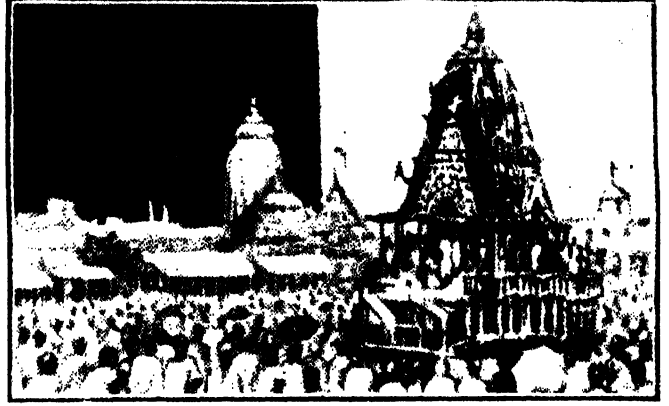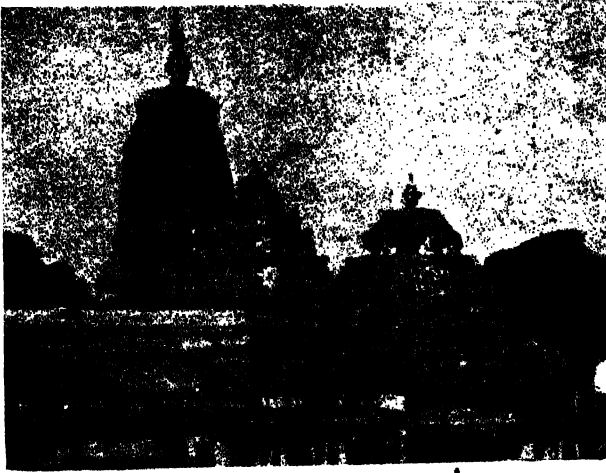
কংসপিতা উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান। তৎপরে বহু বৎসর মথুরায় ও দ্বারকায় অবস্থান করিয়া নাস্তিকতা ও প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতার প্রতীক স্বেচ্ছাচারী

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ : পুরী

নৃপতিবৃন্দের অত্যাচার হইতে ভারতের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্য উদ্ধার করেন। মহাভারতের পাঠকগণ সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের রণকৌশল লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। সেই যুদ্ধভূমিতে তিনি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ এখনও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভারতবাসিগণ প্রত্যহ প্রাতে পরমা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির : পুরী.

শ্রীকৃষ্ণ যখন বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে একবার সূর্য্য-গ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনের জন্য সুদীর্ঘ-বিরহ-সন্তপ্ত ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দও তখন কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল মাধুর্য্যরসের সেবকগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব-হস্তি-রাজবেশ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপর সজ্জা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

ঐ সকল দর্শনে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণকান্তকে চাহিলেন ব্রজের মাধুর্য্যময় কুঞ্জে—গুঞ্জা, শিখিপুচ্ছ, বন্যপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা সুমধুরভাবে সজ্জিত অবস্থায়। হৃদয়গ্রাহী শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাদের নিকটে চিরঋণী, সুতরাং তোমাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূরণ করিব। আর কয়েকটী মাত্র অত্যাচারী নৃপতি অবশিষ্ট আছে। বসুন্ধরাকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করিয়াই আমি যাইতেছি।" শ্রীকৃষ্ণ এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। দুষ্কৃতদিগের অত্যাচার-রূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অন্তে শ্রীভগবানের করুণারূপ বর্ষার সুশীতল ধারায় সুপুষ্টা ও শ্যামলশ্রী-বিমণ্ডিতা ধরিত্রীদেবী রথারূঢ় শ্যামসুন্দরকে ব্রজধামে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুসজ্জিত রথে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শুভ বিজয় হইয়াছিল। ইহাই আমাদের পরম গৌরবের শ্রীরথযাত্রা।

রথযাত্রার পূর্ব্ব দিবস পুরীতে 'গুণ্ডিচামার্জ্জন' উৎসব হয়। সুদীর্ঘকালের পরে প্রাণকান্ত আসিতেছেন, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ব্রজবাসিগণ মহোল্লাসে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জ্জন ও বিধৌত করিয়া দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ করেন। তাহাই 'গুণ্ডিচামার্জ্জন'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে গুণ্ডিচামার্জ্জন করিয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে, রথযাত্রার তুল্য ফল-স্বরূপে শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়-বৃন্দাবনে পাইতে হইলে, ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত ইতর অভিলাষ, স্বসুখমূল কর্ম্ম ও আত্মলয়মূলা জ্ঞান-প্রচেষ্টা প্রমুখ আবর্জ্জনা-সমূহ হৃদয় হইতে সম্যক্‌রূপে নিষ্কাশিত করিতে হইবে।

পরমানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হৃদয়াভিরাম কোন সুখ-দেশে
আনিলে আমারে প্রভো,
উজ্জ্বল হয়ে উঠিছে যে আজ
যাহা ছিল নিষ্প্রভ।
করিয়াছি যার লাগি প্রাণপণ,
মনে হয় অতি তুচ্ছ সে ধন,
স্থায়ী ভাবিয়াছি যারে, হয় তাহা
নয়নের জলে দ্রব।

লৌহ আজিকে পরশমণির
পরশ পেয়েছে টের,
কাণাকাণি করে সংবাদ গোটা
বিদ্যুৎ রাজ্যের।
বড় যা ভেবেছি ছোট হয় সব,
অসম্ভবই ত শুধু সম্ভব,
মুদে আসে আঁখি, এড়াইতে চায়
দৃষ্টি যে আলোকের।

ভ্রান্ত শ্রান্ত পতিত মধুপে
করি নব প্রাণ দান,
দ্রাক্ষাকুঞ্জ পদ্মবনের
এ কে দিল সন্ধান।

বলে 'আশাতীত নিকটেই আছে'
অনুভব দূরে এনে দেয় কাছে,
অনাস্বাদিত কি শান্তি লভে
উৎকণ্ঠিত প্রাণ!

শুধু ভাব আর ভগবান লয়ে
দিবানিশি আলোড়ন
পলে পলে হরি বিরহ মিলনে
সেই অভিভূত মন।
অলক্ষিতের সমাগম সুখ,
করে অন্তর বহির্বিমুখ
আপনার হয়ে সঙ্গে ভ্রমিছে
শত সাধনার ধন।

যুগের যুগের ভক্ত ভাবুক
সাধক সঙ্গে দেখা,
সকল রূপকে ম্লান করা রূপ
ভোগ করা বসি একা।
সকল ত্যজিয়া সকলকে পাওয়া,
বন্ধুর সঙ্গে এক পথ চাওয়া,
একি দুর্লভ অমৃত বাণী
ভস্মেতে ছিল লেখা!

মেঘ ও স্বপ্ন

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারো

কিছুদিন পরে। বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে—এবং মল্লিকার সেই নীল আলোয় ঘেরা ঘর থেকে ছুটী পেয়েছে—এখন আবার ফিরে এসেছে সেই কোটরে, তাদের সেই মেসের অন্ধকারে। মল্লিকা বাধা দিয়েছিল, পারেনি, বিদ্যুৎ হেসেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

একটা কথা বিদ্যুতের প্রায়ই মনে আসে ঠিক কথা নয়—ঘটনা। বিদ্যুৎ সেদিন সত্যই ভীষণ অবাক হ'য়েছিল। প্রথমে ঠিক কি সে উত্তর দেবে, ভেবে উঠ্‌তে পারেনি, পরে অবশ্য সে ঘটনার বল্গাকে ভালভাবেই টেনেছিল—না হ'লে কিছু হ'ত হয়তো। বিদ্যুতের হাসি পেল। কি বিচিত্র মানুষের জীবন আর কি রহস্যময় এর গতিভংগী !

অসুখ সেরে এসেছে। বিদ্যুৎ তখন বিছানার ওপরে স্বচ্ছন্দে উঠে বস্‌তে পারে। এমন কি, ইচ্ছে করলে ঘরের মধ্যে পায়চারিও করে মাঝে মাঝে।

এম্‌নি এক সন্ধ্যায় ঘটনাটা ঘট্‌লো।

সন্ধ্যা ঘনো হ'য়ে নেমেছিল। জান্‌লার ধারে বিদ্যুৎ ব'সেছিল, রুক্ষ চুল—ক্লান্ত শরীর। এখান থেকে ফিরে মেসে গিয়ে কি করবে, সেই কথাই ভাব্‌ছিল সে।

হঠাৎ দরজা খুলে মল্লিকা ঢুক্‌লো। বিদ্যুৎ অন্যমনস্ক ছিল। দরজা খোলার শব্দ টের পেল না। বাইরে, রাস্তার দিকে সে তখনো সেই ভাবে চেয়ে আছে।

মল্লিকা এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে বল্‌লে, "কি ভাব্‌ছেন ?"

বিদ্যুৎ সোজা হ'য়ে বস্‌ল, বল্‌লে, "বসুন—এই এম্‌নি চেয়েছিলাম পথের দিকে।"

"ও—" মল্লিকা জান্‌লার ধারে একটা মোড়া টেনে নিলে, "কেমন লাগ্‌ছে শরীরটা ?"

"ভালই—এবারে ধীরে ধীরে বেশ সেরে উঠ্‌বো মনে হ'চ্ছে," বলে বিদ্যুৎ সামান্য একটু হাস্‌ল, "আপনি না থাক্‌লে হয়তো এই আমার শেষ শোওয়া হ'ত—আমার পরবর্তী জীবনের প্রত্যেকটী দিনের বেঁচে থাকার কৃতজ্ঞতা আপনাকে আমি কি ক'রে জানাবো ?"

মল্লিকা মাথা নীচু ক'রে হাস্‌লো, বল্‌লে, "কি যা তা বল্‌ছেন আপনি—এ করবেন না !—এটুকুও যদি না করি তাহ'লে আর আমার"—মল্লিকা মধ্যপথে একটু থাম্‌লো, "অন্ততঃ মনুষ্যত্বের দিক থেকে এ আমার করা উচিত, এর জন্যে আপনার এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না, বিদ্যুৎবাবু !"

বিদ্যুৎ মল্লিকার চোখাচোখি চাইলো, "শুধুই কি মনুষ্যত্ব ? আর কিছু নেই ?"

এবারে মল্লিকার সমস্ত গাল আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, বল্‌লে, "কি আর থাক্‌বে, *সত্যিই থাক্‌বার* মত কিছুই তো নেই আমার—"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, "কেন নেই, আপনার মনকে এই কয়-দিনের পরিচয়ে আমি খুব স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছি, একেবারে টক্‌টকে, নিটোল—আমার ভারী ভাল লাগ্‌লো !"

মল্লিকা মাথা নীচু করলো, "এ আমার পরম ভাগ্য বল্‌তে হ'বে, জীবনের এই ভাল-লাগাগুলি আমার কাছে এক একটী আশীর্বাদের মত মনে হয়, কখন, কবে, কোন-দিন এরা আস্‌বে তার কোন ঠিক নেই—কিন্তু যেদিন আসে সেদিন মনে হয়, আমি সার্থক হ'য়ে উঠ্‌লাম। আমার সমস্ত জীবন আজ ভ'রে উঠেছে !"

"তাই হয় মল্লিকা দেবী, আমিও তা অনুভব করি মাঝে মাঝে" বিদ্যুৎ জান্‌লার দিকে আবার দৃষ্টি প্রসারিত ক'রল, "মাঝে মাঝে আমারও ঐরকম ভাল লাগে।" একটু থেমে বল্‌লে, "আমি বড়ো খেয়ালী—জীবনটাকে ঠিক শৃঙ্খলার মধ্যে আন্‌তে পারলাম না—অনেক দুঃখ জমা হ'য়ে আছে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে, নয়তো আপনাদের এই ভালবাসা, আপনাদের এই স্নেহ—আমার প্রতি আপনাদের এই সহানুভূতি—এরা তো চিরজীবনের জন্যে সোনার দাগ ফেলে গেল আমার মনে, একী কম গৌরবের। আমি তার কোনো সম্মানই দিতে

পারলাম না—আমাকে ক্ষমা করবেন—এখানেই আমি বড় দুর্বল !”

“কি যে বল্‌ছেন !” মল্লিকা আবার বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকালো, “আপনি কোথায় দুর্বল, আপনার মধ্যে পরম একটা শক্তিশালী সত্তাকে আমি দেখেছি, আপনি নিজেই কেবলি সংকুচিত হন—কিন্তু আপনার সত্তা তাতে সংকুচিত হয় না।”

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, “হয়তো তাই হ'বে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন, আপনার চোখে আমার সেই সব দুর্বলতা ভেসে ওঠে না, কিন্তু আমি তো বুঝি—আমি কত অবিচার করছি সেই পরমকে ঘিরে, যার থেকে সোনা সৃষ্টি হ'তে পারতো একদিন, তার থেকে সৃষ্টি করছি মূল্যহীন অথবা সামান্য মূল্যের কতোগুলি মাটীর খেলনা। আমি তো বুঝি ! অন্ততঃ এটুকু আমি বুঝ্‌তে পারি।”

মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো—বিদ্যুতের আরো কাছে সে আস্তে এগিয়ে এল, বল্‌লে, “আপনার জীবনের এইটাই বড় দুঃখ নাকি ?”

“না, দুঃখ আমার আরো আছে” বিদ্যুৎ ম্লান হাস্‌লো, “কিন্তু সে থাক, আবার তারই আলোচনা ক'রে আপনার মনকে আমি বিষণ্ণ করবো না।”

মল্লিকা আরো কাছে এগিয়ে এল, বিদ্যুতের একটা হাত আস্তে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল, “একটা অনুরোধ আছে আমার, রাখ্‌বেন ? “বলুন—” বিদ্যুৎ মাথা তুল্‌লো।

“ভয় হয়, হয়তো আপনি রাখ্‌বেন না” পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকা বিদ্যুতের চোখের দিকে চাইলো।”

“না—রাখ্‌বো—যদি আমার সাধ্য থাকে !”

মল্লিকা বিদ্যুতের আরো কাছে ঘন হ'য়ে এল, বল্‌লে, “বলুন—প্রতীজ্ঞা করুন, আর কখনো আপনি এ উপকারের কথা তুলে আমাকে কষ্ট দেবেন না ?”

“কষ্ট ?” বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ অবাক হ'ল, ওর সমস্ত শরীরে কেমন যেন একটা কম্পন নাম্‌লো। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো সেইভাবে, তারপরে বল্‌লে, “আচ্ছা !”

তারপর সেই রাত্রি থেকেই বিদ্যুতের আরো একটা চিন্তা ঘন হ'য়ে এল। ভাব্‌লে: আর নয়, এবারে আস্তে স'রে যেতে হ'বে। আবার কেন বিপন্ন করা আরেক জনকে ? কি অভিশাপ নিয়েই জন্মেছিল বিদ্যুৎ ! পরিপূর্ণভাবে কাউকেই সে কিছু দিতে পারলো না। শুধু লোভ আর মোহ—শুধু আকাঙ্খা আর বাসনা—এর বেশী কিছুই সে পেলো না, কিছুই সে দিতে পারলো না। লোভ ? হ্যাঁ লোভ সেই আকাঙ্খিত জীবনের ওপরে—যে জীবন একদিন সূর্য্যের মত জ্বলে উঠ্‌বে গৌরীশঙ্করের শিখর সীমায়—যে জীবন একদিন উছলে পড়বে পরিপূর্ণতায়, যে জীবনে শান্তি থাক্‌বে নিবিড় হ'য়ে। আর যেখানে ব্যথা নেই, বেদনা নেই, হানাহানি নেই, সেই শান্ত সাধনলোকে বিদ্যুৎ প্রবেশ করবে, বিদ্যুৎ গরীয়ান্—বিদ্যুৎ মহীয়ান্ তখন ! এই—এই জীবনের ওপরে লোভই তো বিদ্যুতের বেশী। বিদ্যুৎ সার্থক হ'য়ে উঠুক, এই কামনাই তোমরা ক'র। তাকে সংসারের আবর্ত্তে টেনে এনে ব্যর্থ ক'র না, তোমরা তাকে ভালবাস, সে ভালবাসাকে অসম্মান ক'র না। গার্গী, তুমি যে আমার কী, আমি কী ক'রে বোঝাবো। তুমি ছিলে বলেই হয়তো এতোটা এগিয়েছি, এই জীবনে পূর্ণভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা তোমার কাছ থেকেই তো পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, তুমিই আমার পরম বাধা। বাধা আমার সাধনার—আমার আগামী দিনের—যার জন্যে আমার সমস্তটা জীবন নিবেদিত আছে—যার জন্য আমি পথে পথে বেঁচে থাক্‌বার প্রেরণায় প্রবুদ্ধ। গার্গী, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, জীবনে অনেক—অনেকরকম দুঃখকেই সংগী করতে হয়, তারজন্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার, তারজন্য অনেক ক্ষতি স্বীকারও করতে হয়। জানি আমাদের জীবনের এই ক্ষতি গভীর হ'য়ে থাক্‌বে, এ ক্ষতির সীমা নেই—কিন্তু তবু আমি স্বার্থপর গার্গী, আমি নির্মম—আমার সাম্‌নে যে সেই হিমালয়ের চূড়া, আমাকে যে সেখানেই যেতে হ'বে ! গার্গী, আমাকে যে সেখানে যেতেই হ'বে !

উনিশ

বালীগঞ্জের সেই কাঁকর বিছানো পথে একদিন আবার বিদ্যুৎ পা ফেল্‌লো। রেবা বারান্দায় ওপরে দাঁড়িয়েছিল,

ছুটে নীচে নেমে এল—"একী আপনার অসুখ ক'রেছিল নাকি ?"

'হ্যাঁ," বিদ্যুৎ হাস্‌লো একটু, "আপনাদের আর কোন খবর নিতে পারিনি, মা ভাল আছেন ?

"হ্যাঁ, সকলেই ভাল আছেন, আসুন আপনি" রেবা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, "বেশ লোক, অসুখ হ'ল, একটা খবরও তো দিতে হয়, আমরা আপনার ঠিকানাও জানি না, খোঁজ যে নেব, তারো কোন উপায় ছিল না !"

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে আবার সেই বড় ঘরটার মধ্যে এসে ঢুক্‌লো। মা বসে কি একটা বই পড়ছিলেন, বিদ্যুৎ এসে প্রণাম করলো।

"আরে—বিদ্যুৎ যে !—একি, অসুখ হ'য়েছিল নাকি তোমার ?"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "হ্যাঁ, নেহাৎ আয়ু আছে তাই বেঁচে গেলাম।"

"যাট্—ওকি কথা, তা আমরা অনেক ভেবেছি তোমার কথা, সেই যে গেলে, আর কোন খবর নেই, যাক্ এখন কোথায় আছ ?"

"সেই মেসেই—" বিদ্যুৎ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো।

আমি ওঁকে তোমার খোঁজ নেবার জন্যে বলেছিলাম, উনি চেষ্টাও ক'রেছিলেন। কিন্তু কোথায় যে তুমি থাকো, তা কেউ বল্‌তে পারলে না। বইয়ের দোকানেও তোমার খোঁজ করা হ'য়েছিল !"

"ও—" বিদ্যুৎ হাস্‌লো একটু।

"আমিই সেই কথা বলেছিলাম—" রেবা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এল, "হয়তো পাব্‌লিশারদের কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তাঁরা যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, তাতে খোঁজ ক'রে জানা গেল, আপনি অনেক দিন সেখান থেকে উঠে গেছেন—" হঠাৎ রেবা কিছুক্ষণের জন্যে থাম্‌ল, তারপরে বিদ্যুতের দিকে চেয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বল্‌লো, "আচ্ছা লোক আপনি !"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, বল্‌লে, "ঠিকই বলেছেন আমার কোনো কিছুরই স্থিরতা নেই, এতো অস্থির মতি হ'লে কি চ'লে পৃথিবীতে, আপনিই বলুন মা ?" বিদ্যুৎ মার দিকে চাইলো। মা হাস্‌লেন, বল্‌লেন,—"তাতে কি হ'য়েছে বাবা, এ-রকম সকলেই থাকে—তারপর দায়িত্ব মাথায় পড়লেই সব ঠিক হ'য়ে যায়—ওর জন্যে—"

"তুমিও যেমন—' রেবা ঠোঁট উল্‌টোলো, "এ রকম মানুষ আর কোন দিনত পাবে না। যে অন্যমনস্ক লোক কোন্‌দিন্ দেখো পথের মধ্যেই উনি নিজে হারিয়ে যাবেন।"

বিদ্যুৎ হেসে উঠ্‌লো। মাও হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "যা ;—তোর আর চালাকী করতে হ'বে না, ওঁকে জানিয়েছিস্ ?"

"না—চলুন না বিদ্যুৎবাবু, বাবা নীচে র'য়েছেন, দেখা ক'রে আস্‌বেন।"

"বেশ তো চলুন—" বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো।

সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে রেবা বিদ্যুতের আরো কাছে ঘনো হ'য়ে এল, "জানেন, ভারী চমৎকার কয়েকটা বই কিনেছি কয়েক দিন আগে—চলুন আগে আমার লাইব্রেরীটা দেখে আস্‌বেন—"

বিদ্যুৎ বল্‌লো, "আগে ওঁর সংগে দেখা করলে হ'ত না ?"

"উনি তো আর চ'লে যাচ্ছেন না—" রেবা আগে আগে এগিয়ে চল্‌লো, "না হয় একটু পরেই দেখা করবেন।"

"আচ্ছা—"

বিদ্যুৎ পিছনে পিছনে এগিয়ে চললো।

একেকটা সময় আসে মানুষের জীবনে, যখন সে শুধু হতচকিত হ'য়ে পথের মধ্যে থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তখন মনে হয়, জীবনের গভীর অন্ধকারে এত রহস্যময় জালও তাকে বিপর্য্যস্ত করবার জন্যে প্রস্তুত ছিল! সে তখন আলো আর অন্ধকারের একটা সীমা রেখায় এসে দাঁড়ায়। সাম্‌নে তার দিগন্ত বিস্তৃত পথ—পিছনেও তাই ; কিন্তু আরো এগিয়ে যাবে কি পিছিয়ে আস্‌বে, এই দ্বন্দ্বে সে আন্দোলিত হ'তে থাকে ক্রমাগত—পায়ে তার তখন জোর ক'মে এসেছে—চোখের জ্যোতিঃ অনেকটা নিষ্প্রভ !

বিদ্যুৎ থম্‌কে দাঁড়ালো। ভাব্‌লো, আরেকটা নতুন প্রবাহ এল তার জীবনে। এবারে এ প্রবাহে যে কোন্ দিকে যাবে—কোন্ পথে তার যাত্রা এবার স্বরু হ'বে, কে জানে?

কয়েকটা দিন বিদ্যুৎ বাধ্য হ'ল রেবাদের বাড়ীতে থাক্‌তে—শুধু মহামায়া আর রেবার বাপের অনুরোধ নয়—রেবারও একটী সুন্দর স্মিত সম্মতি ছিল—একটী নিটোল ভোর বেলাকার ফুলের মত প্রার্থনা, বিদ্যুৎ যেন কিছুদিন থাকে। তাতেই তাঁদের যথেষ্ট আনন্দ!

তাই বিদ্যুৎ ছিল। কিন্তু এ কি! অক্টোপাশের মত সমস্ত আব্‌হাওয়া—সমস্ত পরিস্থিতি যে তাকে চেপে ধরেছে ক্রমশঃ। আরো কিছুক্ষণ পরেই হয় তো তার সমস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌বে! তার পরেই—তার পরেই আস্‌বে বিদ্যুতের সেই নিদারুণ আর নির্ম্মম মৃত্যু! বিদ্যুৎ তা সহ্যও করতে পারবে না।

কয়েক দিন হ'ল এ আভাষ পাওয়া গেছে। মহামায়াই একদিন সে আভাষ দিলেন—হরনাথ পরোক্ষে সুন্দরভাবে করলেন সমর্থন আর রেবা উচ্ছ্বসিত আনন্দে শুধু নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা ক'রে চল্‌লো। জীবনে তার নতুন ভোর এসেছে!

আবার পালাতে হ'বে বিদ্যুতের। আর দেরী নয়। ঈশ্বর কি নির্ম্মম, জীবনের ঘোরালো উপহাস করার অদ্ভুত প্রবৃত্তি তাঁর!

একদিন বিদ্যুতের আশঙ্কা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। রেবাই ধ'রেছিল সেদিন, বলেছিল "চলুন, আজ খানিকটা ড্রাইভ ক'রে আসা যাক।"

সহর ছাড়িয়ে খানিকটা যেতেই সন্ধ্যা নাম্‌লো। রেবা হেড্‌লাইটা জ্বাল্‌লে। বিদ্যুৎ বাধা দিল, বল্‌লো, "আরো যাবেন, ফিরুন এবার, না হ'লে রাত্তির হ'য়ে যাবে কিন্তু—"

"হোক্ না—" রেবা মেটারের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে। এলোমেলো চুল তার মুখের ওপরে, এলোমেলো চুল তার কপালে; রেবা যেন মুখ টিপে হাস্‌ছে। অন্ধকারেও বিদ্যুৎ তা বুঝতে পারলো।

"ভয় করছে নাকি আপনার?" রেবা বল্‌লে।

"ভয়—না ভয় কিসের, তবে এ-রকম পথে আর বেশীদূর না যাওয়াই ভাল ছিল।—"

"বেশ" হঠাৎ রেবা গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলে, তারপরে আস্তে পথের একপাশে গাড়ীটাকে দাঁড় করালে, তারপরে সে বিদ্যুতের আরো কাছে ঘনো হ'য়ে এল, বল্‌লে, "জানেন?" তারপরে একটু থেমে বল্‌লে, "না, আর 'জানেন' নয়", বলেই বিদ্যুতের গলা দুই হাতে আস্তে রেবা জড়িয়ে ধরলো, বল্‌লে, "জানো, বিয়ের পরে আমরা কোথায় গিয়ে থাকবো? বাবা বলেছেন শিলঙে —সেখানে ছোট্ট একটা বাড়ী কিন্‌বো আমরা—খালি তুমি আর আমি থাক্‌বো—আর কেউ নয়। তুমি লিখ্‌বে, আর আমি ব'সে ব'সে দেখ্‌বো। পিছনে আমাদের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়। সারাদিন আর সারারাত যেন আকাশ ঝুঁকে র'য়েছে তার ওপরে—"

"একি—একি বল্‌ছেন?"

"ঠিকই বল্‌ছি—" রেবা হেসে বিদ্যুতের গায়ে গড়িয়ে পড়লো, "একজনকে বাঁচানোর দায়িত্ব কম নয় মনে রেখো—"

"কি বল্‌ছেন, কিছু বুঝ্‌তে পারছি না আমি—" বিদ্যুতের বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড অসম্ভব দ্রুত গতিতে চল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, "আপনি কী বল্‌ছেন এ সব?"

"মনে নেই, ভুলে গেলে? তোমার জীবন আমি যে তোমাকেই দেব ভেবেছি!" রেবা বিদ্যুতের চুলের ওপরে হাত বুলোতে লাগ্‌লো। বিদ্যুতের মনে হ'ল, তার সমস্ত শারীর-চেতনা যেন লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, তার সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবী কাঁপ্‌ছে, সমস্ত অন্ধকার—সমস্ত রাত্রী; আর তার সারা শরীরে মৃত্যু যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

"রাগ করলে?" রেবা বিদ্যুতের একখানা হাত কোলের ওপরে টেনে নিলো, "তুমি রাগ করলে আমার ওপরে?"

"না", বিদ্যুৎ আর কথা বল্‌তে পারলে না, "গাড়ীটা ঘোরান, ভারী অসুস্থ বোধ করছি আমি।"

স্টার্ট দিয়ে রেবা গাড়ীটা ঘোরালে, তারপরে হেড-লাইটের আলো ফেলে তীব্রবেগে মোটর এগিয়ে চল্‌লো।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি

সামাজিক সংবাদ

সমসাময়িক হিন্দু-সমাজের সংবাদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জয়ানন্দ বলিতেছেন,—

"পদ্মাবতী নামে নদী আছে বঙ্গদেশে
ব্রহ্মক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র তার তীরে বাস।"[১]

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই ব্রহ্মক্ষেত্রী জাতির লোকেরা কোথায় গেল ?[২] সেনবংশীয় রাজারা নিজেদের ব্রহ্ম-ক্ষেত্রী বলিতেন। গুজরাটে এই নামে একটি জাতি আছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন, তিনি প্রাচীন ভারতের পাঁচটি রাজবংশের নাম পাইয়াছেন যাঁহারা এই জাতিগত বলিয়া পরিচয় দিতেন। "ব্রহ্ম-ক্ষেত্রী" শব্দের অর্থ হইতেছে, "ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ", অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ। আবার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-বৃত্তিধারী হইলেও এই নামে অভিহিত হয়। পুরাণ সমূহে* এবম্প্রকারের অনেক বংশের নামোল্লেখ আছে। ভবভূতির "মহাবীর চরিতে" ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখ দিয়া বর্ণিত হইতেছে যে তিনি ব্রহ্ম-ক্ষত্রী; তাহা হইলে এই স্থলে অর্থ হইবে "ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ।" সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তকেও এই প্রকারের অনেক উদাহরণ আছে। যখন এই নামধারী একটা রাজবংশ বাংলায় ছিল তখন তাঁহাদের আত্মীয় কুটম্বেরাও নিশ্চয়ই এদেশে ছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত (ষোড়শ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত) একটি পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের নাম "সেখ শুভোদয়া।" ইহা লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ কর্ত্তৃক লিখিত। সমালোচকেরা বলেন, টোডরমল্ল যখন বাংলার মোগল শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন জমি-সংক্রান্ত দলিল স্বরূপ এই পুস্তক গৌড়ের কোন মসজিদের মাতোয়ালী তাঁহাকে দেখান। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সেনযুগের বাংলার সমাজের কিঞ্চিৎ সংবাদ বা জনশ্রুতি আছে তাহাতে সংশয় নাই। ইহাতে "রাজপুত্র" নামে একটি জাতির উল্লেখ আছে। একটি গল্পে উল্লেখ আছে, কোন এক রাজপুত্রের গলায় তাঁতি-বসাকের জন্য আনিত মালা মন্ত্রী ধোয়ীর পরামর্শে তাহার গলায় দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন সে লক্ষণ সেনের সভায় গিয়া নালিশ করে। তাহাতে রাজা তাহাকে তাহার জাতিনাশের কোন ভয় নাই বলিয়া সান্ত্বনা দেন; কারণ "রাজা তাহার স্বজাতি।"

"জ্ঞাত্বা রাজা তং রাজপুত্রং প্রবোধয়ামাস
* * * *
শ্রীমতা সহ স্বজাতীয়োঽহম্'[৩]

স্মরণ রাখিতে হইবে, "রাজপুত্র" অর্থে "রাজার ছেলে" নয়। ইহার অর্থ "রাজপুত"। প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে জাত্যার্থে "রাজপুত্র" শব্দ ব্যবহৃত হইত **। বাংলা এবং হিন্দিতেও সেই অর্থে "রাজপুত" শব্দ ব্যবহৃত হইত। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।[৪] তাহা হইলে দেখা যায় যে 'রাজপুত' বলিয়া বাংলায় একটি জাতিও ছিল। অবশ্য 'শেখ শুভোদয়া'র এই ব্যক্তি রাজার জ্ঞাতি—অতএব রাজপুত্র এই অর্থ করা যায় না; কারণ লক্ষণ সেন তাহাকে স্বজাতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, জ্ঞাতি বলে নাই।

চৈতন্যযুগের পূর্ব্বে দনুজমর্দ্দন দেব যখন বঙ্গজ কায়স্থদের 'সমীকরণ' করেন, সেই সময়ে কায়স্থ গোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করেন দ্বিজ বাচস্পতি। তিনি কায়স্থদের তালিকা বিষয়ে বলেন, "এতে সপ্তবিংশা কায়স্থা (বঙ্গজ কায়স্থ) বংশহেতু প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতদভিন্নাঃ রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ কদাচন।[৫] এইস্থলে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের অর্থ কি ইহা নহে যে এতদ্ব্যতীত, অর্থাৎ এই ২৭ ঘর কায়স্থ

১। "চৈতন্য মঙ্গল"—পৃঃ ৪৮

২। ৺দীনেশ সেন মহাশয় বলেন যে ইঁহারা বৈদ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

* "বায়ু পুরাণ"—৮৮ অধ্যায় ৫, ৭ এবং মৎস্য পুরাণ ৫০, ১৫ দ্রষ্টব্য।

৩। ডাঃ সুকুমার সেন—"সেখ শুভোদয়া", পৃঃ ১৩১

** সংস্কৃত বল্লাল চরিতে 'রাজপুত্র' শব্দ আছে, 'ক্ষত্রায়াৎ ব্রাহ্মণী-চ্ছেত্রী রাজপুত্রো য উচ্যতে'। শেষ পৃষ্ঠা ১০ম শ্লোক।

৪। ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬৯

৫। নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্য কাণ্ড পৃঃ ৩৭০

ছাড়া বাকি সব জাতিতে রাজপুত ?[৬] এতদ্বারা কি ইহা সূচিত হয় না যে বাংলায় রাজপুত বলিয়া একটি জাতি ছিল এবং উহা পরে কায়স্থ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান যুগে অনেক পশ্চিমাগত রাজপুতজাতীয় লোক বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কায়স্থদের কুল পঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ আছে, এবং সমাজপতিরাও তাহা অস্বীকার করেন না। এই সব বংশের কথা এই স্থলে বলা হইতেছে না।*‡* ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর যখন উত্তর ভারতে "রাজপুত" বলিয়া একটি জাতির উদ্ভব হয় সেই সময়ে বাংলা কি তাহার প্রভাব হইতে বাদ পড়িয়াছিল? উপরোক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে এইটুকু বোধগম্য হয় যে, চৈতন্য এবং তাঁহার অব্যবহিত কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক গোষ্ঠী ছিল—যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিত। বীরভূম জেলায় অনেক বাঙ্গালী গোষ্ঠী আছে যাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে অথচ গলায় পৈতা নাই। ইহারা কায়স্থ সমাজের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। চৈতন্যের সময়ে হিন্দু-বিবাহের বিধি-নিষেধ যে আজকালকার মত শক্ত ছিল না তাহার প্রমাণ প্রেম-বিলাসেও পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গার বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্যের সঙ্গে বিবাহোপলক্ষে বলা হইয়াছে,—

"রাঢ়ী, বারেন্দ্র বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক"।[৭]

প্রেম-বিলাস এই বিবাহোপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন বিষয়ে প্রচলিত কাহিনীটির উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে এই গল্পটি আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই, তাঁহারা এই কথা পুনঃ বিবেচনা করিবেন। পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, প্রেম বিলাসের বয়স সাড়ে তিন শত বৎসর†। এই বিবাহোপলক্ষে প্রেম বিলাসে কান্যকুব্জা গত বংশীয় ব্রাহ্মণদের নামের তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়। যথা,—ওঝা, অধর্য্য, ভট্ট, মিশ্র, চতুর্ব্বেদী, আচার্য্য,* প্রভৃতি।[৮] এই সঙ্গে প্রেম বিলাসে লিখিত আছে,

"পঞ্চ ঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন,
পঞ্চ ঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ,
* * * *
যোদ্ধ্‌বেশী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র,
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।" ৯

এই গল্পে এই পঞ্চ কায়স্থদের ব্রাহ্মণের দাসও বলা হইতেছে, আবার ক্ষত্রিয়ও বলা হইতেছে। উক্ত গ্রন্থের লেখকের বোধ হয় জানা ছিল না যে, ক্ষত্রিয় কখনও ব্রাহ্মণের দাস হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহা হইতে এই সংবাদটি প্রাপ্ত হওয়া যায় যে কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীও পুরাতন। এই গল্পের শেষে কান্যকুব্জ হইতে আগমনের তারিখও প্রদত্ত হইয়াছে।

"বেমবনে নবমান ৯৫ মন শকাব্দের যখন।
পঞ্চ মহর্ষি কৈলা গৌড়ে আগমন॥১০

এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, এই প্রবাদ অতি পুরাতন। পুনরায়, বল্লাল চরিতে কান্যকুব্জ হইতে আগমনের গল্প বিবৃত আছে। এই পুস্তক চৈতন্যের সময়ে লিখিত হয়। এতৎ সমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই প্রবাদ হালে সৃষ্টি হয় নাই। ইহার মূলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য ও নিহিত আছে।

এই স্থলে প্রেমবিলাস বলিতেছে যে, অনেক ব্রাহ্মণ বংশ দারিদ্র্যের দায়ে ঠেকিয়া নীচকর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং তথাকথিত নিম্নজাতিদের পুরোহিত হয়,—

"অনেক বংশজ শিল্পকার্য্যে মন দিল।
গোয়াল, কুমার, যুগী, তাঁতীর পেশা কষ্ট-শ্রোত্রিয় আর বংশজের গণ।
তার মধ্যে বহু হইল বর্ণের ব্রাহ্মণ।১১

আবার,

"বল্লাল সময়ে বহু অগ্রদানী হইল।
পরেও বহু বংশজ তাহাতে মিলিল॥"১২

৬। বিভিন্ন পণ্ডিতকে দেখাইয়া এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবুর পুস্তকে প্রদত্ত অর্থ সমীচিন নয় বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে লেখকের নিকট তিনি উপরোক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ ৺নগেন্দ্রনাথ বসু 'Ethnology of the Kayathas' নামক পুস্তকে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের বিষয়ে মালাধর ঘটকের কুলজী দ্রষ্টব্য।

৭। প্রেমবিলাস—পৃঃ ২১৪

† "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩১১

৮। "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২৬৬

* এই পদবীগুলি পশ্চিমের কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে আজিও প্রচলিত আছে।

৯। ঐ ঐ —পৃঃ ২৬২

১০। প্রেমবিলাস—পৃঃ ২৬২

১১। প্রেমবিলাস—পৃঃ ১৮৯

১২। প্রেমবিলাস—পৃঃ ১৮৯

১৩। প্রেমবিলাস—পৃঃ ২৯৩

পুনরায় প্রেমবিলাসে বলা হইয়াছে, বাগদত্তা কন্যার বিবাহ না হইলে মুস্কিল হয়:—"সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা দোষে দুষ্টা হয়। তার অন্নজল কেহ স্পর্শ না করয়।......কদাচিত পতিত ব্রাহ্মণে বিবাহ করয়......ব্রাহ্মণের ব্যজ্য সমাজে নাই স্থান।"[১৩] এই অনুষ্ঠানটি মনুর পুনর্ভূ কন্যার বিবাহের প্রতিধ্বনি।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কনৌজাগত ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা অবস্থাহীনতার জন্য নিজেদের বংশাভিমান ত্যাগ করিয়া নানাকর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে দেবীবর ঘটকের পুস্তকে দেখা যায় যে, রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালনা করিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বর্ণ-বিপ্রগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ পুরোহিত ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে লিখিত—"বর্ণবিপ্রগণ মঠপতি",* এই উক্তিকে তিনি তাঁহার মতের প্রামাণিকতার জন্য টানিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে দেখা গেল যে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবংশের অনেকে বর্ণব্রাহ্মণ হন, এবং তাহাদের বংশের পদবী তাহার প্রমাণ। এদেশে একটা ধারণা আছে যে, অগ্রদানী ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বাহ্লীক হইতে আগত "মগ" বা "শক দ্বীপি" ব্রাহ্মণ বংশীয়। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে অনেক কনৌজি ব্রাহ্মণদের বংশধরেরাও অগ্রদানী হইয়াছিল। এই সময়ে অন্যান্য প্রদেশ হইতেও বাংলায় আসিয়া বাঙ্গালী সমাজভুক্ত হইতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রূপ সনাতনেরা কর্নাটি বংশোদ্ভব ছিলেন। ভক্তি রত্নাকরে উল্লেখ আছে,

"কর্ণাটি দেশাদি হ'তে আইলা বিপ্রগণ
সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে।" ১৪

এখন ইঁহাদের পৃথকসত্তা কোথায়?

পূর্ব্বে চৈতন্যের পিতৃপুরুষদের বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক জয়ানন্দের উক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্টের বৈদিক সম্প্রদায়শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন, চৈতন্যদেবের বংশ তাহাদের শ্রেণীভুক্ত, এবং তাঁহারা মিথিলাগত বলিয়া নিজেদের দাবী করেন। অন্যদিকে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একটি সংবাদ দিতেছেন, "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মাতুল দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিবাহ বৈদিকশ্রেণীর কন্যা,.. ...দ্বিতীয় বিবাহ রাঢ়ীশ্রেণীয় কন্যা।"[১৫] এই যুগের অপর একটি সংবাদ এই যে, আকবরের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাটক হইতে নিমরায় নামে এক ব্যক্তি বিক্রমপুরের "ফুলবাড়ি" নামক স্থানে বাস করেন। ইঁহারই বংশে কায়স্থবংশীয় বিখ্যাত ভূঁইয়া চাঁদ রায় ও কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে, বিভিন্নস্থানের লোক বাংলায় আসিয়া নানাজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান সঙ্ঘবদ্ধতা হয় নাই, অর্থাৎ, লেখক যাহাকে "দ্বিতীয় জাতীয় সমীকরণ"[১৭] (second social integration) বলিয়া অভিহিত করেন তাহা হয় নাই। তখনও হিন্দুসমাজ নিজের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করে নাই। এইজন্যই তখনও বাহিরের লোক বাঙ্গালী সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান চলিতেছে। এই সময়কার আর একটি সংবাদ এই যে, হিন্দু রাজাদের বাড়ীতেও খোজা চাকর থাকিত। "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নাটকে উল্লেখ আছে যে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ অন্তঃপুরে খোজা চাকর থাকিত,—

হেনকালে সৌবিদল্ল আসিল রাজা স্থানে
* * * *
খোজা কহে দেবী সব পাঠাইল মোরে।"[১৮]

রাজনীতিক সংবাদ

ইতিপূর্ব্বে জমিদারদের অবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সাহিত্যে আরও কিছু রাজনৈতিক সংবাদ পাওয়া যায়। দেখা যায় বাদশাহ হোসেন শাহ হিন্দু-কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতেন। যেমনি রূপ সনাতন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, তেমনি নরোত্তম

* "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"—১ম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—পৃঃ ২৬৪

১৪। "ভক্তিরত্নাকর"—পৃঃ ৮২

১৫। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—"কেদার রায়". পৃঃ ৯৫

১৬। Dr. Wise—Asiatic Society's Journal—1874

১৭। Vide Dr. B. N. Datta—"Modern Review": 1937, July—September.

১৮। "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" (বাংলায় ভাষান্তরিত) পৃঃ ১০ম অঙ্ক

ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণদত্তও প্রধান অমাত্য ছিলেন। মালাধর বসু একজন বড় কর্ম্মচারী ছিলেন—তাঁহার শরীর-রক্ষক সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন, কেশব বসু :

"মন্ত্রী সঙ্গে তাহাতে উঠিলা গৌড়েশ্বর

* * * *

কেশব বসু নাম সঙ্গে ছিলা পাত্রবর ॥১৯

ইঁহাকেই চৈতন্যচরিতামৃতে ভুলবশতঃ "কেশব ছত্রী" বলা হইয়াছে।* কিন্তু পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "ছত্রনাজি একটি পদবী মাত্র,—যেমন সাকার মল্লিক ও দবিরখাস। আসলে ইনি বর্দ্ধমান কুলীন গ্রামের কেশব বসু। ইনি পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহারা পাঁচ ভাই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—ইনি ছত্রনাজির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কেশব ছত্রী নাম প্রয়োগ হইয়াছে।"[২০] উড়িষ্যার রাজার বিষয়ে শোনা যায় যে, তিনি একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। নগেনবাবু বলেন, তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন;[২১] পরে চৈতন্যের ভক্ত হন এবং বৌদ্ধ-দলন করেন। এই রাজার সহিত হোসেন সাহের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে ত্রিশূল পুঁতিয়া দুই রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণ করা হইত। এক রাজ্যের প্রজা আর এক রাজ্যে প্রবেশ করিবার কালে "ডুরি" নিতে হইত। ইহা ছাড়পত্র বা passportএর ন্যায় ছিল। পথিকদের নূতন রাজ্যে প্রবেশকালে মাশুল (কর) দিতে হইত। এই সময়ে তাহাদের উপর জোর জবরদস্তি প্রয়োগ করা হইত।

"উড়িয়া জগাতি সব বড়ই দুর্ম্মতি"

* * * *

ঘাটে ঘাটে ওড্রদেশে জগাতি বিস্তর

মোর প্রভুরগণ বিনা সবে দেই কর।"*

১৯। "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" (বাংলায় ভাষান্তরিত)—পৃঃ ৯ম অঙ্ক

* চৈতন্য চরিতামৃত—১ম পরিচ্ছেদ

২০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড; ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

২১। N. N. Basu, "The Modern Budhism and its followers in Orissa"—পৃঃ ৭০

* "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক"—৯ম ও ১০ম অঙ্ক

চৈতন্যের দল এই মাশুল হইতে অব্যাহত ছিলেন বটে, তবু একবার বাঙ্গালী ভক্তদের উড়িষ্যা প্রবেশকালে অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ উড়িষ্যার রাষ্ট্রান্তর্গত ছিল। একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে প্রাদেশিকতা তৎকালে এত তীব্র ছিল না যতটা আজকাল হইয়াছে। চৈতন্য ও রূপ-সনাতনের অনেক অ-বাঙ্গালী শিষ্য ছিল এবং প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিল বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। সনাতন গোস্বামী উড়িষ্যার বৌদ্ধদের শিষ্য করেন।[২২] তেমনি পশ্চিমের এবং পাঞ্জাবের ভক্তদের সাহায্যে রূপ-সনাতন বৃন্দাবন পুনঃ সংস্কার করেন :—

"হেন কালে মুলতান দেশীয় একজন

* * * *

কপুর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস

নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ

* * * *

সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কইল।"[২৩]

ভক্তদের সামাজিক স্তর

এই সকল বিবরণাদি হইতে এই সংবাদ অবগত হওয়া যায় যে, চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম্ম প্রথমাবস্থাতে স্বাধীন রাজা (প্রতাপ রুদ্র), ভুঁইয়া রাজারা (বীর হাম্বির ও শিখর-ভূমির বর্ত্তমান পঞ্চকোট—রাজা হরিনারায়ণ), প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (রামানন্দ রায়), বড় বড় মন্ত্রী (রূপ-সনাতন, "সহস্র ঘোড়া যার আগে পিছে দৌড়ে, বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পোতা থাকিল সে গৌড়ে")* জমিদার পুত্র (নরোত্তম দত্ত ও রঘুনাথ দাস), ধনী (উদ্ধরণ দত্ত), কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত জমিদারের ছেলে ইত্যাদি ভক্ত হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম প্রথমে অভিজাতদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বাংলার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের তথাকথিত উচ্চ জাতিদের মধ্যেই ইহা গৃহীত হয়।

বিমানবাবু প্রথমযুগের ভক্তদের মধ্যে জাতির যে তালিকা দিয়াছেন তন্মধ্যে বঙ্গীয় হিন্দুদের তালিকার মধ্যে

২২। The Modern Budhism, পৃঃ ৭৪, ১২৫

২৩। ভক্তি রত্নাকর—পৃঃ ৯৩

* জয়ানন্দ—"চৈতন্য মঙ্গল", বিজয় খণ্ড—পৃঃ ১৩৬

বিভিন্ন জাতীয় ভক্তদের সংখ্যা হইতেছে,—ব্রাহ্মণ ২৩৯ জন, কায়স্থ ২৯, বৈদ্য ৩৭, সুবর্ণ বণিক ১ জন।"[২৪] এতদ্বারা ইহা দৃষ্ট হয় যে এই ধর্ম্ম প্রথম যুগে তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। ব্রাহ্মণদের দ্বারা মুখ্যতঃ ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। নিপীড়িত জাতিদের মধ্যে একজন ভক্ত হইয়াছিলেন। অন্যপক্ষে তথাকথিত আভিজাত বা দরবারী শ্রেণীয় ভক্তদের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যা অতি কম। ইহার কারণ কি? কেনই বা কায়স্থেরা এই ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয় নাই এবং কি কারণেই বা বেশীর ভাগ কায়স্থেরা, বেশীর ভাগ বৈদ্যরা এই ধর্ম্মকে আজ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে? এই সমস্যার ব্যাখ্যা সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নূতন আলোকসম্পাত করিবে।

২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৬০৯

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-কথা

শূলপাণি

ডি, এইচ, লরেন্স-এর Sons and Lovers পড়িতেছিলাম। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছি, রাত্রি গভীর হইয়া চলিল, ঘুমে শরীরে ক্লান্তি আসিতেছে তথাপি উপন্যাসের অর্দ্ধ পথে ছেদ টানিতে মায়া হইতে লাগিল। রাত্রির স্তব্ধতাকে, ইহার অন্ধকারকে চকিত করিয়া কোথায় ঘড়িতে দুইটাও বাজিয়া গেল।

বই মুড়িয়া রাখা ছাড়া উপায় নাই। অথচ জীবনের যে চলস্রোতে এতক্ষণ নিজেকে একান্তভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই জগতের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু ও হৃদয়াবেগ যেন আমাকে অন্তরে-বাহিরে কোথায় টানিতে লাগিল। ক্বচিৎ কোন উপন্যাস পড়িয়া এমন হইয়াছে—যেন একটা উপলব্ধির রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। অন্তরের দিকে চাহিলে বোঝা যায়, মনের সীমান্ত-রেখা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

উপন্যাসটি নূতন নয়। ইতিপূর্ব্বে আর একবার পড়িয়াছিলাম। ভালই লাগিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া হয়তো পড়ি নাই—হয়তো বা রস-বোধের ক্ষেত্রে 'মুডের' বিভিন্নতা থাকিতে পারে। ইহাও হইতে পারে যে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিভিন্ন পান্থশালা অতিক্রম করিয়া এমন একটি স্থানে পৌছায় যেখানে উপন্যাসটির সুদীর্ঘ অবকাশবহুল চিন্তার বৃহদাকাশে সে যেন আপনা হইতেই সঞ্চরণ করিতে পারে।

রসোপভোগের ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। বিশেষ করিয়া আর্টের ব্যাপারে আমাদের অন্তরের সৌখীন মানুষটি স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর পথ ধরিয়া চলেন। তার পথ চলার একটা ছন্দ ও ক্রমবিকাশ আছে, পথের প্রতি বাঁকে তার খাদ্য ও পেয়ের পরিবেশনে নূতনত্ব চাই। এই সুদীর্ঘ পরিক্রমণের বিভিন্ন যুগে 'মুডের' এই যে বিভিন্নতা তাহার ফলে উপভোগের ক্ষেত্রে পাই আমরা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফলিয়া ওঠে অজস্র ফসলের বৈচিত্র্য। যে যুগে আমাদের মনের বৃহৎ আঙিনায় রঙের হোলি খেলা সুরু হয়—অনুরাগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় এই পৃথিবীটা যেন রাগরক্তিম হইয়া ওঠে—বাসন্তী রাত্রির সেই বিহ্বল মুহূর্ত্তগুলি একদিন পাখা মেলিয়া কোথায় উড়িয়া যায়! তাহার পর ধীরে ধীরে চলে তাহার ঋতু-পরিবর্ত্তন। আমাদের জীবনে হেমন্তেরও প্রয়োজন আছে, তাই ফুলের পালা শেষ হইলেও আক্ষেপের কিছু থাকে না। আমরা জানি, বিশুষ্ক জীর্ণ পুষ্প-পত্রের পথ বাহিয়া ফল ফলিবার দিন আসিল বলিয়া।

বাঙালীর বর্ত্তমান সাহিত্যেও ফুলের ফসল অত্যধিক ফলিয়াছে। বিজ্ঞ সাহিত্যিকের মত আমরা চীৎকার করিয়া বলি না, ইহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি এই অজস্র সাহিত্য-সম্ভার একদিন বিশুষ্ক জীর্ণ পত্র-পুষ্পের মত নিঃশব্দে সাহিত্যের অঙ্গন হইতে বিদায় লইবে।

কাজেই ডাষ্ট-বিন দেখাইবার মত অতখানি উৎসাহী আমরা নই। কিন্তু এই সৃষ্টি ক্ষণিক হইলেও মিথ্যা নয়—খেয়ালে ইহার সৃষ্টি হইলেও ইহার অনিবার্য্য মৃত্যু নূতন সৃষ্টির মন্ত্রকে আবাহন করিয়া আনিবে। সাহিত্যের ঋতু-পরিক্রমায় এখন ফুল ফুটিবার দিনই চলিতেছে—ফল ফলিবার দিন হয়তো আসে নাই। সাম্প্রতিক সাহিত্যের আক্ষেপ-বিক্ষেপ, বিলাপ ও প্রলাপের পরিসমাপ্তি যেদিন ঘটিবে সে দিন বুঝিব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সত্যই নূতনের আগমন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিককে দেখিয়া আঁতকাইলেই চলিবে না। সাহিত্যের মহারণ্য হইতে একে একে বনস্পতিরা বিদায় লইয়াছে—এখন আধুনিক সাহিত্যের টবের ফুল লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সে ফুলে হয়তো কালাতীত সুন্দরের পূজা চলিবে না, কিন্তু সৌখীনতা ও প্রসাধনের প্রয়োজন কিঞ্চিৎ মিটিবে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক এই সাম্প্রতিক সাহিত্যকে আমরা ঠিকভাবে বুঝি নাই—ইহা হয় তো অনেকে বলিবেন। আমরা তাহাদের এই অভিযোগের উত্তর দিবার ভার আপাততঃ ভবিষ্যতের কাব্যরসিকের হাতে ছাড়িয়া দিতেছি।

কথাপ্রসঙ্গে পথ ছাড়িয়া বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। লরেন্সের 'Sons and Lovers' উপন্যাসটির কথা বলিতেছিলাম। উপন্যাসটির বিশেষত্ব ইহার গভীর আদর্শবাদ। পল, ক্লারা মিরিয়াম ও মায়ের চরিত্র লইয়া ঘটনা বহিয়া চলিয়াছে। কয়লার খনির পশ্চাৎপটের উপর কয়েকটি নরনারীর জীবনের ভূমিকা ও তাহাদের পরিণতির আভাষ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাই। অতি-সাধারণ দরিদ্র নরনারীর ব্যথা ও ব্যর্থতার কাহিনী একটি বৃহৎ জগৎ রচনা করিয়াছে। এই লেখকের রচনায় পারিপার্শ্বিকের ও বস্তু-জীবনের পরিচয় যথেষ্ট মিলিবে কিন্তু যে গভীর জীবন রহস্য মানুষের বাহিরকে অহরহঃ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দুনিবার বেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। ক্বচিৎ কোন বিদেশী ঔপন্যাসিকের রচনায় দৃষ্টির এমন গভীরতা দেখা গিয়াছে।

সবচেয়ে ভাল লাগে মায়ের (Mrs. Morel) চরিত্রের অভিব্যঞ্জনা। উপন্যাসটির গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই নারী-চরিত্রের উপর লেখক তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করিয়া দিয়াছেন—তাহার জীবনের বিভিন্ন পথ-প্রান্তে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা সর্ব্বত্রই সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া। মাতা ও পুত্রের (Paul) জীবনের অভিব্যক্তি যেন এক রহস্যময় কারণে একই সুরে স্পন্দিত হইয়া চলিয়াছে। Paul-এর জীবনের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে তাহার অন্তর-বাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া নারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পর ধীরে ধীরে পলের জীবনে যখন যৌবনের প্রথম পদক্ষেপ হইল তখনও দেখি পুত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছে মা। Clara ও মিরিয়ামের সহিত Paul-এর sexual জীবনের যে সুদীর্ঘ পরিচয়, তাহাও যেন এই অন্তরালবর্ত্তিনী নারীর আদর্শবাদের প্রভাব হইতে মুক্তি পায় নাই। উপন্যাস সাহিত্যে ইহা বিচিত্র। Paul-এর sexual জীবনের গভীর তলদেশে যে mysticism-এর প্রভাব তাহা যেন সে মায়ের রক্তধারার সহিত পাইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিই, গোর্কীর 'মাদার' উপন্যাস ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্যে মায়ের চরিত্রের এই অভিনব রূপ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমার ইহাও মনে হয়, Lawrence-এর সহিত তুলনায় গোর্কীর মাতৃ-মূর্ত্তি বোধ হয় এতখানি গভীর ও বিচিত্র হইয়া দেখা দেয় নাই।

রবি-স্মৃতি

শ্রীজহরলাল বসু

মৃত্যুঞ্জয় তুমি কবি! মরণের পর।
ধরায় তোমার যশঃ শাশ্বত ভাস্বর॥

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালীপদ দাস

তুমি নাই আজ সকলি শূন্য তপ্ত অশ্রুধারা—
খুঁজিছে তোমায় অসীম মৌনে তুমি হও নাই হারা।

গান ও স্বরলিপি

কবিগুরুর অদর্শনে

মল্লার মিশ্র—দাদ্‌রা

বর্ষা আঁচল বিছা'ল ধরণীতলে—
কবি তুমি দূরে রবে বল কোন্ ছলে ?
কেতকী কদম বিকশিল বনতলে
কবি তুমি দূরে রবে বল কোন্ ছলে ?
নদী সরোবরে ভরিয়া উঠেছে জল,
মাঠ ঘাট ছেয়ে জেগেছে তৃণ শ্যামল,
রহি' রহি' বাজে গগনে মেঘ-মাদল
হেন দিনে কবি দূরে রবে কোন্ ছলে ?
বনে বনে আজ কেকারব শোনা যায়
মানসবনের শিখী তুমি কোথা হায় !
বাদলের গান আর কি শোনাবে না,
হৃদয়ের ক্ষুধা আর কি মেটাবে না,
তোমা লাগি' আজ বিরহিনী ধরণী
চেয়ে রয় বুঝি দেখা দিবে কোন্ ছলে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি. এল্., বাণীকণ্ঠ

১				০				১				০			
[পা	-া	সা]													
{সা	-া	সা	|	সা	সা	-ণ্া	I	সা	রা	রা	|	রা	রা	রসা	I
ব	র্	যা	|	আঁ	চ	ল্		বি	ছা	ল	|	ধ	র	ণী০	
সরা	-া	জ্ঞা	|	-া	-া	-া	I	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	জ্ঞা	মা	পা	I
ত	০	লে	|	০	০	০		ক	বি	তু	|	মি	দূ	রে	
														॥	
পরা	রা	রা	|	রা	রা	-জ্ঞা	I	সরা	-া	সা	|	-া	-া	-া	I
র	বে	ব	|	ল	কো	ন্		ছ০	০	লে	|	০	০	০	
{মা	পা	পা	|	পা	পা	-ধা	I	পা	ধা	ণা	|	ণা	ণা	ধা	I
কে	ত	কী	|	ক	দ	ম্		বি	ক	শি	|	ল	ব	ন	
						[ণা]									
পধা	-া	পা	|	-া	-া	-ধা}	I	মা	পা	মা	|	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	I
ত	০	লে	|	০	০	০		ক	বি	তু	|	মি	দূ	রে	
রা	মা	মজ্ঞা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	-র্া	I	সরা	-া	সা	|	-া	-া	-া	II
র	বে	ব	|	ল	কো	ন্		ছ	০	লে	|	০	০	০	

১´ ০ ১´ ০
II {মা পা পা | পা পা ধা I না না র্সা | র্রা র্রা না I
ন দী স | রো ব রে ভ রি য়া | উ ঠে ছে .

র্সা -া -া | -া -া -া I র্সর্সা -র্রা র্সা | -া ণা ণা I
জ ০ ০ | ০ ল্ ০ মা০ ঠ্ ঘা | ট্ ছে য়ে

[-া]
ধা ণা ণা | ধা ণা ধা I পা -া -া | -া -া -ধা} I
জে গে ছে | তৃ ণ শ্যা ম ০ ০ | ০ ০ ল্

{মা ধা ধা | ধা ধা ধা I ধা ণা ণা | ধা ণা ধা I
র হি র | হি বা জে গ গ নে | মে ঘ মা

পা -া -া | -া -া -া} I মা পা মা | মা জ্ঞা জ্ঞা I
দ ০ ০ | ০ ল্ ০ হে ন দি | নে ক বি

রা মা মা | মজ্ঞা জ্ঞা -রা I সরা -া সা | -া -া -া I
দূ রে র | বে কো ন্ ছ০ ০ লে | ০ ০ ০

[সা রা মা | মা মা -া I মা পা পা | -া পা পমা I
II {প্‌া সা সা | সা সা -প্‌া I পা সা সা | -া ন্‌া সা I
ব নে ব | নে আ জ্ কে কা র | ব্ শো না

মণা -া -া | -া -জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা] |
রা -া -া | -া -া -া I রা রা -জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I
যা ০ ০ | ০ য়্ ০ মা ন স্ | ব নে র্

রা মা মজ্ঞা | জ্ঞা রা রা I সা -া -া | -া -া -া} I
শি খী তু | মি কো থা হা ০ ০ | ০ য়্ ০

II {মা পা পা | -া পা -ধা I না -া র্সা | র্রা র্রা না I
বা দ লে | র্ গা ন্ আ র্ কি | শো না বে

র্সা -া -া | -া -া -া I র্সা র্রা র্সা | -া ণা ণা I
না ০ ০ | ০ ০ ০ হৃ দ য়ে | র্ ক্ষু ধা

১´			০				১´			০		[-া]	
ধা	-া	ণা	ধা	ণা	ধা	I	পা	-া	-া	-া	-া	-ধা}	I
আ	ব্	কি	মে	টা	বে		না	০	০	০	০	০	
{মা	ধা	ধা	ধা	ধা	-া	I	ধা	ণা	ণা	ণা	ধা	পধা	I
তো	মা	লা	গি	আ	জ্		বি	র	হি	নী	ধ	র	
পা	-া	-া	-া	-া	-া}	I	মা	পা	মা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	I
ণী	০	০	০	০	০		চে	য়ে	র	য়	বু	ঝি	
রা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-রা	I	সরা	-া	সা	-া	-া	-া	II II
দে	খা	দি	বে	কো	ন্		ছ০	০	লে	০	০	০	

২২শে শ্রাবণ

শ্রীদিলীপ মিত্র

সহস্র বৎসর পরে আবার আসিবে জানি
শূন্যতার বেদনায় পূর্ণ করা ২২শে শ্রাবণ।
বসন্তের শেষ পুষ্প, কোকিলের অশান্ত সঙ্গীত
সকরুণ দীনতায় লইবে বিদায়।
বহু বেদনার আঁখিজলে ভরা
হে দাম্ভিকা রমণি,
অভিসার তব যাবে না কি থামি' ?
উশৃঙ্খল তব যৌবন ক্ষণে
মনে যদি পড়ে অকারণে
সেদিনের ভুলে-যাওয়া ২২শে শ্রাবণ।
জানি, জানি
হয়ত পাষাণি
স্মিত হাসে
চলে যাবে উপেক্ষার দুরন্ত উল্লাসে।
তবু হায় তব পথ মাঝে
অলক্ষিতে রবে লাজে বেদনা বিধুর
শ্রাবণের ক্রন্দনের সুর।

অস্তায়ন

শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

রবি গেল অস্তাচলে। শ্রাবণের মধ্যাহ্ন গগন
ঘনপুঞ্জ কৃষ্ণমেঘে ধীরে ধীরে হইল মগন।
দিবসের আয়ুশিখা পলে পলে হ'য়ে এল ক্ষীণ,
থেমে গেল জীবন-স্পন্দন, যেন শূন্যে হ'ল লীন।
বুঝিতে পারিনে আজ মোরা আছি বেঁচে কিংবা ম'রে,
শোকে মূঢ় স্তম্ভিত যে কাঁদিতে পারিনে উচ্চ স্বরে।
দিকে দিকে সমীরণ কেঁদে ফেরে আকুল বিলাপে
পিতৃহীন অবোধ শিশুর মত বিয়োগ-সন্তাপে।
বাণীহীন আকাশের অন্ধ আঁখি হ'তে অশ্রু ঝরে
বেদনা গুমরি' উঠে মর্ম্মন্তুদ মেঘমন্দ্র স্বরে।
অকম্প্র প্রতীক্ষাভরে নক্ষত্রমণ্ডলী আছে চাহি'
কখন উঠিবে ফিরে মৃত্যুর তমিস্রা অবগাহি'
অনন্তের পূর্ব্বপ্রান্তে সপ্তবর্ণ রথে নব ভানু
কাকলি' উঠিবে সুর মর্ত্ত্যবুকে প্রাণী, পরমাণু,
সুরভির ছন্দে-লয়ে প্রবাহি' উঠিবে ভাব ভাষা
মানবের সুপ্ত মনে, মুকুলিবে মুঞ্জরিবে আশা।
নিবিড় তমসা মাঝে আর্ত্তস্বরে কাঁদিছে ধরণী
মোর বুকে ফিরে এস, হে রবীন্দ্র, কবি শিরোমণি।
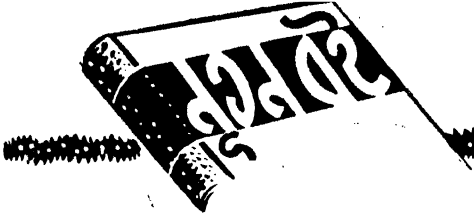
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর জন্মান্তর-গ্রহণের বিচিত্র কাহিনী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাঙালীর জীবনে এত বড় একটি রূপান্তর কি ভাবে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার সত্যকার ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। এখনো অনেক অজ্ঞাত কাহিনী সংবাদপত্রের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। তদুপরি এই আশঙ্কাও অমূলক নহে যে, এখনো যে-সব উপকরণ প্রাচীন পুঁথিপত্রের পাতা হইতে বহু আয়াসে সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে, কিছুদিন পরে হয়ত আর তাহার অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বাগল-মহাশয় গত দশ বারো বৎসর ধরিয়া প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া এই ইতিহাসের যে-সব উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধনিচয়ের কয়েকটি সঙ্কলন করিয়া তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' নামক মূল্যবান গ্রন্থখানি বিরচিত। ইহাতে রুস্তমজী কাওয়াসজী (১৭৯২-১৮৫২), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (১৮০৬-১৮৫২ ?)—রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)—এই সাতজন কৃতী কর্মবীরের জীবনী ও কার্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি-বিবর্ত্তনের আলোচনা করা হইয়াছে। উপরের তারিখগুলি হইতে সময়ের দিক্ দিয়া যদিও ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত গ্রন্থের আলোচনার কাল লক্ষ্য করা যাইবে, তবু প্রধানতঃ বাংলার জাতীয় জীবনে হিন্দু কলেজের যুগ ও তার প্রভাব-কালের কথাই বিশেষভাবে এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। 'নব্য বঙ্গের গুরু স্থানীয়' হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং হিন্দু কলেজের তিনজন সফলকর্ম্মা ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিকদারের কথা আলোচনা করিতে গিয়া তৎকালীন বাঙালীর জীবনগঠনে হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষার প্রভাবের কথাই বার বার উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান গ্রন্থের উপজীব্য প্রধানতঃ বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিগত অভ্যুদয়। গ্রন্থকার অবশ্য এই বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা নিঃশেষ করিবার দাবী করিবেন না, কিন্তু এই আলোচনায় যাঁহাদের কথা না জানিলে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, অথচ যাঁহাদের সম্পর্কে হয় আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অল্প, নয় ত তাহা পদে পদে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বাগল-মহাশয় এমন কয়জন কৃতী পুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়া তৎসম্পর্কিত এবং প্রসঙ্গত আলোচ্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ব্ব সূরীদের ভুলগুলি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া এই গ্রন্থে সেই যুগের সত্য ইতিহাস রচনার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের সত্যান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে বাগল-মহাশয় কখনো ত্রুটি করেন নাই। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তিনি তৎকালীন সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি হইতে মৌলিক প্রমাণের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। হাত-ফেরতা উপকরণের উপর তিনি কখনো বরাত দেন নাই। এই জন্যই আলোচ্য যুগ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান নূতন কথা, তারিখ ও তথ্যের অনেক ভ্রম সংশোধন এবং কোনো কোনো বিষয় ও ব্যক্তি সম্পর্কে এ যাবৎ প্রচলিত ভুল ধারণার প্রতি আমাদের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বাগল-মহাশয় যে কৃতিত্বের অধিকারী হইলেন, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ তাহা সব সময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবেন। 'রেফারেন্স' বুক' বা প্রমাণ-পুস্তক হিসাবে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য হইয়া রহিল। আমরা আশা করি, তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'র কাজ এইখানেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না।

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভাট্টাচার্য

ঋগ্বেদ—(প্রথম অষ্টক—প্রথম অধ্যায়) শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান:—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বর্ত্তমানে হিন্দু-ধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের যুগে বাঙ্গালী নরনারীর বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ধারাটির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ যুগের বর্ত্তমান গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন মনে হইলেও জাতির অন্তরের গভীর অতলে একটি অভাবিতপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনা বহিয়া যাইতেছে। ইহা অনুভব করিবার দৃষ্টি সকলের না থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ মনীষী যাঁহারা তাঁহাদের ইহা দৃষ্টি এড়ায় নাই। এই ভাবী জাগরণ, যাহার আবাহন মন্ত্র গাহিয়া ভারতীয় হিন্দু সমাজ দিন-দিন করিয়া মাস ও মাস-মাস করিয়া বৎসর গণিতেছে, তাহাকে সফল করিতে হইলে সৎ সাহিত্য প্রচার করিতে হইবে। শ্রুতির প্রচারের সহিত আমরা সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারা ও সমাজ পদ্ধতির প্রাণরসটুকু আহরণ করিয়া হয়তো সবল ও সুস্থ হইয়া বাঁচিতে পারিব। গ্রন্থকার এই দিক দিয়া যে প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রচুর সার্থকতা আছে। লেখক মূল, সায়ণাচার্য্যের অন্বয়মুখী টীকা এবং

মূলের পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। এই বাংলা পদ্যানুবাদকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণ পাঠককে বেদতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কারণ মূল ও সায়ণাচার্য্যের টীকা পড়িয়া সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর বেদতত্ত্ব বুঝা সত্যই কঠিন। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার অন্বয় মুখে বাংলা ব্যাখ্যা একটু বিস্তৃতভাবে দিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিতে সহজ হইত। কাব্যানুবাদ প্রাঞ্জল ও মূলানুগত হইলেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহাই একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে বলিয়াই যাহা কিছু অসুবিধা। আমরা এই দিকে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। বেদতত্ত্ব ও বেদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা সুবিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সুপর্ণা—চতুর্থ বর্ষ, ১৩৪৮-৪৯ সন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মুখপত্র, সম্পাদিকা শ্রীমতী শান্তি বসু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতির নির্ব্বাচন সম্পাদিকা ও তাঁহার সহকারিণীদের রুচির পরিচয় দিতেছে। এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ যে সাহিত্য-প্রীতি ও সংগঠন-নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুলভ নয়। অন্ততঃ কেবলমাত্র বাঙালী মহিলা পরিচালিত এইরূপ একখানি পত্রিকার সন্ধান আমাদের জানা নাই। আমরা এই উপলক্ষে পত্রিকার সম্পাদিকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

চণ্ডী (কাব্য)—৺ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, কর্ত্তৃক সংস্কৃত মূল হইতে কাব্যাকারে গ্রথিত। দশ আনা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী ভারতের হিন্দু নরনারীর পরম পবিত্র গ্রন্থ। বর্ত্তমান কালে চণ্ডীর বহু বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও আলোচ্য গ্রন্থে স্বর্গীয় সুকবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী মহাশয় কাব্যের মধ্য দিয়া চণ্ডীর যে রূপ দান করিয়াছেন, তাহা পরম উপাদেয় হইয়াছে। কাব্য রসের সহিত স্বর্গীয় লেখকের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতা মিশিয়া গ্রন্থটিকে যে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে—তাহা সুলভ নয়। আমরা পুস্তকটি পাঠকসাধারণকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কবি-প্রণাম—বাণীচক্র-ভবন, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। সাধারণ সংস্করণ দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীহট্টের সাহিত্যিকবৃন্দ রবীন্দ্র-প্রয়াণ উপলক্ষ্যে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তৎসত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি, আলোচ্য গ্রন্থ তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে। আমরা দেখিতেছি পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ হইয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা লেখকগণের তথ্যপূর্ণ রচনায় এই পুস্তক বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। বাংলার খ্যাতিমান লেখকগণের অনেকেই ইহাতে আছেন, ফলে পুস্তকের আকর্ষণী শক্তি অধিকতর বাড়িয়াছে। সতীশচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্র-স্মৃতি', শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য', শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-পরিক্রমা' প্রভৃতি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা কবিগুরুর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলার পাঠক সমাজের দৃষ্টি এই গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

স্তোত্রগীতা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, "শ্রীশ্রীনারায়ণ আশ্রম" মৃগা—ময়মনসিংহ। মূল্য—গ্রন্থকারের জন্মস্থানে শ্রীশ্রীকালীমন্দির প্রতিষ্ঠার্থ দান।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সংস্কৃত ভাষায় স্তবমালা রচনা করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। স্তবপাঠের এমন একটি প্রভাব আছে যাহা মনকে শুদ্ধ, শান্ত ও আনন্দময় করিয়া তোলে। নিয়মিত স্তোত্র পাঠে আমাদের বিক্ষিপ্ত চঞ্চল ও সংশয়াকুল মন একটি শুদ্ধ ও গভীর প্রশান্তির আস্বাদ পায়। এই পুস্তকের চৌত্রিশটি শ্লোকই সুমধুর, সুললিত। ইহা পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণের অন্তরে ভক্তিভাব উন্মেষিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। রচয়িতার উদ্দেশ্যও মহৎ। দাতার অকৃপণ হস্ত প্রস্তাবিত কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার্থ উন্মুক্ত হইবে, এই প্রার্থনা করি।

দ্বিচক্রে কোরিয়া-ভ্রমণ—ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান: পর্য্যটন প্রকাশনা ভবন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

রামনাথবাবুর ভ্রমণ কাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনায় দৃষ্টিশক্তি ও সমবেদনার পরিচয় থাকে, ইহার ফলে তাঁহার পর্য্যটন কাহিনীগুলি সরস ও মনোরম হইয়া পাঠকের নিকট ধরা দেয়। সকলের উপর আছে তাঁহার অকুণ্ঠ ও সরল প্রকাশভঙ্গী যাহা ভ্রমণ কাহিনী লেখকের পক্ষে অনিবার্য্য। বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক কোরিয়া সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে কোরিয়ার সমাজ, ভৌগোলিক বিবরণ ও জীবনের অভিজ্ঞতা বহু ঘটনার মধ্য দিয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তকটি লেখকের রচনার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া মনে করি।

বঙ্গীয় মহাকোষ—স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। এই মহাকোষের ২য় খণ্ড, ২২শ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদন ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সমস্ত পাণ্ডিত্য ও গবেষণা একাধারে নিয়োগ করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ মহাকোষ প্রকাশিত হইলে ইহা বঙ্গভাষার বিশেষ গৌরবের সামগ্রী হইবে। বাঙ্গলার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহার যে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

রুশ-রণাঙ্গন ঃ সমগ্র রুশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে প্রলয়ঙ্করী সংগ্রাম চলিতেছে। এক পক্ষে জার্ম্মান-বাহিনীর মহাপ্রলয়ের প্রবল ঝঞ্ঝাবেগ ও অন্য দিকে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় রুশ বাহিনী ও জনসাধারণের মরণপণ দৃঢ় সঙ্কল্প। বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে এই ঘটনা অভূত-পূর্ব্ব ও অভিনব। রুশগণ জার্ম্মানীর বিপক্ষে যে সংগ্রাম করিতেছে তাহাকেই প্রকৃত গণযুদ্ধ (People's war) বলা যায়। চীনাদের সংগ্রামকেও গণযুদ্ধ বলা যায়, কিন্তু চীনবাসীদের এক বৃহৎ অংশ জাপানের তাঁবেদার বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু রুশিয়ার সমগ্র দেশবাসী তাহাদের সাধারণ শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতে বদ্ধপরিকর। রুশিয়া দুর্ব্বল দেশ নয়। সে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি রুশবাসিগণের সামরিক শক্তি বিশ্ব-বিখ্যাত। আধুনিক শস্ত্র-বিদ্যায়ও রুশিয়া গৌরবান্বিত এবং আধুনিকতম ভাব-ধারায় রুশবাসিগণ সঞ্জীবিত। রুশবাসিগণের মধ্যে এখনও জার্ম্মানী ভেদ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই। তাহার উপরে রুশিয়ার লোক সংখ্যা জার্ম্মানীর তিন গুণ ও তাহার দেশের আয়তনও বিপুল। আয়তনে রুশিয়া আফ্রিকার চাইতেও বৃহত্তর।

সে যাহাই হউক, বস্তুতঃ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, লেনিনগ্রাড ও মস্কৌ মহানগরীর বিপদ ঘনীভূত হইয়াছে এবং তাহার উপর ককেসাসের তৈল উপলক্ষ করিয়া যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইতেছে তাহার ফলাফলের উপরেই বর্ত্তমান মহাসমর তথা পৃথিবীর ভাগ্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, হিটলার একদিকে জিব্রাল্টার আক্রমণ করিবে এবং অন্যদিকে তুরস্কের মধ্য দিয়া সুয়েজ খাল দখল করিবার চেষ্টা করিবেন এবং তুরস্কের মধ্য দিয়াই ককেসাস ও ইরাক আক্রমণ করিবেন। সেজন্য ভূমধ্যসাগরের দিকেই প্রধানতঃ সকলের দৃষ্টি এতাবৎ নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিটলার সকলের সকল প্রকার গবেষণা ব্যর্থ করিয়া ককেসাসেই সরাসরি রুশিয়ার মধ্য দিয়াই অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। জার্ম্মান বাহিনীর ককেসাস বিজয়ের ফলাফল তাহাদের সুয়েজ খাল দখলের চাইতেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ককেসাসের সঙ্গে সঙ্গে ইরাক, ইরাণ, সুয়েজ খাল, মিশর প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের দেশগুলি জার্ম্মান-আক্রমণের সম্মুখীন হইবে। এক কথায় এশিয়া ও আফ্রিকায় পশ্চিম হইতে প্রচণ্ড ভূকম্পনের ধাক্কা আসিয়া লাগিবে। জার্ম্মান বাহিনী বর্ত্তমানে রোষ্টভ ও ভরশিলফগ্রাড অতিক্রম করিয়া উত্তর ককেসাসের বিখ্যাত তৈল অঞ্চলের মর্ম্মস্থলে আসিয়া হানা দিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাড আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। সামরিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অষ্ট্রাখান পর্য্যন্ত উপনীত হইবার জন্য জার্ম্মান সেনাপতি ভন বক রণনীতি পরিচালনা করিতেছেন। তাহাতে ককেসাসের তৈল হইতে রুশ-বাহিনী বঞ্চিত হইবে এবং অপর পক্ষে ককেসাস, ইরাক ও ইরাণের অতুলনীয় তৈল সম্পদ্ জার্ম্মানীর আয়ত্বাধীনে আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

এই সময়ে যদি মিত্র পক্ষ ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারিতেন তবেই রুশিয়ার উপর হিটলারের চাপ কমিয়া যাইত। উক্ত রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে মিত্র পক্ষ যতই বিলম্ব করিবেন ততই রুশ-রণাঙ্গনের অবস্থা ভীষণাকার ধারণ করিবে। ভূমধ্যসাগরের প্রলয় ঝঞ্ঝা এখন ককেসাসের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং স্পেন ও তুরস্কের আপাততঃ যুদ্ধে জড়িত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে অনেক রণতরী তৈরী হইবার খবর আসিয়াছে। ককেসাসের যুদ্ধে জার্ম্মানী জয়ী হইলে তুরস্কের ভাগ্যে কি ঘটিবে বলা যায় না। চারিদিকে প্রবাহিত প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে তুরস্কে যে এতদিনও অখণ্ড শান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা তাহার রাষ্ট্রনায়কগণের অপরিসীম রাজনীতিকুশলতার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রাচ্য রঙ্গমঞ্চ ঃ ইউরোপীয় সমর-সাগরের ভয়সঙ্কুল তরঙ্গমালা ককেসাস অতিক্রম করিয়া প্রাচ্য মহাদেশে অভিঘাত করিতে উদ্যত। আবার অন্য দিকে পোর্ট মোর্সবিতে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি

পাইয়াছে, তাহাতে অষ্ট্রেলিয়ায়ও যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। তাহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়ার সীমানায় জাপানীগণ বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রশান্তমহাসাগরে আবার "টাইফুন" ঘূর্ণিবাত্যার উৎপত্তি সূচনা দেখা যাইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া উহা সাইবেরিয়া অভিমুখে অথবা অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে—কোন দিকে ধাবিত হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, জাপানের সাইবেরিয়া আক্রমণেরই অধিকতর সম্ভাবনা। তবে আশার কথা এই যে, মার্কিণ সৈন্যগণ সম্প্রতি এলুউসিয়ান ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে। ইহা হয়তো মিত্রপক্ষের ভাবী বিপুল আক্রমণাত্মক নীতিরই পূর্ব্ব সূচনা। ইহা সফল হইলে চীন ও রুশিয়ায় মিত্রশক্তির পক্ষে যোগান দিবার পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক হইবে।

ভারতীয় কংগ্রেসের দাবী যদি ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তিপুঞ্জ মানিয়া লয়েন তাহা হইলে জগতের রাষ্ট্রমঞ্চে ভারত একটী গুরুত্বপূর্ণ অংশের অভিনয় করিবে। ভারতের এই রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিণতি লক্ষ্য না করিয়া এক্সিস শক্তিবর্গ অকস্মাৎ ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত সম্বন্ধে মিত্রশক্তির শুভ বুদ্ধির উপর বর্ত্তমান মহাসমরের গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

চীনের গণযুদ্ধের অন্যতম নেতা চ্যাং স্যুয়ে লিয়াং

অস্ত-গোধূলি

শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, কাব্যনিধি, সাহিত্যশেখর

ধরণীর সরণীতে পশিতেছে নক্ষত্রের আলো,
অবসান হ'য়ে এলো দিবালোক, সন্ধ্যা দীপ জ্বালো।
আকাশে বাতাসে
মূর্ত্ত হ'লো আঁধারের ম্লায়মান ছবি
পশ্চিম গগন-কোণে অস্ত গেল রবি।

প্রকাশের পথ কোথা বিসর্পিল মনখানি জুড়ে
'আমি' 'তুমি' বাঁধা আছি এক তারে একতান সুরে।
রিক্ত নই, ভগ্ন নই, নই ছন্নছাড়া
জীবনসায়র নীরে বহমান নদীজলধারা।
…ছুটে চলি সাগর-সঙ্গমে
বেগবান্ প্রাণের উদ্যমে—
প্রদোষের আলোক আঁধারে।

খোলো যবনিকা, মেলো আঁখি, চাহ পথপানে—
অগণিত আর্তনাদ শোনো ওই নিখিলের প্রাণে
অভিযোগরাশি…
মলিন ক'রেছে কত মানবেরে সুখশান্তি নাশি'।
দেবার কি কিছু নাই?
অভিযান রুদ্ধ কর, দেখ ভাবি—পথ কোথা ভাই!
নেমে আসে অন্ধকার নিশীথিনী চাহ চাহ ফিরে
ভাঙো ভুল, ডেকে নাও সকলেরে আসে পাপ ঘিরে।

শতাব্দীর ভাঙাগড়া সুরু হবে যবে, চূর্ণ হবে সব
কোন্ মূল্য দিয়ে মোরা লভি' পরিচয়—জিনিব বৈভব?
বাস্তবের কলুষতা
করিবে পঙ্কিল, ভারতের যত ইতিকথা।
কাব্যগাথা, দর্শনে প্রাণ-পরিচয়ে করিব মিতালি,
হে অস্ত-গোধূলি!

সাময়িকী

ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি :

গত ৭ই ও ৮ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং মহাত্মাজীর একচ্ছত্র নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। এই অধিবেশন আরম্ভ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেসের ওয়ার্দ্ধা প্রস্তাব লইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সারা দেশের উপর তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা ও জল্পনা-কল্পনার ঝড় বহিয়া যায়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী : অশীতিপর বৃদ্ধ মালব্যজী ভারতের মুক্তিসাধনায় সাফল্যকামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন।

বিশ্বের সমগ্র দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্যক্তিগতভাবে ও সংবাদপত্র মারফতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই স্মরণীয় প্রস্তাবের তথা মহাত্মাজীর উপর তীব্র তিক্ত মন্তব্য ও কটু সমালোচনার বাণ-বর্ষণও সমানে চলে। এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা ও মনোভাবের আমরা কোন হেতু খুঁজিয়া পাই না। আমাদের স্বভাবতঃই মনে হয়, এই প্রস্তাবের এবং প্রস্তাব সম্পর্কীয় নেতৃবৃন্দের পরিস্ফুটক বিবৃতির সম্পূর্ণাংশ বিদেশী জনসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় নাই। মার্কিণবাসীর উদ্দেশ্যে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ক্রোধব্যঞ্জক বেতারবাণী এবং ভারতসচিব মিঃ আমেরীর শক্তিমত্ত উদ্ধত দম্ভোক্তি ইহাই প্রমাণ করে। বস্তুতঃ সমগ্র প্রস্তাবটি বর্ত্তমান বিশ্বের জটিলতম পটভূমির উপর একটা স্বচ্ছ আলোকপাত করিয়াছে। ইহা ন্যায্য সম্মানজনক আপোষের এবং মিত্রশক্তিপুঞ্জের সমর প্রচেষ্টার পরিপোষক মনোভাব লইয়াই রচিত। শেষের কার্য্যকরী অংশ ছাড়া ইহার মধ্যে আবেদনের সুর সুস্পষ্ট। প্রস্তাবের শেষাংশের মর্ম্মও যে মিত্রশক্তির কল্যাণকল্পেই পরিকল্পিত তাহা মহাত্মাজীর অভিব্যক্তির মধ্যে দিনের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, মধ্যযুগীয় জমিদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের স্বার্থান্ধদৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে নাই, অথবা পড়িলেও তাহা আমোল দিবার মত প্রগতিশীল স্বচ্ছ মননশীলতার অভাব ঘটিয়াছে। ভারতসচিবের এই নির্লজ্জ সমবেদনাহীন বিকৃত মন্তব্য "Constitute perhaps the most unfortunate single element in the whole tragedy of misundertanding and mistrust of the past two or three years. To those who in a personal way know anything of what patriotic sensitive Indians think and feel about these things, Mr. Amery's utterances have invariably been either galling or nauseating or both." (Quoted from English Soldiers letter to the Statesman of 15. 8. 42.)

এই সহৃদয় সৈনিকটি পত্রশেষে সত্যই মন্তব্য করিয়াছেন : "After all we Europeans in India are foreigners, intruders. We have no moral right to live and work in the country unless we come as servants of India." মিঃ আমেরি প্রমুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমলাতান্ত্রিকের স্বার্থমলিন মনে এইরূপ নিরপেক্ষ অনুভূতি আসাটা সম্ভব নয়। তবুও মহাত্মাজী অতিমানবীয় নৈতিক বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্রিটিশ প্রভুশক্তির পাষাণ হৃদয় বিগলিত করিবার আশা অসীম ধৈর্য্যের সহিত শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মূল মর্ম্ম ছিল এই যে, বর্ত্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী যে নৃশংস যুদ্ধ চলিতেছে, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে এই যে সংঘর্ষ তাহাতে

তবুও সারা দেশব্যাপী শ্রাবণের ধারার সহিত অশ্রু মিশাইয়া বাঙালী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে রবীন্দ্রনাথের বিদেহী মহাপ্রাণ বাঙালীর প্রাণকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলুক, তাঁহারই জীবনে জনম লভিয়া জাগুক সকল দেশ, এই প্রার্থনাই কবিগুরুর স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা আজ করি।

দেশপ্রিয়-মৃত্যু-বার্ষিকী:

গত ২২শে জুলাই দেশের সর্ব্বত্র দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহনের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখিতে দেখিতে নয় বৎসর কাল অতীত হইল, কিন্তু আজও দেখিতেছি তিনি যে স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পূর্ণ হইতেছে না। দেশপ্রিয় রাষ্ট্রনীতি ও দেশ সেবার ক্ষেত্রে চরিত্র ও প্রতিভার একটি বিশিষ্টতা লইয়া আসিয়াছিলেন যাহা তাঁহার অনতিদীর্ঘ কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনকে বাঙালীর নিকট চিরদিন পরম শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। যে সততা ও নিষ্ঠা সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে, দেশপ্রিয় তাহাকেই

মিলিয়াছে। ইহা আধুনিকতম মারণ যন্ত্রসজ্জার অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। জনগণের যুদ্ধ না হওয়াটাই বর্ম্মা, মালয়, জাভা প্রভৃতি স্থানে মিত্রশক্তির এত শীঘ্র সামরিক বিপর্য্যয়ের হেতু। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। একটা অহিংস নিরস্ত্র শান্তি ও আনন্দময় ভাবী পৃথিবীর স্বপ্নের আভাষ আমরা সত্যসন্ধ মহাত্মাজীর পরিকল্পনার মধ্যে পাই। জাতি ও দেশের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া আত্মিক ধর্ম্মবিশ্বাসী মহাত্মাজী বিশ্বমানবতা তথা ভূমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে এইখানেই। মানবকল্যাণের জন্য পশ্চিমের যে মানসিক কাঠামো আজ ধর্ম্মবিহীন জিঘাংসু রাষ্ট্রনীতিকে আশ্রয় করিয়া মারণাস্ত্র নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে, সে মত ও পথ মহাত্মাজীর নহে। মহাত্মাজীর মত ও পথ অভিনব—সত্যই সমগ্র প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পাশ্চাত্য বণিক বুদ্ধির পাষাণ দেউলে প্রতিহত হইয়া ইহা হয়তো এখন ফিরিবে, কিন্তু ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাচী বিশেষ ভারত আশা

প্রফুল্ল-জয়ন্তী:

গত ৩রা আগষ্ট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনের ৮৩তম বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা সমস্ত বাঙালী জাতির সহিত আচার্য্য দেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আধুনিক বাংলার নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মবহুল
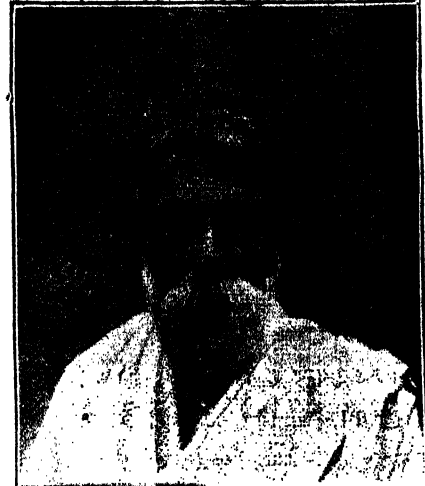
ভুলাভাই দেশাই: আপোষের ইঙ্গিত দিয়া দেশাই-স্যাপ্রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি বিবৃতি দিয়াছেন।

না। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি, কংগ্রেস একটি সরল ঋজু মৈত্রীর পথে অগ্রসর হইয়াছেন যাহা তাঁহার পক্ষে হয়তো এক-মাত্র সম্মানজনক পন্থা ছিল। কারণ এ কথা বোঝা আজ সত্যই কষ্টকর যে, মিত্রশক্তির যুদ্ধপ্রচেষ্টা আজ সারা পৃথিবীব্যাপী বাহু মেলিয়াছে যাহার আদর্শবাদ আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, তাহাদের নিকট স্বাধীন ভারতের নৈতিক ও সামরিক শক্তির সেই বিপুল সম্ভাবনার দিকটি অকিঞ্চিৎকর হইল কি করিয়া। তাই ক্রিপস্-আমেরী-ভারত গবর্ণমেণ্টের দমন-নীতি ও কংগ্রেসকে হীন প্রতিপন্ন করার বাগাড়ম্বর ভারতীয় জনচিত্তকে বিরূপই করিয়া তুলিবে। ভারতের অগণিত নরনারীর অন্তরতম চাওয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ মহাত্মাজী, একথা অস্বীকার করার অর্থ বুঝিয়াও না-বুঝা।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত

সাময়িকী

ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি :

গত ৭ই ও ৮ই আগষ্ট বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং মহাত্মাজীর একচ্ছত্র নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। এই অধিবেশন আরম্ভ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেসের ওয়ার্দ্ধা প্রস্তাব লইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সারা দেশের উপর তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা ও জল্পনা-কল্পনার ঝড় বহিয়া যায়।
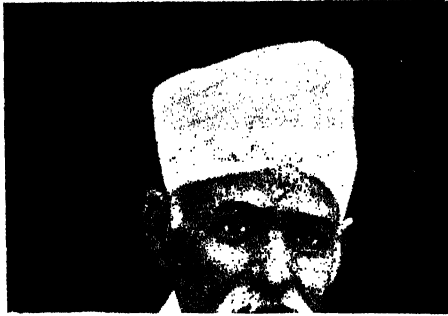
হইতে না হইতেই গান্ধীজী প্রমুখ প্রায় সমস্তকংগ্রেস নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য, ইহা ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশের প্রায় খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতৃবর্গ আজ সকলেই কারারুদ্ধ। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিও আজ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীন আলোচনা বন্ধ করিবার সরকারী বিধি-নিষেধও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সবের কি প্রয়োজন ছিল ? এ কথা স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছিল, কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মহাত্মাজী মিত্রপক্ষীয় বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদিগের নিকট একটি আবেদন জানাইবেন। বড়লাট লিনলিথগোর সহিতও তিনি দেখা করিবেন, ইহাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাক্ষাৎ ঘটিলে এবং উভয় দিকের আন্তরিকতার সম্মিলন হইলে আপোষের যে সম্ভাবনা ছিল না, এমন নয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের অতি-ব্যস্ততার ফলে সেই সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই সাম্প্রতিক রাজনীতিক চাল অদূরদর্শী, ইহা দেশের ভাগ্যে অকল্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছে। আমরা

করা হয় নাই। মার্কিণবাসীর উদ্দেশ্যে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ক্রোধব্যঞ্জক বেতারবাণী এবং ভারতসচিব মিঃ আমেরীর শক্তিমত্ত উদ্ধত দম্ভোক্তি ইহাই প্রমাণ করে। বস্তুতঃ সমগ্র প্রস্তাবটি বর্ত্তমান বিশ্বের জটিলতম পটভূমির উপর একটা স্বচ্ছ আলোকপাত করিয়াছে। ইহা ন্যায্য সম্মানজনক আপোষের এবং মিত্রশক্তিপুঞ্জের সমর প্রচেষ্টার পরিপোষক মনোভাব লইয়াই রচিত। শেষের কার্য্যকরী অংশ ছাড়া ইহার মধ্যে আবেদনের সুর সুস্পষ্ট। প্রস্তাবের শেষাংশের মর্ম্মও যে মিত্রশক্তির কল্যাণকল্পেই পরিকল্পিত তাহা মহাত্মাজীর অভিব্যক্তির মধ্যে দিনের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, মধ্যযুগীয় জমিদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের স্বার্থান্ধদৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে নাই, অথবা পড়িলেও তাহা আমোল দিবার মত প্রগতিশীল স্বচ্ছ মননশীলতার অভাব ঘটিয়াছে। ভারতসচিবের এই নির্লজ্জ সমবেদনাহীন বিকৃত মন্তব্য "Constitute perhaps the most unfortunate single element in the whole tragedy of misunderstanding and

জানি না, ইহার শেষ পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যে আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, যাহার অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ভারতীয় জাতীয় চেতনায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, তাহাকেই যেন আমাদের ভাগ্যবিধাতারা বিশ্বের এক চরমতম সঙ্কট মুহূর্ত্তে বহু মানে আবাহন করিয়া আনিলেন। এই ঘনান্ধকার জটিল পটভূমির বুক চিরিয়া এখনও শুভমতি ও বুদ্ধির অরুণালোক উদিত হইবে, এ আশা আমরা করি।

২২শে শ্রাবণ :

রবীন্দ্রনাথের অমরস্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া ২২শে শ্রাবণ জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। রবীন্দ্র-তিরোভাবের একটি বৎসর দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া আসিল। শান্তিনিকেতনে অনাড়ম্বরে কবীন্দ্রের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা মৃত্যুকে স্বীকার করি না, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মত মহামনীষী মহাগুরুর মৃত্যু নাই। তাই কবির আবির্ভাবোৎসবকে সাড়ম্বরে প্রতিপালন করিবার জন্য শান্তিনিকেতন নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

তবুও সারা দেশব্যাপী শ্রাবণের ধারার সহিত অশ্রু মিশাইয়া বাঙালী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে রবীন্দ্রনাথের বিদেহী মহাপ্রাণ বাঙালীর প্রাণকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলুক, তাঁহারই জীবনে জনম লভিয়া জাগুক সকল দেশ, এই প্রার্থনাই কবিগুরুর স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা আজ করি।

দেশপ্রিয়-মৃত্যু-বার্ষিকী :

গত ২২শে জুলাই দেশের সর্ব্বত্র দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহনের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখিতে দেখিতে নয় বৎসর কাল অতীত হইল, কিন্তু আজও দেখিতেছি তিনি যে স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পূর্ণ হইতেছে না। দেশপ্রিয় রাষ্ট্রনীতি ও দেশ সেবার ক্ষেত্রে চরিত্র ও প্রতিভার একটি বিশিষ্টতা লইয়া আসিয়াছিলেন যাহা তাঁহার অনতিদীর্ঘ কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনকে বাঙালীর নিকট চিরদিন পরম শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। যে সততা ও নিষ্ঠা সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে, দেশপ্রিয় তাহাকেই জীবনের কর্ম্মে রূপ দিয়াছিলেন। জনসেবার ক্ষেত্রে যতীন্দ্র-মোহনের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্মীর যে কদাচিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা আজ বাঙালী বিশেষ মর্ম্মপীড়ার সহিত অনুভব করিতেছে। বাঙালীর চিরন্তন দুর্ভাগ্য এই যে, সে তাহার বিগত প্রতিভার সমাধিতলে স্মৃতি-সৌধ ও শোকাশ্রুহার রচনা করিতেই শিখিয়াছে, বর্ত্তমানের গৌরব ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উন্মুখর এই জাতির কলগান যেন দীর্ঘকাল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া দেশপ্রিয়ের দেশ-সেবার অগ্নি-আকাঙ্ক্ষা বাঙালী চিত্তে যেন পুনর্জাগরিত হয়, ইহাই কামনা।

গোটাপাড়া সংবাদ :

বিগত পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় খুলনা-গোটাপাড়ায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সুহৃদ্বর্গ ও অনুরাগী কর্ম্মিবৃন্দের দুইটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুর পৌরোহিত্যে ২২শে শ্রাবণ যে রবীন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে তাঁহারা কবীন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী :

গত ৩রা আগষ্ট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনের ৮৩তম বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা সমস্ত বাঙালী জাতির সহিত আচার্য্য দেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আধুনিক বাংলার নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মবহুল
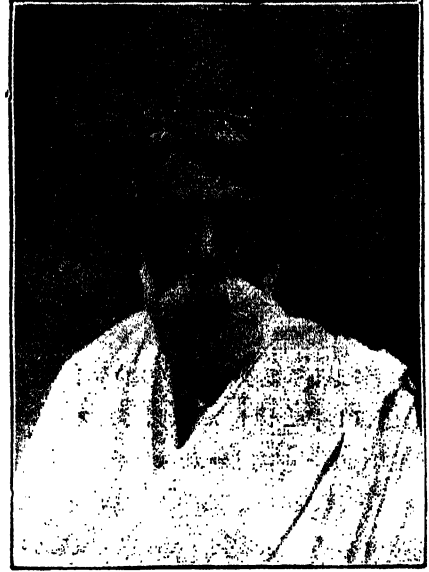
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ত্যাগনিষ্ঠ জীবন দীর্ঘকাল বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিভূস্বরূপ সম্মানিত থাকিবে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট কামনা করি, তিনি শতাধিক কাল জীবিত থাকিয়া জাতিকে একটি সুস্থ ও বীর্য্যময় পথে পরিচালিত করুন।

পরলোকে মহাদেব দেশাই :

সম্প্রতি কারারুদ্ধ, মহাত্মাজীর ভক্তশিষ্য ও অন্তরঙ্গ সহচর মহাদেব দেশাইয়ের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরলোকগমন সংবাদে দেশবাসী মর্ম্মন্তুদ শোকে ম্রিয়মান ও অভিভূত হইয়াছে। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি 'হরিজন' ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নব জীবন' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। বাংলাভাষায়ও তাঁহার জ্ঞান ছিল

প্রচুর। অনেকগুলি বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনেকগুলি পুস্তকও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগোদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ১৯১৭ সাল হইতে তিনি মহাত্মার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন এবং অনেকবার কারাবরণ করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে মহাপ্রাণ মহাদেব দেশাইয়ের স্মৃতি চির সমুজ্জ্বল রহিবে।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ দত্ত :

গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় অধুনালুপ্ত 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রায় ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি রাজা ৺বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সভার ও উত্তরকালে সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহযোগী সম্পাদক হিসাবেও কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া একাধিক সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কয়েকখানি গ্রন্থেরও ইনি রচয়িতা। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার আত্মীয়পরিজনবর্গের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর অনুষ্ঠান :

পূর্ব্বাপর বৎসরের ন্যায় এবারও ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যাদবকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ষোড়শ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ গত ১লা ও ২রা আগষ্ট তাঁহাদের নিজস্ব গৃহে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে একটি জলসারও আয়োজন হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহোদয়ের পৌরোহিত্যে পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্গীতজ্ঞদিগের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়।

অম্বিকা-কালনায় রবীন্দ্র-স্মৃতি-তর্পণ :

'প্রবর্ত্তক'-এর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর পৌরোহিত্যে গত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার কালনা টাউন হলে 'শেফালি সঙ্ঘের' উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে কবিগুরুর তৈলচিত্র প্রতিকৃতি ও মর্ম্মর মূর্ত্তিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মাল্যভূষিত করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশিবরাম ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ মণ্ডল এবং শ্রীমানবেন্দ্র পাল কবিতায় কবিগুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। শ্রীতারাপদ ঘোষ, শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবৈদ্যনাথ মিশ্র ও শ্রীসুনীল রায় মনোহারী আবৃত্তি করেন। পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ও শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস রবীন্দ্র-জীবনী প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। শ্রীএককড়ি কোলে, শ্রীনারায়ণ হালদার, শ্রীভুবন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবৈদ্যনাথ মিশ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান করিয়া এবং শ্রীঅজিত অধিকারী যন্ত্র-সঙ্গীতের দ্বারা উপস্থিত সকলের চিত্তবিনোদন করেন। মোটের উপর মেঘ-ভারাক্রান্ত শ্রাবণের বরষা-সজল সন্ধ্যা কবীন্দ্রের করুণ স্মৃতির গুণ-গানে মুখর হইয়া উঠে। সভাপতির সারগর্ভ ভাষণের পর রাত্রি ৯॥০ টায় সভা ভঙ্গ হয়। হলে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। সহরের বহু বিশিষ্ট নরনারী উপস্থিত হইয়া মৌন নিষ্ঠায় কবিগুরুর স্মৃতি-তর্পণ করেন। শিল্পী দেবেন্দ্রবিজয় ঘোষ, শিল্পী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী সন্তোষ পাল প্রমুখ কর্ম্মিগণের আপ্রাণ সনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় সভা সাফল্যমণ্ডিত হয়।

অবনীন্দ্র উৎসব :

বর্ত্তমান ভাদ্র মাসে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষে সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার যে আয়োজন করা হইতেছে তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে বিশেষভাবে সাড়া দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবনীন্দ্রনাথ শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় নীরব-কর্ম্মী, শুধু কর্ম্মী বলিলে তাঁহার শিল্পসাধনার সব কথা বলা হয় না। আধুনিক চিত্রশিল্পে তিনি নবজীবনের প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছেন ও ইহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পের আদর্শরূপে খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার এই দান বাঙালী দীর্ঘকাল

গৌরব ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আগামী ২রা আশ্বিন অবনীন্দ্র-উৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি ও সম্পাদক হইয়াছেন যথাক্রমে ডাঃ কালিদাস নাগ ও স্বামী প্রেমঘনানন্দ। ৮৯নং আপার সার্কুলার রোডে এই সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার :

ভারত সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টি ও উহার মুখপত্র 'ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট' ও 'নিউ এজ'এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৩৪ সালে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সারা জগতে ফ্যাসিবাদের যে তাণ্ডব চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে ভারতের কম্যুনিষ্টগণ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন, এই আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ ইহাদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে একে একে কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীগণ মুক্তিলাভ করিতেছেন। মুক্তির সর্ত্ত ও দর কষাকষি না হইলে ব্যাপারটা অধিকতর আন্তরিক ও শোভনীয় হইত।

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ :

১৮ই জুলাই হইতে বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলারের অনুমতি পত্র ব্যতীত কেহ বাংলাদেশ হইতে ধান বা চাউল অন্যত্র প্রেরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দিন দিন ধান ও চাউলের মহার্ঘতা বৃদ্ধিই পাইতেছে। বর্ত্তমানে বাংলা সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই আজ তাহাই সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইতি-মধ্যেই জীবনধারণের প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কোনটি এই মূল্য দিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি আর একটি ব্যাপারে বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিথিল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত চার মাস ধরিয়া আমরা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রচলনের কথা শুনিতেছি। কিন্তু সম্প্রতি জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদেশগুলির নিকট হইতে এই ব্যাপারে তাহাদের প্রয়োজনীয় কাপড়ের একটা quota চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক আসাম সরকার ব্যতীত কোন প্রদেশই তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের নির্দ্ধারিত দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান নাই। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বাংলা সরকারের শৈথিল্যের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। আমরা বাংলার সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলি।

প্রতাপচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী :

গত ১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার উল্টাডাঙ্গায় লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রধানতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের চতুর্থ মৃত্যু-স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর, এম-এল-এ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভারতের বিস্কুট

৺প্রতাপচন্দ্র শেঠ

ও বার্লি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে লিলি বিস্কুট কোম্পানী যে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহার পশ্চাতে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের কর্ম্মনিষ্ঠা ও ব্যবসা-প্রতিভা বিশেষভাবে কার্য্যকরী ছিল। বাংলার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা এই যে, বর্ত্তমানে লিলি বিস্কুট কোম্পানী তাহার আধুনিক-তম উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা বিদেশীয় প্রতিযোগিতাকেও

ক্ষুন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে ৺প্রতাপচন্দ্রের সততা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা। আমরা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু - বার্ষিকী উপলক্ষে এই কর্ম্মবীর দেশ-প্রেমিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীঅরবিন্দ :

১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের সপ্ততিতম জন্মতিথি বিভিন্ন স্থানে নীরব নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। বিশ্বমনীষার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা তথা ভারতকে এক গৌরবময় স্থানে অধিরূঢ় করিয়াছেন। দিব্য ঈশ্বরযুক্ত যোগজীবনপ্রতিষ্ঠ জাতীয়তার সাধনায় শ্রীঅরবিন্দের অমর দান এ জাতির পরম সম্পদ্। এই হিমালয়ের মত ধীর, স্থির অচলপ্রতিষ্ঠ জীবন শতায়ুঃ হইয়া জাতির বুকে অধ্যাত্ম প্রেরণা দান করুন, ইহাই এই পুণ্যতিথিতে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিমিটেড্ :

গত ২২শে জুন সোমবার প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিমিটেডের কলিকাতাস্থ হেড অফিসে ইহার অংশীদারগণের ষাণ্মাসিক সাধারণ সভা হয়। জুট মিলের পরিচালকমণ্ডলীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় উপস্থিত না থাকায়, ডিরেক্টরগণের অন্যতম ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট এবং হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট এবং আয়-ব্যয় গৃহীত হয়। পরিচালকবর্গের সুপারিশ অনুযায়ী কোম্পানীর ১৯৪২ খৃঃ ৩১ ডিসেম্বরে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে, তাহার জন্য সাধারণ অংশীদারদিগকে বাৎসরিক শতকরা ৪% হিসাবে এবং প্রেফারেন্স অংশীদারদিগকে গোড়া হইতে ৬% লভ্যাংশ দেওয়া এই সভায় স্থির হইয়াছে। সঙ্কটের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাঘাত এবং বহুবিধ অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে ম্যানেজিং এজেন্টস্ দি প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেড অধিকতর কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিতে পারিতেন। বাঙালীর এই চতুর্থ জুট মিলস্-এর সাফল্যে বাঙালীমাত্রেই সুখী হইবে।

বাঙালী-বিদ্বেষ :

প্রকাশ, দিল্লীর কয়েকটি স্থানীয় কলেজ হইতে বিনা কারণে কয়েকজন বাঙালী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই সকল বাঙালী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদিগকে বিদায় দিবার যথেষ্ট কোন কারণ কর্ত্তৃপক্ষ দেখান নাই। দিল্লীর রামদাস কলেজ ও কমার্শিয়াল কলেজ দীর্ঘকাল হইতে বাঙালীর সেবায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি কলেজের বর্ত্তমান প্রতিপত্তির পশ্চাতে আছে বাঙালী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালীর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হইতেছে তাহা আজ আমাদের গা সওয়া হইয়া গেলেও শিক্ষা ব্যাপারে এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বিশেষ অকল্যাণের সূচনা করিতেছে। ইহাতে ভারতের জাতীয়তাবোধ একদিন বিশীর্ণ কূপমণ্ডুকতাকে আশ্রয় করিবে। দেশের হিতকামী মাত্রেই এই মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করিবেন, ইহা আমরা আশা করি।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
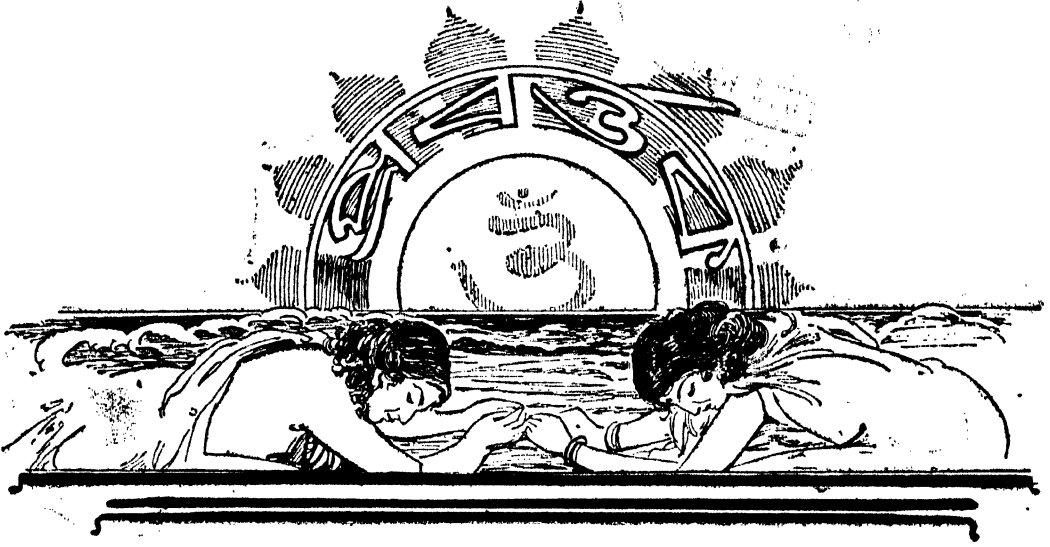
সপ্তবিংশ বর্ষ ১৩৪৯ সাল	আশ্বিন	প্রথম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাধন-বিজ্ঞান

উৎসর্গ হয়েছে আত্মার, বস্তুর উৎসর্গ হয় নাই। তাই দেহে, মনে, প্রাণে এত বিরোধ ও বৈষম্য। আত্মার উৎসর্গের পর বস্তুর উৎসর্গের দাবী ভাগ্যবলেই উপস্থিত হয়েছে। এই দিকে আজ প্রত্যেক সাধক-সাধিকাকে অবহিত হতে হবে।

আত্মার উৎসর্গ যদি হয়ে থাকে, বস্তুর উৎসর্গে বিপ্লবের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আত্মোৎসর্গে ফাঁকি থাকলে, এই বস্তুবিজ্ঞানের সাধনায় তা' ধরা পড়বে।

জ্ঞানের সাধনায় আত্মার উৎসর্গ; বিজ্ঞানের সাধনায় বস্তুর উৎসর্গ। বস্তুর মূল বীজ—মেধা। সমর্পণ-মন্ত্রে দীক্ষিত নর-নারীর মেধার উৎসর্গেই মস্তিষ্কের ঐক্যবুদ্ধি সিদ্ধ হবে। ভাব ও বস্তু—একই সরল জ্যোতির্ম্ময় রেখায় সাধকের সবখানি শক্তিসম্পন্ন ও আলোকোজ্জ্বল করে' তুলবে।

ভাবতঃ ও কার্য্যতঃ যদি ঐক্য প্রতিষ্ঠা পায়, তবেই ঈশ্বরেচ্ছা সিদ্ধ করার পথ আর দুর্গম থাকবে না। বিরামহীন নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্য দিয়াই এই বিজ্ঞান-সাধনা স্বতঃ-স্ফুরিত হবে।

—শ্রীম

সৃষ্টির তপস্যা

কিছু নাই, শুধু উৎসর্গ—আপনাকে দেওয়া। এইটুকু সম্বল লইয়াই সৃষ্টির পথে নামা—ইহাই তো সৃষ্টি-প্রেরণা। সৃষ্টিশক্তি সত্য হইলে, সৃষ্টিপ্রেরণাও সার্থক হয়। নহিলে, শুধুই কল্পনা

অহঙ্কারও সৃষ্টি করে, সে সৃষ্টিও কল্পনা নয়। কিছু করার যে চেষ্টা, তাহা কোথাও সিদ্ধ হয়, কোথাও হয় না। জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার পথে এই চেষ্টার মূল্যও কম নয়। চেষ্টা করে মানুষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। চেষ্টার পিছনে আছে অভাব—অভাবপূরণের বাসনাই চেষ্টারূপে প্রকাশ পায়। বাসনা ও চেষ্টা তাই অভাবাত্মক মানুষেরই ধর্ম্ম।

সত্য ধর্ম্ম ইহা নহে। পূরণাত্মক ধর্ম্মই আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষের লক্ষণ। তাহার কর্ম্ম আছে—সে কর্ম্ম শক্তির স্ফুরণ। যাহা আছে বীজে, তাহাকেই স্ফুটরূপে প্রকাশ করা। এই প্রকাশই যথার্থ সৃষ্টি। সৃষ্টি অন্তর্নিহিত সত্যের আবিষ্কার—সৃষ্টিলব্ধ শক্তিরই বস্তুতন্ত্র আত্মপ্রচার।

সৃজনধর্ম্মী মানুষেরই আজ জাতির প্রয়োজন হইয়াছে। শুধু এ জাতির নহে, পৃথিবীর। চাই সৃষ্টি জীবনেরই জন্য। সৃষ্টি জীবনে; সৃষ্টি মরণেও। মরণের রূপান্তরের মধ্য দিয়াও সৃষ্টিবীজই কি আপনাকে সার্থক করিয়া তুলে না? কিন্তু সৃজনের বীর্য্য সত্য হওয়া চাই অর্থাৎ উহা নিষ্ফলা কল্পনা মাত্র না হয়। কল্পনারও সত্যরূপ আছে; সে কল্পনা নিছক ভাববিলাস নয়। কল্পনাই জগৎ শাসন করে, এ বাণী সত্যেরই ঘোষণা। বিধাতার সৃষ্টিকল্পই জগন্মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে ও চিরদিনই করিয়া চলিবে। সেই মানুষই সিদ্ধ মানুষ, যে এই বিশ্বকল্পের চিহ্নিত অংশীদার, এই সৃষ্টি-স্বপ্নেরই যোগ্য অধিকারী। তাহারই কল্পনা বস্তুতন্ত্র রূপগ্রহণ করে জীবনে—কর্ম্মে, সৃষ্টি-শিল্পে, বস্তুপ্রকরণে। কর্ম্মমাত্রই সৃষ্টি নহে। ঘানির বলদ আবর্ত্তন করিয়া তৈলোৎপাদনে সহায়তা করে বটে, কিন্তু সে স্রষ্টা নহে, যন্ত্র-স্থানীয়। আমাদের অনেক কর্ম্মই এই ঘানির বলদের মতই স্বভাবের আবর্ত্তনমাত্র—তাহা সৃজনাত্মক কর্ম্ম নহে। এই স্বভাবজ কর্ম্মশক্তিই সৃষ্টিবীর্য্যে পরিণত হয়—প্রতিভার স্পর্শে। প্রতিভার জাগরণ উৎসর্গে। তাই উৎসর্গই সৃষ্টিবিজ্ঞানের মূল সূত্র। উৎসর্গমূলক যে কর্ম্ম, তাহাই ক্রমে সৃষ্টি-প্রতিভার উন্মেষে রূপান্তরিত হইয়া পূরণাত্মক সৃজনধর্ম্মে সিদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

উৎসর্গের সাধনায় সৃজনবিজ্ঞানের আবিষ্কার নবজাতির বিশেষ ধর্ম্ম। তাহার জীবন সৃষ্টিময়। ইহা সিদ্ধভাব। সাধনাও ইহারই। সাধনা চেষ্টা নহে; বলিয়াছি—ইহা শক্তির স্ফুরণ। এই শক্তি—যোগশক্তি। স্বতঃস্ফূর্ত্তিই তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ। যোগ যদি সত্য হয়, তাহার স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রকাশ কোনও বাধায়, বিপর্য্যয়ে রুদ্ধ হইবার নহে। স্থান ও কালগত যে বাধা, তাহা সাময়িক বিলম্ব বা সঙ্কোচ ঘটাইলেও, যোগজ প্রকাশের সম্ভাবনীয়তা উহার দ্বারা বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয় না। বরং নূতন ও সমধিক শক্তিসঞ্চয়েরই তপস্যা চলে।

যোগও কর্ম্মশিল্প। ইহা চেতনারই কর্ম্মকৌশল। "যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্"—ইহা গীতার কথা। যোগ জীবনকে ঈশ্বর-জ্ঞানযুক্ত করিয়া, সিদ্ধ কর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী করিয়া তুলে। ইহা অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তিরই উৎস।

ঘটনার মূলেও প্রকৃতির তপস্যা আছে। কোনও ঘটনা আকস্মিক নহে, নিরর্থক নহে। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল—আছে সুচ্ছন্দিত উদ্দেশ্য। আকস্মিকতা কথার কথা মাত্র, আসলে উহা আদ্যন্তহীন কর্ম্মশৃঙ্খলার একটী পর্ব্ব, অসীম নিমিত্ত-স্রোতের একটী ঢেউ। তাহার সংযোগসূত্র আমাদের জানা নাই বলিয়াই উহাকে আমরা আকস্মিক বলিয়া সংক্ষেপে অভিহিত করি। যোগীর জীবনে প্রত্যেক কর্ম্ম ও ঘটনাই অন্তর্দ্দেবতার উদ্দেশ্য এবং অবদান বহন করিয়া আনে।

বিজ্ঞান কার্য্য ও কারণের যোজনা করিয়া কর্ম্ম-শৃঙ্খলারই পরিচয় দেয়। কারণ সূক্ষ্ম, কার্য্য স্থূল। যেমন সূক্ষ্ম গমনেচ্ছার অভিব্যক্তি স্থূল গতি-কর্ম্মে। অতএব বিজ্ঞানের ধর্ম্ম—ইচ্ছারই নিরাকরণ! জড়-বিজ্ঞানের নিয়মও শক্তিরই সন্নিবেশ—উহা জড় গতির স্বভাবচ্ছন্দঃ। যোগবিজ্ঞান—ইচ্ছার শোধন ও সাধন করিয়া উহাকে ঐশী ইচ্ছার সমধর্ম্মযুক্ত করে। শুদ্ধ ইচ্ছায় জ্ঞান-প্রকাশ। সিদ্ধ ইচ্ছাই দিব্যজীবনের মূল।

ইচ্ছার শোধননীতি—আচার ও সেবা। উভয়ই আনুগত্যমূলক। যোগ-জীবনের ইহাই প্রথম ভিত্তি। পরিশুদ্ধ কামবীজই যোগবীর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠে। সিদ্ধ কাম সৃষ্টির রসায়ণ।

তপস্যাহীন সৃষ্টি তাসের ঘরের ন্যায় অলীক অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী—উহা বাধা-বিপত্তি-উৎপাতের দুই একটী ঝটিকাফুৎকারেই নিঃশেষ হয়। তপস্যাহীন কর্তৃত্বও অসম্ভব। উহা ক্রীতদাসের আত্ম-ছলনা। সৃষ্টির তপস্যা আছে, সে তপস্যা বিজ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম। তাপস স্রষ্টা স্বকর্ম্মের অধিকারে আত্মসৃষ্টি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়। তাহা বিশ্ব-বিপর্য্যয়েও অটল—কেননা, আত্মধর্ম্মেই তাহা কালজয়ী। দীর্ঘদিন ধরিয়া সে সৃষ্টিপ্রবাহ পারম্পর্য্য ও অনুবৃত্তি রক্ষা করিয়া চলে।

নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার মধ্য দিয়াই যোগীর কর্ম্মশক্তি বিশোধিত হইয়া, পরিণামে সৃষ্টির উৎসে উপনীত হয়। তখন তাঁহার চিন্তা ও ক্রিয়া বিশ্বকর্ম্মার কল্পসূত্রে সংযুক্ত হইয়া অভিনব সিদ্ধি ও কল্যাণের কারণ হয়। জাতির সংগঠন এই কর্ম্মবিজ্ঞানেই। তাহার শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, অর্থ, রাষ্ট্র—সর্ব্ব দিক্ই যোগপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল, সৃজনধর্ম্মে ব্যাকুল ও জীবনমুখর হইয়া উঠে। যোগনিষ্ঠ, সৃষ্টিশক্তিধর জীবনের উপরেই নব জাতির বিজয়ী স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। আমরা তাই সৃষ্টিমূলক শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, অর্থ ও রাষ্ট্র-সাধনারই পক্ষপাতী।

পরাবিদ্যার কথা

অন্তর আলোর উৎস। সকল জ্ঞানের বীজই এখানে মিলিবে। অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডারও এইখানেই।

অন্তরই চিন্তামণি। চিন্তাসমুদ্রে ডুব দিয়াই এই অন্তরনিহিত সত্যরাজির সন্ধান পাইতে হয়। যত ডুবি, ততই নূতন নূতন তথ্য ফুটে। "কত মণিরত্ন পড়ে' আছে চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে"—মনের এই অন্তঃপুরে খোঁজ করার কথাই ঐ গানের কলিতে সাধক-কবি কমলাকান্ত গাহিয়া গিয়াছেন। শুধু কমলাকান্ত নহেন, তত্ত্বদর্শী সাধক মাত্রেই "এই আপনাতে আপনি থাকার" কথাই সমস্বরে চিরদিন ঘোষণা করিয়াছেন। অন্তরেরই মণিকোটায় সকল কাম্য পাওয়া যাইবে—যাহা চাহিব, তাহাই মিলিবে। এত বড় প্রত্যয়, এত বড় আশ্বাসই জগতের মহাজনগণের নিকট আমরা পাইয়াছি।

অন্তর যদি এমন কল্পতরুক্ষেত্রই হয়, তবে আমরা দীন কেন? অজ্ঞান কেন? অভাবে খিন্ন ও ক্ষুণ্ণ, ভয়ে, দুঃখে, অক্ষমতায়, পরাধীনতায় ত্রস্ত, পীড়িত, ক্লাতর, বিমূঢ় কেন? আপনার মহিমা আপনিই আমরা জানি না কেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রকারেরা দিয়াছেন —আমরা আত্মবিস্মৃত সিংহ-শিশু হইয়াও আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন হইয়া শৃগালের ন্যায় দিন যাপন করিতেছি। হৃদয়ের সহজাত কৌস্তুভের সন্ধান বনের হরিণ যেমন জানে না—না জানিয়া বাহিরের সৌরভ ভ্রমে তাহারই আকর্ষণে সারা বনভবন ঢুঁড়িয়া মরে—ছুটাছুটি করিয়া শেষে ক্লান্ত দেহে ব্যাধের শরে প্রাণত্যাগ করে—আমাদেরও দুর্দ্দশা সেইরূপ। স্বরূপের বিস্মরণে বিকল ও বিচেতন হইয়াই জীবনভোর ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ি এই নিদারুণ ভ্রম বা আত্ম-বিস্মৃতিই তো মায়া!

অসীম আমরা মায়া-বশেই সসীম। ভূমার সন্ধান হারাইয়াছি বলিয়াই তো ক্ষুদ্র, তুচ্ছ লইয়া আমরা মোহগ্রস্ত। এই মায়াধীন ঈশ্বরত্বই জীবত্ব। আসলে জীব অনীশ নহে, আপনার ঈশ্বর—আত্মপ্রকৃতির প্রভু। এই স্বরাট্ স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থার পুনরুদ্ধার তাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—মানবাত্মারও ইহাই অন্তর্নিহিত যথার্থ কামনা।

এই অন্তরলোকের সন্ধান জড়বিজ্ঞান দেয় না; জড়-বিজ্ঞান তাই অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যাই সেই বিদ্যা, যাহা দেয় ভিতরের সন্ধান। জড়বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, তাহা মিটায় বাহিরেরই প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞান করে মনের আলোচনা। যে মন লইয়া আমরা ঘর করি, তাহা মনের সবখানি নয়, উহা একাংশ মাত্র। এই একাংশের তত্ত্ব জানিলেও, কিছু পরিমাণে আমরা আত্ম-স্থিতের পানে অগ্রসর হইতে পারি। মনের গভীরতর স্তরের অনুসন্ধানেও পাশ্চাত্যের দুই একজন যুগের মনীষী বৈজ্ঞানিক ক্রমেই আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক সমধিক আত্মসত্য উদ্ধার করিয়াছেন। এ সকলও অন্তরের পথে দৃষ্টি কতক দূরে লইয়া যায় বৈ কি! অন্তর্দৃষ্টি এইভাবে ধীরে ধীরে গভীরে পাড়ি দিতেছে—যুগচিন্তায় তাহারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। থিয়জফি বা তত্ত্ববিদ্যা নামেও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অভিমুখী একটা প্রয়াস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের পরা বিদ্যা এই সকলের চেয়ে গভীর, ইহাদের সকলের অপেক্ষা পূর্ণতর, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্তর্জ্জগতের রহস্য এই প্রাচীন দেশের মনীষিবৃন্দ যেমন ষোল আনা মন ঢালিয়া আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এ সাধনা সত্যই অতুলনীয়।

অন্তররাজ্যেরই বাণী ভারতের বেদশাস্ত্র। বেদ প্রকৃতির পূর্ণবিজ্ঞান। এ প্রকৃতি আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি উভয়ই। অন্তর্জ্জগতেই বেদের উৎস আবিষ্কৃত হয়। সেইখানেই আছে পূর্ণ সত্য, পরম জ্ঞান। বেদের ভাষা অন্তরের ভাষা, আত্মার ভাষা। ইহা অলৌকিক চৈতন্যেরই সত্য বাক্, ঋতময় সিদ্ধমন্ত্র। আপনার অন্তর-লোক খুলিবার চাবী-কাটি এই বেদমন্ত্র সাধন করিলেই ধরা যায়।

মনের মনই বেদের কথা। যাহা "মনসো মনঃ", তাহাই আমাদের সত্য মন, সিদ্ধ মন। উহাই প্রকৃত অন্তর-রাজ্য। যাহা "অবাঙ্ মনসোগোচরম্"—এই বাক্য ও মন দিয়া পাওয়া যায় না, তাহাই কিন্তু সিদ্ধ বাক্, সিদ্ধ মন দিয়া ধরা যায়, পাওয়া যায়। সে সাক্ষ্য দিয়াছেন বেদের ঋষি—জগতের সাধু-সন্ত মহাজনগণও কম-বেশী উহারই প্রমাণ স্ব-স্ব জীবনে সাধনার সিদ্ধ পর্য্যায়ে আবিষ্কার করিয়াছেন।

মন অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু মনের মন নিত্য ও অপরিণামী। এই মন সেই মন হইতে জাত, উহাতেই ইহা স্থিত ও পরিণামে উহাতেই ইহা লয় পাইবে—যেমন সেই মন্ত্র বা বীজ-বাণীরই রূপান্তর এই সকল বাণী বা ভাষা। এই হিসাবে, 'মনের মন'-এরও পরিণাম আছে; কিন্তু তাহা স্বীয় নিত্য স্বরূপ অটুট রাখিয়া। বেদমন্ত্রের বিকার যে বিশ্বভাষা, তাহার মূলে এই নিত্য ধ্বনি বা স্ফোট সিদ্ধ জনেরই শ্রুতিগ্রাহ্য।

শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধিযোগে আমরা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইন্দ্রিয়েরও শোধন আছে। তাই পূর্ণ জ্ঞানের এক অংশ প্রত্যক্ষই। আবার "বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্"—ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের ক্ষেত্রও আমাদের অন্তরে বিদ্যমান। উহা শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য। ভারতের গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্রে যে অনুমানের কথা আছে, তাহা ঠিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের inference-এর সমতুল্য নহে! গৌতমের অনুমান প্রত্যক্ষেরই ন্যায় অকাট্য প্রমাণ—তাহা "হইতে পারে", এমন সম্ভাবনামূলক প্রত্যয় নহে। প্রত্যক্ষও যেমন শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তেমনি অনুমানও অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধীন্দ্রিয়েরই গ্রহণীয়। ইহা একটা অন্তঃ-প্রত্যক্ষ। তাহারও পরে শাব্দ প্রমাণ বা অপরোক্ষানুভূতি।

অন্তরবিজ্ঞানের সাধনাই ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি-সাধনার মূল ভিত্তি। পরা বিদ্যাই আমাদের মৌলিক আরাধ্য বস্তু। তাহার অর্থ এ নয়, যে অপরা বিদ্যা বা জড়বিজ্ঞান বর্জ্জনীয় অথবা উপেক্ষণীয়। পরাবিদ্যায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াই আমাদের অপরাবিদ্যা অর্জ্জন ও প্রয়োগ করিতে হইবে। তবেই সেই অর্জ্জন হইবে সুন্দর ও সার্থক, সে প্রয়োগ হইবে আপন-পর সকলেরই পক্ষে অবিমিশ্র কল্যাণময়।

৺মহাদেব দেশাই

রাষ্ট্রমুক্তির সাধক ৺মহাদেব দেশাই কারাগারে হৃদ্-যন্ত্রের অবসন্নতায় সহসা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই অমর ধামের যাত্রী মহাসৈনিক শুধু ভারতের রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে নয়, ভারতের অধ্যাত্মক্ষেত্রেও বিশেষভাবে স্মরণীয়

উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের রাষ্ট্রমত বিভিন্ন হইলেও অন্তরসাধনার ক্ষেত্রে সে পুণ্যাত্মার অবদান আমরা তাই সশ্রদ্ধ হৃদয়েই স্মরণ করিব।

মহাদেব দেশাই মহাত্মাজীর শুধু রাষ্ট্র-শিষ্যই নয়, তিনি তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মশিষ্য ও সন্তান—বুঝি তাঁহার প্রধান অধ্যাত্মসন্তান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আত্মসমর্পণযোগী। যাঁহাকে তিনি গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই চরণে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বিকাইয়া দিয়াছিলেন। এমন নিখুঁৎ পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্ত সত্যই খুব বিরল—অসাধারণ।

যোগীর মৃত্যু যোগিজনোচিতই হইয়াছে—গুরু-সাহচর্য্যে, গুরুদত্ত মহাব্রত সাধন করিবার কালেই, রণোদ্যত সৈনিকেরই মত যেন ইচ্ছামৃত্যু। এ মৃত্যু অসাধারণ, সর্ব্বোত্তম উৎসর্গেরই অত্যুজ্জ্বল মহিমায় সমুজ্জ্বল ও গরিমাময়।

মহাত্মাজীরই সহিত অধ্যাত্মসম্পর্কসূত্রে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ এই যোগী ও দেশকর্ম্মীর সহিত আমাদের পরিচয়। সে পরিচয়ের মর্ম্মসূত্র তাঁর জীবনে ও মরণেও বুঝি ছিন্ন হইবার নয়। সুযোগ পাইলে, "প্রবর্ত্তকে" সে পরিচয়ের আলেখ্য আঁকিবার ইচ্ছা ভবিষ্যতে রহিল। আজ শুধু বিগতাত্মার উদ্দেশে নিখিল প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পূত শ্রদ্ধাঞ্জলীটুকুই নিবেদন করি। শ্রীভগবান তাঁর অমরাত্মাকে যোগ্য ইষ্টধামে উপনীত করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারমণ্ডলীকেও অপার্থিব সান্ত্বনা দান করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরাবিদ্যার দীক্ষা

শ্রীমতিলাল রায়

[প্রবর্ত্তক কলেজ অফ্ কালচার-এর তৃতীয় সেসনের নবাগত ছাত্রদের প্রতি সঙ্ঘগুরুর আশীর্ব্বাণী। সঙ্ঘগুরু বর্ত্তমানে অজ্ঞাতবাসে বাংলার বাহিরে আছেন। বিগত জন্মাষ্টমী তিথিতে প্রবর্ত্তক আশ্রমের দীক্ষাক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে সমিৎপাণি হইয়া এই বিদ্যার্থিদের শিক্ষামন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণোৎসব উপযুক্ত আচার্য্যের দ্বারা সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে সম্পন্ন হয়। ভাগীরথী, শিবমন্দির, মাতৃমন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির (নারীমন্দিরের সেবা-ক্ষেত্র) ব্রহ্মবিদ্যামন্দির সমন্বিত আশ্রমপরিবেশের মধ্যে সঙ্ঘের এই দীক্ষাক্ষেত্রটী অবস্থিত। এই পটভূমিটি স্মরণ রাখিলে সঙ্ঘগুরুর বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে। বক্তব্যে শিক্ষা ও দীক্ষার যে মর্ম্ম-পরিচয় আছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।—প্রঃ সঃ]

তোমরা যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নূতন শিক্ষামন্ত্রে উপনীত হইতেছ, সেই ক্ষেত্রের মহিম্নস্তুতি আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। এই পুণ্য বিল্ববৃক্ষমূলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পবিত্র ক্ষেত্রে যুগমন্ত্রদীক্ষিত বহু নরনারী সার্থক হইয়াছে। তোমাদের সম্মুখে এখনও হয়তো প্রজ্জ্বলিত হোমশিখা সমুজ্জ্বল বর্ণে জ্বলিতেছে ; হবির্গন্ধে বোধ হয় তোমাদের প্রতি ঘ্রাণে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। দূরে ভারতের প্রাচীন যুগ-বাণী লইয়া জাহ্নবী বহিতেছে। তোমাদের এক পার্শ্বে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আদি চিহ্ন ত্রিবৃৎমূর্ত্তির দেবমন্দির শোভা পাইতেছে—পশ্চাতে অশরীরিণী দেবমাতার পবিত্র আশ্রয় মাতৃমন্দিররূপে তোমাদের মস্তকে জয়াশীষ বর্ষণ করিতেছে। আরও দূরে একাদশচূড় নব যুগের স্বপ্ন-বিগ্রহরূপে গগনচুম্বী যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি ধরিয়া তোমাদের অমৃতের পথে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছে। অন্য দিকে তিলে তিলে শ্রদ্ধার্ঘ্য তর্পণ করিয়া সঙ্ঘ রচনা করিয়াছে যে অন্নপূর্ণার মন্দির, তোমাদের পুষ্টিবিধানের জন্য সে যেন অলক্ষ্যে বরহস্ত বাড়াইয়া তোমাদের বরণ করিয়া লইতেছে। এই অপূর্ব্ব পরিবেশের মধ্যে তোমরা লইতেছ একটী কঠোর সঙ্কল্প, যাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, আপনার মধ্যে ঈশ্বরচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য নিঃস্বার্থ মাতৃভূমির সেবা এবং স্বাবলম্বনের সাধনা। এই সিদ্ধ তীর্থে অকপটে অটুট প্রত্যয়ের সহিত যাহারা সাধন করিয়াছে অতীতে, তাহারা কেহই ব্যর্থ হয় নাই, তোমরাও ব্যর্থ হইবে না। এই আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া সঙ্কল্পসাধনে অগ্রসর হও।

প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচারের শিক্ষাদানের সূচিপত্র আমার হৃদয়ে কোন আশাই সঞ্চার করিবে না, যদি না দেখিতে পাই শিক্ষার্থিগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, অসাধারণ ধৈর্য্য ও তপস্যা, অনিন্দ্য চরিত্রগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলারক্ষার সঙ্কল্প। এইগুলি জীবনের মর্ম্মোপলব্ধি করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। শিক্ষা তবেই সিদ্ধ হইতে পারে, নতুবা শিক্ষাসূচি আড়ম্বরের মতই বোঝা হইয়া থাকিবে।

তোমাদের স্মরণে রাখিতে বলি—ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার অর্থে মানবতার রক্তে যে মৌলিক সনাতন অমৃতময় বীর্য্য সুপ্ত রহিয়াছে, তাহারই জাগরণ—এইখানে আর্য্য কি অনার্য্য, হিন্দু কি অহিন্দু, সংস্কৃতি-করণের দায়ে যুগে যুগে যে রক্তবিপ্লব, যে বিজাতীয় মিশ্রণ, সে সকলের কোন সমস্যাই নাই। আমরা এই পূত সাধনার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া উপলব্ধি করিতে চাহি রক্তের সেই মৌলিক প্রকৃতির প্রেরণা, যাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বপ্রথম সঙ্কেত ছিল—সৃষ্টি আনন্দের জন্য এবং সে আনন্দ সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তাকেই প্রকটিত করা। মানুষের মধ্যে ভগবানকে মূর্ত্ত করার প্রথম আহ্বান যে দেশে, যে জাতির কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছিল, আমরা সেই দেশের ও সেই জাতির রসে ও রক্তে যুগ-যুগ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূমার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে চলিয়াছি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিলে, ভারতীর মন্দিরে জয়োৎসব পড়িয়া যাইবে।

এই একই শিক্ষা-সাধনার মধ্য দিয়াই জাগিয়া উঠিবে ঈশ্বরচৈতন্য আমাদের অন্তরে ও বাহিরে। প্রতি শিরায় ও রক্তবিন্দুতে সেই অপ্রাকৃত চেতনার সাড়া যদি উঠে, তবেই যে দেশে মানুষের মধ্যে এই সিদ্ধিলাভ হয়, সে দেশের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং সেই দেশের মানুষই সৃষ্টিশক্তিধর বলিয়া সর্ব্বজগতে পূজা পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য কয়েকটী কথা বলিব।

সর্ব্বপ্রথম—যেমন আমাদের প্রত্যেকের আকৃতির ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা, সেইরূপ এই বৈশিষ্ট্যময় অসংখ্য জীবনের সমষ্টি যেখানে গড়িয়া উঠিবে, সেই স্থানকেই কেন্দ্র করিয়া আমাদের জীবনগতি প্রবাহিত হইবে। যদি এই শিক্ষা ও সাধনার বীর্য্য এই পুণ্য ভাগীরথীতীরে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তবেই এই ক্ষেত্র যেমন আমাদের নিকট নবজাতিতীর্থ বলিয়া চিরপূজা পাইবে, সেইরূপ যে ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে এই দেশ অবস্থিত, সেই দেশই আমাদের প্রথম কর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইবে। যদি প্রবর্ত্তক কলেজ অফ্ কালচার-এর পুণ্য পীঠ আমাদের নব জন্মের তীর্থ হয়, তবে বাংলাদেশকেই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্ররূপে সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে।

বাংলাদেশ জগতের অনেক সভ্য স্বাধীন দেশের অপেক্ষা পরিমাপে অথবা লোকসংখ্যায় হীন নহে। আমরা অনায়াসেই বাঙ্গালীকে লইয়াই বাংলাদেশে একটা শক্তিশালী জাতি গড়িতে পারি। কর্ম্মসৌকর্য্যহেতু এইরূপ পর্য্যায় দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা আছে; কিন্তু এই সংশয়ের কোনই হেতু নাই। যেমন একটা দেশ ও জাতিকে মহিমামণ্ডিত করার জন্য কোন এক অজ্ঞাত স্থানে কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে সাধনার অনুশীলন হইতে পারে, তেমনই বাংলাদেশকে আশ্রয় করিয়া একটা নব জাতিরচনার অব্যর্থ পদক্ষেপ প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট হইবে কেন? বাঙ্গালীজাতি যদি অবনত শির ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে পারে, সে জয় সারা ভারতেরই হইবে; কেননা, ভারতের সংস্কৃতি এই অভ্যুত্থানের মূল প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতি ভূমার ধর্ম্মে অন্বিত বলিয়া সমগ্র বিশ্ব বাংলার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইবে। বাংলার জাগরণ মানবজাতির মুক্তি লক্ষ্যে। ইহারও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, ধর্ম্মবিজ্ঞান আছে।

আমার দ্বিতীয় কথা—যে দেশ ও যে জাতির মধ্যে শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে হয়, সে দেশ ও সে জাতি যদি অধঃপতিত ও পরাভূত থাকে, তবে অন্তহীন সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়াই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। ইহার জন্য কতখানি ধৈর্য্য, সাহস ও আত্ম-প্রত্যয়ের প্রয়োজন, তাহা না বলিলেও চলিবে। এই গুণবীর্য্যলাভের জন্যই আমরা আজ নবজন্মগ্রহণের শিক্ষার্থী হইয়াছি। এই শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা শুধুই সদ্‌গুণ আহরণ করিব না, উপরন্তু আমরা দলে দলে এই সত্য সঙ্কল্প সিদ্ধ করার জন্য

আমাদের এমন মস্তিষ্ক গড়িয়া লইব, যাহা সমবৃত্তিসম্পন্ন হইবে। মস্তিষ্ককোষের চিন্তাপ্রণালী বিভিন্নমুখী থাকিলে, অতীত ও বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রে সংহতি-ধ্বংসের যে দুর্ব্বুদ্ধি ও কুবৃত্তি তাহা হইতে আমরাও মুক্তি পাইব না।

আমাদের শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইবে, বিচিত্র শিক্ষাপ্রণালীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এক অখণ্ড মস্তিষ্ক গড়িয়া লওয়া। দেশে বিচিত্র কর্ম্ম, বিচিত্র ধর্ম্ম ও আদর্শ, বিচিত্র রুচি ও প্রকৃতি বর্ত্তমান। এই সকলের মধ্যে তেজোদৃপ্ত একটী প্রাচীন সংস্কৃতিকে জয়ী করিতে পারে তখনই, যখনই কোন এক অলৌকিক শিক্ষাপ্রভাবে তাহারা মস্তিষ্কের সাম্য আনিতে পারে। এই সম-মস্তিষ্ক সম্পন্ন জাতির পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক অভিনব পন্থায় জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তি আসন্ন করিতে পারিব। আমার অতীত বহু অভিজ্ঞতার পর আমি আজ এমন একটী চরম ও পরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—যেখানে দাঁড়াইয়া, ঈশ্বরের সম্মুখে ব্যক্তির, সংহতির, জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ঋক্ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারি। এই ঐশী ভরসা মাত্র সম্বল করিয়া আমি দেশকে ডাকিয়া বলিয়াছি 'এহি'। আশা করি, তোমরা আমার মর্ম্মবাণী মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিবে।

বলিবার যত কথা তাহা ধীরে ধীরে যথাকালে ব্যক্ত হইবে। তোমরা কেবল শুনিয়া যাও, উপলব্ধি কর এবং শিক্ষাপীঠের নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়া চল। তোমাদের পূর্ব্ব অভ্যাসের সহিত বর্ত্তমান জীবনের রীতিনীতির অনেক সংঘর্ষ হইবে—কিছু প্রিয়, কিছু অপ্রিয় বোধ হইবে, কিন্তু একটা কথা স্মরণে রাখিতে বলি—আপনাকে গড়ার সর্ব্বপ্রথম মন্ত্র অন্তরচেতনাকে ছেদহীন জাগাইয়া রাখা। নিয়ম ও শৃঙ্খলা এইজন্য আমাদের যে কি পরমবন্ধু, তাহা বলিতেও হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ উঠে। রাত্রির সর্ব্বশেষ প্রহরে অতীতের ভাল-মন্দ সংস্কারজড়িত স্বপ্নভঙ্গ করিয়া ঐ যে পবিত্র জাগরণের সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি হয়, তাহা তোমরা উপেক্ষা করিও না। অনেককে লইয়া তোমার জীবনের যে শক্তিবৃদ্ধি, তাহার সন্ধান এইখানেই পাইবে। ঐ সমবেতভাবে ভারত-সংস্কৃতির অদৃষ্টপূর্ব্ব ইতিহাসস্মরণের সহিত ঈশ্বরের জন্য জীবনের সুর বাঁধিয়া, প্রতিদিনের জীবনগতির সঙ্গে সকলের সহিত হৃদয় মিলাইয়া এই যে পবিত্র অনুষ্ঠান, তাহা তোমাদের দিব্যজীবনপথে সহায় হইবে। তোমাদের কণ্ঠে উপাসনার ঋক্, ধ্যানের মধ্যে আপনাকে ভাল করিয়া দেখার সুযোগ, কিছু নয় বলিয়া উদাসীন হইও না। শিক্ষার মধ্যে তোমরা পাইবে জড় জীবনের কষ্টিপাথর; তোমাদের অধ্যাত্মজীবনের অমৃত আহরণ করিতে হইবে নিয়মিত উপাসনায়। ইহাই ভারতসংস্কৃতির বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড, পরাবিদ্যা—যাহাকে উপনিষৎ বলিয়াছে "বিদ্যয়ামৃতম-শ্নুতে"। বস্তুবিদ্যায় তোমরা জন্ম-জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পার; কিন্তু অমৃতে অভিষিক্ত হইতে চাহিলে, বিদ্যা বা উপাসনাকেই পরম অনুরাগের সহিত বরণ করিয়া লইতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার ঋক্‌মন্ত্র তোমাদের চিত্ত যদি পূর্ণ করে, তবেই উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবধারিত সিদ্ধ হইবে।

সংসারে, সমাজে চিত্তচাঞ্চল্যের যত কিছু হেতু আছে, এখানেও তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। তোমাদের একমাত্র সহায় আত্মসঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্পরক্ষার সর্ব্বোত্তম বিধান আশ্রমের নিয়ম ও শৃঙ্খলা। এইখানে অবহিত থাকিলে, শিক্ষান্তে দেবতা, শরীরী অথবা অশরীরী যাহাই হউন—তোমাদের ললাটে জয়টীকা অবশ্যই পরাইয়া দিবেন, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কত বাদ-প্রতিবাদ, কত মতবিরোধ, শারীরিক ব্যাধি ও ক্লেশ, ক্ষুধায় অন্নদানের বিপর্য্যয়—এমন কত বাধা যে তোমাদের পথ আগুলিয়া ধরিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মনে রাখিবে—বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে, বাদ লইয়া প্রতিবাদের কণ্ঠ চিরিতে এখানে আসা নয়। এখানে আমরা আসিয়াছি সব কিছুকে পরিপাক করিয়া দুঃখের পাষাণ-ঘর্ষণে চন্দনের সৌরভ আঘ্রাণ করিতে, লবণাক্ত জলধিবক্ষ মন্থন করিয়া একবিন্দু সুধার আহরণ করিতে। আমার উপদেশ তোমাদের অন্তরে বলবিধান করুক। আমার এই সসীম শরীরের সামর্থ্যের উপর আমার কোন আস্থা নাই। যে মাতা তোমায় গর্ভ-ধারণের তপস্যা হাসিমুখে করিয়াছেন, যিনি তোমার জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া তৃপ্তি পাইয়াছেন, প্রত্যক্ষ

জীবনসাধনার ক্ষেত্রে যে জড় মাতৃ-প্রতিমা জড় জীবনকে সতত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তোমাদের অধ্যাত্মজীবনসাধনার পর্য্যায়ে সেই মাতৃমূর্ত্তির অশরীরিণী মহাশক্তি সর্ব্বতোভাবে তোমাদের অন্তর ও বাহিরের নিশ্চয় পুষ্টিবিধান করিবেন। অমর মাতৃস্নেহ। সন্তানব্রতী তোমরা। এইজন্যই অভয় দিয়া বলি—মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তপস্যার সুকঠিন দিনগুলি সহজেই অতিক্রম করিবে। জীবন হইবে অসাধারণ অমৃতময়। সে জীবন ব্যষ্টি, সমষ্টি অথবা জাতিজীবন যাহাই হউক, উহা কোনদিন এই অখণ্ড আত্মিক সংস্কৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। আমরা এই বিশাল, দ্বেষবিদ্বেষ, অনৈক্যবিষে জর্জ্জরিত জাতির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া অখণ্ড মস্তিষ্কপ্রভাবে একটা নবযুগের সূত্ররচনা করিবই।

শ্রীজন্মাষ্টমী

শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

বর্ষার বারিপাতে সুপুষ্ট পাদপবৃন্দের শ্যামল-শোভায় সুশোভিত হইয়া ব্রজভূমি শারদ প্রভাতে মৃদু মধুর হাস্য করিতেছে। কূলে কূলে পরিপূর্ণা কালিন্দী। মানস-গঙ্গা, কুসুম-সরোবর ও রাধাকুণ্ডাদি জলাশয়-সমূহ মনোমুগ্ধকর পদ্মমালায় বিভূষিত। রাজহংস-চক্রবাকাদি ইতস্ততঃ ।। পিক-কুলের সুমধুর কুহু-কুহু-রবে বনভূমি মুখরিত। স্থানে স্থানে শিখিকুল সুদৃশ্য পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কমনীয় নৃত্যের রমনীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া আছে। ক্ষেত্রসমূহ শস্যপরিপূর্ণ। পুষ্পগুচ্ছালঙ্কৃত নন্দীশ্বর গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতমালা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। নভো-মণ্ডলের সুনীল দ্যুতি ধরিত্রীর শ্যামল-শোভার সহিত সৌখ্য স্থাপন করিয়া মধুর ভাব বিনিময় করিতেছে। সৌরভবাহী সুখস্পর্শ মলয়ানিল ব্রজধামের বীজনে রত। দশ দিক্ সুপ্রসন্ন; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই আনন্দের হিল্লোল পরিদৃষ্ট হইতেছে। রবি প্রমুখ গ্রহ এবং অশ্বিনী প্রমুখ নক্ষত্র শান্ত ভাব ধারণ করিল। সর্ব্বশুভদাত্রী রোহিণীর সহিত মুখ্য চান্দ্র শ্রাবণ—গৌণচান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী উদিতা হইলেন। এই সর্ব্বসুলক্ষণান্বিতা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতেই আমাদের আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ এই তিথিকেই মাত্র 'জয়ন্তী' শব্দে উদ্দেশ করিয়াছেন। জন্মাষ্টমী বলিতে যেমন কেবল শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিই উদ্দিষ্টা, সেই প্রকার শাস্ত্রোক্তি অনুযায়ী 'জয়ন্তী' শব্দেও এই পূততমা তিথিই মাত্র লক্ষিতা।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনগণ সকলেই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শ্রীজন্মাষ্টমী তিথি পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দিবারাত্রি উপবাসী থাকিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-মাধুরী কীর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব কালে বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহিত আরত্রিক করিয়া থাকেন। জন্মাষ্টমী-পালন-সম্বন্ধে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের মতভেদ আছে। বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন, সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিতে হইবে না, প্রয়োজন হইলে নবমীতে উপবাস করিবে, তথাপি সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পালন করিবে না। শুদ্ধা অর্থাৎ পূর্ব্ববিদ্ধ-রক্ষিতা অষ্টমীতে শ্রীশ্রীজয়ন্তী ব্রত ও উপবাস বিধেয়। শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ব্রত করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রতটী যাহাতে একটী আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র না হইয়া পড়ে, ব্রত পালনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি যাহাতে দৃষ্টি থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নিত্য—শুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহার নিত্য প্রকাশ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচন দ্বারাই মাত্র সেই আবির্ভাব দর্শনের সৌভাগ্য হয়। এই সৌভাগ্য যখন সত্য সত্যই হইবে, তখনই প্রকৃত জন্মাষ্টমী পূজা হইবে।

বসুদেব ও দেবকীর তনয়রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। বসুদেব—শুদ্ধসত্ত্ব; দেবকীও সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশই তাঁহার জন্ম। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ই প্রকৃত গুরুদেব। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের নিত্যপ্রকাশ। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব—গুরুদেব; দেবকী তাঁহার শিষ্যা। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব ও সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী দেবকী হইতেই ভগবান্ বাসুদেবের আবির্ভাব সম্ভব। মায়াবদ্ধ জীবে কখনও তাঁহার প্রকাশ সম্ভব নহে।

কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার দূরীভূত করিয়া যখন রজতকান্তি শশধর গগনে উদিত হন, সেই দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অঙ্গচ্ছটায় কংসের কারাগার আলোকিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। বিভু সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে হৃদয়ে আর অজ্ঞানান্ধকার থাকিতে পারে না, চিরতরে দূরীভূত হয়। কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্য রাত্রে উদিত হইয়া সুধাকর অপর রজন্যার্দ্ধ আলোকিত করিয়াই গগনে বিরাজিত থাকে। কংস-কারাগার নাস্তিকতার প্রতীক। অভক্ত ভক্তকে এই কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ভগবান্‌কে বিনাশ করিবার বৃথা প্রয়াস পায়। দুর্ব্বৃত্ত কংসের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সেই দুশ্চেষ্টার ফলে সে নিজেই নিহত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের রণসম্ভার ও যুদ্ধাস্ত্র

শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ

প্রাচীন আর্য্যজাতি যে কেবল যাগ-যজ্ঞ-জপ-তপঃ-হোমাদি পারলৌকিক কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অঙ্গে লৌহময় কবচ ধারণ করিয়া, অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যন্ত বিক্রমের সহিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেন এবং এককালে তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতাদির সময়ে এই বিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। কালের পরিবর্ত্তনে বীরপ্রসবিণী ভারতভূমি বীরশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রাদিও বিলুপ্ত হইয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্রই হইল যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। যুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত তৎকালে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে আমরা তীর, ধনু, বর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। অগ্নিপুরাণে অস্ত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

(১) যন্ত্রমুক্ত (যাহা মেশিন দ্বারা ছাড়া হয়)।

(২) পাণিমুক্ত (যাহা হাত দিয়া ছাড়া হয়)।

(৩) মুক্ত-সংধৃত (যাহা নিক্ষেপ করিয়া আবার সংগৃহীত হইত)।

(৪) অমুক্ত (যাহা নিক্ষেপ করা হইত না)।

(৫) বাহুযুদ্ধোপযোগী (হতাহাতি যুদ্ধে ব্যবহৃত)

'নীতিপ্রকাশিকায়' প্রাচীনকালের যুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—ধনু, বাণ, শক্তি (বর্শা), নালিকা, লগুড়, চক্র, কুঠার, দন্তকণ্টক প্রভৃতি মুক্ত অস্ত্র ছিল। বজ্র, তরবারি, পরশু, বল্লম, পিণাক, ত্রিশূল, মুদ্গর প্রভৃতি অমুক্ত অস্ত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর অস্ত্র ছিল, উহাদিগকে মন্ত্রমুক্ত বলিত (অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইত)। উহাদের ক্ষমতা এত ছিল যে, কিছুতেই উহাদের ব্যর্থ করা যাইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—বিষ্ণুচক্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বজ্রাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রমুক্ত অস্ত্রের নাম করা যাইতে পারে। এইরূপ ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, বৈশম্পায়ন-নীতি, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, তৎকালের বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার ও প্রচলন সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। তবে বহুকাল যাবৎ উহার ব্যবহার ও চর্চ্চা না থাকায়, ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের আকার-প্রকার ও ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা খুব কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে তৎকালের যে কয়েকটি মাত্র যুদ্ধাস্ত্রের কতকটা স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

১। ধনু—অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র। বাঁশ বা লৌহাদি দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করা হইত।

২। ইষু—ধনুতে রাখিয়া যে অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়, এক কথায় যাহা তীর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। ভিন্দিপাল—ইহা এক প্রকার হাত দিয়া নিক্ষেপ করিবার অস্ত্র।

৪। শক্তি—ইহা বল্লম বা বর্শাকে বুঝায়।

৫। দ্রুঘন—ইহার স্বরূপ অনেকটা লৌহমুদ্গর বা কুড়ালের মত।

৬। তোমর—ধনুতে রাখিয়া নিক্ষেপ করিবার তীর-বিশেষ।

৭। লঘুনালিক—বর্ত্তমানকালের বন্দুকের মত আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

৮। বৃহন্নালিক—আধুনিক তোপ বা কামান শ্রেণীর আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ।

৯। লগুড়—ইহা দুই হস্ত পরিমিত লম্বা শক্ত বাঁশের লাঠী বা দণ্ড, অগ্রভাগটি লৌহের দ্বারা বাঁধাই বা লৌহময় মুদ্গর। দৃঢ়শরীরবিশিষ্ট পদাতি সৈন্যেরা ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিত।

১০। পাশ—ইহা লম্বায় দশ হাত গুণ-রজ্জু, কার্পাস-রজ্জু, তৃণ-রজ্জু, পশুবিশেষের স্নায়ু বা আকন্দ ছালের সূতা ও চর্ম্মবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম ৩০ গাছি তন্তু উত্তমরূপে একত্র পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়,

প্রয়োগের সময়ে কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া প্রক্ষেপ করিতে হয়। ইহার দ্বারা শত্রুকে ইচ্ছানুরূপ বন্ধন পূর্ব্বক নিকটে আকর্ষণ করিয়া, পরে কৃপাণ দ্বারা বধ করা হয়।

১১। চক্র—এই অস্ত্র গোলাকার, প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত ও ধারাল। উহার কাজ ছেদন, ভেদকরণ, নিপাতন ও শায়িত করা।

১২। দন্তকণ্টক—ইহার শরীর দণ্ডাকার, সর্ব্বাঙ্গে লোহার কাঁটা, আগা মোটা ও গোড়া সরু, বাহু-পরিমাণ লম্বা, ধরিবার স্থান সুন্দর। ইহার দ্বারা নিক্ষেপ ও গাঁথিয়া ফেলা এই দুই কাজ সাধিত হয়।

১৩। ভুসুণ্ডী—ইহা তিন হাত পরিমিত লম্বা, বড় বড় গ্রন্থিবিশিষ্ট, ধরিবার স্থান উত্তম, স্থূলকায়; পাতন ও ঘূর্ণন এই দুই গতি ইহার অনুগত।

১৪। পরশু—ইহা একটি বাহুপরিমিত লম্বা লাঠীর মাথায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকার লৌহ ফলক। ইহার কার্য্য পাতন ও ছেদন।

১৫। গোশীর্ষ—গোমস্তক তুল্য গোশীর্ষ নামক অস্ত্রের উর্দ্ধকায় লৌহ-ফলকে আবদ্ধ থাকে। ইহার উচ্চতা এক হাতের কিছু কম। ছেদন ও বিদ্ধ করা ইহার কাজ।

১৬। অসি—এই অস্ত্রটি অতি পুরাতন। অতি পূর্ব্বকালে ইহা অসি, খড়্গ, তীক্ষ্ণ বর্ম্ম, শ্রীগর্ভ, বিজয়, চন্দ্রহাস, কৌক্ষেয়ক, করবাল, তরবার ও তরবারি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। বিশেষ বিশেষ লৌহে ইহা বিশেষ বিশেষ পাইন দ্বারা প্রস্তুত হইয়া সুদৃঢ় ও ধারাল হইত। কোন কোন শিল্পী এমন সুতীক্ষ্ণ অসি পূর্ব্বকালে প্রস্তুত করিত যে, অসির আঘাতে প্রস্তরস্তম্ভও কাটা যাইত। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে, ভাঙ্গিয়া যাইত না, এইরূপ অসি এখন আর দেখা যায় না।

১৭। কুন্ত—এই অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ছয়পলে, ৫ হাত লম্বা ও পদদেশ গোল। ইহা বর্শার সমান অস্ত্রবিশেষ।

১৮। লঘিত্র—ইহা একপ্রকার তীক্ষ্ণ ও বাঁকান অস্ত্র। ইহার মুঠা অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষাদি কর্ত্তন করা যায়।

১৯। স্থূণ—ঘন ঘন গিঁটযুক্ত পুরুষপ্রমাণ লম্বা ও সোজা লৌহ-বাণের নাম।

২০। প্রাস—মস্তকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলাবিশিষ্ট সাত হাত লম্বা একগাছ বাঁশ। ইতস্ততঃ পরিচালন ও বিদ্ধকরণ ইহার কাজ।

২১। পিণাক—যাহাকে আমরা ত্রিশূল বলি।

২২। গদা—ইহার অপর নাম মুদ্গর। ইহার মুষ্টি-স্থান স্থূল, অবয়ব আটপলে। কোন কোন ক্ষেত্রে শতপলবিশিষ্টও হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকে।

২৩। মুদ্গর—২০ মণ লোহার মুদ্গর পরিচালনা করিয়া প্রাচীনকালে যোদ্ধগণ অনায়াসে যুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদের শারীর শক্তি কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হয়।

২৪। সীর বা লাঙ্গল—ইহা দুই স্থানে বাঁকা লৌহবদ্ধ মুখবিশিষ্ট অস্ত্র।

২৫। মুষল—লাঙ্গল বা ঢেকীর মোনা শ্রেণীর অস্ত্র।

২৬। পট্টিশ—ইহা একপ্রকার তরবারিবিশেষ, এই অস্ত্রটি খড়্গাকার, ইহা পুরুষপ্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ।

২৭। পরিঘ—ইহা লৌহবদ্ধ লগুড়, বলের সহিত নিক্ষেপ করিতে হয়।

২৮। ময়ূখী—ইহা পুরুষপ্রমাণ একপ্রকার দীর্ঘ দণ্ড।

২৯। শতঘ্নী—মহাভারতের বচনানুসারে টীকাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট এই শতঘ্নীকে আগ্নেয় দ্রব্যবল প্রযোজ্য অর্থাৎ 'আধুনিক কামান সদৃশ অস্ত্র' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত দণ্ড, চণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণ পাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গান্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাব, জম্ভন প্রভৃতি শত শত অস্ত্রের নাম শুনা যায়, কিন্তু তাহাদের আকার প্রকার ও ব্যবহারপ্রণালী কিছুই জানা যায় না।

রামায়ণ ও মহাভারতে বজ্র, নালিকা, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়বীয় অস্ত্র, আগ্নেয় ঔষধ, অগ্নিচূর্ণ, শতঘ্নী ও সহস্রঘ্নী

প্রভৃতি উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে, ভারতে গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী, এই চতুরঙ্গ সেনা ছাড়াও তৎকালের যুদ্ধে জাহাজ ও বিমান ব্যবহৃত হইত। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উহা বোমযানের সাহায্যে হইবে। মহাভারতে কথিত আছে, শাম্বের 'সর্ব্বপুর' নামে একটি লৌহনির্ম্মিত ব্যোমযান ছিল, ইহার সাহায্যে তিনি দ্বারকা আক্রমণ করিয়াছিলেন। উহা জল, স্থল ও আকাশের মধ্য দিয়া বিচরণ করিত। ইহা ছাড়াও বসুরাজের একটি কাঁচের এবং কার্ত্তবীর্য্যের একটি সোণার বিমান ছিল। বিশ্বকর্ম্মালিখিত শিল্প-সংহিতায় এইরূপ লেখা আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা বায়ুর মত গতিবিশিষ্ট একটি যান (বিমান) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বাষ্পের দ্বারা চালিত হইত এবং আকাশে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিত। নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত ও উজ্জ্বল এই বিমানটি 'পুষ্পক' (Puspaka) রথ নামে ত্রিভুবনে পরিচিত।

যোদ্ধা সৈন্য ছাড়াও যুদ্ধের উপকরণ ও মালপত্র এবং সৈন্যদের আহার্য্য দ্রব্যাদি পাঠাইবার জন্য অনেক লোক ও যানবাহান নিযুক্ত থাকিত। শুক্র-নীতির মতে দেখা যায়, যে সাহায্যকারী লোক সমেত সব চাইতে ছোট সৈন্য-দলেও কমপক্ষে ৩০০ জন পদাতিক, ৮০ জন অশ্বারোহী, ১টি রথ, ২টি কামান, ১০টি উষ্ট্র, ২টি হস্তী, ২টি গাড়ী এবং ১৬টি ষাঁড় থাকিত। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রূষা ও সাহায্যের জন্য শ্রমিক সৈন্য (Labour Corps) ছিল। সৈন্যদের জন্য ডাক্তার ছিল; কৌটিল্যের লেখা হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিল। চিকিৎসকগণ তাহাদের আবশ্যকীয় অস্ত্রপাতি, মালিশ করিবার তৈল, পট্টীবন্ধন (bandage) এবং মহিলারা খাদ্য ও পানীয় হস্তে করিয়া পশ্চাৎ হইতে যোদ্ধাগণকে উৎসাহিত করিত, এইরূপে দেখা যায়। ইউরোপে Red-Cross Society প্রবর্ত্তিত হইবার অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পরিচর্য্যাকারিণীরা (Nurse) আহত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের দুঃখের লাঘব করিবার জন্য তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিত।

আনন্দ

শ্রীইন্দ্র সেন

হে দেবতা, সত্য কহ, তোমারে শুধাই বারম্বার
আনন্দ-রাজত্বে তব কেন মোর নাহি অধিকার ?
নন্দন কাননে যদি সুরভিত স্ফুটিত মন্দার,
অপ্সরীর কলকণ্ঠে ওঠে যদি বীণার ঝঙ্কার,
কোমল চরণ-পাতে জেগে ওঠে নব নৃত্যচ্ছন্দঃ,
তবে কেন বল আমি রহি দূরে বেদনায় বদ্ধ
অন্ধ হ'য়ে। স্বরগের সুন্দরের রত্নবেদী-তলে
প্রেমের পূজায় যদি উর্ব্বশীর আঁখি-দীপ জ্বলে
ফুল-মুঠি হ'তে ঝরে পুণ্য শুভ্র ফুল-বারিধারা–
কেন তবে আজি হায় ছল-ছল মোর আঁখি-তারা!

বসন-অঞ্চল মম ধরণীর ধূলি-তলে লোটে,
পাগল পরাণখানি পাখী হ'য়ে বনে বনে ছোটে।
আমারো আকাশে হেথা চন্দ্রসভাতলে জাগে তারা,
কাননে ফোটে যে ফুল, বুলবুল শ্যামা দেয় সাড়া,
নবীন বসন্ত হাসে, সমীরণ এসে দেয় দোলা,
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে দখিন দুয়ার থাকে খোলা।
তবু এই ধরণীর আনন্দেরে লাগেনা যে ভালো,
আঁধারের কারাগারে আলোকের আঁখি হয় কালো।
দিবসে নিশীথে প্রাণ বেদনাতে রহে নিশ্চেতন,
কায়া মোর ছায়া হ'য়ে খোঁজে তব নব নিকেতন।

জ্যোতিষী

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ প্রফেসর রাজার কাছ থেকে আজ সান্ধ্য ভোজনের। কি আশ্চর্য্য! যাকে জীবনে কোন দিন দেখিনি, যার সাথে একটি কথাবিনিময়ের সুযোগ কখনও ঘটেনি, সেই আজ হঠাৎ আমার জীবন-নাটকে এমন করে' একটা অজানা অঙ্ক সুরু ক'রবে, এ যে অদ্ভুত!

অনাত্মীয়, অপরিচিত, অসবর্ণ এই লোকটীর আমি প্রতিবেশী। রাজা থাকেন দোতলায়, আমি থাকি চার তলায়, বড় রাস্তার ধারে মস্ত একটা বাড়ীর। তবুও দেখাসাক্ষাৎ নেই—দু'টী লিফ্‌টে আমরা উঠি-নামি।

প্রফেসর রাজা নাকি বড় জ্যোতিষী।

দুজ্ঞেয় রহস্যের মত বাইরের জন-স্রোতঃ এড়িয়ে দিনের পর দিন কত নরনারীর বিধিলিপি যে নির্ণয় করেন রাজা, তার খবর কোন না কোন প্রসঙ্গে আমার কাণে এসে পৌছায়। রাজার পাশের ঘরে আমার কয়েক জন তরুণ বন্ধু বাসা নিয়েছেন। তারা কলেজের ছাত্র। হয়ত তাদের কাছেই রাজা আমার কথা শুনে থাকবেন, আমিও তাদের কাছেই রাজার খবর পাই। কিন্তু জ্যোতিষে আমি বিশ্বেস করি নে। বন্ধুরা প্রমাণ পরখ ক'রে জেনেছেন—জ্যোতিষ মিথ্যে নয়। আমাকেও নাকি একথা একদিন স্বীকার করতে হবে। চার দিকের ভাগ্য-স্রোতের মাঝখানে আমার অনম নাস্তিকতা যেন একটা মস্ত বড় কলঙ্ক। রাজা একথা শুনেছেন।

দিনের পর দিন রহস্যময় জনরব আমার কাণে আসে—বন্ধুরাই আনেন, কারও চোখে দেখা, কারও শোনা। রাজার সম্বন্ধেই কথা।

অতীশ এসে একদিন বল্‌লে—"শুনেছ মণি-দা, প্রফেসর রাজা যে-সে লোক নন। তার এক ছেলে এবার অক্সফোর্ডে প্রথম হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞেস কল্লাম—এ খবর কার কাছে পেলে অতীশ?

"প্রফেসর রাজাই বলেছেন।"

"কিন্তু এত বড় খবরটা কেমন ক'রে সংবাদপত্রের পাতা এড়িয়ে গেল, অতীশ?"

"সংবাদ-পত্রের সব খবরই যে আপনাকে জানতে হবে, তার কি মানে আছে মণি-দা?"

"মানে থাকাটাই যে স্বাভাবিক, অতীশ। ভারতবাসী অক্সফোর্ডে প্রথম হ'ল অথচ আমরা কেউ জানলাম না, এ যে হেঁয়ালী, অতীশ!"

নীহার বাধা দিয়ে বল্লে—"মঃ লিবার্ণ, লর্ড উইলকি প্রভৃতি যে রাজার বন্ধু, তা'কি আপনি জানেন?"

"একজন নগণ্য জ্যোতিষী মঃ লিবার্ণ, লর্ড উইল্‌কির বন্ধু, একথাও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না, নীহার।"

নীহার উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিল—"প্রফেসর রাজাকে সাদাসিদে জীবন যাপন করতে দেখে, তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিচার করবেন না, মণি-দা! জ্যোতিষী হিসেবে রাজা সত্যিই এখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর এই অনাড়ম্বর জীবনের একটা রহস্য আছে, তা' হয়ত আপনি জানেন না।"

আমি বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস কল্লাম—"শুনি, তোমার রহস্যটী কি?"

নীহার—"রাজা ইম্পিরিয়াল সি-আই-ডি। এ কাজে—জ্যোতিষের মত একটা ব্যবসা—ছোট বড়, রাজা-মহারাজা সকলের সাথেই মেশার যে একটা মস্ত সুযোগ, তা' আর কিছুতেই নেই। বিশেষতঃ, রাজা জ্যোতিষী হিসেবে মোটেই নগণ্য নয়।"

"ইম্পিরিয়াল সি-আই-ডি কাকে বলে, নীহার?"

"লরেন্স অফ্ আরেবিয়ার (Lawrence of Arabia) কথা আপনি জানেন কি? প্রঃ রাজা ও তেমনি একজন অসাধারণ লোক, যদিও তাঁর কাজ ভিন্ন রকমের।"

"অবাক্ করলে নীহার। ইম্পিরিয়াল গোয়েন্দাটী এখানে কি কাজে এসেছেন শুনি!"

"সব গোয়েন্দারই এক কাজ নয়, মণি-দা! আর রাজাও কিছুই বলেন নি তাঁর গোপন কথা আমাদের কাছে। তবে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার কথা ভেবে দেখেছেন কি? কমিশনারের কাছ থেকে

গোপনে লোক আসে রাজার কাছে, আমি একদিন স্বচক্ষে দেখেছি।"

ব্যাপারটা বড়ই বিস্ময়কর ঠেকল। মনে মনে ভাবলাম—স্কুল-কলেজের ছেলেদের দিয়ে রাজা আত্ম-প্রচার সুরু করেন নি তো! কিন্তু নীহার! অতীশ! —এরা ক'রবে এমন হীন কাজের সহায়তা, একথা বিশ্বাস করি কেমন ক'রে!

* * * *

আজ সকালেই শুনছিলাম—কোন হিজ্ হাইনেসের কাছ থেকে ভেট আসবে প্রফেসর রাজার জন্যে। হয়ত' তাই আজই নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন রাজা আমায়। বেলা পাঁচটার আগেই জানাতে হবে—যেতে পারব কি না এই নিমন্ত্রণে। এতক্ষণ বন্ধুদের সাথে বাদ-প্রতিবাদের পর মনে একটা বিস্ময় জাগল—দেখাই যাক্ না রাজা লোকটা কেমন! "হাইনেসদের" ভেটের ব্যাপারটাও চাক্ষুষ দেখার আগ্রহ রইল।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রলাম।

সন্ধ্যা ঠিক সাতটা। রাজার ঘরে গেলাম। বন্ধুরা আগেই এসেছিলেন, তাঁদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁরাই। এ যেন গবর্ণরের ভোজ, পরিচয় নেই অথচ নিমন্ত্রণে এসেছি। অহঙ্কারে আঘাত লাগল—একি আমার প্রতি অনুগ্রহ? নিজেকে জ্যোতিষীর স্তরে অবনমিত করতে মনের কোনও অনাদৃত উপকণ্ঠেও যেন একটুও সাড়া নেই।

একখানি মাত্র বড় টেবিল, তার চারদিকে আমরা ব'সেছি। এইটাই রাজার মান-মন্দির বা বীক্ষণাগার। ঘরের এক কোণে কয়েকখানি বই, একখানি অতশী কাচ ও স্কেল-কম্পাস। একটা তাকে গোটা কয়েক শিশিতে নানা রঙের চূর্ণ। ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কতকগুলি মানচিত্র, কয়েকখানি নর-কঙ্কালের ছবি (Anatomical chart), হাত-পায়ের রেখাঙ্কিত চারখানি বড় বড় চার্ট এবং কোন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা একটা চিত্র—"মৃত্যু।" ছবিখানি একটু বৈচিত্রময়: অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুহা, তার মেজেয় ছড়ানো জীবজন্তুর কঙ্কাল। গুহার মধ্যে ভীষণ এক অজগরের কুণ্ডলিনীপাশে মুমূর্ষু, রক্তাক্ত দেহ, অর্দ্ধনগ্ন একটা হতভাগ্য মানুষ। অন্ধকারে অপলকে চেয়ে আছে অজাগরের হিংস্র চক্ষু শিকারের দিকে। সাপের কুশাগ্র জিহ্বা লক্লকিয়ে উঠ্ছে তার মুখের উপর। মৃত্যুর কবলে যার জীবন-দীপ ধীরে ধীরে নিবছে। তার সে করুণ-কাতর চাহনির অমানুষিক উৎকণ্ঠা, একটা বারের জন্যেও, মৃত্যুর বিভীষিকায় মানুষকে অভিভূত ক'রে দেয়, আবেষ্টনীর প্রভাব মনকে প্রশ্ন করে—একি অদৃষ্টের পরিণাম, না পুরুষকারের পরাজয়?

রাজার চেহারায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভ্রষ্টশ্রী, বার্দ্ধক্যের সঞ্চার দেখা দিয়েছে। পোযাকপরিচ্ছদে পারিপাট্য নেই। খর্ব্বাকৃতি একটা সুপুরুষের জীর্ণ মূর্ত্তি। বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ।

পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচারপ্রদর্শনের পর রাজনীতির আলোচনা সুরু হ'ল। "ইম্পিরিয়াল সি-আই-ডির" তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আশঙ্কায় মনের আগে সঙ্কোচের দুরন্ত বাধা। সাবধানে জবাব দিই। আলোচনা জমে না। চুপ ক'রে রাজার কথাই শুনতে লাগলাম। সঙ্গতি-অসঙ্গতির সীমা ছাড়িয়ে রাজা কিন্তু সহজেই আপনাকে মুক্ত করে দিলেন তাঁর প্রশ্নজালের অন্তরালে। ধীরে ধীরে কথা সহজ হ'য়ে এল, ভাবলাম—কূটদর্শীর এ একটা কৌশল। আপনাকে অরক্ষিত ক'রে দিয়ে সবাইকে সে চায় নিরস্ত্র করতে। অসাধারণত্ব খুঁজছিলাম তাঁর কথায়, বার্ত্তায়, ভঙ্গীতে। সে আশা ফল্ল না।

রাজা হঠাৎ বল্লেন—"মণিবাবু, আপনার মত লোকের চাকুরী করা পোষায় না। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গতি থাকলে এ পথ আপনি নিতেন না।

আমার সম্বন্ধে রাজার এইটা প্রথম ভবিষ্যৎ-বাণী। এমন একটা ভবিষ্যৎ-বাণীকে সত্যও বলা চলে না, মিথ্যাও বলা চলে না। রাজাকে ভাগ্যপরীক্ষায় উৎসাহ দিলাম না।

আমরা যে টেবিলে ব'সেছি, তার এক কোণে দু'খানা টেলিগ্রাম চাপা দেওয়া ছিল। একখানির শেষ লেখা-টুকুতে দেখতে পেলাম "নিজাম।" কৌতূহল জাগছিল—নিজামের কাছ থেকে রাজার কি টেলিগ্রাম আসে! কিন্তু রাজার কাছে আপনাকে সহজলভ্য করা সম্ভব নয়।

একটা প্রশ্ন উঠ্‌ল মনে মনে—সি-আই-ডির বাড়ীতেই গোয়েন্দাগিরি করতে পারা কি কৃতিত্ব নয়? সুযোগ এ প্রশ্নের জন্যেই হয়ত অপেক্ষা করছিল।

রাজা হঠাৎ পাঁচ মিনিটের জন্যে ক্ষমা চেয়ে ভিতরে গেলেন। এই অবসরে টেলিগ্রাম দু'খানা এক পলকে দেখে নিলাম। "নিজাম" লিখেছেন—"ধন্যবাদ, পাঁচ হাজার টাকার চেক পাঠালাম।" আর একখানি টেলিগ্রাম বিকানীরের লেখা ছিল—"রাণী সাহেবা আজ রওনা হ'য়ে গেছেন। কাল বিকেলে চারটার সময়ে প্যালেসে গণনার জন্য তৈরী থাকুন।"

ব্যাপারটা প্রহেলিকার মতই ঠেক্‌ল। সত্যিই কি রাজা তা' হ'লে রাজামহারাজাদের জ্যোতিষী। কিন্তু রাজার চালচলন দেখে তেমন কিছু ভাবনাও যে শক্ত!

রাজা ফিরে এসে জানালেন—খাবার তৈরী। আমরা ভিতরে গেলাম, আমি আর আমার বন্ধুরা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বাইরের কেউ ছিল না।

কখন যে "হিজ্‌ হাইনেসের" কাছ থেকে ভেট এল, কই দেখতে তো পেলাম না! চীনাবাসনের ডিশে যে সব খাবার সাজানো ছিল, তাতে বিশেষত্ব ছিল না কিছুই। যে কোন ভদ্র হোটেলেই এমন খাবার পাওয়া যায়। মনে মনে বিরক্ত হলাম, খাবারের অপ্রাচুর্য্যে নয়, ভেটের রহস্যটা আবিষ্কার করতে না পেরে। কে জানে, হ'তেও প্যারে, এই হয়ত ভেট!

আহারান্তে রাজা বল্লেন—"মণিবাবু, অতীশবাবুর কাছে শুনিলাম, কাল তিনটায় নৃতত্ত্বের ছাত্রদের নিয়ে আপনি যাদুঘরে যাচ্ছেন। আমারও ইচ্ছে, আপনার মত একজন বিশেষজ্ঞের সাথে গিয়ে যাদুঘরটা একবার দেখে আসি, যদি মনে কিছু না করেন।"

রাজার টেলিগ্রামে দেখেছিলাম, কাল চারটায় তাঁর বিকানীর প্যালেসে যাবার কথা। এখবর আমি গোপনে দেখেছি, রাজাকে বলার উপায় ছিল না। আমি সম্মতি জানালাম—ব্যাপার কি দাঁড়ায়, জানার ইচ্ছে রইল। ন'টা বেজে গিয়েছিল, বিদায় নিলাম। রাজা একদিন আমার বাসায় গিয়ে সৌজন্যের প্রতিদান দেবেন, জানিয়ে রাখলেন।

* * * *

মনে মনে এই "ইম্পিরিয়াল" চরের উপর একটু সি-আই-ডি-গিরি করার ইচ্ছে জাগছিল। পরদিন ষ্টেশনে লোক পাঠালাম জানবার জন্যে—বিকানীর থেকে রাজা-রাণী কেউ আসেন কিনা। কিন্তু সত্যিই রাণী এলেন।

এই হতশ্রী লোকটীর ফাঁদে তা'হ'লে বড় বড় শিকার জুটেছে! মনের কোণে প্রহেলিকাজাল ঘনিয়ে এল। দুর্ভাগ্য, দুনিয়ার দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষের; অদৃষ্টের পানে তারা চেয়ে থাকে তীর্থের দেবতার মত। মানুষ—এই ক্ষুদ্র মানুষ—চায় বিনা আয়াসে ভোগের পূজা। নৈলে তারা কিসের প্রত্যাশায় আপনার পৌরুষকে বলি দেয় জ্যোতিষের কাছে?

আমার নৃতত্ত্ব ক্লাসে তিন জন ছাত্রী আর সাত জন ছাত্র ছিল। তাদের নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাদুঘরে গেলাম, রাজাও সঙ্গে গেলেন। ছাত্রছাত্রীদের সাথে খুব আলাপ জম্‌ল তাঁর। এইটী ছিল রাজার গুণ—লোকের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারা, কৌতূহল জাগানো, তাদের প্রাণের একটা অনাহত তারে আপনার একটী সুর বেঁধে দেওয়া।

কিন্তু রাজা বিকানীরের কথা ভোলেন নি দেখছি! সাড়ে তিনটে বাজতেই তাঁকে দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হ'ল। বিকানীরের কথা হয়ত তাঁর মনে ছিল না, কাল যখন যাদুঘরে আসবার অঙ্গীকার করেন আমার কাছে। আমি পাঁচটায় যাদুঘর থেকে বেরিয়ে "রাণীর বাগে" যাব শুনে বল্লেন—"পাঁচটায় আমারও কাজ শেষ হবে, হয়ত পথে আপনার সাথে দেখা হ'তেও পারে।"

যাদুঘর থেকে বেরিয়েছি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। একটা বড় রাস্তা পেরিয়েই চার্চ্চ লেন। তার ঠিক মাঝখানে "রাণীবাগের" প্রবেশপথ। এক প্রান্ত দিয়ে আমরা চলেছি বাগানের দিকে। অপর প্রান্ত থেকে একজন লোক আসছিলেন কি যেন ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে। একজন ছাত্র বলে উঠল—"রাজা গরীবদের সিকি-দুয়ানী বিলাতে বিলাতে আসছেন।" চার্চ্চের কাছে একদল ভিখারী দাঁড়িয়েছিল, আমিও দেখলাম, রাজা তাদের সিকি-দুয়ানী ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কিছু দূরে এসে আমাদের দিকে চোখ পড়তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন,

ভিখারীদের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের হয়ত তিনি আগে দেখেন নি।

একটা তরঙ্গ আমার চিন্তায় ঢেউ খেলতে লাগল—সত্যি কি রাজা এমনি বড়লোক যে, অজস্র সিকি-দুয়ানী দান করতে পারেন, না, আজ তাঁর অসম্ভব রকম কিছু লাভ হয়েছে? এই লোকটীর সবই যেন দুর্জ্জেয়!

রাত আটটার সময়ে বাসায় ফিরে দেখি, অতীশ আমার জন্যে ব'সে আছে। আমি বল্লাম—"অতীশ, তোমাদের রাজার আজ বোধহয় মোটা রকমের কিছু লাভ হয়েছে। দেখলাম, ভিখারীদের সিকি-দুয়ানী বিলাচ্ছেন।"

আমার মুখ থেকেই একটা প্রমাণ পেয়ে অতীশ উৎফুল্ল হ'য়ে উত্তর দিল—"জানেন না মণি-দা, রাজা সপ্তাহে একদিন পকেট ভ'রে সিকি-দুয়ানী নিয়ে বেরোন, গোপনে গরীবদের ভিক্ষাপাত্রে পকেট খালি ক'রে দিয়ে আসেন। লাভ-অলাভের সাথে এর সম্বন্ধ নেই, আমি স্বচক্ষে দেখেছি একদিন।"

বিস্মিত হ'লাম।

কয়েক দিন পরে খবর পাওয়া গেল, আমার ছাত্রীরা রাজার কাছে হাত দেখিয়ে এসেছে। রাজার দপ্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় জমতে সুরু হয়েছে। কারও কারও বাপ-মাও রাজার কাছে ভাগ্য-পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। আমার মত নাস্তিকও নাকি রাজাকে সুখ্যাতির সনন্দ দিয়েছে—একথা কেমন ক'রে যে প্রচার হ'য়ে গেল, আমি ভেবে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম—রাজার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাটা ঠিক হয় নি। প্রতিকারের উপায় ছিল না। আমার সহকর্ম্মী দু'একজন প্রফেসরের প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রতিবাদ ক'রে জানিয়েছি যে, রাজাকে কোন প্রশংসা-পত্র আমি দিই নি। কিন্তু এ প্রতিবাদ ক'জনের কাণেই বা পৌঁছাবে!

একটী বাঙ্গালী ছোকরা রাজার দৌলতে বিলেত যাবে, এই আশায় এর মধ্যেই তাঁর দাসত্ব সুরু ক'রে দিয়েছে। সে রাজার জন্যে চা তৈরী করে, ছোটখাট কাজে সাহায্য করে। রাজার প্রশংসায় তার নিজেরই যেন আত্ম-গৌরব। রাজার বন্ধু যে বিলেতের সব নামজাদা লোক! ছেলে তাঁর অক্সফোর্ডের সম্মান-ভূষিত! একজন নিঃস্বার্থ দাতা, পোষাক-পরিচ্ছেদে আড়ম্বর নেই, চাল-চলনে অহঙ্কার নেই, হয়ত বা "ইম্পিরিয়াল সি-আই-ডি," তারপর জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী! এমন লোকের বন্ধুত্ব লাভ করা ভাগ্য বলতে হবে—অনেকের মুখেই শুনি এ কথা। সুতরাং ছেলেটীর আর দোষ কি! দুঃখ হ'ল, স্বাধীন যে বাঙ্গালী!

ক'দিন ধ'রে তর্কবিতর্ক চলছিল তরুণ বন্ধুদের সাথে ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা সম্বন্ধে। তারা যাকে প্রমাণ ব'লে মেনে নিতে চায়, তার একটীও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হ'য়ে ওঠে না। এর কিছুদিন পরে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘট্‌ল। রাজা শুনেছিলেন আমার প্রমাণ চাওয়ার কথাটা।

সেদিন শিবরাত্রি, প্রথম ফাল্গুনের অভিনন্দন অলক্ষ্যেই বিশ্বের দ্বারে এসে পৌঁছেছে। শহরের আব্‌হাওয়ায় আপনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না—বৈচিত্র্যহীন একটানা পথে একঘেয়েমী পথ-চলার মত। ঘরেই ব'সে আছি। অতীশ এসে একখানি শীলমোহর-করা লেপাফা হাতে দিল। উপরে রাজার নাম "এন্ডর্স্" করা। তার নীচে লেখা আছে, "৫ই মার্চ্চের আগে খুল্‌বেন না।"

আশ্চর্য্যান্বিত হ'লাম, বিরক্তিও হ'ল রাজার এই স্পর্দ্ধা দেখে। নির্দ্দিষ্ট দিনের তখনও ১৯ দিন বাকী। রাজাকে এবার একটা শিক্ষা দেওয়ার প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌ল। মুখে কিছু না ব'লে লেপাফাখানি রেখে দিলাম। অতীশ বল্লে—"সাবধানে রাখুন, হারায় না যেন, এবার আমাদের কথার সত্যতা আপনি বুঝতে পারবেন।" অতীতের কথার কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে ভাবলাম—রাজাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

আমি নিরুপায়। জ্যোতিষে রাজার প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে, আমার শত অনিচ্ছা অস্থেও। আমি নাস্তিক, তাতে রাজার কি আসে যায়! প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি নে—রাজা ভণ্ড। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রফেসারের এমনি একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়াটাও কিছু সুখ্যাতির কথা নয়।

* * * *

কয়েক দিন পরে একটা বিয়ের ব্যাপারে রাজার কথাটা চাপা পড়ে গেল। সিটি মিউজিয়ামের কিউরেটর স্যার

অসিত রায় আমার বিশিষ্ট বন্ধু, বিলেতে এক কলেজেই পড়েছি। তার মেয়ে মীরার বিয়ের একটা মস্ত ভার আমাকেই নিতে হ'ল। মীরাকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করি। বিয়ের দিন ২০শে ফাল্গুন। লেডী রায়ের ইচ্ছে, বিয়েটা এ তারিখে না হয়ে পরে হয়; কারণ এক জ্যোতির্ব্বিদ্ নাকি বলেছেন—এ তারিখে বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। অসিতের জেদ—বিয়ে ২০শেই হবে, এ সব কুসংস্কার সে মানে না।

বিপুল সমারোহে আয়োজন চলেছে। পৌর-ভবনে নৃত্য-গীতের বিরাম নেই। সেদিন দোল-পূর্ণিমা। সারা দিন ধ'রে রঙ-তামাসা, খেলাধূলো হ'ল। রাত্রে পানাহারের অকুণ্ঠ ব্যবস্থা। মীরা নিজেই আমাদের পরিবেশন করল। আহারান্তে শ্রান্ত দেহে বিদায় নিলাম।

পরদিন ১৯শে তারিখ। ঘুম থেকে ওঠার আগেই অসিতের টেলিফোন এল—

"কে? অসিত? হাঁ, কি জন্যে ডেকেছ?"

"মণি? এক্ষুনি চ'লে এস আমাদের বাড়ী?"

জিজ্ঞেস করলাম—"কি হয়েছে বলত?"

"বলার সময় নেই, এক মুহূর্ত্তও দেরী ক'রো না, ভয়ানক বিপদ্।"

অসিতের উৎকণ্ঠিত ত্রস্ততায় প্রাণের ভিতর একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা জেগে উঠল। ড্রাইভার তখনও আসেনি, নিজেই মোটর নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম অসিতের বাড়ী।

গিয়ে দেখি মীরা বিছানায় শুয়ে আছে। তার সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় পাংশু, সারা রাতের রোগ-ভোগে দীর্ণ। বিছানার পাশে ব'সতেই আমার হাতখানি নিয়ে মীরা তার কপালে ছোঁয়াল, যেন আমার স্পর্শে তার সব ব্যাধি সেরে যাবে। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত ক'রে বল্লাম—"ভয় নেই, মীরা, ভাল হয়ে যাবে, ডাক্তার নিয়ে আসছি এক্ষুনি।"

শহরের দু'জন বড় ডাক্তার আমার বন্ধু, দু'জনকেই নিয়ে এলাম। দেখেশুনে তাঁরা বল্ল—"অ্যাপেণ্ডিক্সের প্রদাহ (appendicitis), অপারেশনের প্রয়োজন হ'তে পারে।"

সারা দিন ধ'রে ডাক্তারে আর রোগে শক্তি-পরীক্ষা চ'ল্‌ল। বিজ্ঞানের সকল কৌশল প্রয়োগ ক'রেও শেষে অপারেশানই স্থির হ'ল পরদিন প্রাতে।

প্রভাতে মীরার দেহে অস্ত্রোপচার করা হ'ল। কিন্তু তার জ্ঞান আর ফিরে এল না। জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে সুচির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, উদয়ের সাথে ফিরল না।

আজ ছিল মীরার বিয়ের দিন। সে চ'লে গেছে। উৎসব-মুখর বাড়ীখানি হঠাৎ যেন স্তব্ধ পারাবারে হারিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রিতেরাও সে পট-ভূমিকায় নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দু'দিন বিষাদের অনাহত প্রবাহ।

* * * *

অসিতের কাছে শুনলাম—প্রফেসর রাজাই নাকি বলেছিলেন, মীরার বিয়ে এ তারিখে হ'বে না। অকিঞ্চিৎকর ব'লে এ কথাটা সে আমাকে জানায়নি। মনে পড়ল রাজার সেই শীলমোহর-করা চিঠির কথা। ড্রয়ার থেকে চিঠিখানি বার ক'রে খুললাম। লেখা আছে—

"স্যার অসিত রায়ের মেয়ে মীরার ৩রা মার্চ্চের গ্রহ-সংস্থান অশুভ। ৪ঠা মার্চ্চ অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য্য।"

"প্রফেসর রাজা,"
১৩ই ফেব্রুয়ারী।"

ক্যালেণ্ডারে দেখলাম ৪ঠা মার্চ্চ ২০শে ফাল্গুন।

সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের জগৎটাকে একজন কোপারনিকাস এসে হঠাৎ যেন উল্টো পথে চালিয়ে দিয়ে গেল। বার বার নিজেকেই প্রশ্ন করলাম—"ভবিষ্যৎবাণী কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে?" আমার বিজ্ঞানের অহঙ্কারটা মর্ম্মে মর্ম্মে কেঁপে উঠল। সারাদিনেও প্রশ্নটা ভুলতে পারা গেল না। ভাবলাম—কাল হয়ত একটা সিদ্ধান্ত খুঁজে পাব, রাজার কথা অপ্রমাণিত হ'য়ে যাবে।

পরদিন সকালে ব'সে ব'সে এই ঘটনাই আবার ভাবছি। অতীশ এসে খবর দিল—রাজা নিরুদ্দেশ, তাঁর ঘরে পুলিস এসেছে অনুসন্ধানে। মনে হ'ল আমি যেন সিনেমা দেখছি, ঘটনাস্রোতের দ্রুত পরিবর্ত্তনে বাস্তবের সাথে সঙ্গতি অমিল হ'য়ে যেতে চায়।

একটু পরে একজন সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর এলেন। তিনি আমার পরিচিত। বসতে অনুরোধ করলাম। একটা কেদারায় ব'সে তিনি বল্লেন—"রাজা পালিয়েছে, আপনি তার সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?"

ব্যক্তিগত কথাগুলি বাদ দিয়ে, সংক্ষেপে যা' জানি বল্লাম।

ইন্‌স্পেক্টর জানালেন, রাজা খুনী আসামী, পাঁচ বছর ধ'রে সে পলাতক। তার প্রকৃত নাম "সিরাজী।"

—"তার কোন ছেলে কি অক্সফোর্ডে ডিগ্রী পেয়েছে?"

—রাজার ছেলেমেয়ে কিছু নেই, সে অবিবাহিত।"

—"আচ্ছা, সে কি নিজাম এবং বিকানীরের জ্যোতিষী না?"

—"মোটেই না। এখানকার লোকদের মনে বিশ্বাস জাগাবার উদ্দেশ্যে তার চর নানা জায়গা থেকে মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠায়। সম্প্রতি হায়দরাবাদ ও বিকানীর থেকে এমনি দু'খানা তার এসেছে। নিজামের টেলিগ্রামখানি মিথ্যে। বিকানীরের রাণীর আসবার কথাটা রাজার এজেন্ট কোন রকমে জেনেছিল, টেলিগ্রামের সেটুকু সত্যি।"

প্রশ্ন করলাম—"শুনেছি রাজা গোপনে ভিখারীদের অনেক দান করেন।"

ইন্‌স্পেক্টর উত্তর দিলেন—"সবই দুরভিসন্ধিমূলক, গোপনতা তার ভান। আপনাকেও একদিন এই ফাঁদে পা দিতে হয়েছিল, সে খবর আমরা পেয়েছি।"

আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হ'ল না। ইন্‌স্পেক্টর বিদায় নিলেন।

অতীশ এক কোণে চুপ ক'রে ব'সেছিল, বল্লাম—"শুনলে অতীশ, রাজার কাহিনী?"

অতীশ জবাব দিল—"বিশ্বেস করি, হয়ত রাজা একজন হীন-প্রকৃতির লোক। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সে এই শহরে নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে গেছে। কিন্তু তার একটী ক্ষমতা কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না—সে একজন অসাধারণ জ্যোতিষী।"

"তার জ্যোতিষের ক্ষমতার যে সব প্রমাণ তোমরা দিয়েছ, তার একটীও তো নির্ভরযোগ্য নয়, অতীশ!"

"মীরার কথাটা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন, মণি-দা?

একটা গোপন ব্যথা মনটাকে বিচলিত ক'রে দিয়ে গেল। অহঙ্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে, উত্তর দিলাম—"রাজা অস্ত্রাঘাতের কথা বলেছিল, অস্ত্রোপচারের কথা নয়, অতীশ।"

আমি বিমনা হয়ে যাচ্ছি দেখে অতীশ আর জবাব দিল না। কিন্তু আমার কাছে আমি নিজেই আজ যেন ছোট হয়ে গেলাম। ভাবলাম—বিজ্ঞানের কোন যুক্তিই তো রাজার ভবিষ্যদ্বাণীটী উড়িয়ে দিতে পারে না! রাজা খুনী, হয়ত চরিত্রহীনও; কিন্তু তার অদ্ভুত ক্ষমতা কি এ সকলেরও ওপরে নয়? তবে তার সব গণনাই বা সত্য ব'লে মানতে পারা যায় না কেন? এ সমস্যার যেন সমাধান নেই! মনে পড়ল, এক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে ব'লেছিলেন—"এসব কুসংস্কারের বিশ্বকোষ।"

একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রশ্ন রয়ে গেল—বৈজ্ঞানিকের শেষ কথা হয়ত এখনও বলা হয়নি!

দেবতা

শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দিরে মোরা পাষাণ দেবতা ফুল-চন্দনে পূজি
ধূপের ধোঁয়ায়, দীপের শিখায় তাহার পরশ খুঁজি।
সত্য দেবতা কাঁদিয়া বেড়ায় দেখেও দেখিনা তারে
দীন ভিখারী-ই বলে শুধু জানি, যে-বেড়ায় দ্বারে দ্বারে।

মজুর, মুনিষ মাঠে-ঘাটে খাটে চরণে ফেলিয়া ঘাম
সম্মান তারে করিনা'ক মোরা, করি না কভু প্রণাম।
দুঃখীর বেশে, কর্ম্মীর বেশে এরা'ই দেবতা হয়
ভালবাসে না'ক এ'দেরে যেজন—সেজন ভক্ত নয়।

এখন হ'ল কি!

অর্থাৎ সেকালের ও একালের বাজার-দর !!

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ

নবাব সায়েস্তা-খাঁ (১) দুইবার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জব-চার্ণক, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, ২৪ আগষ্ট, রবিবার [১০৯৭ বঙ্গাব্দে, ২৩ ভাদ্র] দিবসে কলিকাতায় ৺আনন্দময়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাই ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম দিন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সায়েস্তা-খাঁর জীবনের শেষভাগে জব-চার্ণক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশকে "সোণার বাঙ্গালা" বলিলেও অত্যুক্তি হইত না; কারণ তৎকালে দুই আনা করিয়া চাউলের মণ বিক্রয় হইত, অর্থাৎ টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে চাউলের দর মণকরা ১১৲ টাকা। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সায়েস্তা-খাঁ ও জব-চার্ণকের সময়ে যে দরে বাঙ্গালা-দেশে চাউল বিক্রীত হইত, এখন তাহার প্রায় ৮৮ গুণ দর-বৃদ্ধি হইয়াছে। আড়াই-শত বৎসরের মধ্যে এই ভীষণ কাণ্ড !!!

আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, আমার বাল্যকালে (১৮৬৩ খৃঃ) আমার ৺পিতা-ঠাকুর মহাশয় দোকানে চাউল কিনিতে যাইতেন। আমিও তখন তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। তখন উৎকৃষ্ট বালাম-চাউলের দর মণকরা ১।০ (এক টাকা, চারি আনা) ছিল। তৎকালে এক-বস্তায় দেড়-মণ চাউল থাকিত, এবং সেই সঙ্গে আড়াই-সের চাউল ঢল্‌তা (ফাও) থাকিত। অতএব তৎকালের দর অপেক্ষা এখনকার দর প্রায় নয়-গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমি স্বহস্তে ১৸৹ (এক টাকা, তের আনা) হিসাবে চাউলের মণ কিনিয়াছি।

ধান্যের অবস্থা দৈবের উপর নির্ভর করে। কোন বৎসর ইহা অধিক-পরিমাণে ও কোন বৎসর ইহা অল্প-পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এবং কোন বৎসর বা ইহা কিছু-মাত্র জন্মে না। এই কথা লিখিতে লিখিতে একটী কথা মনে পড়িল। রামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধার করিয়া "সসীত সহলক্ষ্মণ" অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সর্ব্ব-প্রথমেই ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

> "উৎপত্তির্বিষমা যস্য নিত্যং যস্য ব্যয়ো ভবেৎ।
> সর্ব্বশস্যপ্রধানস্য ধান্যস্য কুশলং বদ॥"

অর্থ। (হে ভরত!) যে ধান্য, সকল বৎসরে সমান জন্মে না, অথচ গৃহস্থের সংসারে নিত্য যাহার খরচ আছে, এবং যাহা সকল শস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, সেই ধান্যের কুশল সংবাদ বল।

এখন পাঠক-মহাশয়-গণ ভাবিয়া দেখুন, রামায়ণেও ধান্যের এত মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

মুরশিদাবাদ-নবাব-বাটীর সেরেস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে একজন ভোজপুরী পালোয়ান।৵৹ (পাঁচ আনা) মাত্র খরচ করিয়া একমাস তাহার খোরাকী চালাইত। অতএব দৈনিক পোণ-পয়সা মাত্র তাহার খোরাকী ছিল। আজকাল একটী লোকের পেটের খরচ দৈনিক কত পড়ে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন !!!

---

(১) নবাব সায়েস্তা-খাঁর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গিয়াস-উদ্দীন (ইৎমাদ্-উদ্দৌলা গিয়াসবেগ্) নামক জনৈক হীনাবস্থ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভাগ্য-বর্দ্ধন-মানসে পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া সম্রাট্ আকবরের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রটীর নাম আসফ-খাঁ ও কন্যাটীর নাম নুরজাহান। আসফ-খাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম সায়েস্তা-খাঁ ও কন্যার নাম মমতাজ-মহল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সায়েস্তা-খাঁ সুবিখ্যাতা জাহাঙ্গীর-মহিষী নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধা সাজাহান-পত্নী মমতাজ-মহলের সহোদর। দিল্লীর সম্রাড্-গণের সহিত বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক থাকায় সায়েস্তা-খাঁ ইংরাজদিগের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের উপরে আধিপত্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহাকে সুবিবেচক ও সুশাসন-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা-কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ ব্ল্যাক্-জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় ১৭২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর জমীদার জেফানিয়া হল্‌ওয়েল-সাহেবের অধীনতায় মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে কলিকাতায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দামার বিচার করিতেন। তাঁহার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। এখন বাগবাজারে যে সুপ্রসিদ্ধ ৺সিদ্ধেশ্বরী-মূর্ত্তি ও তাঁহার পশ্চিম দিকে যে একটী অতি পুরাতন মন্দির দেখা যায়, তাহা গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয়ই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহা-সমারোহে ৺দুর্গাপূজা করিতেন। তিনি ৫১ মণ চাউলের একখানি মূল-নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দুর্গা-মাতার পূজা দিতেন। ৺পূজার উপলক্ষে এক একটী জালার মত মিঠাই এবং গরুর গাড়ীর চাকার মত এক একখানি জিলাপী প্রস্তুত হইত। থিয়েটারের ভুনিবাবু (৺অমৃতলাল বসু) মহাশয় বাল্যকালে তাঁহার পিতার সহিত গোবিন্দরামের বাড়ীতে ৺দুর্গা-পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইতেন। তাঁহার মুখে স্বয়ং শুনিয়াছি, তিনিও উক্তরূপ নৈবেদ্য, মিঠাই ও জিলাপী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ১০০ বৎসরের কথা।

গোবিন্দরামের সময়ে কলিকাতায় কিরূপ বাজার-দর ছিল, তাহাও বলা উচিত। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় চাউল, গম ইত্যাদি দ্রব্যের দর-বৃদ্ধি ও জমী-বিলির হারের অল্পতা হওয়ায় কলিকাতা-কাউন্সিল, গোবিন্দ-রামকে ইহার কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার গভর্ণর রজার-ড্রেক্ (Roger Drake) সাহেবকে গোবিন্দরাম বাজার-দরের যে ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গোবিন্দরামের কৈফিয়ৎ দিবার তারিখ ১০ নভেম্বর, ১৭৫২, অর্থাৎ ইহা পলাশীর যুদ্ধের প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা :—

খৃষ্টাব্দ	চাউলের দর	অন্যান্য শস্য	গম	ময়দা	তৈল
১৭৫১	টাকায় ১ মণ ৩২ সের	টাঃ ১ মণ	টাঃ ১ মণ ৩২ সের	টাঃ ১ মণ ৩ সের	টাঃ ১ মণ
১৭৫২	টাকায় ১ মণ ১৬ সের	টাঃ ১ মণ ১২ সের	টাঃ ১ মণ ৬ সের	টাঃ ১ মণ	টাঃ ১ মণ

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বর্গীর হাঙ্গামা হওয়ায় প্রজাগণের প্রাণ-রক্ষার্থ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বাগবাজার হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত ৭ মাইল জমী কাটিয়া খাত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আলীবর্দ্দি-খাঁর সহিত বর্গীদের সন্ধি হওয়ায় নাগ্তে-বাজারের নিকট ২ মাইল আর কাটা হয় নাই। এই খাতের নাম "মার্হাট্টা ডিচ্"। এই ডিচের উপরেই এখন আমার বসতি-বাটী অবস্থিত। বাল্যকালে আমি এই ডিচ্ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহা বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। যখন এই ডিচ্ কাটা হয়, তখন কলিকাতার প্রত্যেক গৃহস্থ একটী করিয়া মজুর দিয়াছিলেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেক মজুর একটী পয়সা রোজগার করিত। একটী পয়সা ভাঙ্গাইলে ১২০০ কড়া কড়ি পাওয়া যাইত। ইহার মধ্যে ৮০০ কড়া কড়ি খরচ করিলে এক একজন মজুরের দৈনিক খোরাকী চলিত। সেই একদিন, আর আজ একদিন! হা ঈশ্বর!!

একবার নবাব মীরজাফর কোম্পানীর অতিথি-রূপে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচর-গণকে যে সিধা দেওয়া হইয়াছিল, নিম্নে তাহার অবিকল তালিকা দেওয়া হইল।(১)

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য		প্রত্যেক মণ
চাউল	৪০ মণ	৭৫৲	প্রতি মণ প্রায়	১৸৶০
ডাল	৮ ,,	২০৶০	,,	২৷৫
ঘৃত	৫ ,,	৭৭৲	,,	১৫৷৶৮
তৈল	৬ ,,	৫১৲	,,	৮৷০
লবণ	৩৷০ ,,	৪৷৶০	,,	১৷০
ময়দা	৮ ,,	২৭৲	,,	৩৷৶০
চিনি	৫ ,,	৩৬৷০	,,	৭৷০
মিঠাই ও সন্দেশ	৬ ,,	৬০৲	,,	১০৲
থাসি	৫০ টা	৫০৲	প্রত্যেক খাসি	১৲

এখানে কিছু বলিবার আছে। নবাব-বাহাদুর আসিয়াছেন। তাঁহাকে সিধা দিতে হইবে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর যে মহাত্মা উক্ত জিনিষগুলি খরিদ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই দস্তুর-মত উদর-পূর্ত্তি করিয়াছিলেন। এই হেতু, এত বেশী দাম হইয়াছে।

(১) "কলিকাতা সেকালের ও একালের", ৬২৪ পৃষ্ঠ।

১১৮৭ বঙ্গাব্দে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের সময়ে বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার নাম জগন্নাথ শর্ম্মা। তাঁহার অনেক পুঁথি ছিল। একখানি পুঁথির মধ্যে একখানি ফর্দ্দ পাওয়া গিয়াছে। তিনি উক্ত বৎসরে মহাসমারোহে ৺দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। পূজায় খরচ হইয়াছিল ৮০৸৶০ (আশী টাকা, পনর আনা মাত্র)। উক্ত পণ্ডিত-মহাশয়ের জনৈক বংশধরের নিকটে এই ফর্দ্দখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তৎকালে এই ফর্দ্দে কোন্ বস্তুর কি দর ছিল, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

দ্রব্য	মূল্য	দ্রব্য	মূল্য
প্রতিমা	৫৲	পুরোহিতের দক্ষিণা	৮৲
ভাল মিহি চাউল ১৭ মণ	৬।০	কাপড়	৮৲
ভাল আতপ তণ্ডুল ৪ মণ	২।০	কড়াই	॥০
ঘৃত ১ মণ	৫৲	ক্ষীর	৫৲
ময়দা ৪ মণ	২।৶০	সন্দেশ	৭৲
তরকারী দিগর	২৲	তৈল ১॥০	২৲
ফল-ফুলুরী	১৲	মসলা দিগর	১৶০
চুণ	৵১০	চন্দন-ধূপাদি	।৶১০
বাদ্যকর	৩৲	গুড়	৬৲
দধি	৫৲	দুগ্ধ	৩৲
চিনি	॥০	কাষ্ঠ	২৲
নারিকেল	২৲	লবণ	॥০
পান-সুপারি	১৲	সপ ১ খানি	॥০
নাপিত	॥০	বেহারা	১৲
		মোট খরচ	৮০৸৶০

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, ২০ নভেম্বর তারিখের "সমাচার-দর্পণে" তুলা, তণ্ডুল ও নীলের দর এইরূপ লিখিত আছে :—

"জালুন তুলা ১৮৲ টাকা মোন। কাছোড়া তুলা ১৭৲ টাকা মোন। পাটনাই তণ্ডুল ৩৻০ মোন। পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম ৩৶০ মোন। মধ্যম তণ্ডুল ২॥৶০ মোন। মুগী তণ্ডুল উত্তম ১৻০ মোন। মধ্যম তণ্ডুল ১॥/০ মোন। বালাম তণ্ডুল ১৻/০ মোন। নীল উত্তম ১৬০৲ টাকা মোন।"

১৮২২ খৃষ্টাব্দে, ১২ জানুয়ারী দিবসের "সমাচার-দর্পণে" কয়েকটী বস্তুর তাৎকালিক মূল্য লিখিত হইয়াছিল। ইহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

বাজার ভাও

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।০	৩৻০
নারিকেল তৈল	১	১০৲	১২৲
চাল পাটনাই	১	২৲	২৶০
মুগী	১	১৶০	১॥০
পাছড়ি উত্তম	১	২।০	২॥০
পাছড়ি মধ্যম	১	১৻০	১৸৶০
বালাম	১	১৶০	১৶০
দুধা গম	১	১৶০	১।০
অড়হর ডাল	১	১॥/০	১॥৶০
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২৭৲	২৮৲
ভয়সা ঘৃত	১	২৫৲	২৬৲
মোমবাতী	১	৫০৲	৬০৲
মিছরী উত্তম	১	১৪।০	১৫৲
চিনি কাশীর	১	১০৲	১০।০
মধ্যম	১	৯৶০	৯॥০
তামাকু	১	৩৲	৬৲
হরিদ্রা	১	৩৲	৩।০
কর্পূর	১	৫০৲	৫২৲

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, ৫ অক্টোবর, বুধবার [১২৭১ বঙ্গাব্দে, ২০ আশ্বিন, শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে] সমগ্র বাঙ্গালা-দেশ ব্যাপিয়া যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল, তাহার নাম "আশ্বিনে ঝড়"। ইহার ঠিক ৩ বৎসর পরে আরও একটী ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছিল। ইহার নাম "কার্ত্তিকে ঝড়"। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ৩০ অক্টোবর, বুধবার [১২৭৪ বঙ্গাব্দে, ১৪ কার্ত্তিক] এই ঝড় দেখা দিয়াছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের পরে এই দুইটী ভীষণ ঝড়ের মত ঝড় আর হয় নাই। এই দুইটী ঝড় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। "আশ্বিনে ঝড়ের" এক বৎসর পরে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এবং চাউলের দর মণকরা ৪৲ টাকা হইয়াছিল। "কার্ত্তিকে ঝড়ের" পরে চাউলের দর মণকরা ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তবে বর্ত্তমান সময়ের মত ১১৲ টাকা দর হয় নাই। ইহাকেই বলে "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত" !!

আমি বাল্যকালে যে সব বস্তুর দর দেখিয়াছি, এখন তাহাদের দর কত তাহাই নিম্নে লিখিত হইল :—

১। **গিনি (সভ্‌রন্‌)**। আমি বাল্যকালে থান-গিনির (সভ্‌রনের) দর ৯।৵০ দেখিয়াছি। এখন ইহার দর ৪১৲ টাকা।

২। **ভয়সা ও গাওয়া ঘৃত**। ভয়সা-ঘৃতকে আমরা বাল্যকালে "মুঙ্গেরী মট্‌কীর ঘৃত" বলিতাম। এই ঘৃতের রূপ ও সুগন্ধ এখনও যেন অনুভব করিতেছি। ইহার দর ছিল ১৭৲ টাকা মণ। তৎকালে চন্দ্রকোণার ঘৃত অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার দর ছিল ২৬৲ টাকা হইতে ২৮৲ টাকা মণ। শুনিয়াছি, এখন চন্দ্রকোণায় ঘৃত দুষ্প্রাপ্য। তখন ভেজিটেবল-ঘৃত বা দাল্‌দা-ঘৃতের অস্তিত্ব ছিল না। তখন "অমরকোষ-অভিধানে" 'বনস্পতি'-শব্দের উল্লেখ ছিল বটে, কিন্তু 'বনস্পতি-ঘৃতের' নাম-গন্ধও ছিল না !!! এখন ঘৃতের দর ৮৪।৮৫৲ টাকা।

৩। **সরিষার তৈল**। তখন খাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া যাইত। ইহার মনোহর গন্ধ ছিল। এখন আর সেরূপ বস্তু পাওয়া যায় না। তখন ইহার দর ছিল ৵০ হইতে ৵১০ পর্য্যন্ত সের। এখন ইহার দর সেরকরা ॥৵০ (দশ আনা)।

৪। **কড়ি**। আমরা বাল্যকালে কড়ি লইয়া বাজারে গিয়া জিনিস কিনিয়াছি। তখন এক পয়সায় ১২০ কড়া কড়ি পাওয়া যাইত। এখন কড়ির চলন নাই, এবং ইহার দরও জানি না। শুনিলাম, এখন ১১॥০ টাকা সের।

৫। **বিলাতী কাপড়**। বাল্যকালে ১০ হাতী মিহি বিলাতী কাপড়ের দর ১॥৴০ দেখিয়াছি। এখন সেইরূপ কাপড়ের দাম ৬৲ টাকা। তবে তৎকালে র‍্যালির বাড়ীর এক যোড়া কাপড় কিনিলে প্রায়ই দেখা যাইত যে, একখানি ৮ হাত ও আর একখানি ১২ হাত, অথবা একখানি ৯ হাত ও আর একখানি ১১ হাত। তৎকালে বিলাতী কালা-পেড়ে কাপড় কিনিয়া ধোলাই করিতে দিলে পাড় উঠিয়া যাইত, এবং ইহা শাদা থান-ধুতিতে পরিণত হইত। মহাত্মা ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় Hindu Patriot কাগজে এই সব কথার আন্দোলন করায় Manchester-এর কাপড়-ব্যবসায়ীরা ভয় পাইয়া পুরা ১০ হাত কাপড় দিতে আরম্ভ করিল, এবং যাহাতে কালা-পেড়ে কাপড় শাদা থান-ধুতি না হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে কাপড়ের এরূপ অবস্থা ছিল।

৬। **লংক্লথ কাপড়**। পূর্ব্বে খেলো লংক্লথ ৵০ হিসাবে গজ ও ভাল লংক্লথ ।৴০ হিসাবে গজ বিক্রয় হইত।

৭। **ময়দা**। পূর্ব্বে ময়দার সের ৴০ (এক আনা) দেখিয়াছি। এখন ।০ (চারি আনা)।

৮। **বালাম চাউল**। বাল্যকালে (১৮৬৩ খৃঃ) ১।০ হিসাবে মণ দেখিয়াছি, এবং তাহার ৫।৬ বৎসর পরে স্বহস্তে ১৸৴০ হিসাবে ভাল বালাম চাউল কিনিয়াছি। তখন এক বস্তা (১॥০ মণ) চাউল কিনিলে আড়াই সের চল্‌তা (ফাও) পাওয়া যাইত। এখন দর মণকরা ১১৲ টাকা।

৯। **ছোট বাতাসা**। বাল্যকালে একটী পয়সা দিয়া ১১০ খানি ছোট বাতাসা কিনিয়াছি। এখন এক পয়সায় ৮ খানি মাত্র !

১০। **সন্দেশ**। বাল্যকালে উৎকৃষ্ট সন্দেশের সের ।৵০ দেখিয়াছি। এখন সেরূপ সুগন্ধ সন্দেশ জন্মে না। মাণিকতলায় ৺কৃষ্ণ-বন্দ্যোর গির্জ্জার দক্ষিণে ৺তিনকড়ি দে নামক একজন বিখ্যাত সন্দেশ-ওয়ালা ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বাল্যকালে তাঁহার পিতার সহিত শোভাবাজার-নিবাসী রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে সন্দেশ দিতে যাইতেন। তৎকালে সাধারণ লোকের নিমিত্ত এক সের, আধ সের, এক পোয়া ও আধ পোয়া ওজনের কড়া-পাকের সন্দেশ প্রস্তুত হইত। ইহার দর ছিল মণকরা ৬৲ টাকা। রাজা-রাজ্‌ড়ার নিমিত্ত দুই প্রকার সন্দেশ প্রস্তুত হইত। তাহাদের নাম নিখুঁতি ও কস্তুরো। তাহাদের দর ছিল মণকরা ১০৲ টাকা। এখন ইহা গল্প বলিয়া মনে হয় !!! এখন দর মণকরা ৮০৲ টাকা।

১১। **ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন**। কচুরী, জিলাপী, খাজা, গজা ইত্যাদি ঘৃতপক্ক খাদ্য-সামগ্রীর দর ছিল সের-করা ।৴০ হইতে ।৵০। এখন দর সেরকরা ৸৵০ হইতে ১৲ টাকা।

১২। **আকের গুড়**। বাল্যকালে আকের গুড়ের দর মণকরা ২॥০ দেখিয়াছি। ইহার দাম এখন মণকরা ২৪৲ টাকা।

১৩। **আলু**। আলুর দাম মণকরা ৷৷০ দেখিয়াছি। এখন মণকরা ১২৷৷০ (সাড়ে বার টাকা)।

১৪। **বেগুন**। বাল্যকালে "মুক্তকেশী"-নামক এক প্রকার বেগুণ ছিল। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং আকারে বৃহৎ ছিল। ভিতরে ১০৷১৫টী মাত্র বীচি থাকিত। এরূপ বেগুণ ২২টী এক পয়সায় কিনিয়াছি। হালিসহরের "দোকো বেগুণ" বড় ফুট-বলের মত ছিল। এক পয়সায় ২টী বেগুণ মিলিত। তখন ওজন-দরে বেগুণ বিক্রয় হইত না। এখন একটী মাঝারী বেগুনের দাম ✓০।

১৫। **আম্র**। বাল্যকালে "চুনোখালি আঁবের" বিশেষ আমদানী দেখিয়াছি। ইহা খুব সুমিষ্ট ও মাঝারী সাইজের ছিল। দর ছিল শতকরা ।✓০ আনা। এ বৎসর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ন্যাঙ্‌ড়া বিক্রয় হইয়াছে।

তখনকার জিনিসের সহিত এখনকার জিনিসের তুলনা হয় না। এখন ত এই ভীষণ বাজার-দর! না জানি, পরে বা আরও কি হয়! এখন যে ঘোর কলিকাল উপস্থিত, তাহা এখন জিনিসের দর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কথায় বলে, "মুড়ি-মিছরীর একদর!" বাস্তবিকই এখন তাহাই ঘটিয়াছে। এখন মুড়ির সের ৷৷০ (আট আনা) এবং মিছরীর সের ৷৷✓০ (দশ আনা)। মুড়ি যে পরিণামে ওজন-দরে বিক্রয় হইবে, তাহা তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার নাতির বয়সী আজকালকার ছেলেরা তর্ক করে, "স্যার, আপনি অর্থনীতি বুঝেন না। তখন টাকার দাম ছিল, এখন জিনিষের দাম হয়েছে, ইহা দেশের উন্নতির সুলক্ষণ।" আমি বলি, "বাবু, তোমাদের অর্থনৈতিক ভেজাল না বুঝাই ভাল। কম দামের নির্ভেজাল জিনিষ খেয়ে, নীরোগ স্বাস্থ্য আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে আছি।" আজ সত্যই দুঃখে বল্‌তে ইচ্ছা হয়, হা নারায়ণ!

শ্রীবৈকুণ্ঠ পরিহরি এস হরি! কৃপা করি
তোমার সাধের এই স্বর্ণ-বঙ্গদেশে।
কি ছিল, কি হলো আজ পেটে খিদে, মুখে লাজ
আরো কি তোমার মনে আছে অবশেষে॥"

সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, বার-এট্-ল

সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে ভাল লাগে ঋতুপরিক্রমা,
ফাল্গুনে বসন্ত আসে নব পল্লবিত কুঞ্জপথে
কোকিল কূজিত ছন্দে, উদাস ঐশ্বর্য্য নিরুপমা
সুষমার বিভূতি মাখিয়া, নব মঞ্জরীর স্বর্ণরথে
দক্ষিণের দাক্ষিণ্য উদ্ভাসি'। আষাঢ়ের নব মেঘে
পুঞ্জ পুঞ্জ নৈরাশ্যের ঘনকৃষ্ণ শুষ্কম্লান কায়
হৃদয়ের গ্লানি যেন ঈশানের কোণে ওঠে জেগে,
সহসা বিদীর্ণ করি' তমালের শ্যামল প্রচ্ছায়
ঢালি' দেয় সুপ্তিমৌন অন্তর্গূঢ় গাঢ় বেদনারে।
শরতে সহাস্যমুখে শঙ্খশুভ্র বরণে বরণে
বিচিত্র বিভিন্নরূপে, শ্বেত করবীর বৃন্ত করে,
শতদলে বিকশিয়া, বিমুগ্ধ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে,
নব নব রূপে এসে দেখা দেয় নভে স্তরে স্তরে।
গ্রীষ্মের বৈরাগ্য মাঝে হেমন্তের পূর্ণতার সুর,
অতি পরিচিত রূপে করি' তোলে বেদনা বিধুর।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে ভাল লাগে বিপুল জনতা,
সহসা পেয়েছে ছাড়া কর্ম্মক্লান্ত যত সর্ব্বহারা
দিনান্তে মজুরী খেটে ফিরে চলে যেন মূর্ত্ত ব্যথা
ম্লান মুখ নৈরাশ্যকাতর। সুধায়ো না ইহারা কাহারা।
গ্রহতারা, গ্রীষ্মে শীতে সৃষ্টির আদিম যুগ হ'তে
যেমতি নিয়তিচক্রে বাঁধা আছে হৃদয়ে হৃদয়ে,
ফুটন্ত গোলাপগুচ্ছ ছাড়াইয়া চলে পথে পথে
কণ্টকবৃন্তের পরে অলক্ষ্যে সূচিকা তীক্ষ্ণ লয়ে
রহিয়াছে সাথে সাথে। সুখদুঃখ কালের হিন্দোলে
বাঁধা যেন একই বৃন্তে গোলাপের কাঁটা গন্ধ সহ,
আমরা মানববৃন্দ পরিচিত পৃথিবীর কোলে।
রয়েছি অনন্ত কাল, ক্লান্ততনু জুড়াইছে নিত্য গন্ধবহ।
জীবনমৃত্যুর মাঝে স্থিতিবিন্দু আমরা মানব,
দুঃখসিন্ধু উত্তরিতে পান করি সুখের আসব।

বিচারক

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

জার্ম্মাণ-অধিকৃত রুশিয়ার একটি সহর। নাম মিনস্ক। কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে এরই বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে মানুষের আমনুষী অত্যাচারস্রোত। প্রতি গৃহ-প্রাচীরের বুলেটচিহ্ন সে করুণ ইতিকথার যেন এক একটি পৃষ্ঠা। তারা সাক্ষ্য দেয়, কেমন করে' সেখান হ'তে মুছে গেছে মানুষের স্বাধীনতা। ভগ্ন অট্টালিকাগুলির এখনও পূর্ণ সংস্কার হয়নি। নীরবে দাঁড়িয়ে তাদের অভিশাপ দিচ্ছে, যাদের সভ্যতার সংঘর্ষে তাদের এ দুরবস্থা। অধিবাসিদের কণ্ঠে শোনা যায় না সাম্যের গান; বিজয়ী প্রভুর অসাম্য আচরণে তাদের জীবনে নেমেছে তিক্ততার শীর্ণ পাণ্ডুরতা। বেঁচে থাকতে হয় বলে'ই আজও যেন তারা কোন রকমে বেঁচে আছে।

সহরের একান্তে যে বাড়ীটি একদিন স্থানীয় শ্রমিক-দের ক্লাব ছিল, আজ তা' প্রধান বিচারকের আবাসে রূপান্তরিত হ'য়েছে। উমানভস্কী জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছে এ পদমর্য্যাদা আর এ সুরম্য গৃহবাসের অধিকার।

বিজয়ী প্রভুর কাছে উমানভস্কী পেয়েছে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের সম্মান; দেশবাসী অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে চাপা স্বরে বলে, ঘাতক! মানুষের একটা বিশেষ স্বভাব আত্মকৃত অপরাধের উপর নির্দ্দোষিতার গুণ্ঠন পরিয়ে সাধারণের পাপের উপর বাহ্যতঃ দেখায় সে ঘৃণা। উমানভস্কীর কৃতঘ্নতা জার্ম্মাণীর পায়ে বিক্রি করেছে তার দেশের স্বাধীনতা, তাই সে তার নূতন প্রভুর যে বিরুদ্ধাচরণ করে, কপট ঘৃণাভরে তাকে বিশ্বাসহন্তা নামে আখ্যায়িত করে, আইনের সব চেয়ে নির্ম্মম চরম শাস্তিই তাদের জন্য সে করে ব্যবস্থা।

মিনস্কের উপর নেমেছে বাদলভরা আকাশ। সন্ধ্যা হ'তে অবিরল ধারে ঝরছে বাদলধারা। রাস্তায় বরফ নেমেছে কয়েক ইঞ্চি; অট্টালিকা তুষারের অবগুণ্ঠনে বসে নীরবে অতীতের যেন অশ্রু বর্ষণ করছে। অশান্ত বাতাস বর্ষণমুখর প্রকৃতির বুকে তুলেছে হাহাকার। নিষ্প্রদীপ রাতের আঁধার জমেছে পরতে পরতে। নগরী আশ্রয়হীনা ভিখারিণীর মত দাঁড়িয়ে সহ্য করছে প্রকৃতির অত্যাচার।

রাত্রি গভীর। উমানভস্কীর চোখে নাই ঘুম। বাতায়নে তুষারকণা নিয়ে আসে বাতাস, তার নিঃশ্বাসে সে শুনতে পায় দূরাগত কার উত্তেজিত কণ্ঠ। সে চমকে উঠে। আকাশে চমকে উঠে বিজলীচমক, উমানভস্কী আতঙ্কিত দৃষ্টি তুলে বাইরে তাকায়। তার মনে হয়, যেন কারা ঝড়বাদল মাথায় করে তারই অপেক্ষায় গোপনে দাঁড়িয়ে আছে দোরের বাইরে। সন্তর্পণে সে উঠে বসল। পিস্তলের ট্রাইগার টিপে সে এগিয়ে চলে দোরের দিকে। বাইরে তাকিয়ে দেখে, তার আদরের কুকুর কম্বলের ভিতর অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ফিরে এসে উমানভস্কী দোরজানালা বন্ধ করে' দিল। ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে সে বসল। দৃষ্টি পড়ল ঘুমন্ত স্ত্রীর সরল মুখের দিকে। উমানভস্কী শিউরে উঠল। তার মনে পড়ল, যাকে আজ সে জার্ম্মাণ সেনানী হত্যার অপরাধে দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড, সেও তারই মত একজন রাশিয়ান। তার স্ত্রী নিশ্চয়ই শুনেছে, যে তার স্বামীকে প্রধান বিচারপতি উমানভস্কী পৃথিবী হ'তে চিরদিনের মত বিদায় দেবার আদেশ দিয়েছে। সেও মিল্‌নার মত স্নেহমমতায় গড়া একজন রমণী। এ সংবাদ তার বুকে বজ্রের মত বিঁধেছে। একজন রুশ নারী নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করেছে নিদ্রার কোলে, আর একজন তারই মত নারী স্বামীহারা শূন্য বিছানায় একান্তে অশ্রু-বন্যায় বাদল ধারাকে হার মানিয়েছে।... সমস্ত দুশ্চিন্তাকে সে সজোরে দূর করে শুয়ে পড়ল। বহুক্ষণ নিরর্থক এপাশ-সেপাশ ক'রেও ঘুম তার এল না; রাতই শুধু বেড়ে চলল।

উমানভস্কীর দম্ যেন বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়। উঠতে গিয়ে সে বাইরের দিকের দোরজানালা সব খুলে দিলে। বাইরে ষড়যন্ত্র করে আঁধার অপেক্ষা করছে আততায়ীর মত। বাগানের পুষ্প-কুঞ্জগুলি আঁধারের

আবরণে ফাঁসীমঞ্চের মত মনে হ'চ্ছে। তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই অপরাধী মিল্‌ভিচ্, যাকে সে আজ ফাঁসীর হুকুম দিয়েছে। ঈস্—কি হিংস্র তার চাহনি! হাতে মুখ ঢেকে উমানভ্‌স্কী ঘরের ভিতর ফিরে এল। চাপা কণ্ঠে তার ধ্বনিত হ'ল—না—না, এ সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘরের দিকে মুখ ফিরাতেই দৃষ্টি পড়ল তার খোকার বিছানার দিকে—নীল আব্‌ছা আলোকে পাতলা মশারির আবরণতলে যেন ক্ষীর সায়রে প্রস্ফুটিত নীল কমল। উমানভ্‌স্কী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে দিকে। মশারি তুলে সে পুত্রের কপোলে পিতার স্নেহ এঁকে দিতে ঝুঁকে পড়ল। ক্ষীণ কণ্ঠে বাতাসের স্বরে কে বাধা দিল। উমানভ্‌স্কী চম্‌কে উঠে বলল—কে?

—আমি। আকাশবাণীর মত যেন একটি শব্দ ভেসে এল।

—কে তুমি? আমি তোমায় চিনতে পারছি না।

—আমি বিবেক। তোমারই ওই পশু মনের মনি-কোঠায় আমার আবাস।

—এ সময়ে তুমি এখানে কেন?

—খোকাকে তুমি আদর করো না; সে অধিকার তুমি হারিয়েছ।

—সে কি! পিওট্রা আমার ছেলে, তাকে আদর করার অধিকারীও আমি নই?

—ভেবে দেখ উমানভ্‌স্কী, তোমার বিচারকজীবনে বিচারের মিথ্যা ছল করে' অমন কত শত পিওট্রাকে অনাথ করে' কেড়ে নিয়েছ তাদের মুখের হাঁসি। তারপর কোনও শিশুকে আদর করতে তোমার মনে পড়ে না সে করুণ মুখচ্ছবির বেদনাময় পাণ্ডুরতা?......মনে রেখ বিচারক, সংসারের সব শিশুই এক। শত্রুমিত্র সবার কাছেই সমান স্নেহের দাবী এরা রাখে।

উমানভ্‌স্কী চিন্তা করতে লাগ্‌ল। যতই সে চিন্তার গভীরতম তলে যায় তলিয়ে, ততই তার চোখে ভেসে উঠে রহস্য-গুণ্ঠনে ঢাকা বিভীষিকা। এমন কতগুলি শিশুর মুখ চলচ্চিত্রের মত ভেসে উঠে, যাদের পিতৃহারা করেছে উমানভস্কী নিজে। সে করুণ মুখগুলির অসাড় চাহনিতে পুঞ্জীভূত অভিশাপভরা। সইতে পারল না সে সে-দৃষ্টি। দু'হাতে চোখ ঢেকে উমানভ্‌স্কী আর্ত্তনাদ করে' উঠল—না—না, আমার অপরাধ কি? আইনের চুলচেরা বিচারে এ দণ্ডই ছিল তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

কপালের উপর তার বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা জমেছে শরতের শিশিরের মত। উমানভ্‌স্কী বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে পায়চারী করতে লাগল। তুষারবর্ষণও তার দেহের উত্তাপ যেন প্রশমিত করতে পারছে না। মনের তপ্ত কটাহে তখনও চিন্তাধারা টগ্‌বগ্ করে' ফুটছে। মাঝে মাঝে নিজের পদ-শব্দে নিজেই সে চম্‌কে উঠে। অপরাধীর দৃষ্টিতে পেছনে তাকিয়ে আবার সে পায়চারী করতে থাকে।

বাইরের প্রকৃতিক দুর্য্যোগ তেমনি চলেছে, উমানভ্‌স্কীর অন্তরের দুর্য্যোগের সাথে তার কতক তুলনা হয়। আজই অপরাহ্ণের বিচারকক্ষের দৃশ্যটি তার চিত্তপটে ফুটে উঠে। যে অপরাধীকে সে আজ পাঁচটায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিয়েছে, তার তেজোদৃপ্ত শেষ কথাগুলি উমানভ্‌স্কীর কাণের পর্দ্দায় বাসা বেঁধেছে। সেই সতেজ কণ্ঠ আঁধারের আবরণে আবার যেন তাকে আক্রমণ করল: রক্তের বিনিময়ে রক্তের নজীর দেখিয়ে তুমি আমার রক্ত নিতে লোলুপ হ'য়েছ উমানভ্‌স্কী! কিন্তু কার রক্তের বিনিময়ে তুমি তোমার দেশবাসীর রক্তপাত করছ? যারা তোমার দেশের শত্রু, তোমারই দেশবাসীর রক্ত-পিচ্ছিল বুকের উপর দিয়ে যারা অত্যাচারীর বিজয়ী শকট চালিয়ে রাশিয়ায় নূতন করে' সূচনা করেছে বর্ব্বর শাসন ও শোষণের ইতিহাস—তাদেরই একজন নগণ্য সেনানীকে হত্যা করা কি পাপ? শত্রুহত্যার পুরস্কার কি প্রাণদণ্ড! মনে রেখো উমানভ্‌স্কী, অদূর ভবিষ্যে যেদিন তোমার দেশবাসী অত্যাচারীর ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে কড়ায় গণ্ডায়, সেদিন তুমিও বাদ যাবে না, উমানভস্কী রাশিয়ান বলে'ও তারা তোমার অভিশপ্ত শিরে করুণার ক্ষুদ্র বিন্দুটিও বর্ষণ করবে না। সেদিন তোমারও গর্ব্বিত শির তাদের ন্যায়-দণ্ডের নীচে অবনমিত হ'বে, হবে বিচূর্ণ!

উমানভস্কী কাণে আঙ্গুল দিয়ে শূলব্যথার রোগীর

মত কুঁকড়ে দম বন্ধ করে রইল। দীপ্তকণ্ঠে বিবেক ডাকল —উমানভ্স্কী!

—কে—কে! তুমি, না—না, তুমি আবার কেন?

—সোজা হ'য়ে দাঁড়াও উমান্ভস্কী! আমি তোমার বিচার করব।

—কিন্তু আমিও বিচারক।

—আমি বিচারকেরও বিচারক। আমার বিচার-ধারা আইন গ্রন্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নয়, সত্যের ভিত্তির উপর সে সুপ্রতিষ্ঠিত।

উমানভ্স্কী নতশিরে অপরাধীর মত চুপ করে' রইল।

—বল, তুমি আজ মিল্ভিচের কি অপরাধে মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করেছ?

—রক্তের বিমণিয়ে রক্তের ব্যবস্থা করেছি।

—কার রক্তের বিণিময়ে?

—আমার প্রভুর।

—কিন্তু যে তোমার শত-শত দেশবাসীর রক্ত নিয়ে আজ প্রভু হ'য়েছে, তার কি বিচার করেছ রাশিয়ান?

উমানভ্স্কী ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

—আর তুমি যে তোমার দেশবাসীর প্রতি কৃতঘ্নতা করেছ, তার কিছু শাস্তি নিয়েছ?

কম্পিতকণ্ঠে উমানভ্স্কী জবাব দিল—না।

—তা' হ'লে স্বীকার করছ, যে তুমি ন্যায়ের অমর্য্যাদা করেছ?

আর্ত্তনাদ করে' উমানভস্কী মেজেতে লুটিয়ে পড়ল: আমি—আমি যে করেই হোক মিল্ভিচের অন্ততঃ প্রাণ রক্ষা করব বিচারক!

—সঙ্গে সঙ্গে নিজের শাস্তির কথাটাও যেন ভুলে যেও না!

উমানভস্কী পাগলের মত ঘরের ভিতর ছুটে গেল। সজোরে দোর বন্ধ করে' সে খিল এঁটে দিল। ক্ষীণকণ্ঠে বিবেক জানাল—আমার বিচার হ'তে অব্যাহতির প্রত্যাশা নিষ্ফল উমানভস্কী!

দোরের প্রচণ্ড শব্দে মিল্না জেগে গেল। বাইরে তখন বাতাসে আর বাদলে চলেছে তুমুল প্রতিযোগিতা। জেগেই সে শব্দ কাণে যেতে মিল্নার মনে হ'ল, পৃথিবীর একটা দিক্ বুঝি ধ্বংস হ'তে চলেছে। দৃষ্টি পড়ল স্বামীর দিকে, বাহ্যজ্ঞানরহিত স্বামী তখন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দোর ঠেলে ধরেছে, দেহ তার অজানা আশঙ্কায় ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপছে। মিল্না বিছানা হ'তে নেমে এসে বলল, ওগো—ওগো, তুমি অমন কাঁপছ কেন?

—না ত! না-না, কাঁপছি না।...হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি একটু বাইরে যাচ্ছি মিল্না!—গুলিভরা রিভল্ভারটি উমানভ্স্কী তুলে নিল।

—এ দুর্য্যোগে তুমি কোথায় যাবে?

—মিল্ভিচ্‌কে আমি অন্যায়ভাবে হত্যার আদেশ দিয়েছি, সে আদেশ আমি রদ্ করতে যাব।

—কিছুতেই আমি তোমায় একা যেতে দেব না।

—আমাকে—আমাকে যে যেতেই হ'বে মিল্না! পাঁচটার মধ্যে না গেলে তারা যে হত্যা করবে তাকে......

ঢং'-ঢং করে' ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। হাহাকার করে' উমানভ্স্কী ফিরে দাঁড়াল:

—গুড়ুম্! গুড়ুম্!! গুড়ুম্!!!

উত্তেজিত উমানভ্স্কী বুলেটের আঘাতে ঘড়ির কণ্ঠ নীরব করে' দিল। বারুদের ধোঁয়ায় ঘর সাদা হ'য়ে গেল। ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে' উমানভ্স্কীর পলকহারা আঁখি শ্যেনদৃষ্টিতে অচল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। তৃপ্তির একটা পাতলা পরশ তার মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা পার না হ'লে মিল্ভিচ্‌কে তারা হত্যা করবে না!

মিল্ভিচের মশানের ঘড়িতেও তখন পাঁচটা বেজেছে, সে ঘড়ি উমানভ্স্কীর ইচ্ছায় অচল হয়নি।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়

(প্রথম পাদ)

শ্রীমতিলাল রায়

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ॥৮॥

কৃত (অনুষ্ঠিত ইষ্ট কর্ম্মের) অত্যয়ে (ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া) অনুশয়বান্ (কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ সহিত) দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ (ইহলোকে পুনরাগমন করে, শ্রুতিস্মৃতিতে এইরূপ কথিত আছে) যথেতম্ (যথাগত মার্গে অর্থাৎ যে পথে জীব গতবান্ হয়,) অনেবঞ্চ (সেই বিপরীত পথে আগমন করিয়া থাকে)।

অর্থাৎ যাহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাহারা কর্ম্মানুরূপ ফলভোগান্তে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যথাগত পথ ধরিয়া মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করেন।

শ্রুতিতে অধিরোহণ করার পথের বর্ণনা আছে। কাষায়ণ শ্রুতি বলেন—জীব প্রথমে ধূমরূপে, তৎপরে অভ্র হইয়া আকাশে গমন করে। আকাশ হইতে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। আগমনকালে আকাশ হইতে বায়ুলোকে, তারপর ধূমরূপে পরিণত হইয়া অভ্ররূপ প্রাপ্ত হয়, অভ্র হইতে মেঘে, তারপর বৃষ্টিরূপে ভূ-লোকে পতিত হয়। শ্রুতিতে অবতরণ কালে বায়ুলোকের কথা অধিকন্তু দেওয়া আছে।

জীবের এই গতাগতির কারণ তাহার কর্ম্ম। কর্ম্ম সুকৃতি-দুষ্কৃতি ভেদে দ্বিবিধ। যাহারা সুকৃতিপরায়ণ, তাহারা চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে। ভোগ শেষ হইলে, যাহারা রমণীয়াচারী, তাহারা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে; যাহারা পাপাচারী তাহারা কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ইহা শাস্ত্রমত। প্রশ্ন উঠিয়াছে—জীব কি কর্ম্ম-ফলভোগ শেষ করিয়া মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করে অথবা কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষে থাকিতে ইহলোক প্রাপ্ত হয়? প্রশ্ন উঠিবার হেতু ব্যাসদেব বলিতেছেন—ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হইলে, কর্ম্মের কিছু শেষ থাকিতে থাকিতে জীব অবতরণ করে। কিন্তু শ্রুতিতে পাওয়া যায় "প্রাপ্যান্তম্ কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহকরোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেতস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" অর্থাৎ জীব ইহলোকেই যে কিছু কর্ম্ম করে, স্বর্গে ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত হইলে, পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য স্বর্গ হইতে ইহলোকে আগমন করে। এই লোকে যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তার সবই নিঃশেষ হইলে যদি জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়, তবে আবার অনুশয়বান্ হইয়া অবতরণের কথা কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রথম অনুস্থয় শব্দের অর্থ অনুধাবন করিতে হইবে। কেহ বলেন - তৈল বা ঘৃতপূর্ণ ভাণ্ড নিঃশেষ করিলে তাহাতে যে অবশিষ্টাংশ স্নেহ-দ্রব্য থাকিয়া যায়, তাহাই অনুশয়। সেইরূপ কর্ম্ম-ভোগ শেষ হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয় হয় না। যে কিছু অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাই পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়। জীব নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্ম যখন স্বল্পাবশেষ হয়, তখন সে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে থাকে। ইহা কিছু অসঙ্গত কথা নহে। অনেক ধনরত্ন লইয়া যদি কেহ বিদেশ গমন করে, তাহা সবই নিঃশেষিত হইলে যে সে ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিবে, এমন কোন কথা নাই। অল্প সঙ্গতি হইলেই তাহাকে যেমন ফিরিতে হয়, জীবও তদ্রূপ যে প্রচুর কর্ম্মফল সঞ্চয় করিয়া স্বর্গারোহণ করে, তাহার ক্ষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতে তাহাকে অবতরণ করিতে হয়। সমস্ত কর্ম্মফলভোগ হইতে হইতে উহা এমন ক্ষীণ হইয়া আসে যে, তখন আর জীব স্বর্গলোকে থাকিতে পারে না। মানুষের কর্ম্মনিঃশেষ ভোগেই হয় না। ইহার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যাহারা স্বর্গকামী, তাহারা অনাত্মবিৎ হইয়া ইহলোকে পরিভ্রমণ করে। অতএব উপরোক্ত সূত্রে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, মর্ত্ত্যধামে জীবের যে কিছু পুণ্য কর্ম্ম, তাহার ফলভোগের জন্য সে স্বর্গলোকে গমন করে। প্রশ্ন উঠিতে

পারে—জীব ভালমন্দ উভয় প্রকার কর্ম করিয়া থাকে। স্বর্গে পুণ্য কর্মের ক্ষয় হয়, পাপ কর্মের পরিণতি কি হইবে? স্মৃতিকার ইহার উত্তর দিয়াছেন—কর্ম বিরুদ্ধ-ফল কর্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এক কর্ম অন্য কর্মে প্রতিবদ্ধ হইলে, তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থায় থাকে, তাহা ফলোন্মুখ হয় না। যথা—

"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি।
পচ্যমানস্ত সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ সংসারে কখনও কখনও এমনও হয়, জীবের দুঃখের অবসান-কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাপকর্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম নির্ব্যাপার হইয়া থাকে। তদ্রূপ স্বর্গে পুণ্যক্ষয়কালে জীবের পাপ-কর্ম সংহৃত হইয়া থাকা অসঙ্গত কথা নহে। ক্ষীণপুণ্য হইলে, পাপ-পুণ্যের পরিমাণানুসারে জীবের উচ্চনীচ জন্ম হয়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব দেখা যায়, পুণ্য-ক্ষয় নিঃশেষ হয় স্বীকার করিয়া লইলেও, জীবের পুনরাগমনে বাধে না। কেননা, স্বর্গে সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয় না, পুণ্যই ক্ষীণ হইয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্কর স্মৃতির বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন —স্বকর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদিও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে সকলেই স্ব স্ব কর্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্মলেশ আশ্রয় করিয়া বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে ও কুলে জন্মগ্রহণ করে, রূপবান্, দীর্ঘায়ুঃ, সদাচারী হয়। আচার্য্য শঙ্কর নিঃশেষিত কর্মক্ষয়ে মোক্ষের কথা তুলিয়াছেন। মোক্ষ জন্মাভাব। মর্ত্ত্যের দুঃখাধিক্যবশতঃ জীব মোক্ষপ্রার্থী হয়। আত্যান্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য বুদ্ধের শূন্যবাদের ন্যায় সনাতনধর্ম্মী সন্ন্যাসীরা শূন্যবাদের নামান্তর প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রই হইয়াছে তাঁহাদের আশ্রয়ে; কিন্তু ব্যাসদেবের সূত্রে জীবনবিজ্ঞানের কথা আছে। জীবনাতীত হওয়ার কথা নাই। তিনি পাপপুণ্যবিজড়িত জীবচৈতন্য দেহান্তরিত হইয়া স্ব স্ব কর্মফল কেমন করিয়া ভোগ করে, তাহারই বৃত্তান্ত দিয়াছেন। অবশ্য শ্রুতিতে আছে—সম্যক্ জ্ঞানে নিঃশেষিতরূপে কর্মনিবৃত্তি হয়, অন্য কিছুতে নহে। যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের অনুশয় সঙ্গত নহে। অতএব জ্ঞানীরা আর জন্মলাভ করেন না, শাস্ত্রের ইহাই অনাবৃত্তি।

আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে, এই পৃথিবী শুধু অনাত্মবিদের জন্যই নহে। মর্ত্ত্যে আত্মবিৎ জনগণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়। অতএব, কর্মই গতাগতির একমাত্র কারণ নহে। এতদতিরিক্ত সৃষ্ট্যাদির যে কারণ, তাহা বিস্মরণ হইলে আমরা ব্যাসকূটের ন্যায় অসম্ভব আদর্শবাদে দিগ্ ভ্রান্ত হইব।

আমরা এই সূত্রে অনাত্মবিদ্‌দের কর্ম ও কর্মক্ষয়ের শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ পাইলাম। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মরণের পর যাহা হয়, তাহা জীবনের সীমায় নহে। অতএব ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব। তবে পুণ্যকারীরা যেমন মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে, সর্ব্বৈব পাপকারীরা ততদূর পৌছায় না। তাহারা ধূমমার্গে প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মধ্যে যে অন্তরীক্ষ, এইখানে তাহাদের কর্মভোগ শেষ করিয়া অনুশয়বান্ হইয়াই তাহারা পুনঃ জন্মলাভ করে। কর্মানুগত আশ্রয় কীট, পতঙ্গ, তির্য্যক হইতে নিম্ন ও উচ্চ অসংখ্য আধার পৃথিবীতে বর্ত্তমান। কর্মভেদে যাহার যেখানে আশ্রয় লওয়ার কথা, সে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবচৈতন্যের উত্থান ও অনুত্থান আছে। জীবাশয় কিন্তু অনাদিকাল তুল্যরূপেই বিদ্যমান, এ কথার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি। যাহা প্রত্যক্ষের বাহিরে তাহা অনুভূতি। যখন শাস্ত্র-প্রমাণ ভিন্ন অন্য কিছুতে সম্ভব নহে, তখন জীবের পারলৌকিক এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব স্বীকার করিয়া আমরা পরবর্ত্তী সূত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥৯॥

চরণাৎ (আচরণ হইতে অর্থাৎ চরিত্রই যোনিপ্রাপ্তির হেতু, অনুশয় নহে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, এরূপ বলিতে পার না) উপলক্ষণার্থা (কারণ শ্রুতিতে করণ শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে) ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ (কার্ষ্ণাজিনি কাষ্ণা ঋষি এইরূপ বলিয়াছেন)।

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "তদ্ য ইহ রমণীয়াচরণাঃ ইত্যাদি" অর্থাৎ যাহারা রমণীয় আচরণ করে, তাহারা উত্তম কুলে জন্মে—ইহাতে জন্মের কারণ চরণ বলিতে হইবে,

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম নহে। স্বর্গে যে কর্ম্মফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হয় নাই, সেই অবশিষ্ট কর্ম্মফল লইয়া অনুশয়বশতঃ পুনর্জ্জন্মের কথা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে অনুশয়ের কথা নাই, চরণের কথা আছে। শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"যথাচারী তথা ভবতি", যার যেমন আচার, তার তেমন গতি। বিনিনিষেধমূলক শাস্ত্র বলিয়াছেন "যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি" অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম অনবদ্য, সেই সকল কর্ম্মের সেবা করিবে। "ন ইতরাণি" নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না। ইহা হইতে উত্তম বা অধম যোনিপ্রাপ্তির কারণ চরণই হয়, অনুশয় হয় না। চরণ অর্থে শীল, আচার, চরিত্র প্রভৃতি।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—না, এরূপ বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না? এই চরণ-শব্দ-লক্ষণা দ্বারা অনুশয় বোধ জন্মায় না। ঋষি কার্ষ্ণাজিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

অনার্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥১০॥

অনার্থ্যকম্ (শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিলে, শ্রুতির উপদেশ অনর্থক হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহাও বলিতে পার না) তদপেক্ষত্বাৎ (কারণ শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম চরিত্রের অপেক্ষা রাখে, এই হেতু)।

কার্ষ্ণাজিনি চরণ-শব্দের অর্থ অনুশয় করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—চরণ যোনিনিরূপণের কারণ হয়। চরণ-শব্দের অর্থ শীল। সর্ব্বভূতের অপকারবর্জ্জন, শাস্ত্রার্থজ্ঞান, এ সকলই শীল-লক্ষণ। যদি চরণ-শব্দের লক্ষণার্থ অনুশয় করা হয়, তাহা হইলে শ্রুতির এই আচার উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়। ব্যাসদেব বলিতেছেন—কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন "যত অনুশয়োপলক্ষণার্থৈবেষা চরণ-শ্রুতিরিতি"—শ্রুতিতে চরণের লাক্ষণিক অর্থ অনুশয়। লাক্ষণিক অর্থ-প্রয়োগ সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—তিনি গঙ্গায় বাস করেন, তখন লাক্ষণিক অর্থ করিয়াই বুঝিতে হইবে যে, তিনি গঙ্গাতীরে বাস করেন। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ চরণ-শব্দের লাক্ষণিক অর্থ অনুশয়। কর্ম্ম অর্থেও 'চর্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞ-কারীকে 'ধর্ম্মাচরণ করিতেছে' বলা হয়। ইহা ব্যতীত সদাচারী না হইলে, শীলপরায়ণ না হইলে, বেদকথিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কেহ করে না। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম শীলাদির অপেক্ষা রাখে বলিয়াই চরণের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করায়, শ্রুতি-বাক্যের আনর্থক্য-দোষ হয় না।

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥১১॥

বাদরিঃ (আচার্য্য বাদরি) ইতি তু (এইরূপ বলেন) সুকৃতদুষ্কৃত দুইই বুঝায়।

আচার্য্য বাদরি বলেন—"ধর্ম্মে চরতঃ মাধর্ম্মম্" অর্থাৎ অধর্ম্ম আচরণ করিবে না। অতএব, এই চরণ শব্দে সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয় পক্ষকেই বুঝান হইল। অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা উত্তম যোনিতে যায় এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ তাহারা অধম যোনি প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষেই গমনাগমন ব্যাপার রহিল। কেননা, উভয়েই অনাত্মবিৎ।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥১২॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি (অর্থাৎ যাহারা অনিষ্টকারী তাহারাও) শ্রুতম্ (চন্দ্রমণ্ডলে যায়, এইরূপ শ্রুতি আছে)।

প্রশ্ন হইবে—উভয় প্রকার আচরণই যখন জন্মমৃত্যুর ক্লেশের কারণ, তখন ধর্ম্মাচার এক পক্ষকে কেবল চন্দ্রলোকে বাস করায় মাত্র। কিন্তু শ্রুতিতে যে পঞ্চমী আহুতির কথা লিখিত আছে, তাহাতে আহুতি-সংখ্যার যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মেই পুনর্জ্জন্ম সুকৃত বা দুষ্কৃতকারী উভয়েই একই প্রকারের হইবে। শ্রুতিও এই বাক্য সমর্থন করিতেছেন "যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছতি"—যে কেহ এলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের এই উক্তিতে কেবল যজ্ঞকারীর স্বর্গগমনের কথা নাই, সর্ব্বপ্রাণীর কথাই আছে। এতৎপক্ষে ব্যাসদেব কি বলিতে পারেন? ব্যাসদের উত্তর দিতেছেন—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌতদগতি-দর্শনাৎ ॥১৩॥

(তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষের সংশয় খণ্ডন করিতেছে অর্থাৎ সকলেই চন্দ্রলোকে যায় না) সংযমনে (যমপুরে) অনুভূয় (অনিষ্টকারীরা যম-যাতনা অনুভব করার পর) ইতরেষাম্ (অধর্ম্মাচারীরা) আরোহবারোহৌ (আরোহণ ও

অবরোহণ করিয়া থাকে) তদ্গতিদর্শনাৎ (শ্রুতি তাহাদের এইরূপ গতিই প্রদর্শন করাইয়াছেন)।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব উক্তি আশ্রয় করিয়া বাদী যে বলিতেছেন, সুকৃত ও দুষ্কৃতকারী উভয়েই চন্দ্রলোকে যায়, ব্যাসদেব তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা সম্ভব নয়। কেন ? তাহার প্রথম সঙ্গতার্থ হইতেছে, কেহ কোথাও যদি যায়, সেখানে তার প্রয়োজন থাকে। চন্দ্রলোক-গমনের উদ্দেশ্য শাস্ত্রপ্রমাণে যজ্ঞকারীদের ভোগের হেতু। যাহারা তদ্রূপ আচরণ করে নাই, তাহাদের সেরূপ ফল-ভোগের প্রয়োজন হয় না। শ্রুতিতে এরূপ উক্তিও যথেষ্ট আছে। যথা—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তরাগেণ মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"

অর্থাৎ পরলোকের শুভ উপায় অজ্ঞের, বিশেষতঃ ধনমুগ্ধের নিকট প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে করে—এই লোকই আছে, পরলোক নাই। এই জন্যই তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশবর্ত্তী হয়। এইরূপ শ্রুতি-বচন আরও আছে—

স্মরন্তি চ ॥১৪॥

স্মৃতিকারেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন।

মনু, ব্যাস, উপনিষদে নাচিকেত উপাখ্যানে পাপীর ফলভোগবর্ণনার কথা আছে।

অপি চ সপ্ত ॥১৫॥

অপি চ (আরও) সপ্ত (পৌরাণিকেরা সাতটী নরকের কথা উল্লেখ করিয়াছে, যথা—রৌরব, মহারৌরব, বহ্নি, বৈতরণী, কুম্ভীপাক এই পাঁচটী অনিত্য নরক; তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র এই দুইটী নিত্য নরক)।

অনিষ্টকারীদের উক্ত সপ্তপ্রকার গমনস্থান থাকা শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত হওয়ায়, অধর্ম্মচারীদের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির কথা আমলেই আসিতে পারে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে প্রশ্ন অবান্তর হইলেও, ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিতেছেন—

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥১৬॥

অবিরোধ (বিরোধের সম্ভাবনা নাই), তত্রাপি চ (সেই সকল নরকেও) তদ্ব্যাপারাৎ (তাহারই কর্ত্তৃত্ব থাকা হেতু)।

এই সূত্র-রচনার উদ্দেশ্য যদি কেহ বলেন, স্মৃতিতে আছে, চিত্রগুপ্ত যমকিঙ্করাদি নরকের অধীশ্বর, সেখানে যম-যাতনা ভোগের কারণ কি ? তদুত্তরে বলা যায়—এই সপ্ত নরক যমেরই কর্ত্তৃত্বাধীন, রাজার অনুচরগণের প্রদত্ত দণ্ড দুষ্কৃতকারীরা ভোগ করিলে, উহা যেমন রাজদণ্ডই বলিতে হইবে, যমরাজনিযুক্ত চিত্রগুপ্তাদির কর্ত্তৃত্ব তদ্রূপ যমরাজেরই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥১৭॥

তু (পূর্ব্বোক্তিনিরসনের জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, মার্গান্তরাভাব হেতু চন্দ্রগতি প্রাপ্ত হয়, সেই সিদ্ধান্ত নিরসন করিয়া বলা হইতেছে) বিদ্যাকর্ম্মণোঃ (বিদ্যা ও কর্ম্মের পথ) ইতি (এইরূপ সিদ্ধান্ত) প্রকৃতত্বাৎ (তৎপ্রক্রিয়ার মুক্তত্ব হেতু)।

অর্থাৎ শ্রুতিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বিবিধ গতির কথা আছে—একটী দেবযান, আর একটী পিতৃযান। "এতয়োঃ পথঃ"—এই বাক্যেরও মর্ম্মার্থ, এই দুই পথে জ্ঞানী ও যজ্ঞকর্ম্মকারী গমন করে। যাহারা জ্ঞানী ও যজ্ঞকারী নহে, তাহাদের জন্য তৃতীয় পথ অবশ্যই আছে। পূর্ব্বে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রস্তাবে যে উক্ত হইয়াছে "বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" অর্থাৎ যে প্রকারে এই স্বর্গলোক পূর্ণ হয় না, তাহা কি তুমি জান ? তদুত্তরে শ্রুতিতে আছে "অথৈতয়োঃ পথোর্ণ কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাহসৌ লোকোন সম্পূর্য্যতে"—যে সকল জীব দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের কোন একটীর অনুপযুক্ত হয়, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণযুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবরূপে উৎপন্ন হয়; ইহারা জন্মে, আবার শীঘ্রই মরিয়া যায়; ইহারা তৃতীয় স্থানেই থাকে, এই জন্যই চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। শ্রুতি-বচনে দেখা যায়, দেবযান ও পিতৃযান ব্যতীত আর এক তৃতীয় পথ আছে।

এই কথায় পূর্ব্বে যে কৌষিতকী শ্রুতিতে সমুদয় জীবের চন্দ্রগতিপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা মিলিল না। এই 'সর্ব্ব' শব্দ অধিকারী সকলের সর্ব্বনাম শব্দ অর্থাৎ অধিকারী সকলে চন্দ্রলোক গিয়া থাকে। শ্রুতিতে যখন তৃতীয় স্থানের কথা রহিয়াছে, তখন দুষ্কৃতকারীও চন্দ্রলোকে যাইবে, এমন কথা অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ দুষ্কৃতকারীদের যখন ভোগাভাব, তখন স্বর্গগমন তাহাদের প্রয়োজনীয় হয় না।

কিন্তু আরও কথা আছে। পূর্ব্বে দেহোৎপত্তি হওয়ার পঞ্চমী আহুতির কথা বলা হইয়াছে। স্ত্রী-যোনিতে জীবের আগমনব্যাপারে চন্দ্রলোক হইতে আকাশে, তারপর বর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবীতে শস্যাদির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রেতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় না। এই নিয়মের বৈকল্য হয়, যদি সর্ব্বজীব চন্দ্রলোকে না গিয়া অতিরিক্ত তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হয়। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥১৮॥

ন তৃতীয়ে (তৃতীয় স্থানে দেহলাভের জন্য আহুতি-সংখ্যার নিয়ম অপেক্ষা করিও না) [কুতঃ কেন?] তথোপলব্ধেঃ (যেহেতু বিনা আহুতিতে জীবসকলের দেহ জন্মিতে দেখা যায়)।

তৃতীয় স্থানের জন্ম-মরণের নিয়ম "জীয়স্ব ম্রিয়স্ব"—জন্মে এবং মরে। পঞ্চমী আহুতির যে নিয়ম, তাহা পুরুষ অর্থাৎ মানবশরীর বিষয়ের জন্য, কীট-পতঙ্গাদির জন্য নহে। এই কথার উত্তরে বলা যায়—তবে কি দুষ্কৃতকারী মানবেরা এই পঞ্চমী আহুতির জন্য চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে? শ্রুতি বলিয়াছেন—পঞ্চমী আহুতিতে আপের আশ্রয়ে মানব-শরীর উৎপন্ন হয়। এই কথায়, এই পঞ্চমী আহুতির স্থান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পুরুষদেহ যে লাভ করা যায় না, এমন কথা বুঝায় না। যাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, আপ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদের দেহ সৃষ্টি করে। এই আপ ভূতান্তরসৃষ্টও হইতে পারে। যেমন মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য ভূতাদি এই পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত জন্মে, মনুষ্যদেহও তদ্রূপ জন্মিতে পারে। যথা—

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥১৯॥

লোকে (পৃথিবীতে) স্মর্য্যতে অপি চ (ঋষিরা আহুতিসংখ্যার অভাবেও জন্মের কথা বলিয়াছেন)।

ভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়—পঞ্চমাহুতি মাতৃগর্ভে রেতঃসেক না করিয়া দ্রোণাদির জন্ম হইয়াছে। চতুর্থ আহুতি শুক্র, পঞ্চম আহুতি রেতঃসেক—এই দুইটী আহুতির অভাবেও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম কল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল পৌরাণিক দৃষ্টান্তে আহুতিসংখ্যার নিয়ম-বিপর্য্যয়েও মানবদেহ লাভ হয়, তাহাই বুঝায়। আরও এক দৃষ্টান্ত আছে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। ঋতুমতী বকী বিনা মৈথুনে গর্ভিণী হয়। মেঘ-গর্জ্জনে তাহার জরায়ুতে সৃষ্টিবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চমী আহুতি স্বর্গগত জনের পুনর্জ্জন্মের হেতু বলিয়া সর্ব্ব লোকের জন্ম-গ্রহণ এই নিয়মের অধীন নহে। আরও—

দর্শনাচ্চ ॥২০॥

গ্রাম্য ধর্ম্ম বিনা দেহোৎপত্তি দেখা যায়।

জীব চারি প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার জীবের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূতের বিনা মৈথুন-ধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। অতএব পঞ্চমী আহুতির নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত আপ পঞ্চমী আহুতি স্বর্গগত জীবগণের আগতির পক্ষেই গ্রহণীয়।

তৃতীয়শব্দবিরোধঃ সংশোকজস্য ॥২১॥

সংশোকজস্য (স্বেদজ প্রাণীর) তৃতীয় শব্দ (উদ্ভিদ শব্দ) অবরোধ (সংগ্রহ করা হইয়াছে) অর্থাৎ শ্রুতিতে তিন প্রকার ভূতগ্রামের কথা লিখিত আছে—অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ। এই উদ্ভিজ্জ শব্দ হইতে স্বেদজ জীব-সংগ্রহ হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ যেমন ভূমিজল উদ্ভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়, স্বেদজের উৎপত্তিও সেইরূপ হইয়া থাকে। কাজেই শ্রুতি স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।

স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥২২॥

স্বাভাব্যাপত্তি (সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্ত হয়) উপপত্তেঃ (এইরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত)।

এ পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে পুণ্যাত্মারা স্বর্গাদি ভোগের পর পুনরাবতরণ করে, তাহাই বলা হইয়াছে। অতঃপর কিরূপে অবরোহণ হয়, তাহা বলা হইবে। "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি"—অতঃপর তাহারা যথাযথ পথে পুনরাগমন করে; ভোগশেষে তাহারা আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূমে পরিণত হয়, ধূমের পর অভ্র হয়, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বর্ষণ হয়। যথাযথ অধিরোহণের পথ ধরিয়া এই অবতরণনীতিতে অবরোহণকারীকে আকাশাদি প্রাপ্ত হইতে হয়। এই প্রাপ্তি অর্থে কি বুঝায়? আকাশের স্বরূপপ্রাপ্তি অথবা তাহারা আকাশতুল্য হয়? যদি বলা হয়—অবরোহণকারীরা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বায়ুত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না; যেহেতু আকাশের স্বরূপ বিভু, জীবের সহিত আকাশ-স্বরূপের নিত্য সম্বন্ধ। অতএব আকাশসাদৃশ্য হওয়াই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। শ্রুতি যে আকাশ-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, উহা আকাশভাবপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥২৩॥

ন অতিচিরেণ (শীঘ্র শীঘ্র অবতরণ হয়) বিশেষাৎ (তাহার পর বিশেষ কর্ম্ম হেতু বিলম্ব ঘটে)।

অর্থাৎ আকাশ হইতে বৃষ্টি-ধারারূপে শীঘ্র শীঘ্র অবতরণ ঘটে। তারপর বিশেষ কর্ম্ম কি, তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই বিশেষ অবস্থা পূর্ব্ব অবস্থা হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ জীবের শস্যভাবপ্রাপ্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অতঃবৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরম্', অর্থাৎ জীব এইবার অতি কষ্টে শস্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। সুখে নিষ্ক্রান্তিকাল অনতিদীর্ঘ হয়, দুঃখের কালই দীর্ঘ। অনুশায়ী জীব শীঘ্র শীঘ্র ধান্য, যব, ব্রীহি প্রভৃতিতে উপনীত হয়, কিন্তু তাহার পর তাহার মনুষ্যদেহপ্রাপ্তিকাল দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥২৪॥

অন্যাধিষ্ঠিতে (অন্য জীব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শস্যাদিতে (পূর্ব্ববৎ (স্বর্গচ্যুত জীবের মুখ্য জন্ম-লাভ হয় না, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায়) অভিলাপাৎ (তাহাদের সংশ্লেষ বা মিশ্রণ হয়, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন)।

পূর্ব্বে বায়ু, ধূমে জীব যেমন মিশ্রিত হইয়া অবতরণের পথে আগমন করে, সেইরূপ ধান্যাদিতে তাহার সংশ্লেষ মাত্র হয়। ইহা তাহার ভোগতন্ত্র নহে। এরূপ হইলে, ধান্যাদির বিনষ্টিতে বা নিপীড়নে তাহার দুঃখই হইত; কিন্তু এরূপ মনে হয় না।

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥২৫॥

অশুদ্ধম্ (যজ্ঞ-কর্ম্মে হিংসাদি পাপ মিশ্রণ থাকে, তাহার ফলভোগ ধান্যাদি হইতেই হয়) ইতি চেৎ এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) (কেন বলিতে পার না?) শব্দাৎ (কেন না, শাস্ত্রনির্দ্দেশেই এইরূপ করা হয় এই হেতু)।

হিংসাদি কর্ম্ম যদি অধর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কর্ম্ম লোকে দোষের বলিবে কেন? তদুত্তরে বলা যায়—কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এক দেশে ও কালে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়, অন্য দেশে ও কালান্তরে তাহাই অধর্ম্মরূপে পরিগণ্য হয়। এক কালে আর্য্যভারতে গো-বধ ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। আবার দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামিগ্রহণ এককালে ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একালে তাহা সম্ভব হয় না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের শাস্ত্র ভিন্ন অন্য গতি নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন—সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবে। শাস্ত্র হিংসা অধর্ম্মজনক বলিয়াছেন। আবার শাস্ত্র বলিয়াছেন—অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশ্যে পশুঘাত করিবে। এই যে শাস্ত্র-বিরোধ, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, সামান্য-বিশেষ জ্ঞানে উপদেশভেদের অবস্থা হইতে পারে। বিশেষ দর্শন যেখানে নাই, সেইখানে সামান্য শাস্ত্রবাক্য অবশ্যই পালনীয়। অহিংসা করিবে, ইহা সামান্য শাস্ত্র-নির্দ্দেশ। কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিবে, ইহা একটী বিশেষ ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত হিংসা অবৈধ অকারণ, পরবর্ত্তী পশুঘাতের নির্দ্দেশ বৈধ ও হেতুভূত। অতএব

ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের শাস্ত্রই যখন একমাত্র হেতু, তখন শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্ম অধর্ম্ম নহে। এইজন্য জীবের শস্য-সংশ্লেষ মুখ্য জন্ম নহে। শস্যাদির পীড়নে উচ্ছেদে জীব যাতনা ভোগ করে না।

রেতঃসিগ্ যোগাহথ ॥২৬॥

অথ (অনন্তর) রেতঃসিগ্ যোগঃ (রেতসিগ্ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়)।

অর্থাৎ শস্যাদি ভক্ষিত হইলে, উহা জীবশরীরে রেতঃরূপে পরিণত হয়। জীব এই ক্ষেত্রেও ধান্যাদির মত রেতঃসেক্তার সহিত সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়। জীব রেতঃ সেক করে না। এইরূপ হওয়ার পর—

যোনেঃ শরীরম্ ॥২৭॥

যোনেঃ (রেতসিগ্ প্রাপ্তির পর যোনিদেশে) শরীরম্ (অনুশয়ীদিগের শরীর জন্মে)।

এইবার "তদ্য ইহ রমণীয়াচরণা" অর্থাৎ যাহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ করে, এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বুঝা যায়। অবরোহণকালে জীবের ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তি তাহার মুখ্য জন্ম নহে। অবতরণক্রম ধরিয়া তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই তাহার জন্ম প্রকরণের একটী পর্য্যায়। জীব-রেতঃ-উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ম্মফল-ভোগের জন্য এই যে জীবের জন্ম, তাহার কথাই এই পাদে ব্যক্ত করা হইল।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদ সমাপ্ত।

আমার বন্ধু

শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী

সে-কোন্ যুগের সে-কোন্ দিবসে
সে-কোন্ লগনে হায়,
পায়ে-চলা পথ ডেকে নিল মোরে
নেশা-ভরা ইশারায়।

সাথীহীন একা পথে পথে ফিরি
দোসর কেহ তো নাহি।
আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে আমি
নিখিলের গীতি গাহি।

পিছনে আমার প'ড়ে থাকে হায়
অতীতের যত ছবি,
সুমুখে শুধুই জ্যোতিঃ হ'য়ে ঝলে
নতুন দিনের রবি॥

কভু মনে পড়ে, কভু ভুলে য়াই
পুরাণো সকল স্মৃতি,
যাহা কাছে পাই তাই দিয়ে মোর
সাজাই পথিক-বীথি॥

পথে চলি আর পায়ে-চলা পথ
কত রূপে হেরি হায়,—
পথ-ধূলি কণা সোণা হ'য়ে সব
অসীমে মিলায়ে যায়॥

গগনে গগনে নয়নে নেহারি
শত আলোকের ছবি—
পথ পরে তা'র লেখা হয় নিতি
শাশ্বত রূপ-রবি!

পথে চলি আর রচি পথগীতি
পথেরি আলোক দিয়া
পথেরি কিরণে আলোকিত মোর
হয়েছে সকল হিয়া।

বিরাম-বিহীন মনের দো-তারা
বাজে মোর অহরহ,
কেহ নাহি মোর! আমি যে সবারি
হ'য়েছি হায় অ-সহ!

বড় ভালবেসে পথ সে একাকী
বন্ধু ক'রেছে মোরে,
বিনা-সূতে তাই গাঁথা হ'য়ে গেছি
অলখ-মায়ার ডোরে।

ভূস্বর্গ রোডেসিয়া

রুশাপির পথে

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

রাত্রির অন্ধকার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই রোডেশিয়ার সীমান্ত সহর ইমতালি ত্যাগ করে আমি বের হয়ে পড়লাম রাজপথে। প্রভাতের মৃদু সমীরণ শরীর জুড়িয়ে দিল। চারিদিকের বৃক্ষলতা, পাহাড়-পথে কি একটা আনন্দের যেন শিহরণ লেগেছে। মনের এত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য যে তা, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভবঘুরের জীবনের এ অনুভূতি রাজৈশ্বর্য্যও দিতে পারে না। বেলা আটটা পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে নীরবে অনেকটা পথ এগোলাম। কঙ্করময় অসমান রাস্তা এখানে ক্রমশঃ সরু হয়ে দুটো মাত্র টার (tar) দেওয়া strap-এ পরিণত হয়েছে। উদ্দেশ্য—মটরের টায়ার যাতে না ক্ষয়ে যায়। বেলা আটটা হ'তেই অনবরত মটর-লরী আর মটর-কার সামনে হ'তে আসতে সুরু করল। দু'বার তিন বার আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি! কালা আদমি মরে গেলেও এদের এতটুকু দুঃখ্ নেই। অগত্যা ষ্ট্র্যাপ ছেড়ে দিয়ে নিগ্রোদের স্বতন্ত্র হাঁটা পথেই চল্‌তে সুরু করলাম।

যে-সব নিগ্রোদের পায়ে হেটে যেতে দেখ্‌তে পেলাম, তারা প্রায়ই সভ্য এবং ইংরেজী বেশ ভালই বল্‌তে পারে। শিক্ষিত নিগ্রোরা ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ানদের একই চক্ষে দেখে। আমাকে তাদের সঙ্গে চল্‌তে দেখে একজন বল্‌লে "You deceive us just the same as Europeans, go and travel with them." বিনা বাক্যব্যয়ে আমি পথ চল্‌তে লাগলাম, কিন্তু যখনই অন্য কোন নিগ্রো এক পায়ে পথের মাঝে থাকৃত দাঁড়িয়ে, আমার ইচ্ছা হত না, লোকটিকে ঘণ্টা বাজিয়ে বিরক্ত করি। হয় লোকটির পেছন পেছন চলতাম, নয়ত সাইকেল হ'তে নেমে তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতাম। অবশ্য এরূপভাবে চলাটা বিরক্তিকর এবং এতে সময়েরও অপচয়। দ্বিপ্রহরে যখন একটি বৃক্ষতলে বসে' খাবার খাচ্ছিলাম, তখন দুটি নিগ্রো আমার কাছে এসে বস্‌ল। তাদের বিশ্রাম করার পর, এক জনকে সাইকেলটাতে তেল দিতে বল্‌লাম আর অন্যটিকে আমার গা-হাতটা একটু টিপে দিতে আদেশ করলাম। উভয়ই সানন্দে এবং বিনা দ্বিধায় আমার কথামত কাজ করল দেখে কৃতজ্ঞ বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "You could refuse my order, but you did not." একটি নিগ্রো অতি বিস্ময়ের সহিত উত্তর করল, Bana, you are a white man." সুন্দর ইংরেজী জানে, আমার চেয়েও ভাল। বেশী আর কথা বাড়ালাম না। নিগ্রোর হাঁটা-পথ ছেড়ে সাইকেল ঠেলে একবারে বড় মোটর-চলা রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কতক্ষণ! প্রত্যেকটি লরি এবং কার-ড্রাইভার আমার প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া-দাক্ষিণ্য না দেখিয়ে আমাকে ঠেলে ফেলেই গাড়ী চালিয়ে চলে যেতে চায়। তিনবার এরূপভাবে আক্রান্ত হয়ে তিনবারই পথ ছেড়ে দিয়ে পথের বাইরে গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি এবং প্রত্যেকবারই কম বেশী জখম হয়েছি। বেশ ভাল করে'ই বুঝলাম, এরা ও-পথে আমায় যেতে দিবে না। আমাকেও চোরের মত পায়ে-হাটা পথেই সাইকেলে যেতে হবে। কিন্তু তাতে
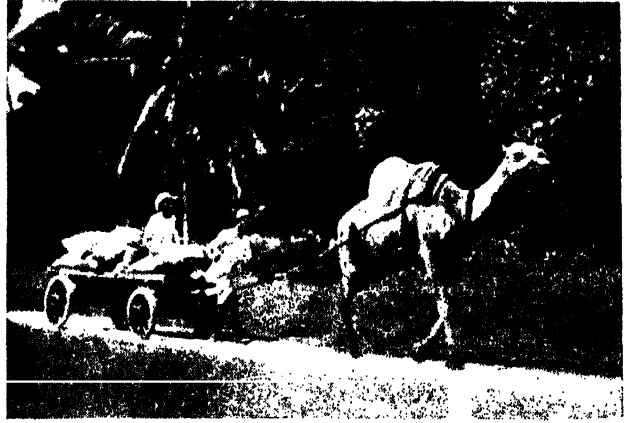
ঘন বৃক্ষ-লতাশোভিত পাকা রাস্তার দৃশ্য : আফ্রিকা

আমি মোটেই রাজী নই। সত্যাগ্রহ করে' প্রাণটা দিবার মত আমার মনোবৃত্তি নয়। পথের ধার হ'তে বড় বড় পাথর ঠেলে এনে পথটাকে একদম বন্ধ করে' দিয়ে অন্য মটর আসার অপেক্ষায়, লম্বা চাকুটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইমতালির সভ্য আদিমবাসিগণ

প্রথম মটরটি এসেই দাঁড়াল এবং একজন ড্রাইভার নীচে নেমে এসেই আমাকে বল্লে, "What's the hell you dirty Negar doing here ?"

"I dig a grave for the white......do not forget I am a man like you, can fight very well. I pride my being an Indian."

লোকটি আমাকে ভূপর্য্যটক জেনে ভদ্রভাবে বল্লে 'আপনি মস্ত ভুল করেছেন। আপনি বুঝি ইমতালি পুলিস ষ্টেশনে কোন সংবাদ দেননি বা নেননি। এটা one way road. এখন অন্য দিক্ হ'তে মটর না আসা পর্য্যন্ত আর চল্‌বেন না।'

তু'জনায় মিলে পাথরগুলি সরিয়ে ফেলে দিলাম। লোকটি চলে' গেল। পথেরই পাশে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। পথে যারা চলেছিল, তারা প্রায় সকলেই আমার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টিপাত করতে কসুর করেনি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একজন সারজেণ্ট এসে আমাকে বল্ল "Now you can bike friend, go ahead." লোকটি যাবার বেলা আমাকে কয়খানা রুটি এবং এক টিন সিগারেট দিয়ে গেল। পর্য্যটক বলে' বোধ হয় এই খাতিরটা পেলাম। আর আমাকে বিশেষ পেছন দিক্ থেকে নিগ্রোর মতই দেখায়, এই অবহেলা ও অপমানের এও একটা হেতু। এই সদাশয় ভদ্রলোকটি চার মাইল দূরের অভিবৃজ সহরে পৌছেই ইমতালীতে টেলিফোন করে' বিশেষ করে' বলে' দিয়েছিলেন যে, পর্য্যটক ইণ্ডিয়ানকে যেন কেউ খারাপ ব্যবহার না করে। আমার গন্তব্য সহরের পুলিস ষ্টেশনেও সংবাদটা দিয়ে রেখেছিলেন। আমি সহরে পৌছা মাত্র তিনি আমাকে একটি ইণ্ডিয়ানের বাড়ী পৌছে দিলেন, আমার সাহস আছে বলে' বার বার করমর্দ্দন করলেন। নিগ্রোদের প্রতি এই দুর্ব্যবহারে আমার অন্তরটা বড়ই পীড়িত হয়েছিল। শুনেছি, একদিন নাকি কলকাতার চৌরঙ্গীতেও ভারতীয়েরা ধুতি-চাদর পরে যেতে পারত না। শ্বেত জাতিদের আচরণ বোঝা যায়, কিন্তু আফ্রিকায় নিগ্রোদের প্রতি ভারতীয়দের যে আচরণ তাহাও ক্ষমা করা চলে না। অর্থলোলুপতা মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। ইউরোপীয়গণ নিগ্রোদের প্রাণে মারে আর ভারতীয়েরা মারে ভাতে।

হাটের পথে সারিবদ্ধ সভ্য-নিগ্রোর দল

অভিবৃজ ঠিক সহর নয়, গ্রামও নয়, একটা ফাঁড়ি মাত্র। একটি ভারতীয় দোকান মাত্র আছে। দোকানী গুজরাতের মেমানক্ষেত্রী। এরা সুন্নি শ্রেণীর মুসলমান। পূর্ব্বে এরা নাকি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় ছিল। আসল কথাটা হল ব্রাহ্মণক্ষেত্রী। গুজরাতীরা ব্রাহ্মণকে বাম্মণ বলে' থাকে।

শুনেছি জিন্না নাকি এই বাম্মন ক্ষেত্রী। ওদের সঙ্গে অন্য কোন শ্রেণীর মুসলমানের নাকি বিয়ে হয় না। বাম্মনক্ষত্রী মহাশয় আমাকে আদর-যত্নের ত্রুটি করলেন না, পরন্তু কিছুদিন থেকে যাবার জন্যও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ছোট্ট জায়গা। সাইকেলে ঘুরে দেখতে একটা বৈকালই যথেষ্ট। গল্পে-সল্পে রাতটা বেশ কাটল। সকালে উঠেই রুশাপির দিকে রওয়ানা হলাম। এবার ইউরোপীয়দের আড্ডায় আমার বিদায়ের কথা বলে' গেলাম।

সহরের উপকণ্ঠস্থ পল্লীবাসিগণ : আফ্রিকা

সুন্দর, সুগম, পরিচ্ছন্ন পথ। এতটুকু ময়লা বা কুটো কোথায়ও নাই। দুটো পথ। ছোট্ট অপ্রশস্ত পথটি বেশ ছায়াযুক্ত বলে' এই পথটিই আমি ধরলাম। নিগ্রোরা সাধারণতঃ এই পথটিতে চলে' থাকে। মাঝপথে দুইজন নিগ্রো তরুণের সঙ্গে দেখা। বেশ হাসিখুসী ছেলে দুটি। সহৃদয়তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম। এরাও সাইকেলে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গী করে' নিলাম। আমার সঙ্গী হওয়া মানেই আমাকে সাহায্য করা। একজন আমার লাগেজ তার সাইকেলের পেছনে বাঁধল, দ্বিতীয় জন তার সাইকেলের পেছনে রশি বেঁধে আমার সাইকেলের হাতলে বেঁধে টানতে লাগল। আমি আরামছে ব্রেক কষে' বসে' গান ধরে' দিলাম। এরূপ আরামদায়ক ভ্রমণ আফ্রিকায় এই প্রথম নয়, আরও হয়েছে। যখনই কোন ইউরোপীয় আমাকে পথে এই অবস্থায় দেখেছে, তখনই তারা বলেছে, "That's the clever way to use these Negars."

ওদের কথা শুনে আমার প্রাণ কাঁপ্‌ত।

প্রশস্তি

শ্রীপুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়

সে কোন অতীত দিনে তীর্থপথে যাত্রা হ'ল মোর
নিভৃত পথের প্রান্তে সংশয়িত শঙ্কিত চরণে ;
পথের পাথেয় ছিল প্রভাতের অনুরাগ ডোর
আশা মোর জেগেছিল ধরণীর স্নেহের বন্ধনে।

তারপর দিনে দিনে আমি শুধু চলেছি সম্মুখে
চলার আনন্দ নিয়ে বুকে নিয়ে বিজয়ের আশা ;
থামে নাই গতি মোর জীবনের দুর্য্যোগের দুঃখে,
বাধে নাই কভু মোর অন্তরের অন্তহীন ভাষা।

এ উষার অভিযানে তোমারই শুভ আশীর্ব্বাণী
আমারে করেছ'ধন্য হে পৃথিবী চির সুশ্যামল ;
চরণে দিয়েছে গতি, অন্তরে দিয়েছে নব বল,
তোমারই তরে তাই আনিয়াছি এ সঙ্গীতখানি।

এ অভিনন্দন পত্র লহ তুমি আজি এ প্রভাতে,
যুগের আবর্ত্ত মাঝে এই দান দিনু তব হাতে।

কন্যাকুমারী

শ্রীমতী সুধা চট্টোপাধ্যায়

ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত কুমারিকা অন্তরীপের কুমারী দুর্গামূর্ত্তি বহুকাল যাবৎ পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। কন্যাকুমারী ভারতের সুপ্রাচীন তীর্থস্থান। ইহা পরম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালী ও সৌন্দর্য্যের আকরভূমি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এই তীর্থে যাইবার প্রধানতঃ দুইটী পথ। মাদুরা হইতে ট্রেণযোগে তিনেভেল্লী হইয়া মোটরে ৬৪ মাইল অতিক্রম করিলে, কন্যাকুমারী পৌছান যায়। দ্বিতীয় পথটি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিভান্দ্রাম্ হইতে ৫০ মাইল মোটর-যোগে গিয়া কন্যাকুমারী যাইতে হয়।
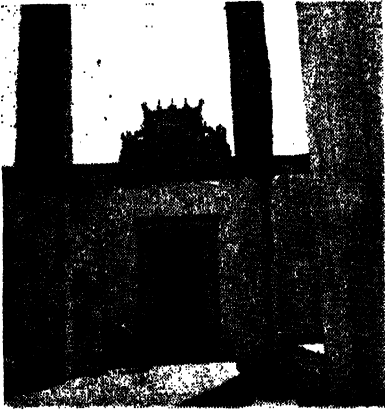
দুর্গা-মন্দির: কন্যাকুমারী

আমরা ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের একদিন নির্ম্মল প্রাতঃকালে ত্রিভান্দ্রাম্ হইতে কুমারিকা অভিমুখে রওনা হইলাম। মোটরের রাস্তাটী বেশ ভাল এবং এ অঞ্চলের পথের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী পরম রমণীয়। কতক রাস্তা জনবহুল বসতির মধ্য দিয়া ও কতক পথ শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কোথাও বা তাল-নারিকেল-কুঞ্জ ও কদলীকানন, কোথাও বা নয়নমুগ্ধকরী পদ্মপুষ্প-শোভিত স্বচ্ছ নীরময় সরোবর পার্শ্বে রাখিয়া আমাদের গাড়ী ছুটিতে লাগিল। প্রতি মাইলে চক্ষুর সম্মুখে ছায়াচিত্রের ন্যায় ঘন ঘন যেরূপ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন একটা স্বপ্নময় কাব্য-জগতের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। আমাদের মোটর যতই কুমারিকার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই হাওয়ার বেগ যে অতিমাত্রায় বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপ অতীব বিচিত্র ও মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়া আমরা অবশেষে ভারত-মাতার চরণপ্রান্তের শেষ বিন্দুটিতে উপনীত হইলাম।

নীলাম্বুরাশি-চুম্বিত এই কুমারিকা অন্তরীপ একটী নির্জ্জন রমণীয় স্থান। ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত তরঙ্গের গর্জ্জনে স্থানটীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া ফেনিল নীলবারি আছড়াইয়া কুমারিকার পদধৌত করিতেছে। উপরে অনন্ত অসীম নীল আকাশ দূরে সমুদ্রের নীল জলে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়াছে। এই মনোহর স্থানে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর কুমারীমূর্ত্তি অতি প্রাচীন যুগ হইতে বিরাজিতা। মন্দিরের পাশেই স্নানের ঘাট। সরল সোপানশ্রেণী জলের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। এই ঘাটের জল শান্ত, মাত্র এক কোমর গভীর। মন্দিরের পূজারী বলিলেন, এই ঘাটে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থের পুণ্য অর্জ্জিত হয়। স্বামী-স্ত্রীতে একই সঙ্গে নাকি স্নান করা বিধেয়। চতুর্দ্দিকে ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত থাকায় এ স্থানে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তেমন নাই। এই বেষ্টনীর বাহিরে স্নান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জলের ধারে কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ ও ঈষৎ হরিদ্রাভ বালি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সঞ্চিত দেখিয়া আমি বিশেষ চমৎকৃত হইলাম এবং কিছু কিছু সংগ্রহও করিলাম। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, গঙ্গা, পদ্মা বা পুরীর সমুদ্রধারের বালির ন্যায় সাদা বালির সঞ্চয় স্থানে স্থানে একরূপ নাই বলিলেই হয়। আমার স্বামী (ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়) এই লাল, কাল ও হলুদে বালির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করিলেন। এ অঞ্চলের সকল স্থানগুলিই নাকি অতি প্রাচীন কল্পের প্রস্তর দ্বারা গঠিত এবং এই প্রস্তরমধ্যে নানা প্রকার মণিকের (রক্তবর্ণ garnet; কৃষ্ণবর্ণ ilmenite; ঈষৎ হরিদ্রাভ monazite প্রভৃতি) সমাবেশ আছে। সমুদ্রতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায়, মণিকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য ঢেউয়ের সাহায্যে

তাহারা এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সঞ্চিত হইতেছে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর বালির উপকারিতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, এগুলি আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমুদ্রতটের স্থানে স্থানে এইরূপ বালির সঞ্চয় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজদরবার সমুদ্রতটের এই বালির ইজারা কয়েকটী কোম্পানীকে দিয়া থাকেন ও ইজারাদার কোম্পানী কিছু শোধনকার্য্য করিবার পর এই বালি বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, উপরোক্ত কৃষ্ণবর্ণ বালি হইতে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সাদা রং প্রস্তুত হয়। হলুদে বালি হইতে এক প্রকার রাসায়ণিক পদার্থ (Thorium nitrate) উৎপন্ন হয় ও ইহা গ্যাস মাণ্টেল (Gas mantle) প্রস্তুতিকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। রক্তবর্ণ বালি শিরিষ কাগজ (garnet paper) প্রস্তুতিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ আলোচনার পর তিনি কলেজের ছাত্রদের দেখাইবার জন্য কিছু বালি সংগ্রহ করিলেন। ঘাটের ও মন্দিরের কয়েকখানি ফটোও তোলা হইল।

আমরা স্নানশেষে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। গর্ভমন্দিরের প্রবেশপথটী ছোট ও ভিতর বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুনিলাম, বহুকাল পূর্ব্বে মন্দিরের সমুদ্রাভিমুখী দ্বারটী সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত ও দেবীর শিরোস্থিত মুকুটের মণির উজ্জ্বলতায় দিক্ নির্ণয় করা হইত। একদা কয়েক জন বিদেশী বণিক্ এই মণির লোভে আকৃষ্ট হইয়া মণিটি অপহরণ করিতে আসে; কিন্তু দেবীর মহিমায় তাহাদের পাপ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তদবধি দ্বারটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দেবীর অচল মূর্ত্তি প্রস্তরে গঠিত এবং ভোগমূর্ত্তি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তিদ্বয় বহু রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিত্য পূজিত হয়। প্রত্যহ পূজার পরে সুসজ্জিত শিবিকায় বহন করিয়া দেবীর ভোগমূর্ত্তিকে বহু আড়ম্বরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রদক্ষিণ করান হয়। নারিকেল, কদলী, মিষ্টান্ন ও পুষ্পাদি ব্যতীত অপর বিশেষ কোন পূজার ফলমূলাদি পাওয়া যায় না। আমরা যখন মন্দিরাভ্যন্তরে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, পূজারী কর্পূর-আরতি করিতেছেন। আমি একদৃষ্টিতে অপলক নেত্রে দেবীর দণ্ডায়মান অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলাম। দেবীর মুখে সরল হাসি ও হাতে বরমাল্য। এ স্থান হইতে আট মাইল উত্তরে সুচিন্দ্রাম্ মহাদেবের আবাসস্থান। প্রবাদ—তিনি দেবীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পরিণীত হইতে চাহেন। দেবীর সম্মতিক্রমে বিবাহের লগ্নও স্থির হইয়া যায়। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে দেবীর মত শেষ মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়। শিব বহু চেষ্টা করিয়াও দেবীর চিত্ত জয় করিতে অকৃতকার্য্য হন। ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া শিবানুচর নন্দী-ভৃঙ্গী বহু উৎপাত আরম্ভ করে ও উৎসবের চাউল আদি সমস্ত দ্রব্য সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করে। সেই কারণেই

সমুদ্রস্নানের ঘাট: কন্যাকুমারী

কুমারিকার সমুদ্রতটের কতক বালির আকৃতি আতপ তণ্ডুলের ন্যায় বলিয়া জনশ্রুতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পূজাশেষে দেবীর চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া আমরা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলাম। এই পবিত্র স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহিমায় ও দেবীর হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তির অপূর্ব্ব রূপে অভিভূত হইয়া কন্যাকুমারী তীর্থ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই পুণ্য তীর্থদর্শনে প্রাণে যে প্রচুর তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও অন্তরে শিহরণ তোলে। কন্যাকুমারীর কাব্যময় নৈসর্গিক দৃশ্য এখনও আঁখি মুদিলে চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। সত্যই মনে হয়, আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

যোগজীবন

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতীয় শাস্ত্র ও সাধনা তথা বিশ্বমানবের জীবন ও দর্শনের মূল মর্ম্ম কত সহজ ও সুন্দরভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "বঙ্গলক্ষ্মী" হইতে উদ্ধৃত নিম্নের রচনাটুকু হইতে বোধগম্য হইবে।

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্ম্মসাধনার একটা বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটী বিশেষ দিক্ আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটী বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্য-সাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেছে, সন্দেহ নাই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিমদেশবাসীরা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করছেন, তাতে তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষের একটি বিশেষ শক্তি দান করছেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট হয়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে সাধনার ধারা ভারতের চিত্ত-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশতঃ লুপ্ত হোতে দেই, তাহলে আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্যকেও বঞ্চিত করবো।

সাধারণতঃ পশ্চিমের মানুষ বলে থাকে, চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিষ কিছু আছে কিনা, সে সম্বন্ধে সেখানে সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে নেওয়া, চল্‌তে চল্‌তে টুকরো টুকরো জিনিষ জমিয়ে তোলা—এইটে হচ্চে সেখানকার কথা। সেখানকার বন্দোবস্ত রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে চলা, ঘরের বাতি জ্বালানো নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলে এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম সত্যে পৌঁছবার প্রণালীটি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল; সেটি কী, তা এই যোগ শব্দের দ্বারাই জানা যায়; সেই কথাটাকে একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া চাই।

যে সত্যকে মানুষ সাধারণতঃ ঈশ্বর নাম দিয়ে থাকে, সেই সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের বিধিকেই আমরা ধর্ম্ম বলি।

কোনো কোনো ধর্ম্মে বলে, এই সম্বন্ধের বিশুদ্ধিতা অনুসারে আমরা পুরস্কার পেয়ে থাকি। সেই পুরস্কারকে কখনো পুণ্য বলি, স্বর্গ বলি, কখনো পরিত্রাণ বলি। যা-ই বলি না কেন, এর একটা বাহ্য মূল্য আছে।

ঈশ্বর বিধাতা, তাঁর বিধান পালন দ্বারা আমরা তাঁর প্রসন্নতা পাই; সেই প্রসন্নতাই আমাদের কল্যাণ। অতএব বিধাতার বিধানপালনের যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করবার একটা হিসাব পাওয়া গেল।

এই পন্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পন্থার এক জায়গায় মিল আছে। বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ এই যে, বিশ্বের অমোঘ নিয়মগুলিকে যদি আমরা জানি এবং তাদের যদি মানি, তা'হলে শক্তি লাভ করি, ঐশ্বর্য্য লাভ করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে দণ্ড পুরস্কারের ভয়ে ও লোভে দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওয়া পাওয়া হচ্ছে বস্তু-নীতিগত, আর ধর্ম্মক্ষেত্রে সেটা কর্ত্তব্য-নীতিগত। ধর্ম্ম বিহিত এই কর্ত্তব্যনীতি কোথাও শাশ্বত সত্যের অনুগত, কোথাও কৃত্রিম আচারগত। যেখানে তা শাশ্বত সত্যের বিরোধী নয়, সেখানে মানুষ তা পালন করে কল্যাণ লাভ করে, যেখানে তা কৃত্রিম আচারমাত্র, সেখানে তাকে আশ্রয় করে মানুষ দুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে পদে-পদে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। এই আচারকে ধর্ম্ম বলা আর যাদুবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা একই কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষ যাকে পরম সত্য বল্‌ছে, যাতে উত্তীর্ণ হবার প্রণালী হচ্ছে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নাই, হওয়ার সম্বন্ধ। বস্তুত সত্য হওয়া ছাড়া সত্যকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

মানুষের দুটো দিক্। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সে বিশ্বতন্ত্র। আহারে ব্যবহারে সঞ্চয়ে কর্ম্মচেষ্টায় এই স্বাতন্ত্র্য আমাকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। একে বাঁচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মানা চাই। নইলে চারিদিকের টানে ধূলিসাৎ হতে হবে। এই নিয়মকে আপনার আয়ত্ত করে, স্বাতন্ত্র্যকে বলিষ্ঠ করে তোলা য়ুরোপের স্বভাবগত। এতে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ক্রমাগত তাকে বোঝা-পড়া করতে হয়।

ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে ঝোঁক দিয়েছে যে দিকে মানুষ বিরাট। এই যে বিশ্বের মধ্যে আমি বিরাজ করছি, একে যে পরিমাণে আপন না করবো সেই পরিমাণেই আমি অসত্য থাক্‌ব। সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করে তবে আমার পূর্ণতা হবে।

সেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আয়তনের দ্বারা বিশ্বকে অধিকার করা। সেই আয়তনের দিকে সীমার কোথাও শেষ নাই। বস্তুত অফুরান সীমা অসীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ।

একখানা গ্রন্থকে তার বস্তুর পরিমাণ আর শব্দপরিসরের দ্বারা পরিমাপ করতে গেলে সেই বোঝা দুঃসাধ্য বৃহৎ হয়ে পড়ে। তার মূল তত্ত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায়। যা কিছু সমস্তর মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্ছে যোগ। কিন্তু পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাকে ওতঃপ্রোত করে এবং অতিক্রম করে যে সত্য বিরাজ করেন, সেই ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশই যোগের লক্ষণ।

প্রণবো ধনুঃ সারোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

এই যে যোগ, এ মনের কর্ম্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের ভেদ ঘটিয়ে সংসারযাত্রার কাজ চালায়। যোগসাধনের প্রধান অঙ্গই হচ্ছে মনকে ভোলা। যারই সঙ্গে যোগে মনের ব্যবধান ঘুচে যায়, তারই সম্বন্ধে আত্মার গভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আত্মা বাধামুক্তরূপে সেখানে আপনাকে প্রসারিত করে।

আত্মার এই যোগের পথে মনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কিছু অর্জ্জনে মন কর্ত্তা নয়, উপলব্ধিতে মন কর্ত্তা। যাকে আমরা বাইরে রাখি তাই অর্জ্জন, যা অন্তরের জিনিষ তাই উপলব্ধি। এই অর্জ্জনের রাজ্য হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রের রাজ্য। এখানে সংখ্যা এবং আয়তন এবং ওজন। এখানে সংগ্রহ করা এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের পথে এগোতে থাকে। কোথাও তার পর্য্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে সে দশ শতের এবং দশ শত লক্ষের দিকে অঙ্কের মত চল্‌তে থাকে।

উপলব্ধির রাজ্য হচ্ছে পরিমিতির অতীত রাজ্য। সেজন্য সেখানে পৌঁছানোর মধ্যে সমাপ্তি আছে অথচ সমাধা নাই। সেখানে আত্মা পূর্ণতার স্বাদ পায়। এই পূর্ণতার অব্যবহিত অনুভূতিই আনন্দ। তারই কথা উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম.এ, পি.এইচ-ডি

৬

ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রথম যুগের বৈষ্ণব নেতারা ভক্তদের অন্য দেবদেবীর পূজাদি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দীনেশবাবু ইহাকে অনুদারতা বলিয়াছেন।[১] কিন্তু "হরিভক্তি বিলাস" নামক বৈষ্ণবস্মৃতি* এই নিষেধটি প্রাচীন বৈষ্ণব পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিজের মধ্যে চালাইয়াছেন। যেমন স্কন্ধ পুরাণ বলিতেছে, "অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চন্দ্রায়ণ করিতে হয়।" পদ্মপুরাণ বলিতেছে, "বুদ্ধিমান বৈষ্ণব অন্য দেবতার নৈবেদ্য বা পানীয় গ্রহণ, স্পর্শ বা ভক্ষণ করিবে না।" নৃসিংহ পুরাণ—বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ না করে, কেশব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন।" অন্যপক্ষে নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে, "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনও সংসার মুক্তির অপর একটি প্রধান কারণ।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পারস্পারিক উচ্ছিষ্ট খাবার প্রথা আছে। ভূঁইমালী জাতীয় ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সপ্তগ্রামের রাজার ভাই ভক্ষণ করিতেন। চৈতন্য প্রভু এতে আপত্তি করেন নাই। পুরীতে রঘুনাথদাস গোস্বামী সাধক অবস্থায় পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইতেন। চৈতন্যদেব তাহাতেও আপত্তি করেন নাই। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে চৈতন্যদেব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বৈষ্ণবের অন্নদোষ মনে নাহি দ্বিধা"। কিন্তু পশ্চিমের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা এইজন্যই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের অতি ঘৃণা করেন। বৃন্দাবনে লেখকের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে একজন পশ্চিমা বৈষ্ণব বাবাজী (ইনি একটি সম্প্রদায়ের নেতা) বলিয়াছিলেন,—"বাবুজী, বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা পরের ঝুটা খায় কেন?[২] এ বিষয়ে লেখক একটি প্রবীণ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি পরলোকগত চরণদাস বাবাজীর একজন শিষ্য। তিনি বলিলেন, "আমার গুরুই এইটি প্রবর্ত্তন করিয়া

১। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩০১
* শ্রীরাধানাথ কাবাসী সঙ্কলিত—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ১ম খণ্ড
২। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত—"সাধু চতুষ্টয়" দ্রষ্টব্য

গিয়াছেন। আমরা জনকতক আপত্তি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমাদের ভক্তি নেই!" কিন্তু আমরা দেখি যে, এই বিধান প্রথম থেকেই ছিল, যদিচ ইহার সার্ব্বজনীনতার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এই অভ্যাস দ্বারা যে একটা কুৎসিৎ প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। লেখক একবার পশ্চিমবঙ্গের নবশায়ক জাতীয় বৈষ্ণব বংশীয় একটি যুবককে অবৈষ্ণব ও বিভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখেন। ইহার ফলে সকলেই হৈ-হৈ করিয়া তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। লেখক যখন অন্য সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, এই লোকটি উচ্চজাতীয় এবং বোধহয় দীনতা-সুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই এই কর্ম্ম করিতেছেন, তখন লেখকের এই যুক্তি কেহই মানে নাই। এই ঘটনাটি ১৯০৮ সালে ভাগলপুর জেলে ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে আর কতকগুলি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—যেমন নিরামিষভোজন। লোকনাথ ঠাকুর নরোত্তম দাসকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে শিষ্য করেন:

"তবে কহে বিষয়েতে বৈরাগী হইবা,
অনদ্বাহ উষ্ণ চালু মৎস্য না খাইবা।" ৩

তৎপর দীক্ষামন্ত্রগ্রহণের নিয়ম হইতেছে এই যে, মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না, কিন্তু "রোগাদির জন্য কখনও মাংসভোজনের আবশ্যক হইলেও কচ্ছপ ও শূকর মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবে না।"৪ আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, মহারোগী শশক ও শূকর মাংস ছাড়া অন্য মাংস খাইতে পারে।* "হরিভক্তিবিলাসের" অনুজ্ঞানুযায়ী বৈষ্ণবের নিকট তুলসী গাছ পবিত্র। প্রাচীন বৈষ্ণবদের কাছেও তুলসী গাছ তদ্রূপই ছিল। ইহাকে প্রাচীন totem-এর চিহ্নস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। মহেনজো-দাড়োতে অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং বিভিন্ন জন্তুর পূজার চিহ্ন পাওয়া যায়। বেদেও অশ্বত্থবৃক্ষমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। কাজেই কোন একটি বিশিষ্ট বৃক্ষের বা লতার পবিত্রতাকে উপরোক্ত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ বলিয়াই গণ্য করা বিধেয়। তৎপর "হরিভক্তি বিলাসে" "শালগ্রাম শিলার" পূজার ব্যবস্থা আছে সকল বর্ণের:—'স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক, কিম্বা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদি হউক শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠলাভ করিবে'। অতএব স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা বিষয়ক যে-সমস্ত নিষেধ বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায় তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন, "ওই সকল নিষেধ বচন অ-বৈষ্ণবের পক্ষে, বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে নয়"।৫ কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য তাঁহার পূজিত শালগ্রাম শিলাকে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে পূজার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল কথা উঠিয়াছে যে, 'হরিভক্তিবিলাসের' এই অনুজ্ঞা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তকেই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। আজকাল কিন্তু শূদ্র বৈষ্ণব শালগ্রামশিলা নিজে পূজা করিতে পারেন না। অথচ দেখা যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্মে অনেক স্থলেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ব্যক্তিগত আচরণ ধর্ম্মগত অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এইজন্য "হরিভক্তিবিলাসে"র অনুজ্ঞা অযৌক্তিক নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম যুগে সনাতনী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সর্ব্ব বিষয়েই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। হরিভক্তিবিলাস হিন্দুর জীবনে সমস্ত-বিষয়েই নূতন ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছে। এই যুগের সনাতনীদের তরফ হইতে লিখিত রঘুনন্দনের "অষ্টা-বিংশতিতত্ত্বের" সহিত তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। বৈষ্ণবদের এই স্মৃতি সনাতনীদের স্মৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের অনুজ্ঞা অনুসারেই ইহা লিখিত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আসরে নামিয়াছিল। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় আছে,—

"তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছেন পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন,
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে সেই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিতপূরণ।"

৩। শ্রীমৎ মনোহর দাস—"অনুরাগবল্লী" ৪র্থ মঞ্জুরী পৃঃ ৬৬
৪। শ্রীরাধানাথ কাবাসী—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২
* শ্রীরাধানাথ কাবাসী—শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার, কার্ত্তিক ব্রত পৃঃ ২৯৪—২৯৫
৫। শ্রীরাধানাথ কাবাসী—শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৭

আবার দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় আছে, "জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে, দেবতা, অসুর, ঋষি সকলেই সমানে"। পুনশ্চ দীন কৃষ্ণদাসের পদাবলীতে আছে, "ব্রাহ্মণে যবনে মিলি, করাইল কোলাকুলি, পরতেকে চাহ একবার"।[৬] আবার নরহরি দাস বলিতেছেন, "অনুপম গোরা অবতার, নবধা ভকতি বহে বিস্তারিয়া সব দেশে, না করিল জাতির বিচার"।[৭] আবার শেখর দাস বলিতে-ছেন, "বিষয়েই যবন যত, তারা হইল উন্মত, না হইল পড়ুয়া অধম"[৮]; "সুরধুনী যাইঞা ভাসাইব কুলক্রিয়া, তবে ভজিব সে গোরা কুলমণি"।[৯] এইসব বিবরণাদি হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রথমযুগের spirit বুঝা যায়।

৬। "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী"—পৃঃ ১০

৭। "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী"—পৃঃ ২৮

৮। ঐ —পৃঃ ২৮

৯। ঐ —পৃঃ ১০৮

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

আজ দিকে দিকে বাংলার জাতীয় জীবনে লেগেছে দোল। শতাব্দীর ভাঙাগড়ায় যাঁরা নূতন সৃষ্টির ঢেউ জাগিয়েছেন, জাতি সমবেতভাবে পূজা ক'রবে তাঁদেরই। বাঙালীর কৃষ্টি ও বাঙালীর সভ্যতার এই হিল্লোলিত প্রবাহে জেগে উঠেছে মানবতার প্রাণ। মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে তাঁদের আয়ুঃ বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে। সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে নূতনের জয়গান, তরুণ ভারতের শঙ্খনাদ। জীবনের জন্ম সূচনা ও স্থিতিতেই নয়, বিকাশের পূর্ণ উচ্ছল গতি তরঙ্গায়িত হ'য়ে যখন বৈচিত্র্যকে ডেকে আনে, তখন প্রাণ-প্রাচুর্য্যের আবেদনে ভ'রে ওঠে তা'র গতির সচল প্রবাহ।

বড় আশা, বড় গর্ব্ব বাঙালীর বুকে সাহস দিয়ে চলেছে এই বিংশ শতাব্দী। সমগ্র ভারতে বাঙালীর প্রাণ যুগিয়েছে আগে চলার প্রেরণা, এ কথা অস্বীকার্য্য নয়। নবযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জাতি যখন চলার পথে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়াল, তখন বাঙ্‌লার মনীষা সৃষ্টি ক'রল চ'লতি যুগ হ'তে ভাবী জীবনের নবীন পথ—যে পথ সম্মুখে চলাতে জানে ও চ'লতে পারে। এমনি সময়ে আমরা পেলাম শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একজন সত্যকারের শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিভা। কি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, অতীতদর্শী সভ্যতার গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে, অথচ মৌলিক রূপ নিয়ে নূতনত্বসৃষ্টির প্রকাশমান রূপরেখায় তিনি ফুটিয়ে তুল্‌লেন চিত্রের জীবন্ত সম্পদ্‌ আত্মসম্বেদনের মন্ত্রে উচ্ছলিত তুলির রেখায় ও স্পন্দনে ভাবের মূর্ত্ত বিকাশকে ফুটিয়ে তুল্‌লেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু বাংলার ন'ন, ভারতের শিল্পি-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান যুগের মনীষী। নীরব সাধনায় মূক ও মৌন চিত্রপটে যে জীবন্ত ভাষা থাকতে পারে, তিনি তা দেখিয়ে দিলেন। 'সাজাহানে'র মৃত্যুর মধ্যে নিজ কন্যার স্মৃতি উদ্বেলিত হ'য়ে নামান্তরিত হ'ল, লোকে জান্‌ল শিল্প-বিকাশের ধারা—অথচ যে গোপন দরদী মন হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি ও আন্তরিকতায় স্বকীয় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুললেন তা' শুধু বুঝ্‌লেন তিনি। 'মা' চিত্রখানির যে প্রাণস্পর্শী আবেদন, তার মধ্যেও আছে তাঁর স্বকীয় জীবনের স্পর্শ।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতের সর্ব্বোত্তম আধুনিক শিল্পী—এ কথা জেনেছিলেন মহামনীষী কবিসম্রাট্‌ রবীন্দ্রনাথ। মনীষীর সংস্পর্শে প্রতিভাবানের যোগ্য সমাদর ঘটেছিল। ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুত নন্দলাল বসু, আচার্য শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ দেশবরেণ্য গুণী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সুযোগ্য ছাত্র।

আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘায়ুঃ কামনা করি। আর, প্রার্থনা করি—তিনি দীর্ঘদিন বাধামুক্ত থেকে জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করুন। তাঁহার অবলম্বিতরূপায়ণ জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুচালিত করুক—ইহাই আমাদের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

মেঘ ও সূর্য

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুড়ি

আঃ!—পরম একটি নিশ্চিন্ততায় বিদ্যুৎ পৌছতে পারলো এবার। কে বলে ঈশ্বর নেই, কোন্ মূঢ়? জীবনে যখন সমস্ত পরিস্থিতি—সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অভিশাপের মত ঘনো হ'য়ে আসে চারদিকে, তখন তিনিই হাত বাড়িয়ে দেন, তাঁর পরম কল্যাণময় একটী ইংগিত, একটী সুন্দর পথ নির্দ্দেশ!

চিঠিটা বিদ্যুৎ আবার পড়ল, লেখা দেখেও যেন তার প্রথমে বিশ্বাস হয় নি, বার বার সে পড়েছে। পরেশ, স্কুল-জীবনের সেই পুরোণো বন্ধু, আজ তার কী উপকারই না করলো! চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাক্‌বে বিদ্যুৎ! কে জানতো বিদ্যুতের ভাগ্যবিধাতা এই পথেই নেমে আস্‌বেন একদিন! তাই প্রথমে বিদ্যুৎ বিশ্বাস করতে পারেনি, অবিশ্বাস আর অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে গেলো বিদ্যুতের জীবনে। পরেশ তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ নিঃশেষে অর্পণ করেছে বিদ্যুতের জনহিতায় ব্রতসিদ্ধির উদ্দেশে।

পরেশ লিখেছে, বিদ্যুতের উদার আদর্শবাদ, তার চিন্তা তাকে মুগ্ধ ক'রেছে—সে একান্তভাবে প্রার্থনা জানিয়েছে যে, বিদ্যুৎ যদি তাকে তার পাশে দাঁড়াবার অধিকার দেয় তাহ'লে সে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বে। কিছুদিন থেকে সে একটা গভীর আকর্ষণ উপলব্ধি করছিল হিমালয়ে যাবার, আজ সময় এসেছে—বিদ্যুৎ যদি আসে, তাহ'লে সে কৃতকৃতার্থ হ'বে—বিদ্যুতের সমস্ত জনসেবার, সমস্ত বিশ্বের বিরাট্ কল্যাণের কার্য্যে সে সাহায্য করবে।

বিদ্যুৎ যেন এই চাইছিল। এতদিন ধ'রে সে এরই জন্যে যেন অপেক্ষা করেছিল—ঈশ্বরের উন্মুক্ত আশীর্ব্বাদের মত পরেশের চিঠিখানা আজ তার কাছে এসেছে। আঃ এবার সে প্রাণভ'রে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

বিদ্যুৎ উঠে বস্‌লো। কাল—কাল ভোরেই তার ট্রেন!

আবার সেই কালো আর ভারী লোহার গেট্ টেনে বিদ্যুৎ ভেতরে ঢুকলো। চারদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। কেউ নেই। বারান্দা দিয়ে ও ওপরে উঠ্‌লো, বাইরের ঘড়িটা সেইভাবেই চল্‌ছে—খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুত দরজা ঠেল্‌লো।

দরজার দিকে চেয়ে গার্গী বল্‌লে, "আর একটু পরে এলে হয়তো দেখা পেতে না।"

বিদ্যুৎ দরজার ধার থেকে এগিয়ে গেল। চারদিকে বিছানাপত্র সমস্ত বাঁধা—দুটো ট্রাঙ্ক, নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় র'য়েছে।

"একী, কোথায় চল্‌লে তুমি?" বিদ্যুৎ থম্‌কে দাঁড়ালো একপাশে।

"কাশীতে"—ড্রয়ার থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা গার্গী বার ক'রে নিলে, চাবীর গোছাটা নিয়ে ভুলে আঁচলে বাঁধতে গিয়েছিল—খুলে হ্যাণ্ডব্যাগে ভরলে, তারপরে হাস্‌লো একটু, বল্‌লে, "কয়েক দিন আগে দিদাকে মঞ্জুদির সঙ্গে কাশীতে পাঠিয়ে দিয়েছি—আজ সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে সেখানে চল্‌লাম। কুমারী-কল্যাণের ওখানকার শাখাকেন্দ্রের আমি এখন সম্পাদিকা। আভাও এসেছে ওখানে!"

"ও—" বিদ্যুৎ কোন রকমে উচ্চারণ করলো, "আর এই বাড়ী?"

"বাড়ী?" গার্গী বিদ্যুতের চোখের দিকে চাইলে, ওষ্ঠপুটে হাসির রেখা টেনে বল্‌লে, "বাড়ীর আর ভাবনা কি? কাল টেনাণ্ট আস্‌ছে, চাকর রইলো, মালী রইলো—আমি সবই ঠিক ক'রে দিয়ে গেলাম।"

"দীনবন্ধু—" গার্গী বারান্দার ওপরে গিয়ে ডাক্‌লো, "তুমি ট্যাক্সি নিয়ে এস, আমার সব ঠিক হ'য়ে গেছে।"

"যাচ্ছি দিদিমণি!" দীনবন্ধু উত্তর দিলে।

গার্গী আস্তে আস্তে আবার বারান্দা থেকে ফিরে এল।

"এখনি যাবে?—ক'টায় ট্রেণ তোমার?" বিদ্যুৎ বল্‌লে।

"সাড়ে আট্‌টায়—" রিষ্ট ওয়াচের দিকে গার্গী চাইলো একবার, "ডেরাডুন এক্‌স্‌প্রেস্‌—!"

"ও—"আচ্ছন্নের মত বিদ্যুৎ কথা কইলে। বিদ্যুতের যেন সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেছে। কেমন একটা অসহায় মূক দুর্ব্বলতা তার সমস্ত শরীরে মনে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

গার্গী একটা কৌচের ওপরে এসে বস্‌লো। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত্ত পার হ'ল। তারপরে, সবার প্রথমে গার্গীই কথা বল্‌লে, "হঠাৎ এলে যে, কোনো দরকার ছিল আমার কাছে?"

"হ্যাঁ,—" আস্তে বিদ্যুৎ বল্‌লে, "আমিও যে জানাতে এসেছিলাম, যে আমিও চ'লে যাচ্ছি।"

"চলে যাচ্ছ, কোথায়?"

"হিমালয়,—আমার ডাক এসেছে!"

"ডাক এসেছে?" প্রতিধ্বনি করলো গার্গী। তারপরে আস্তে বল্‌লে, "বুঝেছি"—তারপরে চুপ করে গেল।

বিদ্যুৎ কি বল্‌তে যাচ্ছিলো, বাধা পড়্‌লো। দীনবন্ধু এসে ঘরে ঢুকলো, বল্‌লে, "গাড়ী এসে গেছে দিদিমণি—"

"চল—" গার্গী কৌচ থেকে উঠে দাঁড়ালো, "মালীটাকে ডাক্‌—এইগুলো নিয়ে যেতে হ'বে" ট্রাঙ্ক আর বিছানাপত্রগুলি দেখিয়ে গার্গী বল্‌লে।

দীনবন্ধু নীচে নেমে গেলো।

"কবে, তুমি ফিরছো?" বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো।

"আমি?" গার্গী বিদ্যুতের দিকে চাইলে, "আমিতো আর এখন ফিরছি না—ওখানে থেকেই আমাকে কুমারী-কল্যাণের প্রচার করতে হবে।" একটু থেমে বল্‌লে, "আমারও অনন্ত সেবাব্রত বিদ্যুৎ—আমি তোমার মধ্য দিয়ে আজ নিজেকে চিনেছি। ভবিষ্যতে তোমার সাধনাই আমাকে পথ দেখাবে।"

বিদ্যুৎ চুপ করে রইলো।

দীনবন্ধু আর মালী এসে একে একে সব জিনিষগুলিই নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলো। গার্গী বল্‌লে, "আমার সময় হ'য়ে গেছে—এবার রওনা হওয়া দরকার।"

"চলো—" বিদ্যুৎ বারান্দার দিকে পা বাড়ালো, "আমিও যাবো।"

"কোথায় যাবে?"

বিদ্যুৎ হাস্‌লো, উত্তর দিলে না।

"না—" গার্গী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "অনেক—অনেক দূর এসেছ—অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছ বিদ্যুৎ, আর নয়।"

ধীরকণ্ঠে বিদ্যুৎ বল্‌লে, "আমি যদি সে ক্ষতিকে স্বীকার না করি?"

"পাগল—" গার্গী সামান্য একটু হাস্‌লো, "কেন অবুঝ হ'চ্ছ—তোমার যে কী মূল্য, তা কি আমি জানি না। আমার জন্যে তা নষ্ট হ'বে, এ আমি সহ্যও করতে পারবো না বিদ্যুৎ। তুমি মহীয়ান্ হ'য়ে ওঠো, তুমি বরণীয় হ'য়ে ওঠো, তাইতেই আমার গর্ব—"

"গার্গী"—বিদ্যুৎ গার্গীর হাত চেপে ধরলো।

"দিদিমণি—নীচ থেকে দীনবন্ধু চীৎকার ক'রে ডাকলো—"দেরী হ'য়ে যাচ্ছে"—

"যাচ্ছিরে"—গার্গী আস্তে বিদ্যুতের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলে—তারপরে নীচে নাম্‌তে আরম্ভ করলো। বল্‌লে "এস—"

ট্রেণে মোটেই ভিড় ছিল না, ওদিকে একজন ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা ব'সে আছেন—দুটী ছোট ছোট মেয়ে তার সংগে, আর সমস্ত গাড়ী খালি।

কুলীরা গার্গীর জিনিষগুলি ঠিক্‌ভাবে সাজিয়ে রেখে দিলে। তখনো গাড়ী ছাড়বার মিনিট পাঁচেক দেরী। বিদ্যুৎ গার্গীর পাশে এসে বস্‌লো।

"গার্গী—একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি, আর সময় নেই—আমার এখনই বলা উচিৎ" বিদ্যুৎ সোজা হ'য়ে বস্‌লো—"জীবনে আবার একথা বলার সুযোগ হয়তো নাও আস্‌তে পারে।"

সামান্য একটু হাস্‌লো গার্গী, কথা বল্‌লে না। "আমি জানি" বিদ্যুৎ অতি ধীরে কথা কইলে, "আমি কী করেছি, তোমার কাছে আমি কী নিদারুণ অপরাধী, তবু আজ—আজ ক্ষমা চাইলাম, জানি এ আমার মূঢ়তা, তবু

চাইলাম—নিজেকে তুমি ব্যর্থ ভেবো না কোন দিন, যদি একদিন সেই সময় আসে, তাহ'লে আবার দেখা হ'বে, তখন দেখ্‌বে আমার সমস্ত জীবনের এক দিগন্ত হ'তে অন্য দিগন্তে তোমারি আলো লুটিয়ে প'ড়েছে, তুমিই আমাকে মহামহিমান্বিত ক'রেছো গার্গী! তুমি!—তোমার ভালবাসা!"

গার্গী হাস্‌লো, বল্‌লে, "আমি তা জানি বিদ্যুৎ, আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি, তুমি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ?"

গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়লো—বিদ্যুৎ সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো—আর একবার গার্গীর মুখের দিকে চাইলে, বল্‌লে, "আজকের দুঃখকে মনে রেখো না।"

"না—" গার্গী আবার হাস্‌লো।

"আমারো একটা কথা ছিল—" গার্গী বিদ্যুতের আরো কাছে এগিয়ে এল, "একটা চিঠি লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম পরে পাঠাবো। কিন্তু যখন দেখাই হ'ল, তখন তোমার হাতেই দিই। এখনি পড়ো না, বাড়ী গিয়ে খুলো।"

বিদ্যুৎ হাতে ক'রে চিঠিটা নিলে, তারপরে আস্তে সে গার্গীর হাতটা চেপে ধরলো, "সত্যি—কী নরম—কী নরম তোমার হাত গার্গী?"

শেষ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো, আর তারপরে তীব্র হুইস্লের সংগে সংগে ট্রেণ দুলে উঠ্‌লো, গার্গী কী বল্‌লো বোঝা গেল না। শুধু কাণে এল, "নেমে পড়'—নেমে পড়' বিদ্যুৎ!"

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো—গার্গীর কপালের ওপরে কয়েকটা চূর্ণ কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে—চোখে তার অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টি! অপরূপ দেখাচ্ছে গার্গীকে, বিদ্যুৎ আর একবার চাইলে—তারপরে বল্‌লে, "আচ্ছা।" তারপরে বিদ্যুৎ আর পিছনের দিকে চাইলো না। আস্তে, আল্‌গোছে সে নিজেকে প্ল্যাট্‌ফরমের ওপরে ছেড়ে দিলে। দেখলে না পিছনে তার সেই ধাবমান ট্রেন—পিছনে তার সেই ধাবমান জীবন!

এখানে আমাদের আরো একবার পট-পরিবর্ত্তন হ'ল। এবার বিদ্যুৎ একলা। মেসের সেই ছোট ঘর। রাত অনেক। টিম্ টিম্ ক'রে তার সেই লণ্ঠন জ্বল্‌ছে। ঘরের দরজা বন্ধ! কাল সকালেই ট্রেণে যাবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়ে রয়েছে। জান্‌লার ধারে ছোট্ট একটা টেবিলের ওপরে বিদ্যুৎ লিখছে। মাথা তার ঝুঁকে পড়েছে কাগজের ওপরে। একাগ্র মনে সে লিখে চ'লেছে।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে বিদ্যুৎ একবার কলম থামালে। আঃ! আজ কী বেগ এসেছে তার লেখায়—কী অসম্ভব গতিতে সে লিখছে!

তারপরে অনেকক্ষণ লিখলো বিদ্যুৎ—তারপরে কলমটা অবশ হ'য়ে এল—ঘুমে বিদ্যুতের সমস্ত চোখ যেন জড়িয়ে আস্‌ছে।

হঠাৎ দেখলো সাম্‌নে গার্গী দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তার সমস্ত চুল এলোমেলো। মুখে তার কেমন যেন একটা রূঢ়তা নেমে এসেছে—নির্ম্মম দৃষ্টিতে তার দিকে যেন গার্গী চেয়ে আছে।

কলমটা গড়িয়ে টেবিল থেকে নিচে প'ড়ে গেল। বিদ্যুৎ সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো।

সাম্‌নে জান্‌লা খোলা, ওপরে অনন্তবিস্তৃত নীল আকাশ। কতোগুলো তারা উঠেছে—চাঁদটা ঘোলাটে, সমস্ত অন্ধকার রাত্রি যেন সেই চাঁদকে ঘিরে কাঁপছে।

বিদ্যুৎ আবার কলম তুলে নিলে। মল্লিকাকে মনে পড়ছে। তার সেই চূর্ণ কুন্তল, তার সেই আত্মসমর্পণের সহজ আর সংকুচিত ভংগী।

মল্লিকা দেবী! তুমিও বিদ্যুৎকে ভুলো! তুমিও কেন যে ছায়া ফেল্‌লে তার জীবনে, তোমরা কি বোঝো না বিদ্যুতের কী তীব্র অন্তর্বেদনা! তোমরা বড় স্বার্থপর! নিজেদেরকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবতে পারো না, আজ যে বিদ্যুৎ তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাতে তোমাদের একেবারেই ভ্রূক্ষেপ নেই!

আর রেবা! রেবাও যেন তাকে ক্ষমা করে। যে আশা নিয়ে সে এগিয়ে এসেছিল তাতে বিদ্যুৎ নির্ম্মভাবে বাধা দিয়েছে। কিন্তু—কিন্তু বিদ্যুৎ এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারতো!

তারা তো জানে না বিদ্যুতের সাম্‌নে কি জ্বল্‌ছে, সেই গৌরীশঙ্করের গগনস্পর্শী সূর্য্যালোকিত শিখরদেশ, সে

যেন তারই দিকে এগিয়ে চ'লেছে, একদিন দেখলে সে সেখানে পৌছেছে। তার মাথায় জ্বল্‌ছে সেই সোণার মুকুট, ঠিক্‌রে পড়ছে তার হীরকদ্যুতি—ঝলসে যাচ্ছে সেই আলোতে সমস্ত ভারতবর্ষ। বিদ্যুৎ সেদিন গৌরবান্বিত, বিদ্যুৎ সেদিন সার্থক!

তারপরে সে আরও এগিয়ে যাবে—তার যাত্রাপথ ক্রমশঃ প্রসারিত—কোথাও থামেনি—কোথাও নামেনি—কোথাও বাধা দেয়নি। সে এগিয়ে চলেছে! মল্লিকা দেবী, তোমার ঋণ কি বিদ্যুতের জীবনে ভুলবার! তুমি তাকে ক্ষমা ক'র। এইটুকু প্রার্থনাই শুধু সে আজ তোমার কাছে রেখে গেলো।

সাম্‌নে গার্গীর চিঠিটা খোলা প'ড়ে র'য়েছে। বিদ্যুৎ আবার পড়লে:

"বিদ্যুৎ,

আমাদের আপাততঃ এই শেষ চিঠি—জীবনে হয়তো আর কোনো চিঠির প্রয়োজন নাও হ'তে পারে; আজ একটা কথা মনে পড়েছে, তারই জন্যে লিখ্‌লাম। অনেক দিন আগে তোমার একটী কবিতা পড়েছিলাম। জীবনকে তুমি মেঘের সংগে মিলিয়েছিলে তাতে, আর দৈহিক ভালবাসাকে বলেছিলে স্বপ্ন;—আজ এই যাওয়ার আগে ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌লাম, তোমার কথার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। জীবনটাই আমাদের সব, ভালবাসা সেখানে কতটুকু—সে তো স্বপ্নের মতই একদিন সামান্য রেখা রেখে উধাও হয়—কারো বা সে রেখা পড়ে—কারো বা সে রেখা পড়ে না। জীবনের পড়ন্ত-বেলায় মৃত্যুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ কথা ভেবো, বুঝ্‌বে তুমি কত সত্যি কথাই বলেছিলে একদিন। ইতি—

তোমারই গার্গী।

বিদ্যুৎ চোখ তুল্‌লে। গার্গী, এ তুমি কী লিখেছো। তুমি শুধু তোমাকেই দেখলে—আমাকে দেখলে না? আমার সাম্‌নে যে কি বিরাট্ আদর্শ তাতো তুমি জানো! আর জানো, প্রতিদিন আমি তোমারি মত প্রার্থনা ক'রে এসেছি, "অসতো মা সদ্‌গময়ঃ—তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ!"

গার্গী, আমার প্রার্থনা কি কোনো দিন ফুল হ'য়ে ফুটে উঠবে না? আর তারপরে আমি এগিয়ে যাব! আঃ, সেই দিন—সেই দিন আমার কবে আসবে? পার হ'বো মরু প্রান্তর, পার হ'বো অরণ্য বিভীষিকা—পার হ'ব সমস্ত বেদনা—সমস্ত অভিযোগ। যাত্রা আমার লোক হ'তে লোকান্তরে—গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে। সম্মুখে আমার সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ—কোনো ভয় করি না, আর কোনো ভয় করি না আমি, আসুক অন্ধকার, নামুক বৃষ্টি, তবু আমি এগিয়ে যাব—এগিয়ে যাব সেই অন্ধকারের অপরিচয়ের পারে, দিগন্তবিস্তৃত সীমাহীনতায়!

জান্‌লার বাইরে ঘনো কালো রাত্রির নক্ষত্রজড়ানো নীল আকাশ, বিদ্যুৎ আবার কলম তুলে নিল। একদা দুর্য্যোগময়ী অন্ধকারের শঙ্কিল মুহূর্ত্তে গার্গী ভেসে গিয়েছে প্রবল বন্যায়—বোধহয় আজ তারই ইতিহাস লিখবে বিদ্যুৎ!

— সমাপ্ত —

পথ-চলা

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

কণ্টক পথেরো আছে অবসান
ওরে ভীরু কেন এত ভয়?
দুঃখের তিমিরে আজি অভিযান
নির্ভীক পরাণে হ'রে আগুয়ান—
বেদনা কি চির সাথী হয়?

রক্ত ঝরে যাক্ কাঁটার আঘাতে,
চিহ্ন থাক্ কিছু পথের ধূলাতে—
চল তুই সমুখে গেয়ে শুভ গান
পথে আছে নব পরিচয়।

বেদনার ওপারে দীপালী উজল
তাহারি সন্ধানে ওরে ভীরু চল।
কঠিন চিতে ধরি কর্ম্ম সহায়
বাজুক ব্যথা শত তোর প্রতি পায়—
এই শুভমন্ত্রে হ'রে বলীয়ান্
ব্যথা মাঝে আছে তোর জয়।

স্কটল্যাণ্ডে কয়েকদিন

শ্রীমতিলাল দাশ

[১৯৩৬ সালের ৫ই জুলাই সুসাহিত্যিক লেখক শ্রীমতিলাল দাশ মহাশয় ইউরোপ ভ্রমণোদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি লণ্ডন হইতে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা পৌঁছেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ১৩৪৮ সালের ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা প্রবর্ত্তকে তাঁহার ৭ই হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রঃ সঃ]

১৪ই সেপ্টেম্বর সোমবার। সকালে উঠিয়া প্রাতরাশ শেষ করিয়া স্কটদের মাছের হাটে গেলাম। এটা উপেক্ষার বিষয় নয়—নানা জাতীয় সমুদ্র-মৎস্যের প্রচুর সমাবেশ সত্যই দর্শককে পরিতুষ্ট করে। মেছোহাটার ভীড় এ-দেশ ও-দেশ সব দেশেই সমান।

এখান হইতে ইহাদের পৌরশাসনের ভবন (Town-Hall) দেখিলাম—তাহার পর পুলিশ কোর্ট ও সেরিফ কোর্টে খানিক ঘুরিয়া এখানকার সুপ্রসিদ্ধ Marischal কলেজ ভ্রমণে চলিলাম। সুন্দর, সুবিস্তৃত হৃদয়মনোহর। গথিক স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন—দূর হইতে ইহার চূড়া পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলেজ খোলা ছিল না, তাই ইহার আভ্যন্তরীণ কোনও পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটিল না। এখান হইতে Cruickshank Botanic Garden দেখিতে গিয়াছিলাম। সামান্য উদ্যান তবে পুষ্পসমাহার মন্দ লাগিল না। ইহার পর সেণ্ট ম্যাকর ক্যাথিড্রাল নামক প্রসিদ্ধ গির্জ্জায় গেলাম। এই গির্জ্জাটি ইহারা দর্শকদের দেখাইতে ভালবাসে।

তারপর King's college দেখিলাম—এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুইটী কলেজ। কিংস্ কলেজ পুরাতন নগরের মুকুটমণির মত। ইহার গির্জ্জাটি দর্শনীয়—এই কলেজে কলা এবং পৌরোহিত্য বিদ্যার উপাধি দেওয়া হয়। অন্য কলেজটীতে আইন ও ডাক্তারি অধ্যাপনা হয়! ক্যাথিড্রালে যাইবার পথে একটী সেতু পার হইলাম। এই সেতুর সহিত পুরাতন আখ্যায়িকা জড়িত। ইহার নাম Auld Bug o' Balgowine। সুন্দর নয়নাভিরাম প্রস্তর সেতু, একটি খিলানের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলেন, একজন বিশপ রবার্ট ব্রুসের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করেন, কেহ বলেন, ইহা রবার্ট ব্রুসের দ্বারাই স্থাপিত। পুলের তল দিয়া উপনদী তর তর বেগে উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

ইহার পর Thoinglore নামক স্থানে গিয়া কিছু খাবার কিনিয়া খাইলাম। চলিতে চলিতে Balmon hill-এর পথে তৃষ্ণা পাইল—দুইটী বাড়ীতে গিয়া দুইটী মেয়ের নিকট জল চাহিলাম—তাহারা খুব সম্ভব পরিবারের কন্যা নহে, পরিচারিকা। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত বিদেশী পথিকের প্রতি এদের অসদ্ব্যবহার অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া দিল। খুব সম্ভব, তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে নাই ; এই ভাবিয়া সান্ত্বনালাভ করাই শ্রেয়ঃ।

তারপর আলেকজেণ্ডার ডানকানের বাড়ীতে গেলাম। সদর রাস্তা হইতে ভিতরে গিয়া একটী পরিচারিকাকে কড়া নাড়িয়া ডাকিলাম, সে অনেক পরে বৃদ্ধকে ডাকিয়া দিল। বৃদ্ধ হয়ত অন্য পরিবারে paying guest, তথাপি আমাকে চা ও কেক খাওয়াইলেন। তারপর আমাকে নিয়া তাঁহাদের গ্রাম দেখাইতে চলিলেন। বৃদ্ধের সঙ্গ আমার খুব ভাল লাগিল। তাঁহার শিশুসুলভ অমায়িকতা হৃদয় স্পর্শ করিল।

বাসে চড়িয়া একটী গ্রামের জনবহুল স্থানে নামিলাম। দেবদারু ও পাইনের ছায়াশ্যাম বনপথে নদীতীর পর্য্যন্ত চলিলাম—পথে Rashbery নামক খুদে জামের মত ফল খাইলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের গরীব বুড়ীদের মত এখানেও বুড়ীরা এই ফল সংগ্রহ করিয়া নিয়া যাইতেছে। ইহা দিয়া তাহারা জ্যাম তৈয়ারি করিবে। তাহা ছাড়া Bramble গাছের ফলও আস্বাদন করিলাম। বিলাত দেশটাও যে মাটীর তাহার এই সুন্দর পরিচয় আমার স্মৃতিতে গাঁথিয়া গিয়াছে। খালের মত একটি ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে—ও-পারে কৃষকের বাড়ী দেখা যাইতেছে—নদীতীর ঘাসে ভরিয়া রহিয়াছে। ফিরিবার পথে Golf-link দেখিলাম। গলফ খেলা স্কটজাতির খুব প্রিয়—প্রত্যেক সহরেই বিস্তৃত ময়দান আছে। এডিনবরার বর্ণনায় এক লেখক লিখিয়াছেন :—

'Several fine golf-courses belong to the city, many lie within easy reach. I hear of an Edinborough man who on thirty-seven consecutive days played over thirty-seven different courses, all good, some famous and slept every night in his own bed,"

গলফ খেলার জন্য বিস্তৃত ময়দান চাই। একটি কাঠের বল এবং অনেকগুলি লাঠি লইয়া খেলাটি চলে—মাঠের ইতস্ততঃ অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ত্ত করা হয়—লাঠি দিয়া বলটি গর্ত্তে ফেলাই খেলা। গড়ের মাঠে অবশ্য গলফ খেলা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন।

বৃদ্ধ চমৎকার আলাপী, পকেটে করিয়া লজেঞ্চ নিয়া গিয়াছিলেন তাহা দুইজনে খাইলাম। বৃদ্ধ আমাদের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসের ভাড়া তিনিই দিলেন। তাহার সঙ্গ-স্মৃতি জীবনে একটী অনুপম সঞ্চয় রহিয়া গিয়াছে। মানুষে মানুষে ব্রহ্মদর্শী ঋষিরা যে ঐক্যের কথা বলিয়াছিলেন—সমস্তকে আত্মায় অনুপ্রাণিত করিয়া আত্মীয় বলিয়া দেখিতে বলিয়াছেন, তাহার মহিমা এই সমস্ত হৃদয়বান্ মানুষের সংস্পর্শে আমরা সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারি। বৃদ্ধের নিকট সত্যকার বেদনার সহিত বিদায় নিয়া Y. M. C. A. আফিসে চিঠির তল্লাসে আসিলাম। চিঠি না পাইয়া Ferry hill নামক স্থানে চলিলাম—তারপর Woolworth নামক কোম্পানীর সস্তার দোকান হইতে জুতার ফিতা কিনিয়া সমুদ্র তীরে চলিলাম।

উত্তর-সমুদ্র তখন তরঙ্গসঙ্কুল—শীতবায়ু বহিতেছিল। প্রতিদিন যেমন অসংখ্য নর ও নারী এখানে আমোদপ্রমোদ করে, আজ শীতের ভয়ে তাহারা কেহ নাই বলিলেই হয়। জনপ্রাণীহীন সমুদ্র-তীর—খানিক ঘুরিয়া লইলাম। সমুদ্র-তীরের প্যাভিলনে তখন vaniety show চলিতেছিল—Harry Guder's entertainment। একখানি টিকিট কিনিলাম। মেলা আরম্ভ হইবার বিলম্ব দেখিয়া Milk-bar নামক দোকানে গিয়া এক গ্লাস অরেঞ্জ সিরাপ এবং এক গ্লাস গরম দুধ খাইলাম। Amusement-place ঘুরিয়া সমুদ্র-তীরের দিকে চলিলাম—ছেলেদের মন ভুলাইবার জন্য নানা প্রকার খেলার যে সব আয়োজন ছিল তাহা দেখিলাম। দৈবজ্ঞেরা আসিয়াছিল, তাহার হাত গণনা করিত, অদৃষ্ট বলিত। ছেলেদের নাগর-দোলা, রেলগাড়ী প্রভৃতি খেলাগুলি বেশ সুন্দর লাগিল। নানা প্রকার আমোদের ব্যবস্থা ছিল। একটী কলে একটা পেনি দিলে চরিত্র সম্বন্ধে একটী কার্ড পাওয়া যায়। প্রথমটী পাইবার পরে, পরের কার্ড একই হয় কিনা দেখিবার জন্য আর এক পেনি খরচ করিলাম। দুইখানি কার্ড মিলিল—তাহাতে চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ কথা লেখা আছে।

একটী জিনিষ খুব ভাল লাগিল। এই সব দ্রষ্টব্যসমূহ এমনি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু দুষ্ট ছেলেরা আসিয়া ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতেছে না। ইহাদের দেশে ছেলে ও মেয়ে প্রথম হইতেই নিয়মানুগত্য শেখে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাই ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। আমাদের গৃহ পরিবারে শিশুরা আদর বা আবদার পায়, প্রায়ই নিয়ম মানিতে শেখে না।

সেখান হইতে ফিরিয়া উত্তরে হাওয়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সমুদ্রের অশান্ত বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর খেলা দেখিতে চলিলাম। খেলা মন্দ লাগিল না—হাসির ও আনন্দের চমৎকার আয়োজন। প্রত্যেক কৌতুককর রস আমরা ধরিতে পারি না, কারণ কৌতুক বুঝিতে চলিত ভাষার উপর যে অধিকার থাকা প্রয়োজন, আমাদের তা নাই। রাত্রি আটটায় বাসায় ফিরিলাম। এবার্ডিনের এই সমুদ্র-তীরে আলোকিত আনন্দ নিকেতনের আয়োজন হইতে ফিরিবার পথে আমার মনে ক্ষণকালের জন্য যেন সত্যের সাক্ষাৎকার হইল। মুহূর্ত্তের সেই একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, তথাপি বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

দেশে শাস্ত্র অনেক পড়িয়াছি, তাহাতে শান্তি না পাইয়া জীবনের কাম্য জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উত্তর সাগরের তীরে শান্ত স্নিগ্ধ আকাশের তলে আমার মনে হইল, জীবনে প্রতি মুহূর্ত্তে আনন্দকে বরণ করাই জীবনের সার্থকতা। তরঙ্গের দোদুল নর্ত্তনের মত নানাভাবের সংঘাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিবে, সেই বিক্ষেপে ভ্রান্ত না হইয়া আনন্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের চারিদিকে এই আনন্দকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। আনন্দের আস্বাদনে এবং পরিবেশনে মানুষ আপন সার্থকতাকে পাইবে।

১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। সকালে উঠিয়া পুনরায় চিঠির সন্ধানে চলিলাম। চিঠি পাইলাম না। অশান্ত চিত্ত নিয়া ডাক ঘরে গিয়া দেশে চিঠি পাঠাইলাম। মোটর ভ্রমণের সময়ে যে ছবি তুলিয়াছিলাম তাহা স্থানীয় ফটো-গ্রাফারের দোকানে দিয়াছিলাম, তাহাই আনিতে চলিলাম। তারপর আর্ট গ্যালারি দেখিতে গেলাম। এ দেশের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নগরের শিল্প বিভাগ, কলা বিভাগ প্রভৃতির আয়োজন আছে। এই সমস্ত সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে স্থাপন করা উচিত। সেখান হইতে ফিরিয়া বৈষ্ণব গীতির যে অনুবাদ Calcutta Review কাগজে ছাপিতে দিয়াছিলাম তাহা পাইলাম। বড়ালের চিঠি ও দীপিকাও পাইলাম। একশত এক-পঞ্চাশটী গীতিকা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলাম। বিলাতে এইগুলি প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম—হয় নাই। এ দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাহির হইতে দুই একজনকে দিয়া বলিয়াছিলাম। প্রকাশ হয় নাই—অথচ বাংলা সাহিত্যের এই অপূর্ব্ব সম্পদগুলি বিদেশীর দ্বারে দেখাইয়া দিলে আমরা দেশের কল্যাণ সাধন করিব। বড়াল বিলাত আসিবেন সেই কথা লিখিয়াছিলেন।

ডিনার খাইয়া His Majesty's Theatre নামক নাট্যশালায় দুইখানি নাটকের অভিনয় দেখিলাম: How they were married and South on sea: একটী ব্যঙ্গ কৌতুক, অপরটী দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ, মন্দ লাগিল না। তারপর ইহাদের সাধারণ পাঠাগার দেখিলাম—চমৎকার ব্যবস্থা। তারপর ট্রিভোলিতে গেলাম। সমুদ্রের বন্দরে দুইজন জেলের সঙ্গে আলাপ হইল।

তাহারা বলিল—"রাষ্ট্র আমাদের প্রতি সদয় নয়, আমাদের মদে ডুবিয়ে রেখেছে।"

বলিলাম—"খাও কেন?"

উত্তর দিল—"এই সুকঠোর শীতে মদ না খেলে কি মাছ ধরা যায়?"

বলিলাম—"অভ্যাস করলেই পার"

তাহারা তাহা বিশ্বাস করে না—বলে—"আমাদের এরা মানুষ হতে দিতে চায় না—আমাদের অমানুষ পশু করে এদের বিজয়-যাত্রা চলছে—"

দেখিলাম জেলে দুটি কথা বলিতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা কোথাও সর্ব্বসুখকর হইতে পারে না। দুঃসহ ও কষ্টকর কাজ অনেকের করিতে হয়—তাহারা এইরূপ বিদ্রোহ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। ট্রিফালিতে নাচ, গান সার্কাস ও স্কেটিং দেখলাম—অনেকক্ষণ বেশ আমোদে কাটিল। আমাদের দেশে এই ধরণের আমোদের ব্যবস্থা করিলে লোকের উপকার হইবে।

বাসায় ফিরিয়া হোটেলের মেট্রন মিসেস কুটসের সঙ্গে আলাপ হইল। মিসেস কুটস্ বক্তৃতা দিতে বলিলেন। ব্যবস্থা করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাহার পর আর আয়োজন করিতে পারেন নাই।

১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার। চিঠির সন্ধান লইয়া ব্রিমারে চলিলাম। বাসে ১২॥০ শিলিং দিতে হইল, কিন্তু মন খুব খুসী হইল। ডি নদীর দুই তীরে মনোজ্ঞ ছবির মত নিসর্গ দৃশ্য—অন্তরে শাশ্বতস্থান অধিকার করিয়া রহিবে। সাত জন লোক—তাহাদের মধ্যে লণ্ডনের এক বৃদ্ধ দম্পতী আছেন। তাহাদের সাথে খানিক আলাপ হইল। একটী তরুণী ও তার জননী এডিনবরা হইতে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মা বলিল—'Are we going too fast?

আমি বলিলাম, "তা বই কি, বিজ্ঞান তোমাদের দাস হয়েছে, যন্ত্র কৌশল তোমাদের আয়ত্ত, জীবনকে তোমরা সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত হয়ে ভোগ করছ?" মা আমার ব্যঙ্গ বুঝিল কিনা জানিনা, সে আমার কথা স্বীকার করিল। আমি বলিলাম, "তোমরা কি এই স্বাধীন প্রমত্ততায় সুখী?"

মা সত্যবাদিনী, বলিল—'না'

সমুদ্রতীর হইতে পশ্চিম দিকে ব্রিমার পথে ব্যালেটার নামক সহর পড়ে—স্বচ্ছতোয়া ডি নদী পাশে পাশে থাকে, সুন্দরতম ও মহত্তম নিসর্গ ছবি—অন্তর পুলকিত হইয়া ওঠে। পথে ব্যাল মোরাল ক্যাসল পড়িল—এই প্রাসাদে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী মাঝে মাঝে আসিয়া বাস করেন। ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এই প্রাসাদ মহারাণী ভিক্টোরিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন।

ফিরিয়া ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে আলাপ হইল। ম্যাকডোনাল্ড বলিলেন—"বৃটিশের উন্নতির মূল তার সুগভীর ধর্ম্ম বিশ্বাস।"

একথা সত্য। আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার মিথ্যা বড়াই করি। দুর্ব্বল ও ভীরু আমরা—সত্যকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। যোগের প্রথম হইতেছে যম—অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। যে বলবান্, যে সাহসী, সেই অহিংসা করিতে পারে। সত্য আমাদের আচরণে নাই। সাধারণ বৃটিশ সত্যবাদী, শ্রমশীল এবং ন্যায়পরায়ণ। বৃটিশপ্রতাপের মূল বৃটিশ চরিত্র।

আমি বলিলাম—"য়ুরোপ ত ধ্বংসের গহ্বরমুখে, রণদৈত্যের হুঙ্কার শুধু ক্ষণিকের জন্য থেমে আছে···"

প্রৌঢ় খানিক চুপ করিয়া বলিলেন—'তা সত্য, চারিদিক অন্ধকার, তবু বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি আমরা আস্থা রাখি এই দুঃখদুর্ব্বহ দিন যাবে—আলোক ফুটবে।"

মিশনারীর এই আত্মপ্রত্যয় আমার ভাল লাগিল। অবিশ্বাস আসে—দুঃখ হয়, তথাপি বিশ্বাস রাখাই বাঞ্ছনীয়।

১৭ই বৃহস্পতিবার। মিসেস কুটস্ কিছু ফাঁকি দিলেন। নিরুপায় মূর্খতায় তাহা শোধ করিয়া ইনভারনেস যাত্রা করিলাম। বারটায় পৌছি ও রাত্রি বাস করি।

১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার। সকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া পোষ্টাফিসের নিকট বাস্ ধরিলাম। ৮-৩০ মিনিটে ষ্টীমার ছাড়িল—ইনভারনেস হইতে ফোর্টউইলিয়াম ষ্টেসন পর্য্যন্ত ক্যালিডোনিয়ান খাল দিয়া ভ্রমণ খুব আরামপ্রদ—ছোট নদীর মত খাল, মধ্যে মধ্যে হ্রদ আছে—সে-সব স্থান বিস্তৃত পরিসর। দুই ধারের প্রাকৃতিক শোভা একান্তই মনোরম। সহযাত্রীরাও নানা ধরণের। ম্যাঞ্চেষ্টার ব্যাঙ্কের একজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে বিশ্বাসী ও সুখী, বলিল "বর্ত্তমানকে অবজ্ঞা করবার মত কিছু নেই—এই জীবনই সুখের ও আনন্দের।" বলিলাম—"চারিদিকে যে গ্লানি, যে দুঃসহ গতি, যে অসহ শঙ্কা—"

যুবক হাসিয়া উত্তর দিল···"তা' জানি, তবু তার মাঝেই আমরা অগ্রগতির গান করি।" আধুনিক সাম্প্রতিক মনোভাবের মূর্ত্ত প্রতীক। তাহার সহিত মতের মিল না হইলেও, তাহার আশাতুর হৃদয়কে তুচ্ছ করিতে পারি না। হয়ত চিন্তা ব্যাধির কবলে জর্জ্জরিত না হইয়া জীবনে এমন ভাবেই আনন্দকে দেখিতে শিখিলে ভাল হয়।

L. N. E. R. রেলের এক কর্ম্মচারী সস্ত্রীক চলিয়াছে। তাহার সুহাসিনী ও সুভাষিণী পত্নীর সহিত আলাপে প্রীত হইলাম। তরুণী ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, সে আমার নিকট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিল। বিদেশে ভ্রমণের সময়ে দেখিয়াছি মেয়েরাই বেশী উদার-হৃদয়, তাহারাই সব সময়ে অপরকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

এক বুড়া স্কচম্যান খুব আনন্দে ছিল। সে ভারতবর্ষে করাচীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুস্থানী আয়াদের হাতে মানুষ হইয়াছিল। সে তাহার শৈশবশ্রুত সেই সব গানের অর্থ জানিতে চাহিল। গানগুলি উর্দ্দু ভাষাবহুল। সে যে সব চরণ বলিল, তাহার ব্যাখ্যা করা আমার স্বল্প বিদ্যায় কুলাইল না। আমাদের দেশে যেমন বাঙ্গাল বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে ক্ষেপানো হয়, ইংরাজেরাও তেমনই স্কচদের প্রাদেশিকতার জন্য বিদ্রূপ করে। এই সব বিদ্বেষের গল্প তাহার নিকট এই দীর্ঘ জলযাত্রায় মুখরোচক লাগিল। ব্যাঙ্কের কেরাণী একটী তরুণীর সহিত উন্মাদ ভাবে প্রণয়গুঞ্জন করিয়া চলিল। আর একটী আঠার-কুড়ি বৎসরের মেয়ে একা একা অত্যন্ত ছটফট করিতে লাগিল। সে যাত্রার বিলম্বকে সহিতে পারিতেছে না। যে যুবতী ম্যাঞ্চেষ্টার ব্যাঙ্কের কেরাণীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, সে তাহার সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষ্যা করিতেছিল কিনা জানি না। তবে তাহার অতি অস্থিরতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

প্রবাদ, এই খালে মৎস্যকন্যারা বিচরণ করে। এখনও তাহাদিগকে দেখা যায়; তাহার সত্য বিবরণও সংবাদপত্রে সঙ্কলিত আছে। তথাপি অবিশ্বাসী আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মৎস্যকন্যাদের কতকগুলি ছবি কিনিয়াছিলাম, আর নিসর্গদৃশ্যের কয়েকটী ছবি তুলিয়াছিলাম। মৎস্যকন্যাদের কাহিনী লইয়া ম্যাথু আর্ণল্ড একটী চমৎকার কবিতা লিখিয়াছেন। একটী মৎস্যকন্যা পৃথিবীতে আসিয়া একটী মানুষকে বিবাহ করিয়াছে, দিনান্তে তাহার স্বামী, পুত্র ও কন্যা আসিয়া করুণ স্বরে তাহাকে তাহাদের গৃহে ফিরিতে ডাকিতেছে। এইটুকু গল্প লইয়া একটী চমৎকার কাব্য রচিত হইয়াছে। চলিতে চলিতে সেই কাব্যটি মনে পড়িল। ফোর্ট উইলিয়ামে

৪-৩০ মিনিটে আসিলাম। নদীকূল হইতে ষ্টেশনে যে গাড়ীতে আসিলাম, সে গাড়ীতে তাড়াতাড়ি টুপি ফেলিয়া আসিয়াছিলাম—ষ্টেশনমাষ্টারের সাহায্যে অনেক কষ্টে টুপি উদ্ধার করিলাম। ফোর্ট উইলিয়াম হইতে গ্লাসগো রাত প্রায় দশটায় পৌছিলাম। Y. M. C. A. Hostel-এ আশ্রয় মিলিল—সেখান হইতে এখানকার International Association-এ চিঠির জন্য চলিলাম। কতকগুলি চিঠি পাইলাম; কিন্তু যার চিঠির জন্য হৃদয়ে মনে ব্যাকুলতা, তার চিঠি পাইলাম না। এই সময়ে একজন ভারতীয় যুবক তাহার স্কচপত্নী ও কন্যাকে টুকরা টুকরা করিয়া হত্যা করে। সেই জন্য ভারতবাসীর প্রতি একটী অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের ভাব জন্মিতেছিল। তথাপি ইহাদের চরিত্রের মধ্যে আমাদের দেশের মত নীচতা নাই, তাই আমরা কোথাও নির্য্যাতিত হই নাই। যে ভারতীয় যুবক পাশবিক ভাবে স্ত্রী ও কন্যা হত্যা করিয়াছিল, তাহার আচরণ একান্ত গর্হিত এবং আমানুষিক।

১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার। সকালে উঠিয়া পুনরায় চিঠির সন্ধানে চলিলাম। আমার ভগিনীপতির চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, গীতা ভাল হইতেছে। কিন্তু গীতার তখন ভাল-মন্দ ও দুঃখের হাত ছাড়াইয়া পরম পিতার কোলে আশ্রয় মিলিয়াছে। বাড়ীর চিঠি সেই জন্যই পাইতেছিলাম না; কিন্তু অকারণ দুশ্চিন্তায় যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহার চেয়ে তার শোক-সংবাদ জানানো ভাল ছিল। গ্লাসগো হইতে দিনে দিনে বেলফাষ্টে যাইব স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু সেণ্ট এনক্স ষ্টেশনে আসিয়া জানিলাম ১০-৩৫ মিনিটের ট্রেণ নাই, তাই Left-luggage আফিসে সুটকেস রাখিয়া Cenral Street বহিয়া সহর দেখিতে চলিলাম। জর্জ্জ স্কোয়ারে বসিয়া গ্লাসগোর ছবি দেশে পাঠাইলাম। তাহার পর এই নগরের আর্ট গ্যালারি দেখিতে চলিলাম। ইহাকে গাইড বুকে যে জগদ্বিখ্যাত বলা হইয়াছে, তাহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইল। সেখান হইতে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া ইহার ক্যাথিড্রাল দেখিলাম। ইহা অতি পুরাতন এবং অতি সুন্দর—A fine example of fifteenth century mansion.

গ্লাসগো সহরকে অতি অল্প সময়ের জন্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ এবং জনসংখ্যায় ইহা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের দ্বিতীয় নগর। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক স্মৃতি নাই, প্রাকৃতিক রমণীয়তা নাই। ৩-৩০ মিনিটের গাড়ী ধরিয়া অল্পক্ষণেই ফার্থ অব ক্লাইডে ষ্টীমারে উঠিলাম। গ্লাসগো হইতে বেলফাষ্ট ১১০ মাইল। রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে বেলফাষ্ট পৌছিলাম।

গ্লাসগো হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী মঞ্জুকে যাহা লিখিয়াছিলাম, সেই কবিতাটি তুলিতেছি—

সুখী হও জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে।
ক্ষতি নাই তবু তায়, যদি দুঃখ আসে।
সত্যের সারথি কর সাধনার রথে,
জীবন সুরভি হবে আনন্দের বাসে।

এই উপদেশ নিজের জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি নাই। সমস্ত শক্তির ও কর্ম্মের উৎস, সত্য-প্রতিষ্ঠায় বাক্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু যে তপস্যা ও সাধনার প্রয়োজন তাহার অবসর কোথায়?

ক্ষণ-পরিচয়ের স্মৃতি মুছিতে চায়; কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে যে প্রীতি জাগিয়াছিল, বিদায়বেলায় তাহাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়া ক্যালিডোনিয়ার উদ্দেশে প্রীতির সন্দেশ জানাইলাম। বীরের দেশ ও কর্ম্মীর দেশ স্কটল্যাণ্ড—তাহার শৈলশিখরে, তাহার প্রান্তরে অতীত জীবন ধরিয়া পুরাণ-কাহিনী গান করে। বিদেশী তাহার মর্ম্মধ্বনি জানিতে পারে না; তথাপি যে আভাষ পাই, তাহাকে অনুরাগে সম্বর্দ্ধনা করি।

বিদেশীকে আত্মীয় অনুভব করিবার মধ্যে জীবনের সার্থকতা আছে। পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যই চিত্তবৃত্তির এই প্রসার। যখন ঘরে থাকি, তখন তাহার অচলায়তন আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ করে। আমাদের মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ আছেন, যাঁহার অনুভূতি ও যাহার রসাস্বাদন জীবনের কাম্য, তাহা এই আত্মীয়তাবোধে পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের প্রকাশ তাঁহারই প্রকাশ—আমাদের চৈতন্য ও জ্ঞানে, আমাদের ধী ও বুদ্ধিতে তিনিই প্রকাশিত হন, যখন আমরা সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া বৃহৎকে বরণ করি, বিস্তারকে আলিঙ্গন করি এবং ব্যাপ্তাকে অনুভব করি।

পরমাত্মীয়ের বেদনা লইয়া ক্যালিডোনিয়া হইতে চলিলাম। যে বাষ্পযানে ক্লাইড উপসাগরের উপর দিয়া গিয়াছিলাম, তার চারিপাশে গাংচিলেরা ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করিতেছিল—তাহাদের ব্যাকুল-বেদনার মাঝে দূরে পল্লীভবনে কন্যা শোকার্ত্তা প্রিয়তমার বেদনা হয়ত ভাসিয়া আসিতেছিল। তাই চক্ষুঅশ্রু সজল হইয়া উঠিতেছিল। নিজের শোক, দুঃখ এবং তাপকে বিশ্বের ব্যথার সহিত মিলাইয়া লইতে পারিলে, ব্যথা আনন্দে পরিণত হয়।

বাষ্পযান ছাড়িল—নিঃসঙ্গ একাকী আমি যাত্রা করিলাম। গাংচিলেরাই শুধু যেন আমার নির্ব্বান্ধব জীবনের সাথী বলিয়া মনে হইতেছিল। হৃদয়ের অন্তর-দেবতাকে এই দুঃখের মাঝে অসংশয়চিত্তে গ্রহণ করিবার জন্য মনকে বলিলাম। (সমাপ্ত)

চাকরী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

চাকরী না করিয়া উপায় কি?···আর চাকরীই যখন করিতেছি, মুনিবের কাজ বুঝাইয়া দিতে হইবে বৈ'কি—নতুবা অধর্ম্ম হইবে।···বড় বাবু ঠিকই বলিয়াছেন।

স্নান ··· শিবপূজা ··· স্বপাক আহার···কোন দিনই বেলা ১১টার আগে আফিসে হাজিরা দিতে পারি না। কিন্তু আজ ইনস্পেক্‌শন্‌···সাহেব আসিবে।·· একাউণ্টের কাজ···কিন্তু 'চেক্‌' করিয়া সব দেখা হয় নাই তো!

অভ্যাসমত গঙ্গায় প্রাতঃস্নানে গিয়াছি। স্নান করিতে করিতে গঙ্গামাহাত্ম্য আবৃত্তি করিতেছি—'ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ ··· মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো···'। একবার···দুইবার···তিনবার ডুব দিলাম। কিন্তু পাপের দাগ মন হইতে যেন মুছিতেছে না···'চেক্‌' করিয়া সব দেখা হয় নাই তো!

আজও উত্তর মুখে বসিয়া গঙ্গামৃত্তিকা হাতে তুলিয়া লইলাম···সঙ্গে কাঁসার যে ছোট পাত্রটি ছিল, তাহার উপর মৃত্তিকা দিয়া শিবলিঙ্গ গড়িলাম···তাঁহার মস্তকের 'বজ্র' পিনাকের উপর রাখিলাম···প্রতিষ্ঠা ও ধ্যান সারিয়া আবাহন করিলাম—'হ্রাং হ্রীং স্থিরোভব যাবৎ পূজা করোম্যহম্‌'···হে ভগবান, যতক্ষণ আমি পূজা করি, তুমি এখানে স্থির হইয়া থাক।···কিন্তু ভগবান যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন: এগারোটায় আসিবে সাহেব···আর মাত্র চার ঘণ্টা পরে···হিসাব চেক্‌ করিতে চার ঘণ্টার কম লাগিবে না তো।···

আজ প্রায় সব কর্ম্মচারীই আগে-ভাগে আসিয়াছে। আমিও নিজের টেবিলে বসিয়া একাগ্র মনে হিসাব মিলাইতেছি। লিঙ্গমূর্ত্তিতে শিব আজ যেন আমার সম্মুখে জাগ্রত। কাজে সত্যই অনেক খুঁত ছিল। বাড়ী আসিয়া কাজ করি, তবুও কাজ শেষ হয় না—এতই কাজের চাপ। দেখিলাম এক জায়গার হিসাব অন্য জায়গায় লিখিয়াছি, এমনও কিছু আছে। সব চোখে পড়িতেছে··· আর কলের মত সব সংশোধন করিয়া যাইতেছি। বড় বাবু বার দুই আসিয়া কি যেন সব বলিয়া গেলেন··· সবাইকে তিনি খবরদারি করিয়া বেড়াইতেছেন।

একটু পরে আফিসে ডামাডোল লাগিল···যেন শুনিয়াও শুনিতেছি না। সাহেবী ভাষায় শোনা যাইতেছে উদারা ···মুদারা-তারা···সপ্ত গ্রামের আওয়াজ! যাহার কাজ ভুল হইতেছে, তাহারই তলব হইতেছে সাহেবের ঘরে। ···তাহারই অশ্রু ঝরিতেছে···তাহার সঙ্গে মিশিতেছে বৃদ্ধ বড় বাবুর অশ্রু।—কাহারও কাজ তিনি দেখেন না, পদে পদে তাঁহার গাফিলতি। বৃদ্ধের কাজ যায়-যায়।

এইবার টাকাকড়ির হিসাব দেখা হইবে। মুসলমান চাপরাসী আমার হিসাবের খাতাগুলি লইতে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল! চাপরাসীর দেরী দেখিয়া খোদ বড় বাবু আমার ঘরে আসিলেন। ভিজা হইলে কি হয়··· তিনিও রক্তচক্ষু দেখাইলেন। আসিয়াই 'ইডিয়ট্‌' 'ফুল' বলিয়া আমাকে গালি দিলেন। শেষে টেবিল হইতে

খাতাগুলি নিজেই চাপরাসীর হাতে উঠাইয়া দিয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে চলিয়া গেলেন।

বুঝিতে পারি না আমার কি দোষ! আশ্চর্য্য, আমারই হিসাব দেখিয়া সাহেব তারিফ করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম।···সাহেব বলিতেছেন, আমার মাহিনা বাড়িবে··· আরও বলিতেছেন এত কাজের ভার একটা লোকের উপর চাপানো অবিচার হইয়াছে···। আমার চোখেও তখন জল দেখা দিয়াছে···বলিতেছি—'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং···'। কিন্তু মোহ কাটিয়াছে—মোহ কাটিয়াছে···।

এ কি! বড় সাহেব আমারই ঘরে আসিতেছেন। দাঁড়াইয়া সম্মান জানাইলাম। কিন্তু সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন।···আমার টেবিলে কাঁসার পাত্রে সেই শিবলিঙ্গ ···আমার গায়ে জড়ানো স্নানের ভিজা কাপড় এখনও শুকায় নাই···আমি যে আনমনে স্নানের ঘাট হইতে বরাবর আফিসে চলিয়া আসিয়াছি!

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, আমার কাজে ভারী খুশী হইয়াছেন ও আমার মাহিনা বাড়াইয়া দিবেন ·· আর আগামী মাস হইতে আমার একজন সহকারীও দিবেন···। কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহার মর্ম্ম এই যে—আমার মোহ কাটিয়াছে·· চাকরীর মোহ কাটিয়াছে। ·· যে চাকরী মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া দেয়···ভগবানের পূজা ভুলাইয়া টানিয়া লইয়া যায় আফিসে···মানুষ হইয়া সে চাকরী আমি করিতে পারি না।· আজ দায়িত্ব শেষ, আজ হইতে বিদায়···।

সাধিকার পত্র

[এই পত্রখানি ঘটনাচক্রে আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। পত্রখানি প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের জনৈকা অন্তরঙ্গ সাধিকা কর্ত্তৃক তাহার ইষ্ট ও গুরুদেবের উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘগুরু বিগত ৬ই জানুয়ারী হইতে এক বৎসরের জন্য সঙ্ঘচক্র হইতে দূর প্রবাসে অজ্ঞাতবাসে আছেন। পত্রখানির সাহিত্যিক মূল্য যত তুচ্ছই হউক, ইহা বিরহ-ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আবেগময়ী আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল। গুরু-শিষ্য এবং শিষ্য-মণ্ডলীর পারম্পরিক আত্মিক সম্বন্ধ-জগতের যে সংবাদ ও সংবেদনার আবেদন পত্রখানিতে আছে, তাহা অ-সাধারণ। অলক্ষ্যে আত্মার নিবিড় ঘনিমায় সাধন-চক্রে যে ভাব-প্রবাহ চলে, তাহার বিচার বস্তুগত নয়, পরন্তু রস ও মাধুর্য্যগত। ইহারই প্রতিচ্ছবিস্বরূপ এই পত্রখানি আশা করি, মরমী পাঠক-পাঠিকার মর্ম্মগ্রাহী হইবে। প্রঃ সঃ]

শ্রীচরণেষু—

আট মাস যেন দীর্ঘ আট যুগ। চুপ করে' আর থাকা গেল না। কিছু মনের কথা নিবেদন করি। আমার প্রণাম নেবেন। ভগবান অজ্ঞাত আর সর্ব্বত্র; কিন্তু আপনার অজ্ঞাত বাস দেখি আমাদের কাছেই, বিশেষ আমার কাছে। কত কথা! কিন্তু আপনাকে বেশী বিরক্ত করতে ভাল লাগে না। কেবল জানতে ইচ্ছা হয় আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন তো? শান্তিতে আছেন তো? আপনার মনে কি হয়, কি ভাব জাগে, কি রকম আছেন, মাঝে মাঝে এই সব বড় জানতে ইচ্ছা হয়। প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে, মনের ভিতর কি যে হয়, তা' ভাষায় বোঝান যাবে না। আপনার ভিতরের কথা জানা সহজ নয়—যদি দয়া হয়, তবেই জানবো। আমার কথা কিছু জানাই।

কত বার মনে হয় আপনাকে অন্তরের কথা লিখি; কিন্তু কত বার লিখেও কোন ঠিকানায় পাঠাব, ভেবে পত্র আর দিতে পারিনি। বার বার যখন দেওয়া হয় না, তখন মনে হয় আমার চিঠি কি তবে আপনার কাছে পৌঁছুবে না, ইহাই যখন ঈশ্বরবিধান, তখন দূর থেকেই বার বার প্রণাম জানাই। আপনার কাছে সে প্রণাম পৌঁছায় কিনা জানি না। কিন্তু আমি বেশ তৃপ্তি পাই প্রণাম জানিয়ে। আপনার বুকে তৃপ্তি দেওয়ার আশা রাখি না। কতটুকু আমি! বাহিরের কথা সবই আপনার জানা আছে। সে সব কথা আর কি জানাব, শুধু আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি, আপনি যে কাজের ভার আমার উপরে চাপিয়ে গেছেন, আপনি আসা পর্য্যন্ত তা' যেন বইতে পারি নিষ্ঠার সঙ্গে, মনে যেন কোন দিন বিরক্তি না আসে।

আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি কর্ম্ম করে' যাচ্ছি অনাহত ভাবে। সেবার ভিতর যে এত সুখ, তা' আগে বুঝিনি, আজ বুঝছি। এখন সব যেন উল্টে যাচ্ছে। আপনার "আত্মসমর্পণ" বই আগেও পড়েছি। অরুণদার কাছে অনেক কথা বুঝেও নিয়েছি, এই বইখানার পরীক্ষাও দিয়েছিলাম ক্লাসের পড়ার মত। কিন্তু তখন এমন করে' তো ইহার ভিতর যে এত অর্থ, তা' বুঝে উঠতে পারিনি। এখন মনে হয় সবই ভগবানের কাজ, ভগবান ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কিছু আছে তা' ভাব্‌তে ভাল লাগে না। নারীমন্দিরের খবর হয়তো আপনি সবই জানেন। তবে একজনের কথা একটু জানাই। তাঁর সাধন বেশ জমে উঠেছে। তিনি আমাদের সম্পাদিকা। প্রায় সব সময়ে মৌনই থাকেন। ধ্যানও চলেছে খুব। অন্যেরাও বেশ চলেছে—যেন সবাই অন্য জগতে বাস করছেন। সকলেই বেশ আত্মস্থ, ভাবে বিভোর। নিজের কথাই বলি, এক বৎসর আপনাকে কিছু জানাব না মনে করেছিলাম, যত প্রশ্ন সব নিজের মধ্যেই উঠবে এবং লয় পাবে, এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু পারলুম না, বুক যেন ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, কেন তা' বুঝি না। যখন বড় অস্থির হই, তখন আপনি যে কর্ম্ম দিয়েছেন তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ি। মনে করি, "তাঁরই কাজে আছি রত আর কিছু জানি না রে"। কিন্তু মন তাতে মানা মানে না, কোথায় ছুটে যায়, কিছুতেই ঠিক রাখ্‌তে পারি না। একটা ভয়ের কথা বলি, মনে হয় আপনি যদি ভুলে যান; আবার ভরসা পাই এই ভেবে "তাও কি হতে পারে"? আমি যখন দিবারাত্র মনে করছি, তখন আমার ভগবান কি আমায় ভুলে যেতে পারেন? না, পারেন না—কিছুতেই পারেন না! তিনি তখনই ভুলে যেতে পারেন, আমি যখন তাঁকে মনে না রাখব। বলুন তো আমার এ ধারণা ঠিক কিনা? ভগবান বলে' আপনাকে স্মরণ করে' যেন চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা যায়, কি-করি কি-করি, এমনই ব্যাকুল হয়ে উঠি। তারপর নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি দিন দিন আমার মনের পরিবর্ত্তন দেখে। সঙ্ঘের মধ্যে ভাই-বোনের সম্বন্ধ এমন সুন্দররূপে আমার মনে ফুটে উঠেছে, তা' আর কি বলব! মনে হয় সবাই আমার ভাই, আমি তাদের খাওয়া না দেখলে বুঝি ভাইদের ভাল খাওয়া হবে না। ছুটে যাই তাদের খাবার সময়ে। অন্য দিকে যতই কাজ থাক, ভায়েদের খাওয়ার সময়ে আমায় থাকতেই হবে। যে দিন যেতে পারি না, মনে হয়, কি খাওয়া হল, বোধ হয় পেট ভরেনি সবায়ের। আবার নিজে নিজেই মনে করি, কই আগে তো এমন মন ছিল না, খাবার কাছে বরং দাঁড়াতেই লজ্জা করত। এখন এমন হয়েছে, যদি শুনি কারও অসুখ করেছে, মনে হয় ছুটে যাই, দেখে আসি। কেষ্ট পাল-দা'র অসুখের সময় থেকে এমন হয়েছে। তাঁকে গিয়ে খাইয়ে দিয়ে আসতুম, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে কত যে আরাম পেতেন! কিন্তু তিনি বাঁচলেন না, চক্ষের জল আর শুকাতে চায় না। এই তো বাহিরের দিক্। নিজের ভিতরও বেশ আনন্দে ভরে' উঠছে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর কত কি এসে ঘিরে ধরে, কিন্তু একটা মজা এই যে, বেশীক্ষণ সে সব থাকে না। এমন কি তারা পালাতে যেন পথ পায় না। আপনার বইগুলি যখন পড়ি, ভাল লাগে। অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে।

কত স্মৃতি জাগছে, কবে যে আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলব! যেন কথার পাহাড় জমে যাচ্ছে। এখন রাত ১২টা। আমার জাগার পালা, তাই বসে' বসে' লিখছি। লেখা আর ফুরাতে চায় না। রাত্রেও পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে, দিবারাত্রি স্বাধ্যায় চলেছে চেতনা জাগিয়ে রাখার জন্য। রাত ১২টা বাজল। ঘণ্টা দিতে যাচ্ছি। আমার জাগরণের পালা শেষ হল।

জীবন তো অর্দ্ধেক কেটে গেল, বাকী জীবনটা কি 'গুরু' 'গুরু' বলে' এমনভাবে কাটাতে পারব না! নিশ্চয় পারব। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন গুরুর দুয়ারে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যেতে পারি। ইহাই আমার যুগ-যুগান্তরের প্রার্থনা। আপনার হাতের লেখা দেখার জন্য প্রাণ বড় ছট্‌ফট্ করে। দোলের প্রণাম যখন আপনার কাছে পৌঁছল না, তখন মন বড়ই খারাপ হয়েছিল। তারপর আপনার দোলের বাণীর ভেতর আমার নামটি শুনে কত যে তৃপ্তি পেলুম, তা' কি আর বলবো! আপনার অযাচিত প্রেম ও করুণায় আমি অভিভূত, নিঃসংশয়।

পুনরায় আমার প্রণাম জানাচ্ছি।

"বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে"*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচারের নবীন ছাত্রগণ, ইচ্ছা ছিল নিজে উপস্থিত হইয়া তোমাদের সঙ্গে দুই-চারিটি কথাবার্ত্তা কহিয়া আলাপ-পরিচয় করিয়া আসিব। কিন্তু তাহা হইল না। অগত্যা জ্বরেরই গায়ে দুই-এক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতে হইল। এই ঘটনা হইতে একটা কথা আমরা মনে করিতে পারি, আমরা যা চাই তার অধিকাংশই হয় না, আর যা চাই না তাই হয় বেশী। আমরা যা চাইব তাই হইবে, এমন সৌভাগ্য কারও নাই। অনীপ্সিত আমাদের আসিবেই, আমরা যেন তাহার জন্য জীবনে প্রস্তুত হইতে পারি।

বাপু, আমি তোমাদিগকে ছাত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, কিন্তু মন আমার তা' চায় না। কেন চায় না? সাধারণতঃ তো 'ছাত্র'ই বলা হয়। ঠিক কথা। কিন্তু এ শব্দটা তেমন ভাল নয়, অন্ততঃ এই পরবর্ত্তী সময়ে। পূর্ব্বে ভাল ছিল। ছাতা যেমন রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে শরীরকে ঢাকিয়া রাখে, গুরুও তেমনি শিষ্যকে বিপদ্-আপদ্ হইতে আবরণ করিয়া রক্ষা করেন। আর শিষ্যও গুরুকে ছাতারই মত পরিপালন করিবে। এইজন্য শিষ্যকে বলা হইত ছাত্র। ইহা ছিল পাণিনি-পতঞ্জলির সময়ের অর্থ। তার পর (অর্থাৎ কাশিকাকারের সময়ে) তাহার নূতন অর্থ হইল। গুরুর কার্যসমূহে অবহিত থাকিয়া তাঁহার ছিদ্র আবরণে প্রবৃত্ত বলিয়া শিষ্যের নাম ছাত্র। বলাই বাহুল্য, বর্ত্তমানে আমরা এই অর্থেও মনে করিয়া ছাত্র-শব্দ প্রয়োগ করি না।

আমি তোমাদিগকে যে শব্দে সম্বোধন করিতে চাই তাহা হইতেছে 'বিদ্যার্থী' অর্থাৎ যে বিদ্যা চায়। আমার মনে আছে, আমি যখন কাশীতে পড়িতে গিয়াছিলাম, তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর। সেখানে আমার পরিচয় দিবার সময়ে আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি অন্যকে বলিতেন—এ একটি নূতন বিদ্যার্থী। কথাটা আমার কানে কেমন-কেমন ঠেকিত। তারপর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার মনে হয়, বিদ্যার্থী বলিয়া সম্বোধন করিলে তোমাদেরও কানে হয়তো ঐ রকমই ঠেকিবে। তা ঠেকুক, আমি তো দেখিতেছি—ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর শব্দ আমার জানা নাই। ছাত্রের আসল উদ্দেশ্যটা ইহাই সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার চোখের সামনে তাহা সর্বদা ধরিয়া রাখিতে পারে এমন আর কোন শব্দ কোন ভাষায় আছে আমি তো জানি না। ইংরাজী বা জার্মান Student, Latin Studing Zen ইহার তো কাছেই ঘেসিতে পারে না, ফরাসী Eléve তথৈব চ।

তাই বাপু, আমি তোমাদিগকে আমার প্রাণের মত মনের মত করিয়া সম্বোধন করিতে চাই বিদ্যার্থী।

তোমরা কলেজ অফ কালচারে প্রবিষ্ট হইতে যাইতেছ। এ বিষয়ে তোমাদের আমি সহযাত্রী। আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাই আমি যা' বলিতে যাইতেছি, বস্তুতঃ তা' আমি নিজেকেই বলিতেছি, আমি নিজেকেই তোমাদের আকারে দেখিতেছি।

বিদ্যালয়ের নামটি রাখা হইয়াছে ইংরাজীতে, ইহাতে আমার কিছু বক্তব্য নাই। নাম যাই হউক, আসল জিনিষটি বুঝা গেলেই হইল। কালচার বলিতে এখানে intellectual development, আমি ইহাকে বিশেষ self-culture বুঝিতেছি। বিদ্যার্থী বন্ধুগণ, আমি একটী কথা তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। দেশে বা দেশান্তরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। কত বড়-বড় পুস্তকালয়, কত বড়-বড় বিজ্ঞানশালা, কর্মশালা প্রভৃতি নিত্য-নিত্য স্থাপিত হইতেছে, বিজ্ঞানের কত কি অদ্ভুত অত্যদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু জগৎ ইহাতে পরস্পরের সঙ্গে ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে না, ক্রমশঃই দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতেছে? এই যে চারি দিকে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, কে ইহা করিল? এই এত স্কুল, কলেজ,

* প্রবর্ত্তক কলেজ অব কালচারের তৃতীয় পর্য্যায়ের উদ্বোধনসভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় এই অভিভাষণটি পাঠাইয়াছিলেন। প্রঃ সঃ।

বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানশালার কি ইহাই পরিণাম? শিক্ষার পরিণাম কি ইহাই? কোন্ দেশের কোন ধর্মে, কোন ধর্মশাস্ত্রে বলে যে, পরস্ব অপহরণ করিতে হইবে, পরকে পীড়ন করিতে হইবে? এই যে মানবেরা দানবের মত চারিদিকে যে যেরূপে পারে, সেইরূপে পৃথিবীকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের অভাব ছিল কিসের? খাওয়ায়, না পরার, না ভোগবিলাসের? এরা কি লেখা-পড়া করে নি? ধর্ম-কাজ করে নি? ধর্মশাস্ত্র পড়ে নি? অভাব কিসের? তবুও এই দশা কেন?

বিদ্যার্থী বন্ধুগণ, একবার ভাবিয়া দেখ। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এই কথাই তো সরকার বাহাদুরের কাগজপত্রে দেখিতে পাই। তা' যেমন এ দেশে, তেমনি অন্য দেশে। কিন্তু কাজটা দেখা যাইতেছে শিক্ষিতের না অশিক্ষিতের? এই তথাকথিত শিক্ষিতের দল কয়েক বৎসরের মধ্যে জগতের যে অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত মূর্খ একত্র হইয়া শত শত বৎসরেও এত অনর্থ কখনও করিতে পারিবে না।

কোন-কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দোষ দেন। কিন্তু হায়! বিজ্ঞানের অপরাধ কি? বিজ্ঞান তো নিজে বলিয়া দেয় না যে, 'তুই আমাকে মানুষ মারিতেই লাগা, মানুষ বাঁচান নয়। আগুন দিয়া ঘর পোড়ান যায়, আর রান্না করাও যায়। যে বিজ্ঞান প্রয়োগ করে, ভাল-মন্দ নির্ভর করে তাহারই উপর। আজ মানুষ ক্ষিপ্ত হইয়া শুভাশুভ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। পারিবার উপায়ও নাই—যতদিন সত্য-সত্য সে বিদ্যার্থী না হইতে পারিতেছে। তাই আমি চাই বন্ধুগণ, হে নবীন বন্ধুগণ, আমরা যেন সত্যকার বিদ্যার্থী হইতে পারি'। বিদ্যার আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে। এ নয় যে, বিদ্যার প্রভাবে পরলোকে দুঃখ যাইবে, সুখ হইবে। পরলোক থাকে থাকুক, অস্বীকার করি না। কিন্তু তা' তো আমরা কেউ দেখিনি, এমনও আমাদের মধ্যে কেউ থাকিতে পারেন যে, পরলোক মানেন না। নাই মানিলেন। কিন্তু এ লোকটা তো চোখের সামনে জল্ জল্ করিতেছে। বিদ্যা ফুটিয়া উঠিবে এই জীবনেই যে, আমার সর্বদুঃখের অবসান হইবে। ইহা হয়। ইহা অসম্ভব নয়! যুক্তিতেও ইহা পাওয়া যায়।

আর একটা কথা বলিতে চাই। বিদ্যা দুই রকমের। দৈবী ও আসুরী। আসুরী বিদ্যাই চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দৈবী বিদ্যা পরাভূত। কিন্তু ইহা ঠিক যে, দৈবী বিদ্যারই পরিণামে বিজয় হইবে। বিদ্যার্থী বন্ধুগণ, দৈবী বিদ্যাকেই আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। ইহাতেই আসিবে সর্বত্র শান্তি। বিদ্যা অর্জন করা এক কথা, আর জীবনে তাহা প্রতিপালন করা আর এক কথা। বিদ্যাহীন আচার ও আচারহীন বিদ্যা উভয়ই তুল্য। আজ তোমরা এই আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিতেছ, মনে কর আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী। যখন সমস্ত জগৎ অসুরের ঘোর অত্যাচারে থরহরি কম্পিত, সেই দুর্দিনে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজও অসুরের কম অত্যাচার নাই, আজও কম দুর্দিন নয়। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, দর্শন তোমাদের জীবনপথকে উজ্জ্বল করিয়া রাখুক। তোমাদের কল্যাণ হউক। সময়ান্তরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা থাকিল। আজ বিদায় গ্রহণ করি।

গান

শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত

হে মোর পরাণ প্রিয় আসিও আবার ফিরে,
তোমার লাগিয়া জাগি নিরজনে নদীতীরে।
আসিলে না তুমি হায়
মালা যে শুকায়ে যায়
রাতের হিমেল বায় নীরবে কাঁদিয়া ফিরে।
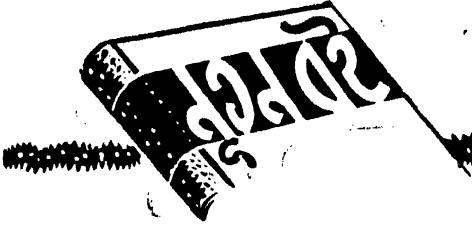
সনাতন নাম-সাধনা—শ্রীনরেশ ব্রহ্মচারী প্রণীত। শিবগড় রাজ্যের যুবরাজ শ্রীমান উদয়রাজ জী সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা মাত্র।

আর্য্যভারতে অনাদি কাল হইতে যে সকল বিচিত্র সাধনমার্গ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নাম-সাধনা সহজ এবং এ যুগে সর্ব্বোত্তম বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ঋষি ও মহাপুরুষ পরম্পরায় প্রচলিত অনাহত এই নাম-সাধনার সিদ্ধ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের মানস সন্তান শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার সদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থে বিষদভাবে ইহার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্য ভগবৎ কৃপালব্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নরেশচন্দ্র অতি সরলভাবে এই অজপা নাম-সাধনার বৈজ্ঞানিক রহস্য ও ক্রিয়া রহস্যের ইঙ্গিত আলোচ্য গ্রন্থে দিয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপের মধ্য দিয়া কত সহজে আধার যন্ত্র বিশুদ্ধ হয় এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও বিভূতি অবতরণ করে তাহার যে ইঙ্গিত ব্রহ্মচারিজী নিজের সাধনালোকে গ্রন্থ মধ্যে দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করি, জিজ্ঞাসু সাধক মাত্রেই উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নাম-সাধকদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে। গ্রন্থ মধ্যে গোস্বামী প্রভু, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ ও লেখকের তিনখানা হাফটোন ব্লক আছে। সিল্কের বাঁধাই, ছাপা ও গঠন পারিপাট্য চমৎকার।

শিশু-ভগবান—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। প্রকাশক: শিবসাহিত্য কুটির। প্রাপ্তিস্থান: প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আলোচ্য কবিতা-পুস্তক লেখকের পুত্রকন্যাদের উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইলেও, ইহার মধ্যে যে সুর ও সুন্দরের প্রকাশ তাহা পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। রচনাগুলির একটি বিশেষ কাব্যমূল্য আছে যাহা রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। শৈশব-জীবনের যে লীলা-চাঞ্চল্য সংসারে বিচিত্র জগৎ রচনা করে, গ্রন্থকার তাহা অনুভূতির রঙ্গে রাঙাইয়া পাঠকের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। রচনাগুলির সত্য ও সুন্দর আবেদন পাঠকের অনুভূতির গভীর স্তরে অনুরণিত হইবে এবং শিশুর মধ্যে ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ অনুভবের নাগালে আনিয়া দিবে। রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনা বিশেষ প্রসংসার যোগ্য। রচনার বিষয় ও তাহার পরিবেশ অনুযায়ী যে ছন্দঃবৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা সুন্দর হইয়াছে। প্রতি গৃহে এই কাব্যগ্রন্থখানি পঠনীয় ও রক্ষনীয়।

আমাদের গল্প—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা প্রণীত। প্রকাশক: নিউ বুক ষ্টল, ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম সাড়ে চার আনা।

আলোচ্য পুস্তক ছোটদের জন্য রচিত। ইহার সহজ সরল আবেদনটুকু মনকে আকর্ষণ করিবে। গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং নির্দ্দোষ শিশু-কল্পনাকে বহুদূর টানিয়া লইয়া যাইবে। বইখানির মূল্য আরও দুই পয়সা বাড়াইয়া গঠন-পারিপাট্য আরও ভাল করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

জীবনের শিল্প—এস্, ওয়াজেদ আলি প্রণীত। প্রকাশক: গুলিস্তাঁ পাবলিশিং হাউস, ৪৮, ঝাউতলা রোড, কলিকাতা। পৃঃ সংখ্যা ২৬৬, মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের চিন্তার আভিজাত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এদেশের সাহিত্য সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলির উপর একটা সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার রচনাকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিবে। বিশেষ করিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার যে মতবাদ তাহা সঙ্কীর্ণতাকে এড়াইয়া চলিয়াছে—ভবিষ্যৎ মুসলিম সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে প্রবন্ধকারের নির্দ্দেশিত এই পথ কল্যাণেরই সূচনা করিবে। হিন্দুমুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদও যথেষ্ট উদার, লেখক সত্যই বলিয়াছেন—"যে জটিল হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান মস্তিষ্ক করতে পারেনি, হৃদয়ের উদারতা সে সমস্যার সমাধান অনায়াসে করে দিয়েছে।" এই সম্পর্কে কবিশ্রেষ্ঠ হাফেজের এই অনুপম গাথাটি এখানে উল্লেখযোগ্য।

হাফেজা গার ওসল খাহি, সোলেহ কুন
বা খাস ও আম;
বা মোসলমান আল্লা আল্লা;
বা বেরাহমান রাম রাম।

হে হাফেজ! যদি কাম্য পেতে চাও, সকলের সঙ্গে প্রণয় কর, মোসলমানের সঙ্গে বল আল্লা আল্লা, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বল রাম রাম।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ :

বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনীষার সমুজ্জ্বল ক্ষেত্র হইতে 'একে একে নিভিছে দেউটি'। উনবিংশ শতাব্দী বাংলার উর্ব্বর ভূমিতে যে বিচিত্র প্রতিভার দীপ জ্বালাইয়াছিল তাহা বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। বাংলার যে সকল কৃতি সন্তান বাংলা তথা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। তাঁহার তিরোভাবে জাতীয় জীবনে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল তাহা আগামী বহু যুগেও অপসারিত হইবার নয়।

গত ২৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ নিজ বাসভবনে পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। এই দিন সারা মধ্যাহ্ন বেলা ধরিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া বারিপাত হইতেছিল। সন্ধ্যায় তাঁহার শব পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে নিমতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহার শাবাধারে পুষ্পমাল্য অর্পিত হয় এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বিগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করেন। শ্রীযুত দত্ত মৃত্যুকালে পত্নী, চার পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ঋষিতুল্য বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথের অনাড়ম্বর পবিত্র জীবন, তাঁহার অতলস্পর্শী জ্ঞান-গরিমা, বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভা, সর্ব্বোপরি তাঁহার মনস্বীতা ও প্রজ্ঞালোকের সত্যানুভূতি তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছে। সাহিত্য, দেশ-সেবা ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বাংলা ও বাঙালীর গর্ব্বের সামগ্রী। বর্ত্তমান ও অনাগত বাঙালী শ্রদ্ধায় এই মনীষীপ্রবরের স্মৃতির অনুধ্যান করিবে। তিনি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অকপট অনুরাগী সুহৃদ ছিলেন। প্রবর্ত্তক পত্রিকা তাঁহার স্নেহ ও দাক্ষিণ্যে ধন্য। আমরা এই বিদেহী আত্মার প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা তর্পণ করি।

পরলোকে ডিউক অফ্ কেণ্ট :

সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অফ কেণ্ট (জন্ম : ২০শে ডিসেম্বর, ১৯০২, মৃত্যু : ২৫শে আগষ্ট ১৯৪২) আইসল্যাণ্ড যাইবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪০ বৎসর হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে গ্রীসের রাজকুমারী ম্যারিনার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৯৩৮ সালে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার অষ্ট্রেলিয়া গমন স্থগিত থাকে। ডিউক অফ কেণ্ট, আর, এফ, এ'র সহিত যুক্ত ছিলেন এবং 'এয়ার কমোডর' স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মৃত্যু করুণ হইলেও বীরোচিত। রাজমাতা মেরী ও রাজ পরিবারের এই আকস্মিক শোকে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমবেদনার উদ্রেক হইয়াছে।

ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও মিঃ আর্থার মুর :

সম্প্রতি কলিকাতার ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের একটি সভায় ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা লইয়া যে আলোচনা হয় তাহাতে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ভারতে 'ন্যাসন্যাল গবর্ণমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে সভার উদ্যোক্তাদের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা সম্ভবতঃ একটা অপরিচয়ের অন্তরালে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার যথেষ্ট কারণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই ইউরোপীয় দলের পরিচয় কতকটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে মিঃ আর্থার মুরের বিবৃতিতে। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, ভারতীয় ইউরোপীয় সমাজের একাংশ আজ বর্ত্তমান সমস্যার গুরুত্ব কিছু উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে মেটে নাই। বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্শের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মিঃ আর্থার মুর ও তাঁহার মতবাদের সমর্থনকারী ইউরোপীয় দল নস্যাৎ হইয়া গিয়াছেন। আমরা এইরূপ একটা কিছু আশঙ্কা করিতেছিলাম। কায়েমী স্বার্থের সমর্থক এই বেঙ্গল

চেম্বার অফ কমার্স, কাজেই মিঃ আর্থার মুর প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলন যাহাতে ব্যাপকভাবে ভারতের ইউরোপীয় সমাজে ছড়াইয়া না পড়ে সেই ব্যবস্থায় চেম্বার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইউরোপীয় বণিকদলের এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও কোম্পানীর আমলের শোষণ বনাম বাণিজ্য নীতির স্বপ্ন দেখেন। স্বার্থে আঘাত লাগিবার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখিলেই ইহারা গুরুতর আতঙ্কিত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

ইহার পর সম্প্রতি মিঃ আর্থার মুর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ভারত-নীতি সম্বন্ধে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩৭ সাল হইতে ইঙ্গ-ব্রিটিশ-নীতির বিশ্লেষণ করিয়া অকাট্য যুক্তি সহকারে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের অছিলা মাত্র। জাপানকে পরাজিত করিতে হইলে ভারতের স্বাধীনতা অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে মিঃ মুর যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে বিবেচ্যই হইবে না।

হস্তলিখিত পত্রিকা :

সম্প্রতি কালনা গিয়া স্থানীয় তরুণদের সঙ্ঘ-গঠনে উদ্যম ও হাতে-লেখা পত্রিকা প্রচারের উৎসাহ দেখিয়া প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। কয়েকটি মিলন-সঙ্ঘ ও কয়েকখানি হাতের লেখা পত্রিকা অতটুকু ছোট মহকুমা সহরে বর্ত্তমান, অথচ স্বল্প সময়ে বিভিন্ন সঙ্ঘ-সভ্যদের মধ্যে যে পারস্পারিক প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় পাইলাম তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায়শঃ ঈর্ষ্যা ও রেষারেষির ভাবই বাঙালীর বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়। 'শেফালি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, সম্পাদক শ্রীশচীনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রতিষ্ঠাতা শ্রীতারাপদ ঘোষ) ও 'বৈশাখী' (তৃতীয় সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীমানবেন্দ্র পাল, পরিচালক চিত্ত বোস) এই দুইখানি পত্রিকা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট এবং এক ও বহু রঙের ছবি, বিবিধ প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার যেন সাজি। সম্পাদকীয় মন্তব্যে তরুণেরা তাদের প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। 'শেফালীতে' "বর্ত্তমান evacueeদের দুর্দ্দশা" শীর্ষক একটি সাময়িক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত পুস্তক পুরস্কার ঘোষণা করিয়া প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধটি প্রাপ্ত। পত্রিকায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, আরও অনেক উৎকর্ষ সাপেক্ষও বটে। তবুও এ কথা বলা চলে যে, ইহাতে যে প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, নিষ্ঠা ও সাধনার স্পর্শ মিলে তাহা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ব্যবসাবুদ্ধিতে পরিচালিত মুদ্রিত-পত্রিকা বাহুল্যে বিরল। আশা করি, তরুণ বন্ধুরা শ্রদ্ধা ও আত্মবিকাশের অনুশীলন ক্ষেত্র হিসাবে অনন্যনিষ্ঠায় এই পত্রিকাগুলিকে গ্রহণ করিয়া ইহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবে।

প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ :

জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধানতম ভিত্তি হইতেছে শিক্ষা। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সংগঠন কর্ম্মের পুরোভাগে তাই শিক্ষা স্থান পাইয়াছে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সহিত যোগ রাখিয়া আশ্রম পরিবেশের অনুকূল আবহাওয়ায় ভারতীয় ভাবে সুকুমারমতি বালকবালিকার মস্তিষ্ককোষ ও চরিত্র-গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি এইসব বিদ্যাপীঠে রাখা হয়। বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেও এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল এইরূপ হইয়াছে : চন্দননগর বিদ্যার্থি ভবনের ২০ জন ছাত্রের মধ্যে প্রেরিত হয় ১৮ জন। তন্মধ্যে ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের দুই জন পরীক্ষার্থিনীই উত্তীর্ণা হইয়াছে। চট্টল বিদ্যাপীঠের ৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জনই উত্তীর্ণ হইয়াছে। ময়মনসিংহ কেন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের কোচিং বিভাগের তিনজন পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এত বিপর্য্যয়ের মধ্যে ছাত্রগণের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া সঙ্ঘ যে শিক্ষা প্রসারের পথে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিয়াছে, ইহা আশার কথা।

পরলোকে হীরালাল হালদার :

গত ৩০ শে ভাদ্র বুধবার ডাঃ হীরালাল হালদার ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁর মানিকতলা বাসভবনে পরলোকগমন করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে ডাঃ হালদার বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের জন্য তিনি বাংলার কলেজসমূহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গৌরবময় স্থানাধিকার করিয়া থাকিবেন। কয়েক বৎসর তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছিলেন। ডাঃ হালদারের চিন্তাশীল দার্শনিক অবদান আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁহাকে সম্মানার্হ করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ডিভিসনের কমিশনার শ্রীযুত এস. কে. হালদার আই-সি-এস তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল :

বঙ্গীয় আইন পরিষদের গত অধিবেশনে নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (New Secondary Education Bill) সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সিলেক্ট কমিটির কার্য্য পরিচালিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমানে মন্ত্রী মহোদয় উচ্চতর আইন পরিষদের (Upper House)

সদস্য, এই কারণে তাঁহার সভাপতিত্ব করিবার অধিকার আছে কিনা এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের আইন সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা যাঁহারা তাঁহারা এই অভিযোগ সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উভয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক নিয়ম-কানুনের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে পরিষদ কর্ত্তৃক কমিটি নির্ব্বাচিত হইবে সেই পরিষদের সদস্য থাকিলে কোন বাধাই থাকে না। অন্যথায় কমিটির একজন সদস্যকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া কার্য্য চালাইতে হয়। আমাদের মনে হয়, সিলেক্ট কমিটির কার্য্য পরিচালনায় মাঝে মাঝে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই একমাত্র দায়ী।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী :

৩০শে ভাদ্র সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলার নাট্যমঞ্চে ও নাট্য সাহিত্যে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। শ্রীযুত শিশির ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসার পর তাঁহার যে নট-জীবনের সূত্রপাত হয় তাহা অচিরেই 'সীতা' নাটকের রচয়িতা হিসাবে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠার প্রায় শিখরদেশে উন্নীত করিয়া ধরে। ১৯৩১ সালে তিনি শিশির সম্প্রদায়ের সহিত আমেরিকায় অভিনয় করিতে যান। মঞ্চে ও চিত্রে অভিনেতা রূপেও তাঁর তুলনা তিনিই। তাঁহার রচিত 'দিগ্বিজয়ী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'পরিণীতা' প্রভৃতি নাটক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ। এতদ্ভিন্ন তিনি 'মহানিশা', 'চরিত্রহীন', 'বাংলার মেয়ে' প্রভৃতির নাট্যরূপ দিয়াও নাট্য সাহিত্যকে শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৫ সালের কমলা বক্তৃতা :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ১৯৩৫ সালের জন্য কমলা লেকচারার পদে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম প্রস্তাব করিয়া সিনেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় বস্তু হইবে "The interaction of Muslim and Indian cultures : Their synthesis and Development." সিণ্ডিকেটের এই নির্ব্বাচন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

পরলোকে বিনোদবিহারী ঘোষ :

গত ২৩শে শ্রাবণ শনিবার বিনোদবিহারী ঘোষ মহাশয় বারাকপুরের নিকট তাঁর স্বগ্রাম নোনায় ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বিধবা পত্নী ও সৎমা বর্ত্তমান। পাট কলের সামান্য চাকুরী হইতে স্বীয় অধ্যবসায় ও সততার বলে তিনি ধান-কলের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিবিধ ব্যবসার দ্বারা জীবনে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

৺বিনোদবিহারী ঘোষ

ধর্ম্মপরায়ণ, নিষ্ঠাবান নীরব কর্ম্মী বিনোদ বাবু বরাবর অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বহু নিরন্ন, অনাথা ও বিধবাকে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অকপট অনুরাগী সুহৃদ বিনোদ বাবুর মৃত্যুতে আমরা তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁর বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

প্রবর্ত্তক কলেজ অফ্ কালচার :

বিগত জন্মাষ্টমী তিথিতে প্রবর্ত্তক কলেজ অফ্ কালচারের তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সঙ্কটের জন্য সকল ছাত্র এই নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইতে না পারায় ইহাদের প্রতিভূস্বরূপে আগত দুইজন বিদ্যার্থি প্রবর্ত্তক আশ্রমের দীক্ষাক্ষেত্রে সঙ্ঘ-সাধক-সাধিকার সম্মুখে

প্রজ্জলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে শিক্ষামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সঙ্ঘাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্য কাব্যতীর্থ এই দীক্ষাযজ্ঞ সম্পূর্ণ আর্য্য ভারতীয় রীতিতে সম্পন্ন করেন। সঙ্ঘগুরু এই উপলক্ষে যে বাণী প্রেরণ করেন তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। এই বাণীতে শিক্ষা ও দীক্ষার মর্ম্ম পরিচয় মিলিবে।

এই উপলক্ষে অপরাহ্নে আশ্রমে এক উদ্বোধন-সভা হয়। সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় তিনি যে অভিভাষণ পাঠাইয়াছেন, তাহাও অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয় সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত এক আবেগময়ী বক্তৃতায় কলেজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য বিদ্যার্থিদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে।

লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-সভা :

'Indian Art and Letters'-এর একটি সংখ্যায় প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর লণ্ডনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি সভায় রবীন্দ্র স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কবির 'গীতাঞ্জলী', 'গার্ডেনার' ও 'ক্রেসেণ্ট মুন' নামক গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করা হয়। গীতি-নাট্য 'চিত্রা'র দুইটি দৃশ্যের অভিনয়ও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই অভিনয় ব্যাপারে ম্যাডেম লিলি ফ্রয়েড-মার্লে ও ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা :

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রচার-সচিব স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার (বর্ত্তমানে শাসন-পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন) ভারতবর্ষের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অভিযোগের উত্তর-দান প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম হইতেছে এই যে, বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখে প্রেস কনফারেন্সে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট রাজনীতিক অভিমত প্রকাশ বিষয়ে বা ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন বিষয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কোন হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, কিন্তু হিংসামূলক কার্য্য এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থন বা উৎসাহদানসূচক কোনপ্রকার সংবাদ বা মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। স্যার রামস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণনীতির আসল রূপ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যাইবে না। এই নীতির অপপ্রয়োগের ফলে দেশের সংবাদপত্র জগতে যথেষ্ট আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। বাংলার তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ইহার প্রতিবাদে একযোগে তাহাদের প্রকাশ বন্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তুচ্ছ অভিযোগকে গুরুতর মনে করিয়া এতখানি স্বার্থত্যাগ করিবার সংস্থান পত্রিকাগুলির ছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া জনসেবা আজ অসম্ভব, ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা এই দারুণ দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার শিক্ষা ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমানে সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতির যে বিচিত্ররূপ বিভিন্ন প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাংলার বাহিরের কয়েকটি প্রদেশ ধৃত ব্যক্তির নাম প্রকাশ করাকে আইন অমান্যের সমর্থন মনে করেন না। অথচ বাংলাদেশে ব্যবস্থা ভিন্ন রূপ। অশান্তি ও উপদ্রব দমন করিবার জন্য পুলিস কোথায় কতবার গুলি নিক্ষেপ করিয়াছে সে সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশের বিভিন্ন মানদণ্ড বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত। এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে ইহা মনে করা অন্যায় হইবে না যে, নিয়ন্ত্রণনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ও ভুল বোঝার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রদেশের এক্সিকিউটিভ কর্ত্তব্য বোধের উপর বর্ত্তমানে যে আস্থা ভারত সরকার স্থাপন করিয়াছেন বর্ত্তমানে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন।

পরলোকে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার :

মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর গত ২৭শে আগষ্ট কাশীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। প্রদ্যোৎকুমার মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র। প্রদ্যোৎকুমারের খুল্লতাত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহনের জমিদারীর তিনি উত্তরাধিকারী হন।

মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সামাজিক প্রকৃতির ছিলেন এবং দেশের বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে তিনি কলিকাতার সেরিফ নির্ব্বাচিত হন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা মহারাজের সে যুগের প্রাণখোলা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রদ্যোৎকুমারের তিরোধানে বাংলা দেশের সামাজিক জীবন হইতে একটি বলিষ্ঠ আদর্শপরায়ণ সামাজিক ব্যক্তির তিরোধান হইল।

হিন্দু-মহসভা ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদঃ

নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে মহাসভা বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা স্বাধীনতাকামী ভারতীয়-মাত্রেই সমর্থন করিবেন। কোন অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী না হইয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহারা বর্ত্তমান অচল অবস্থার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাসভার প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি আদর্শপরায়ণ জাতির মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—

"বর্ত্তমান সমরোদ্যমে ভারতবর্ষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা লাভ করিবার একমাত্র পথ হইল ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী প্রতিপালন করা। ইংলণ্ড ও অন্যান্য মিত্রশক্তির স্বার্থ সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলে ভারতবাসীকে রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। তবেই ইংলণ্ডের কোন শত্রু-শক্তির পক্ষে ভারতের অধিবাসীদিগকে প্রলুব্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।"

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ইহার পরে সর্ব্বদল সম্মেলনের এক প্রচেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে বড়লাট বাহাদুর ও

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মিঃ জিন্নার সহিতও সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি তিনি পান নাই। তাঁহার এই উদ্যমে অন্ততঃ ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, এক লীগ ছাড়া ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আর কোন অন্য দল নাই। তবুও মিঃ চার্চহিলের সুস্পষ্ট বক্তৃতার পরে ডক্টর মুখার্জ্জির এই প্রচেষ্টা কতকটা পণ্ডশ্রমই বলিতে হইবে।

সম্পাদকঃ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত
এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এখন কেমন আছেন?
ভালই আছি
সারিডন
খাওয়ার পর আর কোন যন্ত্রণা নেই
Saridon
Saridon
Saridon

হিমাংশু স্নো

প্রসাধনের অপূর্ব্ব সামগ্রী

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানী লিঃ কলিকাতা

‘শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা’ গেঞ্জী

সকলের এত প্রিয় কেন ?

একবার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন

সামার-লিলি

নটেড্ মেস্

ফ্যান্সি-নীট

সুপারফাইন

কালার-সার্ট

লেডী-ভেষ্ট

কুল্‌টী

সামার-ব্রীজ

শো-ওয়েল

কুল-ওয়্যার

সামার-নীট

গ্রে-সার্ট

সিল্‌কট

স্যাণ্ডো

সুদীর্ঘকাল ইহার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট—আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন।

কারখানা—৩৬।১এ সরকার লেন, কলিকাতা। ফোন—

বিঃ দ্রঃ—গ্রাহকগণকে প্রতারণা হইতে সতর্ক করিবার জন্য আমরা জানাইতেছি যে, এই প্রসিদ্ধ জুয়েলারী এবং ব্যাঙ্কিং কারবার ভিন্ন আমাদের অপর কোন ব্যবসায় নাই এবং আমাদের কোন শাখাও নাই।
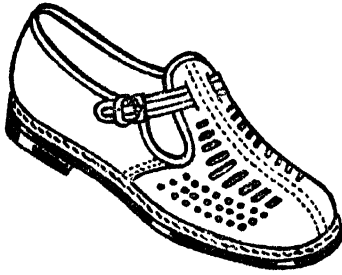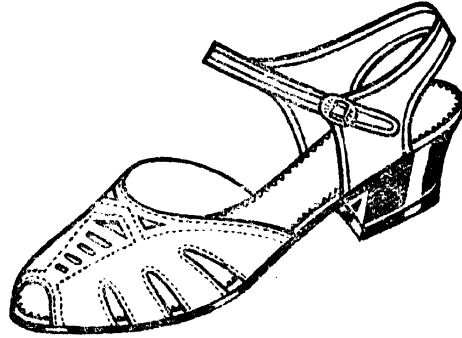
উৎসবের আনন্দে
মহিলাদের নীচু গোড়ালিযুক্ত সুদৃশ্য স্যাণ্ডাল। হাল্‌কা ও আরামপ্রদ।
ছোটদের চামড়ার "ষ্ট্র্যাপ্ সু"। সকল ঋতুর উপযোগী।
প্যাটেণ্ট চামড়ার চকচকে কাল নিউকাট্। চামড়ার সোল্ ও গোড়ালি।
Bata